সত্যযুগ

With compliments of :

FIDMA LIMITED

(A Marketing Agency & Raw Materia
Bank for Small & Cottage Industries

Registered Office

6/2, Moira Street, Calcutta—700 017

Cable : 'DINDEC' Telex : 021-3188 Phone : 44-4741

CUL-HO5265-1-303256

উৎসবের মেজাজ আনতে চাই...

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেলের তৈরী

PX/K-P1/77

UNIVERSITY

A New English Weekly

A Bold Venture of Satyajug Group of Publications

Editor : **A. K. BANERJEE**

Contact for details : **Satyajug Publications (P) Ltd.**
13, Prafulla Sarkar Street, Calcutta—700072
Phone : 23-0502 Gram : JIBANSATYA

পেটের বেদনা আরোগ্য করে!

এম,এ,করিমের –

অম্লজীন

অজীর্ন,অম্লপিত্ত,
অম্লবমি,অম্লশূল,
বায়ুশূল,গলাবুক
জ্বালা,লিভার ব্যথা
ইত্যাদি পেটের
পীড়া দ্রুত নিরাময়
করে।

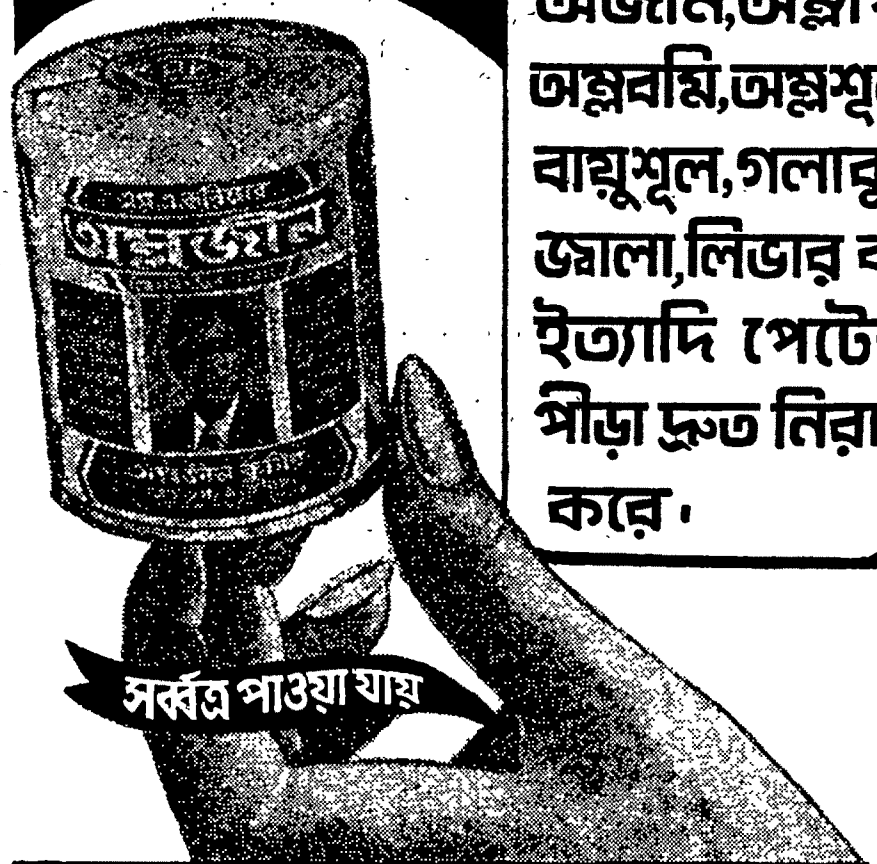

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

artland

অম্লজীন কুটীর

সায়েস্তা নগর
২৪,পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ

ষ্ট্যামাক প্রোডাক্টসের নতুন প্রচেষ্টা

ধারাবাহিক গবেষণা ও নিয়মিত মান নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা যে সব ভেষজ উৎপাদন করি সেইগুলি যে শুধুই মানুষের কাজে লাগে তাহা নহে, পশুপক্ষী, জীবজন্তুদের স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিরও সহায়তা করে।

আমাদের নূতন উদ্যম 'সুলভ কীট পতঙ্গ' বিনাশক (যাহাতে চাষের উপকার হইবে) এবং বিভিন্ন প্রকারের রসায়ণ যাহা আমাদের দেশের ভেষজ উৎপাদনে সহায়তা করিবে, ইহার ফলস্বরূপ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও দৃঢ় হইবে।

যে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের সহায়তা আমাদিগকে এই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাঁহাদেরই সহায়তা আমাদিগের এই নূতন প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে ও ভবিষ্যতে নূতন নূতন রকমের ভেষজ, রসায়ণ সৃষ্টি ও উৎপাদন আরম্ভ করিতে উৎসাহ দিবে।

ফার্মাসিউটিকল, ডেণ্টাল, ভেটেরিনারী এবং পোলট্রি মেডিসিনস্,
ফার্মাসিউটিকল এবং হর্টিকালচারাল সমূহের

প্রস্তুতকারক

ষ্ট্যামাক প্রোডাক্টস

১০৮এ/১০৮বি, হাজরা রোড, কলিকাতা—৭০০০২৬

গ্রাম ঃ হাসপেট

ফোন ঃ ৪৭-৪৪৩১ ; ৪৭-০৮৪২

লোক সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী ৺গৌরচন্দ্র দাসের নিরলস কর্ম্ম সাধনাসমৃদ্ধ

৮৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়

সত্যেশ্বর অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬, ৫৫-৮১১০

৮৪'র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

।। শ্রীশৈলেন মোহান্ত-র প্রযোজনায় ।।

চিত্ত দে রচিত পরিচালিত

সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সোনার ঘোড়া

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণতম পালাকার

সৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এবারের

একমাত্র পৌরাণিক পালা—

নাগমণি

সুর ঃ শচীন বোস ও ক্ষিতীশ দাস

মনোজকুমার

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিল রায়

রেখা ভট্টাচার্য

অজিত মুখার্জী

কেয়া রায়

ও

পুতুল চক্রবর্তী

এবং

অজিত সাহা

কণ্ঠেঃ

হরিগোপাল

ও

অমূল্য নট্ট

প্রযোজক ঃ

বীরেন্দ্র কুমার নট্ট

ম্যানেজার ঃ

ধীরেন নট্ট

পরিচালক ঃ

অনিল রায়

ফোনঃ ৫৫-৮৮৭৮/৭৭-৪৪৫৫

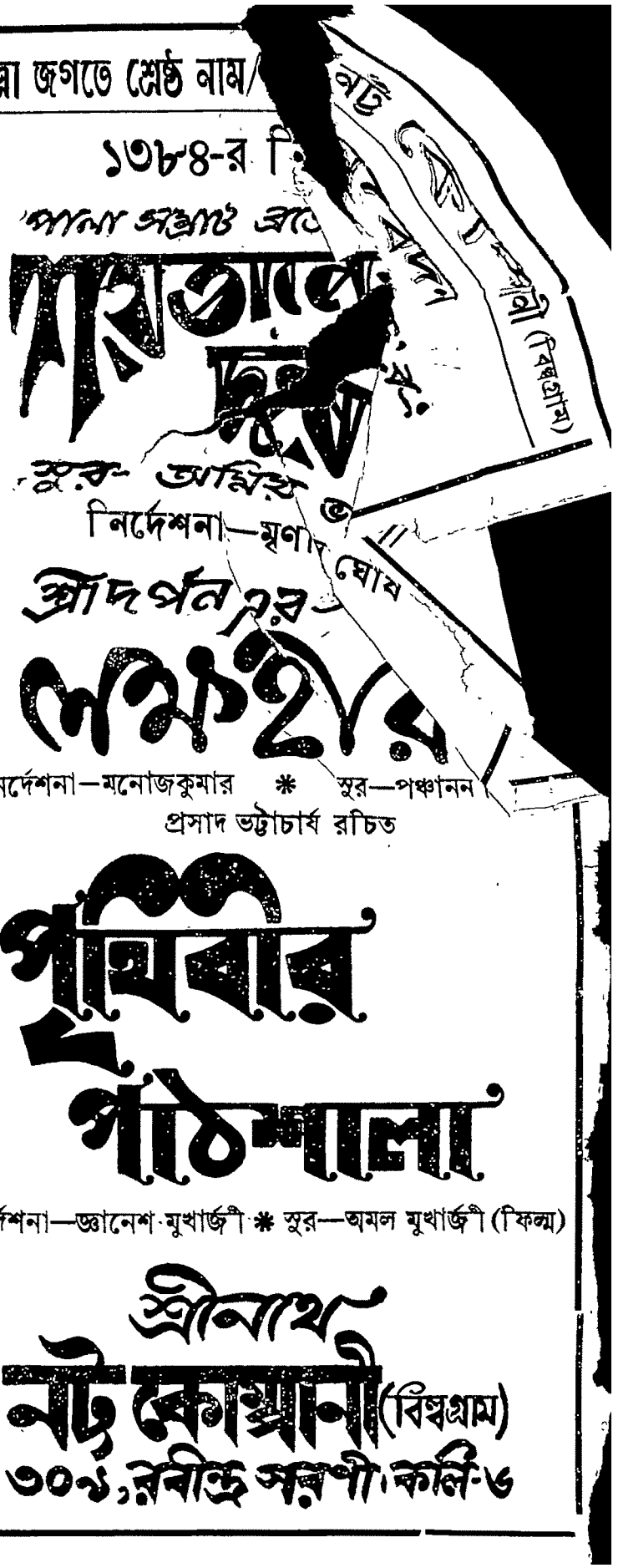

তরুণ অগ্নেরার

-ঃ শারদ সম্ভার ঃ-

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা ★ সিপাই মিউটিনি

রচনা ঃ শম্ভু বাগ
গীত ঃ মধু গোস্বামী
সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

রচনা ঃ মধু গোস্বামী
সুর ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

কার্ল মার্ক্স

রচনা ঃ শম্ভু বাগ
সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ক্রীতদাস

রচনা ঃ শম্ভু বাগ
সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

রচনা ঃ হারু রায় ও বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ
সুর ঃ দুর্গা সেন
নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

মাতা কোম্পানী
৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী · কলিকাতা-৬

আনন্দময়ের
অগ্নিপরীক্ষা
সুর : জগন্নাথ ধর

কানাই নাথের
বেইমান বিধাতা
সুর : গোপাল মল্লিক

শ্রেঃ পান্না চক্রবর্তী
চিত্রা মল্লিক

নিউ প্রভাস অপেরা
৩৩৬এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ ফোন ৫৫-৫৭৮৭
১৩৮৪'র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

রচনা ও পরিচালনা
শৈলেশ গুহনিয়োগী
সুর
বিনোদদাস
গীত
সরজেন্দ্র ঘোষ

কুণাল মুখার্জী রচিত ও পরিচালিত

গীত অজাতশত্রু সুর পশুপতি ভট্টাচার্য
আলোকসম্পাত · সমীর লাহিড়ী (যে ছি ফিল্ম খ্যাত)
দৃশ্যসজ্জা · শ্যামসুন্দর গোস্বামী
তপনকুমার ও প্রশান্তকুমার
মঞ্চশিল্পী · কলকাতা
ঃ পরিচালনায় ঃ রমেন বসুমল্লিক

আনন্দময়ের
কংস
সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সত্যপ্রকাশ দত্তের
সম্রাট আলাউদ্দিন
সুর ঃ দুর্গা সেন

নির্দেশনায় ঃ শেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রেঃ—রাখাল সিংহ, গুরুদাস মিত্র, দিব্যেন্দু মুখার্জী, অঞ্জনা ব্যানার্জী,
মায়া পাল ও রীতা দত্ত এবং দেবকুমার

—ঃ পরিবেশনায় ঃ—

ভারতী অপেরা

১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৬ ফোন : ৫৫ ২৩৫১

ঃ শাখা অফিস ঃ

রাণীসায়ের মোড় ।। ২৬২৩ (রাণীগঞ্জ) অনিল ভাণ্ডারী

॥ প্রবন্ধ ॥

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না কেন? ৯ জ্যোতি বসু
বাঁকা চোখে মাঁ দুর্গা ১৫ সনৎ কুমার মিত্র
ভারত-চীন মৈত্রী ২৮ অন্নদাশংকর রায়
বামপন্থীদের ভূমিকা ৩৩ কুমুদ দাশগুপ্ত
জীবনী সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪১ মণি বাগচি
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর পর্বের গল্প ১০৯ নারায়ণ চৌধুরী
জনপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনার দাবি গণতন্ত্রেরই মৌল অধিকার ১৭৩ ডঃ সরোজমোহন মিত্র
বাংলা ছোটগল্পের রীতি চর্চা ১৯৭ অনুনয় চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের শেষ আলোচনা ২৩১ নেপাল মজুমদার
অপসংস্কৃতি: কি ও কেন ২৪৭ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

॥ ভ্রমণ কাহিনী ॥

রাশিয়া পরিক্রমার অভিজ্ঞতা ১১ বিবেকানন্দ মুখোঃ

॥ নাটক ॥

বিষসনা ৫১ মন্মথ রায়

॥ স্মৃতিকথা ॥

কলকাতা বেতারের আদিযুগ ২৫ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
শব্দ ৩৭ লীলা মজুমদার

॥ রস রচনা ॥

বোতল বোমের কারসাজি ১১৩ ঈশ্বর গুপ্ত

॥ অপ্রকাশিত কবিতা ॥

নগ্ন প্রকাশ/শেষ লেখা ১৭ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ কবিতা ॥

হে বিপ্লবী ৫ মনীশ ঘটক
নাস্তর্পন্থা ৫ বিমলচন্দ্র ঘোষ
ঈশ্বর প্রেরিত ৫ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এগিয়ে যাবার সময় ৬ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
মন্ত্র র পর ৭ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
অস্ত্রের নিজস্ব খেলা ৮ শ্যামল সেন
আশ্চর্য,আঁধার ৭ পলাশ মিত্র
ধান ফুল ৬ স্মরজিৎ দাসগুপ্ত
দৃশ্যান্তর ৬ মধু গোস্বামী
বন্দী জেগে থাকো ৬ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘুমের ভেতরে আর ৮ জিয়াদ আলি
কবিদের ভাষা চাই ৮ সুনির্মল কুণ্ডু
আমরা একশো জন ৭ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
আলোর সিংহাসন ৭ সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়
ব্যবহৃত, হৃত ৮ ধূর্জটি চন্দ
কঠিন মনের জন্ম হয় ২৪৪ ঋতীশ চক্রবর্তী
অর্গল কিম্বা অশ্রুজল ২৪৪ দেবারুণ রায়
এক দুঃসাহসী নাবিক ২৪৪ অরুণ মণ্ডল
সার্কাস ২৪৪ শংকর চক্রবর্তী
পরাজিত মানুষ, বিজিত সাম্রাজ্য ২৪৫ প্রফুল্ল অধিকারী
যন্ত্রযুগ ২৪৫ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতীক্ষা ২৪৫ সঞ্জীব ঘোষ
আমাদের পৃথিবীর জন্যে ২৪৫ দীপক খান
একটি চিঠি ২৪৬ রেবা ঘোষ
নাচিকেতা ২৪৬ রজত বন্দ্যোপাধ্যায়
নীল পাখি ২৪৬ দীপক হালদার
শেষ প্রশ্ন ২৪৬ টগর দাস

॥ সায়েন্স ফিকশন ॥

জীবনের ঘাটে ঘাটে ২০৬ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

॥ উপন্যাস ॥

সুর ও সমাধি ৫৮ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
শেলটার ১১৭ নির্মল ঘোষ
এম ডবলু বনাম লখিন্দ ১৪৭ মহাশ্বেতা দেবী
প্রতিপক্ষ ১৭৬ কৃষ্ণ চক্রবর্তী

॥ গল্প ॥

অস্ত রবির আলোয় ১২ প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রাপ্তি ও সুপ্তি ৩০ সুনীল চক্রবর্তী
প্রত্যাবর্তন ৪৫ মানবেন্দ্র পাল
দড়ি ৫৩ আশা দেবী
শুভঙ্কর ঘুমুতে চায় ৫৫ শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
শর্ত ৮৯ মিহির আচার্য
হাটের মানুষ ১০২ তপোবিজয় ঘোষ
ফুটপাতের কাব্য ১৪০ রনজিৎ কুমার সেন
পানশালায় ১৬৩ সাধন চট্টোপাধ্যায়
মরণ হে মহামরণ ১৬৭ চিত্ত ঘোষাল
প্রবল জীবন স্রোতে ২০০ হলধর পটল
তারপর ২৪০ তরুণ সেনগুপ্ত
রাবণের চিতা ২৭৩ অনির্বাণ রায়চৌধুরী
যুদ্ধক্ষেত্র ২৭৬ সঞ্জয় সিকদার

॥ অনুবাদ গল্প ॥

এখন যে হাওয়া বইছে ৯৩ সি এস রাও
(তেলুগু গল্প) অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্
পিঁপড়ে মেরো না ৯৮ ইউসুফ এল সেবাই
(মিশরের গল্প) অনুবাদ : আশাষ সান্যাল

॥ চল. চ্চত্র ও রঙ্গমঞ্চ ॥

বিদেশী ছাব ২৫১ অনিল সেন
বাংলা সবাক চিত্রের
২৫ বছর ২৫৩ অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত
বাংলা ছবির সংকট ২৫৭ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
যে ছবি হল না, হয় না ২৫৯ নির্মল ধর
সাম্প্রতিক নাটক :
একটি সমীক্ষা ২৬১ প্রলয় কুমার দেব
বাংলা নাটকের গান ২৬৪ শম্ভু চৌধুরী
গিরিশচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা ২৬৬ দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ খেলাধুলা ॥

শতবর্ষের আলোয়
কলকাতা ফুটবল ২৬৯ মাণিক ঘোষাল
আমরা পিছিয়েই রই ২৭০ সন্তোষ শীল
বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে ভারতের
মান খুবই নীচে ২৭১ জয়ন্ত মুখার্জী

॥ নয়া পাঠশালা ॥

মাস্টারদার চিঠি ২৭৯ মাস্টার দা
টগর ও প্রকৃতি রাণী ২৮০ মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত
ছড়া ২৮০ পরেশ ঘোষ
ছড়া ২৮০ জ্যোতির্ময় দেববিশ্বাস
জ্বালা ২৮১ কুমারেশ ঘোষ
হাতির দাম ২৮১ রবিদাস সাহারায়
ছুঁচোর গোলাম চামচিকা ২৮১
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
খেলা ঘরের খেলা ২৮২ রঞ্জিত বিকাশ
বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যাকটাসের আদি নিবাস
আমেরিকা ২৮৩ শচীন কুণ্ডু
বাবার জন্য হাবার ছড়া ২৮৩ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছড়া ২৮৩ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত কে না শোনে ২৮৪ অ নন্দ মিত্র
শীতের বাজারে ২৮৫ নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
কাবুলিওলা ২৮৫ পিনাকীরঞ্জন কর্মকার
আলাপ সালাপ ২৮৫ সরস দে
দর্প চূর্ণ ২৮৬ ডাঃ শচীন্দ্র দাশগুপ্ত
বহুরূপী ২৮৬ সলীল মিত্র
আরমানের ঘুম ২৮৭ তরুণ কুমার রায়
প্রতিদান ২৮৮ যদুনাথ রায়
রূপ কথার ডাইনী ২৮৮ সুধাংশু সরকার
কবির ভাগ্য ২৮৯ প্রফুল্ল হোড় রায়
মাছের বাজার ২৯০ মনোজিৎ বসু
ছড়া ২৯০ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
মহাকাশ জয়ী রকেট ২৯১ শৈলেন দত্ত
ছড়া ২৯২ হিরন্ময় রায়
ফেলে আসা দিন ২৯২ পারুল ঘোষ
পান্না লালের পিসি ২৯৩ দুলাল বিশ্বাস
সেই ডেসেটার শরৎ ২৯৩ অপূর্ব কুমার কুণ্ডু
উপাধি বিতরণ ২৯৪ দিলীপ দে সরকার
তারপর মানুষ আকাশে
উড়লো ২৯৪ উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
কাকের বাসায় কোকিল
ছানা ২৯৫ ছন্দা বাগচী
রাজপুত্তুর ২৯৫ তপন জ্যোতি সরকার
পাতালরেল ২৯৬ ধীরেন বলা
ঈর্ষাকাতর ২৯৬ অর্ণব জ্যোতি দেব

॥ ফটো ॥

মোহন নাগ, পল্লব দত্ত, গোবিন্দ রায়, দীপক ভট্টাচার্য।

॥ অলঙ্করণ ॥

দিলীপ দাস, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, পাবন, আশুতোষ সাহা। কবি করুণানিধানের স্কেচটি এঁকেছেন বিশ্বরঞ্জন প্রামাণিক।

॥ প্রচ্ছদ ॥

মলয়শংকর দাশগুপ্ত।

গোটা দেশ কারাগার
বাক্‌রুদ্ধ মানুষের ভাষা
স্তব্ধ হয় বন্দী লেখনীতে ;
মানুষের অর্জিত অধিকারগুলি
লুঠ করি
টেনে দেয় কৃষ্ণ যবনিকা।
শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকারে
নরকের কীটগুলি কিলবিল করে।
তার মাঝে
ডাকিনীর ক্ষমতা বিলাস।

সেই
অভিশপ্ত দিনগুলি শেষে
শ্বাস-মুক্তি অবসরে
দেবিকার অকাল বোধন।
পড়ে থাক্ নতুন হিসাব ;
সম্ভাবনা, পরিণতি নিয়ে
চুলচেরা গবেষণা।
মনের আনন্দ আজি
উৎসবের রঙে
নতুন উদ্যম নিয়ে হোক সঞ্জীবিত
প্রাণের জোয়ার যেথা
আলোর বন্যায়
যৌবনের সার্থকতা খোঁজে।

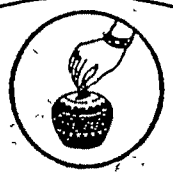

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে"

সঞ্চয় ও ভবিষ্যত নিরাপত্তাবোধ
আপনার ও পরিজনবর্গের জীবনে
এই আনন্দের ধারা
জীবনভর অব্যাহত রাখিবে

উৎসব মুখরিত
শারদীয়ার
শুভেচ্ছার সঙ্গে
এই কামনা জানাই

আশ্বিন ১৩৮৪

বি, কে, রায়
সেক্রেটারী

দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

(স্থাপিত ১৯৩২)
রেজিস্টার্ড অফিস :
পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

PRASA

হে বিপ্লবী

মণীশ ঘটক

গোড়াকাটা গাছে বৃথা জল ঢেলে
যেওনা তাহাকে বাঁচাতে
শিক ভাঙা পেয়ে যে পাখী পালালো
চেওনা ফেরাতে খাঁচাতে
বিপ্লবী, তুমি করতে চেওনা
অসম্ভবেরে সম্ভব
মানুষে যা পারে ভালোভাবে করো,
সেই হবে সেরা বিপ্লব।।

নান্যপন্থা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

করুণাকৃপণ মানব সমাজে
চাইলে কিছু পাওয়া যায় না।
কোনো ব্যক্তির অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর
ন্যায়সঙ্গত চাওয়ার প্রয়োজন
যতই থাকুক
প্রার্থনায় ওপরতলার সমাজ টলে না

দেশ জুড়ে চাওয়ার কিম্বা দাবির
পরিস্থিতি যারা সৃষ্টি করেছে
তাদের শ্রেণীসিদ্ধ হুঁসিয়ারি
জোরালো আইন কানুন, অস্ত্রশস্ত্র,
আর ধর্মানুশাসনে সংরক্ষিত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী
দলীয় অধিকার সৃষ্টির নৃশংসতা
কার্পণ্যে বিদ্বেষে
প্রভুত্বের অহমিকায়
ধর্মীয় আক্রোশে
মানুষকে কীট পতঙ্গের মতো
পায়ের তলায় পিষে মেরেছে।
কর্ণপাতও করেনি কারুর দাবি দাওয়ায়…

ন্যায় আর অন্যায়
শক্তিমানের সশস্ত্র-অধিকারের দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত।
আবেদন নিবেদন-প্রার্থনা অর্থহীন
শক্তির সঙ্গে শক্তির মোকাবিলা ছাড়া
মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই।

ঈশ্বর প্রেরিত

('রাজায় রাজত্ব করে…'/ একটি প্রাচীন লোকসঙ্গীত ।।)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুঠোর মধ্যে ঈশ্বরের বাতাসা ;
তাঁকে ঘিরে
ভক্তেরা দেয় জয়ধ্বনি

ভক্তেরা দেয় জয়ধ্বনি।

থরথরিয়ে কাঁপে বাতাস, কাঁপে আকাশ
হাসেন যাদুকর

ঐ বাতাসা, তাও নকল!
যেমন তিনি নিজেই জানেন না
কোথায় মহান পিতার ঠিকানা
কেমন তাঁর মুখের আলো
সাদা না কালো ?

তিনি নিজেই জানেন না
তাঁর মুঠোর মধ্যে তামাসা
কী করে তাঁকে তিনরাত্তির না পোহাতেই
এনে দিয়েছে লক্ষ মোহর
করেছে তাঁকে রাজার রাজা

তিনি নিজেই জানেন না
কী হবে যখন তাঁর বাতাসা এবং তিনি
মিলিয়ে যাবেন বাতাস হয়ে
বাতাসে ?

তখন তাঁর ম্যাজিক
দোষ কি তাঁকে দেশোত্তমের বাহবা ? তখন
হবেন তিনি পদ্মভূষণ ?

অথবা দেশজুড়ে উঠবে প্রচণ্ড ধিক্কার।
ভক্তেরা তাঁর খড়ের মূর্তি পোড়াবে
তাঁর নামে পুষবে কুকুর ;

তিনি নিজেই জানেন না
কিন্তু তিনি দারুণ খুসি
কেননা তিনি ঈশ্বরের পুত্র,
তাঁর মুঠোর মধ্যে
স্বর্গ মর্ত পাতাল এখন……

[ভাদ্র, ১৩৮৪]

এগিয়ে যাবার সময়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হঠাৎ মনে হ'লো বুকের ওপর থেকে
পাষাণের গুরুভার সরে গেছে ;
হঠাৎ মনে হ'লো চোখের সামনে থেকে
কেউ তুলে নিল এক নিমেষে
কালো পর্দার আবরণ।

জীবনের উৎস মুখ আবার যেন খুলে যায়,
আবার যেন সদ্য ফোটা তাজা গোলাপের মতো
স্বপ্নগুলো চোখের সামনে জাগে ;
আর তখন
ঐ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে
হাওয়ায় মুখ রেখে
সংসারের কাছে ঋণ স্বীকার করতে
ইচ্ছা হয়।

জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বরাবরই চলছিল,
হয়তো আড়ালে আরো কেউ কালো পর্দা হাতে
আত্মগোপন ক'রে আছে ;
ভবিষ্যতে আবার তার মুখোমুখি হবো,
আবার কি পরীক্ষা হবে কার কতো শক্তি !
কিন্তু এখন আমাদের স্বপ্ন দেখার সময়,
এখন ভালোবাসা বুকে নিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ॥

বন্দী জেগে থাকো

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

হো···হেই···হুঁশিয়ার···
এশিয়ার ঘরে দোরে
বেয়নেট উঁচিয়ে কারা···
আফ্রিকার কালো চামড়ায়
কারা আজও কাঁথা বোনার কথা বলে···
হিমালয় থেকে কুমারিকায়
কারা এখনো কেউটের ডিমে তা দেয়
হো···হেই···হুঁশিয়ার···
জেলখানার পাঁচিলের নিচে,
উইপোকারা বাসা বেঁধেছে
জেগে থাকো···যে কোন সময়
ধ্বংসস্তূপের ওপরে তোমার
স্বপ্নের পতাকা ওড়াতে হবে···
পৃথিবী নামে এই বিশাল দ্বীপে

হেইও···হেই···জেগে থাকো···।

ধানফুল

স্মরজিৎ দাশগুপ্ত

হাত বাড়ালেই মাটি ছোঁয়া যায়
মাটির মাটি মাটি গন্ধে ম' ম' করা—
দুর্বার জীবনের রস সিঞ্চন···
আহা মরি মরি, ধানফুল···ঐ তো ধানফুল···।

অনেক অনেক অনশন অর্ধাশন শেষে,
ধান বৌ সাধ খেয়েছে সাধ মিটিয়ে
অনেক অনেক মৃত্যুকে পায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ধানগাছের গোছাগুলো ফুলে ফেঁপে সুডোল।
ধানের শীষে শীষে দুধ ভরে দেবার এখন
চ'লছে আট প্রহর সংকীর্তন···।

আলের ধারের বড় জামগাছটার আগ মাথায়
মৌমাছিদের ব্যস্ততার নেই কোন বিশ্রাম...
ওখানে বন্ধুর জন্যে মধু আর শত্রুর জন্য হুল।
ঢিল মেরে পরের পরিশ্রমের ফল এখন
আত্মসাতের চেষ্টা মিছে···।
বাস্তব কখনো ভুল করে নাহে ভুল করে না।
তবু ঢিল মারার দল ঘামতি ছাড়ে না—
ছাড়তে পারে না·····।

তা' হ'লে···
কল্যাণের হাতে অকল্যাণের বন্যার ক্ষতচিহ্ন
মুছে দিতে দিতে
কাঁধের ভাঁজ করা গামছাখানা আরও কষে
কোমরে বেঁধে নাও না হে কোমরে বেঁধে নাও না।

আহা মরি মরি ধানফুল···
মাটির কত কাছের—
মাটির মাটি মাটি গন্ধে ম' ম' করা—
ঐতো ধান ফুল·····।

দৃশ্যান্তর

মধু গোস্বামী

চারিদিক ঘিরে ঘৃণার পাহাড়,
ক্ষ্যাপা মিছিলের তুষার ঝড়,
চোরা ফাটলের আশ্রয়ে মুখ
লুকোবি কি তুই অতঃপর ?

শান্ত নীরব মৃগয়া ভূমিতে
লোলুপ রক্ত তৃষ্ণা তোর,
ছিল যে মত্ত অবাধ শিকারে
সহসা ভেঙেছে স্বপ্ন ঘোর।

মন্ত্র-র পর

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

যতদিন বেঁচে আছ মৃত্যু নেই···মৃত্যু হবেনাকো
—একথা পূর্বেই আমি জানিয়েছি 'মন্ত্র' নামে অন্য
কবিতায়।
বাঁচা, বা বাঁচার মানে যদি বুঝে থাকো
মৃত্যুর পরেও যুদ্ধ জয় করা যায়।

প্রপাত নির্ঝর ঝর্ণা যতদিন গুঁড়ো করে জল
পাথর ভাসিয়ে খেলে ততদিন স্বচ্ছ কাচ নদীর জীবন।
সকল স্রোতের যাদু উৎসের দখল
যে-মন সমুদ্র হয় উৎস তার—মন।

তোমার মেয়েলি মৃদু হালকা ম্লান নরম নিশ্বাসে
আমার গুমোট ছিঁড়ে নেমে আসে অঘ্রাণের আকাশের
আশা
তোমার স্তনে ও ঠোঁটে শরীরের ঘাসে
মুখ রেখে বেঁচে ওঠে বাঁচার পিপাসা।

এই যে পাখির ওড়া পাতাঝরা ভোরের বাতাসে
এই মন্ত্র সঞ্জীবন দেয় পোড়ামাঠে আমাদের—স্বারা
ভাঙাবাসা,
বালি খুঁড়ি তাঁবু তুলি দেশে পরবাসে
হাতের আঙুলে নাচে নগ্ন ভালবাসা।

আশ্চর্য আঁধার

পলাশ মিত্র

এ এক অদ্ভুত দিন আশ্চর্য আঁধার।
মানুষের চোখগুলি বড়ই করুণ :
কণ্ঠনালী স্ফীত হয় ক্রমে
শীর্ণ হাত প্রসারিত হয়ে
স্থির হয়ে যায়।

প্রান্তরের শ্যামলতা
ধূসর কালিমা মেখে
ভ্রষ্টা নারীর মতো শেষ রাতে
ঘর ছেড়ে গেছে।
পরিত্যক্ত রুগ্ন শিশু
চোখের তারায় তার শীতের
ধোঁয়াটে সন্ধ্যা নামে :
মলিন দু-গাল বেয়ে গড়ানো জলের ধারা
লিখে রাখে ধৈর্য আর প্রতীক্ষার দিন।

এ এক অদ্ভুত দিন আশ্চর্য আঁধার :
আমাদের চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে
দুঃসহ আবর্জনা।

আলোর সিংহাসন

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়

মায়ের হাত ধরে এসে দাঁড়ায় সেই ভাঙা জমিটায়
বসতে ভয় হয়। চাবুকের শব্দ ওঠে কোথায়
সেই সহচরে হাতে হাত ধরে আমরা দশটি ভাই।
এই আকাশে রাত্রি এলেন এলিয়ে খোঁপার চুল
আঁচল জুড়ে গন্ধ দিলেন ভাসিয়ে তাহার কুল,
তারপরেতে লুটে নিল সে আলোর সিংহাসন
যক্ষপুরী। ডাইনীবুড়ী। হেরে গেয়েছি রণ।
যমের দুয়ারে রেখেছি কাঁটা কপালে দিয়েছি ফোটা
আলোর আসন ভাসাবো উঠোন রণপায়েতেই ছোটা—
তারার রথি ছড়ায় গতি দূর যে পথের পাড়ি
ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হলাম পথ নিয়ে যে আড়ি
সামনে চড়াই জোনাক পাড়ায় চার পাহারের সারি
কার সায়রে কোন প্রহরে জোয়ার দিল ছাড়ি
দূর পাল্লায় কোন মাল্লার উজান গেছে বেয়ে,
হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল কোন আকাশের মেয়ে—
একলা চলে যাবো বলে পথ হারালাম শেষে,
ডাইনীবুড়ীর গোলকধাঁধা, হায়। কি ভীষণ সর্বনেশে।
ঠায় আঁধারে ফের চোখে চাই—ডাইকে খুঁজিই ফের
ঐ যে ভাই। দাঁড়িয়ে আছে ; দেরী হলো কি ঢের ?
হয়েছে দেরী, কি আর করা। দুখ দিলাম পুছে
রুক্ষপথের সখ্যে ওরা ঘাম নিয়েছে মুছে।
মায়ের যাদুর মুঠো ভরেছি হারায় যদি পাছে
ভায়ের হাতে হাত রেখেছি দাঁড়িয়ে আছি কাছে।

আমরা একশো জন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক একটা মানুষ হয় না
ঘরে ঢুকলে আলো জ্বলে ওঠে
ঘরে বসলে উৎসবের সানাই···
হয়ত তার মুখে সিগ্রেট, খুচরো হাসি
চোখে বেশ নিপুণ দুষ্টুমি
নেপথ্যে সে নিজেই সিগ্রেট সময়ের হাতে
জ্বলে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে
কপালে বা গালে যার চিহ্ন নেই··· ?
সেরকম একশোজন হলে
কোথায় লোডশেডিং
আলো জ্বলতো সারারাত
উৎসব একদিন থেকে চিরদিন···
এসো আমরা প্রত্যেক মানুষ
সেরকম একশো দুশো হই
যে সময় আমাদের সিগ্রেট বানিয়ে
সুখের মৌতাতে একা অংশভাক্
তার দিকে সিগ্রেট ঘুরিয়ে
লাল আগুন বন্ধুক বাড়াই
শ'য়ে শ'য়ে আমরা যেন নক্ষত্রের মত দীপ্যমান।

অস্ত্রের নিজস্ব খেলা

শ্যামল সেন

দশ হাতে সাজানো সম্পদ,
দেবীগর্জন মূর্তিটিকে ভাসানের পর
পীড়ে এনে দাঁড় করালে
বড় বেশী উলঙ্গ অসহায় লাগে।
একটু আগেই ওর লক্ষ্যভেদী
হাতের ত্রিশূলে
আমূলবিদ্ধ অসুরের বিক্রম ধরা ছিল।

এইভাবে যুদ্ধের সাজসজ্জা
ভাসিয়ে দিয়ে
সজ্জন ধার্মিক যিনি—
শান্ত জলে গা ধুয়ে
পরকালের ধ্যানে বসেন।
ভক্ত শরীরে ছদ্মবেশী যে দানব
মানুষেরই শোণিতে তৃপ্তি খোঁজে,
আর এক গোপন যুদ্ধে মাতে সে
নিরস্ত্র কৌশলে।
সেই নররূপী অসুর নিধনে
মোষলপর্ব জুড়ে পরিপাটি মহলার
আয়োজন,
অথচ অস্ত্রের ভয়ানক আত্মপর ব্যবহার
মাঝে মাঝে ছত্রভঙ্গ করে দেয়
সাজানো শিবির।
ঈর্ষা আর অভিমানে
আস্তনে লুকিয়ে রাখা প্রতিশোধ স্পৃহা
এক লাফে বিদ্ধ করে আত্মজ শরীর।
অস্ত্রের নিজস্ব খেলা
মূর্খ বড়;
দানবেরে স্পর্শ করে না মোটে,
নিজ হাতে নিজেকেই শেষ করে দেয়।

ব্যবহৃত, হৃত

ধূর্জটি চন্দ

নির্ভৃতে সকল রম্য, আত্মসুখে একাকী নির্ভর
র'চি স্মৃতিপুষ্পগুলি, মালা গাঁথি, সহসা যে ছেঁড়ে
ভূমিকম্প হয় বুঝি তখনই ঠিক বুকের ভিতর
কোথাও আঘাত ছিল, কষ্ট ছিলো, তাই প্রাতরোধ।

ছত্রছান করে ফেলি পুষ্পগুলি নখের আঁচড়ে
নিদারুণ মেঘ এসে কথা-বলে ঘন বরষার
ছড়ানো কুসুম হাসে, সেই শব্দে তীব্র হলাহলে
জেগে ওঠে পুনর্বার দিনগুলি, একদা যৌবন।

নিভৃতে সকল রম্য, একা একা তাই লক্ষ্য করি
আমার রচিত দিন পুষ্পহীন ও গন্ধবিহীন
মালা হতে খসে পড়া ফেলে আসা চাতালে শুকায়
যেন ঠিক বেলিফুল, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, হৃত।

কবিদের ভাষা চাই

সুনির্মল কুণ্ডু

কবিদের ভাষা চাই—শব্দভেদী কবিতার ভাষা :
কবিতা লেখে না কেউ সমর্পিত বৃক্ষের ছায়ায় ;
হৃদয়ে হারায় ঘাম, ছন্দে কর্মে শকুনির পাশা :
এ যুদ্ধে যাবেন যদি এতোদিন ছিলেন কোথায় ?

জীবনানন্দের নাম শোনেননি গেঁয়ো সর্দার—
বনের তীব্রতা ছিল বাতাসের রুদ্র পরিহাসে,
পর্ণকুটীরের নীড়ে অকালে মরলো ছেলে কা'র····
কিছুই রাখো না খোঁজ, চৈতন্যে র'য়েছ পরবাসে।

পাঠাগারে স্তব্ধ থাকো, মুদ্রণে বিপুল কাটাকুটি,
প্রকাশে বিকার নেই ; শুদ্ধ প্রেমে ক'লকাতা বাঁচে ?
প্রায়শঃ যক্ষ্মার স্নেহে সময়ের স্বাস্থ্য মোটামুটি···
এহেন ধ্বংসের সুখ বুঝবে না মধ্যবিত্ত আঁচে।

জমেছে শরীরে কিছু মেদ কিংবা আলসেমী বাত,
শ্যামল যৌবন তুমি দেবে কাকে ? রেশনেও টান—
ভাবেই সৈনিক সাজো, বেশ কাটে অমাবস্যা রাত ;
বিলাসী শহরে সদ্য মশকের পরিভাষা কান
নিদ্রার স্থবির-মানে জঞ্জাল এড়াতে পারে কই ?

শহরে হবে না কৃষি : আশ্বিনের জলে চাষা নই।।

ঘুমের ভেতরে আর

জিয়াদ আলি

তাহলে এখানে শেষ—
ভিড় ঠেলে শব্দের প্রপাত
প্রশ্নের মতোন ক্রমে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ভাঙে ;

ইজেলে করুণভাবে পড়ে থাকে দিবা-দ্বিপ্রহর
অবেলার আউটরাম—জল
জলময় একাকারে শোকের লহর।

আকাঙ্ক্ষাবাহিত মায়া ডুবে যায়
ভাটিয়াল গাঙে।

কোথায় ভাসাবো ভেলা চৌদিক জড়ানো অভিমান,
অভিমান ? না কি অন্য
রক্তের আনচান।

তাহলে, এখানে শেষ, এই শেষ
বৃক্ষের সংসার
ঘুমের ভেতরে আর রইলো না কারো অধিকার।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না কেন?

জ্যোতি বসু

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা বা অরুণাচল থেকে পাঞ্জাব যে দিকেই যাত্রা করা যাক, দেখা যাবে, নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে এই ভারতবর্ষে। এই বৈচিত্র্য রয়েছে তার ভাষায়। তার সংস্কৃতিতে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি যার যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমুজ্জ্বল। শুধু ভাষা আর সংস্কৃতি-ই বা বলি কেন, বৈসাদৃশ্য রয়েছে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ভারতীয় জীবন ধারার এই বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়েই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের কথা ভাবতে হবে। এই কারণেই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নটি আজ জটিল হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই সম্পর্ক এখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই এদিক থেকে ইচ্ছা করেও দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব নয়।

জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য যতই থাক এবং এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের ভাষাগত পার্থক্য যতই থাক বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর এই মানুষগুলোর কিন্তু একটা সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। এই সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষাই তাদের বারে বারে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই ঐক্যবোধই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির ওপরেই আমরা একজাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি।

অতীতে আমরা কি দেখেছি। ভাষা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছেন। তাদের এই একতা, তাদের এই সংহতির বন্ধন সূত্রটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আপামর মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহার মধ্যেই। আজকের দিনে তাঁরা কি চান? তাঁরা চান আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে মুক্তি। তাদের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেন? কারণ এখন তাদের সামনে একটাই লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হচ্ছে তাদের যার যার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সুখী সমাজ গড়ে তোলা। তাঁরা চান এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যা যে-কোন রকম সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। এই সাধারণ আশা, এই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা, এই সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করছেন। সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতে মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সবার কাঁধেই এক গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের এই সংগ্রামের আলোকেই কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকেই "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের" প্রয়োজনীয়তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

সংবিধানে রাজ্যগুলির স্বাধিকার বিসর্জিত

স্বাধীনতার পর আমরা একটা সংবিধান পেয়েছে। এটা শুধু নামেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র। এর আসল চেহারাটা একেবারেই এককেন্দ্রিক। এই সংবিধানে রাজ্যগুলির স্বাধিকার বিসর্জিত। রাজ্যগুলির স্বাধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাতেই বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই সংবিধানে। দরকার হলে কেন্দ্রকে যাতে আরও শক্তিশালী করা যায়, তার জন্যই যুক্ত তালিকায় ৪৭টি বিষয় রাখা হয়েছে। সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি রাজ্যগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার প্রবণতা ক্রমেই বেড়েছে। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে (স্বল্প কালের জন্য দু' একটি রাজ্য ছাড়া) দীর্ঘকাল ধরে একটি মাত্র দলের একটানা শাসনের ফলে এই জিনিস করতে সুবিধে হয়েছে। দেশের সংহতি ও ঐক্যের নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার চেষ্টা চলেছে। এ অবস্থার মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যে অকংগ্রেসী দলগুলো ক্ষমতায় এসেছিলো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ চাপে তারা বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। চাপ এসেছে আর্থিক দিক থেকে। চাপ দেওয়া হয়েছে আইন-শৃঙ্খলার ধুয়ো তুলে। এছাড়া আরও কিছু কিছু বিষয়তো রয়েইছে। কোন কোন রাজ্যে, যেমন কেরল ও পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রপতি "চরম স্বৈরাচারীর" মত অকংগ্রেসী সরকারগুলোকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই বাতিল করার জন্য যে ধুয়াই তোলা হোক না কেন, আসলে একটাই উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হচ্ছে সমধর্মীয় নয় এমন রাজ্য সরকার খতম করে দেওয়া।

বেশী ক্ষমতার দাবীতে রাজ্যগুলি সোচ্চার

ভারতীয় রাজনীতিতে আমরা দুটো জিনিস দেখছি। গত বিশ বছর ধরে রাজ্যগুলি আরও বেশি ক্ষমতার দাবিতে ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাদের সীমিত ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়ে রাজ্যগুলিকে দিল্লীর উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা কেন্দ্র ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানের রাজ্য তালিকায় যেটুকু সীমিত ক্ষমতা দেয়া আছে, তাকেই পুঁজি করে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ যে তাদের নিজেদের ব্যাপারগুলো নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করবেন তারও উপায় নেই। এইভাবে কেন্দ্র রাজ্যের স্বাধিকারকে এক প্রহসনে পরিণত করেছেন। এটা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যতভাবে পেরেছেন, রাজ্য সরকারগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করে গেছেন। কখনও তাঁরা আনুষ্ঠানিক ভাবেই তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। কখনওবা বিভিন্ন রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে অর্থ দেন নি। এমনকি কংগ্রেসী মুখ্য মন্ত্রীরাও এই চাপের থেকে রেহাই পান নি। তাদের ওপর এই চাপ এসেছে কংগ্রেসেরই সংগঠন থেকে, এসেছে নেতৃত্ব থেকে।

গেল দশ বছরে কেন্দ্র রাজ্যগুলির আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে নাক গলিয়ে তাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করেছে। অথচ এ ব্যাপারটি পুরোপুরিই রাজ্য তালিকাভুক্ত। আইন-শৃঙ্খলার নাম করে রাজ্যগুলিকে বশীভূত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ পুলিশ (সি.আর.পি) সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী তৈরী করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরতো কথাই নেই। রাজ্যগুলির পায়ে বেড়ী পরাবার কাজ আরও দ্রুত সম্পন্ন হয়। জরুরী অবস্থার শেষের কয়েক মাস সারা দেশে কোন দলের বালাই ছিল না। কি কংগ্রেসী কি অকংগ্রেসী সব মুখ্য মন্ত্রী এবং আইনসভার সদস্যদের হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রের নীতিকে বশংবদের মত মেনে না নেওয়ায়তে অনেককে ক্ষমতাচ্যুতও করা হয়েছে। অথবা ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। রাজ্যের ক্ষমতাকে আরও খর্ব করে এই ব্যবস্থাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে আসে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন। ৪২ তম সংশোধনের ফলে কেন্দ্রের হাতেই এখন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। রাজ্যগুলির স্বাধিকার ওভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলতে যা কিছু ছিল, তা সবই জলাঞ্জলি যায় ঐ সংশোধনের ফলে। এককথায় গোটা দেশেই বলা চলে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। বিশেষ করে বেশী ক্ষমতার দাবিতে যে রাজ্যগুলি সোচ্চার হচ্ছিল, তাদের ক্ষমতা একেবারেই কেড়ে নেওয়া হয়।

ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতা

কংগ্রেসের তিরিশ বছরের বিশেষ করে জরুরী অবস্থার শেষের কুড়ি মাসের শাসনে আমাদের একটা পরিষ্কার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা দেখলাম রাজ্যের স্বাধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে, স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য। শুধু তাই নয় এ অবস্থা রাজ্যে রাজ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এর ফলে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়ে পড়ে তা হল দেশের সংহতি ও ঐক্য।

ত্রিশ বছর একটানা কংগ্রেসী শাসন চলে আসার পর সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচনের পর পরিস্থিতি বদলেছে। এটা আনন্দের কথা রাজনৈতিক শক্তি ও দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন একটা দারুণ ওলট-পালট হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী দলগুলি ক্ষমতায় এসেছে। নতুন এই পরিস্থিতির কথা সঠিকভাবে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। জনতা দল ও কেন্দ্রের নেতারা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া রেখে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাদের এই প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা উভয়েই গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করার কথা দিয়েছি, বলেছি মানুষকে আর্থিক স্বস্তি দেয়ার কথাও। আমাদের আশা, এই সব প্রতিশ্রুতি সম্বল করেই আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বিরোধের বীজ সংবিধানের মধ্যেই নিহিত

দেশের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ সহজেই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব ? কেননা কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের বীজ সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। ৪২তম সংশোধনের পর এতে আরও ঘৃতাহুতি পড়েছে। তাই সংবিধানের ক্ষতিকর ধারাগুলোকে বাতিল অথবা সংশোধন করে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক পড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংবিধানই হবে মস্ত বাধা। কেননা, সুষ্ঠু যুক্তরাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাই একমাত্র রাজ্যগুলির স্বাধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে। সংবিধানে এমন কতকগুলি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ভাল করার ক্ষেত্রেও বিরাট প্রতিবন্ধক। যেমন ৩৫৮ নং অনুচ্ছেদটির কথাই ধরা যাক। এই ধারায় সংবিধান সংশোধন তো বটেই এমন কি এর মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষমতাও সংসদকে দেয়া হয়েছে। এর ওপর ৩৫২ নং থেকে ৩৬০ নং অনুচ্ছেদগুলিতে এমন সব ধারা রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্রপতিকে স্বৈরাচারী করে তুলতে যথেষ্ট। এছাড়া, রাজ্য পালদেরও বিধানসভায় গৃহীত বিল নাকচ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতিও ইচ্ছে করলে এই সব বিলে সম্মতি নাও দিতে পারেন অথবা

আটকে দিতে পারেন। এছাড়া, কেন্দ্র, রাজ্য ও যুক্ত তালিকায় বিভিন্ন বিষয়-গুলি এমন ভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে যে, তাতে রাজ্যগুলির বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। বরং তা রাজ্যের স্বার্থেরই পরিপন্থী। এখানেই শেষ নয়। এগুলি ছাড়াও, অর্থ কমিশন ও রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলি, সর্বভারতীয় সার্ভিস ক্যাডারদের দিয়ে রাজ্যের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ধুয়ো তুলে রাজ্যে পুলিশ পাঠানোর ব্যাপারগুলো তো রয়েছেই।

সংবিধান সংশোধনের দাবি

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দল তো বটেই অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো সংবিধানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন দাবি করে আসছেন। আমরা বলেছি সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করা হোক যাতে করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো সম্প্রসারিত হতে পারে, রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা আসে। দেশের সংহতি ও ঐক্যকে জোরদার করতেই আমরা এ দাবি করে আসছি। আমাদের দল স্বরণ সিং কমিটির প্রস্তাবের যেমন বিরোধিতা করেছে, তেমনি তার পাশাপাশি কতকগুলো পাল্টা প্রস্তাবও রেখেছে। স্বরণ সিং কমিটির প্রস্তাবগুলো পরবর্তীকালে ৪২তম সংশোধনে সংযোজিত হয়েছিল। আমরা যেসব প্রস্তাব রেখেছিলাম তাতে আমরা এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম ঠিক কিভাবে সংবিধান সংশোধন করলে যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে ব্যাপক করে তোলা যায়, রাজ্যের স্বাধিকারকে সম্প্রসারিত করা যায়। কেননা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার একটা পাকা ভিত তৈরি করতে এ দু'টো জিনিস একান্ত দরকার।

জাতীয় সংহতির শর্ত

সব থেকে বড় কথা, ভারতের মত একটা বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয় সংহতি আনতে হলে চাই স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস। এ জন্য ক্ষমতার সুষ্ঠু বণ্টন অপরিহার্য। কারণ, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাজ হবে শুধু সমন্বয় রক্ষা করা। তবে, পরিকল্পনা তৈরি এবং দাম ও মজুরী নির্ধারণ করার ব্যাপারে কেন্দ্র শুধু সমন্বয়ের কাজই করবে—তাই নয়। এর সাথে সাথে একটা সাধারণ নির্দেশও তাকে দিতে হবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, মুদ্রা ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরগুলি। রাজ্যগুলি যাতে তাদের অধিকতর ক্ষমতা ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রকে অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে। কেননা বেশ কতকগুলি রাজ্য আর্থিক ও অন্যান্য নানা দিক থেকে অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এদের ব্যাপারগুলো অবশ্যই যত্ন নিয়ে দেখা-শোনা করা উচিত। নতুবা তাদের অগ্রগতি সম্ভব হবে না। দেশের উন্নতির অর্থই তো সামগ্রিক উন্নতি।

সব শেষে বলি, সেই ভারতই হবে একমাত্র শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত, যেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণ মর্যাদা পাবে—অবহেলিত হবে না। অন্যদিক থেকে যদি এই বৃহৎ দেশে একে অপরকে চেপে রেখে এগিয়ে যেতে চায় বা কেন্দ্র সর্বময় ক্ষমতা আহরণ করে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, তা হলে জাতীয় সংহতি পদে পদে বাধা পাবে—বিভিন্ন জাতির সুষ্ঠু আত্মবিকাশ সম্ভব হবে না।

স্কেচ : ল্যাণ্ডস্কেপ

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

সকাল হতে না হতেই লাঠি ঠুক ঠুক করে নরহরি বার হয়ে পড়ে। খুব সাবধানে বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতেও ভোলে না। তা না হলে মেয়ে একটু জানতে পারলে আর রক্ষে নেই।

মেয়ে যে জানতে পারে না তাও নয়। অনেক রাতে ঘরে ত একবার ফিরতেই হয়। তখন দরজা খুলে দিয়ে সরলা যে কথাগুলো শোনায় অন্যায় না হলেও সেগুলো বড় কটু।

কিন্তু রাত সে ত অনেক দূরের কথা। জীবনের রাতই যার ঘনিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে তার কাছে সকাল থেকে সেই রাত অনেক দূর মনে হয়। অত দূরের ভাবনা এখন ভাববার দরকারকি।

রোজ এমন হয়। রাত্রে দরজা খুলে দিয়ে সরলা বলে—বুড়ো বয়সে তোমার লজ্জাও করে না বাবা! দুটো বাচ্চা নিয়ে একলা মেয়েছেলে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যে এই বাড়িতে একলা পড়ে থাকি সেজন্যে একটু ভাবনাও তোমার হয় না? আমরা মরলাম কি বাঁচলাম বাপ হয়ে সেটা দেখবারও দরকার নেই।

নরহরি বিজ বিজ করে কি যে বলে বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে কলকেটা হুঁকো থেকে তুলে নিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অপরাধীর মত বলে—দ্যাখ আজ আর কিছু খাব না। পেটটা কেমন যেন ফেঁপেছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, পেট কি ফেঁপেছে তা জানি। নাজির জ্যেঠার ওখানে পেট পুরে খেয়ে এসেছ ত'—ক্লান্ত পায়ে নিজের ছোট কুঠরিটায় গিয়ে ঢুকে খোঁড়া রুগ্ন ছেলেটাকে কোলে নিয়ে তিক্ত কাতর গলায় সরলা বলে—আমরা খাই না খাই তাতেও তোমার কিছু আসে যায় না।

কোনদিন সরলা আরো জ্বালার সঙ্গে বলে—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছ, তোমার একটু মরণের ভয়ও হয় না বাবা! বুড়ো বয়সে লোকের ত একটু ধর্মে কর্মে মতি হয়।

মেয়ের এসব কথা নরহরির সহ্য হয় না। রীতিমত রেগে উঠেই বলে—ধর্ম কর্ম করি না করি তোর তাতে কি! খালি বুড়ো হয়েছ, বুড়ো হয়েছ! বুড়ো হয়েছি ত আমার পরকালের কথা আমি ভাবব। আর কাউকে তা ভাবতে হবে না।

আমার তা নিয়ে ভাবনা নেই বাবা—সরলা তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দেয়—তবে তোমার আর নাজির জ্যেঠার কথা নিয়ে লোকে যে ছি ছি করে সেই লজ্জায় মরে যাই।

লজ্জায় মরতে তো তোকে কেউ বলে নি। যার যত খুশি ছি ছি করুক না। আমি পরোয়া করি নাকি?—রাগের জ্বালায় লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে দুর্বল বেঁকে আসা শিরদাঁড়াটাকে কোনরকমে সোজা রাখবার চেষ্টা করে নরহরি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বয়স তিন জনেরই ষাটের কোটা পার হয়েছে। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার তিন সাথী। এ বন্ধুত্ব কেমন করে যে ত্রিশ বছর টিকে আছে ভাবলে অবাক লাগে।

রাধিকানাথ নাজিরগিরি করত। পয়সা কামিয়েছিল নাকি অনেক আর উড়িয়েছেও তেমনি বিস্তর। সুতরাং রাখতে কিছু পারে নি। সামান্য যা

কিছু আছে তাতে একটা ছোট বাসা ভাড়া করে কোনরকমে কায়ক্লেশে চলে। কিন্তু বৈঠকখানা তার সারাক্ষণ খোলাই থাকে তবু।

সকাল বেলা গড়গড়াটি হাতে নিয়ে সে সেখানে এসে বসে। দেখলে তাকে মনে হয় না যে একদিন যৌবনের কোন উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যাচার সে বাদ দেয় নি। প্রশান্ত ভারিক্কি চেহারা। মাথায় চুলে পাক ধরেছে বটে কিন্তু দেহ তার এখনও বেশ মজবুত বলে মনে হয়। সে দেহের তোয়াজই করে রাত দিন।

রাধিকানাথ এসে বসবার খানিক বাদেই সদাশিব এসে হাজির হয়। বয়সে তিন জনের মধ্যে সকলের ছোটই হবে, কিন্তু বার্ধক্যের ভারে সেই সব চেয়ে কাবু হয়ে পড়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে নাজিরের বৈঠকখানায় ওঠবার কটা সিঁড়ি ভাঙতেই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে—হাঁপানিটা বড় বেড়েছে ভাই কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

কে ঘুমোতে দেয়নি, হাঁপানি না গিন্নি ?বলে নাজির হো হো করে হাসে।

সদাশিব মুখটা একটু বেঁকিয়ে বলে —না ভাই, তার কি আর নাগাল পাবার যো আছে ! এরপর হাত দিয়ে স্ত্রীর বিপুল পরিধি বোঝাবার চেষ্টা করে হাসতে গিয়ে কেসে টেসে সে একাকার করে।

সদাশিবের পর আসে নরহরি। সমস্ত রাস্তা লাঠিতে ভর দিয়ে এসে রাধিকানাথের দরজার কাছে লাঠিটা বগলে করে নিয়ে সোজা হয়ে যে সিঁড়ি কটা ভেঙে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করে।

ঘরে আসতে আসতে সদাশিবের কথাগুলো সে শুনেছে। বৈঠকখানায় ফরাস ঢাকা তক্তপোষের ওপর বসে পড়ে বলে,—আরেকটা বিয়ে করো সদাশিব। বুকের ও হাঁপানি টাপানি সব সেরে যাবে।

সদাশিব বলি-চিহ্নে ভরা লোল-চর্ম মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করে বলে,—তাতে কি আর অসাধ দাদা। একটা কেন পাঁচটা দাও না।

এ কথায় অত্যন্ত নোংরা কুৎসিত একটা রসিকতা করে রাধিকানাথ হাসতে থাকে।

নরহরি বলে,—কিছু থাকে'ত বার কর না ভাই, কালকের খোঁয়াড়িটা ভাঙা যাক।

সদাশিব তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে ওঠে,—না, না থাক ভাই। সকাল বেলা আবার কেন ? এ বয়সে অত সহ্য হবেনা।

সহ্য নরহরিরও হয়না। কিন্তু সে কথা স্বীকারের লজ্জা বড় বেশী। সে তাই জোর করে প্রতিবাদ জানায়,—বয়স, আর বয়স। তুমি এবার মরবে সদাশিব। বয়স বয়স করে যমকে যেরকম তলব দিচ্ছ।

সদাশিব লজ্জা পেয়ে নিজের কথা একটু ঘোরাবার চেষ্টা করে,—না, না তা বলিনি। তবে এই সকাল বেলাটায়—

রাধিকানাথ ইতিমধ্যে যা তার করবার করে ফেলেছে। ভেতরে যাবার দরজটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে বলে—বড়বৌ দেখতে পেলে আবার গোল বাধাবে।

দু এক পাত্র চলবার পর মুখ সকলের খুলে যায়। সদাশিব হাঁপানির ভয় ভুলে যৌবনের কাহিনী সদর্পে বলতে শুরু করে।

বড় বৌ এর কথা ভুলে রাধিকানাথ গলা ছেড়ে যে সব কথা বলতে সুরু করে সেগুলো প্রিয়তমা পত্নীর ঠিক কানে যাবার উপযুক্ত বোধহয় নয়।

বেলা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ভেতর থেকে দরজায় একটু ঠেলা দিয়ে বড় বৌ ওদিক থেকে ঝঙ্কার দিয়ে বলে,—দেব সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে। মুখ পোড়াদের মরণও হয়না। ওরা আবার বন্ধু।

রাধিকানাথ তখন বেপরোয়া হাঁক দিয়ে বলে, নরহরি সদাশিব আজ এখানে খাবে, বুঝেছ বড়বৌ।

হ্যাঁ, খুব বুঝেছি. বুঝব না কেন। চুলোর পাঁশ আজ ত ফেলি নি তাই। বলে রাগে গর গর করতে করতে বড়বৌ চলে যায়।

তারা তিনজনে হাসতে থাকে। এ তাদের নিত্যকার ঘটনা রাধিকানাথ হাসতে হাসতে বলে, —মেয়ে মানুষ জাতটাই অমনি। ফাঁকা আওয়াজ শুধু।

যৌবন যাদের অনেকদিন বিদায় নিয়েছে, তাদের যৌবনের বাহাদুরীর সব গল্প তারপর আর থামতে চায়না। স্মৃতির ছেঁড়া পাতাগুলো উল্টে পাল্টে হাঁটকেই তারা যৌবনকে ধরে রাখে।

সদাশিব ই মাঝে মাঝে একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।বলে,—যাই ভাই। ছেলেটা আজকাল আবার বড় রাগারাগি করে।

কিন্তু যাওয়া তার আর হয়ে ওঠেনা।

অনেক রাত্রে নরহরি যখন বাড়ি ফেরে তখন পথ নির্জন হয়ে গিয়েছে। নির্জন রাস্তায় যেতে যেতে কোমরের ব্যথাটা তার অসহ্য মনে হয়। পিঠটা নুইয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটলে মনে হয় অনেকটা আরাম পাওয়া যাবে। কিন্তু একবার নোয়ালে সে পিঠ আর যে সোজা হবার আশা থাকবে না সে কথা জেনে বার্ধক্যকে অস্বীকার করবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে খাড়া হয়েই হাঁটে। মনে মনে রাধিকানাথকে তার হিংসে হয় তাই। অত্যাচার রাধিকানাথ ত' কারুর চেয়ে কম করে নি। কিন্তু তার দেহই বা অমন অটুট আছে কি করে ?

সরলা কিন্তু এক একদিন অসহ্য হয়ে ওঠে। শুধু তার বাবার ওপর নয়, সমস্ত পৃথিবী ওপর তার রাগ হয়। খোঁড়া রুগ্ন ছেলেটার দিকে চেয়ে বিধাতাকে পর্যন্ত তার অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে।

রূপসী সে কম ছিল না কিন্তু কবে যে রূপ তার দেহ থেকে শুকিয়ে ঝরে গেছে আজ তার হদিসও মেলবার নয়।

রূপের জন্যেই মস্ত বড় লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামী জীবনে তাকে অবহেলা, লাঞ্ছনা আর মৃত্যুর পর বৈধব্য ও নিজের দূষিত রক্তের বিকলাঙ্গ একটি পুত্র সন্তান ছাড়া আর কিছু দিয়ে যান নি।

ছেলেটা ভালো করে হাঁটতে পারে না। দুটি পায়ের হাড়ই তার বাঁকা। আর নিত্য তিরিশ দিন রোগগত তার লেগেই আছে। পাড়া পড়শীদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে যখন বাঁকা পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খেলতে গিয়ে হাসির পাত্র হয় তখন নিদারুণ দুঃখে সরলার চোখে জল আসেনা। আগুন বার হয়। ছেলেটির দেহের আর কোনো বিকৃতি নেই বটে। কিন্তু সে

একেবারে নির্বোধ জড়বুদ্ধি বললেই হয়।

কয়েকদিন ধরে তার জ্বর আবার ছাড়ছে না। সর্বাঙ্গে ঘা নিয়ে সারাদিন সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে। অসহ্য হলে জ্বরের ওপরেই তাকে কয়েক ঘা চড় চাপড় দিয়ে পরম হতাশায় সরলা বলে, মর না। মরলে ত হাড় জুড়োয় আমার।

কিন্তু রাগ অভিমান করবারও তার উপায় নেই। কার ওপর রাগ করবে? তাই নিজেই আবার রুগ্ন ছেলেকে ভোলাতে বসে।

সেদিন সকালে নরহরি বার হবার উপক্রম করবার আগেই সরলা বাধা দিয়ে বললে,—আজ কোথাও যেতে পাবে না বাবা। খোকার জন্যে আজ একজন ডাক্তার ডেকে আনতেই হবে।

ডাক্তার ডাকতে হবে ওই জ্বরের জন্যে? আরে ও জ্বর আপনি সেরে যাবে!—তাচ্ছিল্য আর সান্ত্বনা দুই মিশিয়ে বলে নরহরি বার হবার চেষ্টা করতেই সরলা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

আজ সে যেন প্রকৃতিস্থ নেই।

দু হাত দিয়ে দরজাটা আগলে সে তীব্র কণ্ঠে বললে—আজ তুমি কিছুতেই বেরুতে পারবে না বাবা। খোকা মরতে বসেছে আজ একজন ডাক্তার যেমন করে হোক তোমায় ডেকে আনতেই হবে।

এরপর নিজের শেষ সম্বল গলার সরু হারটা একটানে খুলে নরহরির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—নিজের টাকা তুমি খরচ করবে না জানি। এই হারছড়াটা বাঁধা দিয়ে বিক্রি করে যেমন করে হোক একজন ডাক্তার তুমি ডেকে নিয়ে এস। নইলে এইখানেই আজ আমি আত্মঘাতী হব।

সরলার এ রকম মূর্তি দেখে নরহরি সত্যিই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে তাই বললে,—তা অমন পাগলামি করছিস কেন? আমি কি ডাক্তার আনবনা বলেছি। তবে এখনই মিছিমিছি—

না মিছিমিছি নয়—সরলা চিৎকার করে উঠল,—আমার জীবনটাই তোমরা এমনি করে মিছিমিছি করে দিয়েছ। আজ আর কোন কথা শুনব না। তুমি যাবে কি না বল ডাক্তার ডাকতে।

আহা। অত চেঁচাচ্ছিস কেন? যাচ্ছি বলে নরহরি এবার গয়নাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সরলা অনেকবার এমন রাগ করেছে। কিন্তু এবার তার উন্মাদের মত ধরণ ধারণটা সত্যিই নরহরিকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। স্যাকরার দোকানে হার ছড়াটা বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে সত্যিই সে ডাক্তারের জন্যে যাচ্ছিল।

পাড়ার ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে হলে নাজির বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। রাধিকানাথের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে নরহরি একটু পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু রাধিকা নাথের চোখ এড়ানো গেল না। বৈঠক খানা থেকেই সে ডেকে বললে,—কি হে ওদিকে আবার চলেছ কোথায়?

নরহরিকে থামতেই হল। থেমে একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললে,—যাচ্ছি ডাক্তারেরবা ড়ি। নাতিটার বড় অসুখ।

তাই নাকি?—রাধিকানাথ সহানুভূতির স্বরেই বললে—তা যাবে'খন একটু বাদে। একটু বসে যাও না।

নরহরি গিয়ে বসল আর খানিকক্ষণ বসার পর তার মনে হল মেয়েদের কথায় ভয় পেয়ে অত অস্থির হবার কোনো দরকার বোধহয় নেই।

আরও কিছুক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গ পাবার পর নরহরির মনে হ'ল গয়নাটা যখন বাঁধাই দেওয়া হয়েছে তখন অতগুলো টাকা সরলার হাতে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। সে বাজে খরচ করবে।

এতগুলো টাকা! শুধু একটা রুগ্ন বিকলাঙ্গ ছেলেকে অত্যন্ত দু কৌটা ওষুধ খাইয়ে একটা ডাক্তার লুটে নিয়ে যাবে এ যেন অন্যায় মনে হল নরহরির।

সদাশিব কি একটা পুরোন গল্প সবিস্তারে বলবার চেষ্টা করছিল। সে দিকে নরহরির মন ছিল না। ফিরে ফিরে তার মন তখন যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলোর আবছা হয়ে আসা স্মৃতি-গুলোই নাড়াচাড়া করছে।

হঠাৎ তার মাথায় একটা খেয়াল খেলে গেল। রাধিকানাথের হাত ধরে টেনে সে বললে,—আমাদের সেই নৌকো করে নবদ্বীপ যাবার কথা মনে আছে নাজির ভাই? কি মজাই হয়েছিল ক'দিন।

মনে আবার নেই!—রাধিকানাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে,—সেই বারেইত ফিরে এসে দেখি গিন্নী হাতের নোয়া খোলার যোগাড় করছেন।

সদাশিব বললে,—প্রায় কুড়ি বছর হ'ল না?

দূর! তারও বেশী। নরহরি হঠাৎ বলে বসল, —আর একবার সেরকম গেলে হয় না?

গেলেই হয়। —বলেই অত্যন্ত হতাশ ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাধিকানাথ তার দুঃখটা জানালে; —কিন্তু তেমন কাঁচা পয়সা কি আর হাতে আছে ভাই!

নরহরির তখন জেদ চেপে গিয়েছে। পকেট থেকে সমস্ত টাকাগুলো বার করে ফরাসের ওপর রেখে বললে,—টাকার জন্যে পরোয়া নেই। মরি ত ফুর্তি করেই মরব।

রাধিকানাথ কিংবা সদাশিব এতটা আশা করতেও পারেনি। অবাক হয়ে নরহরির দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের সুরে বললে,—সত্যি যাবে নাকি!!

তক্তপোষের ওপর একটা চাপড় মেরে নরহরি বললে,—তবে কি মিথ্যে বলছি! তারপর হঠাৎ এতদিন বাদে অকপটেই স্বীকার করে ফেলল,—দিনত ফুরিয়ে এসেছে ভাই। এমন সুবিধে আর হবে?

তিন বুড়ো যৌবনের কথা স্মরণ করে মেতে উঠল।

নৌকো জোগাড় হল। সাজ সরঞ্জাম কিছুই নিতে ভুল হল না।

নৌকোয় উঠে বসবার পর সদাশিব শুধু যেন নিজেদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে,—তোমার নীতির অসুখটা এমন কিছুই নয়, কি বল নরহরি?

নরহরি হাত নেড়ে সে কথাটাকে যেন ঠেলে দিয়ে বললে,—তাহলে বলি শোনো ভাই, ও খোঁড়া নিতিরুগী ছেলে বেঁচে থাকলে ওর অশেষ ভোগান্তি। আমি ত বলি এই বয়সে মরে যায়'ত সে অনেক ভালো।

সদাশিব কিছু বলতে পারল না। দু'হাতে বুক চেপে ধরে সে তখন হাঁপানি কাশির বেগ সামলাচ্ছে।

কোমরটা বড় কন কন করছিল বলে নরহরি একটু সরে গিয়ে ছইটায় ভালো করে ঠেস দিয়ে বসল।

বাঁকিয়া চোখে মা-দুর্গা

শ্রী সনৎ কুমার মিত্র

দুর্গাপূজা মনে করতে মনের যে ব্যথাটা বারে বারেই টনটনিয়ে উঠছে—তা হচ্ছে, এই যে 'দুগ্‌গা পূজা' এতে আমরা কোথায়? আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে, বাপ দাদা-নানা-চাচার আমল থেকে দেখে আসছি যে গাঁয়ের জমিদারবাবুরা, শহরের রাজা-রাজড়া সামন্ত প্রভুরা মা-দুগ্‌গাকে যে ভাবে দখল করে রেখেছেন—যে ভাবে সাজান গোছান, যেমন চীৎকার করে 'মা' 'মা' ডাক ছেড়ে ভক্তির ঢেকুর তোলেন আর বলির পাঁঠার নধরত্ব বিচার করেন, তাতে করে আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে ইনি আর যাদের মা হোন না কেন, আমাদের কেউ নন।

এই দেখুন না সেদিন বড় মুখ করে বাউরি পাড়ার খ্যান্ত মাসীকে দুগ্‌গা পূজার কথা বলতে গেলাম। তা মাসী আমাকে ছড়া কেটে ছ্যার ছ্যারিয়ে শুনিয়ে দিলে: রেখে দে তোদের বড়-লোকেদের দুগ্‌গো পুজো। ওতে আমাদের কি? ঐ পুজো শুধু শুনতেই; আর হাঁকুর-হুকুর ডাক ছাড়তেই। এই তো—

'পুজো পুজো শুন্‌লাম কানে
পুজো গেলো মোর একপালি ধানে।'

মাসী আরও একটু টিপ্‌পনি কেটে বললেন যে আরে এ কি আর চড়ক-গাজন, না নবান্ন। সেই সময় দেখবি সারা গাঁয়ের চটক-মানুষগুলোর পরাণের স্ফূর্তি।

সত্যি চড়কে গাজনে বোলানে গম্ভীরায় ঢাকের কাঠির চ্যাড়চ্যাড়ে আওয়াজ, কাঁসির কাঁইনানায় যেমন পায়ের চলায় নাচ আনে, রক্তে দোলা জাগায় তেমনটি আর কখন হয়? পোষ-পাবণের পিঠে-পুলির গন্ধ গ্রামে-গঞ্জের আকাশে বাতাসে পাকা ধানের সুবাস যেমন সমস্ত মনটাকে চনমন করে তোলে, এমনটা আর কখন বুঝি? আর সবচেয়ে মজার-আনন্দের-মিলনের দিক এই যে, এ সময় আমরা সারা গাঁ—বাবা দাদা, বাপ-নানা সবাই মিলে এই আনন্দস্রোতে উদ্বেল হয়ে উঠি। এইতো সেদিন টুসুর চৌদোল কাঁধে নিয়ে ঘাটবেড়ার জঙ্গল বাঁয়ে রেখে; ধুতুড়ির মাঠটা উজিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে কুমারী নদীর দিকে ঢোল বাঁশির তালে তালে নাচতে নাচতে সবাই দল বেঁধে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি রসুল-পুরের আবুল মিঞা আমার পাশে পাশে নাচছে, আর ছড়া কাটছে।

অথচ এই আবুল ভাইকেই কিছু দিন আগে দুগ্‌গা পুজো, তার আয়োজন, তার জাঁকজমক সম্বন্ধে কিছু বলতেই তিনি একগাল হেসে আমাকে বললেন: আরে ভাই তোমাদের দুগ্‌গা পুজো সম্বন্ধে যখন এত কথা বললেই তখন তোমাকে ঐ বিষয়ে একটা জারি গান শোনাই, শোনো। এটি আমার বড়ো নানার কাছ থেকে শেখা। তিনি জারির দলের মেনেজার ছিলেন কি না? কাজ করতেন মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে। এই বলেই তিনি ঘরের বাতা থেকে ঢোলোকটা পেড়ে নিলেন, পাশের বাড়ীর ছোক্‌রাটার হাতে কাঁসিটা ধরিয়ে দিয়ে লুঙ্গিটা যুত করে পরে নিয়ে আর মাথায় একটা ফেট্টি মতো বেঁধে সুর করে ধরলেন:

'হিন্দুগো দুগ্‌গি পূজা
ব্যালপাতা তায় বোঝা বোঝা,
(ঐ) এক মাগী হিজের১ পরে
অসুরেরই টিক্কি ধইরে
গলায় দিছে হাপ২ জড়াইয়া
বুকে মারছে খোঁচা।
(আর) দুগ্‌গি দ্যাখলাম চাচা॥
এক ব্যাটা তুম্বা বদন
দাঁত দুইডা তার মুলার মতন
কান দুইডা তার কুলার মতন
মাথাডা ন্যাপা পোঁছা॥
আছে ডাইনে বায়ে দুইডা ছেমরি
পইর‍্যা আছে চাহাই শাড়ী
ঘোরতে দেখছি বাড়ি বাড়ি
ঠসক্ দেহায় ভারী।
(আবার) আল্লায় যদি হরত৩ দয়া
হরতাম নিহা৪ তারে॥
আবার ময়ূরের পরে রইছেন যিনি
হেনার বড় চিক্‌চিহানী
(আবার) গুটি কচ্চেন কোচা॥
তায় হিন্দুগো দুগ্‌গি পূজা
ব্যালপাতায় তার বোঝা বোঝা
আবার চন্নমেত্ত খ্যাইয়া দ্যাখলাম
হুদা৫ গাঙের পানী।
(আহা) দুগ্‌গি দ্যাখলাম নানী'৬॥

ঢোলে শেষ চাঁটি মেরে আবুল ভাই গান শেষ করতেই আমরা হেসে লুটো-পুটি খেতে লাগলাম।

আসলে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা ইংরেজ পূর্বকালে সামন্ত ভূস্বামী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই আপন সামাজিক

প্রতিপত্তি ও শক্তি মদমত্ততা দেখানোর জন্যই করে থাকতেন। আর আপামর প্রজাকুল কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট পেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে সেই - আড়ম্বর ও উচ্ছ্বসির দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

এরপর ইংরেজের কোলকাতার হঠাৎ বাবুরা তাঁদের বাবুয়ানী দেখাবার জন্যে দুর্গা পূজায় বড় জাঁক করতেন। এই সম্পর্কে একশ বছরেরও বেশী আগের রিপোর্ট পাচ্ছি : 'পূর্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হত, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়, পূর্বেকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।'

শ'দেড়েক বছর পরে স্বাধীন ও কাটা ছেঁড়া বাংলায় এই পুজো আরও অনেক—অ-নে-ক খানি ভিন্ন হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের সর্বব্যাপক মহিমায় মা দুর্গোও একেবারে পাঁচ পাঁচির আনাচে কানাচে ঠাঁই নিয়েছেন। তা-তে ফল ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তার বিচারের অধিকার আমার নেই। ভক্তি বেড়েছে, না উপে গেছে কর্পূরের মতো সেটা যে কোনো বারোয়ারী তলায় গেলেই বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, বারোয়ারীর বয়েস প্রায় শ-দুয়েক বছর হলেও তাদের চরিত্রের হেরফের তেমন হয়নি। যেমন ; সেদিনের বারোইয়ারি ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে : "বারোজনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য কোন দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি 'মা' ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহারাজ, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যাঁর যত মাল বিক্রি ও চালান হয়, মন পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসেবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখিন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্যে ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।"

দিন পাল্টেছে। সবদিক থেকেই পৃথিবীটা অনেক এ্যাডভান্স হয়েছে। তাই বাঙালীর বারোইয়ারির ঐ মূল ঐতিহ্যের ওপর অধ্যক্ষেরা নিজেদের সম্বৎসরের আখের গুছিয়ে নিয়ে থাকে। চাই কি আরও একটু বুদ্ধিমান ও বড় বারোয়ারির অধ্যক্ষ—'মা'র ওপর ভক্তিকে ক্যাপিটাল করে বাড়ী টাক্সী মিনিবাসও করে নেন। সেইসঙ্গে একালের বারোয়ারীর মূল লক্ষ্যটাও 'সং ও রং তামাসার' ভালো বন্দোবস্তেই নিবদ্ধ থাকে।

গণতন্ত্রে মাথা গুনতিই বড়ো কথা। সেই মাথার খুলির নিচে ঘি আছে না গোবর আছে তার খোঁজের দরকার কি? কেবল মাথা হলেই হলো। তাই আজকের মা-দুর্গার বারোইয়ারিতে আমরা সাধারণেরা সবদিক থেকেই অপাংক্তেয় রয়ে গেছি। সেইদিনের রাজারাজড়া, বনেদী বড়ো মানুষ বা হঠাৎ বাবুদের বিদায় প্রায় সর্বত্র ঘটলেও এখন যে বাবুরা মায়ের আগমনীর কনট্রাক্ট পেয়েছেন তাঁরা আর জন্মে শম্ভু নিশুম্ভ ছিলেন। এবারে তাঁরা দেশের চৌদিকের অবস্থায় পলিটিক্যাল দাদাদের হাতে মৌতাত খেয়ে একেবারে জনগণের বুকে চেপে বসেছেন।

সেদিন যেমন : কোনোখানে পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিস্ রেখেছেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাঙ নাচানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেছেন ; এক এক বারের হাসির গর্‌রায়, শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ানো পারতাগ করে ত্রাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখচে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত। এদিকে শহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।'

আজকেও বারোয়ারীর প্যাণ্ডেলে হিন্দী গানের অ্যামাইক আপ্যায়নে মা দুর্গা সপরিবারে বহু দিন আগেই প্রতিমে ছাড়া হয়ে গিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন তা বলা শক্ত। অধিকন্তু বারোইয়ার মিলে 'মা'র যে আর্টের চেহারা বানিয়ে ফেলেছেন তাতে করে তিনি তাঁর প্রিয় বঙ্গ সন্তানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে : বাবাগণ তোরা আর আমাকে ডাকিস নি। আমার নাম করে আশ্বিনের ঐ তিন দিন তোদের যা খুশি তাই কর,—আমি স্বশরীরে আর ওর মধ্যে নেই।

সত্যি আমরাও কেউ আর ওর মধ্যে থাকতে চাই না। সেই যে কবে ছেলেরা 'ব্যোমকালী কোল্‌কেত্তা-ওয়ালী' মেরে চেঁচিয়ে ওঠে দম দিয়ে ব্যোম মেরে গিয়েছিলো—সেই থেকে আমরাও ঘর দেখে দেখে দেখে কেমন যেমন ভোম্বা মেরে গেছি। আর মাঝে মাঝে মেহের আলির কণ্ঠস্বরে দূর থেকে ছড়ার শব্দ ভেসে আসে :

'হিঁদুদের দুর্গা পুজো।
উপরে চিকন চাকন ভিতরে
খড়ের বুজো॥'

১। সিংহের ২। সাপ ৩। করতো ৪। নিকা=বিবাহ। ৫। শুধুই=কেবলমাত্র। ৬। এই গানটি চিত্তরঞ্জন দেবের 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

শতবর্ষের কবি করুণানিধান

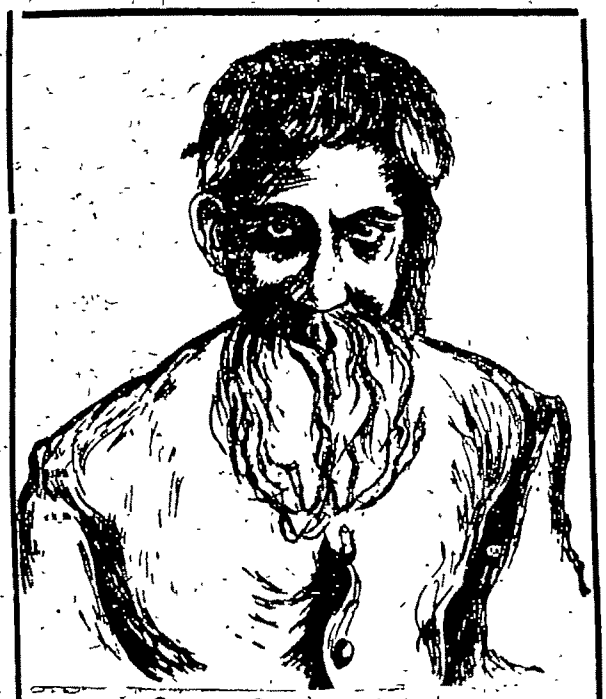

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৯৭-১৯৫৫)

নগ্ন প্রকাশ

জন্ম, মৃত্যু—নগ্ন দুই ; সূতিকা শ্মশান ভুঁই,
লজ্জা লেশ নাই।
নরনারী আবরণে কলঙ্কিছে দেহ মনে
বিষম বালাই।
যেদিন 'ইডেন' হতে প্রথম দম্পতি পথে
হ'ল নির্বাসিত।
কুম্বরে ভরিল লগ্ন, সুধা ভাণ্ড হ'ল ভগ্ন
কাম শৃঙ্খলিত।
মধু মক্ষী বিষজ্বালা, জুড়ায় না, কণ্ঠমালা
পড়ে না খসিয়া ;—
মাপা হাসি, চাপা কথা, ঈর্ষায় রক্তিম ব্যথা
ওঠে নিঃশ্বসিয়া।
সোনার খেলনা আর সোনার গোলাপ হার
ভোলায় কেবল
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানহারা ছোটেমন মাতোয়ারা
অতৃপ্ত চঞ্চল
আদি রূপ। আদি পাপ। একি ঘোর অভিশাপ
সহে লোভাতুর!
শুনি অনন্তের মাঝে মৃত্যুর সান্ত্বনা বাজে
নিস্তব্ধের সুর।

শেষ লেখা

ছোট্ট লেখা
চেয়েছ আমার কাছে—
লেখার পর্ব
শেষ করে আজ
ছুটছি খেয়ার পাছে।
ভয়বাসি ভাই মনে,—
আমার লিপি
ধূলায় পড়ে
থাকবে অযতনে।
কাল তো আমার হল গত—
দিন শেষের আলোর মত,
(এখন) অন্ধকারে ফুটবে তারা
স্মৃতির আকাশেতে,—
শিউলী ঝরা অনাগতের
রাখছি আসন পেতে।

অপ্রকাশিত দুটি কবিতা

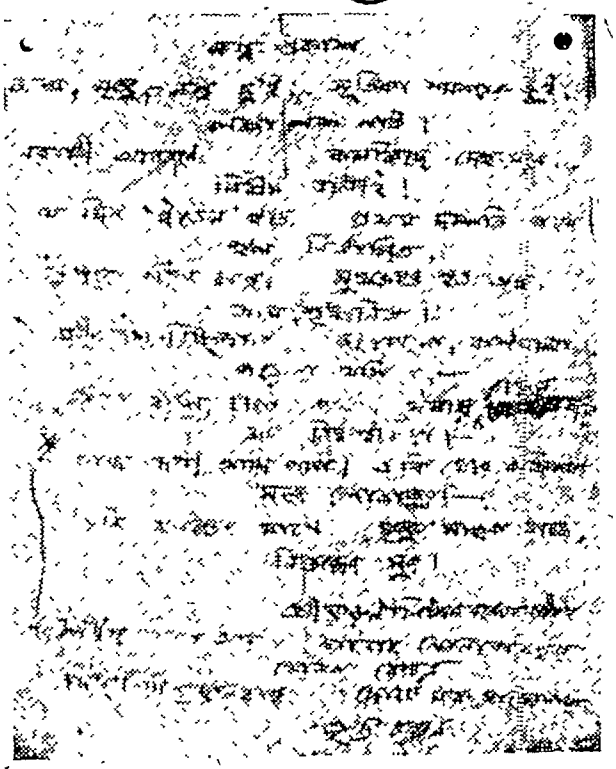

করুণানিধানের অপ্রকাশিত দুটি কবিতা প্রসঙ্গে

আজ থেকে শত বর্ষ আগে ১৮৭৭ সালের ১৫ নভেম্বর, করুণানিধানের জন্ম হয়েছিল শান্তিপুরের কোলে। কবির জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দুটি অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশ করা হলো।

কবিতা দুটির জন্মক্ষণ সম্পর্কে কিছু পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম কবিতা 'নগ্ন প্রকাশ' কবির সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরের আসরে রচিত হয়েছিল।

সময়টা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পুড়ছে। চারদিকে মৃত্যুর কালো হাওয়া ঘূর্ণি জাগাচ্ছে। সভ্যতার সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তে, জীবন, আর জীবনের প্রধান অবলম্বন প্রেম, আর তারই সঙ্গে মৃত্যুবত সব কিছুর পরি সমাপ্তি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে কবির মতামত চেয়েছিলাম।

সেদিন সেই প্রশ্নের উত্তরে কবি একখণ্ড কাগজে কুড়ি পংক্তির একটি কবিতা লিখে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: "এই নাও তোমার প্রশ্নের জবাব। কি বলতে চাইছি আজ না বুঝলেও আমি যখন থাকবো না। তখন বুঝবে।"

স্বল্পায়তন কবিতাটিতে, জীবন-মৃত্যু, প্রেম সম্পর্কে কবির ধারণা, আর অতৃপ্তির বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কবিতাটির ইতিহাস একটু বিচিত্র ধরণের। কবিতাটি সম্ভবত কবির শেষ রচনা। এটি 'সপ্তর্ষি'র ফাইল হ'তে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

করুণানিধানের জীবদ্দশায় একটি স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল—'সপ্তর্ষিমণ্ডল'। করুণানিধানের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছিল। এর বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি পৌরহিত্যও করেছেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পক্ষ হতে একটি ইংরাজী ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। ব্যাপারটি একদিকে যেমন ছিল ছেলেমানুষীতে ভরা, অন্যদিকে তেমনই অভিনব।" উদ্যোক্তারা দাবী করতেন যে, 'সপ্তর্ষি'ই হচ্ছে শান্তিপুরের প্রথম ইংরাজী মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার পক্ষ হতে কবি করুণানিধানের কাছে একটি কবিতা চাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে কবি ছিলেন মুক্ত হস্ত। কিন্তু কবিতাটি হস্তান্তর করার সময়, তিনি সম্পাদককে বলেন যে, আর তিনি কবিতা লিখবেন না। ওটাই তাঁর শেষ কবিতা। কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়নি বলেই তা সম্ভবত মুদ্রিত হয়নি পত্রিকায়।

করুণানিধান, রবীন্দ্রবৃত্তের শেষ রোমান্টিক কবি। প্রত্যক্ষভাবে, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও, তাঁর ভাবভাবনার রূপ রেখার মিল ছিল বিহারীলালের সংগে।

স্বপ্নময়তার কবি করুণানিধান,—অতীতলিপ্সু তাঁর কবি মানস। বেদনার নুড়ি পথেই তাঁর ছন্দধারা নেমে আসে। অতীতের প্রতি তৃষ্ণা ছিল তাঁর অপরিসীম। অক্ষর অমিত উৎসার তাঁর কাব্যে জলছবি আঁকে। সমস্ত লক্ষণের অভিব্যক্তি, তাঁর শেষের কবিতায় ফুটে উঠেছে।

—ধীরানন্দ রায়

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন।

ভূগর্ভ-রেল মানেই গতির প্রগতি

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

MTP

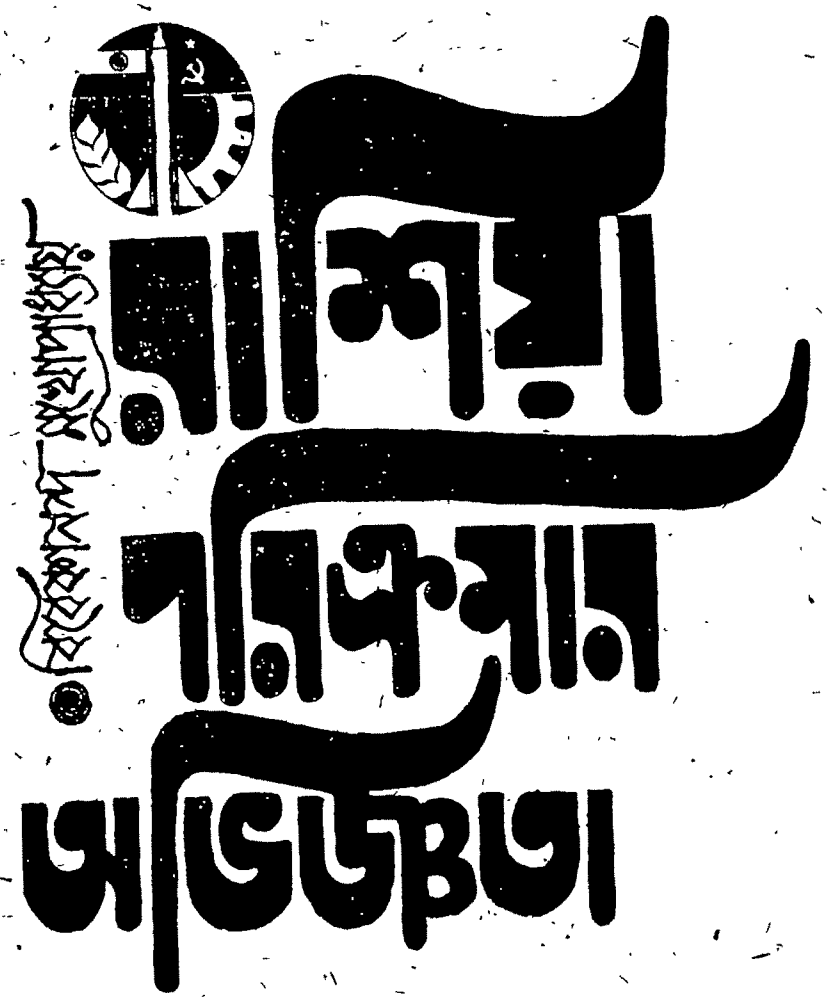

যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষেই দেশ দেশান্তর ভ্রমণ কেবল কৌতূহল তৃপ্তির কিম্বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাপার নয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কের প্রচুর খোরাক জুটে থাকে এই সমস্ত পরিভ্রমণের ফলে। এমন কি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে কিম্বা লাইব্রেরীতে বসে পুস্তক পাঠের মধ্যে যে সমস্ত ফাঁক অপূর্ণ থাকে, ঘরের বাইরে এই বিচিত্র পৃথিবীর বহু বিচিত্র দেশ ভ্রমণের দ্বারা সেই সমস্ত কেতাবী শিক্ষার ফাঁকগুলি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার জোয়ারের জলে যেন পূর্ণ হয়ে যায়। আগেকার দিনে নানা কারণে যেমন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক কিম্বা সাহসী অভিযাত্রী হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ দেখার সুযোগ পেতেন, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক নতুন পৃথিবীতে সেই সুযোগের দুয়ার সাধারণ লোকের জন্যও খুলে গেছে। এমন কি, আমাদের ছোটবেলা যে বাঙালী বধূকে দেখেছি ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বন্দিনীর মত নিরুপায় অবস্থায় থাকতে, আজ সেই বাঙালী বধূই একটি লেডিজ ব্যাগ হাতে নিয়ে দিব্য একা একা দশ হাজার মাইল দূরবর্তী আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সুতরাং এমন দিনে আমার মত সাধারণ মানুষও যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পাবে, সেটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এখানে পৃথিবী পরিক্রমার কথা আলোচনা করতে বসিনি, আলোচনা করতে চাই সদ্য দেখা সোভিয়েত রাশিয়ার কথা। অবশ্য আমার পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া আদৌ নতুন নয়। কারণ, এবার নিয়ে অন্ততঃ সাতবার আমার মস্কো বা সোভিয়েত পরিদর্শন ঘটলো। কিন্তু এবারের পরিদর্শনের মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব ছিল। ১৯৭৬ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর) যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা ১৪ দিনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্ত ৬ জনের মধ্যে স্বনাম প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রোয়েরিক ছাড়া আমরা বাকী পাঁচ জন সোভিয়েত পরিভ্রমণে গিয়েছিলাম গত আগষ্ট মাসে। এই ছোট্ট ডেলিগেশনের নেতৃত্ব পদ আমার ঘাড়েই পড়েছিল এবং আমার সহযাত্রীরা ছিলেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও মননশীল বুদ্ধিজীবী, যেমন—হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনীকার বিষ্ণু প্রভাকর, বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও প্যাভলোভ ইনিষ্টিটিউটের ডাইরেক্টার ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মারাঠা সাহিত্যের ও সাংবাদিকতার খ্যাতিমান নারায়ণ দেশাই এবং মালয়ালম (কেরালা) ভাষার বিদুষী লেখিকা ও সাহিত্য সমালোচক ডঃ মিসেস এম লীলাবতী। শ্রীমতী লীলাবতীই ছিলেন আমাদের মধ্যে একমাত্র মহিলা (যিনি নিজে অধ্যাপিকা এবং স্বামীও অধ্যাপক) যিনি এর আগে আর কখনও ভারতের বাইরে বিদেশে পা বাড়ান নি। সোভিয়েত দেশ কিম্বা সোসিয়লিজম-কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর তেমন কোন স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। আচার আচরণে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং তিনি ও বিষ্ণু প্রভাকর ছিলেন আমাদের মধ্যে নিরামিষাশী। এই দু'জনের মধ্যে আবার শ্রীমতী লীলাবতী ছিলেন অনেক বেশী কড়া ও সতর্ক খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে। এমন কি, তিনি আমাদের সঙ্গে ভোজন টেবিলে লেমোনেড খেতে পর্যন্ত ভয় পেতেন, পাছে আমরা দুষ্টুমি করে লেমোনেডের নাম করে তাঁকে কোন উগ্র পানীয় পরিবেশন করি। কিন্তু আচারে আচরণে কথাবার্তায় তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী ও মিষ্টি স্বভাবের ছিলেন এবং একমাত্র নারী সঙ্গিনী হিসেবে আমাদের হাস্য-কৌতুক খুব উপভোগ করতেন। বিষ্ণু প্রভাকরজী যেমন সদাচারী ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন, তেমনি উদার ও সহৃদয় প্রকৃতির ছিলেন। আর মহারাষ্ট্রের নারায়ণ দেশাই ছিলেন চিন্তাশীল

দার্শনিক প্রকৃতির—যৌবনে গোঁড়া কমিউনিষ্ট কিন্তু বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে বেশ উদার মতাবলম্বী এবং ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ত্রুটি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। আর আমাদের কোলকাতার ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলী ছিলেন মানসিক ব্যাধি, মনস্তত্ত্ব ও প্যাভলোভিয়ান বৈজ্ঞানিক তথ্যে সুপণ্ডিত। প্রায়শঃই সোভিয়েত রাশিয়ার হোটেলগুলিতে ও দিল্লীতে আমরা দু'জনে একত্র থাকতুম। কিন্তু ধীরেনবাবুর যেন আহার নিদ্রা ছিল না, মধ্য রাত্রির পরেও তিনি জেগে থাকতেন, খেতেন সামান্য, আর সুটকেশ থেকে জামাকাপড় বের করতে গেলে কিম্বা ভরতি করতে গেলে তিনি শিশুর মত অস্থির হয়ে পড়তেন পাছে কোন জিনিস হারিয়ে যায় এই ভয়ে। এই সমস্ত "বাস্তব" ব্যাপারে তিনি সত্যি আনাড়ির মত ছিলেন। কিন্তু কোন বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় তাঁর মননশীলতার গভীরতা উপলব্ধি করা যেত এবং সেখানেই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।...

যদিও দিল্লী থেকে মস্কো কিম্বা মস্কো থেকে দিল্লী সোভিয়েত প্লেনযোগে একটানা ৬ ঘণ্টার নন্‌স্টপ ফ্লাইট, তবু দুই প্রান্তের বিমান বন্দরে নানা কারণে এত বেশী বিলম্ব হয়েছিল যে, ব্যাপারটা খুব সুখকর ছিল না। রাত্রি ৩টার সময় প্লেনে আমাদের ডিনার দেওয়া হয়েছিল। যদিও আহার্য বস্তু উপভোগ্য ছিল, তবু শেষ রাত্রে ৭৩ বছর বয়সে সেগুলি উদরসাৎ করার মত সাহস আমার ছিল না। সুতরাং মস্কোতে পৌঁছে কিম্বা দিল্লীতে ফিরে বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলুম। তবে, দূর দেশের পর্যটনে এই ধরনের কিছু কিছু অসুবিধা ঘটবেই যেমন হোটেলগুলিতে অসুবিধা ঘটতো ইচ্ছামত খাদ্য প্রাপ্তি নিয়ে। বিশেষতঃ নিরামিষাশীদের পক্ষে বিড়ম্বনাটাই বেশী ছিল। কারণ, পশ্চিমী খাদ্যের অধিকাংশই আমিষ প্রধান।...

যদিও আমাদের অধিকাংশের কাছেই সোভিয়েত রাশিয়া নতুন দেশ ছিল না, তবু সরল ভাবেই স্বীকার করবো নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছি যথেষ্ট। কারণ,

লেনিনগ্রাদ রক্ষায় যে বীরেরা প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতিতে শহীদ স্তম্ভ।

এ পর্যন্ত গত ২২ বছরে যত বার সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছি, দেখেছি নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ ও দেশ গঠনের প্রয়াস। মনে হলো এবার সেই অনলস প্রয়াস যেন চরম সার্থকতার—সোসিয়েলিজম থেকে কমিউনিজমের প্রবেশ পথে পৌঁছেছে। আমরা মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ, লেনিনগ্রাদ থেকে কিয়েভ (উক্রাইন) কিয়েভ থেকে টিবলিসি (জর্জিয়া) ঘুরে পুনরায় মস্কোতে এলাম এবং এবং পরিক্রমায় দেখতে পেলাম সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীষ্মকালের সূর্যালোকে যেমন ঝলমল করছে, তেমনি সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজের অধিকারীরূপে সোভিয়েত নর নারী ও শিশুরাও যেন জীবনের উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করছে। বিপ্লবের ৬০তম বর্ষে বিজ্ঞান সম্মত সমাজতন্ত্রের আশীর্বাদ সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আজ সত্যিসত্যি অগ্রগামী করেছে—যে অগ্রগামিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, ১৯১৭ সাল থেকে বর্তমান ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত, লেনিন থেকে ব্রেজনেভের কাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচক, বিরোধী এবং নিন্দুক ও শত্রুর কোন অভাব নেই। ঘরে বাইরে এই শত্রুতার জন্য সোভিয়েত নরনারীকে অপরিমিত রক্তে ও অশ্রুতে, উপবাসে ও লাঞ্ছনায় বিশেষভাবে গৃহ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু তবু বিস্ময়ের কথা এই যে, যখন গত ৬০ বছরে পৃথিবীর বৃহত্তম রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি তলিয়ে গেছে, তখন ধ্বংসের মহাশ্মশানে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রশক্তি 'সুপার পাওয়ার' রূপে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই 'সুপার পাওয়ার' বিশেষণটি কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ও নিন্দার সুরেই—বিশেষভাবে চীন মার্কিন মহলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করার এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয় কাণ্ডের পর মাত্র ৩০ বা ৩২ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কোন্ যাদুমন্ত্রে 'Super Power'-এ বা অতি-বলশালী শীর্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হলো? তফাৎটা বুঝা যাবে তখন, যখন দেখা যাবে যে বিগত ৩০ বছর পরেও স্বাধীন ভারতের শতকরা ৭০ জন মানুষ দরিদ্র ও নিরক্ষর এবং কলিকাতার মত এশিয়ার অন্যতম মহানগরী নরককুণ্ডে পরিণত। কিন্তু যত বক্র কটাক্ষ এবং বিদ্রূপই করা হোক না কেন, 'সুপার পাওয়ার' শব্দটাতো এক মাত্র পারমাণবিক কিম্বা সামরিক অস্ত্রসজ্জার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না—যদি না তার পিছনে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক ও

প্রযুক্তিগত বিদ্যার বিস্ময়কর অবদান না থাকে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় অন্যান্য উন্নত ও ধনিক রাষ্ট্রগুলি পিছনে পড়ে গেল কেন? পারমাণবিক অস্ত্রধারী হওয়া সত্ত্বেও তারা কি বৈরুব হয়েছে কিম্বা সেই সমস্ত দেশে কি বেকার নেই, দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ নেই। নেই ক্রমবর্ধমান ক্রাইমের তালিকা অথবা নেই অর্থনীতির ও মুদ্রাস্ফীতির সঙ্কট? সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্ত কেন? 'সুপার পাওয়ার'-এ উন্নীত হওয়ার রহস্য মারণাস্ত্র তৈরীর মধ্যে লুকানো নেই, সেই রহস্য জীবন ও সমাজ বিকাশের মন্ত্রের মধ্যে লুকানো—যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের শক্তি ও প্রতিভার পরিপূর্ণ আলোকে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ আছে।...

সেই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার "নতুন মানুষকে" এবার আমার সপ্তম বারের পরিদর্শনে আরও গভীরভাবে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখে এলাম, পরিচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাত্রা রাস্তায় ঘাটে শহরে বন্দরে, যুবকদের মধ্যে কোন হৈ হল্লা, বেলাল্লাপনা কিম্বা হিপ্পি দেখি নি। আর এই সমস্ত হাঙ্গামা, হুজ্জুৎ এবং জীবন নিয়ে জুয়া খেলার সুযোগ কোথায়, সময়ই বা কোথায়? সমস্ত দেশ জুড়েতো দেখলুম সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী employed—কেবল চাকরি বা জীবিকার অর্থে নয়। সারা দেশে অজস্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পদ ছড়ানো এবং যেখানেই গিয়েছি—মিউজিয়ম হোক, প্রদর্শনী হোক, চিত্রশালা কিংবা বহু বিচিত্র রকমের প্রমোদশালা হোক সর্বত্র উৎসুক ও উৎসাহী নর-নারীর ভিড়। লোক সঙ্গীতের আসর থেকে সার্কাসের তাঁবু পর্যন্ত কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সর্বত্র লোকে গিজ গিজ করছে টিকিট পাওয়াই যেন দায়। পণ্যশালা ও বিপণীগুলিতে যেমন জনতার সমাবেশ, তেমনি ঐতিহাসিক যাদুঘরেও দর্শকের ভিড়। একটা জাতীর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য না এলে এমন জোয়ার দেখা যায় না।

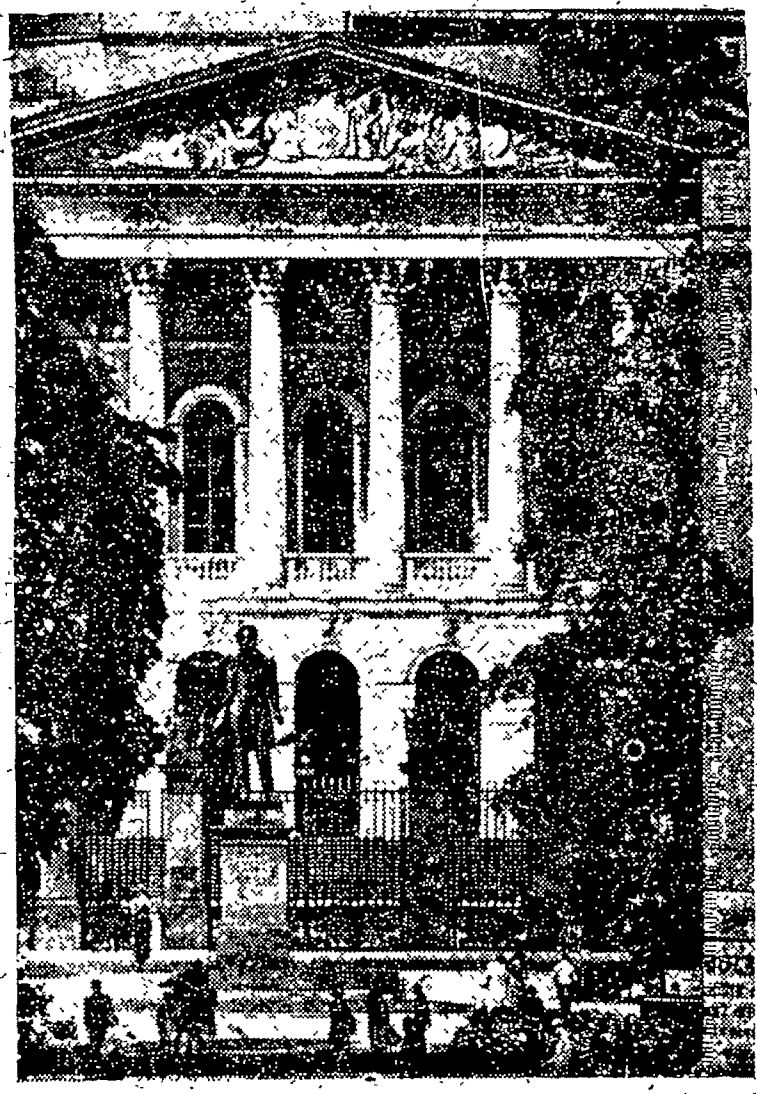

লেনিনগ্রাদে পুশকিনের স্মৃতিসৌধ।

রাজধানী মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ তো জমজমাট—রাজপথে যেন সুবেশ নরনারী শোভাযাত্রা সেজে আছে, আর সেজে আছে নানা যানবাহনের ভিড়। অথচ প্রথম যখন ২২ বছর আগে এসেছিলাম, তখনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরীগুলির কীর্তিমণ্ডিত সৌধ ও সংস্থাগুলি দেখে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তখন জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ে নি। মহাযুদ্ধের মাত্র দশ বছর পরে, তখনও সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বংসের ক্ষয়ক্ষতি সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারে নি। মস্কো থেকে ট্রেনযোগে (কামরাগুলি সেলুনের মত) গিয়েছিলুম উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভে, সঙ্গে ছিলেন পরলোকগত খ্যাতনামা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত—আমরা ছিলুম ভারতীয় শান্তি ডেলিগেশনের সদস্য। কিন্তু ভোরবেলা ট্রেনের কাচে জানালা দিয়ে উক্রাইনের শস্য শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর দেখে শচীনদা ও আমি—উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাম বঙ্গমাতার কথা স্মরণ করে কিঞ্চিৎ পরিহাসের সুরে বলাবলি করেছিলাম—ভাগ্যিস সাহিত্য সম্রাট সোভিয়েত উক্রাইন দেখেন নি। তারপর কিয়েভ শহরে গিয়ে দেখলুম কৃষি প্রধান রাজ্যের নয়ন লোভন উদ্যান নগরী এবং আমাদের সম্পর্কে

30326

কৌতূহলী নারীদের ভীড় বেশ কিছুটা গেঁয়ো ধরনের ভাবভঙ্গী এবং পোষাক পরিচ্ছদ। কিন্তু এবার ২২ বছর পরে গিয়ে সেই কিয়েভ শহরকে যেন চিনতেই পারলুম না। সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটে গেছে জন্মান্তর। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, বিশাল পার্ক, সৌধ-কিরিটিনী নগরীর পরিমায় যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি রাজপথে যানবাহনের জৌলুষ। কিয়েভের নরনারীর মধ্যে সেই বাইশ বছর আগেকার দেখা গেঁয়ো ভাবভঙ্গীর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বড় বড় হোটেল তৈরী হয়েছে, আর তৈরী হয়েছে আধুনিক মেট্রো বা পাতাল রেল এবং সুসজ্জিত এয়ারপোর্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে উক্রাইন কিয়েভ ও নীপার কিম্বা ডন নদী সম্পর্কে আমি যথেষ্ট অবহিত ছিলুম। কেননা রুশ জার্মান সংগ্রামের এক ভয়াবহ অধ্যায় রচিত হয়েছিল দক্ষিণ রাশিয়ার এই অঞ্চলে। জয় পরাজয়ের ধ্বংস ও অত্যাচারের অজস্র কাহিনী উক্রাইন ও নীপারের সঙ্গে জড়িত। পাঠক লেখক হিসেবে আমি যেন নীপার নদীর প্রেমে পড়েছিলাম। সুতরাং ১৯৫৫ সালে কিয়েভ থেকে নীপার নদী এবং তার বিখ্যাত বাঁক দেখে আমার উল্লাসের সীমা ছিল না। তবু যেন সেবার নীপারকে ঐ কিয়েভ শহর থেকেই কিছুটা গেঁয়ো গেঁয়ো মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার? ১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাসে?—সেই নীপারকে চেনা গেল না, এ যেন আধুনিক কিয়েভ শহরের কোন আধুনিক ফ্যাসন দুরস্ত যুবতী। কিন্তু শহরসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে সুসজ্জিত মোটর লঞ্চযোগে যখন ১০০ কিলোমিটার দূর পাল্লায় গেলুম, তখন নীপারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম; অভিভূত হলাম—কোন কোন এলাকায় যেন আমাদের পদ্মা নদীর মত চওড়া ও বিশাল। আর কী অপরূপ নীপারের দুই পারের দৃশ্য। বহু শাখা ও উপশাখা বেরিয়ে গেছে নীপার থেকে। আর কত অপরূপ উপনগরী, পার্ক ও প্রমোদশালা গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের উক্রাইনের জাতীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কোর স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নীপারের তটবর্তী পাহাড়ের চূড়ার উপর। ৩৬০টি সিঁড়ি বেয়ে সেই পাহাড়ের উপর উঠে গেলাম। এমন অপূর্ব স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়ম কদাচিৎ দেখেছি। ভূমিদাসের পুত্র শেভচেঙ্কো নিজেও ছিলেন উক্রাইনের এক জমিদারের কৃতি দাস। সেই অসহ্য অবস্থা ও জারশাসনের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শৃঙ্খল অগ্রাহ্য করে তরুণ শেভচেঙ্কো চিত্রবিদ্যায় ও কবিতায় নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু জীবনব্যাপী লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়ায় অকালে প্রাণ নাশ করেছিলেন। সেই লাঞ্ছিত শেভচেঙ্কো আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মত উক্রাইনের জাতীয় বিপ্লবের কবি এবং তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার রুবল মুদ্রা (এক রুবল ভারতীয় মুদ্রায় ১২ রুবল টাকার সমান) ব্যয়ে এই মিউজিয়ম ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। প্রতি বছর বহু পর্যটক এই স্মৃতিসৌধ দেখতে আসেন। আমরাও স্মারক গ্রন্থে নাম লিখে রেখে এলাম।...

এবার সোভিয়েত রাশিয়া পরিক্রমায় আর একটা নতুন দৃশ্য দেখা গেল। আগষ্ট মাসের গরমে রাশিয়ায়ও যে কলিকাতার মত উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং মাথার উপর সিলিং ফ্যান ও অফিস টেবিলে টেবিল ফ্যান ঘোরে, এটা আগে দেখিনি। কাজেই প্রথমটা বেশ কৌতূহল বোধ করেছিলাম। হাল আমলের ইউরোপে নাকি বেশ গরম পড়বে এবং ভারতের মত সেখানেও নাকি গ্রীষ্মকালে ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে।

এই গ্রীষ্ম প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল লেনিনগ্রাদ থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে ফিন উপসাগরের তীরে জারের আমলের সুবিখ্যাত 'সামার প্যালেস'র গ্রীষ্ম প্রাসাদের কথা, আগেও দেখেছিলাম, কিন্তু এবার গিয়ে চোখ ফেরাতে পারলুম না। অজস্র কৃত্রিম ঝর্ণার রাজকীয় ঐশ্বর্য এবং সেই সঙ্গে আলো। পুষ্পবীথি বিশাল বিটপী শ্রেণীর সুবিস্তৃত অরণ্য, আর উত্তাল সমুদ্রের হাওয়া সে এক অপূর্ব ইন্দ্রপুরীর মায়ালোক যেন হৃদয়, মন ও কল্পনাকে অভিভূত করে ফেললো। দেশ ও দেশান্তর থেকে মোটরে ও টুরিষ্ট বাসে করে এসেছে অজস্র নরনারী। সেই জনারণ্যও দেখবার মত ছিল।

লেনিনগ্রাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীয় ঐশ্বর্য উইন্টার প্যালেসের পৃথিবী বিখ্যাত হার্মিটেজের চিত্রশালা এবার আর দেখিনি। কিন্তু সেই চিত্রশালার একটি বইতে দেখেছি ভারতীয় কলা বিভাগে যামিনী রায়ের প্রসিদ্ধ 'প্রসাধনরতা' ছবিটি। এবারে মস্কোর ভুবনবিখ্যাত ক্রেমলিনেও ঢুকিনি, কারণ তখন অজস্র ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু মস্কো থেকে ১০০ মাইল দূরে তিন ঘণ্টার মোটর পথ অতিক্রম করে বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক ও মনীষী টলস্টয়ের 'ইয়াসনিয়া পোলিয়ানার ঐতিহাসিক বাসগৃহ দেখে এলাম। কাউন্টেরই উপযুক্ত বিরাট জমিদারি বটে, কিন্তু বাসগৃহ প্রাসাদতুল্য নয় এবং শতাধিক বৃক্ষ শ্রেণীর ভিড়ে যেন ঘন অরণ্যের রূপ ধারণ করেছে। টলস্টয়েরই শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে কয়েকটি গাছের ছায়ায়। কোন স্মৃতি ফলক, কোন ক্রুশ বা সমাধিমন্দির জাতীয় কিছু নেই। যিনি আজীবন দরিদ্র ও চাষীদের জন্য লড়েছিলেন সেই বিদ্রোহী টলস্টয়কে একজন সাধারণ চাষীর মতই কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম নব বিবাহিত দম্পতির দল একে একে সেই গোরস্থানে লিলি ফুলের গুচ্ছ রেখে টলস্টয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেন। আর দেখলাম বিরাট ঝিল যেখানে টলস্টয় স্নান করতেন ও সাঁতার কাটতেন। শেষ জীবনে চাষীদের মত যে সাধারণ একটা বাড়ীতে তিনি বাস করতেন, সেটাও বাইরে থেকে দেখলুম।...

মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও টিবলিসিতে (জর্জিয়া) নানা অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি, যেগুলির উল্লেখ করা

বাহুল্য মাত্র। আর সাক্ষাৎ হয়েছিল কিছু সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং ভারত বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বুঝা গেল যে, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাধারণতঃ কোন হতাশা ও নৈরাশ্যবোধ নেই। কিম্বা 'জেনারেশন গ্যাপ' (নতুন ও পুরাতন প্রজন্মের মধ্যে ব্যবধান ও শূন্যতা) নামীয় সমস্যার দ্বারা বিব্রত নন।

মস্কো থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বদিন অপরাহ্ণে মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আই কে গুজরাল ব্যক্তিগত ভাবে একটি চায়ের মজলিসে আমাদের আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার ও শিষ্টাচারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন যে অক্ষুণ্ণ থাকবে, এটাও আমরা মিঃ গুজরালের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় উপলব্ধি করেছিলাম। রাশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। উত্তরে লেলিনগ্রাদ থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া পর্যন্ত সর্বত্র আমরা ভারত সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতার গুরুত্ব অনুভব করেছি। আর অনুভব করেছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাতে-কলমে প্রয়োগের দ্বারা একটা অধঃপতিত ও দুর্গত সমাজ কি ভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সিংহদ্বারে পৌঁছুতে পারে, আর পর্বত প্রমাণ সহস্র বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করে কিভাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির মর্যাদা অর্জন করতে পারে। লেনিনের স্বপ্ন ও সাধনা সোভিয়েত ইউনিয়নে সার্থক রূপ ধারণ করেছে। শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র বুর্জোয়া ধনিক রাষ্ট্রগুলির চেয়ে নৈতিক শক্তিতে যে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে পারে—এই সত্যও সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতর সমাজে সুস্থ জীবনবোধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

০ ০ ০ ০

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে এবং অন্যত্র যে সমস্ত প্রচার কার্য হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চায়। কেননা, অনেক সরল বিশ্বাসী লোক সেগুলি বিশ্বাস করে থাকেন, যেমন—রাশিয়াতে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, মত প্রকাশের অধিকার নেই এবং যাঁরা Dissident বা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের প্রবলভাবে দমন করা হচ্ছে।

১। এগুলির জবাবে এবার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উল্লেখ করছি যে, প্রস্তাবিত নূতন সংবিধান নিয়ে বিভিন্ন কারখানায় ও সংস্থায় শ্রমিক, কর্মী ও জনগণের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছে এবং শত শত Suggestions বা প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে। এগুলির বিচার বিবেচনা করা হবে। টিবলিসির একটি সুবৃহৎ কারখানার ডাইরেক্টারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই তথ্য জেনেছি।

২। মস্কোতে জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাদের বললেন যে, পশ্চিমী সংবাদপত্রে dissident দের নিয়ে খুব হৈ চৈ করা হচ্ছে, আর প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, রাশিয়ার বুদ্ধি/জীবীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ জমে উঠেছে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বললেন যে, তিলকে তাল করা হচ্ছে। কারণ "আমি নিজে মস্কোর একটি রাস্তায় dissident দের একটি বিক্ষোভ মিছিল দেখেছি, শুনে দেখেছি সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন মাত্র ১৯জন। অথচ পশ্চিমী সংবাদপত্রে এটাকেই 'হিউজ ডেমোনেস্ট্রেশন' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।"

৩। মস্কোতে ১২ বছর ধরে বাস করছেন, এমন একজন বাঙালী যুবক আমার সঙ্গে হোটেল কক্ষে দেখা করেছিলেন। (সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ননী ভৌমিক।) আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখানে কেমন আছেন, বলুন তো? কারণ, রাশিয়া সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ প্রচারও চলছে। যুবকটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন— "ওসব বাজে কথা। এখানে খুব ভালো আছি। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই। অসুখ করলে এক পয়সাও খরচ লাগে না। কিন্তু গেল বছর কোলকাতায় গিয়েছিলাম, এবং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অন্ততঃ ৫০০ টাকা আমার লেগেছিল একমাত্র ঔষধপত্রে।"

৪। বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তী প্রায় সারা জীবন মস্কোর বাসিন্দা। বয়স এখন প্রায় ৮০-এর সীমানায়। সম্পূর্ণ একা একটি ফ্ল্যাটে আছেন, নিজেই রান্না করে খান। খবর পেয়ে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন হোটেল কক্ষে ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলী ও আমার সঙ্গে। ১৯৬৫ এর পর এই দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সুতরাং জিজ্ঞেস করলুম—'কেমন আছেন এখানে?'

সস্মিত মুখে গোপেনবাবু জবাব দিলেন—'সোভিয়েত রাশিয়া বলেই এত বয়সে এখনও বেশ ভালোভাবে বেঁচে আছি। কোন অসুবিধা নেই। বৃদ্ধ বয়সে কোন অসুখ করলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার, এম্বুলেন্স এবং হাসপাতাল। রাজার হালে চিকিৎসা। তারপর যথারীতি আবার আমার ফ্ল্যাটে প্রত্যাবর্তন।"

এই সমস্ত দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনা একান্ত নিভৃতে—কোন প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রায় যাঁদের গাত্রদাহ তাঁরা তো নানা কৌশলে অপবাদ রটনা করবেনই। কিন্তু এই অপবাদ সত্ত্বেও আগামী শতাব্দীতে দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী—অন্যথা রক্তের প্লাবন ও বিশ্ববিধ্বংসী মহাযুদ্ধ।

শারদীয়া পূজাতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার...

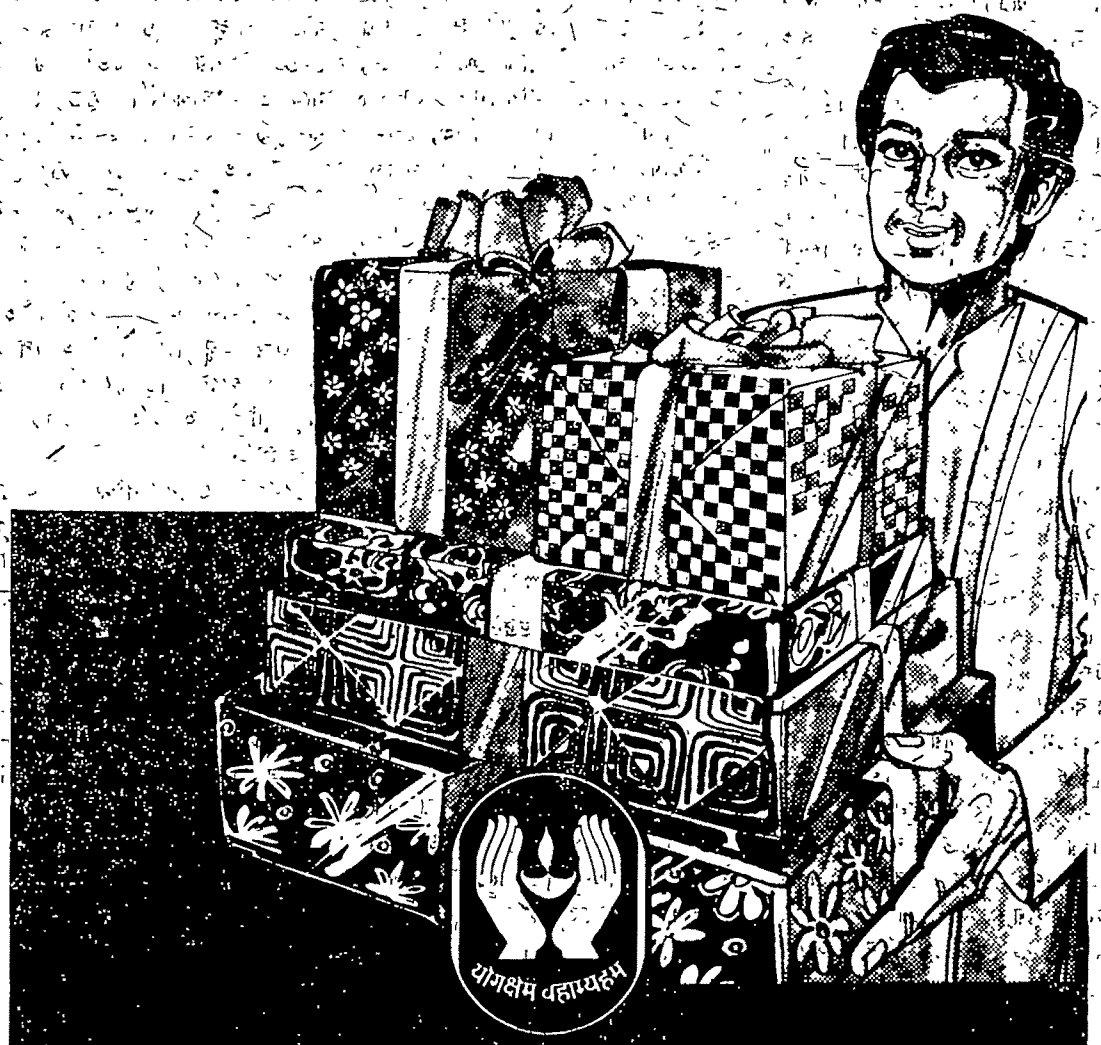

একটি জীবন বীমা পলিসি

হাসিখুশিভরা আনন্দ উৎসবের দিন-গুলি এসে গেল। এই উৎসবের দিনে প্রিয়জনকে উপহারে ভরিয়ে দিতে মন চায়। মনে রাখবেন, প্রিয়জনকে সবার সেরা উপহার দিতে হলে তাঁকে দিন—একটি জীবন বীমা পলিসি। যে উপহার তাঁর সারা জীবনের জন্য এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারাণ্টী দেয়।

জীবন বীমার কোনও বিকল্প নেই

deCunha/LIC/44

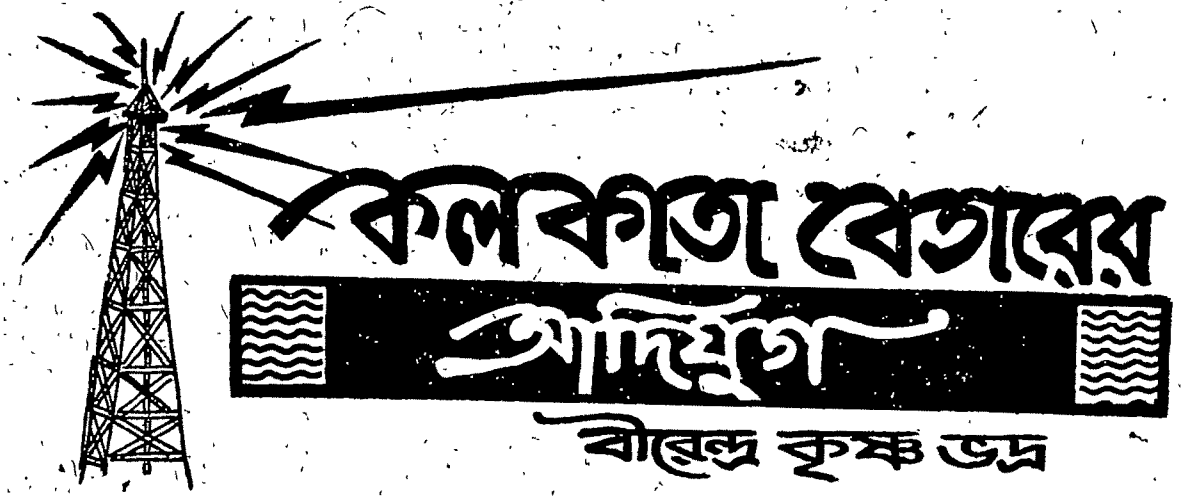

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে এ সালে বেতার তার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করছে। আজকে বেতারের সেই আগেকার ঔজ্জ্বল্য নেই। নেই ক্রীস্টাল সেট। সেই কান দিয়ে শোনার যে মাধুর্য শ্রোতারা একা একা উপভোগ করতেন এবং সেই একা শোনার মধ্যে যে রস পেতেন, লাউডস্পীকার প্রবর্তিত হবার পর তা যেন অনেকটা কমে গেছে।

বেতার যখন প্রথম কাজ শুরু করলো তখন এই যন্ত্রটি সম্পর্কে আমাদের দেশের সব লোকেরা কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। অথচ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ঘরে ঘরে তখন বেতার অনুষ্ঠান শোনার হিড়িক পড়ে গেছে। ১৯২৪ সালে যখন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন তৈরী হলো তখন আমরা শুনতে পেলাম যে মাদ্রাজে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একটা বেতার ক্লাব তৈরী করেছেন। সেখানে বেতার নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। তার কিছুদিন পরে কলকাতা সায়েন্স কলেজে ডাঃ শিশির কুমার মিত্রের তত্ত্বাবধানে বেতার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো। এই সংস্থাগুলি বেতার গবেষণার পরীক্ষগুলো নিজেদের দলের মধ্যেই করতেন। এরা ছোট ছোট ট্রানজিস্টার এবং মাইক্রোফোন তৈরী করে নিজেদের দলের মধ্যে বেতার বার্তা আদান-প্রদান করতেন। জনসাধারণ তার খোঁজও রাখতোনা। ফলে কলকাতার জনসাধারণের মনে বেতারের প্রতি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ জাগেনি। খবরের কাগজে বেতার নিয়ে কোন আলোচনা বা সংবাদ প্রকাশ হতো না।

১৯২৫—২৬ সালে একটি ছোট বেতার ষ্টেশন চালু হয়ে গেস হাই-কোর্টের ঠিক সামনেই টেম্পোল চেম্বার্স হলের একটি বাড়ীতে। বাড়ীটির সর্বোচ্চ তলায় মার্কিনী কোম্পানীর বড় সাহেব জে আর ষ্টেপলটন থাকতেন। কোম্পানীর বেতার যন্ত্রপাতি বাজারে কি রকম বিক্রি হতে পারে তার আঁচ নেওয়ার জন্য তিনি এই ছোট্ট রেডিও ষ্টেশনটি তৈরী করে ফেললেন। দু'টি পাশাপাশি ঘরের মধ্যেই ষ্টুডিও কন্ট্রোল রুম, ট্রান্সমিটার সব স্থাপিত হলো। জায়গা বেশি ছিল না। তাই এই মিনি বেতার ষ্টেশন। প্রতিদিন সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলতে লাগলো এক ঘন্টা ভারতীয় এবং এক ঘন্টা ইউরোপীয়দের জন্য। এই প্রোগ্রামে বহু সৌখীন গাইয়ে বাজিয়ে থাকতেন। ষ্টেপলটন সাহেব ছিলেন সর্বময় কর্তা। আর ভারতীয় প্রোগ্রাম চালাতেন, মার্কিনী কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট কর্মচারী অমর ঘোষ। কিন্তু এই ষ্টেশনের প্রেরক যন্ত্রের শক্তি পাঁচ মাইল বৃত্তের বাইরে যেতে পারতো না। তার ফলে সারা বাংলাদেশের লোক এই প্রোগ্রাম শুনতে পাননি। কলকাতার কয়েকজন কৌতূহলী লোক সংবাদটা পেয়ে কয়েকটা ক্রীস্টাল সেট কিনে ফেলে ছিলেন। সেই সেটেই হেড ফোন লাগিয়ে প্রোগ্রাম শুনতেন। এই সেটের আকৃতি ছিল চৌকো, আধ হাত লম্বা, ভেতরে সামান্য একটু আধটু যন্ত্রপাতি থাকতো। সে সবাই ঠিকঠাক করে নিয়ে শুনতে পারতো। তবে আর একটা অসুবিধা ছিল—যেমন ছাদে এরিয়াল খাটাতে হতো এবং সেই এরিয়ালের সঙ্গে সেটের সংযুক্তি না হলে কিছুই শোনা যেত না। অনেক শৌখীন লোক দশ বারো টাকা দিয়ে এই সেট কিনতেন। দুটো হেডফোন অতিরিক্ত লাগানো যেত পয়সা খরচ করলে। আর একটা কাজ হচ্ছে যে লাইসেন্স ফি দিতে হতো না। তাছাড়া বিদ্যুৎ খরচও কিছু লাগতো না। কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে বোধ হয় শ' খানেক বেশি কেউ ক্রীস্টাল সেট কেননি। কৌতূহলের বশে অনেকে এই সেটের কার্যকলাপ দেখে খুশীই হতেন। কিন্তু ভাবতেন এ খেলনার একটা জিনিস কোনদিন ভেঙ্গে যাবে কে জানে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজে বেরোলো যে বোম্বাইয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেতারবার্তা প্রচারের জন্য একটি কোম্পানী গঠন করেছেন। এই গঠন কর্তার নাম সুলতান চিনয়। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী গড়ে তোলেন এবং মিঃ চিনয় তার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। ২৩শে জুলাই ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং ষ্টেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও উৎসব হয়েছিল। এই ষ্টেশনের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইন। তারপরে এক মাস তিন দিন বাদেই কলকাতা বেতার ষ্টেশনের উদ্বোধন হলো। সেই দিনটি ১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট। স্থান: এক নম্বর গারষ্টিন প্লেস। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সময় কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন বাংলার তদানন্তন লাট বাহাদুর ষ্ট্যানলি জ্যাকসন বেতার ষ্টেশনের দার উন্মোচন করেন। তার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লেডী জ্যাকসনও এসেছিলেন। স্যার ওঙ্কারমল জেঠিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করেন। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, বকুবাবু (শীতাংশু জ্যোতি মজুমদার) দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লবালা, আঙ্গুরবালা এবং নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার। এই সমস্ত গায়ক গায়িকা ছাড়া সুসাহিত্যিক মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি গল্প বলেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বসুও (গল্প দাদা) ছেলেদের জন্য একটি মজার গল্প অবতারণা করেছিলেন। সানাই বাজিয়েছিলেন বেনারসের আলী হোসেন।

আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী কেন তাদের পরিচালিত দুটি ষ্টেশন একদিনেই উদ্বোধন করলেন না। এতে একটু বাধা ছিল। কারণ, প্রধানতঃ একই দিনে বোম্বাই এবং কলকাতায় তাদের পক্ষে উদ্বোধনের সময় থাকা সম্ভবপর হতো না। আরও একটু বাধা হয়েছিল বাড়ী খুঁজে পাওয়া। গারষ্টিন প্লেসটি ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছাকাছি। এই জায়গাটি পেতে একটু দেরি হয়েছিল। এই গারষ্টিন প্লেসের পুরো বাড়ীটাও পাওয়া যায়নি। দোতলা এবং তিনতলাটাই কোম্পানী ভাড়া নিতে পারলেন। এক তলায় ছিল ফিপসন কোম্পানীর মদের গুদোম ও অফিস। উঠোনে ঢুকে একটি ঢাকা জায়গা পার হয়ে একটি কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল তিনতলায়। তিনতলায় ছিল একটি ছোট স্টুডিও, অফিসঘর, ষ্টেশন ডিরেক্টরের কক্ষ, কনট্রোল রুম। দ্বিতীয় তলায় ওয়েটিং রুম এবং একটি বড় স্টুডিও। সেই খানেই গান বাজনা এবং অন্যান্য বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। দুটি স্টুডিও থাকার দরুন একটি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ১ মিঃ ১।।০ মিঃ বিরতি দিতে হতো। কারণ, একজন আর্টিষ্ট উঠে গেলে আর একজন আর্টিষ্ট আসবেন। প্রত্যেকের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তবলা বাঁধতে হতো। এইসব কারণে দেরি হতো। এমন অনেক স্টুডিও থাকায় বিরতি গুলো একেবারে বাদ পড়ে গেছে।

১৯৩৪ সালের পর একতলার ফিপসন কোম্পানী স্থানান্তরে চলে গেল। অনেক ভাঙচুর করে একতলা, দোতলা, তিনতলায় স্টুডিও তৈরী করা হলো। আগে সমস্ত স্টুডিওতে বড় বড় পর্দা ঝুলতো। তার কারণ শব্দটা যাতে না প্রতিধ্বনিত হয়।

চিনয় সাহেব অনেক ইউরোপীয় কর্মচারীকে নিয়োগ করেছিলেন বোম্বাই এবং কলকাতায়। কলকাতায় প্রথম ষ্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন সি ডবলিউ ওয়ালিক। ওয়ালিক সাহেব অত্যন্ত কৃতী পুরুষ ছিলেন। অনুষ্ঠানকে প্রীতিপ্রদ করবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কোম্পানীর কাছ থেকে অর্থ চাইতেন। কিন্তু কোম্পানী বলতেন তাদের আর্থিক অবস্থা বেশি ভালো নয়। অতএব বেশি কিছু নতুনত্ব করা যাবে না।

কলকাতায় তখন শত শত ক্রীশ্চান সেট অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু লাইসেন্সের সংখ্যা খুব কম। কিছু লোকের স্বভাব দাঁড়িয়েছিল লাইসেন্স না নেওয়া। অথচ গোড়ায় বছরে দশ টাকা লাইসেন্স ফির ওপরেই কোম্পানী দাঁড়াতে চেয়েছিল। অনেকের কাছে লাইসেন্স নেবার কথা বললে বলতেন—'আগে কি লাইসেন্স ফি ছিল? দেব না লাইসেন্স ফি।' এর প্রতিকারের জন্য সরকারী ব্যবস্থার কড়াকড়িও ছিল না। আমরা মাঝে মাঝে মিথ্যে জুজুর ভয় দেখাতাম এই বলে যে লাইসেন্স না নিলে আদালতে জরিমানা দিতে হবে। দু'একজন ভয়ে ভয়ে দিলেন। কেউ কেউ অন্য কৌশল ধরলেন। সকালে বাড়ীর ছাদ থেকে এরিয়াল সমেত বাঁশের খুঁটি দুটো নামিয়ে নিতেন। আবার সন্ধ্যে বেলায় ওগুলো যথারীতি লাগিয়ে দিতেন। কিছুই করবার উপায় ছিল না। সেই সময়ে বেতার প্রচার নিয়ে অনেক মজার ঘটনা ঘটতো। একজন শ্রোতা চিঠি লিখে জানালেন, "সেদিন সংবাদ প্রচারের সময় আপনাদের ঘোষক খুব চমৎকারভাবে কেশেছিলেন। আমার পিসিমা সোট শুনতে পান নি। দয়া করে ঘোষক মহাশয় আবার যদি কাশেন তবে খুব বাধিত হবো।" আর একটি ঘটনা। তৎকালে রেডিও ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমকে রেস ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম ভেবে রাস্তার লোকজন এখানে বসে সময় কাটিয়ে যেত। রেডিও ষ্টেশন সংলগ্ন ব্যাংশাল কোর্টে মামলা করতে এসেও কেউ কেউ আমাদের ওয়েটিং রুমে এসে বিশ্রাম করে যেত। পাশে মামলার রূপাকৃত দলিল দস্তাবেজ রেখে দাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমতো। একবার এই রকম এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, "কোর্টের রিসেস হয়েছে, ও বেলায় আবার কেস উঠবে। এই ফাঁকে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি।" আপত্তি করতে তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন, কি করবো মশাই। কোর্টে বসবার জায়গা থাকলে তো? —বলেই আবার চোখ বুজলেন।

আবার আগের কথায় আসি। কলকাতা কেন্দ্রে ওয়ালিক সাহেব বিখ্যাত ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্র নাথকে প্রথম ভারতীয় প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর ওপর সহকারীদের নির্বাচন করা ও আফস কর্মচারীদের নিয়োগ করার পূর্ণ ভার দিয়ে দিলেন। নৃপেন্দ্রবাবু প্রথমেই বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় রাজেন সেন মহাশয়কে সাধারণ ঘোষক, সংবাদ ঘোষক ও তার অনুবাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন। অত্যন্ত কর্মী পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। সেই সময়

আর একজনও রাজেনদাকে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত হন। তিনি হলেন বেহালার খাতনামা বীরেন রায়। আফসে সব কিছু কাজকর্ম করার জন্য দুজন মাত্র ছিলেন—সুরেশ ভৌমিক এবং তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কিছু-দিন পরেই নৃপেন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত সঙ্গীত কলা রসিক লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাইচাঁদ বড়ালকে তাঁর সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন। রাইচাঁদকে নিয়োগ করার মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা তিনি এক দিন বলেছিলেন। রাইচাঁদ থাকলে ভারতের সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁর প্রভাবে অল্প অর্থ নিয়ে হয়তো অনুষ্ঠান করতে পারেন। সে সময়ে ভারতের বহু কৃতী শিল্পী কলকাতায় এসে রাই-বাবুর বাড়ীতে উঠতেন। এমন কি বাইজীরাও সেখানে থাকবার ঘর পেতেন।

আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা আঙুরবালা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা পনেরটি টাকার বেশী কখনও দক্ষিণা পান নি। যে সায়গলের নাম আপনারা এত শোনেন তার পারিশ্রমিকও সে সময় দশ টাকার বেশি ওঠে নি। আর তৃতীয় শ্রেণীর পাঁচ টাকা। বাকি সব আড়াই টাকা। এমনও কেউ কেউ ছিলেন যারা আমাদের পয়সা দিয়ে প্রোগ্রাম করার সুযোগ খুঁজতেন। কিন্তু তাদের সহজে জায়গা দেওয়া হতো না। কিন্তু আমরা কঠোর হলে কি হবে দরিদ্র শিল্পীরা এসে নৃপেন্দ্রনাথের পা আঁকড়ে ধরতো। এ অবস্থায় তিনি অনেককে কোরাস গানে ঢুকিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে সাহায্য করতেন। এটা তাঁর দোষই বলুন আর গুণই বলুন—এইনিয়ে অফিসে অনেকের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হতো। তখন ধীরে ধীরে অডিশন নেবার ব্যবস্থা করে নৃপেন্দ্রনাথকে এ ধরনের কাজ করতে আর দেওয়া হতো না। আমরা এই স্টেশনের আরম্ভ হতে প্রায় প্রত্যহই নৃপেনবাবুর ঘরে চায়ের আড্ডায় যোগদান করতাম। এরা হলেন যোগেশ চন্দ্র বসু (গল্প দাদা), নলিনী কান্ত সরকার, হীরেন্দ্র বসু, পঙ্কজ মল্লিক, বানীকুমার, মনমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), বিজন বসু তারক দে, সুরেশ পাল এবং এই অধীন লেখক। মাঝে মাঝে এই দলটির সবাই কেউ বেশি, কেউ কম অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। পরে সরকারী ভাবে কয়েকজন নিযুক্ত হন এবং বেসরকারী ভাবেও যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বহু প্রোগ্রামের কর্ণধার হয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের শেষদিকে আমাকে নৃপেনদা তাঁর দ্বিতীয় সহকারী ভারতীয় ডিরেক্টর পদে বসিয়ে দিলেন। সেদিন থেকেই এর সঙ্গে আমার যে যোগ হয়ে গেল তা যেন নাড়ীর যোগ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভবিষ্যৎ সমস্ত না ভেবে বেতারের সেবা করার জন্য দীর্ঘ দিন আমি শ্রোতাদের আনন্দবিধানে যে ক্ষুদ্রপ্রচেষ্টা করে গেছি তা সার্থক হয়েছে কিনা জানিনা। তবে আমার অন্তরে কোন ফাঁকি ছিলনা। আরও কয়েকজন করেছেন বৈকি। তাঁদের সমস্ত ইতিহাস না বললে ব্রড-কাস্টিংয়ের ইতিহাস কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারেনা। সে সব কথা বিস্তৃত ভাবে আমি পরে আলোচনা করতে মনস্থ করেছি। ওয়াসিক সাহেব এক বছর পরে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। সেখানে আসেন মাকিনীর বড় সাহেব জে আর ষ্টেপলটন। তিনি যদিও পুরোপুরি ভাবে এখানকার কর্মচারী হননি কিন্তু বেতারের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর দান কম নয়। আরও দুজনের কথা বলি। তাঁরা হলেন ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সুধীরচন্দ্র রায় ও তার সহকারী অতুল চট্টোপাধ্যায়। এরা বহু অসুবিধার মধ্যে চার পাঁচ মাসের মধ্যে সর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার দিশী মাল মশলা নিয়ে যা তৈরী করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তারপর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ১৯৩০ ৩১ সাল পর্যন্ত বেতারে চলেছে জীবন মরণ সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম থেকে মুক্তি পেয়ে ও জয়ী হয়ে বেতার ১৯৩১ সাল থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে তার আর পতনের আশংকা রইলোনা। আজও সে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে বেতারে যুক্ত থেকেছি। এর মধ্যে কত ব্যক্তি এসেছেন, চলে গেছেন। আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে গেছি। কাগজকে জনপ্রিয় করবার জন্য রাস্তায় বেতার জগত পর্যন্ত বিক্রি করেছি। অতীতের দিকে তাকিয়ে আজ এরকম অনেক কথাই মনে পড়ছে। কিন্তু আজ এখানেই থাক।

ভারত চীন মৈত্রী

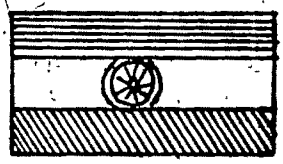

অন্নদাশঙ্কর রায়

একালে পশ্চিম ইউরোপের যে গুরুত্ব সেকালে তার অনুরূপ গুরুত্ব ছিল মধ্য এশিয়ার। বেশীর ভাগ বাণিজ্য চলত স্থলপথে। স্থলপথের বড়ো বড়ো যতগুলো রাস্তা সব ক'টার মিলনভূমি ছিল মধ্য এশিয়া। সেইসব রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করত নানা দেশের ব্যবসায়ী। সেইসঙ্গে তীর্থযাত্রী বা বিদ্যার্থী বা ধর্মপ্রচারক। যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত।

মধ্য এশিয়ার একদিকে চীন, জাপান। আরেকদিকে ভারত, ইরান, আরব। আরো একদিকে সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম। চতুর্থ দিকটা জনবিরল বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া। যেমন ইউরোপের সংগে তেমনি চীন জাপানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের প্রধান সূত্র ছিল মধ্য এশিয়া। বলা বাহুল্য, আরো একটা যোগসূত্র ছিল সমুদ্রবক্ষ। বাষ্পচালিত জাহাজের প্রবর্তন হলে সেইটেই হয় প্রধান যোগসূত্র। জলপথের সব ক'টা বড়ো বড়ো রাস্তা মিলিত হয় পশ্চিম ইউরোপে। মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব স্থানান্তরিত হয়।

মধ্য এশিয়া যখন মধ্যস্থ ছিল তখন চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল নিকটতর। এটা কেবল বাণিজ্যের বেলা নয়। সংস্কৃতির বেলাও। পরে বিভিন্ন কারণে চীন ও ভারত উভয়েই বাইরে যাওয়া ও বাইরের থেকে আসা বন্ধ করে দেয়। ভারতীয়দের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা পাপ। তার মানে জলপথ নিরাপদ নয়। তেমনি যবনসংস্পর্শ পাপ। তার মানে স্থলপথও বিপদসঙ্কুল। যে যার নিজের দেশে আবদ্ধ থাকলে মেলামেশা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। চীনের সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু মেলামেশা ঘটে সেটুকু তিব্বতের মধ্যস্থতার কল্যাণে।

তিব্বতের অবস্থান চীন ও ভারতের মাঝখানে। কিন্তু পথঘাট অতীব দুর্গম। তিব্বত নিজেই একটা মালভূমি। হিমালয়ের এপার থেকে যাঁরাই তিব্বত জয় করতে গেছেন তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন। কতক লোক যেত তীর্থ করতে মানস সরোবর ও কৈলাসে। কতক যেত ধর্ম প্রচার করতে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিতে। কতক যেত আমদানী রপ্তানি উপলক্ষে। চীনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত লাসায়। তিব্বতের শাসকরাও বাইরের লোকের আসা যাওয়ার উপর কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন। কাজেই, যেত আসত একমুঠো লোক। যোগাযোগও সেই পরিমাণে ক্ষীণ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত থাকলে তিব্বতীরাই দলে দলে আসত। নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত বৌদ্ধ শিক্ষকদের।

তিব্বত কোনোকালেই হিন্দুশাসিত দেশ ছিল না। মুসলিম শাসিতও নয়। তার শাসককুল একদা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু জাতিতে তাঁরা তিব্বতীয়। তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভারতীয়ও নন, চৈনিকও নন। এই ভাবে বহু শতাব্দী অতীত হবার পর তাঁরা চীন সম্রাটদের ঊর্ধ্বতনত্ব মেনে নেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তিব্বত পরাধীন হলো। চীনের একজন প্রতিনিধি লাসায় এসে বাস করতেন। আর কোনো দেশের প্রতিনিধিকে ঢুকতে দেওয়া হতো না। এটা যার সূচক তার নাম সোভরেনটি নয়, সুজরেনটি। তিব্বতীরা সোভরেনটি কাউকেই দেয়নি, অথচ তারা নিজেরাও যে শোভরেন তাও নয়। এটা একটা অরক্ষিত অবস্থা। ভারতের ব্রিটিশ কর্তারা যে এর সুযোগ নেবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? চীনের দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা তিব্বতী শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতান। তা বলে চীন সেটা স্বীকার করতে যাবে কেন? ম্যাকমেইন লাইন তিব্বত মেনে নিলেও চীন মেনে নেয়নি দলিলে চীন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত স্বাক্ষর দেননি। ইংরেজরাও পীড়াপীড়ি করেনি।

কালচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজরা একদিন ভারত ছেড়ে চলে যায়। তার কিছুদিন পরে কমিউনিস্টরা চীনের মূল ভূমির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। গোড়ার দিকে ওরা তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমতা সোভরেনটি দাবি করেনি। তিব্বতকে বলেনি চীনের "তিব্বত অঞ্চল"। পরে কিন্তু তিব্বত সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের নীতিগত বিরোধ অনেক দূর গড়ায়। চীন সরকার সন্দেহ করেন যে তিব্বত সরকার তলে তলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত। আর চক্রান্তটা চলেছে ভারতের সীমান্ত পথ দিয়ে। তাই ভেবে চীন সরকার তিব্বতে সৈন্য পাঠান, পররাষ্ট্র নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন, ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও পরামর্শ দেবার জন্যে লাসায় নিজের লোক রাখেন। তিব্বত হয়ে যায় চীনের একটি অঞ্চল বা

স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। আরো পরে স্বায়ত্তশাসনও কুক্ষিগত হয়।

দালাই লামাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগেই তিনি পালিয়ে আসেন। এমন কোনো কথা ছিল না যে বৌদ্ধপ্রধান এতগুলো দেশ থাকতে ভারতই তাঁকে ও তাঁর মতো পলাতকদের আশ্রয় দেবে। এ কাজটি করা হয় ভারত বুদ্ধের জন্মস্থান ও বৌদ্ধদের পুণ্যভূমি বলে। তবে অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, তিব্বত একটি ক্ষুদ্র দেশ, একটি স্বাধীন দেশ ও একটি ধর্মপ্রাণ দেশ, যার উপর গায়ের জোরে কমিউনিজম নামক ধর্মহীন বা ধর্মদ্রোহী তত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। তাঁরা তিব্বতীদের পক্ষ নেন, চীনের বিপক্ষে যান। এতে ভারত সরকার পড়ে যান বেকায়দায়। চীনের লোক কমিউনিস্ট হবে কি হবে না সেটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তেমনি তিব্বতকে চীন কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেবে সেটাও চীনের ঘরোয়া ব্যাপার। গোড়ায় ভারত চীনের সঙ্গে তর্ক করেছিল এই বলে যে চীন তিব্বতের উপর সুজরেনটি দাবী করতে পারে, সোভরেনটি দাবী করতে পারে না। কিন্তু চীন সে যুক্তি অগ্রাহ্য করে। ভারতও তাতে সায় দেয়।

পরবর্তীকালে যে সংঘর্ষটা ঘটে তার ইস্যু তিব্বত নয়, সীমান্ত রেখা। ঘটিতকে আর অঘটিত করতে পারা যাবে না। ভারত ঠিক না চীন ঠিক এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত নিয়ে মতভেদ এখনো অমীমাংসিত। ম্যাকমেইন লাইন চীন এখনো মেনে নেয়নি। ভারতও তার দাবি ছাড়েনি। আক্সাই চীন সম্বন্ধেও একই রকম অবস্থা। দুই পক্ষই সৈন্যসামন্ত নিয়ে দুই পারে বসে আছে। কেউ একতরফা সরিয়ে নেবে না। চাই একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। তার কত দেরি আছে কে জানে।

তবে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য কোনোদিন পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের পরের ধাপ কথাবার্তা নতুন করে শুরু করা। উভয় পক্ষে শুভেচ্ছা থাকলে মিটমাট একদিন না একদিন হবেই। প্রশ্নগুলো মীমাংসার অতীত নয়। তবে আমাদের একটা অতি পুরাতন ধারণা বরাবরের মতো ত্যাগ করতে হবে। সে ধারণাটা এই যে তিব্বত একটা স্বাধীন দেশ, একটা মধ্যবর্তী দেশ, একটা বাফার স্টেট। এ ধারণা ত্যাগ না করলে চীনের সঙ্গে মিটমাট হবার নয়। তা যদি না হয় তবে চীন ও ভুটান, সিকিম প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র বা রাজ্যের ব্যাপারে ভারতের বিপরীত নীতি অবলম্বন করবে।

সে যাই হোক, তিব্বত সেকালের মধ্য এশিয়া নয়। সেকালের মধ্য এশিয়ার মতো আন্তর্জাতিক চৌরাস্তা নয়। সেকালের মধ্য এশিয়ার মতো একটি চৌরাস্তা হচ্ছে একালের পশ্চিম ইউরোপ। সেখানেই চীনের সঙ্গে ভারতের মেলামেশার অবাধ সুযোগ জুটবে। ততদূর যারা যাবে না তাদের জন্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর আর হংকং। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রভাষা চারটি। ইংরেজী, চীনা মালয় ও তামিল। সেখানকার চীনাদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিশেষ সদ্ভাব। আর হংকং তো সকলের কাছেই খোলা। যেমন চীনাদের কাছে তেমনি ভারতীয়দের কাছে। তেমনি জাপানীদের কাছে। ইংরেজদের তো কথাই নেই। মেলামেশার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল স্থান হচ্ছে হংকং। চীনের ভিতরের খবর সেখানে বসেই পাওয়া সহজ। আর সেখানকার সংস্কৃতিও চীনা সংস্কৃতি।

তিব্বত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার জন্যে বেদনাবোধ স্বাভাবিক। কিন্তু তার নাগরিকদের বিপদে আপদে আশ্রয় দেওয়া এক কথা, আর তারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এই স্বীকৃতি দেওয়া অন্য কথা। এমনতর স্বীকৃতি এখন পর্যন্ত অপর কোন রাষ্ট্র দেয়নি। এমন কি চীনের পরম শত্রু তাওয়ানও না। এই প্রশ্নে কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্ট একমত। আমরাই যদি তিব্বতের একমাত্র রক্ষক হই তবে সকলেই ভাববে যে আমাদের নিশ্চয়ই একটা গোপনীয় আভসন্ধি আছে। সেটা তিব্বতের স্বার্থে নয়, আত্মস্বার্থে। দুনিয়ায় আত্মস্বার্থ কার নেই? কিন্তু যাদের তেমন স্বার্থ আছে তারা যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে তোড়জোড় করে, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি পাতায়, সামরিক চুক্তিপত্রে সই করে। অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির ফলে বিদেশের মাটিতে লড়বার জন্যে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য থাকে। এর নাম গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা নয়।

কাগজে কলমে না হলেও কার্যত চীন ম্যাকমেইন লাইন মেনে নিয়েছে। নইলে নেফা থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যেত না। সেটা যে চাপে পড়ে করেছিল তা নয়। করেছিল স্বেচ্ছায়। উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে জানান দেওয়া যে আইন অনুসারে এলাকাটা চীনদেশের তিব্বত অঞ্চলের সামিল। কারণ ম্যাকমেইন লাইন চীনের লিখিত সম্মতি পায়নি। আমার মনে হয় ম্যাকমেইন লাইন নিয়ে চীন আর ভারতকে ঘাঁটাবে না, ভারত যদি আকসায় চীন নিয়ে চীনকে আর না ঘাঁটায়। দুই প্রান্তেই স্থিতাবস্থা বলবৎ থাকবে। দুই পক্ষ যখন স্থিতাবস্থায় বিশ্বাস রাখতে পারবে তখন ধাপে ধাপে সীমান্ত থেকে সৈন্য সামন্ত সরাতেও পারবে। চাই পরস্পরের উপর বিশ্বাস।

চীন ও ভারত কোনদিনই অহি-নকুল ছিল না। প্রবল পরাক্রান্ত চীন সম্রাটরাও ভারত আক্রমণের কথা চিন্তা করেন নি। ভারতের গৌরবের যুগে ভারত পাঠিয়েছিল ধর্মপ্রচারক ও সংস্কৃতির বাহক। বাণিজ্যপোতও যাতায়াত করত। কিন্তু এমন কোন স্বার্থের বিরোধ ছিল না যার জন্যে যুদ্ধে নামতে হতো। তা হলে আজকের দিনে হঠাৎ এই দুই প্রাচীন দেশ সংঘর্ষের পথ ধরতে গেল কেন? হেতুটা কি কমিউনিজম প্রচার বনাম কমিউনিজম বিরোধ। কারো কারো মতে বিরোধের হেতু মতবাদঘটিত। তা হলে তো রুশ-চীন ভাই ভাই হতো। পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার শানাত না। চীন হাজার চেষ্টা করলেও ভারতকে পুরোপুরি গ্রাস করতে বা লাল করতে পারত না। সেটা কতক লোকের কষ্ট কল্পনা। ভারতও যে কমিউনিজমের ঘোরতর শত্রু তাও নয়। প্রমাণ রাশিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুসম্পর্ক সম্ভব ও সঙ্গত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

প্রাপ্তি ও সুপ্তি

সুনীল চক্রবর্তী

থানার ও, সি, গগন দত্তর মন মেজাজটা নানা কারণে খিঁচড়ে রয়েছে। তার একমাত্র ছেলে শান্তনু আজ এক বছর ধরে নিরুদ্দেশ। কোথাও তার হদিশ মেলানো যাচ্ছে না। গোপনে গোপনে তিনি অনেক খোঁজাখুজি করেছেন, এমন কি মিসিং স্কোয়াডের উপর ভার দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান করা গেলনা। আর এই খোঁজ না পাওয়ার জন্যে ছেলের জন্যে উন্মাদ প্রায় তাঁর স্ত্রী কল্যাণী দেবী দায়ী করছেন গগন দত্তকেই। এই নিয়ে ঝগড়া করে তিনি আজ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। যাবার সময় তাঁকে শাসিয়ে গেছেন—সাতদিনের মধ্যে যদি ছেলেকে খুঁজে এনে না দিতে পারেন—তাহলে তাঁর স্ত্রী তাকে ডিভোর্স করবেন। অবিশ্যি ডিভোর্সের ফলে স্ত্রীর অধিকার বাড়াবার জন্যে গগন দত্ত চিন্তিত নন মোটেই। কিন্তু তার ফলে তাঁর শাসালো শ্বশুর বিনায়ক তালুকদারের সম্পত্তিটা যে হাত ছাড়া হয়ে যাবে চিন্তা সেই কারণেই। কারণ শ্বশুর-মশাই'র সন্তানের মধ্যে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে কল্যাণী আর ছোট মেয়ে ইন্দ্রানী। তার ভাগের আধেক পেলেও—দুলাখ টাকার সম্পত্তি তো হবেই। পথও প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে। শাশুড়ী গতবার টেসে গেছেন; এখন শ্বশুর কাৎ হলেই হয়। কিন্তু সত্তর বছর বয়সেও—লোকটা বুক চিতিয়ে চলছেন। সেটাও গগন দত্তের আর এক দুশ্চিন্তা। এসব লোক তো সাধারণতঃ থ্রম্বসিসেই মরেন। কিন্তু থ্রম্বসিস তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁসছে না। যাক গে মরুক গে যাক—এখন আশু কর্তব্য হল স্ত্রীর সঙ্গে একটা ফয়সালা করা। রাউণ্ড থেকে থানায় ফিরে এসেই গগন দত্ত শ্বশুর বাড়িতে ফোন করলেন। সেখানেও এক ফ্যাসাদ। বার পনেরো ডায়াল করে ঘায়েল হয়ে থামবার মুখে একবার শেষ চেষ্টা করলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে সরু গলায় হ্যালো বলে উঠতেই—গগন দত্তর খিঁচে যাওয়া মুখখানাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন—কে ছোট শ্যালিকা নাকি? বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা আবার খিঁচে গেল। সশব্দে ফোনটা রাখতে রাখতে বললেন—রাবিশ।

সামনে বসে থাকা এ এস আই রবীন সোম সভয়ে বললে—কী হল স্যার?

—ফোন করলাম আমার শ্বশুর বাড়িতে। আদর করে বললাম—কে ছোট শ্যালিকা নাকি? ওধার থেকে বলে উঠল—মিরচা কা ভাও কেতনা? যত সব রাবিশ! বালীগঞ্জের ফোন পোস্তায় চলে গেল কী করে?

রবীন ডায়রী পড়তে বললো—হারাইয়া গিয়াছে।

—কে? আমার শালী?

—না। গদাই মল্লিক।

—আবার গদাইটা এলো কোত্থেকে? বলে আবার ডায়াল করতে লাগলেন গগনবাবু।

রবীন বলল—আসেন নি। আসেন নি বলেই তাঁকে খুঁজতে হবে।

তিনের দুই নকাই দত্ত লেনের গদাই মল্লিক হারাইয়া গিয়াছেন।

ফোনটা কানের কাছে ধরে বললেন—গগনবাবু—ওঃ—তা ডায়রীটা করেছে কে?

—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী মল্লিক।

—ওঃ জয়ন্তী মল্লিক—বলে ফোনে কথা বলতে লাগলেন—হ্যাঁ শোন, কী রাগটা একটু কমেছে তো? ঠিক আছে—আমি রাত বারোটা নাগাদ আসছি, দেখি মান ভাঙাতে পারি কিনা—বলেই আঁতকে উঠলেন গগনবাবু—না—না কল্যাণী শোনো শোনো—বলেই রেগে ফোনটা রেখে দিয়ে বললেন—রাবিশ!

রবীন বললে—কী হল স্যার?

—মার্ডার! আমার স্ত্রী গেছেন তার বাপের বাড়ী।

—সে কি—! সেখানে মার্ডার!

—না। আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কিন্তু তোমার কথা শুনে ভুলে বলে ফেলেছি—জয়ন্তী মল্লিকের নাম। রাত বারোটা নাগাদ যাব—। ব্যস—। ঠেলা সামলাও এখন!

—তাহলে কী হবে স্যার?

—কেস আরও জটিল হল। আমারও বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। যে খাণ্ডাত মেয়েছেলে—বলেই খেয়াল হল। ধমক দিয়ে বললেন—আমার ঘরের কথা শোনার তোমার কী দরকার?

—আজ্ঞে মাথাটা কিছু বিকৃত।

—কার?

—গদাই মল্লিকের।

—রাবিশ!

এমন সময় সেপাই বিশু বাই বছরের একটা লোককে নিয়ে এসে বললে—হুজুর—। আসামী বিচ্ছু।

গগন বাবু বললেন—তোমাকে কাকে ধরে আনতে বলেছিলাম?

—মাল পাড়াকা বিছু কো।

—তা ও কোন মালকে ধরে এনেছ?

—ওহি মাল—বিছু কো।

গগন দত্ত বিশুকে জিজ্ঞেস করলেন—ই তোর নাম কী?

—বিশু।

—তোকে কি পাড়ায় কানকাটা বিশু বলে ডাকে?

—না, নাক বোচা বিশু বলে ডাকে।

—কথা বলতে গিয়ে কি তোর মুখ দিয়ে নাল গড়ায়?

—না থুতু ছোটে।

—গাঁট কাটা হিসেবে তুই কি কোনদিন জেল খেটেছিলি?

—আমি না। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর।

—রাবিশ! তোর পিতায় নাম কি দিগম্বর হালুই?

—আজ্ঞে না। ছিরিযুক্ত ঈশ্বর ন্যাংটেশ্বর কাঁটাল।

—ঈশ্বর বলছিস কেন? সে সি মরে গেছে?

—আজ্ঞে না। পিতা মাতা তো সন্তানের কাছে দেবদেবীর সমান। আর দেবদেবীর নামের আগে ঈশ্বর বসার নেয়ম আছে। ঐ যে ছিরি ছির ঈশ্বর শেতলা ঠাকুর—বলে না? সেই রকম আর কি।

সেপাই বললে—লেকেন—যো হি দিগম্বর আছে—ওহি স্যাংটেশ্বর আছে।

—রাবিশ! এ বিশু—সে বিশু নয়। জিংকা বলে গেছে। বুঝলে?

—জী হাঁ!

—একে এক গ্লাস দুধ খাইয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

বিশু বললে—সেই দুধটা এখানেই আনতে বলুন। না হলে ওই সেপাই আবার ঐ দুধের থেকে ভাগ চাইবে স্যার।

—রাবিশ! এই লে যাও।

—চলিয়ে—দুধ পিওবে। বলে সেপাই বিশুকে নিয়ে চলে গেল।

রবীন বললে—স্যার জিংকাটা কে?

—জিংকাকে চেনোনা?

—আমি সবে তো মাত্র চাকরীতে ঢুকেছি। সবাইকে তো চিনি না স্যার।

—চিনবে। জিংকা, লঙ্কা ভোম্বল অনেক আছে, ধীরে ধীরে চিনবে।

এমন সময় সারা গায় নর্দমার পাঁক মাখা দামী সুট পরা মস্ত বড়লোক জয়লাল মিত্র টলতে টলতে এসে ঢুকলেন। তাঁর দু'হাতের আট আঙুলে আটটা বিভিন্ন রত্নখচিত আংটি। বাঁ হাতের মধ্যমা আঙুলে একটা বড় সাইজের হীরে বসানো আংটি। দেখলেই বোঝা যায় মাল খেয়ে জয়লালবাবু বেসামাল হয়ে পড়েছেন। এসে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—এখানকার ও সি কে? আমি ডায়রী দেব।

তাঁকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন গগন দত্ত। জয়লালবাবুর হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতে দিতে বললেন—আপনি আগে বসুন স্যার, আমিই ও, সি, গগন দত্ত। কিন্তু আপনার এই রকম দশা কে করল? সারা গায়ে নর্দমার পাঁক। কী বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে।

হঠাৎ জয়লাল মিত্তির ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—আবার মুখ নেড়ে কথা বলছেন। কী উৎপাটন করছেন এখানে বসে বসে? গুলি করতে পারেন না—মিসায় দিতে পারেন না—?

কেঁচোর মত হয়ে গিয়ে বললেন গগন দত্ত—আজ্ঞে সবই পারি স্যার। কিন্তু কে আপনাকে কী করেছে না জানতে পারলে কাকেই বা গুলি করব—আর কাকেই বা মিসায় দেব?

—ঐ নর্দমাগুলোকে। শালা দিনের বেলা পড়ে থাকে রাস্তার পাশটতে আর রাত হলেই উঠে আসে রাস্তার মধ্যিখানে?

ভদ্দর লোকদের রাস্তা দিয়ে চলবার উপায় নেই।

রবীন হেসে ফেলল। গগন দত্ত বলে উঠলেন—রাবিশ।

জয়লাল বললেন—কে?

—ঐ নর্দমাগুলো, আচ্ছা আমি ওদের শায়েস্তা করে দেব স্যার।

—তাই দিও। বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একশ টাকার কিছু নোট দলা পাকিয়ে টেবিলের উপর ছুড়ে দিয়ে বললেন—নাও—, পেট ভরে মাল খেও। রবীন তখনও হাসছে দেখে বললেন—কিন্তু ইউ নট লাফ—। জয়লাল মিত্তির কাউকে পরোয়া করে না—এমন কি নর্দমাকেও না। বলতে বলতে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

গগন দত্ত টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসতেই রবীন হেসে বললেন—ভদ্রলোক কিন্তু ভাল ইংরেজী বলেন।

—রাবিশ। ইংরেজী না বলতে পারলে হবে কি এক কথায় কোটি টাকা বের করে দিতে পারেন। ঐ জয়লাল মিত্তির তা জানো? কি যে সে লোক। পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করে সেদিন উনি মেয়ের বিয়ে দিলেন। দিল্লী থেকে পর্যন্ত তাবড় তাবড় লোক এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন।

—ওঃ বুঝতে পেরেছি—। এই জয়লাল মিত্তিরকেই তো ভেজাল বেবী ফুডের জন্যে অনেকদিন আগে আমাদের এক পুলিশ অফসার গ্রেপ্তার করেছিলেন?

—ফলে জয়লাল মিত্তিরের কিচ্ছু করতে পারেন,—উল্টে সেই গোঁয়ার পুলিশ অফসারেরই চাকুরীটি গেল। এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হতেই সচকিত হয়ে উঠলেন গগন দত্ত—। বললেন—এইরে রবীন, তোমার বৌদ বোধ হয় এসে পড়লেন।

—কেন আসার কথা ছিল নাকি স্যার?

—না। কিন্তু আমার মুখ থেকে জয়ন্তী মল্লিকের নাম শুনেছেন না—? তাই আমাকে পালিশ করতে—বলেই ধমক দিয়ে উঠলেন—আবার তুমি আমার ঘরের কথা—

—কই শুনি তো স্যার।

—খবরদার শুনবে না।

—আপনি বৌদকে খুব ভয় পান—তাই না স্যার?

—তুমি বিয়ে করেছ?

—না।

—শোনো, বড় বড় শিকারী বাঘের

মুখোমুখি হতে ভয় পায় না। কিন্তু স্ত্রীর সামনে যেতে তাঁদের বুক কাঁপে। জজরা কোর্টে মামলার চুল চেরা বিচার করে আসামীদের সাজা দেন—কিন্তু বউয়ের কাছে গিয়ে নিজেই স্বামী না হয়ে আসামী হয়ে থাকেন।

হঠাৎ এই সময় ফোন এল। গগনবাবু ধরে বললেন—হ্যালো—ও, সি, গগন দত্ত কথা বলছি। এ্যা নমস্কার স্যার নমস্কার। আচ্ছা—ধরছি—।' ফোনের মাউথ্‌পীচটা হাত দিয়ে ঢেকে বললেন—রবীন—নগেন সেনকে চেনো ? এম, পি ?

রবীন বললেন—ও:—কয়েক বছর আগে যাঁর টুল্‌স্ কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়ে ছিল। প্রায় দশ বারোজন শ্রমিক মারা গিয়েছিল ? তখন আমি ছাত্র ছিলাম।

—হ্যাঁ।

—উনিই জনসেবক হবার উপযুক্ত।

—রাবিশ। দেখো রবীন তুমি আমার বন্ধুর ছেলে বলে একটু স্নেহের চোখে দেখ তাই—এমন সময় কোয়ার্টার থেকে ফোন এলো। গগনবাবু উঠলেন।

কোয়ার্টারে দুরু দুরু বুকে ঢুকতেই গগন দত্তর উপর বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্ত্রী কল্যাণী দেবী। বললেন—কী—খোকার কোনো খোঁজ পেলে ?

—না এখনও—।

—তা পারবে কেন ? কোথাকার কে জয়ন্তী মল্লকের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করবে না ছেলের খোঁজ করবে ? না হলে যে চোর রাতে লুকিয়ে চুরি করে—দিনের বেলা তাকে তোমরা খুঁজে বার করে ধরে আনো—আর তুমি খুঁজে পাচ্ছ না তোমার ছেলেকে, এও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে ? এদিকে আমি দিন রাত পাগলের মত করছি। কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছি না। দিনরাত চোখের জলে ভাসছি। খোকা যা যা খেতে ভালবাসে আমি রোজ রান্না করে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি। ভাবি এই বুঝি খোকা এসে মা বলে ডাকবে। বলবে—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা খেতে দাও। আজ ত খোকার আমার জন্মদিন। এই দিনে আমি কত কী করি। আর সেই খোকা—আর বলতে পারলেন না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

গগন দত্ত এতক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করছিলেন। এবার বললাম, কল্যাণী কল্যাণী—শোনো শোনো, আমি তো চেষ্টা করছি। ভুলে যাচ্ছ কেন। খোকাতো তোমার একার নয় সে তো আমারও ছেলে।

—কিন্তু এক জন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার হয়ে সেই ছেলেকে তুমি খুঁজে আনতে পারলে না অথচ আমি একজন মেয়েছেলে হয়ে তার খোঁজ—বলেই চমকে উঠে নিজের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরলেন কল্যাণী দেবী। বললাম এ আমি কী করলাম—। এ আমি কী করলাম—।

অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন গগন দত্ত—খোকার খোঁজ পেয়েছ ? বলো—বলো—সে কোথায় আছে ?

দৃঢ় স্বরে বললেন কল্যাণী দেবী—না, বলব না। যে ছেলেটিকে দিয়ে খোকা আমাকে দেখা করবার জন্যে খবর পাঠিয়েছে, সে তোমাকে বলতে নিষেধ করেছে।

—কেন—কেন—নিষেধ করেছে ?

—হয়তো তুমি খোকাকে নকশাল বলে ধরিয়ে দেবে।

—আমি ধরিয়ে দেব আমার ছেলেকে ? তুমি কি বলছ কল্যাণী।

—তোমরা সব পারো। তোমার বাবার কথা শুনেছি—বৃটিশ আমলে নিজের ছোট ভাইকে চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে এনে গোপনে তার বালিশের তলায় রিভলবার রেখে বিপ্লবী বলে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, আর এই করে করে বাবা সামান্য একজন কনষ্টেবল থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার পর্যন্ত হয়েছিলেন। আর কাকাও সেই সুবাদে স্বাধীনতার পর কেন্দ্র থেকে লাখ দুই লোন বাগিয়ে কারখানা করেছেন। তাম্রপত্র পেয়েছেন। রাজনৈতিক পেনসন পাচ্ছেন।

তাই বলছ—তুমিও হয়তো তোমার নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিয়ে পুলিশ কমিশনার হবার বাসনা করেছ। যাক গে শোনো, আমি এসেছি, খোকার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যেতে। আমি আর তোমার এখানে থাকব না।

—তুমি এ কি বলছ কল্যাণী ?

—হ্যাঁ, তোমরা রোজ সব দুধের বাচ্চাদের ধরে ধরে এনে যখন তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করো, তখন তাদের আর্তনাদগুলো আমার বুকে এসে ধাক্কা খায়, আর আমার খোকার মুখখানা বার বার মনে পড়ে যায়।

এমন সময় ফোন এল। বিরক্তির সঙ্গে বললেন গগন দত্ত রাবিশ। এখানেও নিস্তার নেই। বলে ফোন বললেন যাচ্ছি। হ্যাঁ দেখবেন ওরা কিন্তু ওয়েল আর্মড থাকে। দেখা মাত্র গুলি চালাবেন। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

আকুল ভাবে বললেন কল্যাণী দেবী—ওগো আবার কার মায়ের কোল খালি করতে যাচ্ছ। ওগো—মেরোনা মেরোনা, তাহলে আমার খোকা আর ফিরে আসবে না।

গগন দত্ত বললেন—শোনো কল্যাণী শোনো, এই স্বপন রায় অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে আনবই। ফিরিয়ে আনবই। বলতে বলতে ত্রস্তে বেরিয়ে গেলেন।

পর মুহূর্তে এসে ঢুকলেন গগন দত্ত, সঙ্গে রবীন। ঢুকেই টর্চ জ্বেলেই চমকে বলে উঠলেন একি ! কী করেছেন ?

পুলিশ আফসারটি বললেন—এই সেই স্বপন রায়।

—নো ! বলে চেঁচিয়ে উঠেই জড়িয়ে ধরলেন স্বপন রায়ের মাটিতে পড়ে থাকা শবদেহটাকে। আকুল ভাবে বলতে লাগলেন—শান্তনু, খোকা, শান্তনু—আমার খোকা। ওরে বাড়ি যাবি নি ? আমি যে তোর মাকে কথা দিয়েছি তোকে তার কোলে ফিরিয়ে দেব। বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

হঠাৎ হেসে উঠল রবীন। গগন চকিতে রবীনের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—রবীন তুমি হাসছ ?

রবীন বললে—হাসছি, আপনার করুণ অবস্থা দেখে স্যার। আবার কাঁদছিও ওই তরুণ তাজা প্রাণটার এই অপচয় দেখে।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ : বামপন্থীদের ভূমিকা

কুমুদ দাশগুপ্ত

বামপন্থীদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ অনেকেই করে থাকেন যে জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা তেমন কোন সংগ্রাম করেনি। এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে গোপন সমঝোতার চেষ্টা করেছে কোন কোন বামপন্থীদল—এ ধরনের একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারও আছে।

সত্যিই কি তাই? তাহলে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীদের এই বিপুল জয়লাভ সম্ভব হলো কি করে? বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল সি পি আই (এম) এর দাবি যে জরুরী অবস্থার মধ্যেও তাদের নেতৃত্বে বামপন্থীরা জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংগ্রাম করে জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলেছেন। নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। বামপন্থীদের এই দাবিও কি সত্যি, না দুটো বক্তব্যই আংশিক সত্য? কিংবা দুটো বক্তব্যই আংশিক অসত্য?

এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সি পি আইকে বাদ রাখছি। কারণ কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস হঠানোর প্রশ্নে সি পি আই'র কোনো ভূমিকা নাই। সি পি আই সত্য সত্যই বামপন্থী কিনা তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে এটুকু বল্লেই যথেষ্ট ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে যখন কংগ্রেস প্রায় ফ্যাসিস্ট চেহারা নিয়ে অবতীর্ণ তখন সি পি আই এর মতে কংগ্রেসই ছিল প্রতি বিপ্লবী। কংগ্রেস বিরোধীদের তারা পুরোপুরি ফাসিস্ট না বল্লেও প্রতি বিপ্লবী আখ্যা দিয়েছে। কংগ্রেসকে টিকিয়ে রাখাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—অবশ্য যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেসী শাসনের অংশীদার তারা হতে চেয়েছে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনের পরিবেশ ১৯৭০ সাল থেকেই তৈরী করা হতে থাকে। ১৯৭১ সালের নির্বাচন থেকেই তা বোঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু বামপন্থীরা সে বিষয়ে সতর্ক হন নি। তাই ১৯৭২ সালের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বামপন্থীরা আশা করেছিলেন যে তাঁরাই জিতবেন। তা ছাড়া যুক্তফ্রন্টের আমলে বামপন্থীদের ভূমিকার ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তদের একাংশ যে বামপন্থীদের সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল সে সত্যটা উপলব্ধি করা হয়নি। সব চেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করানোর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান বিজয় যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ইন্দিরার বিপুল মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে সে দিকেও নজর দেয়া হয়নি।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে কারচুপি আর সন্ত্রাস জয়ী হলো। সরকারী বেসরকারী সন্ত্রাস কায়েম হয়ে রইলো বামপন্থী অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলায়।

নৃশংসতম অত্যাচার শুরু হলো বামপন্থীদের উপর বিশেষ করে বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত দল সি পি আই (এম) এর উপর। আঞ্চলিক ভিত্তিতে আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লককেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চল্লো। একই সাথে আক্রমণ করা হলো শ্রমিক কৃষক সংগঠনের উপর। নিম্নবিত্ত চাকুরিজীবীরা দিশেহারা হয়ে কংগ্রেস শিবিরের পাশে জড়ো হয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। বামপন্থীদের সবচেয়ে নির্ভরশীল যে ছাত্র ও যুবশক্তি ছিল তাদের মস্তানবাজী আর সুবিধাবাদের দিকে আকৃষ্ট করার কংগ্রেসী পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হলো।

বামপন্থীরা তখন আত্মরক্ষায় মন দিয়েছে। আক্রমণ করে আত্মরক্ষার পথে না গিয়ে তাঁরা পিছু হঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। সাজানো বিধানসভা বয়কট করা হলো কিন্তু পাল্টা কোন পথের নিশানা দিয়ে জনগনকে সংগঠিত করার চেষ্টা হলো না। ফলে বামপন্থী শিবিরে হতাশা আর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া গেল। বামপন্থীরা অনেকটা বিবৃতির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসী শাসনের স্বরূপ উদঘাটিত হতে লাগলো জনসাধারণের মধ্যে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী যারা কংগ্রেসের উপর ভরসা করেছিল তাদের মোহভঙ্গ হতে লাগলো। সারা দেশ জুড়ে জনগণের মধ্যে দেখা দিলো অসন্তোষ। তখনো কিন্তু বামপন্থীরা নিজেদের সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে এই অসন্তোষকে ব্যাপকভাবে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করলো না।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সঙ্কট

বেড়ে উঠতে লাগলো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ছাঁটাই আর শৃঙ্খলাহীনতার রাজত্ব তখন স্থায়ী রূপ পেয়ে বসেছে। জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ। সি পি আই(এম) আর এস পি-র মত বামপন্থীদলের নেতৃত্ব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করে বল্লেন, সঙ্কটের চাপে পর্যুদস্ত শাসকশ্রেণীকে বাঁচার জন্য এখন আরো উগ্র একনায়কত্বের পথ গ্রহণ করতে হবে। তার আভাস স্পষ্ট। এই একনায়কত্ব তথা আধা ফ্যাসিবাদকে রোখার জন্য সমস্ত গনতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত হয়ে সংগ্রামের আহ্বানও জানানো হলো। কিন্তু সবটাই তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হলো। এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে কর্মসূচীর প্রয়োজন তার দেখা পাওয়া গেল না। আর এস পি'র মত দল কর্মসূচীও গ্রহণ করলো কিন্তু সেই কর্মসূচীকে নিজ দলের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যতটা সম্ভব ততটাও কাজে রূপায়িত করা গেল না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। নগ্ন রেষারেষিতে কংগ্রেস নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একদিকে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ আর একদিকে শাসকদল আত্মদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ—এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কংগ্রেস সরকার ফ্যাসিস্ট শক্তি হিসাবে প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এত সব জানা সত্ত্বেও প্রকাশ্য আর গোপন আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিক নির্দেশকে বামপন্থীরা সঠিকভাবে অনুসরণ করলেন না। বরং সি পি আই (এম)-এর মত সংগঠিত বামপন্থী দলের নেতাদের একাংশ আশা করতে লাগলেন আত্মদ্বন্দ্বে কংগ্রেস ভেঙে পড়বে। তাঁরা আশায় দিন গুনতে লাগলেন। কঠোর অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কঠোরতর সংগ্রাম করার পথ তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করেও কার্যতঃ গ্রহণ না করায় বামপন্থী দলগুলির ক্যাডারদের মধ্যে হতাশার আবহাওয়া সঞ্চারিত হতে লাগলো।

এই সময়ে বামপন্থীরা কিছুই করে নি বল্লে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কেবল কোন কোন শিল্পে, বিশেষ বিশেষ কারখানায়, কোন কোন গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু আন্দোলন সংগঠিত করা হোলো। সেই আন্দোলনের উপর বর্বর আঘাত আসা সত্ত্বেও কর্মীরা দমে নি। কিন্তু এই সব আন্দোলনকে এলাকা ভিত্তিক স্তর থেকে সম্প্রসারিত করে রাজ্য স্তরে সঞ্চালিত করার কোনো প্রয়াস দেখা গেল না।

১৯৭৪ সালে একটি সুযোগ এলো। রেল ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে রেল শ্রমিকেরা একটা মরণপণ আন্দোলনে নেমে পড়লো। সারা দেশে আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা বামপন্থী নেতৃত্বে আন্দোলনে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সার্বিক রাজনৈতিক আন্দোলন করার যে সুযোগ সৃষ্টি হলো বামপন্থীরা তা গ্রহণ করতে পারলেন না। রাজ্য সরকারী কর্মচারী বেসরকারী সংস্থা, কল কারখানা, এমন কি গ্রামাঞ্চলের কৃষকরাও রেল ধর্মঘটের পরিবেশের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমে পড়ে শাসক শক্তির মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে পারতেন না। কিন্তু বামপন্থীদের একটা বড় অংশই রেল ধর্মঘটকে ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের আওতার বাইরে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত করার পথে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া দূরের কথা, বাধাই সৃষ্টি করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের এই সুযোগ নিয়ে সংগ্রাম করাটা মূল সংগ্রামের সাথে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে অনেকটা সুবিধাবাদের আকারে দেখা দিল। ফলে দু'দিনেই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা আন্দোলন থেকে পিছু হঠলেন। ফলে রেলকর্মীদের আন্দোলন সমৃদ্ধ না হয়ে দুর্বল হলো। ইন্দিরা সরকার জঘণ্য এবং বর্বর আক্রমণ চালিয়ে রেলধর্মটকে ব্যর্থ করলেন। বিরাট একটা সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটলো।

রেল ধর্মঘটের সময় যে শুধু রেল কর্মীদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাই নয়। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের বহু বাম বামপন্থী কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নানা মিথ্যা মামলায় কয়েক হাজার বন্দী।

বন্দীমুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য তখন কিছু কিছু সমাবেশ, সম্মেলন শুরু হয়েছে। বামপন্থীরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এমন কি সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গেও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে একই মঞ্চ থেকে দাবি তুলছে। এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে বামপন্থীরা সম্মিলিত মঞ্চে যোগ দেওয়ার প্রতিবাদে এস ইউ সি বামপন্থী জোট ছেড়ে চলে গেল।

দেশের সার্বিক সঙ্কটের মুখে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুল্লেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গেল। সি পি আই (এম), আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থীদল জয়প্রকাশজীর এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন ভিন্ন মঞ্চ থেকে। জয়প্রকাশজীর আন্দোলন উপলক্ষ্য করে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রকাশ্য রূপ নিতে থাকায় বামপন্থীরা তার সুযোগ গ্রহণ করে। সি পি আই জয়প্রকাশজীকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ইন্দিরাজীর শোষণ ও নির্যাতন কলুষ হস্তকে শক্তিশালী করার ডাক দেয়। বামপন্থীরা জয়প্রকাশজীর সঙ্গে একই আন্দোলন শুরু করায় বামপন্থীদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা আরোপ করা হয়। বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য সমস্ত রাজ্যে কোথাও জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে গঠিত সংঘর্ষ সমিতিতে যুক্ত হয়ে আন্দোলন করে কোথাও বা ভিন্ন মঞ্চ থেকে একই আন্দোলনে মদৎ দেয়।

পশ্চিমবাংলায় জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে একটি মিছিলে এবং সমাবেশে বামপন্থীরা সামিল হয়। জনসাধারণের কাছে কিন্তু দীর্ঘ কয় বৎসর ধরে যে শ্বাসরোধকারী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখানোর সুযোগ এসে যায়। পশ্চিম-

বাংলার গ্রামে, শহরে, শিল্পাঞ্চলে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বেই সমাবেশ ঘটতে থাকে।

সরকারী দল অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে গেলো। পুরানো দিনের বহু কংগ্রেস নেতা সরকারে আর দলের অভ্যন্তরে ইন্দিরাজীর একনায়কতন্ত্রী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধী রাজনৈতিক গগণে মাতৃদেবীর সহায়তায় ধুম ধুম করে জ্বলতে শুরু করেছেন। সঞ্জয়ের নিপীড়ন সর্বতোমুখী। বহু কংগ্রেস নেতাও এই অবস্থা আর বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তারা অনেকেই জয়প্রকাশজীকে গোপনে সমর্থন জানাতে লাগলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল হয়ে গেছে। তবু তিনি পদত্যাগ করলেন না। জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে পদত্যাগের দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে। অসংখ্য সভা মিছিল থেকে দাবি ধ্বনিত হচ্ছে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা এই দাবির সমর্থক। বামপন্থীরা এই সুযোগ ছাড়লেন না। তাঁরাও প্রকাশ্য আন্দোলনে সামিল হলেন।

ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ-বঙ্কুয়া চক্র আর অপেক্ষা করলো না। সি পি আই'র পূর্ণ সম্মতি ছিল। হঠাৎ জারী হলো অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার পর্বের পত্তন ঘটলো।

জেল, গুলি আর নির্যাতনের বন্যা বয়ে গেলো। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রের তাত্ত্বিক চেহারা বাস্তবে রূপ নিতে লাগলো। বামপন্থীরা বিশেষ করে সি পি আই (এম) এবং আর এস পি এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা বরাবরই করে এসেছে। রেল ধর্মঘটের পরে এই দুই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এই অবস্থা আসছে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছে। কিন্তু অবস্থা প্রতিরোধে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। যে সাহসিকতার সঙ্গে এই ধরনের ভয়াবহ অবস্থার মোকাবিলা দেশে দেশে করা হয়েছে বামপন্থী নেতৃত্ব সেই সাহস দেখাতে পারলেন না বলেই জানা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের পরিকল্পনা নেয়া হোল না। বামপন্থী দপ্তরগুলিতে একটা অবসন্নতার চিত্র দেখা দিল। যদিও জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কোন ভুল হলো না।

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। কিছু-কিছু কর্মী ও নেতাদের 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' পাঠানো হোল।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবাংলায় ভিন্ন পথ গ্রহণ করলেন। তিনি বামপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন না। এস এস বি'র ফার্গাণ্ডেজ অনুগামী অংশের কয়েকজন নেতাকে দিল্লীর বিশেষ নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হোলো। সিদ্ধার্থবাবু প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন সম্ভবত সি পি আই'র পরামর্শেই যে সরকার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকেই আঘাত করছে—বামপন্থীদের নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অঘোষিতভাবে শিল্পাঞ্চলে, সরকারী-বেসরকারী কর্মকেন্দ্রে, গ্রামে বামপন্থী অনুগামী ক্যাডারদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হোলো অনেককেই নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে। সিদ্ধার্থ বাবু প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন, রাজনৈতিক কারণে আর এস এস, আনন্দমার্গী প্রভৃতি ছাড়া আর কাকেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। অন্যদিকে যে সমস্ত সুশিক্ষিত কর্মী নীচের তলায় আন্দোলন গড়ে তোলে তাদের আটক করে সমস্ত আন্দোলনের উৎস মুখ বন্ধ করে দেয়ার কৌশল তিনি গ্রহণ করলেন।

জরুরী অবস্থার প্রথম কয়েকদিন জনসাধারণের মধ্যে হতাশা আর প্রচণ্ড ভীতি থাকলেও কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধারণের বিক্ষোভ টের পাওয়া গেল। বামপন্থী নেতৃত্ব কিন্তু অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে তৎপর হলেন না। জরুরী অবস্থার মতো ভয়াবহ পরিবেশে গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে বিক্ষোভ সংগঠিত করার প্রয়াস দেখা দিল না। তত্ত্বগত ভাবে যাই বলা হোক না কেন কিছু কিছু বৃদ্ধ নেতার মধ্যে হতাশাই বেশি করে প্রকট। জরুরী অবস্থায় সবচেয়ে বেশি আঘাত নেমে এসেছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। ঘরোয়া আলোচনায় কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও যে কথা স্বীকার করতেন। কিন্তু সিটু, ইউ টি ইউ সি প্রভৃতি সংগঠনের দু'চারজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার আচার আচরণে সবচেয়ে বেশি হতাশার পরিচয় পাওয়া যায়। আর কিছু হলো না। এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি।

সি পি আই (এম)-এর একজন বিশিষ্ট নেতাকে এই লেখক প্রশ্ন করেছিলেন—অতীতে যেভাবে গোপনে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন সেই পথ এখন নিচ্ছেন না কেন? তিনি সরলভাবে স্বীকার করলেন, গত ত্রিশ বৎসর ধরে বিরাট সভা সমাবেশ সংগঠিত করে তার মাধ্যমেই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করে চলার ফলে এখন ঘরে ঘরে গিয়ে সংগঠিত করার পথ ধরতে কর্মীদের অসুবিধে হচ্ছে। তবে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আন্দোলনের পথ নেয়া হচ্ছে।

বস্তুতঃ সি পি আই (এম), আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দল এই সময়ে গোপনে কর্মী সভা করে জেলায় জেলায় নিজেদের কর্মীদের মনোবল গড়ার দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন। তাছাড়া ছাত্র-যুব প্রভৃতি ফ্রন্টে শরৎ-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং নানা সাংস্কৃতিক কর্মে কর্মীদের নিয়োগ করার কৌশলও নেয়।

বামপন্থীরা জানতেন যে পশ্চিম বাংলায় প্রকাশ্য বা গোপনে সংগঠিত করে সমাবেশ প্রভৃতি ঘটালেও বামপন্থীদের উপর সবচেয়ে বেশি নির্যাতন নেমে আসবে। দলের সদস্যশক্তি হারাতে তাঁরা চাননি। এই অতি সতর্ক পদক্ষেপ কতটা কার্যকরী হয়েছে জানি না কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের যে বিপুল শক্তি আর জনসমর্থন ছিল তার উপর ভরসা করে ইন্দিরাশাহী বিরোধী ব্যাপক কোনো আন্দোলনের কর্মসূচী তাদের ছিল না। তবে ১৯৭৬ সালের গোড়া থেকে বামপন্থী কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিছু আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন।

সংবিধান সংশোধন উপলক্ষেও বামপন্থীরা বেশ কয়েকটি সমাবেশ, ঘরোয়া বৈঠক, গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ, পুস্তিকা বিক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করতে পারে।

সংবিধান সংশোধনের পর বামপন্থীরা ধরেই নিয়েছিলেন নির্বাচন হবে না। গোয়েন্দাদের ভুল রিপোর্ট আর আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে ইন্দিরাজী আকস্মিকভাবে নির্বাচন ঘোষণা করায় প্রথমে বামপন্থীমহলে নতুন কোনো উৎসাহের সৃষ্টি হয় নি। জরুরী অবস্থা বজায় রেখে নির্বাচন করলে ১৯৭২ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলেই তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। তবু নির্বাচনে তাঁরা যোগ দেবেন বলে স্থির করে নিয়েছিলেন নিছক প্রচারের সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বয়কটের প্রস্তাবও ওঠে।

এদিকে জয়প্রকাশজী, মোরারজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুক্ত হয়ে এসে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মোর্চা গড়ে তোলেন। দিল্লীতে ত্রিদিব চৌধুরী তাঁদের বোঝাতে গিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন বয়কট করা ভালো। কিন্তু তিনি সেকথা বলতেই পারলেন না—ত্রিদিববাবুকে দেখেই মোরারজী বললেন, এখনো দিল্লীতে বসে। এক্ষুণি কলকাতায় গিয়ে নির্বাচন শুরু করো। বামপন্থীরা আপোলাপ আলোচনা করে নির্বাচনে যোগ দেবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে তাদের ঘোরতর সন্দেহ ছিল। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত জনতা পার্টির প্রভাব কত সীমিত তাও জনতা নেতারা জানতেন। তাই লোকসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট জনতার আঁতাত হতে দেরী হলোনা। নির্বাচনী সংগ্রাম সুরু হল।

অবস্থা একেবারে পাল্টে গেল জগজীবনরাম কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিরোধী শিবিরে যোগ দেওয়ায়। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গেও জনসাধারণের মধ্যে নতুন আলোড়ন দেখা দিল। নির্বাচনী সমাবেশ গুলিতে বিপুল সংখ্যক লোকের যোগদানে অন্যদের উৎসাহ বাড়লো। বৃহৎ কয়েকটি সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণীর শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিনতিতে ও জরুরী অবস্থা কালে ইন্দিরা সিদ্ধার্থ-বড়ুয়া চক্রের হাতে নির্যাতিত হওয়াই বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করে।

পশ্চিম বাংলায় সিদ্ধার্থবাবু চেষ্টা করেও ৭২ সালের কারচুপির পরিকল্পনা সার্থক করতে পারলেন না। প্রথমতঃ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে তা আগে থেকে না বুঝতে পারায় আমলাতন্ত্র পুরোপুরি সিদ্ধার্থ রায়কে মদৎ দিতে রাজী হয়নি আর দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ নিজেরাই ভোটদানের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ভোর থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লাইন দিয়ে ভোটদান এবং জাল ভোটের ক্ষেত্রে নিজেরা সক্রিয় হয়ে বাধাদানের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

লোকসভার নির্বাচনের ফলে ত্রিশ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটলো। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল দেখে জনতা পার্টির পশ্চিম বঙ্গের নেতৃত্ব ধরে নিলেন যে বামপন্থীরা তাদের দৌলতেই পশ্চিমবাংলায় সংখ্যায় ভাল ফল করেছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন বামপন্থীদের সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে আপস করতেই রাজী ছিলেন না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে রাজী হলে ও আসন সমঝোতা নিয়ে অবাস্তব এবং অপমানজনক প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা ভেঙে দিলেন।

বামপন্থীরা অত্যন্ত দ্রুত নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি শেষ করলেন। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল দেখেও কিন্তু তখনো বামপন্থীরা নিশ্চিত ছিলেন না যে তাঁরা জয়লাভ করবেনই। তাই বামপন্থীদের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্তও জনতা পার্টির সঙ্গে আপসের চেষ্টা হয়।

বামপন্থীরা নির্বাচনে নেমে বুঝতে পারলেন যে জনসমর্থন তাদের দিকে। সি পি এম ভাবেনি তাঁরা এককভাবে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। নির্বাচনের দিন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া সর্বত্রই দেখা গেছে যে, অতীত দিনের তুলনায় বামপন্থী কর্মীর সংখ্যা কত কম। বামপন্থী বিরোধী শিবিরের তো অস্তিত্ব ই ছিল না। জনসাধারণ নীরবে এসে ভোট দিয়ে গেছেন। এই নীরবতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপুল জয়লাভ ঘটেছে। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বারংবার জনসাধারণকে শান্ত ও সংযত থাকতে বলেছেন। সবই ঠিক, কিন্তু তা সত্বেও নির্বাচনের এই বিপুল সাফল্যের বাইরে কোনো প্রতিফলন দেখা না যাওয়া অনেকটা অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে মানুষ ইন্দিরাশাহীকে কেন্দ্র থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেস ও জনতাকে হারিয়েছে। বামপন্থীদের উপর তারা আস্থা স্থাপন করেছে। এই আস্থা ইতিবাচক বলে ভুল হবে।

১৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলের বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যতই রটনা হয়ে থাকুক না কেন ঐ সময়ে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীকে বামপন্থীরা যে নতুন জীবনের স্বাদ দিতে পেরেছিল তা তারা আজো ভুলে যায় নি। ইন্দিরা শাহীকে তারা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছে কিন্তু বামপন্থীদের সাথে কি একাত্ম হয়েছে? নির্বাচনকালে এবং তারও পরে জনসাধারণের নিস্পৃহতা কিন্তু সে সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। জনসাধারণ আবার বামপন্থীদের সুযোগও দিয়েছে। কিন্তু এখনও কোথাও জনগণের মধ্যে উৎসাহের আভাস দেখা যায় নি।

বামপন্থীরা বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কঠিনতম পরীক্ষার তারা সম্মুখীন। জনগণের মধ্যেকার এই নিস্পৃহতা কাটিয়ে তুলে সরকারী কর্মকাণ্ড তথা বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত কাজকর্মের মধ্যে তাদের কতটা জড়িয়ে ফেলা যায় তার উপরেই বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তুলনামূলকভাবে একটা সৎ কংগ্রেসী সরকার পরিচালনা করলে বামপন্থীরা জনতার এই নিস্পৃহতা কাটিয়ে তুলতে পারবেন না। সবচেয়ে বড় কথা লোকসভার নির্বাচনই বলুন আর বিধানসভার নির্বাচনই বলুন জনগণের যে বিপুল নীরব সমর্থন ভোটে পাওয়া গেছে তার প্রধান কারণ হোল বামপন্থীদের ঐক্য। এই ঐক্যে চিড় ধরলে জনগণের সক্রিয় সমর্থনকে বজায় রাখা যাবে না।

ষোল বছর বয়সে কলেজে ঢুকে, লজিক ক্লাসে একদিন মহা ফাঁপরে পড়েছিলাম। দি দি ম পি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি কোন উপায়ে চাঁদে একটা ঘণ্টা পাঠিয়ে কোনো প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে সেটা নাড়া যেত, তাহলে কি কোনো শব্দ হত?" আমরা বললাম "না হত না। কারণ চাঁদে বাতাস নেই, শব্দ তরঙ্গ উঠতে পারত না।" দিদিমণি বললেন, 'যদি বাতাস থাকত, তা হলে কি শব্দ হত?' আমরা বললাম হত। কিন্তু শোনা যেত না। কারণ শুনবার কেউ নেই।" দিদিমণি বললেন, "যে জিনিস শোনা যায় না তাকে কি শব্দ বলা চলেনা?" তখন বোকা ছিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছিলাম। এখন শুনি এমন সব শব্দও আছে এত মৃদু কিম্বা এত তীক্ষ্ণ, মানুষের কান যা ধরতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী পারে। চলন্তিকায় 'শব্দ' কথার একটা মানে দেওয়া আছে, 'শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানস।' এতে মন ওঠে না। সুখের বিষয় সঙ্গীত বিলাসীরা ছাড়া শব্দ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। তাঁরাও সঙ্গীত গ্রাহ্য শব্দ নিয়েই মাথা ঘামান। আরো যে লক্ষ-কোটি রকম 'শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানস' আছে তার হিসাব কে রাখে?

তাও রাখে। আকাশবাণী রাখে। তাঁরা ইপ্সিত শব্দ রক্ষা করতে আর অবান্তর শব্দ বিদূরিত করতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে ওঠেন। আকাশ বাণীর সঙ্গে যুক্ত হবার আগে পর্যন্ত শব্দ সম্বন্ধে এতটা সচেতন ছিলাম না। অথচ ছোট বেলা থেকে কান ভরে থাকত শব্দে। পাহাড়ের গায়ে সরল গাছের বন; সেই বনের মধ্যে দিয়ে আট প্রহর বাতাস বইত আর সরল গাছের লম্বা লম্বা পাতার ভেতর থেকে মধুর একটা শোঁ-শোঁ শব্দ হত। মাঝে মাঝে রাতে বৃষ্টি হত। সেই বৃষ্টি আমাদের বাড়ির টিনের ছাদের ফুটো দিয়ে টপ টপ করে ঘরের কাঠের মেঝের ওপর পড়ত। আমার মা সেইখানটাতে একটা এনামেল করা গামলা বসিয়ে দিতেন। অমনি সুর বদলে টুং-টুং করে জলের ফোঁটাগুলো পড়তে আরম্ভ করত। গামলার তলাটা জলে ভরে গেলে মিহি একটা পুপ্ পুপ্ শোনা যেত। বনের মধ্যে ভিজে হুতুম প্যাঁচা ডাকত। দূরে দূরে পাহাড়ীদের গায়ে শীত-লাগা কুকুর কাঁদত। ভোরে আমাদের মোরগ ডাকত। আস্তাবলের কাঠের মেঝেতে বাবার ঘোড়া পা ঠুকত। আরো পরে চিমনিতে আগুন দেওয়া হত; অমনি ধোঁয়া বেরোবার চোঙার ভেতর থেকে গণগণ্-গণগণ্ করে শব্দ হত আর আগুনের শিখা পত্ পত্ করে নড়ত। রোদ উঠলে দাঁড় কাগরা শ্যামপাতি গাছের মগডালে বসে হেঁড়ে গলায় বলত, "অাঁ—আ—ক্। আঁ—আ—ক্। কলকাতার পাতি কাকরা কা—কা করে, সে অনেক পরে শুনেছিলাম।

কান খাড়া করলে বাড়ির পেছনে পাহাড়ে নদীর কল কল করে ছুটে চলার শব্দও শোনা যেত। বৃষ্টির পর দিন জল ফেঁপে ফুলে একশো ঘোড়ার দাপা দাপির মতো শোনাতো। সারা দিন বনে বনে কুকু পাখী ডাকন; সে ডাক কোকিলের ডাকের মতো মিষ্টি; কিন্তু আরো নরম, আরো নম্র, আরো মধুর।

পাহাড়ের ওপরে লুমপারিং গ্রাম; সেখান থেকে ম্যা—ম্যা বলে গোরু ডাকত। ম্যা—অ্যা—অ্যাঃ ম্যা—অ্যা অ্যাঃ করতে করতে মায়ের সঙ্গে ভেড়ার ছানা নেমে আসত। সন্ধ্যায় গির্জার ঘণ্টা বাজত। এই সব শব্দ দিয়ে সারা দিনটা ভরে টৈ টম্বুর হয়ে থাকত। কল থেকে ছড় ছড় করে টিনের বালতিতে জল পড়ত, রান্নাঘরে আমাদের রান্নার লোকটা বাঁশের চোঙা দিয়ে ফুঁ দিয়ে কাঠের জ্বালের আঁচ বাড়াচ্ছে শুনতে পেতাম। ঘসর ঘসর মশলা পেশা হচ্ছে; ছ্যাঁক—ছ্যাঁক—ফোঁস্স্ করে ডালে সম্বরা দেওয়া হচ্ছে। ছাদের তলায় পায়রা ডাকছে। আস্তে আস্তে চাপড়ে চাপড়ে মা খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। ন—মাসে ছ—মাসে রাস্তা দিয়ে হু—উ—স্ করে একটা মোটর গেল, ফট্—ফট্—ফট্ করে মোটর বাইক গেল।

এ সমস্ত শব্দ দিয়েই কালের শোভা যাত্রা ভরা হতে থাকে, কিন্তু কেউ তার ধার ধারে না। জীবনের শব্দ দিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে? শব্দ ধরে রাখতে হলে শুধু মানুষের তৈরী আওয়াজ, যেমন গান বাজনার শব্দ ধরা হয়; নাটক-প্রহসনের শব্দও ধরা হয়, ঐ সব নাটকে শব্দ সংযোজনা করবার জন্য কয়েকটা বিদেশী রেকর্ড আনিয়ে রেখেছেন আকাশবাণী। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ঐ সব কাকের ডাক, কুকুরের বুক্কন, সেকেলে মোটরে স্টার্ট দেবার ও থামাবার শব্দ, বন্যার জলের আওয়াজ, নিবিষ্ট-চিত্তে ওঁরা ব্যবহার করে আসছেন। জীবনের শব্দ দিয়ে কি হবে? তা-ছাড়া বড় হাঙ্গামা। হাঙ্গামার চাইতে হতাশা বেশী। শব্দ ধরে রাখতে হলে রেকর্ড করার যন্ত্র চাই, সে আর হাতের কাছে পাচ্ছি কোথায়? আবার রেকর্ডে সত্যিকার বৃষ্টি পড়া ঝুপ-ঝুপ না করে টপ্ টপ্

করে। টিনের বালতিতে মটরের দানা ফেলতে হয়। ছোটবেলাকার ঐ সব শব্দগুলো তো গেছেই—তুঁত গাছে শুঁয়ো পোকাদের পাতা চিবুবার শব্দ পর্যন্ত শুনেছি—এখনো প্রতিদিন কত ভালো ভালো শব্দ স্রেফ নষ্ট হচ্ছে, ভাবলেও দুঃখ হয়। এই দুঃখটা অবিশ্যি নিতান্ত নিষ্কাম নয়। ভালো শব্দ ধরে রাখার উদ্দেশ্যই হলো ভবিষ্যতে তার সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ মানুষের কোনো কু ক্রম কাজে সত্যিকার শব্দের স্থানে প্রয়োগ করবার জন্যে। নইলে কে আর বসে বসে পৃথিবীর জীবনযাত্রার শব্দ শুনছে?

১৯৫৬ সালে আকাশবাণীতে প্রযোজনার কাজ নিলাম। সেও প্রায় ২২ বছর হল, তারও আগে ২৮ বছর ধরে বেতারের কাজ হচ্ছিল। অনুরাগী কয়েকজন তখনো ছিলেন। ছোটদের আর মহিলাদের অনুষ্ঠানের ভার দেওয়া হল আমাকে। হালচাল বুঝে নিতে কিছু দিন সময় নিল। আমরা ৬৭ জন প্রযোজক নিযুক্ত হয়েছিলাম। সকলের আকাশবাণীর বাইরে কিছু নামডাক ছিল। তবু বেশির ভাগ সহকর্মীর কাছে আমাদের আগমন যে শুধু অবাঞ্ছিত তা নয়, অসহ্যও বটে —একথা বুঝতে আমাদের বেশী সময় লাগে নি। তার ন্যায্য কারণও ছিল। অতীতে পারদর্শী কর্মীদের মাথার ওপরে আমাদের চাপানো হয়েছিল। উৎসাহের চোটে তো ঢুকে পড়েছিলাম। এখন বুঝি আরেকবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। প্রবীণ শিল্পী সাহিত্যিক দের অমান হুট করে আকাশবাণীর কর্মচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করা ভুল। অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করেই আমরা হুড়মুড় করে চাকরি নিয়ে বসলাম। তবে শিল্পী সাহিত্যিকরা কবে আর ঠিক কাজ করেছে? আমার নিজের বেলার আরেকটা কারণও ছিল। আমার স্বামী কেবলি আমাকে বলতেন, 'তা যতই ফার্স্ট ক্লাস্ ফার্স্ট গোল্ড মেডেলিস্ট হও আর সাহিত্যিক বলে নাম কেনো, চাকরির বাজারে গেলে দেখবে কেউ তোমাকে তিনশো টাকাও মাইনে দেবে না।" বলা বাহুল্য, শুনে রাগে পিত্ত জ্বলে যেত। কাজেই এঁরা যখন বললেন, "পাঁচশো টাকা দেব।" ভাবলাম এবার ঐ লোকটির চোখ টাঁরা হয়ে যাবে। পরে কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম আধা মুখ্যু চ্যাংড়া খোকা কর্মচারীরাও আমার থেকে বেশী মাইনে পায়। যারা বেশী টাকা পায়, তারা সহজে কম টাকা-পানে ওয়ালাদের শ্রদ্ধা করে না। আমাদেরও সেই দশা হল। কেউ ভেগে গেল। কেউ ছেড়ে গেল। আর আমার মতো কেউ কেউ সাত বছর ধরে কামড়ে পড়ে রইল এবং শেষ পর্যন্ত অনেক বন্ধু, অনেক স্নেহ-লাভ করল। বিদ্বেষ আর ক'দিন টেকে। বেলায় আনন্দ পেয়েছি আকাশবাণীর কাজ করে। অগুন্তি লোকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞ হলেই তো আর কেল্লা ফতে হয় না। প্রায়ই মনে হত এই এত কাণ্ড করে, অনেকগুলো লোকের অন্ন-সংস্থান ছাড়া আর কি লাভটা হচ্ছে? কার্যকরী দিক থেকে কার কোন্ উপকারটা হচ্ছে? চোখের সামনে দেখতে পেতাম যে বিদ্যার্থীদের জন্য যখন ভালো ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে, বিদ্যার্থীদের ঠিক সেই সময় অনুষ্ঠান শোনা অসম্ভব। বিদ্যালয়গুলোর সহানুভূতি নেই; সহানুভূতি পাবার খুব একটা চেষ্টাও নেই। মহিলাদের জন্য যখন অনুষ্ঠান হয়, মহিলারা তখনো হয় ঘরকন্নার কাজ সেরে উঠতে পারেন নি; কিম্বা যাঁরা পেরেছেন তাঁদের ঘুম পাচ্ছে। মনে আছে আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্তা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার মহিলামহলে বলবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি রাজী হন নি। লিখেছিলেন যে কয়েক জন ঘুম পাওয়া মেয়েমানুষকে বক্তৃতা শোনাবার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। কথাটা মন্দ বলেন নি। সত্যিই তাই হত।

তাছাড়া আমার কেবলি মনে হত বেতারে বঙ্গ সাহিত্য পাচার করার চেষ্টাটা খুব সফল হয় না। একটা নতুন শব্দও শিখলাম। সেটি হল 'কথিকা'। বলা বাহুল্য চলন্তিকায় কিম্বা সাহিত্য সংসদের অভিধানে 'কথিকা' বলে কিছু খুঁজে পেলাম না। মনে হলো প্রয়োজনবোধে কেউ বানিয়েছেন। নতুন শব্দ প্রণয়নের আমি নিন্দা করতে পারি না। আমি নিজে দরকারমতো বাঁকা-চোরা করে শব্দ ব্যবহার করলে, নিন্দুকরা খুশি হন না। তবে একটা মানে থাকা চাই। 'কথিকা' মানে যদি 'ছোট কথা' হয়ে থাকে, তাহলেও বুঝি। তাই হওয়াই উচিত। ৬৭ মিনিটের মধ্যে যে কোনো বিষয়বস্তুর সারমর্ম সরস করে বলতে হবে। বলা বাহুল্য খুব শক্ত কাজ। অনেক সময়ই আসল কথাটি বাদ পড়ে যায়। তবে কেউ কেউ এত চমৎকার বলেন যে মন খুশি হয়ে যায়। বেশীর ভাগই বলেন না।

ছোটদের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাটা আমাকে তৈরী করতে হত। আমার সঙ্গে কাজ করবার জন্য একজন কর্মচারী থাকতেন। আমার পরিকল্পনা দেখে তিনি চটে কাঁই হতেন। কোথায় ক'জন নামকরা লেখকদের, কিম্বা মাষ্টার মশাইদের আনয়ে দশ মিনিট ধরে কাগজ পড়িয়ে ছেড়ে দিলেই হত, তা নয়। কি, না 'ফীচার' হবে। যত রাজ্যের হাঙ্গামার ব্যাপার। হাঙ্গামা মানে রেকর্ডার চাই, রেকর্ড করবার লোক চাই, গাড়ি চাই, ড্রাইভার চাই, দায়ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন একজন কর্মচারী চাই, যিনি দেখবেন কোনো জিনিসের অপব্যবহার না হয়। অর্থাৎ উক্ত কর্মচারীটিকে চাই। অবশেষে যখন তাঁকে বাদ দিয়ে নানা জায়গায় যাওয়া ধরলাম, তখন তাঁর উৎসাহ দেখে কে। তাঁকে বাদ দিয়ে এমন একজন মানুষকে পেলাম, যার নাম না করলে মহা অন্যায় হবে। তিনি হলেন শ্রীঅরন্ত চৌধুরী। পরে ইনি আকাশবাণী ছেড়ে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে ওয়াশিংটনে ভয়েস্ অফ আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠানের ভার নিয়ে কয়েক বছর ছিলেন। গল্প লেখা, স্কিপ্ট লেখা, নাটক লেখা—অর্থাৎ বেতারোপযোগী সাহিত্যকর্ম ছাড়া বেতারের কাজ আর যা যা শিখেছিলাম, অরন্ত আমাকে

হাতে ধরে শিখিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ১৯৬৩ সালে বেতার ছাড়বার পর, অনভ্যাসের ফলে হাত নিশ্চয় আবার আনাড়ি হয়ে গেছে। তাছাড়া এখন অন্য রকম যন্ত্রপাতির আমদানি হওয়াতে, অতখানি হাত লাগাতেও হয় না। আমার ঐ বিদ্যেটাও মাঠে মারা গেছে।

আজকাল দেখছি রেকর্ডিং এর মান অনেক উঁচু হয়েছে, কিন্তু মানবিক দিকটা ছাঁটাই হয়ে, কেমন একটা যান্ত্রিক ভাব এসে যাচ্ছে। ভুলের সুযোগও থাকছে না বটে, কিন্তু প্রয়োজনের স্বকীয়তার সুবিধাও কমে গেছে। এখন দেখি 'কথিকার'-ই জয় জয়কার। তবে সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে এখনো মানবিক দিকটা রক্ষা করা হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রশ্নগুলো সব এক ধরনের। ছেপেটেপে রাখে কি না কে জানে। তাছাড়া যাদের কিছু বলবার নেই, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কতটুকু সার্থকতা, বিশেষ বিভাগের প্রচার কার্য ছাড়া ?

জয়ন্তর সঙ্গে মাছের চাষ রেকর্ড করেছিলাম। সঙ্গে কয়েকজন ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। নৌকো করে চাষের জায়গায় ঘুরেছিলাম। খেপলা জাল, বেড়া জাল ইত্যাদি দিয়ে মাছধরা দেখেছিলাম। জেলেদের কথা-বার্তা রেকর্ড করা হয়েছিল। দাঁড় বাওয়ার শব্দ, মাঝ জালের মধ্যে মাছের আকুলি বিকুলির শব্দ। সে-রেকর্ড এঁরা রাখেন নি। আর কেউ ও রকম যাবেনও না। তাছাড়া মাছের চাষ তুলে দিয়ে ওখানে শহর পওন হয়েছে। ও শব্দগুলোও নষ্ট হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। নন্দ-বাবুর সঙ্গে, ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে, তেজেস সেনের সঙ্গে তাঁদের প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমনের কথা রেকর্ড করা হয়েছিল। মনে আছে 'সাক্ষাৎ-কৃত' ও সাক্ষাৎকারীর উভয়ের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। সেগুলি নাকি হারিয়ে গেছে। আর তো পাবার নয়। কোন জিনিস অমূল্য আর কিসের মূল্য নেই, আকাশবাণীকে কে শেখাবে ? মূল্য মনে না করলে মূল্য কিসের ?

মাঝে মাঝে রাগ করতাম। অধ্যক্ষ মশাইকে বলতাম : "বড় গায়ক বিশেষতঃ গায়িকা, নাম করা অভিনেতা আর রাজনৈতিক নেতা এলে আপনারা দুন্দুভি বাজান ; কিন্তু কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী এসে কতক্ষণ বসে থাকেন, কেউ তাঁদের পোছে না !" এখন যে দূরদর্শন হয়েছে। তাঁরা যদি দেশের সেরা গুণীদের চেহারা, গলার আওয়াজ, কথা বলা কেমন ধারা, দেশের লোককে না দেখান, তবে অন্য করলেনটা কি ? জীবনযাত্রার সঙ্গে কত-টুকু সম্বন্ধ বেতারের কিম্বা দূরদর্শনের ? আমাদের দেশ কেমনধারা তার কতটুকুই বা জানা যায় ? ভাবি দেশের মানুষদের কতটুকুই বা দাম ? তাই সারা দিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেকর্ড করা একই পুরনো গান বাজাতে হয় ; সরকারী প্রচেষ্টায় জন কল্যাণের প্রাপকদের নাম ধাম আর এর পর কি করবে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

মানুষের লিখিত-পড়িত-শিখিত গলার শব্দগুলোই শুনি আর জীবনের অনন্ত চলার ধ্বনি বাদ পড়ে যায়। তাতে মনে পড়ল জয়ন্ত আর আমি দু'বার শুধু শব্দ দিয়ে দু'টি গল্প বানিয়ে গল্পদাদুর আসরে শুনিয়েছিলাম। শ্রোতাদের বলেছিলাম গল্পটা লিখে পাঠাও। রাশি রাশি সঠিক উত্তর পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। ছোটরা ছাড়া শব্দের মহিমার হিসাব কে রাখে। গার্সটিন প্লেসের সিঁড়ির ওপরকার বড় আলোটা একদিন ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ল। অমন শব্দ জন্মে কখনো শুনিনি। অথচ কোনো কাজে লাগলো না।

রজতজয়ন্তী বর্ষের
অভিনন্দন
বি.গি
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫-১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

জীবনীসাহিত্য প্রসঙ্গে

মণি বাগচি

॥ ১ ॥

গোড়ায় সাধারণভাবে জীবনচরিত সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নিই। জীবনী বা Biography বলতে আমরা ঠিক বুঝি? কয়েক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আমি একটি স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেদিন একজন অধ্যাপক শ্রোতা আমার সেই বক্তৃতাটি খুব মন দিয়ে শোনার পর বলেছিলেন যে, জীবনচরিত সম্পর্কে এতকাল তাঁর কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। বলা বাহুল্য, এদেশে আজো শতকরা নব্বুইজন পাঠকের কাছে জীবনী বিষয়টি দুর্বোধ্য বলে মনে হয় এবং সম্ভবত এই কারণে জীবনী পাঠকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কথা মুখে তাই জীবনীর সংজ্ঞাটা নির্ণয় করা দরকার।

প্রচলিত অর্থে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কাহিনীকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা আর সেই সঙ্গে তার চরিত্রের একটা বিশ্লেষণ দেওয়া, তার ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করা—একেই বলা হয় জীবনচরিত। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হলো না। বাইরের ঘটনাবলীর সঙ্গে অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বেরও প্রতিফলন থাকবে, চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে থাকবে তার মানসিকতার বিশ্লেষণ এবং এরই সমন্বয়ে সম্পূর্ণভাবে, সার্থক ভাবে বিরচিত হয় একটি পূর্ণায়ত জীবনচরিত। আবার একটি জীবনকে তার যুগের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করে তার সমসাময়িকদের কথাও কিছুটা উল্লেখ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এটাও বিচার করে দেখাতে হবে যে, সেই জীবনের কর্ম ও চিন্তা সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করল। সুতরাং তথ্যভূয়িষ্ঠ হওয়াটাই একটি সার্থক জীবনচরিতের একমাত্র পরিচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এর আবেদন আরো গভীরে—সাহিত্যের রসলোকে। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, জীবনচরিত সাহিত্যেরই একটি বিশেষ শাখা; সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। ওদেশে জীবনচরিতকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে একে ফ্যাকালটির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং স্নাতকোত্তর পাঠ্যতালিকায় জীবনচরিত সংক্রান্ত পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট কথা, যার মধ্যে সাহিত্যরসের উৎকর্ষ নেই, মনোবিজ্ঞানের আলোছায়ার খেলা নেই, তা বায়োগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু লিটারারি বায়োগ্রাফি কদাচ নয়। সাহিত্যের দরবারে তেমন রসহীন বস্তুর সমাদর কখনো হয় না, হওয়া উচিত নয়।

আমার এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য ওদেশের তিনজন বিশিষ্ট জীবনী সাহিত্যিক প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন: 'Biography is not only history, it can also be good literature. And in some cases it can even rank with creative literature'. হেসকেথ পিয়ার্সন বলেছেন: 'Biography is the history of the lives of individual man—a truthful record of an individual and composed as a work of art. It is the narrative from birth to death, of one man's life in its outward manifestations and inward workings.'

আঁদ্রে ম্যারো বলেছেন: 'Biography is that type of writing which reveals, in narrative form, the outer and inner experiences of one personality through another. It is the study and presentment of a human character with its contradictions and failures, with its inner conflict of aim and impulse and its outer stuggle between circumstance and temperament. In short, it is the faithful portrait of a soul in its adventures through life.'

জীবনের মধ্য দিয়ে একটি মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্যই হলো প্রকৃত জীবনচরিত—আঁদ্রে ম্যারোর এই কথাটি যেমন অর্থবহ তেমনি সুগভীর। এই জাতীয় আলোখ্য অঙ্কনে যাঁর দক্ষতা যত বেশি সার্থক জীবনচরিত রচনায় তাঁর অধিকার ঠিক সেই পরিমাণে তত বেশি। এবং এর থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জীবনীকার হবার আকাঙ্ক্ষা যিনি রাখবেন তাঁকে সকলের আগে হতে হবে

একজন সাহিত্যিক—বিদগ্ধ ও রসবোদ্ধা সাহিত্যিক। সৃজনী শক্তি সম্পন্ন সাহিত্যিক। এদেশের অধিকাংশ জীবনীকাররা একটি মৌল সত্য বিস্মৃত হন যে, জীবনী রচনার কাজটি প্রকৃত-পক্ষে একটি পুরোদস্তুর সাহিত্যকর্ম। য়ুরোপের যাঁরা খ্যাতনামা জীবনীকার তাঁরা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক। কিন্তু জীবনচরিত রচনার কাজটি কি শুধুই শিল্পকর্ম ? না। লুই মামফোর্ড এই প্রসঙ্গে বলেছেন : 'জীবনী একাধারে বিজ্ঞান ও শিল্প।' কথাটি খাঁটি সত্য। যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে একটি জীবনের বিকাশ ও পরিণতির কাহিনী, তার সংগ্রহ ও ঝাড়াই বছাই এর কাজটা হলো বিজ্ঞানীর কাজ, আর তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে দেওয়ার কাজগুলো শিল্পীর কাজ। এবং এটাই হলো কঠিনতর কাজ।

কাজটা যে কতখানি কঠিন তা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত জীবনীকার এমিল লুডউইগ বলেছেন : 'To re-create bygone scenes and figures, to reanimate with movment, proportion and climax the stubborn facts of a man's or woman's whole existence requires a dramatic sense equal if not superior to that of the playwright or novelist.' অর্থাৎ কারো জীবনের সমগ্র সত্তাকে সেই জীবনের বিভিন্ন পর্বের ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট করে তুলতে হলে জীবনী-কারকে যুগপৎ হতে হবে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও চিত্রকর। জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন রহস্যকেও উদঘাটিত করার দায়িত্ব জীবনীকারের। লিটন স্ট্রেচি তাই বলেছেন, মানুষের বহির্জীবন ও তার অন্তর্জীবনের সামঞ্জস্যবিধান ব্যতি-রেকে কোনো জীবনচরিতই সার্থকতায় পৌঁছতে পারে না, সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। যে মানসিকতা ব্যক্তি মানুষের যাবতীয় আচরণের উৎস, যদি কেউ মনোবিজ্ঞানীর উৎসুক্য নিয়ে সেই মানসিকতার ত্রিবিধস্তর—শারীরিক, মানসিক ও আবেগ প্রবণতা—উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তবেই না আমরা তার ব্যক্তিত্বের নাগাল পাই। জীবনচরিত প্রকৃতপক্ষে সময় ও স্থানের চালচিত্রে সংস্থাপিত একটি ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বেরই ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে সাহিত্যরসের ভিয়ানে চাপানই জীবনী কারের কাজ।

সেই ইতিহাস হবে যতখানি তথ্য-নির্ভর ঠিক সেই পরিমাণে রসসমৃদ্ধ। জীবনচরিতের বিষয়টি আমরা যত গভীরভাবে চিন্তা করি ততই আমরা দেখতে পাই যে, এর মূল কথাই হলো একটি ব্যক্তিত্বের অনুশীলন, অর্থাৎ যাকে বলা হয় 'The study of personality', এবং যে জীবনচরিতের মধ্যে এই বস্তুটি থাকেনা, অতি মনোরম ভাষায় লিখতে হলেও এবং তথ্যভূয়িষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, সেই জীবনচরিত প্রকৃত জীবনচরিত পদবাচ্য বলে গণ্য হতে পারেনা। জীবনীকার যদি কেবলমাত্র কাহিনীকার বা chronicler হন, তাহলে তাঁর প্রয়াসটা পণ্ডশ্রমে পর্য-বসিত হবে—হবে শুধু পাটের বস্তা বাঁধা, তার অধিক কিছু নয়। পাঠক যদি তার নিজের কল্পনায় জীবনীকার বর্ণিত চরিত্রটিকে রক্তমাংসের সজীবতায় প্রত্যক্ষ করতে বা অনুভব করতে না পারে, অথবা সেই জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তার সমগ্র সত্তাকে তার উপলব্ধির বলয়ের মধ্যে আনতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে জীবনী কারের সমস্ত পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হয়েছে।

জীবনচরিত হবে কাহিনীপ্রধান, কারণ কাহিনী হলো এর একটি অপরি-হার্য অঙ্গ। কাহিনীর খুঁটিনাটির ভেতর দিয়েই বর্ণিত বিষয়টি হয়ে উঠবে জীবন্ত lifelike ; কিন্তু জীবনচরিতের যথার্থ মানদণ্ডে সেই কাহিনীর যদি কোন মূল্য থাকতে হয় তাহলে তার ভেতর দিয়ে মানুষটির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ কাহিনী কাহিনীমাত্র হবেনা, তার মধ্য দিয়ে জীবন ও জীবন রহস্য দুইই ব্যাখ্যাত হবে—বিশ্লেষিত হবে নিপুণভাবে। কোনো একটি জীবন চরিত্র যদি শুধু কাহিনীসর্বস্ব হয়, তবে পাঠকদের কাছে তার কোনো চিরায়ত মূল্য থাকতে পারেনা। তাইতো সমর্সেট মম বলেছেন : 'A biography which is merely anecdotal is no biography at all. An anecdote is indispensable, but to have any real biographycal value, an anecdote must reveal the true nature of the man.' এইখানেই স্যামুয়েল জনসনের জীবনীকার জেমস বসওয়েলের কথা আমাদের মনে পড়ে। সর্বযুগের আদর্শ জীবনীকার বসওয়েল রচিত জনসন-চরিত যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বইটি একান্তই কাহিনী প্রধান ; কাহিনীর সঙ্গে আছে তথ্য। বৃদ্ধ জনসনের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীকে বসওয়েল ধরে রেখেছেন তাঁর বইতে ; এমন কি তাঁর ভাবভঙ্গি পর্যন্ত। কিন্তু আশ্চর্যসাগে এই ভেবে যে, সেই সব কাহিনীর প্রত্যেকটির ভেতর দিয়ে তিনি মানুষ জনসনকে অর্থাৎ জনসনের প্রকৃতগত বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটিকে পাঠকদের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। বসওয়েলের লেখা জনসন চরিত বইটি তাই বিশ্বের জীবনী সাহিত্যে শুধু আদর্শস্থল নয়, অপরাজেয় হয়ে আছে। বসওয়েল তো মাত্র একটি বছর জনসনের সান্নিধ্যে বাস করে ছিলেন, আর তিনি যখন লণ্ডনে অনুপস্থিত থাকতেন তখন বসওয়েল চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করতেন। এইভাবেই তিনি জনসন সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে জনসনের মৃত্যুর সাত বছর পরে নানা অসুবিধা ও বহুজনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, বসওয়েল প্রকাশ করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'Life of Samuel Johnson' যা আজ শুধু 'Life' নামেই সারা পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত। কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলবার জাদু ছিল বসওয়েলের কলমে, তাই এই জীবনী গ্রন্থটি আজো যদি কেউ পাঠ করেন তবে তিনি সর্বক্ষণের জন্য অনুভব করবেন বৃদ্ধ জনসনের সান্নিধ্য। প্রথম শ্রেণীর লিপিকুশলতার এ কি কম নিদর্শন। ঘনিষ্ঠ বা intimate বায়োগ্রাফীর দৃষ্টান্ত হিসাবে বস-ওয়েলের বইটি আজো সাহিত্য-সংসারে তুলনারহিত হয়ে আছে।

এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্যামুয়েল জনসন নিজেও একজন প্রথম শ্রেণীর জীবনীকার ছিলেন। তাঁর 'কবিজীবনী' আজো বিশ্ব-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যের কবিদের জীবনচরিত রচনা করেন। জনসন নিজে জীবন চরিত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন: "The business of the biographer is often to pass slightly over those performances and incidents which produce popular greatness to lead the thoughts into domestic privacies, and display the minute details to daily life, where exterior appendages are cast aside and men excel each other only by prudence and virtue.' মোট কথা, যাঁকে নিয়ে জীবনী লিখতে হবে, তাঁর জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয় লেখককে জানতে হবে, পেতে হবে। ঘটনা ও কাহিনীকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে করে মানুষটির জীবনের ভিতর ও বাহির পাঠকের মনশ্চক্ষে সমান বর্ণালি সম্পাতে প্রতিভাত হয়। আবার বলি, জীবনচরিত প্রকৃতপক্ষে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি—তার কম নয়, বেশি নয়।

।। ২ ।।

বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই অজস্র ফসল দেখা যায়, দেখা যায়না শুধু একটি বিভাগে। সেটি হলো জীবনচরিত। ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটির দৈন্য আজো পীড়াদায়ক। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর কালের মধ্যে অবশ্য কতকগুলি উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে; এবং কোনো কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক জীবনচরিত রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এটা খুবই আশার কথা। অন্যদিকে জীবনচরিত পাঠকের সংখ্যাও আগের তুলনায় এখন অনেক বেড়েছে; এর ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে ইদানীং এই জাতীয় গ্রন্থ ক্রয় করার প্রবণতা দেখা যায়। একালের কথা বলবার আগে প্রসঙ্গত সেকালের কথা একটু উল্লেখ করি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। এই দু'জন সাহিত্য মহারথীর মধ্যে কেউই পূর্ণায়ত জীবনচরিত রচনা করে যান নি। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত বা দীনবন্ধু মিত্রের জীবন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখে গেছেন তার প্রভাব যে পরবর্তীকালের জীবনী লেখকদের ওপর এসে গিয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। তেমনি রবীন্দ্রনাথও কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। না করলেও তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'রামমোহন', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', 'বিদ্যাসাগর', 'নিবেদিতা' ও 'অরবিন্দ ঘোষ'—এই জীবনী প্রবন্ধগুলি যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ব্যক্তিবিশেষের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের দুরূহ কাজে কবি কি রকম পারঙ্গম ছিলেন। এঁরা দু'জনেই ভবিষ্যতের জীবনীকারদের জন্য বহু অমূল্য নির্দেশ রেখে গিয়েছেন যা একান্তভাবেই অনুসরণযোগ্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যশস্বী ও সার্থক জীবনীকার হিসাবে আমরা যোগীন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি। এঁদের লেখা যথাক্রমে 'মাইকেল মধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' ও 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত। এঁরা তিনজনেই যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে ও পরিশ্রম সহকারে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের মাইকেল জীবনী তো সেই বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল ট্রাজিক জীবনের একটি অপূর্ব আলেখ্য। পরবর্তীকালে এই চরিত্রটিকে নিয়ে যাঁরা জীবনী লেখার কাজে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী, মণি বাগচি, জীবেন্দ্রকুমার সিংহ রায়, মোহিতলাল মজুমদার ও শীতাংশু মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই মাইকেল জীবনীগুলিও সাহিত্যরসিক পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর' বইটি দীর্ঘকাল বি এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। বিদ্যাসাগরের ওপর অনেকগুলি জীবনী লেখা হয়েছে; সেগুলির মধ্যে বিনয় ঘোষ, মণি বাগচি ও নমিতা চক্রবর্তীর লেখা জীবনী তিনখানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁরা প্রত্যেকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনিশ শতকের বাংলার এই বিরাট চরিত্রটি আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্রও তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বই লিখেছেন।

রামমোহন চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে ইদানীংকালে কয়েকটি জীবনী লেখা হয়েছে, যেমন লেখা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে। এগুলির মধ্যে মোহিতলালের 'বঙ্কিম বরণ' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবন ও বিস্ময়কর প্রতিভা জীবনীকারের আদর্শ বিষয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও চারটি বৃহদায়তন খণ্ডে সমাপ্ত 'রবীন্দ্রজীবনী' একালের একটি সার্থক জীবনচরিত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কবির জীবন বিশাল ও বিরাট। তাঁর সম্পর্কে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে প্রভাতকুমার বাঙালি পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজনই হয়েছেন। এটি শুধু জীবনী নয়—এটি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক এবং বইটির প্রকৃত মূল্য এইখানেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'পিতৃস্মৃতি' বইটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বোধ করি এইটিই যথার্থ অন্তরঙ্গ জীবনচরিত—কেবলমাত্র স্মৃতিচিত্রণ নয়। উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম বিরাট পুরুষ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষি সম্পর্কে যে বিরাট জীবনচরিতটি প্রণয়ন করেন সেটি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করেছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অন্য দু'টি প্রতিভা গগণেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে লেখা যথাক্রমে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গগণেন্দ্রনাথ' এবং রাণীচন্দের 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ'

দুটি সুন্দর এবং তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী। কবির অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন নিয়ে ডঃ সুশীল রায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নাম দিয়ে সম্প্রতি যে বইটি লিখেছেন সেটিও একটি প্রথম শ্রেণীর জীবনচরিত হয়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত পরমপুরুষ' বইটি লিখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, এটিকে ঠিক জীবনীগ্রন্থ বলা যায় না। লেখক চটকদার ভাষায় রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে কয়েকখণ্ডে একটি ভক্তিমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন মাত্র। বরং এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সাফল্য লাভ অনেক বেশি; তাঁর লেখা 'লীলাপ্রসঙ্গ' বোধ করি রামকৃষ্ণের একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী। অচিন্ত্য কুমার, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র ও নজরুলের জীবনী নিয়ে বই লিখেছেন; কিন্তু জীবনী হিসাবে সেগুলি অসার্থক রচনা। বরং এই ক্ষেত্রে আমরা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ করতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথের 'বিবেকানন্দ চরিত' স্বামীজী সম্পর্কে একটি ভাল জীবনী। তবে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার হলেন গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তিনি যে বিরাট বইটি লিখেছেন ('অরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ') সেই বইটি অতি মূল্যবান। জীবনকে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার ও দেখাবার শক্তি ছিল তাঁর।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন জীবনীকারদের অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং তাঁর বিষয়ে আমরা বাংলায় বেশ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট জীবনীগ্রন্থ পেয়েছি। এগুলির মধ্যে মোহিতলালের 'জয়তু নেতাজী', পবিত্র-কুমার ঘোষের 'সুভাষচন্দ্র', সাবিত্রী প্রসন্নের 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র', নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' ও মণি বাগচির 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অতি সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত কয়েক জন বরেণ্য বাঙালি সন্তানের শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা কয়েকটি সুন্দর জীবনীগ্রন্থ পেয়েছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দ ও শরৎচন্দ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকখানি ভালো বই লেখা হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে বলা যায়। স্বদেশ রঞ্জন দাস প্রণীত 'মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও দর্শন' বইটির কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য। বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় সম্পর্কে এইটিই একমাত্র প্রামাণ্য জীবনচরিত। ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জীবনী লিখে এই নিবন্ধকার অনেকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের লেখা 'কান্তকবি রজনীকান্ত' ও দেবকুমার রায়চৌধুরীর লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলাল'—দু'টিই সুন্দর জীবনী; শেষোক্ত বইটি বহুকাল যাবৎ অপ্রকাশিত রয়েছে।

মোট কথা, আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট জীবনীগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে তার একটা দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হলো। আশা করা যায়, নবীন ও শক্তিশালী লেখকবৃন্দ এগিয়ে এসে সাহিত্যের এই বিভাগটি আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন। বর্তমানের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিনে মহৎজীবনের কথা যত বেশি আলোচিত ও পরিশীলিত হয়, দেশ এবং জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁরা যেন মনে রাখেন, জীবন থেকেই জীবনের উজ্জীবন সম্ভব আর সত্যিকার অর্থাৎ উচ্ছ্বাস বর্জিত নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ জীবন রিতই সেই প্রয়োজনীয় উজ্জীবনের প্রক্রিয়াকে সার্থক করে, সম্পূর্ণ করে তুলতে সক্ষম। 'ভালো জীবনী লেখা ভালো জীবন যাপন করার মতোই একটি সুকঠিন শিল্পকর্ম'—বার্ণার্ড শ'য়ের এই' মূল্যবান কথাটি ভাবীকালের জীবনীকারগণ যেন মনে রাখেন।

প্রত্যাবর্তন

শ্যামবেন্দু পাল

ট্রেন থেকে নামল শান্তনু। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সে একবার আকাশের দিকে তাকাল। নীল উজ্জ্বল আকাশ। কোথাও এতটুকু মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। সে বাতাসে লাইনের ওপারে আমের পাতা কাঁপছে। ঐ আমগাছগুলো কত কালের? কে জানে। তবে শান্তনু ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে—ওরা ওখানে অমনি দাঁড়িয়ে। কত ঝড় জল বজ্রপাত চলে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। কিন্তু গাছগুলো মরেনি। আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আজও সবুজ পাতার সমারোহ—আজও মুকুল ধরে—ফল ফলে।

শান্তনু বুক ভরে নিশ্বাস নিল। পাঁচ বছর সে এখানে ছিল না। পাঁচ বছর ধরে সে দেশে দেশে—পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কখনো এমন প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারেনি। এমন মিষ্টি নির্মল বাতাস আর কোথাও পায়নি।

শান্তনু ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়াল। তাড়াহুড়ো নেই। এখনো হাতে অনেক সময়। এখন বেলা এগারোটা। ফেরার ট্রেন সেই বিকেলে।

একজন রিক্সাওলা কাছে এসে বলল, রিক্সা লাগবে বাবু?

শান্তনু মাথা নাড়ল।—না।

রিক্সা কি হবে? রিক্সায় উঠলেই রিক্সাওলা জানতে চাইবে—কোথায় যাবেন?

সত্যিই তো—কোথায় যাবে। আজ কোন্ ঠিকানায় গিয়ে উঠবে? একদিন—বেশি দিন নয়, মাত্র পাঁচ বছর আগেও তার ঠিকানা ছিল—ঘর ছিল—বাড়ি ছিল—বন্ধু বান্ধব, ক্লাব—পার্টি অফিস সব—সব ছিল। কিন্তু আজ—

শান্তনুর বুকের ভেতরটা কিরকম করে উঠলো। দু চোখ জলে ভরে উঠলো। কিন্তু না, চোখের জল ফেললে চলবে না। আজ আর অশ্রু নয়—আজ——আনন্দ—আনন্দ—জয়ের আনন্দ—মুক্তির আনন্দ।

শান্তনু হাঁটতে আরম্ভ করল। চোখ পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। এখন জুন মাস। আশ্চর্য! এখনো গাছটা লালে লাল হয়ে আছে। শান্তনু থমকে দাঁড়াল। এই পাঁচ বছর পরেও গাছটার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। এতটুকু বুড়ো হয়নি। এখনো তেমনি লাল ফুলের বাহার নিয়ে লোকের চোখ ভুলোচ্ছে।

কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো কি তখন এত লাল ছিল? বোধহয় না। তাহলে হঠাৎ এখন রক্তমাখা লাল হল কি করে?

শান্তনুর চোখের সামনে মুখ ভেসে উঠল। পাতলা ফর্সা—বড়ো বড়ো সরল দু'টি চোখ—তীক্ষ্ণ নাক—। তার ঐ পাতলা শরীর ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত। মহেশ ব্যানার্জি। একদিন

রাতের ট্রেনে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ফিরছিল। রিক্সায় উঠেছে সবেমাত্র... অমনি চারদিক থেকে হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কারা যেন। মহেশের হাতে ছিল ছাতা—। সামান্য ছাতা দিয়ে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু ছোরা, লাঠি, টাঙ্গি বর্শার সঙ্গে পারবে কেন? তারা তাকে মারতে লাগল।

মহেশের শেষ জিজ্ঞাসা—আমায় তোমরা মারছ কেন?

এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেয় নি। তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে রইল এইখানে।

কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো তাই কি রক্ত-মাখা লাল হয়ে ফুটেছে?

শান্তনু মাটি থেকে কৃষ্ণচূড়ার একটা ছেঁড়া পাপড়ি কুড়িয়ে বুকপকেটে রেখে দিল।

এই হত্যা যখন ঘটে শান্তনু তখন এখানেই ছিল। ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—মাইকে করে কারা যেন কি বলে যাচ্ছে।

এত ভোরে মাইক?···কি যেন বলছে···হত্যা করা হয়েছে···তারই প্রতিবাদে হরতাল।

ধড়মড় করে শান্তনু উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।—কী হয়েছে রে বিকু?

—বেরিয়ে আয়। বলছি।

প্রায় ছুটতে ছুটতে শান্তনু রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল—কী হয়েছে।

বিকুর মুখ ফ্যাকাশে। বললে, মহেশদাকে কাল রাত্তিরে মেরে দিয়েছে।

—মহেশদাকে।

মহেশের মতো মানুষকেও মারতে পারে কেউ? ঐ শান্ত ধীর ভদ্র—

—কারা মারল?

—আবার কারা—নাম মুখে আনারও উপায় নেই। তাদের দলের কেউ শুনলে বাড়ি থেকে টেনে এনে শেষ করে দেবে। কেউ বাঁচাতে আসবে না। পুলিশ তো তাদের এজেন্ট।

শান্তনু হেঁটে চলেছে স্টেশন রোড দিয়ে। এখন জুন মাস। বেলা এখন সাড়ে এগারোটা। মাথার ওপর নিষ্করুণ সূর্য। রাস্তার পিচ গলছে। এ রাস্তায় এমনিতেই লোক চলাচল কম। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথ প্রায় নির্জন।

কতদূর যেতে হবে শান্তনুকে? ঠিকানা তো তার আজ নেই। ঠিকানা নেই তবু তাকে খোঁজ করতে হবে একটা ঠিকানার। সেইটুকুর জন্যে আজ এই পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে।

হ্যাঁ, এই তো সেই শিমুলতলা। ওরই পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার মুখে এসে শান্তনু দাঁড়িয়ে পড়ল। বহু পরিচিত—বহু স্মৃতি জড়িত ঐ পথ।

বিনীতা, তুমি কি আজ আছ? আজও কি আমায় মনে আছে?

বিনীতা খুব চেষ্টা করেছিল শান্তনুকে সরিয়ে আনতে। বলেছিল তুমি পড়াশোনায় ভালো, নিজের কেরিয়ার তৈরী করো।

শান্তনু বলেছিল, আমি তো পড়াশোনা ছেড়ে দিই নি।

—পড়াশোনা আর রাজনীতি এক সঙ্গে চলে না।

—চালাচ্ছি তো।

—তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

—রাখবার চেষ্টা করব।

—না, মুখে বললে হবে না। আমার হাতটা তোমার হাতে তুলে নিয়ে বলো, সত্যি চেষ্টা করবে?

তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা দেখে ফিরছিল দু'জনে। সিনেমা শেষ হলে বিনীতা একাই ফিরতে চাইছিল, শান্তনু ছাড়েনি। ওকে এগিয়ে দিচ্ছিল। যতটুকু কাছে পাওয়া যায়।

শিমুলতলার মোড়ে অন্ধকারে বিনীতা যখন তার হাতটা স্বচ্ছন্দে শান্তনুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—শান্তনুর সমস্ত শরীরটা কেমন করে উঠল।

—তোমার রাজনীতি বড়ো না আমি বড়ো?

শান্তনু বললে, দু'টো দু'রকম।

—ওসব বুঝি না। তুমি রাজনীতি ছাড়ো।

—কোনো দিনক্ষণ দেখে প্রতিমা-পত্রে সই করে তো রাজনীতির খাতায় নাম লিখাই নি বিনীতা। যে লেখা পড়ার কথা বলছিলে রাজনীতি তারই একটা ফল।

—কিন্তু রাজনীতি করা আমি পছন্দ করি না। আমার বাড়ির কেউ করে না।

—কেন কর না?

—ও বড়ো বিশ্রী জিনিষ। মনটাকে নিচু করে দেয়। লোভ বাড়িয়ে দেয়।

—কিসের লোভ?

—গদি দখলের লোভ।

শান্তনু হাহা করে হেসে উঠেছিল।

—অত জোরে হেসো না। লোকে দেখবে।

—হাসির কথা বললে হাসব না? গদির লোভ? কিসের গদি? মন্ত্রিত্বের? ভয় নেই। অতদূর তাকাতে পারি না। আমি পোস্টার মারি সাফ, মাইকে করে সভার কথা অ্যানাউন্স করে বেড়াই—বড়ো জোর ভোটের সময়ে বাড়ি বাড়ি ছোটাছুটি করি—আমি সামান্য ক্যাডার ছাড়া কিছু নই।

ক্যাডাররা সামান্য? ক্যাডাররাই তো সব। ওরাই তো সৈনিক।

—শুনে ভালো লাগল।

সেই জন্যেই আমার ভয়। সব ক্ষয় ক্ষতি তোমার মতো ক্যাডারদেরই সহ্য করতে হয়।

বলেই বিনীতা হাতটা সরিয়ে নিল।

—আমি বললাম।

সেই সন্ধ্যায় ঠিক এইখান থেকে বিদায় নিয়ে বিনীতা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তার ঐ একটা কথাই বার বার বাজছিল—ক্যাডাররাই তো সব। ওরাই তো সৈনিক।

একথা যে বলতে পারে সে কি কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে ঘৃণা করতে পারে? তবে কেন ওকে বার বার রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলেছিল?

একবার কি ঐ রাস্তায় ঢুকে বিনীতাদের বাড়ির খবর নিয়ে যাবে—সে এখন কোথায়?

না, থাক্। যে জন্যে তার এখানে আসা। আগে সেই কাজ সারতে হবে। আগে সেই ঠিকানা চাই।

শান্তনু এগিয়ে চলে।

আজ এই মুহূর্তে সেই ভয়াবহ দিন গুলির সব কথাই মনে পড়ছে।

ওদের মধ্যে কয়েকটা ভালো ছেলেও ছিল। অর্থাৎ তারা নিজেদের পুরো পুরি বিকিয়ে দিলেও একেবারে বিবেক

শূন্য হতে পারে নি। একদিন ওদের একজন চুপি চুপি শান্তনুর সঙ্গে দেখা করল। বললে, তিন মিনিটের বেশি সময় তোকে দিতে পারব না। তোর সঙ্গে কথা বলছি আমাদের কেউ দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। —শোন্, তুই কালকের মধ্যেই পালিয়ে যা।

—পালিয়ে যাব! কি বলছিস দেবু! এযে আমার দেশ—আমার জন্মভূমি! এ জায়গায় ছেড়ে কোথায় পালাবো? আর পালাবোই বা কেন? কি আমার অপরাধ?

—বেশি কথা বলার সময় নেই শান্তনু। তুই আমার ক্লাসফ্রেণ্ড বলেই সাবধান করে দিয়ে গেলাম। গোঁয়ার্তুমি করিস নি। ওরা তোর লাস ফেলে দেবে ঠিক করেছে।

বলেই দেবু অন্ধকারে পুকুর পাড় দিয়ে পালিয়ে গেল।

দেশ ছাড়াই স্থির করল শান্তনু। একথা বাড়ির লোক ছাড়া আর যে জানল সে বিনীতা। শান্তনু নিজেই গিয়ে বিদায় নিয়ে এল। বিনীতা একটি কথাও বলল না।

লাস্ট ডাউনে চলে যাবে বলে শান্তনু প্ল্যাটফর্মে এসে একপাশে চুপচাপ বসেছিল। তাকে কেউ তুলে দিতে আসে নি। সে উপায় ছিল না। ট্রেনে উঠে যখন চুপি চুপি এক কোনে বসতে যাচ্ছে তখন ও চমকে উঠল—কে যেন ডাকছে।

—আমি বিনীতা—এই যে এই দিকে। জানলার বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে একটা টিফিন কেরিয়ার এগিয়ে দিল। শান্তনু চমকে উঠল। —তুমি কী করে এলে?

—আমার বিন্ধু অতসীর বাড়িতে থাকব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। সে থাক। কখন কোথায় থাক চিঠি দিয়ে জানিয়ো। চিঠি আমাদের বাড়ি দিয়ো না। অতসীর ঠিকানা—ট্রেন চলতে শুরু করল—সাবধানে থেকো—

দেশ থেকে শান্তনুর নির্বাসন হয়ে গেল। তারপর থেকে কোথায় না ঘুরেছে—কত লজ্জা—কত ধিক্কার—কত গ্লানি। আবার সেই সঙ্গে কত জনের কাছ থেকে পেয়েছে আন্তরিকতা। কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তাদের কাছে।

দূরে থাকলেও প্রায় প্রতিদিনের দেশের খবর সে পাচ্ছে। তার পর একদিন সেই খবরটাও এল—

—শান্তনু না?

—প্রদীপ!

—শান্তনু তুই ফিরলি! বলেই প্রদীপ জড়িয়ে ধরল শান্তনুকে।

—এই ফিরছিস নাকি?

শান্তনু সংযত আনন্দে মাথা দোলালো।

—হেঁটে হেঁটে? রিক্সা ছিল না?

—হাঁটতে হাঁটতেই এলাম। দেখছিলাম জায়গাগুলো।

—খাওয়া দাওয়া?

শান্তনু মিথ্যে কথাই বলল—খেয়ে নিয়েছি?

—যাবি কোথায়?

শান্তনু হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

—তোদের বাড়িতে তো কেউ নেই। এটা তো ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে গেল।

শান্তনু ম্লান হেসে বললে, কি হবে আর এখানে থেকে।

—মা কেমন আছেন?

শান্তনু অন্য মনস্ক ভাবে বললে, আছেন। না থাকলেই ভালো হত।

প্রদীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তাহলে কোথায় যাচ্ছিস? কারো সঙ্গে দেখা করতে?

শান্তনু মাথা নাড়ল।

—তাহলে?

—এমনিই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। তারপর বিকেলে ফিরে যাব।

প্রদীপ হাসল। বললে, বুঝেছি। দেশের মাটির টান। অনেক কবিই দেশপ্রেমের কবিতা লিখে অমর হয়েছেন। কিন্তু তোর এই দেশপ্রেম—

না—না শুধু দেশপ্রেম নয় প্রদীপ। একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারও আছে।

—ব্যক্তিগত ব্যাপার—তা চল্, পার্টি অফিসে নিয়ে যাই। এখন তো সব নতুন মুখ—তোকে হয় তো চিনবে না।

—পার্টি অফিসে যাবার দরকার নেই। তোকে দিয়েই কাজ হবে। তুই কি একটু সময় দিতে পারিস আমার জন্যে?

—কেন বল্‌তো।

—অতনুর কথা একটু শুনতে চাই।

মুহূর্তে প্রদীপের মুখটা বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। গাঢ় স্বরে বললে, এবার বুঝেছি, কেন আজ তুই এখানে এসেছিস—কেন এই দুপুর রোদে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। একটু থেমে বললো, তুই কতটুকু শুনেছিস?

—অনেকটাই। আমি শুনেছি আমাকে ওরা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছিল—মাকে ভয় দেখিয়েছিল। বলেছিল আমার ঠিকানা না দিলে বাড়িতে আগুন লাগাবে।

আমি শুনেছি—শেষ পর্যন্ত ওদের রাগ গিয়ে পড়ল অতনুর ওপর। ওরা ওকে ধরে শাসালো—দাদা কোথায় বলো। অতনু বলতে পারল না। ও কোথায় পাবে আমার ঠিকানা? আমি কখনো রাউরকেল্লা—কখনো পাটনা—কখনো মধুপুর গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছি। তখন রাগটা গিয়ে পড়ল এর ওপর। যেন ও ইচ্ছে করে ঠিকানা দিচ্ছে না। ও কেমন ভয় পেয়ে গেল।

—ভয় তো পাবেই। ছেলেমানুষ। রাজনীতির ছায়াও মাড়াত না।

প্রদীপ বলল।

—হ্যাঁ, সবে বি এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। পড়াশোনা নিয়েই ও থাকত। তারপর হঠাৎ একদিন ও শুনল ওকে মারবার প্ল্যান চলেছে। আমি এই পর্যন্ত শুনেছি—ওর দুশ্চিন্তায় নাকি ঘুম হচ্ছিল না। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল না। ও নাকি স্থানীয় কর্তাদের কাছে গিয়েওছিল। গিয়েছিল কি?

প্রদীপ বললে, গেয়েছিল।

—কার কাছে?

—মলয় সরকারের কাছে।

মলয় কি বলল?

—মলয় আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, তোমার কোনো ভয় নেই।

—মলয় এ আশ্বাস দিয়েছিল?

—হ্যাঁ। অতনু জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারি? মলয় বলেছিল কেন পারবে না। তোমার কোনো দোষ নেই।

—এমন কথা মলয় বলেছিল? ঠিক জান?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—বলছি। সরে আয়, লরি আসছে। একটু চা খাবি?

—না, তুই বল।

—অতনু সেদিন বিকেলে একরকম জোর করেই বেরোল। ওর মা অনেক করে—

—ও কথা আমি শুনেছি। তুই তার পরের ঘটনা বল যা আমরা কেউ জানি না। শোনা কথা শুনতে চাই না তুই নিজে যা জানিস তাই বল।

চলতে চলতে প্রদীপ বলতে লাগল—বাড়ি থেকে বেরিয়ে অতনু চলে এল তে মাথার মোড়ে। এটা তখন কি মারাত্মক জায়গা বুঝতেই পারছ। এখানে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দু'জনে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল। অনেকক্ষণ গল্প করল দুই বন্ধুতে—বাদাম ভাজা খেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ওর বন্ধুটি বললে, অতনু, আর নয়, এবার তুই বাড়ি যা।

অতনু অবাক হয়ে তাকালো—কেন?

—কেন তা কি বুঝিস না?

অতনু হাসল। বলল, আমায় মারবে? না, সে ভয় আর নেই। মলয়দা বলে দিয়েছে।

বন্ধুটি বললে, যতই বলুক বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া মলয়দার কথা যদি ওরা না শোনে?

অতনু বললে, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আমায় কেন মারবে? আমার কি অপরাধ? আমি তো কোনো পার্টিতেই নেই।

বন্ধুটি বলল, এটা তো যুক্তির কথা। কিন্তু খুনের স্বাদ যারা একবার পেয়েছে তারা যুক্তির ধার ধারে না। তুই যা।

এই বলে অতনুকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বন্ধুটি চলে গেল।

প্রদীপ থামল।

—থামলে কেন? বলো বলো। আমি ঠিক আছি।

—অতনু ফিরছিল অন্যমনস্কভাবে। তার মনের কোথাও এতটুকু ভয়ের ছায়া ছিল না। কিন্তু ঐ তে মাথার মোড়ে আসতেই কারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে। প্রথমে ওর বাঁ হাতে ছুরির ঘা পড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। তখন সে ডান হাত দিয়ে রক্ত চেপে ধরে ছুটতে থাকে। পেছনে ধাওয়া করল খুনীর দল—মুখে একটা বীভৎস শব্দ। সে শব্দ যে শুনেছে তার বুক কেঁপে উঠেছে। শহরের রাজপথ—সবে সন্ধ্যে। একটি ছেলে প্রাণ ভয়ে ছুটছে—বাঁচাও—বাঁচাও। পেছনে তাড়া করেছে হায়নার দল। কিন্তু কেউ বাঁচাতে এল না। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। গেরস্তর বাড়িতে খিল পড়ল ভয়ে। আর তাদেরই ঘরের একটি ছেলে প্রাণ বাঁচানোর আকুল আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল পথের ওপরে।

শান্তনু—শান্তনু—শক্ত হও।

—আমি ঠিক আছি প্রদীপ। এইটুকু সোনার জন্যেই তো আমার আসা।

—এই সেই তে মাথার মোড়। ঐখানে প্রথম তার ওপর আঘাত।

—তারপর?

—তারপর ও ছুটল বড়ো রাস্তা ধরে।

—বাড়ির দিকে না গিয়ে ও দিকে ছুটল কেন?

—বোধহয় ভেবেছিল, মেন রোডে মানুষের ভিড়। তারা তাকে বাঁচাবে। বোধহয় ভেবেছিল, পুলিশের সাহায্য পাবে—আর দু' পা এগোলেই তো এস ডি পি ও র কোয়ার্টার—

—তারপর?

—ওরা চারিদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলল। ছুরি মারল পেটে। অতনু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—

—কে ছুরি মারল?

—আবার কে—

—শ' নাম বলো।

—প্রতিশোধ নিবি!

—না। আমি শুধু তাকে মনে রাখব।

—বিজু।

—বিজয় সামন্ত।

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর অতনুর লাশ পড়ে রইল রাস্তার ধুলোয়। কতক্ষণ ধড়ফড় করল—কেউ বেরিয়ে এল না, এক ফোঁটা জলও পেলনা। আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল।

—সেই জায়গাটায় আমায় নিয়ে চল্ প্রদীপ। এইজন্যেই আমার এখানে আসা।

প্রদীপ শান্তনুকে নিয়ে এল। বেলা তখন পড়ে এসেছে। এও এক অপরাহ্ণ। শান্তনু স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পাঁচ বছর—পাঁচ বছরের মধ্যে কত ঝড়ে এখানকার কত ধুলো উড়ে গেছে। পাঁচ বছরের কত শ্রাবণ ধারায় শেষ রক্তবিন্দু ধুঁয়ে গেছে—কোনো চিহ্ন নেই।

শান্তনু রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো হাতে তুলে নিল।

—কিন্তু তোকে আরো খবর দেওয়ার আছে।

—বল।

—শুনে হয়তো কষ্ট পাবি।

—সহ্য শক্তিটা এই পাঁচ বছরে অনেক বেড়ে গেছে।

—তুই দেশছাড়া হবার পর শুধু যে তোদের বাড়িতেই হামলা হয়েছে তা নয়, বিনীতাকেও রেহাই দেয় নি।

—কেন বিনীতা কি করল? শান্তনুর দুই চোখ জ্বলে উঠল।

—তোর সঙ্গে কিছু একটা ব্যাপার আছে। বিদুরা তা টের পেয়েছিল। ওরা সেইজন্য বিনীতাকে নানাভাবে অপমান করেছে। এমন কি বিনীতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পর্যন্ত বিজু সোজাসুজি দিয়েছিল।

শান্তনু ঠোঁটের ওপর কামড় বসিয়ে নিজের হাতের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি মেরে গর্জে উঠল—ননসেন্স!

—ধৈর্য ধর শান্তনু।

—না, না ধৈর্য আমি হারায় নি। তুই বল।

—অতনুর খবর পেয়ে বিনীতা ছুটে এল তোদের বাড়ি। তোর মা তখন পাগল হয়ে গেছে। বিনীতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমরা শান্তকে এনে দাও। আশ্চর্য! অতনুর কথা একবারের জন্যেও মুখে আনলেন না।

তিনি তোর জন্যে এমন অবুঝ হয়ে উঠলেন যে শেষ পর্যন্ত বিনীতা নিজে এল বিজু সামন্তর কাছে। বললে, তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজি—শুধু শান্তনুকে আসতে

দাও। নইলে ওর মা বাঁচবেন না।

বিজু সামন্ত খুশী হল। বললে, বেশ, ও আসতে পারে।

তবু বিনীতা জিজ্ঞেস করলো, মলয়দাকে বলতে হবে ?

—না। আমি যা বলব তাই হবে। তবে আমার শর্তটা এখনি তোমায় মানতে হবে।

প্রদীপ বললে, বিনীতা তোকে তিনখানা চিঠি লিখেছিল জানি। তুই পাসনি ?

—না। আমার তো কোনো এক জায়গায় থাকার স্থিরতা ছিলনা।

—তারপর আর শুনবি ?

—না। আর শুনতে চাই না। সব বুঝতে পেরেছি। শুধু একটা কথা জানতে চাই। ওরা কি এখন এখানেই আছে ?

—ওরা মানে ? বিজু বিনীতা ? হ্যাঁ, আছে। শুধু ওরা কেন ওদের দলের সবাই আছে।

—ভয় নেই ওদের ?

—কিসের ভয় ? প্রতিশোধের ? প্রদীপ হাসল। না, আর প্রতিশোধ নয়। তবে তদন্ত হবে নাকি শোনা যাচ্ছে। তারই ভয়ে কেউ কেউ গা ঢাকা দিতে চেষ্টা করছে।

বিকেলে আর ফেরা হল না শান্তনুর। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ট্রেন এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। এখন বেশ রাত। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে প্ল্যাটফর্মও বেশ নির্জন। শান্তনু পিছনের দিকে নিরিবিলি দেখে একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল।

এ সেই ট্রেন যে ট্রেনে চেপে পাঁচ বছর আগে শান্তনু দেশত্যাগী হয়েছিল। এ সেই ট্রেন যেখানে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল বিনীতার সঙ্গে। বিনীতাও এসেছিল চুপি চুপি। টিফিন কেরিয়ারটা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল সাবধানে থেকো।

আশ্চর্য। পাঁচ বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেল।

শান্তনু একপাশে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। এ ঘরের আলোটা মিটমিটে। এ লাইনে অনেক গাড়িতে আলোই থাকে না। এটায় তবু তো টিমটিমে আলোও আছে। হঠাৎ চোখ পড়ল তারই উল্টো দিকের বেঞ্চির একেবারে কোণে অনেকটা আত্মগোপন করার মতো করে বসে আছে এক জোড়া.....মহিলাটি বোধহয় বিবাহিতা। কিন্তু অমন জড়োসড়ো কেন ? নিজেদের অমন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কেন ?

পরের বৌ নিয়ে কেউ পালাচ্ছে নাকি ?

শান্তনু এবার স্পষ্ট করে দেখতে লাগল। ট্রেন তখন চলছে। চলার জন্যেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক আলোটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গেসঙ্গে শান্তনু চমকে উঠল। শুধু শান্তনু চমকায় নি। চমকে উঠেছিল অন্য দু'জনও। তবে সে দু'জনের চমকের মধ্যেও তফাত আছে। একজন চমকে উঠল ভয়ে—আর একজন বিস্ময়ে, কিছুটা বা লজ্জায়।

ট্রেন চলেছে। পরের স্টেশন আসবার আগেই বিজু সামন্ত কেমন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বিনীতা তাকে ইশারায় কি বলল। তারপর দু'জনেই উঠে পড়ল—। —ভাবখানা এই—যেন ভুল গাড়িতে চেপে বসেছে। গাড়ি এখনই বদলাতে হবে।

তারা উঠতেই শান্তনু নিঃশব্দে নিজের পা দু'খানা সামনের বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে পথ আটকাল।

এমনিতেই এ গাড়িতে প্যাসেঞ্জার কম। তারপর পিছনের দিকে এই কম্পার্টমেন্টখানা একেবারেই খালি। এখন শুধু এই তিন জন ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেউ নেই বললে ভুল হবে। একটা অন্ধ ভিখিরি ওদিকে দরজার কাছে বসে পয়সা গুনছে।

শান্তনু পা তুলে পথ আটকাতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। কিন্তু ওরা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারল না—আমাদের যেতে দাও।

শান্তনুও নির্বিকার। সে পা তুলেই রইল। ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না।

অগত্যা ও'দের দু'জনকে আবার বসতে হল। এই সময়ে আলোটা আবার উজ্জ্বল হল। শান্তনু বিজয় সামন্তর দিকে ভালো করে তাকাল। দেখল মুখখানা ওর ভয়ে সাদা হয়েগেছে।

আর বিনীতা?

না, তার মুখ দেখার উপায় নেই। সে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে আবার চলতে শুরু করল। শান্তনু ধীরে ধীরে জামাটা খুলে ফেলল। বিজু চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

শান্তনু শার্টটা বাঙ্কের উপর ছুঁড়ে দিল। এবার শান্তনু প্যান্টের ভেতর থেকে গেঞ্জিটা টেনে বের করল। বিজু বিস্ফোরিত চোখে দেখতে লাগল। সে হয়তো ভাবছিল এবার ঐ কোমর থেকে এমন কিছু একটা ধাতব অস্ত্র বেরোবে—

না, তা বেরোল না। শান্তনু গেঞ্জিটা তুলে দেখিয়ে দিল তার কাছে তেমন কিছু নেই। না, ভয় নেই।

ভয় নেই কিন্তু কিছু একটা আছে। যা ভয়ের চেয়েও ভয়ংকর। তা যে কি জিনিস তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না।

বিজু কাঠ হয়ে বসে আছে জানলার বাইরে তাকিয়ে। শান্তনুর দিকে তাকায় এমন সাধ্য নেই।

ট্রেন চলেছে।

বিনীতা তেমনিভাবেই মাথা নীচু করে কাঁদছে। তার সিঁথির সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে।

ট্রেন চলেছে।

বিজুর সাধ্য নেই জায়গা থেকে এতটুকু নড়ে। সে নিজের জায়গাটুকুর মধ্যে বন্দী। এমনি বন্দী অবস্থায় তাকে কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে।

ট্রেন চলেছে।

শান্তনু বেঞ্চির ওপর দু'পা তুলে নির্বাক তাকিয়ে রয়েছে আলোর দিকে যেখানে কতকগুলো পোকা বৃথাই ঘুরপাক খেয়ে মরছে।

এ ঘরেতে এখন তিন জন—খুনী, খুনীর বৌ আর শোকার্ত হৃদয় এক দাদা। আরো এক জন আছে—বিনীতা। সে বিচ্ছিন্ন সত্তা। আছে অলক্ষে। তবু শান্তনুর সমস্ত মন-প্রাণ ভরে আছে তারই কথায়—তারই স্মৃতিতে।

ট্রেন এসে থামল ব্যাণ্ডেলে। শান্তনু ধীরে ধীরে উঠল—"সাবধানে থেকো।"

কাউকেই উদ্দেশ্য না করে কোনো একদিনের কোনো একজনের অতি আন্তরিকতাপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র করে উদ্ধত গর্বে শান্তনু নেমে গেল।

মন্মথ রায়

[রাত তখন অনেক। দিব্যেন্দু সবে ঘুমিয়েছে। ঘরে জ্বলছে নীলরঙের বাল্‌ব। বিনতা এবার শুতে যাবে। একবার আড়মোড়া ভেঙে নেয় বিনতা। এগিয়ে যায় জানলার কাছে। বাহিরে তাকিয়ে হঠাৎ কি দেখে চমকে ওঠে। আবার দু'হাতের চেটোয় চোখ মুছে তাকায় ভাল করে, তারপর ছুটে এসে দিব্যেন্দুকে ডাকে।]

বিনতা : এই শোনো, ওঠো—

দিব্যেন্দু : আঃ

বিনতা : ওঠো বলছি।

দিব্যেন্দু : না। কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিলে। —কেন বলতো?

[ধড়মড় করে দিব্যেন্দু উঠে বসে]

বিনতা : বাগানে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিব্যেন্দু : এত রাতে।

বিনতা : হ্যাঁ···একটা সোমত্ত মেয়ে···

দিব্যেন্দু : বল কি। কই?

বিনতা : এখন অবশ্য দেখছি না। কিন্তু দেখেছি। এমন কিছু দেখেছি যা বলতে বাধে।

দিব্যেন্দু : বলকি রাণী।

বিনতা : হ্যাঁ। তুমি তো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলে, আমার ঘুম পেল না। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম চমৎকার জ্যোৎস্না—সারা পৃথিবী ঘুমচ্ছে। শুধু চাঁদ জেগে আছে আর আমি।···হঠাৎ—

দিব্যেন্দু : বল—

বিনতা : হঠাৎ দেখলুম হাসনুহানার ঝোপের ধারে—

দিব্যেন্দু : একটা সোমত্ত মেয়ে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রাণী।

[দিব্যেন্দু হেসে উঠে]

বিনতা : আমি স্পষ্ট দেখলাম···তবু বলবে মাথা খারাপ হয়েছে?

দিব্যেন্দু : পাঁচীল ঘেরা বাড়ী—রাত দুপুর—আর তুমি দেখলে একটা মেয়ে হাসনুহানার ঝোপে—

বিনতা : শুধু কি তাই? বলতে বাধছে...

দিব্যেন্দু : কি?

বিনতা : কাপড় নেই।

দিব্যেন্দু : মানে ন্যাংটো?

বিনতা : হ্যাঁ।

[দিব্যেন্দুর গলায় অবিশ্বাসের সুর]

দিব্যেন্দু : তুমি দেখেছো?

বিনতা : আমি দেখেছি।

দিব্যেন্দু : মনে হয় এখনো এখানে রয়েছে?

বিনতা : কি করে বলব। এদিক ওদিক তাকালো, এক পা দু'পা এগুলো, চার দিক চেয়ে দেখলো, তারপর বোধহয় আমায় দেখতে পেয়ে সরে গেল।

দিব্যেন্দু : কোথায়?

বিনতা : ঝোপের আড়ালে—

দিব্যেন্দু : ন্যাংটো।

বিনতা : হ্যাঁ। কিন্তু তুমি বল... আমি এসব কি দেখলাম। লোক-জন ডাকো—দেখতে হবে।

দিব্যেন্দু : তুমি স্পষ্ট দেখেছ ন্যাংটো?

বিনতা : হ্যাঁ গো হ্যাঁ—

দিব্যেন্দু : মনে করে দেখ পরণে সাদা কাপড় ছিল না তো।

বিনতা : না। আমি স্পষ্ট দেখেছি। অমন জ্যোৎস্না। না, ভুল আমি করিনি। সাদা থান কাপড়, কেন?

দিব্যেন্দু : না, একটা কথা মনে পড়ল, তাই।

বিনতা : কি কথা।

দিব্যেন্দু : আমার এক জ্যাঠাইমা, অনেক কাল আগে অপঘাতে—

বিনতা : মানে···মানে তুমি বলতে চাও—

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ, অনেকে দেখেছে—

বিনতা : দেখেছে?

[বিনতার চোখ বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়]

দিব্যেন্দু : বলে তো তাই।

বিনতা : না, এ সে হবে কেন। এ ভরা যুবতী মেয়ে। আর কই, সে সব কথা তো আমি শুনিনি। না না, এ ভূতটুত নয়। এও তো হতে পারে যে, আমি যে এখানে এসেছি বা আছি ও মেয়েটি শোনেনি।

দিব্যেন্দু : মানে?

বিনতা : হয়ত এমন অনেক এসেছে। যাকে বলে অভিসারে।

[বিনতার গলায় যেন একটা বাঁকা সুর জ ওঠে]

দিব্যেন্দু : মানে, তুমি বলতে চাও—

বিনতা : আমি কিছুই বলতে চাইনা। কিন্তু বলবই না বা কেন—

দিব্যেন্দু : বল।

বিনতা : রাত দুপুরে, তোমার শোবার ঘরের লাগাও বাগানে এসব দেখব এ যদি জানতাম—

[এবার ধ্বনিত হয় অভিমান]

দিব্যেন্দু : রাণী।

বিনতা : লোকজন ডাকো বলছি। ডাকো। চল আমি নিজে যাব।

দিব্যেন্দু : চল—কিন্তু—কিন্তু শোন রাণী—

বিনতা : যাবে না?

দিব্যেন্দু : যাবো না কেন। কিন্তু লোকজন নিয়ে গিয়ে কিছুই দেখবো না, তুমি জানো না—এমন অনেক-বার হয়েছে।

বিনতা : ভূত বলে উড়িয়ে দিতে চাও?

দিব্যেন্দু : জানিনে কি। জ্যাঠাইমা এসেছিলেন বিধবা হয়ে বাবার কাছে আশ্রয় চাইতে। বাবা রাজী হননি। জ্যাঠাইমা বললেন, মোকদ্দমা করবো—এ বাড়ীতে আমার অধিকার আছে—ভাত-কাপড় তুমি দিতে বাধ্য। বাবা রেগে করলেন অপমান। পরদিন ভোর বেলায় দেখা গেল ঐ আমগাছটায় তার পরণের কাপড় খানি ফাঁস দিয়ে তিনি—

বিনতা : ঐ···ঐ। দেখছ?

[জানলা দিয়ে তাকিয়ে বিনতা আবার আঁৎকে ওঠে]

দিব্যেন্দু : কিন্তু এতো···সত্যিই তো।

বিনতা : একি তোমার জ্যাঠাইমা?

দিব্যেন্দু : না···কিন্তু···তবু···

বিনতা : তবু বলবে জ্যাঠাইমা। বলো স্বর্গে কাপড় নেই, কনট্রোল, তাই—

দিব্যেন্দু : কিন্তু ও মানুষ নয়—মানুষ নয় রাণী। কোন যুবতী মেয়ে অমন স্যাংটো হয়ে—দাঁড়াও—

বিনতা : আমি জানতে চাই এসব কি।

দিব্যেন্দু : না না শোন। এটা বিজ্ঞানের যুগ। গুলি ছুড়ে দেখবো ওটা কি?

[দিব্যেন্দু ছুটে গিয়ে দোনলা বন্দুকটা টেনে নেয়—জানলা দিয়ে নিশানা করে বাইরে। তারপরই বন্দুকটা গর্জন করে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা আর্তনাদ ওঠে। কালক্ষেপ সূচকঅন্ধকার। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠলে দেখা যায় ঘরের আলোটা জ্বালানো আর দিব্যেন্দুর বিছানায় শোয়ানো একটা নারী মূর্তি, আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। দিব্যেন্দু বন্দুক হাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে—আর বিনতাও দাঁড়িয়ে আছে খাটের বাজুতে হাত রেখে।]

নারীমূর্তি : আমায় মেরেছ···ভালই করেছ···ভালই করেছ। আঃ ওঃ—

দিব্যেন্দু : কে তুমি? তুমি কে?

নারীমূর্তি : কৈবর্তদের মেয়ে ফুলি। একখানা কাপড়—একখানা মাত্র কাপড় সাত জায়গায় জোড়া তালি দিয়ে···কোন রকমে··· আঃ ওঃ

দিব্যেন্দু : কোথায় সে কাপড়?

নারীমূর্তি : সন্ধ্যেবেলা তালপুকুরে গা ধুতে গিয়ে···ভাবলাম—কাপড়খানা ভিজলে আর তো নেই, তাই খুলে রেখে ডুব দিয়েছি, উঠে আর পেলাম না, কে চুরি করে পালিয়েছে।

[বাড়ীর বুড়ো চাকর গোবিন্দ ঢোকে]

দিব্যেন্দু : ডাক্তার এসেছে?

গোবিন্দ : আসছেন।

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ, তারপর?

নারীমূর্তি : হঠাৎ দেখলাম কারা আসছে। তোমাদের খিড়কির দোর খোলা ছিল। ঢুকে পড়লাম, ঝোপের ভেতর থেকে দেখলাম তোমাদের দারোয়ান সব দরজায় তালা দিয়ে গেল। আর পালাতে পারলাম না। আঃ ওঃ, তা বাবু গুলি করে মেরে ভালোই করলে। আমি বেঁচে গেলাম।

দড়ি

আশা দেবী

আকাশ ছেয়ে গেছে ঝড়ের মেঘে।

ঠিক এক মুহূর্তে শঙ্করের মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার কথাগুলো। কোন এক বেদে বাঁশী বাজাচ্ছে আর তাই শুনে আকাশে জেগে উঠেছে অগ্নিবরণ নাগ-নাগিনীর দল। কাজল কাজল মেঘ আকাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ যেন কেমন থম থম করতে লাগলো আকাশ। ঝড় আসবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝুলন্ত কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল শঙ্কর। মনেও ওর যেন ঝড় বইছে। ঝড়ের হাওয়ায় দুলছিল কড়ি কাঠে ঝুলন্ত ফাঁসির দড়িটা। ওটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে শঙ্করকে।

দূরের আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ—মাঠে মেটে মেটে জ্যোৎস্না বাইরের পৃথিবীটাকে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মত লাগছে।

বাড়ীটা ভাড়া নেবার সময়ই কিপার আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। বলেছিল ঃ বাবু বাড়ীর মালিক বিদেশে থাকেন। বাড়ীটা দেখাশুনা আমিই করি। গত বছর এক বাবু এখানে এসে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে গেছে। তারপর থেকে এ বাড়ী পড়েই আছে। আমি থাকি পাশেই। দরকার হলে ডাকবেন আমাকে।

—তা দড়িটা তো ঝুলছেই, ওটাকে কেটে ফেলতে পারনি। অমন একটা বিশ্রী জিনিস কি ঘরে রাখে। ওটা ছিঁড়ে ফেল। কিপার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে তাকিয়ে থেকে বললে না বাবু। ও পারি না। ও দড়ি আমাকে নামাতে বলবেন না। ওতে হাত দিলে আমাকে আর বাঁচতে হবে না। চটে গিয়ে শঙ্কর বললে—না নামালে। বাড়ী তোমাদের। তোমাদের পাঁঠা তোমরা ঘাড়ে কাট আর ল্যাজে কাট তাতে আমার কী? কিন্তু আমার কোন বিপদ হলে মজা বুঝিয়ে ছাড়বো।

কিন্তু তখন ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলেছিলাম এখন মনে হঠাৎ আসবার সময় সুমিতার সঙ্গে ঝগড়া করে এভাবে একা একা এসে এ বাড়ী ভাড়া না নেওয়াই উচিত ছিল। জীবন কী খেলার জিনিস?

কিন্তু এখন যত রাত বাড়ছে ততই যেন মনে হচ্ছে ওই ফাঁস দেওয়া দড়িটা যেন আরো—আরো বেশী ঝুলে আসছে। আসছে শঙ্করের গলার ওপর নেবে। স্ত্রী সুমিতার সঙ্গে সকাল বেলাতেই একটা কুৎসিৎ ঝগড়া হয়ে গেল। পুরোনো বন্ধুর ছেলে অরবিন্দ শঙ্করের কাছে আসে প্রায়ই। ইদানিং তার আসাটা যেন বড্ড বাড়াবাড়ি ঠেকছে শঙ্করের চোখে। সে আসে ঠিক শঙ্কর বেরিয়ে গেলে, যায় শঙ্কর ফেরবার আগে। এর অর্থ কী সে বোঝে না?

সন্দেহ? হ্যাঁ, সন্দেহ একটা আগে থেকেই মনে ছিল। একদিন সেই সূত্র ধরে শঙ্কর অসময়ে বাড়ীতে ফিরে এলো এবং দেখলো সুমিতা আর অমিতাভ বারান্দায় বসে বসে চা খাচ্ছে আর গল্প করছে। এমন মিষ্টি করে হাসতে পারে সুমিতা? আজ পাঁচ বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে কখনও এমন মিষ্টি করে হাসতে দেখেনি সুমিতাকে শঙ্কর বিয়ের আগের সমস্ত মিষ্টত্ব যেন তীব্র হলাহলে রূপান্তরিত হয়েছে সুমিতার। প্রতি মুহূর্তে সে তিক্ততার সৃষ্টি করে অকারণে, আর বারে বারেই বলে এমন জানলে আমি খনই বিয়ে করতাম না তোমার মত একটা অপদার্থকে।

—কি জানলে? প্রশ্নটা অমিতাভই করে।

—তোমার বাড়ী নেই। ভাড়া বাড়ীতে মাত্র দু'খানা ঘরে তুমি থাক।—মাইনে—

—চুপ কর সুমি। তুমি সব জেনে শুনেই আমাকে বিয়ে করেছ। এখন যত সব বাজে কথা বলে সংসারে অশান্তি আনবার চেষ্টা করছো। বাপের বাড়ীতে তুমি বুঝি রাজ প্রাসাদে থাকতে। আমি বিয়ের আগে তোমাকে দেখিনি? কখনও একবেলা খেতে কখনও দু'বেলাই উপোস। আমার কাছে এত কথা বলো না। আমি তোমাদের হাঁড়ির খবর সব জানি।

জ্বলে ওঠে সুমিতা। —কী সব জানো? সব জেনে শুনেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। এখন ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে বসে থাকলে কী হবে। —তুমি যেমন আমাকে জেনেছ আমিও তেমনি তোমাকে জেনেছি এটা ঠিকই। কিন্তু শুধু আমার দুঃখ

তোমার ক্যামোফ্লেজটা ধরতে পারিনি।

শঙ্কর চুপ করে গেছে কথার মাঝেই। সে জানে মেয়েরা যখন নীচ হয় তার সঙ্গে বুঝি আর কারো তুলনা চলে না। স্বার্থের জন্যে ওরা সব করতে পারে কিন্তু মনে মনে এই তিক্ততাকে লালন করে করে সুমিতার ওপর ওর নিজের অজ্ঞাতসারেই দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। সেটা সে বুঝলো যখন অমিতাভ আর ওকে নিভৃতে আলাপ করতে দেখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সুমিতা সম্পর্কে সমস্ত রোমান্স ছোট-বেলায় দেখা আকাশের বুকে রামধনুর মত মিলিয়ে গেল।

ঘর, সংসার, স্ত্রী, সন্তান সবই সে চেয়েছিল। কিন্তু না সুমিতার ওপর সে বড্ড বেশী করে আশা করেছে। যাকে দিয়ে যা হবার নয় তার কাছে তা চাইলে হতাশ হতেই হবে। এর তো কোন উপায় নেই।

একটা কাল পেঁচা ডেকেই চলেছে—নিম—নিম—নিম। বুকটার মধ্যে কেমন কেঁপে উঠলো শঙ্করের। আবার সে তাকালো দড়িটার দিকে। দড়িটা দোল খাচ্ছে মহাশূন্যে। কড়ি-কাঠে। কিন্তু ঘরের দরজা তো বন্ধ তাহলে দুলছে কেন? হাওয়া পেল কোথায় কিংবা ওকেই ডাকছে দুলে দুলে। বুকের মধ্যে কেমন দুড় দুড় করে কাঁপন ধরছে শঙ্করের—বাইরের ঝড় যেন আরো দামাল হয়ে আসছে।

টিক—টিক—টিক। একটা ধেড়ে টিকটিকি হেঁটে চলে গেল। যাক তাহলে ঐ দড়িটার ওপর দিয়ে হাঁটছিল ওটা তাই দড়িটা দুলছিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো শঙ্কর।

হঠাৎ একটা বাদুর ডানা ঝটফট করে উড়ে গেল। দূরে গোড়ানিম গাছে বসে বসে একটা শকুনের ছানা কেঁদেই চলেছে একটানা। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ। সে একবার তাকিয়ে দেখে নিল।

শঙ্করকে কী মৃত্যু ডাকছে। ওর মা বলতেন, আত্মহত্যার কথা ভাবলে মৃত্যু তাকে ভর করে। ওর ঘাড়ে কী তাহলে মৃত্যুই ভর করলো। কার জন্যে সংসার, স্ত্রী তাকে বোঝে না—মা বাবা তাকে স্বার্থপর ভাবে। সে ডাক্তার নয় ইঞ্জিনীয়ার নয়—অন্য ছেলেদের মত কৃতী নয়। তাই হয়তো সুমিতাও ওকে অবজ্ঞা করে বাবা মার মত। হাতের মুঠোয় পাবার পর যাদের ভালবাসায় ক্লান্তি আসে সেই ধরনের মানুষ সুমিতা। শঙ্করকে সে ছেঁড়া কাপড়ের মত ফেলে দিয়ে আবার নতুনের পেছনে ধাওয়া করেছে। এই সুমিতার অভ্যাস।

দড়িটার দিকে আবার তাকালো শঙ্কর। দড়িটার কী চোখ আছে—। ওকে কি তার দৃষ্টি দিয়ে সে সম্মোহিত করে রেখেছে। উঠতে দিচ্ছে না। নড়তে দিচ্ছে না। না—ভয়ে তার এমন হচ্ছে, সে ভয় পেয়েছে। থমথমে রাত। চারদিকে কুকুর ডাকছে। কোথায় যেন একটা কুকুর করুণ সুরে কেঁদে চলেছে। আর শঙ্করের মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে হিমেল বাতাস বইছে—তার সংগে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন কার। সেই অদেহীর নয় তো? না একা এভাবে না এসে সুমিতাকে নিয়ে এলেই হতো। আবার সুমিতা? ভয়ে পেয়ে শঙ্কর ভাবছে এ রকম। নিজেকেই ধমকে দিল শঙ্কর। সুমিতার সঙ্গে আর নয়। সুমিতার কাছ থেকে সরে এসে জীবনের সম্পূর্ণ একটা ছবি সে পেল যেন। কোন নতুন আশ্চর্য সত্য তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না। কোন নতুন বিস্ময় তার মনের ভেতর আর সাঁড়াসাঁড়ির বান ডাকাবে না। কোন নতুন সম্ভাবনাময় জীবন তাকে আর উৎসাহিত করে তুলবে না। তবে? তবে আর সুমিতার কথা কেন? সে তো চলেই এসেছে।

দড়িটা নেমে আসছে। দড়ি—মানেই মৃত্যুর ফাঁস। শঙ্কর ঘেমে উঠলো।

দরজায় ধাক্কা পড়লো—বাবু দরজা খুলুন। আমি। শঙ্কর শক্ত হয়ে রইলো। না। সে দরজা খুলবে না কিছুতেই।

—বাবু আমি কিপার রাম সিং।

লাফ দিয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে দু'হাতে রামসিংকে জড়িয়ে ধরলো শঙ্কর।

—তুমি এসেছ? দুচোখে আনন্দ দীপ্তি শঙ্করের।

—জলের কুঁজোটা দিতে এসেছি বাবু। রাতে যদি তেষ্টা পায়।

—দাও। পুরো এক গ্লাস জল দাও। তেষ্টা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আর ওই চেয়ারটা আনতো দড়িটা ছিঁড়ে ফেলি। শঙ্কর পাগলের মত দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে কুকুরের মত হাঁপাতে লাগলো।

জানালা খুলে দিলো শঙ্কর। ঝড় থেমে গেছে। সুন্দর জ্যোৎস্না পড়েছে গোড়ানিম গাছটার ওপর। শকুনের বাচ্চাটার কান্না থেমে গেছে এখন। দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লো সে স্টেশনের দিকে। সে বাড়ী ফিরে যাবে ভোরের গাড়ীতেই। দাবি কেউ কারু হাতে তুলে দেয় না আদায় করে নিতে হয়।

শুভঙ্কর ঘুমোতে চায়

শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমিংওয়ের সমুদ্রাভিযাত্রী বৃদ্ধ জেলে প্রিয় ছেলেটিকে বলছে : If you were my boy I'd take you out and gamble. But you are your father's and your mother's and you are in a lucky boat.

বইখানা উল্টে রেখে দিয়ে ভূমি-শয্যায় সটান শুয়ে পড়লো শুভঙ্কর মিত্র। চোখ বুঁজে একটা পদার্থের মতো প'ড়ে রইলো। মন অথবা ব্রেইনে ওর চিন্তার পরিক্রমা।

অপর পিতা-মাতার একটি ছেলেকে তা'র জন্মাবধি শুভঙ্কর আপন সন্তানের মতোই লালন করেছিলো। না ; কোনো ফাঁক ছিলো না। ছেলেটির প্রতি শুভঙ্কর ও তা'র স্ত্রীর বন্ধনহীন গ্রন্থির চেয়ে শক্তগ্রন্থি আপন মাতা-পিতা ও সন্তানের ক্ষেত্রেও অবাস্তব।

কিন্তু সেও 'দ্য ওল্ড ম্যান্ এ্যাণ্ড দ্য সী'র ওল্ড ম্যানের কথা-মতোই ছিলো অপর পিতা-মাতার অর্থাৎ তা'র নিজের পিতা-মাতার সন্তান। সুতরাং সে গ্রন্থির বন্ধন হয়তো বা স্বাভাবিক-ভাবেই শিথিল হয়ে গেলো।

শুভঙ্করের বুকের কোথায় যেন একটা মোচড় দিচ্ছে।

শুভঙ্কর মিত্রের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিটি অবসর-মুহূর্ত ওকে বেদনা-বিহ্বল ক'রে তোলে। ও চায়, ও চেষ্টা করে কাজ-কর্ম, লেখা পড়ায় আত্ম বিস্মৃত হয়ে থাকতে। কিন্তু, কিছুই ভালো লাগে না।

ওল্ড ম্যান তার প্রিয় 'বয়'-কে বলেছিলো : and you are in a lucky boat.

শুভঙ্করের প্রিয় ছেলেটিও তা'র জন্মলগ্ন থেকেই যখন শুভঙ্করের সংসারের সংস্পর্শে এসেছিলো, তখন, হ্যাঁ, শুভঙ্করও চ্যালেঞ্জ ক'রে বলতে পারতো যে তা'র সংসার-নৌকাও অবশ্যই সৌভাগ্য ভরপুর ছিলো। ওল্ড ম্যানের ভাষায় 'lucky boat'. কিন্তু ছেলেটির তেরো বছর বয়সে শুভঙ্করের স্ত্রী লোকান্তরিতা হওয়ার পর থেকে শুভঙ্করের এটা উপলব্ধি যে সৌভাগ্য ব'লে কোনো কিছুর সার্শলেশ মাত্রও ওর জীবনে নেই।

বৃদ্ধ জেলের কথা মতো তা'র নৌকো আর শুভঙ্করের জীবন দু'টোই সমান দুর্ভাগ্য প্রতীক।

ওল্ড ম্যান ভেবেছে কিম্বা দেখেছে যে তা'র সৌভাগ্যের কপাট অবরুদ্ধ। বলেছে : I have no luck any more. But who knows, May be to-day, Every dy is a new day.

ওলড ম্যান নতুন দিনে নতুন আশার প্রত্যাশী ছিলো। যে কোন নতুন দিনে নতুন সৌভাগ্যের সমাগম হ'লেও হ'তে পারে—এ আশায় সে একেবারে জলাঞ্জলি দেয় নি।

কিন্তু শুভঙ্কর ? ওর প্রবল প্রত্যয় : "ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।"

শুভঙ্করের জবন সকরুণ নিঃসঙ্গতায় জর্জর। কাজ কর্ম, লেখা-পড়া ছাড়াও ও আজকাল তৃতীয় মাধ্যমের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে, মনকে শান্ত, নিস্তরঙ্গ রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেটা না কি সেই সর্বময়ের করুণা ব্যতীত সম্ভব নয়। সেটা না কি মানুষের চেষ্টা-নির্ভর নয় ; ঈশ্বরের কৃপা নির্ভর।

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা অত্যন্ত কৃপণ। আশ পাশের অজস্র মানুষের জীবনই তার অকাট্য প্রমাণ। অবশ্য জাগতিক জীবন। আর, সেই অজস্রদেরই একজন তো শুভঙ্কর মিত্র।

সুতরাং...

দেখা গেলো স্রোতের ধারা বিপরীত-মুখী। শুভঙ্করের জীবন নিস্তরঙ্গ হওয়ার পরিবর্তে সেখানে ঊর্মির আলোড়ন ফেঁপে ফুলে উঠতে চাইছে।

আলোড়ন তুলছে সুদক্ষিণা সেন।

সুদক্ষিণা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সেটা সত্য হবে অথবা অসত্য, তা' হলপ্ ক'রে বলা যায় না। কারণ, সুদক্ষিণারা দু'জ্ঞেয়—এটা যেমন এদেশের প্রবাদ ; তেমনিই বিদেশেরও প্রবাদ : between a woman's 'yes' and

'no', there is no room for a pin to go.

সুদক্ষিণা ডগমগে একটা সতেজ সুপুষ্ট রজনীগন্ধার ডাঁটা। শোভা ও সৌরভে গরবিনী। দক্ষিণা বাতাসের দমকে রজনীগন্ধার ডাঁটা যখন এদিক ওদিক হেলতে দুলতে থাকে, তখন এদিক মনে করে: ও আমার। আবার, পরক্ষণেই ওদিক মনে করে: ও আমাকেই নতি জানাচ্ছে।

পর্যাপ্ত পুষ্পভারাবনত ওই ডাঁটো রজনীগন্ধার ডাঁটা ও সুদক্ষিণার গোত্র হুবহু এক।

"যে মানুষ অনেক দেবতার পূজার আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে' স্তব করে। দেবতাদের বুঝতে কিছু বাকি থাকে না; অথচ খুশীও হন।"—এটা রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক উদ্ধৃতি। আর এর বাস্তব রূপায়ণ: শুভঙ্করের প্রতি সুদক্ষিণার প্রতিশ্বাস।

অন্যান্যেরা কি বোঝে আর কি বোঝে না, কে জানে? শুভঙ্করের মনে সুদক্ষিণার কথা উদয় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু ওর মনে পড়ে "মরীচিকা" কথাটা।

প্রতপ্ত মরুভূমিতে প্রখর সূর্য কিরণে জল ভ্রম। মনে হয়: সকল তৃষ্ণার অবসান বুঝি বা ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারলেই। ভ্রম। তবুও ভালো লাগে। আবার ভ্রম ভেঙেও যায়।

দিনভোর বিরক্তিকর বৃষ্টি। গুমোট গরম। প্যাচপেচে ঘাম। উপরন্তু লোড্-শেডিং এর বর্বর ব্যভিচার। নিঃসঙ্গ শুভঙ্করের নির্জন ফ্ল্যাট নিরেট স্তব্ধতায় গর্বিত। অধিক পালের যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে মাথাটা বুঝি ফেটেই যাবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর শীতলপাটিতে এলায়িত দেহ শুভঙ্কর অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে ভাবছে প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণের মতোই জীবনে অর্থাকর্ষণও অবধারিত সত্য।

সপ্তাহখানেক আগে সুদক্ষিণা এসেছিলো শুভঙ্করের অসুস্থতার খবর পেয়ে ওকে দেখতে। কুশল সংবাদ বিনিময় ও কফির পাত্র নিঃশেষ করে সুদক্ষিণা সুমিষ্ট কণ্ঠে ও সুকণ্ঠ ভঙ্গীতে শ' পাঁচেক টাকা চেয়েছিলো। ওদের প্রতিবেশী পরিবার পশুপতিনাথ দর্শনে পরের সপ্তাহেই নেপাল যাচ্ছে। তাদেরি সঙ্গে তীর্থযাত্রা অথবা দেশ-ভ্রমণে অভিলাষিনী সুদক্ষিণাও। তাদের প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। এই টাকাটা পেলেই সুদক্ষিণাও প্রস্তুতিপর্ব শুরু করতে পারে।

লজ্জা-কুণ্ঠায় নতশির শুভঙ্কর পরিস্থিতির চাপে প'ড়েই অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলো। নিঃসহায়া আত্মীয়ার বিপজ্জনক অসুস্থতায় অতি সম্প্রতিই ওকে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অতএব, অনটন। এ অক্ষমতা যেন শুভঙ্করের অপরাধ; এমনিভাবেই ও সুদক্ষিণার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলো।

তারপর?

হ্যাঁ; সপ্তাহখানেক অবশ্যই অতীত হয়েছে। শুভঙ্কর এখনো সুস্থ নয়। সুদক্ষিণা কিন্তু ইতিমধ্যে আর আসে নি।

উঃ! গুমোট গরম কি অসহ্য! অন্ধকার কি অস্বাভাবিক! দেহ-মনের অবসাদ কি অপরিসীম।

অবশেষে যেন লোড শেডিং-এর অন্ধকারকে অবজ্ঞা করতেই বহু চেষ্টা ও কষ্ট করে উঠে শুভঙ্কর একটা মোম-বাতি জ্বালালে।

ঘটনার সমাপতন! সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলো সুদক্ষিণা। ঘর যে আলোকিত হলো,—তা'সে যতো স্বল্পই হোক, সেটা মোমবাতির মুমূর্ষু অথবা আলোর প্রভাবে সুদক্ষিণার দাক্ষিণ্যে, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলো না শুভঙ্কর।

অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবসুদক্ষিণার। ওর প্রথম কথা: আমার কিন্তু একটুও সময় নেই। মোটেও বলতে পারবো না। শুধু জানাতে এলাম, কালই ভোরের প্লেনে নেপাল রওনা হচ্ছি।

দুর্বল কণ্ঠে বললে শুভঙ্কর: সুসংবাদ, সন্দেহ নেই। ঈশ্বর এমনি ভাবেই তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

—তুমি ভালো আছো তো?

নিরুত্তাপ প্রশ্ন সুদক্ষিণার।

—দেখছোই তো। মন্দ কি?

নিরুৎসাহ উত্তর শুভঙ্করের।

—খুব ভালো আছো বলে তো মনে হচ্ছে না। ওষুধপত্র নিয়মিত খাচ্ছো তো? শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

—ভালো থাকার এলাকা ভাগ্যবানদের জন্য। আমাদের ক্ষেত্রে ওটা "আউট অফ বাউণ্ড।" তা হোক। কিন্তু, তোমাকে যে একটু কফি করে খাওয়াবো, তারও তো কোনো উপায় দেখছি না। লোড্ শেডিং। হীটার জ্বালানোর প্রশ্নই ওঠে না। আর স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে জল গরম করতে তো—

শুভঙ্করের অসমাপ্ত কথার মাঝেই অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় এক নিঃশ্বাসে বলে চললো সুদক্ষিণা: না, না, না। আমার এতোটুকুও সময় নেই। সারাদিন, ঘোরাঘুরি করেছি। এই তো একটু আগে প্লেনের টিকেট পাওয়া গেলো। কিছুই সম্ভব হতো না। যদি না প্রফেসার ভাবক সমস্ত টাকা দিয়ে; সারাদিন সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে টিকিটের জন্যে এতো চেষ্টা করতেন। সত্যিই, ওঁর এ উপকার ভোলবার নয়। নীচে ট্যাকসিতে বেচারী এতোক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বিস্ময় মিশিয়ে বললে শুভঙ্কর: কি আশ্চর্য! তাঁকেও এখানে নিয়ে এলে পারতে তো। রাস্তায় অপেক্ষা—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুদক্ষিণা প্রায় ঝেঁঝে উঠলো: না, না। আমার আর এক মুহূর্তও সময় নেই। এখনি বাসায় ফিরে সমস্ত গোছগাছ করতে হবে। ভোরেই এয়ারপোর্টে হাজির হতে হবে। কোনো আয়োজন নেই। আচ্ছা, আমি চলি। তার ওপর রাস্তা-ঘাট এখানে জলবন্দী তো সেখানে জ্যাম্। কতোক্ষণে যে বাসায় পৌঁছুতে পারবো—কে জানে?

গজ্‌গজ্ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো সুদক্ষিণা।

—তোমার যাত্রা আনন্দময় ও প্রত্যাবর্তন নির্বিঘ্নে হোক।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো শুভঙ্করও।

—না, না। তোমাকে উঠতে হবে না। তুমি বোসো।

বলা শেষ হতে না হতেই ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো সুদক্ষিণা।

অন্ধকার সিঁড়িতে ওকে আলো দেখাবার জন্যে টর্চ হাতে এগিয়ে গেলো শুভঙ্কর।

কিন্তু সুদক্ষিণা আর একটিবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

অন্তরে একটা অরুন্তুদ যন্ত্রণা অনুভব করছে শুভঙ্কর। মাথার যন্ত্রণাও দুঃসহ। দেহ-মনের ব্যথা-বেদনা যেন ক্লিশিত ওর সহিষ্ণুতার সীমানা অতিক্রম করবেই।

কষ্টকর ভঙ্গীতে শীতলপাটির ওপর দেহ এলিয়ে দিতে দিতে শুভঙ্করের মনে হলো: ও ও যদি সমুদ্রাভিসারী জেলে সেই বৃদ্ধের মতো বলতে পারতো—And pain does not matter to a man.

কিন্তু শুভঙ্কর তা বলতে পারে না। কারণ, ওর এখন মনে হচ্ছে: Life is woe and hope is dumb.

আর, দ্য ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দ্য সী র নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের বক্তব্য ছিলো: It is silly not to hope Besides I belive it is sin.

লোড শেডিং যেন ক্ষতের বাঞ্জনে অপমানের ফোড়ন। যে কোনো যন্ত্রণাকে দুর্বিষহ করে তুলতে ওর কার্য-কারিতা অমোঘ।

যন্ত্রণা জর্জর শুভঙ্করের মনে ক্ষোভের বিশৃঙ্খল সংক্ষোভ।

বিদ্যুৎসঙ্কট কি অনন্তকাল চলবে? কোনো সভ্য দেশ কি দীর্ঘ দশ বছরের সময়েও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান না হয়ে উল্টে তার নিয়মিত ক্রমঅবনতির কথা ভাবতেও পারে?

আলো নির্বাপিত। পাখা নিবাত। হীটার নিরুত্তাপ। সবকিছু অসহ্য মনে হচ্ছে শুভঙ্করের।

ওল্ড ম্যান কিন্তু ছিলো প্রখর বাস্তব-বাদী ভিন্ন উপলব্ধি তার। যা নেই, তার কথা সে ভাবতেই চায় না। বলে: Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with what there is.

কিন্তু, আমার জীবনে কি আছে? কিছু করবার মতো কিছু আছে কি আমার জীবনে? শুধু শূন্যতা। আকাশের মতো নিঃসীম শূন্যতা। অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা দিক দিগন্তের মতো। এ নিয়ে কি কিছু করা সম্ভব?

শুভঙ্করের মনে অবিন্যস্ত চিন্তার অন্তহীন মিছিল। চলছে তো চলছেই। তাদের ক্লান্ত কণ্ঠে একঘেয়ে স্লোগান: নেই, নেই, নেই।

নেই। সুদক্ষিণাও নেই। চলে গেছে। চলে গেছে, শুধু তার বাসায়; কিম্বা তার চেয়ে বহু দূরে এভারেষ্টের পাদ দেশে কাঠমাণ্ডুতে,—তাই নয়। তার চেয়েও দূরে অনেক দূরে। হয়তো বা সেই বিন্দুতে, যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়।

নিবিড় অন্ধকারের অঙ্কে শীতল পাটিতে শুয়ে শুয়েই অসহ্য ক্লান্তি বোধ করছে শুভঙ্কর। বিষণ্ণ চিন্তার ক্রমান্বয় নিষ্পেষের ক্লান্তি। আর পারছে না, শুভঙ্কর। ওল্ড ম্যানের মতোই ওর নিজেকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে: you are tired now you are tired in side.

নির্জীব শুভঙ্কর দক্ষিণের খোলা জানলার বাইরে শ্বেত দৃষ্টি মেলে পড়ে রয়েছে। সেখানেও নিবিড় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কতোখানি বর্তমান অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলো—হুঁস নেই শুভঙ্করের।

অবশেষে ওর নজরে পড়লো ছিন্ন মেঘের এক ফাঁকে এক ফালি শীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ আর মিটমিটে দু'একটা তারা।

ঘুম নয়। নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা আর ক্লান্তিতে শুভঙ্কর চোখ মেলে চাইতে পারছে না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে ও।

আহা! এই চোখ বোজা যদি ঘুমের হোতো? ঘুমোতে চায় শুভঙ্কর। ওল্ড ম্যান যেমন বলেছিলো: I must sleep.

বলেছিলো: ওই চাঁদ, ওই সূর্য, ওই তারারা ঘুমোয়। এমন কি ওই সমুদ্রও মাঝে মাঝে ঘুমোয়। আমাকেও ঘুমোতে হবে। I could go with out sleeping But it would be too dangerous.

না। আর পারছে না শুভঙ্কর। ও উঠে টর্চ জ্বেলে ড্রয়ারের মধ্যে থেকে টাবলেট বার করে খেয়ে নিয়ে আবার সটান হয়ে ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়লো।

হিপনোটিক ট্যাবলেটস।

শুভঙ্কর ঘুমোতে চায়।

—(*)—

আসুন! দেখুন! কিনুন!

বম্বে ডাইংয়ের মনের মত

* শাড়ী
* সার্টিং-স্যুটিং
* কাট-পীস্
* বেডলিনেন
* তোয়ালে
* গৃহসজ্জার উপকরণ

ত্রিমূর্তি

১২, জহরলাল নেহেরু রোড,
কলি-১৩ * ২৩-১২৮২

ঐতিহাসিক উপন্যাস

সুরত সমাধি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শারদীয় সত্যযুগ ১৩৮৪

আগে পাশাপাশি বর্শা হাতে দু'জন অশ্বারোহী, তাদের পিছনে আর দু'জন। তারপর এক জোড়া সাদা ঘোড়ায় টানা মখমলের ঘেরা টোপে ঢাকা চার চাকার জাঁকাল। তার পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে আরো দু'জন অশ্বারোহী।

তাঞ্জাম হাজার দুয়োরীর বড় ফটক পেরিয়ে ধীরে ধীরে এসে থামল গঙ্গা তীরবর্তী দক্ষিণ মুখো সিঁড়ির ঠিক সামনে।

সিপাই শান্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল, হাজির হো নবাব উল মুলুক।

সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন নবাবের পহেলা মুন্সী এনায়েৎ খাঁ। তিনি এগিয়ে এসে ঘেরাটোপ সরিয়ে দোর খুলে দিলেন গাড়ীর।

নবাব নেমে নিঃশব্দে তলোয়ার খানা তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়েই হন হন করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

এক নজরেই এনায়েৎ খাঁ বুঝলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মনের আকাশে গাঢ় মেঘ জমা হয়েছে। কি তার কারণ? কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী, রাজবল্লভ ও উমিচাঁদের দল ফিরিঙ্গি কোম্পানীর বড়কর্তা ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ফাঁদছেন, সেইজন্যে কি? কিম্বা বর্গীবাহিনীর অধিনেতা আনন্দ ভাস্করের বিরাট ফৌজ নিয়ে রাজমহল এলাকায় ছাউনি গেড়েছেন, সেইজন্যে কি? কিন্তু এর কোনটাইত নূতন ব্যাপার নয়, অনেক দিন থেকে চলছে, চলবেও অনেক দিন।

বুদ্ধিমান এনায়েৎ খাঁর মগজে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত উদয় হল একটা নূতন চিন্তার। কোন নারীর রূপ লাবণ্য আকর্ষণ করে নি ত নবাবের নজর। নিশ্চয় তাই।

শেঠ জগৎ রামের পৌত্রের অন্ন প্রাশনে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন নবাব। সেখানে বসেছিল আজ মস্ত নাচ গানের আসর। লখনৌ এর বিখ্যাত বাঈ ফৈজী বেগম এই উপলক্ষে এসেছেন, দু'লাখ টাকার বিনিময়ে সাত রাত্রি মুজরা করতে।

এই নর্তকী ফৈজী ওরফে ফয়জান বিবি দিল্লীর নামকরা পাখোয়াজী ভীমরাজ সিং-এর মেয়ে। মা তাঁর লখনৌর প্রসিদ্ধ গায়িকা রোশেনারা বেগম। এই রকম বাপ মার শিক্ষায় মানুষ হয়েছেন ফয়জান, তাই চব্বিশ বছরে পা দিতে না দিতে তিনি গোটা ভারতবর্ষের মনোহরণ করেছেন নৃত্য গীতে। সবাই বলেন, গানে তিনি হলেন কোকিল, আর নাচে ময়ূর। আর রূপেরও খ্যাতি তাঁর অল্প নয়। রাজা উজির আমীর ওমরাহ দলে দলে নাকি কাড়াকাড়ি করেন তাঁর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্যে।

এই ফয়জানই কি কেড়েছেন নবাবের মন, যার ফলে থমথমে আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ করে ফিরে এলেন তিনি শেঠ মঞ্জিল থেকে? নিশ্চয় তাই।

নিজের অজান্তেই মুখে ফুটল তাঁর অল্প একটু বাঁকা হাসি। বুঝলেন আজ হক, কাল হক ব্যক্ত করবেনই নবাব সব কথা তাঁর কাছে। দরকার হলে চাইবেন সাহায্যও।

নীল পেয়ালায় খানিকটা সিরাজী ঢেলে নিয়ে তিনি এসে উঠলেন একপা একপা করে নবাবের সামনে, রাত্রের খাওয়া সম্বন্ধে তল্লাস নিতে।

নবাব অন্যমনস্কের মত বললেন, আজ আর কিছু খাব না। শরীরটা ভাল লাগছে না।

পেয়ালাটি সামনে নামিয়ে দিলেন এনায়েৎ খাঁ।

থেমে থেমে একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলেন সিরাজদ্দৌল্লা। ভঙ্গী কিন্তু একই রকম গম্ভীর।

এনায়েৎ খাঁ ইতস্তত করতে লাগলেন দাঁড়িয়ে থাকবেন, না চলে যাবেন।

হঠাৎ সিরাজ বলেন, খাঁ সাহেব, তুমি ত' আমার চিরকালের দোস্ত। অনেক বারের মত আর একবারও সাহায্য কর আমাকে।

কি-ব্যাপার বলুন আমাকে জনাব। দেহে যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ এই বান্দা সব কিছু করতে প্রস্তুত আপনার জন্যে।

আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নর্তকী ফৈজী বেগম। তাকে আমার চাই। দরকার হলে মুর্শিদাবাদের মসনদ ছাড়ব, কিন্তু ওকে ছেড়ে বাঁচা অসম্ভব আমার।

মাথা চুলকাতে লাগলেন এনায়েৎ খাঁ। মুহূর্ত মধ্যে জবাব দিতে পারলেন না, যেমন বরাবর দিয়ে থাকেন।

কি, কথা বলছ না কেন?

একটু ভেবে দেখুন জনাব। পেশাদার বাঈজী নবাবের প্রিয়পাত্রী হলে তা নিয়ে নানাজনে ঘোঁট করবে। বেগম লুৎফুন্নিসারও তাতে বিষম মনোবেদনা হবে। তাছাড়া ওর স্বভাব সহবৎ শিক্ষাদীক্ষা...

বাধা দিয়ে সিরাজ বললেন, দেখ খাঁ সাহেব, হয় পারা নয় না পারা, যে কোন একটা কথা ঠিক করে বল। বাজে যুক্তি, বৃথা তর্কে বোকা বোঝাতে চেওনা আমাকে।

এনায়েৎ খাঁ চতুর মানুষ, আর দড়ি টানা উচিত হবে না বুঝে বললেন, বহুৎ আচ্ছা জনাব। কৌশলে কার্য হাসিল করতে হবে। কাজেই দু একদিন সময় হয়ত লাগবে। তবে আলি এনায়েৎ হোসেন খাঁ যখন হাত দিচ্ছে, তখন জানবেন সাফল্য হবেই।

নবাব বললেন, এই ত' চাই। জিতা রহ দোস্ত। মানুষ বাসা বানায় শক্ত জমিতে, শান্তি তাতেই। কিন্তু সুখ হল স্রোতে গা ভাসানতে। ওটাও চাই, নইলে জীবনটাই হয়ে যায় অর্থহীন।

তা ঠিক, বললেন এনায়েৎ খাঁ, খাজা হাফেজ বলেছেন, আকাশের উড়ন্ত পাখী দশজনকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তাকে কেউ আপন করতে পারে না। আপন করে পেতে হলে পিঁজরায় আটকাতে হয় তাকে।

ধীরে ধীরে পেয়ালাটি নিঃশেষ করলেন সিরাজ, তারপর সেটি তুলে দিলেন মুন্সী সাহেবের হাতে।

মুন্সী বেরিয়ে গেলেন।

আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে পা দুটো টান করে এগিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চোখ বুঁজলেন নবাব।

॥ ২ ॥

দেউড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং। নৈশ পাহারার খটাখট জুতোর

শব্দ থেকে থেকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। নদী রক্ষীর বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কখনো দূরে, কখনো কাছে। আবার চারদিক ডুবে যাচ্ছে অতল নীরবতায়। একমাত্র জেগে আছে গঙ্গার কলধ্বনি।

কাচের আধারে জ্বলছে মৃদু মোমের আলো। বেগম লুৎফা বিনিদ্র চোখে বসে আছেন নবাবের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায় নবাব?

শেঠ মজলিসের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরেছেন তিনি, সে খবর পেয়েছেন বেগম। শরীর খারাপ বলে রাত্রে কিছু খান নি, সে খবরও পেয়েছেন। তাই আশা করেছেন শীঘ্রই শুতে আসবেন তিনি। অন্তত আসা ত' উচিত। কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা! মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেল, তবু নবাবের দেখা নেই।

অস্থির হয়ে বাঁদী শুশনারকে জাগালেন তিনি।

ডাকিয়ে পাঠালেন তোষাখানার দারোগা জান মহম্মদ খাঁকে। বললেন, খাঁ সাহেব, রাত্রি অনেক হল। নবাব এখনো শুতে আসছেন না কেন?

দারোগা সাহেব বললেন, নবাব আরাম কুর্শিতে বসে বসেই ঘুমুচ্ছেন। ডাকলে বিরক্ত হচ্ছেন, তাই আমরা তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করি নি। ওখানেই পাহারা বসিয়েছি।

কোন কথা না বলে জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে নিজেই রওনা দিলেন বেগম তোষাখানার দিকে। অগত্যা জান মহম্মদ খাঁকে খোলা তলোয়ার হাতে পিছু পিছু যেতে হল তাঁর।

নবাব কি ঘুমুচ্ছেন? না, চোখ বুঁজে নিঃশব্দে নিবিষ্ট মনে কি যেন ভাবছেন। আস্তে আস্তে কপালে হাত রাখলেন লুৎফা। নিষ্প্রভ চোখ দুটি মেলে তাকালেন তাঁর দিকে সিরাজ।

লুৎফা বললেন, শুনলাম শরীর ভাল বোধ করছ না বলে কিছু খাওনি। কিন্তু বিছানায় গিয়ে শোবেত। আমাকে জানাবে ত'কি হয়েছে। এখানে এই ভাবে একলা পড়ে আছ কি জন্যে?

ঠোঁটের কিনারে ম্লান হাসি টেনে এনে বললেন সিরাজ, শরীর খারাপ নয় লুৎফা। অসুখ ঢুকেছে মনে। এক ফোঁটাও স্বস্তি পাচ্ছি না তাতেই।

ডান হাতটা চেপে ধরলেন তাঁর লুৎফা। বললেন, চল, ঘরে চল। সব কথা শুনব। এখানে চার দিকে লোক লস্কর। কে কি শুনবে ঠিক নেই ত'।

নিস্তেজ মেরুদণ্ডটা কোন মতে সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন নবাব, তার পর সঞ্চরমান ছায়ার মত পিছু পিছু চললেন লুৎফার।

বিছানায় শুয়ে বললেন সিরাজ, চার দিকে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে লুৎফা। কলকাতায় কোম্পানী জোর করে কুঠি আর কেল্লা বানিয়েছে। নবাব সরকারের হুঁসিয়ারিকে গ্রাহ্য করছে না তারা। শুনছি সেনাপতি জাফর আলির সঙ্গে তলায় তলায় ষড়যন্ত্র আঁটছে তারা। এদিকে বর্গীরা ছাউনি ফেলেছে রাজমহলের জংলা পাহাড়ে। সেখান থেকে যে কোন সময় মুর্শিদাবাদে হানা দিয়ে সব তছনছ করে ফেলতে পারে তারা।

বেশত জাফর আলির বদলে নুরুল হোসেনকে পাঠাও ফিরিঙ্গী কোম্পানীর মোকাবিলা করতে, আর এবাদৎ আলির ওপর ভার দাও বর্গীর হাঙ্গামা ঠেকানর। দু'জনই ত ওঁরা ওস্তাদ জঙ্গী জওয়ান, আর সৈন্যদের মহলে ওঁদের খাতিরও আছে।

ভেবে দেখেছ কি, তার ফল কি দাঁড়াবে?

কি দাঁড়াবে?

যে চক্রান্ত আজ তলায় তলায় পাক খাচ্ছে, তা নখ দাঁত নিয়ে বাইরে প্রকাশ পাবে। হবে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ, আর আমাদের হতে হবে বন্দী।

তা কেন? আগে থেকেই জাফর আলি আর আসরফ খাঁকে কয়েদে ঢুকিয়ে দিয়ে সৈন্যবাহিনীর কাঠামোতে রদ বদল কর, আর রাজধানীর বিখ্যাত মানুষ যাঁরা, তাঁদের এক জমায়েৎ ডেকে কেন এই ভাঙাগড়া করছ তা বুঝিয়ে বল। পিছনে তাঁরা এসে দাঁড়ালে আর ভয়টা কি?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিরাজ বললেন, হায় লুৎফা! রাজধানীর বড় মানুষরা কি আর কেই আমার পক্ষে আছেন? আলিবর্দীর মৃত্যুকালে যে শপথ উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরা, সম্পদে বিপদে সব সময় আমার দিকে থাকবেন বলে, তাঁরা তা বিলকুল ভুলে গেছেন। জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাদ এক দিকে বর্গী সরদার ভাস্করজীর অন্য দিকে কোম্পানীর পয়লা কারকুন ক্লাইবের সঙ্গে সলাপরামর্শ করছেন।

কেন?

এই সুযোগে যদি আবার হিন্দু হুকমৎ ফিরিয়ে আনতে পারেন। যদি কোম্পানীর হাত ধরে ইউরোপ যন্ত্র ব্যবসা বাণিজ্য ছড়াতে পারেন।

কিন্তু কোম্পানীই হক, আর বর্গীই হক, কেউ একবার গেড়ে বসতে পারলে আর ছেড়ে যাবে এই সোনার খনি?

নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে বললেন সিরাজদ্দৌল্লা, ওঁরা তা বুঝছেন না লুৎফা। ওঁরা বলেন, আমি যেহেতু বাঙালী নই, কাজাক তুর্কী, তাই আমাকে হঠাতে হবে বাংলার মসনদ থেকে। সম্পূর্ণ স্বদেশী হুকমৎ চাই।

তিক্ত কণ্ঠে লুৎফা বললেন, কিন্তু সেভাবে বিচার করলে ওঁরাই কি বাঙালী? শেঠজী, উমিচাঁদ…

জেদের সঙ্গে যুক্তি চলে না লুৎফা। তাছাড়া হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীও মদৎ জোগাচ্ছেন ওঁদের পিছন থেকে। নাটোর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, সবাই আছেন।

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন সিরাজ, কিন্তু গলা জড়িয়ে এল তাঁর ঘুমে। নিঃশ্বাসের গতি হল দ্রুত ও সশব্দ।

লুৎফুন্নেসা সযত্নে মশারিটা গুঁজে দিয়ে এবং সবুজ আধারের মোমবাতিটা জ্বেলে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ালেন খোলা জানলার ধারে।

জ্যোৎস্নার জোয়ারে সারা দুনিয়া ভেসে গেছে। আকাশ পৃথিবী জলে মেশামিশি হয়ে সবটা দেখাচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন আলোর সমুদ্রের মত। দূরে দূরে দু'একখানা বজরা কিনারায় নোঙর ফেলে মাঝ নদীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোচার খোলার মত ভাসছে ছোট ছোট জেলে ডিঙি, তাতে মাছ ধরছে জেলিয়ারা, থেকে থেকে ঘোরানো জাল টোপরের মত মাথার

জ্যোৎস্নার জোয়ারে সারা দুনিয়া ভেসে গেছে।

ওপর তুলে চক্রাকারে ছড়িয়ে ফেলে।

দেখতে দেখতে মনে হল লুৎফার, পৃথিবী এত সুন্দর। কোথাও তার নেই এতটুকু মালিন্য, এতটুকু দৈন্য। তবে মানুষের জগৎটা কেন এমন অসুন্দর? এত ঈর্ষা, শঠতা, ষড়যন্ত্র কেন? কেন একজন যখন অপার বিশ্বাসে বন্ধু বলে গলা জড়িয়ে ধরছে, অন্যজন তখনই তীক্ষ্ণ হিংসার শাণিত ছুরি আমূল বুকে বসিয়ে দিচ্ছে তার আপন হীন স্বার্থ সাধনের অভিসন্ধী নিয়ে?

সেদিনের কথা স্মরণে আসতেই চোখে জল এল লুৎফার। নবাব আলিবর্দী তখন জীবিত। দৌহিত্র সিরাজের বিয়ে দিলেন তিনি মহা-ধুমধাম করে। আর সেই নব দম্পতিকে যৌতুক হিসাবে দিলেন কাটোয়া আর ভুবনেশ্বরে বৃহৎ দুটি তালুক। বললেন, গদী যদি নাও থাকে, এই দুটো থেকেই রাজার হালে দিন কাটাতে পারবে তোমরা।

আজ যদি তাই হত। যদি এই ঈর্ষায় আক্রোশে কণ্টকিত মসনদ জনগণকে ডেকে তাঁদের হাতে তুলে দেন সিরাজ, তারপর দু'জনে তাঁরা যদি চলে যান ঐ তালুকের আশ্রয়ে, তাহলে কি শেষ হবে না এই দুশ্চিন্তার? কি লাভ এই অনাহার অনিদ্রায় দিনরাত্রি বৃশ্চিক দংশনে ছটফট করার?

হঠাৎ কানে এল, লুৎফা ঘুমবে না আজ?

বুঝলেন নবাবেরও ঘুম আসে নি। শুধু এক একবার তন্দ্রা আসছে, আবার কেটে যাচ্ছে।

॥ ৩ ॥

হাজার দুয়োরী থেকে ক্রোশ আড়াই দক্ষিণে গঙ্গার ওপারে আলিবর্দী বানিয়েছিলেন তাঁর সখের বাগান খোস বাগ। সোনাই সুলতান, বিবি পসন্দ, আঙ্গুরই খুন রকমারি শাহী জাতের আমের গাছ, রকম রকম গোলাপ ও অন্যান্য সুগন্ধী ফুলের গাছ গঙ্গার কিনার থেকে অর্ধ চন্দ্রাকারে বেষ্টন করে আছে এই বাগানের সামনেটা। পিছনে পাশাপাশি দুটি সুন্দর বাড়ী, দুটোই এক চেহারার। একটা চিহ্নিত করেছিলেন আলিবর্দী তাঁর কবর রূপে। অন্যটায় ইচ্ছা ছিল তাঁর টাকশাল বসানর।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পরে কবরটা যথাস্থানেই তৈরী হয়েছে। কিন্তু পাশের বাড়ীখানা খালিই ছিল। মাঝে মাঝে নামী সাধু ফকির কেউ এলে বসাতেন এখানে মজলিস। কখনো কখনো সিরাজদ্দৌল্লা ইয়ার বকসী নিয়ে এখানে এসে করতেন গান বাজনার আয়োজন।

এই দ্বিতীয় বাড়ীর নাম এখন হয়েছে ফৈজী মহল। নর্তকী ফয়জান ফৈজী বেগম নাম নিয়ে এই মহলে ডেরা বেঁধেছেন নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়ে।

কেউ বলেন নবাব তাঁকে শাস্ত্র মতে বিয়েই করেছেন। কেউ বলেন করেন নি, তবে কোনদিন করবেন কথা দিয়েছেন। আসল ব্যাপার জানেন এনায়েৎ খাঁ। গঙ্গার বুকে ভাসমান বজরা রোশেনারা থেকে তিনিই ফয়জান বিবিকে ডাঙায় নিয়ে

এসেছেন, করেছেন নবাবের নর্ম সহচরী।

খাট পালঙ্ক, তৈজসপত্র, ছবি, হরেক সাজ সজ্জায় ঝলমল করা এই ফৈজী মহলে গঙ্গার দিকে উন্মুক্ত বারান্দায় চুল এলো করে কোলে সারেঙ্গী নিয়ে বসে আছেন ফৈজী বেগম। ডান দিকে পাখোজী ইয়ার জং সুর বাঁধছেন খুট খাট করে। প্রস্তুতি চলছে সান্ধ্য আসরের।

কিন্তু যাঁর জন্যে প্রতীক্ষা সেই নবাবেরই দেখা নেই।

কথা ছিল সূর্যাস্তের আগেই হাজির হবেন তিনি। কিন্তু বেলা গড়িয়ে ক্রমে অন্ধকার হল। ওপারে কুঞ্জঘাটার খেয়াঘাটে একে একে জ্বলে উঠল আলোর মালা। যাত্রী পারাপার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। নবাব এলেন না তবুও। কি হল তাঁর?

চার দিকে চলছে যুদ্ধবিগ্রহের পাঁয়তারা। ভেতরেও সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আবর্তিত হচ্ছে হীন চক্রান্ত। তারই বেষ্টনীতে জড়িয়ে পড়লেন কি নবাব?

সব কথা আনুপূর্বিক না জানলেও অনেক কথা শুনেছেন ফৈজী। সেই সঙ্গেই শুনেছেন যে নবাবকে গ্রাস করেছেন বলে তাঁর ওপরও কিছু মানুষ বিশেষ অপ্রসন্ন। হয়ত কোন দিন হিংস্র প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকেও।

উৎকণ্ঠা ক্রমে দুশ্চিন্তার রূপ ধরল ফৈজীর। মনে হল, এ কি করলেন তিনি? কেন এই ভুলের ফাঁদে পা দিলেন?

ঠিক এমন সময় মশালের আলোয় ঝকমক করে উঠল নদীর জল। সেই সঙ্গেই নকীব হেঁকে উঠল, হৈ হাজির নবাব উল মুলুক ই মুখসদাবাদ। নবাবের ময়ূরপঙ্খী এসে লাগল খোস বাগের ঘাটে।

আস্তে ব্যস্তে লোহার ফটক খুলে ঘাটের রাণায় নেমে এলেন ফৈজী নবাবকে স্বাগত করতে।

হাসি মুখে বললেন, জনাবের বিকেল কি মাঝ রাত্রি থেকে শুরু হয়?

তাঁর ডান হাতটি ধরে উঠতে উঠতে সিরাজ বললেন, না গো পিয়ারী, বিকেল ঠিক বিকেলেই হয়। কিন্তু দুষমণ আর দাগাবাজরা দিনের খবর রাখে না ত' মানুষের। খালি তারা অকাজের মঙ্গল সৃষ্টি করে আটকে রাখে। পথ ছেড়ে দেয় না এগিয়ে যেতে।

এই জন্যেই ত আমি বলেছিলাম জনাব যে উড়ন্ত আশমানের পাখীকে খাঁচায় পুরবেন না। জিঞ্জিরে বেঁধে দানাপানে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা আর শেখান বুলি বলান আমি চাইনি হুজুর। ওর জন্যে জন্মেছেন হাজার হাজার সতী নারী। স্বামী সংসার আর ছেলে পুলে নিয়ে মেতে আছেন তাঁরা দিব্যি। আমার ধরন আলাদা। অফুরন্ত আকাশে অফুরন্ত গান···এই আমার জীবন।

বারান্দার আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সিরাজ বললেন, আগে লাল পান দাও। বড্ড ক্লান্ত। তারপর দিচ্ছি তোমার সমস্ত কৈফিয়তের সোজা সহুত্তর।

পাশের কুশিটিতে বসে নবাবের খাস খানসামার আনা সুরাই থেকে নিজে হাতে পেয়ালায় ঢেলে দিলেন ফৈজী ফুটন্ত দ্রাক্ষা চোঁয়ান মদ। নিজেও নিলেন খানিকটা ঢেলে। খান না খান, চুমুক দিতে হয় তাঁকে পেয়ালায়, তা না হলে অখুসী হন নবাব।

ফৈজী বললেন, কৈফিয়ৎ দাবি করছি না জনাব। অজানা অনিশ্চয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কোন কিছু না ভেবে চিন্তে। এখনও ভয় আর উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি দিনে রাত্রে। গানই হল আমার জান। সে গানও ভুলতে বসেছি যেন এই কদিনেই।

কেন? গান গাও, যখন খুসী যত খুসী গান। সারেঙ্গী, সুর বাহার, বীণা, দিলরুবা, মৃদং মন্দিরা, যা চাই তাই আনিয়ে নাও। গায়েন বায়েন যত জন চাই বহাল কর।

ও সবের কথা বলছি না। ওর কোনটারই অভাব নেই আমার। আমি বলছি মনের কথা, যে মন সুরের ডানায় ভর করে হাওয়ায় উধাও হয়, সেই মনই যে আমার সমস্ত রং সব রস হারিয়ে দেউলে হয়ে গেছে। গান আসবে কোথা থেকে? কোন্ প্রেরণায়?

বাঁ হাতে ক'টি বেষ্টন করে কাছে টানলেন ফৈজীকে নবাব। কাঁধে লুটিয়ে পড়া তাঁর সুগন্ধী এলো চুলের গোছায় মুখ রেখে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, বড্ড একলা লাগে তোমার। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, না? আরো কিছুদিন বরদাস্ত কর দোস্ত, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে আমি পহেলী বেগম করে মসনদের অংশ দোব। তখন আর নিঃসঙ্গ মনে হবে না নিজেকে।

অভিমানাহত কণ্ঠে ফৈজী বললেন, একই কথা কেন বার বার বলেন জনাব? আমি বেগমও হব না, বাঁদীও না। আমি শিল্পী, তাই থাকতে চাই আমি। দোস্ত হতে চেয়েছিলেন, সাড়া দিয়েছি সে ডাকে। কিন্তু তখন কি জানতাম নবাব বাদশার দোস্ত হওয়া যায় না? হতে হলে হয় বন্দিনী বেগম হও, নয় পদাশ্রিতা বাঁদী হও। এই দুটোর ভয়েই সমস্ত আমন্ত্রণ ফেরৎ দিয়েছি আমি এত দিন!

সিরাজ ক্ষুণ্ণ হলেন।

অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, ভালবাসা অদ্ভুত জিনিস ফৈজী। তা প্রভুর মত ক্ষমতাও দেয়, আবার নোকরের মত আত্মসমর্পণও শেখায়। চুল চিরে বিচার করার সুযোগই হয় না কোন্ দিকটা কতখানি প্রাধান্য নিয়েছে। কোন্ দিকে পাল্লা ভারী।

কিন্তু ভালবাসাটা ত' চাই। চোখের নেশায় দেওয়া না হয়ে কারোকে কবজায় আনা এবং দেহটা নিংড়ে মুচড়ে ক্ষিধের তৃপ্তি করাকে ভালবাসা বলবেন কি জনাব?

সিরাজের ততক্ষণে মদের আবেশে চেতনায় ঘোর লেগেছে। মুখের কথা আসছে জড়িয়ে।

ভাঙা ভাঙা ভঙ্গীতে তিনি বললেন, যেতে দাও পিয়ারী, ও সব বৃথা তর্কে লাভ নেই। তুমি জ্বলন্ত আগুনের মত ঝলক সৃষ্টি করে নাচ, আর ধর ফুলন্ত গুলসানের গান। আমি দেখি, শুনি, আর বুঁদ হয়ে ডুবে যাই।

পায়ে ঘুঙুর পরে পাখোয়াজী

ইয়ার জংকে ইঙ্গিত করলেন ফৈজী। ডাকলেন ঈশার আলিকে সারেঙ্গী ধরতে।

সুরের আলাপ জমে উঠল অল্পক্ষণের মধ্যেই। জ্বলজ্বলে ঝড়ের আলোর নীচে এসে দাঁড়ালেন ফৈজী মসৃণ মখমলে জরির কাজ করা চুস্ত ও সালোয়ার পরে। গঙ্গার হাওয়ায় উড়ছে কচি কলাপাতার মত সোনালী শ্যাম ওড়না তাঁর কাঁধে।

দিব্য দ্যুতিময়ী বেহেস্তী হুরীর মত নাচতে নাচতে গান ধরলেন তিনি :

ক্যা তড়পতা দিল মে ?
নয়া বাহার গুলজার মহফিলমে।
বনায়া ফুলোঁকি চৌরন,
রোশনী জ্বালায়া ! হাজার,
মজরমে বৈঠ প্যারে……
হো খুস মুসকিল মে।

সিরাজ তখন সম্পূর্ণ অসাড় অচেতন হয়ে পড়েছেন।

দেহরক্ষী আসগর খাঁর আদেশে চারজন বাহক সন্তর্পণে ধরাধরি করে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ময়ূরপঙ্খীতে।

ফৈজী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আই খোদা রহমান !

॥ ৪ ॥

মুন্সী এনায়েৎ খাঁ কি করে নর্তকী ফয়জানকে নবাবের মুঠোয় নিয়ে এলেন, সে কাহিনী জানার আগ্রহ আছে নিশ্চয় সকলের। বলছি তা এখানে।

ফয়জান দিল্লী থেকে এলাহাবাদ হয়ে নিজের বজরা রোশেনারায় সরাসরি জলপথে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন, শেঠ মঞ্জিলে মুজরা করতে। রোশেনারা তাঁর মার নাম। বজরাটাও ছিল তাঁরই। এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর বজরা খুব কমই দেখেছেন কেউ। খাওয়ার ঘর, শোয়ার ঘর, চানের ঘর, গাওনা বাজনার আসর বসানর জন্যে দালান··· কি নেই তাতে ?

নিয়ান্নিশ পাড়ার নাগাল বরাবর গঙ্গায় নোঙর ফেলেছে এই বজরা এবং এতেই স্বাধীনভাবে বাস করছেন ফয়জান। ঘাট থেকে চৌদল চেপে যাচ্ছেন শেঠ মঞ্জিলে। গাওনা সেরে ফের ফিরে আসছেন। তাঁর এবং সঙ্গের লোকলস্করের ষোল আনা ভার নিয়েছেন শেঠজী জগৎরাম।

এই বজরায় গাওনার মেয়াদ শেষ হবার ঠিক দু'দিন আগে পিনেস ছুটিয়ে এসে উঠলেন মোল্লা বক্স কাদিরী মুর্খ সদাবাদের নাম করা ঘরোদী।

পর পর চার রাত্রি সঙ্গত করেছেন তিনি ফৈজীর সঙ্গে। আলাপ হয়েছিল তাইতেই।

সামনে পানের বাটা আর আতর দান এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে ফয়জান। নিজে হাতে জরিদার গোদা বালিশ এনে বসার জায়গা করে দিলেন মেঝেয় বিছান জাজিমের ওপর।

বললেন, আপনার মত পহেলা কসমের উস্তাদের কদম পড়ল আজ আমার ঘরে রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হয় না জনাব।

উস্তাদ হেসে বললেন, না সাহেবান, আমাদের নাম ধাম যাই থাক আমরা পৃথিবীর মানুষ। কোসিস কসরতে হয়ত শিখেছি কিছু গাওনা বাজনা। কিন্তু আপনি ত' মাটির মুল্লুকে পয়দা হন নি, আসমান থেকে সুরের পরী নেমে এসেছেন মানুষের চেহারা নিয়ে। আপনার ঘরে এসে কৃতার্থ হলাম আমিই।

আপনার মত মহাজনেরই যোগ্য এই বিনয়। কিন্তু কি আদেশ করছেন মেহেরবানি করে বলুন এবার।

বৃদ্ধ ওস্তাদ মাথার কলকাদার রেশমী টুপিটা খুলে কোলের ওপর রাখলেন। তারপর বেশ একটু চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন।

সকালের সোনালি আলো তখন বজরার জাফরি দিয়ে এসে পড়েছে দু'জনের মুখে চোখে। তরল জ্বলন্ত সোনায় ঝলমল করছে আকাশ গঙ্গা। তার লালিমাস। ঘরের ভেতরটাও দেখাচ্ছে অনেকটা মায়াপুরীর মত।

উস্তাদ কাদিরী বললেন, নবাবের ইচ্ছা একলা বসে তিনি প্রাণ ভরে আপনার নৃত্যগীত ভোগ করবেন একটা বেলা। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে কুঞ্জ ঘাটার শিস মহলে আয়োজন করতে পারেন তিনি। এজন্যে যা দক্ষিণা চাইবেন আপনি, তাই দেবেন তিনি।

হাত জোড় করে ফৈজী বললেন, নবাব যদি সত্যিই গান শুনতে চান, তাহলে সিপাই সান্ত্রী লোক জন নিয়ে আসর কেন ? একা আসুন আমার নৌকায়। খুসী হয়েই গান শোনাব। কিছু লাগবে না দক্ষিণা, এক দীনারও না। আমি শিল্পী, দরদী আর সমঝদার শ্রোতা চাই। পেশা করি পেটের জন্যে, সে অন্য জিনিস।

কাদিরী এই চাইছিলেন। কিন্তু মনোভাব গোপন করে মুক্ত করে তিনি বললেন, বহুৎ আচ্ছা সাহেবান। নবাব একাই আসবেন। নকীব বরকন্দাজ ও দেহরক্ষী সবাই ছিপ নৌকায় টহল দিয়ে ফিরবেন গঙ্গায়। কেউ বজরায় পা ঠেকাবেন না। কিন্তু কিছু নজরাণা নেবেন না আপনি, এ শুনলে দুঃখ পাবেন নবাব।

মোলায়েম সৌজন্য ফয়জান বললেন, নবাব সাবকে আমার সহস্র তসলিম জানাবেন। তাঁর মত প্রতাপশালী গুণী মানুষ আমার গান শুনতে চেয়েছেন, যদি শুনে খুসী হন, সেই আমার সেরা পুরস্কার হবে।

এরপর উস্তাদ কাদিরী গলাটা বেশ করে ঝেড়ে নিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয় জানেন সাহেবান বানারসী বক্সু ঘরাণার কথা। ঐ পীর বক্সুর বংশেই জন্ম এই গরীবের। মুখসদাবাদে এসে আর যেতে পারি নি নবাব সাহেবের জন্যেই। শুধু আমি না। কত আলেম উলেমা শিল্পী ভাবুককেই যে তিনি বন্দী করেছেন তাঁর ভাল বাসার দুর্গে, তা শুনে শেষ করা যায় না। তাঁর রাজধানীকে তিনি করতে চান দুনিয়ার আয়না, যাতে তামাম মানুষ দেখবে আপন মুখ।

ভারী ভাল লাগবে জনাব একথা শুনে। লখনৌ অউধ বানারস গয়া কত জায়গায় ত মুজরা লাগিয়েছি। আমীর ওমরাহ জমিদার চেট্টী বহু জনকে দেখেছি। তারা সখ করে হাতী পোষে, বাগান বানায়, তছবির

আঁকায়, গাওনা ডাকায়। কোনটাতেই তাদের দিনের তাগিদ দেখিনি, তাই ভাল লাগে নি কারোকে। মায়ের এন্তেকাল হয়ে ইস্তক আমি তাই জলেই বাসা বেঁধেছি। আমি দরিয়ার মানুষ, শুধু ভেসেই চলেছি।

এবার জমিনে নেমে বসুন। মুখসদাবাদ আপনার সুরের ছোঁয়ায় নূতন জীবন পাবে। আপনিও আজীবন যে রকম দরদী সুর সুহৃদ খুঁজেছেন, তা পাবেন। তিনি আর কেউ নন আমাদের নবাব বাহাদুর শের এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা।

ফয়জান হাসলেন। সে হাসিতে ঝিলিক দিচ্ছে একটু বিষাদও যেন। যেন কি একটা কথা মনে মনে গুছিয়ে নিতে হচ্ছে তাঁকে, ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করার আগে।

কাদিরী বললেন, আমি জানি এক মাটির গাছকে তুলে এনে আর এক মাটিতে লাগালে তা হয়ত বাঁচে, কিন্তু তার ফুল ফল নাও হতে পারে। তবে এইটুকু ভরসা দিতে পারি, এখানে যদি ডেরা বাঁধেন আপনি, তাহলে ঠিক মরুভূমিতে পড়বেন না। আপনার পায়ের কদমেই মাটি সোনা হবে, হাওয়ায় আসবে বেহেস্তী খসবু। তাতে আমরা ধন্য হয়ে যাব বিবিজান।

আবার হাত জোড় করলেন ফয়জান। বললেন, আমার ঘর নেই, বাড়ী নেই, আত্মীয় পরিজন কেউ নেই জনাব। বাবা ছিলেন বিখ্যাত পাখোয়াজী, মা নামকরা বাঈজী, তাঁদের অবিবাহিত প্রেমের সন্তান আমি। দু'জনেই আজ বেহেস্তে। আমি কোন সংস্কারের মধ্যে জন্মাই নি, তাই কোন বন্ধনও কবুল করে নি। ওপরে আসমান, সামনে দরিয়া, এর মধ্যেই সুরের নৌকা ভাসিয়ে চলেছি আমি দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে।

তাই ত' মিনতি করছি হজরৎ যে এবার মাটিতে নেমে আসুন। আমরা আপনার প্রতীক্ষাতেই দিন গুনছি।

সেদিনই দুপুরে বাকী দুদিনের চুক্তি শরীর খারাপের অজুহাতে বাতিল করে সেঠ মঞ্জিলে খবর পাঠালেন ফৈজী এবং বিকেলে বজরা ভাসল মুঙ্গের অভিমুখে। মহামান্য আরোহীরূপে তাতে উঠে বসলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা।

প্রধান দেহরক্ষী আসগর খাঁ তাঁর ভাগিনা ও সহকারী নূর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় এসে উঠলেন যাত্রা শুরু হবার ঠিক আগে। তাঁদের পিছনে জনা চার সিপাহী। তল্লাসি না করে নৌকা ছাড়ার অনুমতি দেবেন না আসগর খাঁ।

নবাব বিরক্ত হলেন। তলব করলেন মুন্সী এনায়েৎ খাঁকে।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, উপায় নেই জনাব। আপনি না চাইলেও সরকারকে ত আইনমাফিক কাজ করতে হবে। এত লোকলস্কর রয়েছে বজরায়। পরীক্ষা না করে ওঁরা ছাড়ার হুকুম দেবেন কি করে? শুধু তাই নয়, বজরা পাহারা দেবার জন্যেও আগে পাছে যাবে সিপাহীদের দু'টো নৌকা। হতাশ হয়ে কপালে হাত ঠেকালেন সিরাজদ্দৌল্লা।

বললেন, বুঝলাম যে নবাব হয় সে শুধু নবাবই, সে আর মানুষ নয়। তার অপছন্দ বলে কিছু থাকবে না।

আসগর খাঁ কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে সহকারীকে বললেন, নূর, তুমি হুঁশিয়ার থাকবে কোন ঘটনাতেই কেউ যেন নবাব সাহেব শান্তি নষ্ট না করে। তোমরা খাড়া নজর রাখবে, কিন্তু তফাতে থাকবে।

আদাব জানিয়ে নূর বললেন, জী হাঁ।

পড়ন্ত বেলার রক্তিম আলোয় আকাশ জলের সঙ্গম স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন নূর খাঁ গলুইয়ের ওপর। এমন আশ্চর্য সুন্দর রূপ···এ কি মানুষের হয়? ঠিক যেন স্ফটিকে তৈরি অপরূপ একটি দেবদূতের মূর্তি। এই নূর খাঁই চলেছেন আর একটি নৌকায় নবাবের পহেলা দেহরক্ষী হয়ে।

নৌকা ভাসল। একত্রিশ দিন পরে তা যখন ফিরল মুর্শিদাবাদে, ততদিনে মুন্সী এনায়েৎ খাঁর তদারকিতে ফৈজী মহলের অঙ্গসজ্জা শেষ হয়েছে। সেখানেই ডেরা নিলেন নর্তকী ফয়জান ফৈজী বেগম নাম নিয়ে।

॥ ৫ ॥

কাটরা মসজিদের পিছনে একটি সরু রাস্তায় পীর কুতুব আলির দরগা। পীর সাহেব ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব প্রত্যক্ষ দেখেন এবং যাঁরা তাঁর কাছে ধর্ণা দেন, তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের দিশাও বাৎলে দেন। কেউ বলে তিনি বায়ু-ভুক, অন্ন জল কিছুই লাগে না তাঁর। কেউ বলে গভীর রাত্রে মাটিতে দেহটা ফেলে রেখে তাঁর আত্মা আকাশে উড়ে বেড়ায়।

নবাব রাজধানী ছাড়ার দিন দুই পরে ঠিক দুপুর বেলা হুঁহুঁ করে একখানা পালকী এসে থামল এই দরজার সামনে। জমিদার ঝালর সরিয়ে তার ভেতর থেকে বেরুলেন বেগম লুৎফুন্নেসা, আর বাঁদী গুলনার।

তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন সালেহা খাতুন। লুৎফার বাল্য সঙ্গিনী তিনি এবং প্রধান দেহরক্ষী আসগর খাঁর স্ত্রী। তিনিই পীর সাহেবের সঙ্গে এই মোলাকাতের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

ছোট্ট বাগান পেরিয়ে তিনজন ভেতরে এলেন। উঠানে জুতো খুলে রেখে এগিয়ে এসে তিনজনই কদমবুসী করে দোয়া মাঙলেন পীর সাহেবের।

একটা টুকারতে চাল নিয়ে পীর কবুতরকে খাওয়াচ্ছিলেন। বেগমের দিকে তাকিয়ে শুধু অল্প হাসলেন।

বললেন, দিল চাঙ্গা রাখ বেটী, সাহস হারাস নে। মুখসদাবাদের ওপর উড়ছে ইবলিসের কালো নিশান। প্রকাণ্ড ঝড় আসছে। আসমান জমিন উথল পাতাল হয়ে যাবে।

নবাবের কোন আপদ-বিপদ হবে না ত খোদাবন্দ?

আল্লা তালাকে ডাক মা। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। কোনটারই ফয়সালা করতে পারবেন না বেচারী নবাব। গদী হারাবেন, জানও হারাবেন।

এই পর্যন্ত বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আয় আয় করে ডাকলেন। দু'টো হৃষ্টপুষ্ট বিড়ালছানা দৌড়ে এসে কোলের ওপরে উঠে পড়ল তাঁর

এবং আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। একটা দুধের বাটি এগিয়ে দিলেন পীর তাদের সামনে।

সালেহা বললেন, বাজান, বেগমের দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই। ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছে বেচারা। ও জানতে চায় বিপদটা কি হবে, বোম্বেটে বর্গীদের হাতে, না ফিরিঙ্গী কোম্পানীর হাতে। তাহলে একটু সাবধান হতে পারে।

দেখ মা তগদিরের সঙ্গে লড়াইয়ের কোন হাতিয়ার নেই মানুষের হাতে। তবে জেনে রাখ বর্গীর বাচ্চারা এ দফা মার খেয়ে ফিরবে। কিন্তু নেমকহারাম ঘরের লোকের মদতে কোম্পানী কামিয়ারী করবে। এ মারের সাবধান নেই।

অস্থির উৎকণ্ঠায় লুৎফুন্নেসা বললেন, কারা সেই ঘরের লোক বাজান?

দূরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে পীর সাহেব বললেন, খোদা হাফেজ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, সামনে আছেন জাফর আলি আর তাঁর বেটা। কিন্তু পিছনে আছেন তামাম বাংলার হিন্দু···শেঠজী, রাজাজী, রাণীজী। কে নেই?

এ থেকে পার পাওয়ার রাস্তা নেই কিছু?

না, না, বিলকুল না। হত যদি নবাব মসনদ ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তা তিনি পারবেন না।

আমি যদি বোঝাতে পারি তাঁকে।

হো হো করে হেসে উঠলেন পীর সাহেব। এক টানা হিহি হো হো করে হাসলেন অনেকক্ষণ এবং কখনো বেড়াল ছানা দুটোর, কখনো একটা কবুতরের গায়ে নিঃশব্দে হাত বুলাতে লাগলেন।

লুৎফা বললেন, বলুন বাজান, বলুন।

পীর বললেন, ওরে বেটী, মানুষ যখন জহন্নামের ফাঁদে পা দেয়, তখন যেটা সকলের আগে বোঝার, সেটাই বোঝে সব শেষে। আর তাতেই সে বোঝায় কোন কাজ দেয় না। নবাবের মর্জি কি আর আজ সিধা রাস্তায় হাঁটছে? দেখেও দেখছেন না, বুঝেও বুঝছেন না তিনি কিছু।

কেন? এইত লোক লস্কর নিয়ে পাটনায় রওনা দিলেন তিনি। নিশ্চয় জমায়েৎ ডাকতেই গেলেন সেখানে, আমীর উমরাহ ও জঙ্গী সর্দারদের নিয়ে।

না রে আম্মাজান। নবাবের বুদ্ধি আর নিজের এক্তিয়ারে নেই। এক নাচনে-গাওনেওয়ালী রূপসী কসবী তাঁকে দখল করেছে। তাকে নিয়েই পানিতে নৌকা ভাসিয়েছেন শের এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা।

কসবী? চমকে উঠলেন লুৎফুন্নেসা। সারা শরীরটা কেঁপে উঠল তাঁর দুঃসহ কি একটা আশঙ্কা আর উত্তেজনায়।

বললেন, আমাকে নবাব বলে গেলেন, পাটনায় জরুরী জঙ্গী বৈঠক ডাকবেন এবং খড়্গ সিং ও মনোহর সিং ভাই দু'জনের মদৎ চাইবেন সংকটের মোকাবিলা করতে।

দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে পীর বললেন, হুঁ, বৈঠক হয়ত ডাকবেন তিনি। মদৎও চাইবেন সিং ভাইদের। কিন্তু সে হল দুসরা কিসিমের কাজ। পয়লা কিসিম হল খুবসুরৎ আওরতের সঙ্গে আমোদ করা। তোর বন্ধুনী ত জানে সব। সে বলে নি?

লুৎফা তাকিয়ে দেখলেন সালেহা কখন কুঠি থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে বাঁধা একটা হরিণ ছানাকে পাতা খাওয়াচ্ছেন তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। লুৎফা বুঝলেন কথাটা উঠতেই সরে গেছেন সালেহা, সামনা সামনি স্বীকার করে নিতে অসুবিধা হবে বলে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে লুৎফা বললেন, আমার সঙ্গে বেইমানী করলেন নবাব। আমাকে মিছে কথা বললেন। এর চেয়ে যে আমার মরাও ভাল ছিল জনাব।

দরদের সঙ্গে বললেন পীর সাহেব, বুঝি মা বুঝি। কিন্তু এই ত দস্তুর পুরুষ জাতের। ছোট বয়সে প্রজাপতি উড়তে দেখলেই তারা ফাঁদ পেতে ধরে। তারপর কাঁটায় গেঁথে খতম করে তার জান। বড় বয়সে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার দিকেও হাত বাড়ায় একই ভাবে। একই ভাবে কাঁটায় বিঁধে নিকেশ করে তাকেও। শেখ সোদী বলেছেন, বিশ্বাস আর প্রেম নিয়ে নারী জন্মেছে অবিশ্বাসী পুরুষের তলোয়ারে গলা দেবার জন্যে।

লুৎফুন্নেসা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন। বসেই রইলেন তিনি। ভাবতে লাগলেন আকাশ পাতাল। পৃথিবীটা এত নোংরা জায়গা। এত ছোট মানুষের মন! মজহব বল, কেতাব বল, মহব্বত বল, সব কি সত্যকে গোপন করে খালি মিথ্যাকে প্রোজ্জ্বল করে দেখানর জন্যে তৈরি?

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল তাঁর, এই গস্তানীকে কি করলে নবাবের নজর থেকে সরান যায়। কি করলে তার দুষমনীর যোগ্য জবাব দেওয়া যায়!

মাথা ঠাণ্ডা করে চলে যা বেটি, বললেন পীর সাহেব। একখানা চিনির বাতাসা হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললেন, ফিরনি নে বেটী। খোদাই ঠিক করে দেবেন সব।

কান্নায় ভেঙে পড়ে লুৎফা বললেন, কি ঠিক করে দেবেন বাজান? নবাব যদি এর মধ্যে নিকাহ করে ফেলেন তাকে, আর তাকেই পহেলী বেগমের গদীতে বসান·····

তোবা, তোবা। তিন মাস তের দিনের মধ্যেই খেল খতম হয়ে যাবে ঐ ঔরতের। ওর জন্যে কিছু ভাবনা নেই তোর। আসল ভাবনা অন্য জায়গায়।

আর কোন কথা না বলে পীর সাহেব বড় একখানা পুঁথি টেনে নিলেন পাশের তাক থেকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ডুবে তন্ময় হয়ে গেলেন তার ভেতর।

লুৎফা আর কি করবেন? অগত্যা তাঁকে আদাব জানিয়ে এক পা এক পা করে বেরিয়ে এলেন বাগানে। আর সেখান থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন পালকীর কাছে।

সালেহা আস্তে আস্তে এসে ধরলেন তাঁর ডান হাতটি। লুৎফার চোখে টলটল করছে কান্নার সমুদ্র। জল চকচক করছে তাঁরও চোখে।

করুণকণ্ঠে বললেন, রাগ করেছিস পিয়ারী? তুই অকারণ দাগা পাবি বলেই জেনে শুনেও কথাটা বলিনি। তাছাড়া খসম খাঁ সাহেব বারণও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

ছোট বয়সে প্রজাপতি উড়তে দেখলেই তারা ফাঁদ পেতে ধরে.....

মনিবের হাল হদ্দ নিয়ে নোকরদের কথা কইতে নেই।

লুৎফার ম্লান মুখে কেমন একটা অর্থহীন হাসি ফুটল। কিছু না বলেই তিনি পালকীতে ঢুকলেন। দুহাতে ঝালর টানতে টানতে সামনের নীচু আসনে গিয়ে বসল গুলনার।

পালকী চলল হুঁ হুঁ হুম শব্দ করে।

মুখ বাড়িয়ে লুৎফা বললেন, চললাম বহন। রাগ আমি করিনি কারো ওপর, আপন নসীবের ওপর ছাড়া।

সালেহা কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, খোদা হাফেজ।

॥ ৬ ॥

সবাই যখন কণ্টকিত হয়ে রয়েছেন বর্গীরা ভগবানগোলা থেকে সদলবলে ঘোড়া ছুটিয়ে কখন রাজধানীর ওপর এসে পড়ে জিমখানা, কোষাগার, শস্য ভাণ্ডার, সব লুঠে নেবে, তছনছ করে দেবে, হাজারদুয়োরী, মতিঝিল, হীরাঝিল, সেইভয়ে ঠিক তখনই শোনা গেল, তারা ডেরা ডাণ্ডা গুটিয়ে পিছু হঠছে। কি ব্যাপার কেউ জানে না। তাই রকমারি গুজবে চারদিক সরগরম হয়ে উঠল।

গোবিন ভাট নামে বালুচরের গ্রাম থেকে বর্গীরা এক বামুনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আনন্দ ভাস্করের হয়ে সকাল বিকেল শিব পুজো করার জন্যে। পাছে বাইরে আসার সুযোগ পেলে বামুন বর্গীদের হালচালের খবর ফাঁস করে দেন, তাই তাঁকে রাখা হয়েছিল নজরবন্দী করে।

গোবিন ভাট আসলে গোবিন্দ ভট্টাচার্যি। সত্যিই পেশা তাঁর ছিল পুরুৎগিরি। একদিন গঙ্গায় স্নান করতে করতে মন্ত্র আওড়ে সূর্যকে জলের অঞ্জলি দিচ্ছেন, ইতিমধ্যে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়াল এসে একখান ছিপ নৌকা এবং চোখের নিমেষে পাঁজা কোলা করে তাঁকে তুলে নিল বলিষ্ঠ দেহ এক ঝাঁক বর্গী সিপাহী।

ওদের দলের সঙ্গে এসেছিলেন যে পুরোহিত, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হতে শিবজীর পুজো বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দ ভাস্কর তাতে দলনায়ক ধুন্দুজীকে হুকুম করেন, এক বেলার মধ্যে একটি বামুন জুটিয়ে আনতে হবে। চারদিকে ছুটল নৌকা আর ঘোড়ায় পাঁচ সাত জন করে। তারই একটা দল গঙ্গার ঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ভটচার্যিকে।

পরণে পাজামা, গায়ে বানডী ও মাথায় পাগড়ী পরে গোবিন্দ ভটচার্যি হলেন গোবিন ভাট এবং দু'বেলা শিবজীর পুজো করতে লাগলেন। আর কখনো রাজবল্লভের কখনো জগৎশেঠের, কখনো বা জাফর আলির দূত এসে পণ্ডিতজীর সঙ্গে যে সব সলা পরামর্শ আঁটতেন, মুখে চোখে কোন কিছু বুঝতে না পারার ভান করে তাই শুনতেন।

ছারপোকা বোঝাই খাটিয়ায় শুয়ে ঘুম আসত না রাত্রে। মোটামোটা চাপাটি ও খোসা শুদ্ধ ডাল খেয়ে হজমও হত না। সারা রাত্রি এপাশ ওপাশ করতেন, উদগার তুলতেন, আর এক দিকে কুচক্রীদের চালচলন লক্ষ্য করতেন, অন্য দিকে মনে মনে ভাবতেন, কোনরকমে একবার পালাতে পারলেই সোজা নবাব সরকারে গিয়ে সব কথা জানিয়ে দেবেন।

কিন্তু পালানর রাস্তা কোথায়? পায়ে হেঁটে পালান ত অসম্ভবই, রাতের অন্ধকারে জলে নেমে নদী সাঁতরে পালাতে গেলেও কিনারায় পাহারা নিরত শিবির রক্ষীর তীরে প্রাণ হারাতে হবে।

কিন্তু সুযোগ এসে গেল অভাবনীয় ভাবেই। আনন্দ ভাস্কর আর ধুন্দুজীর মধ্যে হঠাৎ বেধে গেল প্রচণ্ড কলহ এবং তার পরিণামে বর্গী ফৌজ ভাগ হয়ে গেল স্পষ্ট দু'ভাগে। যারা রইল ধুন্দুজীর পক্ষে, তাদেরই একজনের হাতে বিদেশ বিভুইয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হল শতাধিক যুদ্ধের সফল নায়ক আনন্দ ভাস্করকে।

কিন্তু কলহটা কি নিয়ে আগে বলি।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে পনের দিন ধরে হয় মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব পাবন। সারা মুল্লুকে মহা সমারোহে হয় শিবের পুজো। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে বসে মেলা, হয় নাচ গান ও তয়ফার আয়োজন। ঘরের লোকরা ত মেতে ওঠেনই, প্রবাসীরাও দলে দলে ঘরে ফেরেন।

ভাস্করজীর ফৌজেও এই উপলক্ষে ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য জেগেছে। তারা নিজেদের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশও করছে। বলছে, মানে হয় না এ সময় ঘরবাড়ী ও স্ত্রী পুত্র ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকার।

জঙ্গী অধিনেতা আনন্দ ভাস্কর কড়া ধাতের মানুষ। কোন সুকুমার বৃত্তির ঠাঁই নেই তাঁর চিন্তায়। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার অনুপস্থিতির সুযোগে ঝটিকা আক্রমণে তিনি মুর্শিদাবাদ দখলের পরিকল্পনা ফাঁদলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ডেকে বললেন ধুন্দুজীকে অভিযানের নক্সা নিয়ে আসতে।

তাঁবুতে নিচু কাঠের চৌপায়ায় বসে ভাস্করজী ফাঁসিতে তামাক টানছেন। নীচে মাটিতে কম্বলের আসন পেতে পাঁজি পুথি বিছিয়ে গোবিন ভাট গণাপড়া করছেন, কোন্ দিন কোন্ সময় অভিযান চালালে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

হঠাৎ ঢুকেই ধুন্দুজী বললেন, সামনে পাবন, এখন সৈন্যেরা ঘরে ফেরার জন্যে পাগল। তারা এখন মোটেই রাজী হবে না অভিযানে আগুয়ান হতে।

তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন ভাস্করজী, তারপর বললেন, বাড়ী ফিরতে চাইছে সিপাহীরা, না চাইছ স্বয়ং তুমি? যদি সৈন্যরা এই বেয়াদপী করে থাকে ত' তাদের জন্যে চাবুকের ব্যবস্থা কর। আর এই যদি তোমার নিজের বক্তব্য হয়, তাহলে দু'গাছা চুড়ি কিনে দু'হাতে পর। এক সময় ত' তয়ফায় নেচে হাত পাকিয়েছিল।

ধুন্দুজীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল রাগে। তিনি কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললেন, ধীমান নিশ্চয় জানেন আমি এতখানি অমর্যাদার যোগ্য নই। দল নায়ক হিসাবে সিপাহীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখ চাইতে আমি বাধ্য। মানুষত বলদ নয়, তাকে নাকে দড়ি দিয়ে হাঁকান চলে না।

উঠে দাঁড়ালেন ভাস্করজী। কোমর থেকে তলোয়ার খুলে উঁচিয়ে ধরলেন এবং বললেন, ভাস্কর পণ্ডিতের ইচ্ছাই আদেশ। সৈন্যেরা হয় ঘাড় হেঁট করে হামলা চালাবে, নয় তাদের কোতলে আমের হুকুম দোব আমি।

ধুন্দুজীও নিজের তলোয়ার খুলতে দেরী করলেন না। তিনি বললেন, বড় আসনে থেকে ছোটপণা করবেন না ধীমান। মায়ের দুধ খেয়েছি আমরাও। অভিযান হবে না, কিছুতেই না। আমিই হতে দোব না।

ভাস্করজী স্তম্ভিত হলেন। তাঁর সারা জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয় নি। ধুন্দুজী ছিলেন বাল্যে সুদর্শন এক তামাসা গাইয়ে। তয়ফার দলে মেয়ে সেজে নাচ গান করতেন। ভাস্করজীই তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে লেখাপড়া শেখান, সহবৎ শেখান। কৈশোর থেকেই ধুন্দুজী তাঁর নিত্য সঙ্গী, তাঁর দক্ষিণ হাত। সেই ধুন্দুজী তাঁকে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে শাসাচ্ছেন!

তিনি বললেন, কুকুরকে আস্কারা দিলে সে মাথায় ওঠে। নিজের অতীত ভুলে গেছ তুমি। বেরোও, দূর হও তুমি। তোমার তাজ তকমা ফেরৎ দাও।

ধুন্দুজী সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ বিলম্বিত শিঙাটি তুলে নিয়ে জোরে ফুঁ দিলেন তাতে দু তিনবার। গভীর জঙ্গলে ঢাকা গঙ্গরি তীরে, আকাশে, রাত্রির বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল সেই আওয়াজ। ছুটে এল তাঁর পার্শ্বরক্ষী চারজন জোয়ান সিপাহী।

ধুন্দুজী বললেন, বন্দী কর পণ্ডিত জীকে। তোমাদের সর্দারকে তিনি অপমান করেছেন কুত্তা বলে। তোমাদের ওপর চাবুকের হুকুম করেছেন। উনি বলছেন এই শনিবারে হামলা করতে।

ভাস্করজী চোখের নিমেষে তলোয়ার ঘুরিয়ে লাফিয়ে পড়লেন ধুন্দুজীর ওপর। প্রস্তুত ছিলেন তিনিও। লেগে গেল দ্বৈরথ যুদ্ধ দু'জনে। বাল্যে হাতে ধরে যুদ্ধ শিখিয়েছিলেন ধুন্দুজীকে ভাস্কর পণ্ডিত। আজ সেই গুরু-শিষ্যেই বাধল জীবন মরণ যুদ্ধ।

ফলাফল কি দাঁড়াত কেউ জানে না। বেশীক্ষণ চলল না লড়াই। একজন

সিপাহী পিছন থেকে এসে আমূল বসিয়ে দিল তার কৃপাণ ভাস্করজীর পিঠে এবং ওঃ করে সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্নমূল শাল গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। হয়ে গেল সব খেলা শেষ।

শিঙার আওয়াজ শুনে আশে পাশের গ্রাম শহর সব সচকিত হয়ে উঠেছিল। সবাই ভেবেছিলেন বুঝি বর্গীবাহিনী গভীর রাত্রে ছুটেছে রাজধানী আক্রমণ করতে। কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন সবাই, সকালের আলোয় বর্গীদের সদলবলে উলটো মুখে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে যেতে দেখে।

বর্গীরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটোছুটি করছে, গোবিন ভাট সেই ফাঁকে জঙ্গলে জঙ্গলে দৌড়ে সোজা রাজধানীতে এসে উঠলেন পরের পর দিন দুপুর নাগাদ। কারণ তিনি জানতেন কাজ হাঁসিল হয়ে গেলেই বর্গীরা তাঁকে খতম করে ফিরে যাবে।

॥ ৭ ॥

ডামা ডোলের সুযোগে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও, গোবিন ভাট কিন্তু স্বস্তি পেলেন না বাড়ী এসে।

সালার এ আলা আবিদ আলির পরোয়ানা নিয়ে বড় কোতয়ালীর থানাদার এসে হাজির একদিন তাঁর দোরে। এক্কা থেকে এক লাফে মাটিতে নেমেই থানাদার হাঁকলেন, গোবিন ভাট বেরাম্মন কার নাম ?

ভাঙা ইঁটের মস্ত একটা স্তূপের পেছন থেকে বেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালেন ভটচার্যি।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে।

কার নামে ? আমার ?

হ্যাঁ। ওঠ এক্কায়। সদর যেতে হবে।

আমার অপরাধ কি হুজুর ? আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বর্গীরা। জোর করে করিয়েছিল শিব পুজো।

থানাদার অগ্রাহ্যের সুরে বললেন, সে সব বল উপরওয়ালাদের। এখন বাপের সুপুত্তুর হয়ে গাড়ীতে ওঠ।

ভট্টাচার্য গৃহিনী ইঁটের ওপিঠে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সব কথাবার্তা। ভয়ে আঁওমাও করে উঠলেন তিনি।

তাঁকে প্রবোধ দিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন ভটচার্যি। কিন্তু এক্কা ছুটতে শুরু করল এবং ঘোড়ার পায়ের খাটাখট শব্দ আর গলার ঘন্টার টুংটাং আওয়াজেই ঢাকা পড়ে গেল তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

হাজার দুয়োরীর পেছনের মহলে কোতয়ালীর সদর কাছারী ঘরে যখন হাজির হলেন ভটচার্য, তৃষ্ণায়, আতঙ্কে ও ক্লান্তিতে তাঁর দেহ তখন নোতয়ে পড়েছে। গোটা প্রাণটা যেন জিভের ডগায় এসে তির তির করে নড়ছে ফড়িঙের পাখনার মত।

একজন রাশভারী ধরনের মানুষ এক গোছা হলদে কাগজ হাতে নিয়ে এসে বসলেন সামনের কেদারায়।

চৌপট্টির প্রধান খাতাঞ্চী তিনি।

তিনি বললেন, তোমারই নাম গোবিন ভাট ?

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভটচার্যি বললেন, হ্যাঁ হুজুর। আমার নাম গোবিন্দ ভটচার্য। বর্গীরা বলত গোবিন ভাট।

কোথায় বাড়ী তোমার ? কি কর কাজ কাম ?

আমার ঘরবাড়ী নেই হুজুর। বাজুচরে সিংহ বাবুদের কুঠিবাড়ীর সামনে একখানা ভাঙা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি আমি। পুজো আর্চা করে যা পাই তাতে স্বামী স্ত্রী দুটো প্রাণীর কোন মতে পেট চলে যায়।

পিছন থেকে টিপ্পনী কেটে একজন ছোকরা হুকমৎনবীশ বললেন, হুঁ, নিরীহ ছাগল ছানাটি আর কি। গারদে পুরে গাব কোটা করলেই বেরবে অনেক কথা।

তাকে থামিয়ে দিয়ে খাতাঞ্চী সাহেব বললেন, আচ্ছা বর্গীদের মহলে তুমি যে ইচ্ছে করে যাও নি বা চুপি চুপি তাদের বরাবর রাজধানীর অন্ধি সন্ধি বাৎলে দাও নি, তা প্রমাণ করতে পারবে ? না পারলে কিন্তু কয়েদ হবে।

ডুকরে উঠলেন ভটচার্য, ধর্মবতার, আমি গীতী ভাগবত ছুঁয়ে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি আমি সত্যি কথা বলছি। আমাকে ওরা নদী থেকে ছিপে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর নজর বন্দী করে রেখেই রোজ আমাকে দিয়ে শিব পুজো করাত। আমি শুনেছিলাম কাজ মিটে গেলে আমাকে মেরে জলে ফেলে দিয়ে যাবে ওরা।

হেসে বললেন খাতাঞ্চী সাহেব, তাহলে ওদের দেবদ্বিজে ভক্তি ত' খুব জবর দেখছি। তা ওরা যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেল, না মেরে ? এর মানেটা কি ?

ওরা কি আর ছাড়ল হুজুর ? রাজা সাহেব আর সেনাপতি সাহেবে একদিন মারামারি বাধল। রাজা চান শনিবার রাত্রেই রাজধানীতে হানা দিতে। সেনাপতি চান এখন যুদ্ধ বন্ধ রেখে দেশে ফিরতে। সামনে কি যেন পরব। এই নিয়ে দু'জনে তর্ক। তর্ক থেকেই যুদ্ধ। আর তাতেই রাজা সাহেব খতম হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেধে গেল তোলপাড় কাণ্ড। এই ফাঁকে বনে বনে পালিয়ে এলাম আমি দুই রাত আর এক সকাল হেঁটে।

সেই ছোকরা হুকুমৎ নবীশ বিদ্রূপের সুরে বললেন, তুমি ত' ভাষাই বুঝতে না। কি করে জানলে কি নিয়ে ঝগড়া ?

রাজা সাহেব আমাকে দিয়ে দিন গণাচ্ছিলেন যে, হিন্দীতে সব কথা বুঝিয়ে বলে বলে। একজন হিন্দী আর বাংলা জানা দোভাষী ছিল ওঁদের দলে। সেটা হল গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঘটনা। তার একটু পরেইত' বাধল ঝগড়াটা। ভগবানই বাঁচিয়ে দিলেন হুজুর।

ঠিক জানত বাঁচিয়েছেন কি না ?

নামাবলীর নীচেয় লুকিয়ে ভটচার্যি নিয়ে এসেছিলেন বেতে বোনা চারকোণা একটা ঝাঁপি। লাল সালুতে মোড়া ঐ জিনিসটা কোন ধর্ম বিষয়ক কেতাব হবে মনে করেই কোতয়ালীর ওপরওয়ালারা ওটা সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। ভটচার্যিও ভয়ে এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে ওটার কথা তাঁর মনেই পড়ে নি, যদিও বগলদাবাতেই রয়েছে ওটা তাঁর।

খাতাঞ্চী বললেন, বেশ, তোমার কেতাব বের করে হলফ কর, তারপর

এই কাগজে দস্তখৎ করা। মেয়াদ তোমাকে খাটতেই হবে।

কেতাব? এখানে আমি কেতাব কোথায় পাব হুজুর?

কেন, ঐ যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।

এবার চমক ভাঙল ভটচাঁযির। তিনি বললেন, হুজুর, আপনিত প্রমাণ চাইছিলেন। এই আমার প্রমাণ। এই খুঙ্গীটা আনন্দ রাজা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। কক্ষণো হাত ছাড়া করতেন না। পালানর সময় ওটা হাতিয়ে নিয়েই দৌড় দিয়েছিলাম আমি, হুজুর সরকারে পেশ করব বলে।

ঘরে যে ক'জন ছিলেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন সবাই। এমন একটা জলজ্যান্ত দলিল এতক্ষণ চেপে রেখেছেন, আর আজে বাজে কথায় সময় কাটাচ্ছেন, এ বামুন ত' তাহলে সোজা আদমি নন!

খাতাঞ্চী খুঙ্গীটি হাতে নিয়ে একজন সিপাইকে বললেন, মুন্সী জনাব এনায়েৎ খাঁর কাছে নিয়ে যাও বামুনকে, আর এই খুঙ্গীটাও।

বিকেল বেলা ঐ একা চেপেই গোবিন ভাট বাড়ী ফিরলেন। এক বেলার মধ্যেই বরাত ফিরে গেছে তাঁর। বহু মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ জুটিয়ে এনেছেন তিনি বর্গীদের শিবির থেকে। তাতে বর্গীদের ও কোম্পানীর ত' বটেই, দেশের মানুষদের ও হাল হদ্দ সম্বন্ধে নাকি আছে প্রচুর সমাচার, যা নবাব সরকারের বিশেষ কাজে লাগবে।

কাজেই এনায়েৎ খাঁ মোটা এনামে সম্বর্ধিত করলেন ভটচাঁযিকে। খোসবাগে যেখানে নূতন করে ফৈজী মহলের সংস্কার হচ্ছিল, তার পূর্ব দিকে ছিল অনেক দিনের জীর্ণ একটা শিব মন্দির। এই মন্দিরটার সংস্কার করে এর সঙ্গে একটা কাঁচা বাড়ী ও বাগান বানিয়ে মোকররী মৌরসী শর্তে তা দেওয়ার ব্যবস্থা হল ভটচাঁযিকে। তিনি সেখানে থেকে নির্বিঘ্নে পুজো আর্চা করবেন।

শুধু কি তাই? চতুর এনায়েৎ খাঁ ফৈজী বেগমের ওপর নজর রাখার জন্যেও গোবিন ভাটকে বসালেন তাঁর চৌহদ্দীর মধ্যেই। পেশাদার নর্তকী হয়েছেন নবাবের প্রিয় পাত্রী। তাঁর মহলে কখন কে আসে কে যায়, কি কার্যকলাপ চলে তলায় তলায়···এই রকম একটা ন্যাকা বোকা মানুষ দিয়ে তার তত্ত্ব নেওয়াই হবে সবচেয়ে সোজা।

ভটচাঁয ফেরার বেলা একায় উঠছেন যখন, তখন সেই হুকমৎ নবীশ এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললেন, গোস্তাকি নেবেন না জনাব। ফাঁসিকাঠ থেকে মসনদে উঠলেন, মনে রাখবেন গরীবকে।

এবার হাসি ফুটল ভটচাঁযির মুখে।

॥ ৮ ॥

গঙ্গার দিকে উন্মুক্ত দরবারী কামরায় চিন্তান্বিত মুখে বসে আছেন সিরাজদ্দৌল্লা। বেলা গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। গঙ্গার পশ্চিম কোণে লালে লাল হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে অপরাহ্ণের আলো। সেই রঙের প্লাবনে গা ডুবিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফেরা পাখী। যাচ্ছে দু'একখানা করে ছোট-বড় নৌকা।

কোতয়ালীর প্রধান কাসিম খাঁ তাঁর সহকারী নবায়েৎ খাঁ, প্রধান দেহরক্ষী আসগর খাঁ, সেনাপতি মীর মুদনালি, মোহন লাল সিং, মুন্সী এনায়েৎ খাঁ, সবাই দু'পাশে অর্ধ চন্দ্রাকারে ঘিরে বসে আছেন নবাবকে।

কাসিম খাঁ নিস্তব্ধতা ভেঙে বললেন, আর একটু ভাল করে ভাবুন জনাব। রাজাজী রাজবল্লভ আর শেঠজী জগৎরাম হলেন মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে ক্ষমতাপন্ন দু'জন হিন্দু। ওঁদের ফাটকে ঢোকালে তার ফল গুরুতর হবে। গোটা হিন্দু সমাজ ক্ষেপে উঠবে হয়ত।

আসগর খাঁ বললেন, ভেবে দেখার কথাই বটে জনাব।

নবাব বললেন, গ্রেপ্তারির পরই ওঁদের সম্বন্ধে ফতোয়া জারী করব। তাতে জানিয়ে দোব জনসাধারণকে যে ওঁরা মসনদ উচ্ছেদের মৎলবে একদিকে কোম্পানীর অন্য দিকে বর্গীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আঁটছিলেন। বর্গী শিবির থেকে পাওয়া রোকা ও দস্তবেজ থেকেই এটা জানা গেছে।

এনায়েৎ খাঁ বাধা দিয়ে বললেন, সে ফতোয়ায় জনগণ বিশ্বাস করবেন, এতখানি সবিশ্বাস কি আছে জনাব এই সরকার সম্বন্ধে?

নবাব ভাবতে লাগলেন। গোবিন ভাটের হাত থেকে পাওয়া খুঙ্গীর কাগজপত্র ওলটাতে ওলটাতে একটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই স্থির হয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ।

আসগর খাঁ বললেন, তার চেয়ে দু'জনকে সরাসরি নবাব সরকারে তলব করে জবাবদিহি করলে কেমন হয়? কি বক্তব্য তাঁদের এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্বন্ধে, তা শুনলে কেমন হয়?

নবাব মাথা নেড়ে বললেন, খাঁ সাহেব, সমস্যাটাকে আপনি খুব কাছে রেখে দেখছেন। আর একটু দূরে তাকান। দুই শক্তিশালী শত্রুকে খুঁচিয়ে জাগান হবে, অথচ আটক করা হবে না, তার ফলটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন? সাপের লেজে বাড়ি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে নেই। বাড়ি দিতে হলে তা দেওয়া উচিত ফণাতেই।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, তা ঠিক। ভাস্কর বর্গীর চিঠিতে পরিষ্কার রয়েছে নবাব সরকার উচ্ছেদ করে তাঁরা রাজা রাজবল্লভকে মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। বাৎসরিক চৌথা দিয়ে রাজা মারাঠার সার্বভৌমত্ব কবুল করে নেবেন, এই ছিল সর্ত।

মাথা নেড়ে নবাব বললেন, বিলকুল তাই, আর রাজা সাহেবের চিঠিতে প্রমাণ হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ লুঠ করতে বর্গীদের প্ররোচিত করেছেন তিনিই। তিনি লিখেছেন, আপনারা শিবের উপাসক। সেই শিবিরে পবিত্র পীঠ-স্থান ভুবনেশ্বর ধ্বংস করেছিলেন আলিবর্দী। তাঁর দৌহিত্র সিরাজ যদি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনে নির্বিঘ্নে বহাল থাকেন, তাহলে পরমেশ্বর শিবের ক্ষমা পাবেন না আপনারা।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আসগর খাঁ বললেন, তার মানে হিন্দু শাসন কায়েম করতে ও নিজেকে তাঁবেদার শাসনকর্তা বানাতেই আজি জানাচ্ছেন বর্গী সর্দারের কাছে।

অর্থাৎ পহেলা কসমের বিশ্বাসঘাতক।

নবায়েৎ খাঁ বললেন, আর এই বিশ্বাসঘাতককে গদীতে বসানর জন্যে ভাস্করজীকে মোটা নজরানা দিতে কবুল হয়েছেন শেঠজী। দুজনকে তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভেবে আটক করা তা উচিতই, প্রাণদণ্ড করলেও অন্যায় হবে না।

অল্প হেসে এনায়েৎ খাঁ বললেন, জারা বাঁধকে ভাই। কোতায়লীর হুকুম হুট করে জারী করা যেতে পারে, কিন্তু দরবারী সিদ্ধান্ত নিতে হয় সবদিক ভেবে চিন্তে।

কাসিম খাঁ বললেন, সাচ্চা কথা বলেছেন জনাব। তারপরে একটা ঢোক গিলে বললেন, আচ্ছা সেই পাঞ্জাবী গিধধড় উমিচাঁদ কোথায়? তিনি ত' স্রেফ ফেরার হয়েছেন। শুনেছি নাকি কলকুত্তা গিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ভিড়েছেন।

নবাব বললেন, শুধু উমিচাঁদ নন, ভিড়েছেন আরো অনেকে। কিষনগর কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোর থেকে ভবানী রাণী, বর্ধমান থেকে দীপচাঁদ, সবাই কোম্পানীর সঙ্গে গোপনে দোস্তী চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে টোপ ফেলেছেন শেঠজী এবং রাজাজীও।

নবাবের অসম্পূর্ণ বক্তব্যের পরিপূরণ করে মুন্সী এনায়েৎ খাঁ বললেন, তার মানে ওঁরা চান হিন্দু হুকমৎ ফিরিয়ে আনতে। সবাই হাত মিলিয়েছেন তাই একসঙ্গে কার্য হাঁসিল করার জন্যে। কিন্তু তলায় তলায় একের বিরুদ্ধে অন্যে প্যাঁচও খেলছেন আবার।

অর্থাৎ? আসগর খাঁ এগিয়ে দিলেন একটি শাণিত প্রশ্ন।

অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র গদীটা চান নিজে দখল করতে। রাজবল্লভও ওটা চান নিজের জন্যেই। আর এই লোভী নিমকহারামদের নাচিয়ে কার্য সিদ্ধির ফিকির ভাঁজছেন কোম্পানীর প্রধান কারকুন ক্লাইভ ও তাঁর দোহার ওয়াটস। মামলা যাতে করতে পারলে, তখন এঁদের সক্কলকার পিঠে লাথি হাঁকিয়ে তক্তে চেপে বসবেন কোম্পানী নিজে।

জরুর বলে উঠলেন একযোগে সবাই।

আগের কথার জের টেনে এনায়েৎ খাঁ বললেন, মজা এই যে শেঠজী এখানেও দুহাতে টাকা ঢেলে বেদম মদৎ জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ওঁর স্বার্থ বর্গীরা কায়েম হলে মারাঠায় মাদ্রাজে আর কোম্পানী চেপে বসলে বিলাইতে ব্যবসা জড়াবে। সবাই আপন আপন তালে আছেন।

কাসিম খাঁ দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুকের কাছে নিলেন, তারপর নবাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজেই এঁদের সব কটিকেই কয়েদে পোরা এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গঙ্গার ধারে দাঁড় করিয়ে কোতল করা দরকার। কিন্তু রয়ে বসে।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, সব কজনকে আর পাচ্ছেন কোথায়? ভবানীরাণী, কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ, সব ত আংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন আগে থেকেই। বর্গীর সঙ্গে সওয়ালের মৎলবেই শুধু শেঠজী আর রাজাজী এখানে ছিলেন, এখনও আছেন। হয়ত হাওয়া বুঝলে পালাবেন তাঁরাও আজ কালের মধ্যেই।

এবার নবাব কথা বললেন। গলাটা তাঁর ভাঙা ভাঙা।

তিনি বললেন, আজই এ দুজনকে গ্রেপ্তার করে বালেশ্বর পাঠিয়ে দিন। আর আগামীকাল আবিদ আলিকে সরকারের ফর্মান সহ কলকাতায় পাঠান, কোম্পানীকে সাত দিনের সময় দিয়ে। ঠিক এই সময়ের মধ্যে পলাতকদের আমার হাতে না যদি তুলে দেন তাঁরা, তাহলে যুদ্ধের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকেন।

জী হুজুর, বললেন কাসিম খাঁ।

আসগর খাঁ শেষ চেষ্টা হিসেবে তবু বললেন এই পাকা কথা রইল। তবু পাঞ্জায় দস্তখৎ করার আগে আর একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি জনাব।

নবাব বললেন, না খাঁ সাহেব, আর ভাবনা-চিন্তা নয়। এখনি অথবা কোন কালে নয়। ফেরদৌসীর সেই বয়েৎটি কি এনায়েৎ খাঁ, যেটি কাল শুনিয়ে ছিলে আমায়?

এনায়েৎ খাঁ বললেন, পঞ্জী পিঁজরায় থাকতে থাকতে ঠিক কর কাবাব বানাবে, না বুলি শেখাবে।

উড়ন্ত চিড়িয়ার পিছনে আকাঙ্ক্ষা নিক্ষেপ করে বেওকুফে।

নবাব বললেন, এই হল আমারও কথা। আমার শিরে লক্ষ্য করে হাতিয়ার তুলেছিলেন এক সঙ্গে তিন দল। বর্গীরা, ঘরের দুষমণরা, আর কোম্পানী। বর্গীরা নিজের আগুনে নিজেরাই পুড়ে শেষ হয়েছে। ঘরের দুষমণদের এবার নিপাত করব। তার পরে লড়াই হাঁকাব কেরেস্তান কোম্পানীর বিরুদ্ধে।

আর কোন কথা না বলে পাঞ্জায় স্বাক্ষর করে নবাব তা তুলে দিলেন কাসিম খাঁর হাতে।

কাসিম খাঁ কাগজ নিয়ে সেলাম করে বেরিয়ে গেলেন। পিছু পিছু গেলেন নবায়েৎ খাঁ, আসগর খাঁ। উঠে দাঁড়ালেন মোহনলাল সিং এবং মীর মুদনালিও।

নবাব বললেন, সিংজী আর মুদনা ভাই, তোমাদের দু'জনের ওপরই কিন্তু আমার আসল ভরসা এই দুঃসময়ে।

বহুৎ আচ্ছা জনাব, বলে বেরিয়ে গেলেন তাঁরাও।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, খোসবাগ যাচ্ছি, সেই সারেঙ্গীদারকে বহাল করে আসিগে।

বৈঠক ভেঙে একে একে সবাই চলে গেলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে নামল। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে নবাব একা একা পায়চারি করতে লাগলেন। অনেক ভাবনা, অনেক জল্পনা, অনেক ভাঙা গড়া করেছেন এতদিন। এবার একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিলেন। ভালমন্দ যা হয় হবে। তবু ত অস্থিরতার গুমোট কাটল।

ঝাড়ের বাতিগুলো জ্বলে উঠল দরবার ঘরে। দরবারের কুর্শী কেদারা সরিয়ে মেঝেটা ফাঁকা করে দিল খানসামারা। সেখানে আয়োজন হল নবাবের সান্ধ্য আসরের।

সরবৎ আর পান হাতে এলেন স্বয়ং বেগম লুৎফুন্নেসা।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সিরাজ বললেন, তুমি নিজে?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে লুৎফুন্নেসা বললেন, হ্যাঁ জনাব। অনেক দিন বাড়ী ছিলে না, খাওয়া দাওয়ার তদারক করতে পারি

নি। আজ ইচ্ছা হল নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াব।

নবাব আর কিছু না বলে নিঃশব্দে জলযোগ শেষ করে সরবতে চুমুক দিলেন।

লুৎফা বললেন, একদিকে কোম্পানী আর এক দিকে হিন্দু জনতা, দুইকে একসঙ্গে খেপাচ্ছে। দুইয়ের মোকাবিলা করতে পারবে? আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।

ভয়ের আর এক নাম মৃত্যু। যে সাহস করে দরিয়ায় ঝাঁপ দেয় মণি-মুক্তো উঠে আসে তারই মুঠোয়। কিনারায় দাঁড়ান কাপুরুষ কোন দিনই জেতে না, তাই কখনো হারে না। কিন্তু লুৎফা ও নিয়ে দুর্ভাবনা করার দরকার নেই তোমার। ওর জন্যে অনেক লোক আছেন নবাব সরকারে।

হঠাৎ আত্ম বিস্মৃত হলেন লুৎফুন্নেসা। উত্তেজনায় সারা দেহটা কেঁপে উঠল তাঁর। তারপরই বললেন, আজ আমার সব দরকারই ত' ছেঁটে ফেলেছ তুমি। ভালই করেছ নবাব, ভালই করেছ। খোদা যেন জয়ী করেন তোমাকে সব বিষয়েই। না যদি করেন, তখনো জেন একজন আছে পাশে দাঁড়ানর। সে এই লুৎফা।

নবাব উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন মুখে, পিঠে, মাথায় চুলে। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত বুকে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর লৎফুন্নেসা। ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

নবাব বললেন, ভুল কর না, ভুল বুঝ না। যাও, সেই গানগুলোর রেওয়াজ কর গে।

একটু পরেই বজরা ভাসল নবাবের খোসবাগ মুখো।

॥ ৯ ॥

শেঠ জগৎরাম ও রাজা রাজবল্লভের কারাদণ্ডে বাংলাদেশের ছোট বড় সব হিন্দুই দারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। যখন রটনা হল যে মুসলমান খানসামা বাহিত খাদ্য পানীয় খেতে অস্বীকার করে তাঁরা ফাটকে অনশন করছেন, তখন সেই অসন্তোষ প্রকাশ্য বিক্ষোভের মূর্তিতে দিকে দিকে প্রকাশও পেতে লাগল।

রাজসাহীতে জনতা সরকারী শস্য গোলা ও অস্ত্রাগার লুঠ করল। মালদহে চৌপট্টী ও সেরেস্তায় আগুন ধরিয়ে দিল। নদীয়ায় হাওলাদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে কালীমার কাছে বলি দিল। বীরভূমে সুরু হল বাগদী বিদ্রোহ। মেদিনীপুরে উঠল খাজনা বন্ধের আন্দোলন।

খাস মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ ধরল সবচেয়ে হিংস্র চেহারা। তালুকদার পঞ্চানন সিং-এর মেজ ছেলে ইন্দ্র সিং তেওড় বাগদী গোপ ও মালাকার সমাজ থেকে বাছাই করা হাজার চারেক জোয়ান নিয়ে তৈরি করলেন এক বাহিনী এবং লোক পরম্পরায় শোনা গেল, এই বাহিনী নিয়ে, তিনি সোজা নবাবের সঙ্গে মোলাকাৎ করবেন। দাবী করবেন শেঠজী ও রাজাজীর মুক্তি।

যদি তিনি কথা শোনেন ত ভাল। নইলে জনতা আপন হাতে আইন নিলে তাঁরা সেজন্যে দায়ী হবেন না।

কাসিম খাঁ, আসগর খাঁ, আবিদ আলি, এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ নবাবের প্রধান প্রধান কর্মী ও সলাহকাররা, শুনলেন বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সকালে জনতা নাকি নবাবের বরাবর হাজির হবে। দুদিন আগে তাঁরা এক মিলিত বৈঠকের আয়োজন করে লোক মারফৎ ডেকে পাঠালেন ইন্দ্র সিংকে। ইন্দ্র সিং জবাবে বললেন, নবাব ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর কোন আলোচনা করার ইচ্ছা নেই।

কাসিম খাঁ ক্রুদ্ধ হয়ে নবায়েৎ খাঁকে বললেন, বেতামিজ বিল্লীর ঘাড়ে লোম গজিয়েছে, তাই নিজেকে সে মনে করছে শের বাবর। তোমার ওপরে খাড়া হুকুম রইল, দলবদ্ধভাবে জনতা কোন রকম শান্তি ভঙ্গের কাজ করলে, বেপরোয়া হাতিয়ার চালাবে। পাঁচ সাতশো হাজার কোস যদি পড়ে যায় তাতে, কুছ পরোয়া নেই।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, একটু ভেবে চিন্তে খাঁ সাহেব। হিন্দুর মুল্লুক, মুসলমানের হুকমৎ। বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম এক হলে, তোপের মুখে পায়রার মত উড়ে যাবে নবাব সরকার। নিজে হাতে নিজেদের খতমী পরোয়ানায় সই করবেন না যেন।

আসগর খাঁ মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ভাবনার কিছু থাকত না, পুরো সৈন্যবাহিনী এক্তিয়ারে থাকলে। তা ত' নেই। মুদনালি, মোহন লাল সিং, আর দাউদী বেগ এই তিন জন ছাড়া আর কারো ওপর ষোল আনা ভরসা করা ত যাচ্ছে না। জাফর আলি এবং তাঁর দলবল ত' স্রেফ উল্টো দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

অবজ্ঞার ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করে আবিদ আলি ফোড়ন কাটলেন, ছাড়ান দিন ভাই সাহেবরা ঐ চশুখোর বুড়োর কথা। শুধু খেয়াল রাখবেন যেন আগে ভাগে কোন হুকুম জারি করে না বসেন উনি। তাহলেই বিপদ ঘটবে।

এনায়েৎ খাঁ সকলকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বললেন, সরাসরি মোকা-বিলার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হল, তখন কোন অবস্থাতেই জনতাকে নবাবের সামনাসামনি হাজির হতে দেবেন না। বললেন, তিনি শহরে নেই। পাটনা গেছেন।

নবায়েৎ খাঁ বললেন, একি রকম কথা হল মুন্সী সাহেব? হুকমতের হয়ে আমরা যাই করি না কেন, মসনদের মালিক স্বয়ং নবাব বাহাদুর তাঁর জন্যে দায়ী থাকেন। এই হল বরাবরের দস্তুর। কিন্তু নবাবকে গরহাজির সাজিয়ে আপনি সবটা ঝুঁকি ভুলে দিচ্ছেন আমাদের ঘাড়ে। আমাদের ইজ্জতের কথাটাও ভাবুন একটু।

কাসিম খাঁ বাধা দিয়ে বললেন, ইজ্জতের জন্যে দরকার হলে জান কবুল করবে। কিন্তু ঝুঁকি ত' নিতেই হবে। তোমরা ত' পাইক বরকন্দাজ রসুইকার নও, শান্তি শৃঙ্খলার জিম্মদার।

অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক নবায়েৎ তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করায় এনায়েৎ খাঁ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন একটু। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চিনি বললেন, বাঁশী যেমন তেমন বাঁশেই বানান

যায় ভাইজী, লাঠি পাকা বাঁশ ভিন্ন হয় না।

কিন্তু যা শোনা গিয়েছিল কার্যকালে হল ঠিক তাই। শুধু চার হাজার নয়, হাজার পঞ্চাশ লোকের এক জনতা বৈশাখী পূর্ণিমার সকালে চার দিক থেকে এসে জড় হল আমানীগঞ্জের মাঠে। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল লোক নবাব বাড়ীর দিকে।

খোল ঢোল রামশিঙা করতাল রকমারি বাজনা বাজছে। কারো হাতে ত্রিশূল, কারো হাতে সড়কি। কেউ উড়িয়েছেন খড়্গ চিহ্নিত গেরুয়া পতাকা। কেউ কাঁধে নিয়েছেন এক জোড়া মড়া কাক বাঁধা লম্বা একটা বাঁশ।

ভার্ল করে সূর্য ওঠার আগেই জনতা নদী পার হয়ে হাজার দুয়োরীর প্রধান দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চারদিক কম্পিত করে হাঁক ছাড়ল, হর হর শঙ্কর! কালী করাল বদনী!

দেউড়ির কপাট খুলে গেল। সাদা ঘোড়ার পিঠে সকলের আগে নবায়েৎ খাঁ, তাঁর পিছনে তলোয়ার, বল্লম ও গাদা বন্দুক হাতে পাশাপাশি তিনজন করে নবাবী রক্ষীবাহিনীর মস্ত একটা দল।

নবায়েৎ খাঁ কালো কাঠের একটা চোঙা মুখে লাগিয়ে বললেন, ভাই সব, ভুয়ো খবর পেয়ে ক্ষেপেছ তোমরা। সেঠজী আর রাজাজীকে নিয়ে নবাব সাহেব পাটনায় গেছেন। সেখানে জঙ্গী সর্দার আর মহাজনদের জমায়েৎ ডাকা হয়েছে, আসন্ন সঙ্কটে কর্মপন্থা ঠিক করার জন্যে।

গোরুর গাড়ীর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতের খোঁদলে মুখ রেখে ইন্দ সিং বললেন, বিশ্বাস করি না এ কথায়। নবাব শহরেই আছেন, আর শুধু রাজাজী ও শেঠজীকে না, সমস্ত নামী হিন্দুকে ফাটকে বন্দী করে না খাইয়ে রেখেছেন! চালাকি রেখে ফটক ছেড়ে দিন। আমরা নবাবের সাক্ষাৎ চাই। নইলে জনতা জোর করে ঢুকবে।

নবায়েৎ খাঁ বললেন, এক থেকে একশো গণায় যতটা সময় লাগে, তাই দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা এর মধ্যেই উল্টো দিকে মোড় ঘুরে আপন আপন বাড়ী রওনা দাও। তা না হলে তৈরি হও জঙ্গী জওয়ানদের আক্রমণের জন্যে।

ইন্দ্র সিং বললেন, ঘুরে আমরা যাব না। জঙ্গী জওয়ান আমরাও। নবাব বাহিনীও যেন প্রস্তুত হয়।

হঠাৎ তাঁর পিছন থেকে শাঁ করে ধারালো বর্শা একটা এসে আমূল বিধল নবায়েৎ খাঁর বুকে এবং হা'য় আল্লা বলে কাৎ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে। কিন্তু মুখটা তাঁর মাটিতে থুবড়ে পড়লেও একটা পা আটকে রইল ঘোড়ার রেকাবে। এই অবস্থায় আর একটা তীর এসে অর্ধেকটা ফুঁড়ে গেল তাঁর মাথায়।

এরপর জনতা ও সরকারী ফৌজে বেধে গেল তুমুল যুদ্ধ। তীর ধনুক, বর্শা, তলোয়ার চলতে লাগল সমানে সমানে। মাঝে মাঝে দু'পক্ষই দাগতে লাগল গাদা বন্দুকও।

গোলমালের সুযোগে হিন্দু সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর গোটা দুই দল যে কখন এসে জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তা কেউ বুঝতেও পারে নি। কিন্তু নবাবের রক্ষী বাহিনীর লোকরা তা টের পাওয়া মাত্র পিছু হঠে পালান সুরু করল। আর তাদের পিছু পিছু তাড়া করে ছুটল ক্ষিপ্ত জনতা। কিন্তু না, দু'দিক থেকে বন্যা স্রোতের মত অজস্র সরকারী অশ্বারোহী সৈন্য এসে ঘিরে ফেলল জনতাকে চোখের নিমেষে। শুরু করল সরাসরি আক্রমণ।

জনতার সামনের দিককার মানুষগুলো তীর আর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে ধড়াধ্বড়। পিছনের দিককার মানুষগুলো অলি গলি নালা নর্দমা দিয়ে পালাতে লাগল। অশ্বারোহী ফৌজ তাদের পিছু তাড়া করে নিয়ে চলল শহর তলীর দিকে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

অবিচল স্থৈর্যে দাঁড়িয়ে আছে তখনো সাদা ঘোড়াটা। তার গায়ে সংলগ্ন হয়ে লুটিয়ে রয়েছে নবায়েৎ খাঁর মৃত দেহটা যার অল্প দূরে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ধুঁকছেন ইন্দ্র সিং।

পলায়নপর জনতাকে ডেকে তিনি বললেন, মরে যাচ্ছি তাতে ক্ষতি নেই। তবুও জানিয়ে দিয়ে গেলাম বিধর্মী সরকারকে যে বাংলার হিন্দু এখনো মরে নি।

কয়েক জন তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে গঙ্গার দিক দৌড়লেন। পঞ্চানন সিং-এর ছেলে বিদ্রোহী ইন্দ সিং-এর মৃতদেহ ধাওড়ে তুলবে, কিংবা শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, মুর্শিদাবাদের মানুষ তা বরদাস্ত করবেন না কোন মতেই।

গঙ্গার ধারে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা দেখলেন জাফর আলির হাতি জল খাচ্ছে। আর তার পিঠে হাওদায় বসে মুখ টিপে হাসছেন তাঁর বড় ছেলে মিরণ। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক তিনিই, বুঝতে দেরী হল না কারো।

॥ ১০ ॥

নবাব বাড়ী থেকে মাত্র আধক্রোশ দূরে প্রধান সেনাপতি জাফর আলির অর্থাৎ মিরজাফরের নবনির্মিত বাড়ী। গঙ্গার কিনারা থেকেই মর্মর পাথরে পোস্তা বাঁধিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে শুভ্র সুন্দর প্রাসাদ। সামনে তার গোলাপ, বেল, জুঁই রকমারি ফুলের বাগিচা, পিছনে ফলের বাগান। আম, জাম, লিচুর অনেক গাছ সেখানে।

দেওদার বাউ ও রকমারি পাতা বাহার দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তোষাখানার প্রবেশ পথটিকে ছায়ায় সুষমায় করে রেখেছে অতুলনীয়। পথের মাঝে মাঝেই অর্ধ অনাবৃত দেহ পাথরের পরীর মুখ থেকে অবিরাম ফিনকি দিয়ে ছড়াচ্ছে জল। গাছের ডালে ডালে ডাকছে অজস্র পাখী। উড়ছে লাল হনুদ প্রজাপতির দল।

এই ফুলবাগে বসে জাফর আলি রূপোর ছোট্ট পেয়ালায় আফিং এর ঘুমতিতে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছেন। আর তাঁর মখমল মোড়া গদীর নীচে কাঠের কুর্শিতে বসে কোলম্যান নামে কোম্পানীর একজন কাতেব দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে।

তখনো ভাল করে সূর্য ওঠে নি। হঠাৎ নবাবের বিখ্যাত সাদা ঘোড়ায় টানা তাজাম এসে দাঁড়াল ফটকের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে নকীব হেঁকে উঠল : হাজির হো নবাব উল মুলুক শের এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা।

হতভম্ব জাফর আলি পেয়ালা হাতেই আস্তে ব্যস্তে দৌড়ে এলেন। নিজে হাতে বালর সরিয়ে দোর খুলে দিলেন গাড়ীর। স্বয়ং নবাব তাঁর বাড়ীতে, ব্যাপার কি ?

তলোয়ারের বাঁট মুঠিতে ধরে নেমে এলেন সিরাজদ্দৌল্লা।

জাফর আলি বললেন, কি অপার সৌভাগ্য আমার জনাব। বান্দাকে তলব না করে নিজে তার গরীবখানায় পা দিয়েছেন, এ মহত্ব আপনাকেই মানায়।

নবাব ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বললেন জাফর আলি সাহেব, এ পর্যন্ত কতবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি তা কি খেয়াল আছে আপনার ? না এসে করি কি ?

দুহাত যুক্ত করে জাফর আলি বললেন, কসুর নেবেন না হুজুর। আমি বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম, তাই যেতে পারিনি।

বাড়ীর দরজায় থানা গেড়ে বসেছিল বগীরা। আপনি ত' সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক, মন্ত্রী মহলেরও পয়লা সারির সদস্য। আপনার কোন সাহায্য বা উপদেশই পেলাম না আমরা।

আমি খবর পেয়েছিলাম জনাব যে বগীরা আত্মকলহে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওদের পাততাড়ি গুটিয়ে পালান ছাড়া গতি নেই। তাই ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি আদৌ। কিন্তু হুজুর পথে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি আপনার মত মহান অতিথির-যোগ্য ? আসুন, ভেতরে আসুন।

আগে আগে জাফর আলি, তার পিছনে নবাব। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই নবাব দেখলেন শীর্ণকায় এক ইংরেজ হাত পা গুটিয়ে বসে আছে আলি সাহেবের আসনের সামনে।

উত্তেজিত হয়ে ফার্সিতে জিজ্ঞাসা করলেন নবাব, এই বিলাইতী কুত্তাটা ভোর বেলা এসে আপনার আঁস্তাকুড়ে মুখ দিয়ে পড়ে আছে কেন ? কে ও ?

জুতো শুদ্ধ পা তুলে লাথি মারতে যাচ্ছিলেন তিনি। সামনে এসে দাঁড়ালেন জাফর আলি এবং বললেন, জনাব, এই ব্যক্তি রেশম ও কাঁসা পিতলের ব্যাপারী। সওদা করতে মুখসদাবাদে এসেছে। আপনার মত পূজ্য পুরুষের কাছ পর্যন্ত যাবার ভরসা পায়নি, তাই এসেছে এই নোকরের কাছে।

নবাব সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। তারপর হাঁক দিয়ে বললেন, দূর করে দিন এক্ষুণি ওকে এখান থেকে নইলে নবাবের লাথি থেকে ওকে পারবে না কেউ বাঁচাতে।

জাফর আলি দোভাষী মারফৎ বললেন, সাহেব, তুমি এখন যাও। কারবারে হাত লাগাবে কি না ভেবে খবর দোব তোমাকে। সাহেব প্রাণ নিয়ে দৌড় লাগাল।

জাফর আলির পরিত্যক্ত আসনে বসলেন নবাব এবং সামনের কুশীটা দেখিয়ে বসতে বললেন জাফর আলিকে। তারপর কতকটা যেন স্বগতভাবেই বললেন, আলি সাহেব, আমাকে না চান ত যাকে খুশী নবাব করুন। আপনি হতে চান তাই হন। কিন্তু দেশকে জহন্নামে দেবেন না।

ভৃত্যের ওপর অন্যায় দোষারোপ করছেন জনাব। আমার দিনের সব কাজ, সমস্ত চিন্তা, রাত্রের সমস্ত স্বপ্ন দেশকে ঘিরে। মরহুম আলিবর্দী খাঁর দিন থেকেই মনে প্রাণে জন্মভূমির সেবা করে আসছি। বৃদ্ধকালে আপনার কাছে আর একটু সুবিচার…

বলতে বলতে বাষ্পার্দ্র হয়ে এল তাঁর কণ্ঠ। হাতের রুমাল চেপে ধরে তিনি বললেন, মার্জনা করবেন জনাব, ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছি।

নবাব কিন্তু বিশেষ বিচলিত হলেন না। বরং কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাবই ফুটে উঠল তাঁর মুখে চোখে।

তিনি বললেন, আপনি কি জানেন যে যারা মসনদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল, কোম্পানী তাদের কয়েক জনকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে ? আমাকে জানিয়ে দিয়েছে তারা যে কিছুতেই আশ্রিতদের ফেরৎ দেওয়া হবে না। দরকার বোঝেনত নবাব যুদ্ধ করুন।

কোম্পানীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল আমার অগোচরে, ব্যাজার মুখে বললেন জাফর আলি, যেমন শেঠজীও রাজা-জীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমাকে না জানিয়ে।

জাফর আলির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হল, চাপা একটা অভিমানের সুর। তিনি বললেন, আপনার কাছে না যাওয়ার কথা বলছিলেন। কোন আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কি করে যাবে হুজুর এরপর ?

দু'হাতে তালি বাজিয়ে নবাব বললেন, উল্টো দিক থেকে প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করবেন না আলি সাহেব। এর প্রত্যেকটার জন্যে সলাহ করা ও ফর্মান নেওয়া উচিত ছিল আপনারই। আপনি বিপথে পা দিয়েছেন বলেই আমাকে অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

তারা আপনাকে ভুল পথে চালিয়েছে জনাব। আপনার নীতি আপনার ত সর্বনাশ করলই, দেশেরও সর্বনাশ এগিয়ে আনল।

বেশ আপনিই তাহলে নেন সব ভার। ঘরের ষড়যন্ত্রকারীদের সায়েস্তা করুন। শায়েস্তা করুন বেইমান কোম্পানীকে। বলুন আপনি পবিত্র কেতাব ছুঁয়ে যে আজ থেকে এ দুই কাজে জান মাল কবুল করবেন। আমি তাহলে এখন গদী ছেড়ে দোব।

গদী ছাড়তে হবে না। আপনি শুধু বিশ্বাসী নোকরদের ওপর ভরসা রাখুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। খোদা জানেন, আসন, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, এসবের ওপর আমার কোন লোভ আছে কি না। শুধু একটা কথা বলে রাখি জনাব যে কোম্পানী শুধু ব্যবসা করতেই চায়। অন্য কোন মতলব নেই তাদের। বেশ ভাল করেই যাচিয়ে দেখেছি আমি। এই সাহেবটির সঙ্গেও সেই কথাই হচ্ছিল।

এবার ক্রুদ্ধ হলেন নবাব। তিনি বললেন, তারা রাণীর ঘাটে কেল্লা বানিয়েছে। উলুবেড়িয়া, কলকুত্তা, সুতানুটী থেকে একটানা মগরা ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের জাহাজ। তারা প্রজা

বসিয়ে জমি বিলি করছে, খাজনা নিচ্ছে, অথচ নবাব সরকারকে নজরানা দিচ্ছে না। উল্টে সরকারের শত্রুদের সঙ্গে গোপনে ফন্দী আঁটছে। আপনি আমাকে বোঝাচ্ছেন তারা ব্যবসা করতে চায়, আর কিছু চায় না। আলি সাহেব, আপনার মগজ ঐ ঘুমতির মধ্যেই খোয়া গেছে।

জাফর আলি উত্তেজিত হলেন না। ক্রুর কটাক্ষে তাকিয়ে বললেন, আপনি যখন ওপরওয়ালা তখন যা খুশী বলতে পারেন। তবে দু'জন মানী হিন্দুর কোমরে দড়ি দিয়ে শুরুতর কসুর করেছেন আপনি, এ যেমন আপনার শুভার্তী হিসাবে না বলে পারব না, তেমনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠিয়ে দারুণ ভুল করেছেন আপনি, এ আমি ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে বলব।

কোনটাই ভুল করেনি আলি সাহেব, কালের বিচারে তা প্রমাণ হবে। ভুল করেছেন ও করছেন আপনি।

উঠে দাঁড়ালেন সিরাজদৌল্লা। বললেন বিদ্রোহ দমনের নামে পাঁচশো লোক কোতল করেছে মিরণ, তাই তাকে ফৌজ থেকে বরখাস্ত করেছি আমি।

সেলাম করে জাফর আলি বললেন, আপনার যা অভিরুচি জনাব।

॥ ১১ ॥

আট দিন পরে কোম্পানীর বড় কারকুন রবার্ট ক্লাইভের চিঠি নিয়ে মর্শিদাবাদে ফিরলেন আবিদ আলি। এর আগেই লোক মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নবাবকে যে কোম্পানী তাঁর হুকুম তামিল করতে গররাজী হয়েছে।

চিঠি পড়ে রাগে আগুন হলেন সিরাজদ্দৌল্লা। দাঁতে দাঁত ঘসে তিনি বললেন, মাকড়ের ডানা গজায় শুধু আগুনে পুড়ে মরার জন্যে। ভালই হল। সৈন্যবাহিনীকে হামলা চালানর হুকুম দিয়ে একটু ইতস্তত করছিলাম কাজটা ঠিক হল কিনা ভেবে। আর কোন কুণ্ঠা রইল না এখন।

মুন্সী এনায়েৎ খাঁ কোলের ওপর লাল চামড়ার একটা পেটি নিয়ে বসে ছিলেন। নবাব তাঁকে বললেন, পড় ত খাঁ সাহেব নবাব সরকারের চিঠিটা আর একবার, আর তার জবাবে লেখা কোম্পানীর প্রধান মুরুব্বির চিঠিটা।

এনায়েৎ খাঁ পড়তে লাগলেন ঃ

মান্যবর কোম্পানী বাহাদুর,

আজ ৯ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার নবাব উল মুলুক শের-এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা হুকমৎ বরাবর জানাচ্ছেন যে আপনারা কলকুত্তায় আর গঙ্গার এপার ওপারের অন্য অনেক জায়গায় কুঠি ফেঁদেছেন, বেআইনীভাবে কিল্লা ও বুরুজ বানিয়েছেন, সুতানুটি ও কালিঘাটায় বহুৎ প্রজা বসিয়েছেন। এর কোনটার জন্যেই নবাব সরকারের অনুমতি নেন নি। এই সব ইমারত সাত দিনের মধ্যে ভাঙতে ও ছুট প্রজা উচ্ছেদ করতে হবে। আর নবাব জেনেছেন যে নবাব সরকারের বিরুদ্ধতা করে কিছু হিন্দু গিয়ে আপনাদের কুঠিতে ঠাঁই নিয়েছেন। তাঁদের ঐ সময়ের মধ্যেই সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। দুটোর কোনটার অন্যথা হলেই চূড়ান্ত ফয়সলার ভার সৈন্য বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বহুৎ তসলিমান্তে ইতি—

সিরাজদ্দৌল্লা।

নবাব বললেন, হুম। আচ্ছা পড় এবার কেরেস্তান কুত্তাদের জওয়াব।

এনায়েৎ খাঁ পড়া শুরু করলেন,

মহামান্য নবাব বাহাদুর,

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগত কর্মী ও হুজুরের বশংবদ ভৃত্য রূপে জানাচ্ছি যে আমরা কোথাও কেল্লা বুরুজ নির্মাণ করে নি। পণ্যদ্রব্য কেনা বেচার কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে কতকগুলি গুদাম তৈরি করেছি। তার একটি ছাড়া কোনটাই কোঠাবাড়ী নয়। আর এই একটিও খাঁটি অর্থে বাড়ী নয়, পাকা কামরা মাত্র। কোম্পানী বাহাদুর মনে করেন ব্যবসা করার যে সানুগ্রহ অনুমতি নবাব সরকার মঞ্জুর করেছেন, এই কামরা বানানর অধিকার তার অন্তর্গত। কাজেই তা ভাঙার কথা ওঠে না। আর প্রাণ ভয়ে কয়েক জন হিন্দু জমিদার ও মহাজন যেহেতু আশ্রয় চেয়েছেন, সেহেতু ভগবান যীশুখৃষ্টের সেবক এই কোম্পানী তাঁদের ফেরৎ পাঠাতে পারেন না কোন কারণেই। এতে যদি প্রবল প্রতাপ নবাব উল মুলক এই শক্তিহীন বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই কোম্পানীকে তার সম্মুখীন হতে হবে।

শুক্রবার আপনার অতি অনুগত
৯ই মে, ১৭৫৫ রবার্ট ক্লাইভ

কপাল কুঁচকে নবাব বললেন, মছলি চোর বিল্লীর বিনয় দেখছ। এই ভণ্ডামির সমুচিত জওয়াব দেবে মির মুদ্দানালি ভাই, কি বল?

জরুর বললেন এনায়েৎ খাঁ।

ইতিমধ্যে চোপদার এসে রোকা দিল, সেনাপতি জাফর আলি আসছেন মোলাকাৎ করতে।

নবাব রোকাটি এনায়েৎ খাঁর হাতে তুলে দিয়ে একটু অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন। প্রত্যুত্তরে খাঁও তাকালেন একই রকম অর্থপূর্ণ মুখ করে।

জাফর আলি ঢুকে কুর্ণিশ করলেন। তারপর গদী আঁটা একখানা কেদারা টেনে নিয়ে বসলেন নবাবের ডান দিকে।

নবাব কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, কাল আমি বড়ই গোস্তাকি করেছি হুজুর। আপনি দুটো ভার নিতে বলেছিলেন বান্দাকে, এক কোম্পানীকে দুরস্ত করা, আর ঘরের দুষমণী খতম করা, সাহস করে হ্যাঁ বলতে পারি নি। আমি সালার এ সিপাহী, আমার এই কাপুরুষতা চরম বেইজ্জতীর কথা। সারা রাত আমি অনুতাপে ঘুমুতে পারিনি জনাব। সকাল হতেই তাই ছুটে এসেছি।

অনুতাপের কিছু নেই আলি সাহেব। ইচ্ছা করলে এখনো আপনি ষোল আনা ভার নিতে পারেন। আংরেজকে সিধা করুন, দুষমণদের কোমর ভেঙে দিন, দেশকে রক্ষা করুন, আপনি চাইলে আমি মসনদ ছেড়ে দিচ্ছি।

তোবা, তোবা, জিভ কাটলেন জাফর আলি। বললেন, বেহেস্তবাসী আলিবর্দীর রুহ আমাকে দোজখে ঠেলে দেবে জনাব, যদি তাঁর দৌহিত্র আপনাকে আমি বেইমানী করে জলে ফেলি। মসনদে আপনিই বহাল থাকুন,

আমরা আপনার নোকর নকীব থেকেই সুখী থাকব হুজুর।

বেশ তাহলে কোম্পানীর কুঠি তছনছ করে পলাতক দুষমণদের ধরে আনুন মুখসদাবাদে এবং কোতল করে এক সঙ্গে দুই শত্রু নিপাত করুন। আপনি প্রধান সেনাপতি, আপনারত আর হুকুমের দরকার নেই। তবু হুকুম নামা পাঠিয়ে দোব এনায়েৎ খাঁর হাতে। আংরেজ কুত্তাদের চিঠি পেয়ে এখন মেজাজটা ঠিক নেই।

চিঠিটা কি একটু দেখতে পারি হুজুর? কর্মপন্থা ঠিক করার আগে ওটা একটু দেখা দরকার।

পাবেন দু এক দিন পরে। উলেমা সাবকে দিয়েছি ফার্সিতে সবটা তর্জমা করে আনতে।

জাফর আলি একটু ইতস্তত করে বললেন, বান্দার কসুর যখন মাপ করলেন জনাব, তখন আপনার বরাবর একটি আর্জি পেশ করতে চাইছি।

কি আর্জি?

বিদ্রোহী জনতাকে সামাল দেবার জন্যে আমিই পাঠিয়েছিলাম মিরণকে। সে সবচেয়ে কম বল প্রয়োগ করে ভীড় ভেঙে দেবে, এই রকমই ঠিক ছিল। কিন্তু দু' কিস্তি হিন্দু ফৌজ এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দেখে, হুজুরের বশংবদ ভৃত্যরূপেই সে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং ফাঁড়িতে ফেরার পরে, ঐ ফৌজের লোকদের ফাঁসি দেয়। পাঁচশো নয় হুজুর, চারশো বাহাত্তর আদমি নিকেশ হয়েছে।

শুকনো চোখে তাকিয়ে নবাব বললেন, এই নিকেশের হুকুম নামায় ত সই করেছেন আপনি। করেন নি?

করেছি হুজুর। কিন্তু আমি শুনেছিলাম ওদের পাঠিয়েছেন দল নায়ক মোহন লাল সিং। গুরুতর অন্যায় মনে হয়েছিল এটা আমার।

মোহন লাল সিং? তাঁকে আপনি চেনেন নি আলী সাহেব। গোটা হুকুমত সফর ফৌজে ওঁর চেয়ে স্থির বুদ্ধি, সত্যবাদী ও দায়িত্বশীল লোক আর দু'জন নেই।

জাফর আলি বললেন, ওর ভগ্নী আহেলা বিবির সঙ্গে জড়িয়ে আপনার নামে মন্দ লোকে অনেক অকথা বলে হুজুর। তাই থেকেই আমার বোঝার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

সিরাজ হিংস্র দৃষ্টিতে একবার তাকালেন জাফর আলির দিকে, তারপরে বললেন, আচ্ছা এক মাস বাদে পুনর্বহাল হবে মিরণ। এই এক মাসের বরখাস্তই তার জরিমানা।

জাফর আলী উঠে কুর্ণিশ করলেন আবার এবং বললেন, হুজুর মা বাপ। এ আপনার মত মহাজনেরই যোগ্য কাজ।

চলে গেলেন জাফর আলি।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, আবার এই ঘায়েল নেকড়ের ফাঁদে পা দিলেন জনাব। ওঁর মতলব বোঝেন নি আপনি?

হেসে বললেন নবাব, খুব বুঝেছি। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। মুদনালির ফৌজ ছুটছে হাবেলী সহর ছাড়িয়ে মণিরামপুর মুখো। তারাই করবে সমুচিত মোকাবিলা আংরেজের সঙ্গে। ওদের পিছন পিছন কাল রওনা হচ্ছি আমি নিজে। যাই এখন একবার ফৈজী মহলে ঘুরে আসি।

॥ ১২ ॥

নৌকা ছাড়ার সময়ই আকাশ কালো করে জমা হয়েছিল জৈষ্ঠের ঘন মেঘ। ঘাটে ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দুরন্ত ঝড়। তার পিছু পিছু নামল প্রবল বর্ষণ।

বাদামী রঙের প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় ধরে একজন দেহরক্ষী নবাবকে ফৈজী মহলে ঘেরা বারান্দায় উঠিয়ে দিল।

গায়ের বর্ষাতী বালাপোষটা খুলে তার হাতে দিয়ে নবাব বললেন, ঝড় জল থামলেই আমি মহলে ফিরব। নৌকা যেন ঘাটে তৈরী থাকে।

কয়েক রশি গিয়েই নবাব দেখলেন, একটা নীচু পায়ার কুর্শিতে বসে নুর খাঁ তাঁর পেয়ারের বাঘের ছানাকে একটা সাদা পাথরের পেয়ালায় করে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

নবাবকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন নুর।

নবাব বললেন, জংলীশেরের বাচ্চাকে বৃথাই দুধ খাইয়ে বড় করছ নুর। একটু বয়স হলেই দেখবে সকলের আগে ও কামড়াতে আসবে তোমাকে।

নুর বিনম্র কণ্ঠে বললেন, হতে পারে জনাব। তবে আমার চাচেরা ভাই দাউদী বেগের শের বাচ্চাটা বেশ ডাগর হয়েছে। তাকে কিন্তু একায় জুতে দাউদীর মেয়ে রহিমা রোজ বিকালে ফুল বাগিচায় ঘুরে বেড়ায়।

হয়ত রক্তের স্বাদ পায়নি এখনো। তবে পেতে দেরী হবে না। জেলালুদ্দীন রুমী বলেছেন, কাঁটার মুখ আপনিই ধারাল হয়, আপনিই রঙদার হয় ময়ূরের পেখম। বুঝলে।

বলতে বলতেই ভেতরে ঢুকে গেলেন নবাব। বাইরে তখন শুরু হয়েছে দুর্দান্ত বৃষ্টি। কিন্তু ঘরের ভেতর বাজছে বাঁশীতে মোলায়েম বারোয়াঁর সুর। গমক দিয়ে দিয়ে চলছে সারেঙ্গীতে করুণ কান্নার মত স্তিমিত এক একটি টান। আর চলছে মৃদঙ্গে মৃদু তালে তার সঙ্গে সঙ্গত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে নবাব দেখলেন, তন্ময় হয়ে নাচছেন ফৈজী, বাজানার তালে পা ফেলে ফেলে। নাচছেন আর গাইছেন।

কান খাড়া করে শুনলেন গানটি নবাব:

যো কুছ থা দিলমে
উসকো বহার লানেক বার,
ইয়ে আফশোস মহব্বৎকা
পেঁজরা হো গয়া চুরমার।
আসমানমে পঞ্ছী খো গয়া,
পড় রহা পিঁজরা নাচার,
সুবা সাম/রো রোকে
অব লায়া রাতকি আন্ধার।

ঘরে জ্বলছে এক সার রকমারি রঙের মোমবাতি ঝুলন্ত ঝাড়ের আধারগুলোয়। পুব পশ্চিম ও দক্ষিণের সবকটি দরজা জানলা বন্ধ। শুধু খোলা আছে উত্তরের পর্দা ঘেরা দরজা দুটো। এই ছায়াময় মায়াময় কক্ষ পুরীতে একমনে নাচছেন ফৈজী। একটি জাগ্রত জীবন্ত স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে সমগ্র দৃশ্যটা। ফৈজীকেও হালকা জাফরাণী কামিজে, ঘাগরায় ও উড়ন্ত রেশমী ওড়নায় দেখাচ্ছে যেন সদ্য মাটীতে নেমে আসা সুরময়ী অপ্সরীর মত।

চমকে উঠলেন নবাব হঠাৎ ফৈজী ডান দিকে চোক ফেরাতেই। এ কি?

তাঁর দু' চোখে জল কেন? গানের ব্যথা ভরা কলিগুলো মনে গুঞ্জন করেই ফিরছিল তাঁর। আবিষ্ট অভিভূত হয়েছিলেন তিনি নূপুরেরর তালেও। চোখের জল করে দিল তাঁকে অস্থির উতলা। বুকের ভেতরটা ছলছলিয়ে উঠল তাঁরও।

একবার ভাবলেন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন তাঁকে দু'হাতে। আবার ভাবলেন এই অপূর্ব ভাবাবেশ ভাঙবেন না শিল্পীর। মানুষের জীবনে এমন দুর্লভ মুহূর্ত কদাচিৎ আসে।

কিন্তু চেষ্টা করেও রুখতে পারলেন না গলার শুকনো কাশিটা। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা থামল। থেমে গেল নৃত্যগীতও। ব্যগ্র দুটি হাত বাড়িয়ে ফৈজী এসে দাঁড়ালেন বাইরে এবং অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন নবাবকে পাশের সজ্জিত ঘরটিতে।

নবাব বললেন, সুরের শাহানশাকে তোমার অর্ঘ্য নিবেদন করছিলে পিয়ারী। এমন তন্ময়তা গন্ধর্ব, জীন, আফসানাদেরও আছে কিনা সন্দেহ! তোমার ধেয়ান ভাঙলাম।

ফৈজী বললেন, আমার সুরের শাহানশা ত তুমি খোদাবন্দ। কাছে থাক দূরে থাক, সব পূজো আমার তোমাকে।

নবাব কাছে টেনে নিলেন ফৈজীকে। বললেন, কাঁদছিলে কেন? লড়াই কাজীয়ার জীবন আমাদের। সুর কম বুঝি, শিল্প একেবারেই বুঝিনা। বলত কি হয়েছে।

ফৈজী বললেন, কোন কারণে নয় জনাব। সাহানা, সোহিনী, পিলু বারোয়াঁ ধরলেই কেমন যেন কান্না আসে আমার। মনে হয় কি যেন খুঁজেছিলাম, কি যেন পাইনি।

আর্দ্র কণ্ঠে নবাব বললেন, আমি কলকুত্তা দৌড়চ্ছি ফৌজ নিয়ে। আংরেজকে সিধে করে পনের দিনেই ফিরব। তার পর···

তার পর কি জনাব?

তোমায় আমি নেকাহ করব, ধর্মপত্নী করে তোমায় দোব মসনদের বখরা। এরকম করে আর চলেনা ফৈজী।

ভুল করবেন জনাব। বিয়ের দড়িতে বাঁধবেন না আমাকে। আপনার মহব্বতের মুক্ত দরিয়ায় সাঁতার দিয়েই সুখী আছি ও থাকব আমি। বেগম আপনার এক জনই থাকুন সুন্দরী লুৎফা। আল্লা তালা মঙ্গল করুন তাঁর।

নবাব আহত হলেন। এমনটা ত আশা করেন নি তিনি। তারপরই মনে হল না, না, ফৈজী সত্যিই মহৎ, সত্যিই উদার। যাচা সম্মান প্রত্যাখ্যান করছেন তিনি, আর একটি নিরপরাধ নারীর স্বার্থ ও সুবিধাহানির ভয়ে।

দুজন খানসামা বিরিয়ানি, গোস্ত, আলু বখরার খাট্টা শিন হালুয়া ও আঙ্গুরী খুন মদের ছোট্ট একটা মশক নিয়ে এল। থরে থরে সাজিয়ে রাখল জিনিসগুলো তারা নবাবের সামনে একটি তেপায়ার ওপর। রাখল রূপোর কৌটোয় পান।

খানসামাদের বিদায় করে দিয়ে ফৈজী বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে জনাব। দুপুরের খাওয়াটা সেরে যান এখান থেকে। তাছাড়া অনেক দিনের সাধ আমার, নিজে হাতে তৈরি খানা খাওয়াব আপনাকে। বিমুখ করবেন না বাঁদীকে।

বাঁদী? তুমি ত বলেছিলে ফয়জান যে তুমি বেগমও হবে না, বাঁদীও না। তুমি থাকবে দোস্ত।

সে বলেছিলাম মুখ দিয়ে। বুকে তখনো আপনার প্রেম তুফান তোলে নি জনাব। আজ বুঝছি আপনিই ঠিক। ভালবাসা মানেই আত্ম বিসর্জন।

বিসর্জন, না সমর্পণ?

ও দুই একই কথা জনাব, এই বলে আলতো করে ডান হাতটি রাখলেন তিনি নবাবের কাঁধে। বললেন, খান জনাব।

নবাব হেসে বললেন, খেতে পারব না পিয়ারী। খাদ্য পরীক্ষক সঙ্গে নেই। কোন কিছু খাবার আগে তাঁর ছাড়পত্র চাই যে।

আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করছেন নবাব?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় ফৌজী। এই হল দস্তুর। নবাব আগে নবাব, তারপর ত মানুষ।

এবার আহত হলেন ফৈজী। বললেন, বহুৎ আচ্ছা জনাব।

নবাব উঠে চুমো খেলেন তাঁর মুখে। তারপর বেরলেন বারান্দায়। সেখান থেকে ফটক পেরিয়ে দাঁড়ালেন ঘাটে গিয়ে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে তখন ফুটেছে উজ্জ্বল সূর্যের আলো।

নবাবের বজরা ঘাট ছাড়তেই ঘরে এসে ঢুকলেন নূর খাঁ এবং নবাবের পরিত্যক্ত আসনে চেপে বসে বললেন,

খোদা মিলায় ত মিলে খানা,
আঁখো মিলায় ত মিলে আফসানা।

ফৈজী বললেন, কিন্তু তোমার আফসানাকে ত বেকুবটা নেকাহ করে বেগম বানাতে চায়। এখন কি করবে তুমি?

তোমার যদি মেহেরবানি থাকে তাহলে বেগম হলেও এই বান্দাকে পায়ে রাখবে, সে আমি সঠিক জানি। কিন্তু একটা কথা সাচমুচ বলত, নবাবকে কি তুমি সত্যিই ভালবাস না?

বিলকুল না। ওর যত খায়েস আছে, তত হিম্মৎ নেই। সে রকম জিন্দা মরদ নয় ঐ বাচ্চা নবাব, যা আমার মত ঔরৎকে মহব্বতের যুদ্ধে কাবু করতে পারবে।

নূর হেসে বললেন, ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। কিন্তু শোবার ঘরের খাটের তলাটা দেখেছ ত?

দেখেছি। আলিবর্দীর করব থেকেই এঁকে বেঁকে চলে এসেছে বুঝি রাস্তাটা? একদিন ঐ রাস্তার এক মুড়ো থেকে অন্য মুড়োয় যাব তোমার সঙ্গে।

বেশ যাবে। এখন এস খাওয়া সেরে নিই।

দু'জনে খেতে বসলেন পাশাপাশি।

নূর বললেন, গোবিন ভাট বেটাকে একটা কাজ দিয়ে দু হপ্তা কিষনগরে পাঠিয়েছিলাম। সেই ফাঁকে সুড়ঙ্গটা বানান গেল। সারা দিন আগান বাগানে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। আস্ত শয়তান লোকটা। মোটেই বিশ্বাস করি না আমি ওকে।

বাধা দিয়ে ফৈজী বললেন, না, না, গরীব বেরাহ্মন। কাঠ কুটো কুড়িয়ে বেড়ায়। ওকে সন্দেহ করার কিছু নেই।

নূর বললেন, বাঙালী হিন্দুকে তুমি চেন না। ওরা শেয়ালের মত চতুর।

শক্তির অভাবকে ওরা বুদ্ধির ধূর্তামি দিয়ে পূরণ করে নেয়।

॥ ১৩ ॥

নবাব রাজধানী ছাড়ার পরদিন দুপুরে খোশবাগের ঘাটে রোশনারা নহর থেকে নামলেন পীর কুতুব আলি। ফৈজী বারান্দার পৈঠায় দাঁড়িয়েই ছিলেন। এগিয়ে এসে আদাব জানালেন। বললেন, আসুন খোদাবন্দ।

চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে আর খাঁতখেঁতে ভাঙা গলায় কাশতে কাশতে পীর সাহেব বললেন, নূতন বৃষ্টির জলে ভিজে একটু শর্দি হয়েছে। তা কি জন্যে তলব করেছিস বেটি বুড়োকে ?

তাঁর দুপায়ে হাত রেখে ফৈজী বললেন, মেহেরবানী করে ভিতরে আসুন জনাব। কিছু জরুরী আরজ আছে।

আগে আগে ফৈজী চলেছেন লীলা-পরায়ণা হরিণীর মত। পিছন পিছন চলেছেন পীর সাহেব। নিজের কামরা থেকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন নুর খাঁ। নিজের অজান্তেই চাপা একটা হাসি ফুটল তাঁর মুখে।

গদী আঁটা কেদারায় গেদ্দা বালিসে ঠেস দিয়ে বসে কুতুব আলি বললেন, যা ভাবছিস তা হবে না। যা ভয় করছিস তাও হবে না। মস্ত ঝড়ি আর বাঢ় চলে যাবে ওপর দিয়ে। জানের হানি করবে না, তবে গোটা ছকই পালটে দেবে তোর জীবনের।

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটল ফৈজীর মুখে চোখে।

তিনি বললেন, আপনার জোবান ঠিক ঠিক বোঝার মত জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই হজরৎ। সহজ করে বলুন একটু।

ঘরের ডান দিকে এক জোড়া মিথুন-বদ্ধ নিরাবরণদেহ নর-নারীর শ্বেত পাথরের মূর্তি। বাঁ দিকে পেথম ধরা একটি সত্যিকার মৃত ময়ূর দাঁড় করান। কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না, ঘরের ভেতর একটা নীলচে আলোর আভা একটানা ঝিলিক দিচ্ছে। ঝির ঝির করে আসছে আম জাম কাঁঠালের বাগান থেকে গা জুড়ান ঠাণ্ডা হাওয়া।

পীর সাহেব বুঝি বুঝি মুখ করে হাসতে আর কাশতে লাগলেন। আর ঝাঁকড়া চুলের জঙ্গল থেকে কল্কা বসান আদ্দি টুপি খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখের ওপর বাতাস করতে লাগলেন।

ফৈজী অস্থির উদভ্রান্ত। পীর সাহেবের যেন হুঁসই নেই।

নিস্তব্ধতা ভেঙে ফৈজী বললেন, আমার আজ কি হবে, দু'দিন বাদে কি হবে, সব অকপটে আমায় খুলে বলুন খোদাবন্দ !

পীর সাহেব আলখেল্লার জেব থেকে একখানা আতস কাচ বের করলেন। খোলা দরজার দিকে সেটা ধরে তার ওপর এক নজর তাকিয়েই বললেন, সন্দেহ করিস নে বেটি। যা দেখেছি ঠিক দেখেছি। যা বলেছি তার মধ্যে কোন গলতি নেই।

সে কথা বলছি না জনাব। আপনার জোবানের মর্ম বুঝতে পারিনি, এই-টুকুই শুধু নিবেদন করছি আপনার পায়ে।

পীর সাহেব কাঁধের ঝোলা থেকে কালো কাচের দানা বসান একটা মাঝারি আকারের মালা বের করে দিলেন ফৈজীর হাতে।

বললেন, সকাল সন্ধ্যা রোজ এই তসবীতে আড়াইশো বার আল্লার নাম জপ করবি। দেখবি অস্থির মনও ঠাণ্ডা হবে, যে কোলো মেঘ ঘিরে আসছে চার দিক থেকে, তাও শেষ পর্যন্ত খোদার প্রসাদে কেটে যাবে।

ভগ্নকণ্ঠে ফৈজী বললেন, কি ভাবছি কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে, কি করে কেটে যাবে সব কিছুই আমি আপন অন্তরে বুঝছি না। তাই আপনার কথাগুলো ঠেকছে বড্ডই ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া গোছের।

হো হো করে হেসে উঠলেন পীর কুতুব আলি। উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যের দিকে মুখ করে দুহাতে তালি বাজালেন বার কতক। তারপর বললেন, দে দে বেটির তিসরি চোখ খুলে।

ফৈজীর মনে হল পীর সাহেব যা শুনেছেন, সবই ভুয়ো। লোকটি হয় বদ্ধ পাগল, নয় বেহদ্দ বজরুক। তবু ধৈর্য রক্ষা করে তিনি বললেন, তাহলে আপনি বলেছেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না।

না।

আমার গর্দানও যাবে না।

না। তবে যাবার অবস্থা হবে। কি ভাবে হবে, কবে হবে তা আমি বলব না। সাতদিন তসবী জপের পর এই সিসায় চোখ রাখিস আপনিই দেখতে পাবি তুই। এ সিসা মদিনা শরীফ থেকে আনান।

আতস কাচখানা হাতে নিয়ে ফৈজী কপালে ঠেকালেন। তারপর দুহাত জুড়ে বললেন, কিছু মিঠাই পানি আনাই জনাব।

পীর বললেন, না। তংকা নেওয়া খানা পিরনা বখশিস নেওয়া ঝুটা কথা মিঠা কথা বলা···ওসব গিরস্তী লোকের কাম। আমি ফকির, হাটে মাঠে খাই, আমি দরমহো নিয়ে কারোকে তগদীর বাৎলাই না বেটি।

হাতের টুপিটা মাথায় পরে, কাঁধের ঝুলিটা গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ালেন পীর সাহেব।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাবিস না পীর বাবা তোকে ধোকা দিয়ে গেল। যা বলেছি সব নিছক সত্যি।

তারপরই হন হন করে হেঁটে গিয়ে বজরায় উঠলেন। চার দিক অন্ধকার করে বৃষ্টি এল তখনি ঝমঝম শব্দে। ফৈজী দেখলেন নুর খাঁ তাঁর বাঘের ছানাটাকে তাড়াতাড়ি খাঁচায় বন্দী করছেন। উদাস অবসন্ন মনে তাঁর গানের জোয়ার এল। সেই পুরান গান বরিখে বাদারিয়া।

* * *

বিকালে গঙ্গার দিকে মুখ করে খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন লুৎফুন্নেসা। আকাশ ও জলে ব্যবধান রচনা করে চিকের মত দুলছে দুরন্ত বৃষ্টির ধারাগুলো। এপারের পথঘাট বাজার গঞ্জ, সব বৃষ্টির আড়ালে ঝাপসা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ওপারের গ্রাম, বন, মাঠ সব মনে হচ্ছে স্বপ্নের মত ধূসর।

নবাব যুদ্ধে রওনা হবার পরই

হাজারো ভয়, লাখো দুশ্চিন্তা শতপদী বিছার মত দিনরাত্রি কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাঁর মগজে। মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। একটু ছোঁয়া লাগলেই হুড়মুড় করে অতলস্পর্শ অন্ধকারে গড়িয়ে পড়বেন।

দরজায় কাঁশির শব্দ হতেই চমকে পিছন ফিরে দেখলেন, দুহাত বুকের কাছে একত্র করে দাঁড়িয়ে আছেন পীর সাহেব।

নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে লুৎফুন্নেসা বললেন, আসুন, আসুন জনাব। বড় দরকার আমার আপনাকে। কিন্তু কোতয়ালীর হুকুম নেই বাইরে বেরনর। তাইতে খবর পাঠিয়েছি।

পীর কুতুব আলি চেপে বসলেন আরাম কুর্শিতে ধীরে-সুস্থে। তার পর বললেন, যা দূরে ছিল তা বিলকুল কাছে এগিয়ে এসেছে আম্মাজান। এ যুদ্ধে অবশ্য নবাব সাহেবই জিতবেন। কিন্তু পরেরটায় কোন ভরসা নেই। সব ভেঙে ভেস্তে চুরমার হয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতায় পড়বে নুতন আঁচড়।

প্রাণটা রক্ষা হবে ত, কাকুতির সঙ্গে বললেন লুৎফা।

না। তবে যুদ্ধে হবে না, হবে এক নেমকহারামের হাতে।

কে সে?

উঁহু, ওকথা জিজ্ঞাসা করিস নে বেটি।

এরপরই অন্যদিকে চোখ রেখে আপন মনে বলতে লাগলেন তিনি, প্রাণ থাকত, গদী ছাড়লে। সে কথা ত আগেই বলেছিলাম মা।

কপালে হাত রেখে বিস্ময়কণ্ঠে লুৎফা বললেন, শের বাবর সাতরোজ না খেয়ে থাকলে কি ঘাস খেতে পারে জনাব? নবাবী দিমাক নিয়ে যাঁর জন্ম, ইজ্জতের জন্যে তিনি জান কবুল করতে পারেন। তবু ইজ্জৎ খোয়াতে পারেন না।

সেখানেই ত সত্যিকার বিপদ।

ইতিমধ্যে কখন যে সালেহা এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে, লুৎফা তা টেরই পান নি। কিন্তু তাঁকে দেখেছেন পীর সাহেব। নিঃশব্দ হাসিতে স্বাগত জানালেন তাঁকে তিনি।

সালেহা বললেন, হজরত বাবা, আমার বহিন বড্ডই ভেঙে পড়েছে। আপনি একটা কিছু করুন যাতে ওর বিপদের মেঘ কেটে গিয়ে আবার সুখের আলো ফুটে বেরয়।

পীর সাহেব আপন বুকে হাত ঠেকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, খোদা হাফেজ। তারপর চোক গিলে বললেন, কি জানিস বেটি, দোজখের চররা যখন ঘাড়ে চাপে, তখন তারা মানুষকে ভুলের পর ভুল করায়। গড়ান পাথরের মত সে একেবারে রসাতলে গিয়ে তবেই থামার সুযোগ পায়।

একটু খোলসা করে বলুন বাজান, বললেন সালেহ অনুনয়ের সুরে।

লুৎফা কিছু বললেন না, শুধু মিনতি ভরা চোখে তাকালেন। অন্তরের অস্থিরতাটুকু সব যেন মিশিয়ে দিলেন তিনি সালেহার ঐ কথার সঙ্গে।

পীর সাহেব বললেন, ঘটনার গতি ঠেকানর ক্ষমতা মানুষের নেই। ফাঁকি বাজরা যত খুসী বড়াই করুক, যা হবার তা হবেই। তবে দেখব চেষ্টা করে। সব গরব গরিমা ঝরে যাবার পরে যখন প্রাণ রক্ষার তাগিদে পালাতে বাধ্য হবি, তখন আসিস। কেমন?

কি ধরনের বিপদ আসছে জনাব?

ত্রাসে গলা বুঁজে এল লুৎফার।

আর কিছু শুধাস নে বেটি। যা দেখতে পেলাম এক নজরে, তাই বলে দিলাম।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে তখন ধূসর সন্ধ্যার আকাশ দেখা দিয়েছে। গঙ্গার জলে কেঁপে কেঁপে ইতস্তত ঝিকমিক করছে প্রথম রাতের তারারা। দূরে দূরে চলেছে নৌকা, বজরা, ভাউলে, ভড়, জেলে ডিঙি। বিলম্বিত পাখীর ঝাঁক দু'একটা তখনো সবেগে ডানা ঝাপটে উড়ে চলেছে বাসার দিকে। অথবা পথ হারিয়ে বৃথাই পাক দিচ্ছে।

পীর সাহেব বাইরে পা বাড়িয়ে ছিলেন। কি মনে হতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, যেদিনের কথা বললাম, তা যখন আসবে, তখন বাবুয়ানির সমস্ত ঠাট-বাট, ক্ষমতা ও খাণদানি চালের সমস্ত জৌলুষ টেনে দূরে ফেলে দিয়ে পথে পা দিবি কিন্তু।

লুৎফা ও সালেহা এক সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বাঁদী গুলনার এসে জানাল পাল্কী মোতায়েন আছে।

পীর সাহেব বললেন, বহুৎ আচ্ছা। একবার জাফর আলির কুঠিতেও যেতে হবে। মণিবেগম মোলাকাৎ চেয়েছেন।

॥ ১৪ ॥

প্রায় আড়াই মাস পরে নবাব রাজধানীতে ফিরলেন ইংরেজদের বানন কুঠি কাছারি সব ভেঙেচুরে দিয়ে এবং পলাতক ষড়যন্ত্রীদের বন্দী করে নিয়ে। কোম্পানী শুধু পরাজয়ই স্বীকার করল না, এক চুক্তি অনুসারে নবাব সরকারে এগার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হল। সবাই ভাবলেন গোখরো সাপের মাজা ভেঙেছে এবার।

বিকালে নিজস্ব উপদেষ্টাদের বৈঠক ডেকে সব বিবরণ ব্যক্ত করলেন নবাব। তারপর বললেন, আপাতত নিষ্কণ্টক হওয়া গেল। এখন বাকী শুধু ঘরের দুষমণ কটাকে সায়েস্তা করা। এক হপ্তার মধ্যেই ওদের প্রাণদণ্ড দিয়ে ষোলআনা নিশ্চিত হব।

কাসিম খাঁ বললেন, ওঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। নইলে জিনিসটা প্রতিহিংসা মেটানর মত দেখাবে কিন্তু।

আসগর খাঁর দিকে তাকিয়ে নবাব বললেন, আপনিও কি তাই বলেন খাঁ সাহেব?

আসগর খাঁ বললেন, বিশ্বাসঘাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহীর দণ্ড অবশ্য মৃত্যুই। তবু হিন্দু জনমত হাতে রাখার জন্যে একটা ন্যায় বিচারের অভিনয় দরকার।

নিষ্প্রভ মুখে নবাব বললেন, আচ্ছা, তাই হবে।

ঠিক এই সময় আবিদ আলি এসে কাসিম খাঁর হাতে একটা বাঁশের চোঙা তুলে দিলেন। গুপ্তচর বিভাগের

অধিনেতা মামুদ বেগ পাঠিয়েছেন তাতে একটা জরুরী রোকা।

কাসিম খাঁ সেটি খুলে পড়লেন। তারপরই গম্ভীর মুখ করে বললেন, আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। এখন পরিষ্কার বুঝলাম কোম্পানী চুক্তিটা করেছে শুধু সময় নেবার জন্যে। বেগ সাহেব জানাচ্ছেন, উত্তর থেকে গাঢ়োয়ালী ও পাঞ্জাবী এবং দক্ষিণ থেকে তেলেঙ্গী সিপাহী সংগ্রহ করে ক্লাইভ, ওয়াটস আর ভ্যানসিটার্ট আসছেন মুর্শিদাবাদ বরাবর হামলা করতে। তিন দলে ভাগ হয়ে তাঁদের ফৌজ রওনা দিয়েছে। কিছু আসছে নৌকায়, কিছু ঘোড়ায়। পদাতিকদের ছাউনি পড়েছে মণিরামপুরে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন সিরাজদ্দৌলা। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। রোকাটা টেনে নিলেন তিনি আপন হাতে। দ্রুত চোখ বুলালেন সবটা বক্তব্যের ওপর।

বাঁ হাতের তেলোয় মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা সজোরে ঠুকে তিনি বললেন, হারামখোর কেরেস্তানদের ঝাড়ে বংশে খতম করে তবেই হাতিয়ার গুটান উচিত ছিল আমার। আচ্ছা, করছি ভাল করেই তাদের কবরে গাড়ার ব্যবস্থা।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সিরাজদ্দৌলা বললেন, সকাল হতে হতেই কাল সলাহ বৈঠক বসবে জঙ্গী পরিষদের। এনায়েৎ খাঁ, রাত্রের মধ্যেই যেন প্রধানদের সকলকে এত্তেলা পাঠান হয়। ওদের জন্যে অপেক্ষা না করেই আমরা আগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এনায়েৎ খাঁ মাথা চুলকে বললেন, খবর এখনি চলে যাবে। আট-দশ জন ঘোড় সওয়ার ছুটবে চারদিকে রোকা নিয়ে। কিন্তু একটা প্রশ্ন…

অস্থিরভাবে বাধা দিয়ে নবাব বললেন, কি ?

জাফর আলি সাহেবকে ত' আপনি আগেই পুরো পাঞ্জা দিয়ে রেখেছেন। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব ত' বর্তাবে…

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর হাতেই। তাছাড়া উপায় কি ? কাঁটা দিয়েই কাঁটা ওপড়াতে হবে। দুষমণ দিয়েই দুষমণীর ঘর ভাঙতে হবে। তবে মোহনলাল সিং আর মুদনালির ওপর ঢালাও হুকুম থাকবে, তেমন তেমন দেখলে প্রধান সেনাপতির ফর্মান অগ্রাহ্য করেই তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন। চাই কি দরকার হলে প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারবেন।

কাসিম খাঁ মাথা নেড়ে বললেন, গোড়ার বনিয়াদটা, বড্ড কাঁচা থেকে গেল জনাব। জঙ্গী কানুনে নীচুওয়ালার পক্ষে ওপর ওয়ালার কোমরে দড়ি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ইয়াদ রাখবেন, জাফর আলি ও মিরণের বশংবদ লোকের সংখ্যা কম নয় ফৌজে।

নবাব বিকৃত কণ্ঠে বললেন, হাল ছেড়ে দেবেন না খাঁ সাহেব। জাফর আলি-বেইমানী নাও করতে পারেন ত'। পবিত্র কেতাব হাতে হলফ করেছেন তিনি আমার সামনে।

এনায়েৎ খাঁ বললেন, সাধুজনকে আলো থেকে অন্ধকারে দিশেহারা করার জন্যে ইবলিসও কেতাবের নামে কসম খায়, বলেছেন আল্লামা সবিস্তারী। জাফর আলিকে আদৌ বিশ্বাস নেই আমার। যাই হক, আপনারা এগোন, আমি আসছি এখনি।

অন্যেরা সবাই বিদায় নিলেন একে একে। এনায়েৎ খাঁ শুধু একা বসে রইলেন অন্ধকারে মাথা হেঁট করে।

চিন্তান্বিত মুখে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন নবাব। মুখ দেখেই বোঝা যায় মনে তাঁর দুরন্ত একটা ঝড় দাপাদাপি করছে। একটা চরম বোঝাপড়া, একটা রোজ কেয়ামতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন যেন তিনি।

হঠাৎ এনায়েৎ খাঁর দিকে চোখ পড়তেই বললেন, কিছু কি বলতে চাইছ খাঁ সাহেব ? নিঃসংকোচে বল।

একটু ইতস্তত করে এনায়েৎ খাঁ বললেন, অন্য কিছু বলব না। ফৈজী বেগম সাহেবাকে আপনি ঐ রোশেনারা বজরায় উঠিয়ে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, ফের সেখানেই ভেজে দিন জনাব।

ঘুমন্ত মানুষের গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগার মত মুহূর্তে চমকে উঠলেন সিরাজদ্দৌলা। জানলার কাছ থেকে প্রায় লাফিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন মুন্সী সাহেবের সামনে।

বললেন, কেন, কেন একথা বলছ ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে এনায়েৎ খাঁ বললেন, নবাব উল মুলুক শেরে বাঙাল সিরাজদ্দৌলার সঙ্গিনী হবার যোগ্য নন তিনি…এর বেশী আর কিছু বলতে বলবেন না আমাকে হুজুর। ছোট মুখে বড় কথার মত শোনাবে। তাছাড় নারীর নামে কুৎসা করা আমার রুচিতেও বাধে।

নবাব বললেন, তুমি ত নবাব সরকারে এক জন পহেলা সারির আমলা মাত্র নও, তুমি আমার দোস্ত, আমার উস্তাদ, আমাকে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালান, নৌকা বাওয়া, গান ও কবিতা চর্চা করা, হরেক বিদ্যায় তালিম দিয়েছ। আমার ঘর সংসার, জীবন, সব বিষয়ে তুমি আমার সলাহকার। এত বড় একটা ব্যাপার, যার সঙ্গে আমার জানমান জড়িয়ে আছে, এখানে তুমি সব কথা আমায় খুলে বলবে না ? তাহলে আমি আর কার মুখ চাইব বল ত'।

এনায়েৎ খাঁ কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব নীচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, দেহরক্ষী নুর খাঁর সঙ্গে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত। জ্যোৎস্না রাত্রে ওঁরা বজরায় চেপে গঙ্গায় টহল দেন। বিবি খোলা পাটাতনে বসে গান ধরেন তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে তা শোনেন নুর। দুপুরের খরায় আম বাগানে বাঁধান বেদীর ওপর গায়ে গা দিয়ে বসে দু'জনে আদর সোহাগে মশগুল হন। বর্ষার রাত্রে নীল বাতি জ্বালিয়ে খোলা জানলার……

তাঁকে বাধা দিয়ে নবাব চীৎকার করে উঠলেন, আর বলতে হবে না। নেমকহারাম নুরকে আমি কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। আর ঐ কসবীকে আমি দরজা জানলা গেঁথে দিয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে শুকিয়ে মারব একটু একটু করে। কিন্তু তুমি, তুমি কি করে জানলে ? বল শীঘ্রী, বলতে হবে তোমাকে। এনায়েৎ খাঁ বললেন, পেশাদার বাঈজীকে আপনি বজরা থেকে নামিয়ে এনে যখন বিবির ইজ্জত দেন, তখনই আমার মন তাতে সায় দিতে গররাজী হয়েছিল জনাব।

তাই আমি ওঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে ফৈজী মহলের পাশেই শিব মন্দিরের লাগোয়া কুঠিতে গোবিন ভাটকে মোতায়েন করে ছিলাম। সব খবর আমার কাছে পৌঁছেছে তার মারফৎ।

সে মিথ্যাবাদী কিনা যাচিয়ে দেখেছ? লোভী বেরাহ্মন এনামের আশায় অপবাদ রটাতে পারে ত।

না জনাব, গোবিন গরীব, কিন্তু ইতর নয়। তাছাড়া অন্যভাবেও যাচাই করেছি আমি।

কি রকম?

কলিমন বিবি বলে এক বাজারী কসবীকে চুড়িওয়ালী সাজিয়ে পর পর কয়েকদিন পাঠিয়েছি ফৈজী মহলে রকমারি বেলওয়ারি চুড়ি, টিপ, আর জরির সিঁথি পাটি বিক্রি করতে। সে বেগমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে একদিন গণৎকারাণী সেজে তাঁর হাত দেখে। সেই ফুরসতে সে বলে নবাবের সঙ্গে দুষমণী করে তুমি জিম্মাদারের সঙ্গে আশনাই করছ দিদি। এ ঠিক নয়; এ মহা পাপ। তাছাড়া একদিন এই বেইমানীর ব্যাপার জানাজানি হলে মহা বিপদ হবে তোমার।

অধীর হয়ে নবাব বললেন, কি বলল সে তাতে?

এনায়েৎ খাঁ বললেন, তাঁর উপযুক্ত কথাই বললেন, আমি নবাবের সাদী করা বৌ নই। আমি স্বাধীন জীবিনী নর্তকী। যে আমার খায়েস মেটাতে পারবে আমি তারই। আমার সতীত্ব রক্ষার জন্যে বৃথা খপর্দারি না করে নবাব বরং লম্পট হুসেন কুলের কবল থেকে আপন মাসী ঘসেটি বেগমকে বের করে আনুনতো। তাতে হারেমের ইজ্জত বাড়বে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন নবাব। বললেন, চল খোস বাগ। এখনই শেষ করে আসি এই জঘন্য নাটকের।

এনায়েৎ খাঁ এগিয়ে এসে হাত ধরলেন তাঁর। বললেন, আপনি সাধারণ মানুষ নন জনাব, বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা। যতবড় অন্যায়কারীই হোক কোন মানুষ, নিজে তার কসুর সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে দণ্ড দেবেন না। ধৈর্য ধরুন।

বেশ, কাল রাত্রেই আমরা বনে বনে খোসবাগ যাব এবং অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থেকে স্বচক্ষে দেখব যা শুনেছি তা সত্যি কিনা। তুমি ইতিমধ্যে সাপে কাটা দুখু মিঞা ও তার বিবি মরিয়ামের কবলে মিনার তোলার নামে এক নৌকা ইঁট আর চুণ সুরকি দিয়ে কয়েক জন মজুর পাঠিয়ে দাও খোসবাগে। বুঝেছ।

এনায়েৎ খাঁ হুকুম নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ১৫ ॥

মেঘ ভাঙা রোদ্দুরের আলোয় ঝলমল করছে সকালের আকাশ। নবাব বাড়ীর তোরণ থেকে সানাইয়ে বাজছে আহিরী ভেঁরোর মোলায়েম সুর। হাজার দুয়ারীর চার পাশের বাগিচায় হাজারো পাখী গলা মিলিয়ে সঙ্গত করছে যেন তার সঙ্গে। আকাশ মাটি জলে ছল ছল করছে কেমন একটা বিষণ্ণ মধুরতার আমেজ।

নবাবী ফৌজ এই সকালে রওনা হচ্ছে কলকাতার পথে। সারা শহরে রটনা এই যুদ্ধই হবে কোম্পানীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধ। প্রস্তুতিও হয়েছে সেজন্যে যথোচিত ভাবেই। সমস্ত ফৌজ জমায়েত হয়েছে হাজার দুয়ারীর প্রধান ফটকে। চার পাশে ভেঙে পড়েছে শহরের লোক এ দৃশ্য দেখতে।

সকলের আগে রয়েছেন সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলি। রেশমী আচকান পিরানে ও জরিদার পাগড়ীতে তাঁকে দেখাচ্ছে তেজোদীপ্ত তরুণের মত। ডান হাতে তাঁর খোলা তলোয়ার, বাঁ হাতে ঘোড়ার রশি।

তাঁর ঠিক পিছনে মোহনলাল, মীর মুদানালি, দাউদী বেগ, নুরুল হোসেন, এবাদৎ আলি, আসরফ খাঁ, সবাই পাশাপাশি ঘোড়ায় বসে আপন বাহিনী নিয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে।

হঠাৎ বেজে উঠল তাসা জগঝম্ফ। তারপর হল তূর্যধ্বনি। নকীব হেঁকে উঠল, হৈ হাজির নবাব উল মুলুক শেরে এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা।

সবগুলো বাহিনী একে একে শিঙা বাজিয়ে স্বাগত জানাল নবাব বাহাদুরকে।

আগে আগে সুন্দর খয়েরী টাট্টু চেপে এলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁর পিছনে এলেন বড় বড় ঘোড়ার পিঠে আসগর খাঁ, কাসিম খাঁ এবং সব শেষে এনায়েৎ খাঁ।

নবাব কালো আবলুস কাঠের চোঙা মুখের কাছে নিয়ে, ইশারা করতেই সমস্ত কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। ঘোড়া হাঁকিয়ে বাহিনীর সামনে কয়েক কদম এগিয়ে এসে সিরাজ বললেন, ফৌজী বন্ধুগণ, আপনারা জানেন ভারতবর্ষের মাটি থেকে কাফের কেরেস্তান কোম্পানীকে চিরদিনের জন্য দূর করব বলে যুদ্ধে যাচ্ছি আমরা। আমাদের এই মহান জন্মভূমির আজাদী ও ইজ্জত রক্ষার ভার আমি তুলে দিলাম আজ আপনাদের হাতে। জান কবুল করেও এই লড়াইয়ের মোকাবিলা করুন আপনারা। সত্য আমাদের পক্ষে, জয় আমাদের হবেই। ইনশে আল্লা।

নবাবের ঘোষণা শেষ হতেই ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করলেন প্রধান সেনাপতি জাফর আলি। এলেন একে একে বিভিন্ন বাহিনীর নায়করা। সবাই আনুগত্য জানালেন তাঁরা।

আবার বেজে উঠল জগঝম্ফ এবং শিঙাও একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে বেজে উঠল অনেকগুলো।

হাত নেড়ে জনতাকে শান্ত হতে বলে জাফর আলি এবার চোঙা মুখে নিলেন।

তিনি বললেন, দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকগণ, বাংলার সাহসী যুবকগণ, আজ আমাদের অগ্নি পরীক্ষার দিন। আমাদের মাতৃভূমির বুকে কোন দুষমণ বিদেশীর ঠাঁই হবে না, এই সঙ্কল্প নিয়েই আমরা যুদ্ধে

যাচ্ছি। নবাব সাহেব আল্লামা আলিবর্দীর বিশ্বস্ত সিপাহী, শের এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌলার শক্তিধর ফৌজ আমরা আল্লাহ তালার পুণ্য নামে শপথ নিচ্ছি, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা এই যুদ্ধে মুর্শিদাবাদের পতাকার ইজ্জত রক্ষা করব। হয় জয়, নয় মৃত্যু···এই হল আমাদের লক্ষ্য। আর তৃতীয় কোন রাস্তা নেই।

ভাষণ শেষ হল। সৈন্যবাহিনীও শুরু করল তাদের অগ্রযাত্রা। প্রথমে চলল কামান নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী। তারপর বল্লম উঁচিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী। তার পিঠ পিঠ হাতী ও উটের পিঠে বন্দুকধারী ফরাসীরাও তীরন্দাজ জাঠ সিপাহীরা। সব পিছনে উলঙ্গ তলোয়ার হাতে দুর্দান্ত পদাতিক বাহিনী। লক্ষাধিক লোকের এই চলন্ত মিছিল রওনা হল রণবাদ্য বাজিয়ে।

নবাবকে আদাব জানিয়ে বিপরীত মুখে ঘোড়া ঘোরালেন আসগর খাঁ ও কাসিম খাঁ। আর নবাব ও এনায়েৎ খাঁ জিম্মাদারদের ঘোড়া বুঝিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেই ফটক পেরিয়ে ঢুকলেন এসে হাজার দুয়ারীর প্রাঙ্গণে।

পূর্বমুখো সিঁড়ির সর্ব প্রথম ধাপে পা দেবা মাত্র চোপদার এগিয়ে এসে সেলাম করে বলল, শেঠজী জগৎরামের ছেলে ভগৎ রাম তোষাখানায় অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে মোলাকাতের জন্যে।

নবাবের কপালের রেখা কুঞ্চিত হল। সারা মুখে দুঃসহ বিরক্তি ফুটিয়ে এনায়েৎ খাঁকে বললেন, খাঁ সাহেব, তুমি গিয়ে শোনগে নেমকহারাম কুত্তার বাচ্চা কি বলতে চায়। আমার তবিয়ত ঠিক নেই।

এনায়েৎ খাঁ একবার নবাবের দিকে বক্র চোখে তাকিয়েই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, তারপর সেলাম দিয়ে ভিতর রাস্তার দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিনটা কাটল নবাবের দুঃসহ অস্থিরতার মধ্যে। আফশোস, উত্তেজনা, ক্রোধ ও বিরক্তি এক সংগে তাল পাকিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল তাঁর বুকের ভেতর, ঠিক যেমনভাবে তরঙ্গিত হয় ক্ষুব্ধ লাভার স্তূপ ধরিত্রীর নিভৃত জঠরে। বাইরে কিন্তু স্থির শান্ত অবিচল একটি ধৈর্য আশ্রয় করে রইলেন তিনি প্রাণপণ চেষ্টায়।

একবার মনে হল তাঁর ঘাটে অঘাটে ভেসে বেড়ান নর্তকীকে আমি ঘর দিয়েছি, শান্তি দিয়েছি, প্রেম দিয়েছি, দিতে চেয়েছি সম্ভ্রম ও সামাজিক স্বীকৃতি। তাতে সে পোষ মানল না। নগণ্য একজন দেহরক্ষীর কাছে আত্মবিক্রয় করল সে অনায়াসে। আবার মনে হল হয়ত এ সবই এনায়েৎ খাঁর বানান কথা। নবাবকে ফৈজীর কবল থেকে বের করে আনার জন্যেই ফেঁদেছেন তিনি এই উপন্যাস, যার সংগ্রাহক ও প্রচারক হল গোবিন ভাটের মত একটা অকিঞ্চিৎকর মূর্খ মানুষ।

পূর্ব নির্দেশমত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন এনায়েৎ খাঁ। গঙ্গা পার হয়ে আমানীগঞ্জ দিয়ে বনে বনে এসে পৌঁছল নবাবের চৌদোল নিয়াল্লিশ পাড়ায়। সেখানে আলিবর্দী আমলের পরিত্যক্ত নিমক কুঠিতে একদল দেহরক্ষী নিয়ে লুকিয়ে রইলেন সিরাজদ্দৌল্লা মধ্যরাত্রির অপেক্ষায়। বেগম লুৎফুন্নেসাকে তিনি বলেছেন রাত্রে সমর পরিষদের জরুরি বৈঠক আছে। প্রাসাদের আর সকলেও জেনেছেন তাই।

আসল ব্যাপার জানেন শুধু এনায়েৎ খাঁ। নবাবের রাত্রিকালীন খাদ্য পানীয় ও পোষাক পরিবর্তনের কথা মনে রেখে তাই সঙ্গে এনেছেন তিনি দুজন খাস খানসামা এবং একজন পাংখাওয়ালা। এসব বিষয়ে তাঁর কাজে কখনোই কোন খুঁত কোন থাকে না।

লম্বা এক পশলা বৃষ্টির পর রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে চাঁদ উঠল। গঙ্গার জলে, আশপাশের ঝিল, বাঁওড় ও আগাছার জঙ্গলে, তাল নারকেল ও বাবলা গাছের মাথায় সেই বৃষ্টি ভেজা নরম আলো বিছিয়ে দিল কেমন একটা পাণ্ডুর বিমর্ষতার ছায়া। মনে হয় কোথাও যেন কেউ নেই পৃথিবীতে। যেন প্রেত পুরীর ওপার থেকেই ভেসে আসছে ক্লান্ত একটা রী রী শব্দ।

ফৈজী মহলের সেই পরিচিত শয়ন কামরায় জ্বলছে নীল আলো। কিংখাবের গদী লাগান নবাবের পালঙ্কে শরীরটা অর্ধেক এলিয়ে তাঁরই পেয়ালায় আয়েসে চুমুক দিলেন একটু একটু করে নুর খাঁ এবং তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে বিছানায় আধ শোয়া অবস্থায় গলা ছেড়ে গাইছেন ফৈজী নবাবের সেই প্রিয় গান :

দেওয়ানা দিল হামারা গুল হোগ্যা
তু খোসবুকে সামিল হো যানা,
নীলি হোকে আসমানসে তু
মেরে খুসীকে সাথ খো যানা।

হঠাৎ নবাবের বজ্রকণ্ঠ হুংকার দিয়ে উঠল, নেমকহারাম নুর মহম্মদ, গস্তানী ফৈজী...যাও দু'জনে গান গাইতে গাইতেই দোজখের সদর দরওয়াজা পার হয়ে। তোমাদের শয়তানির এই হল শাস্তি।

সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। সন্ত্রস্ত নুর খাঁ ও ফৈজী বেগম দেখলেন ঘরের সমস্ত দরজা জানলা আটক করে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রস্ত সিপাহীরা। আর তাদের প্রহরায় মিস্ত্রি মজুররা ঝপাঝপ ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দিচ্ছে আলো হাওয়ার প্রবেশ পথগুলো একে একে।

ঘরের মধ্যেকার আলোটা দপ করে নিভে গেল। তারপরই শোনা গেল একটা দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ। কিন্তু কোন কান্না, কোন করুণ আবেদন, ভীত চকিত মুমূর্ষু মানুষের কোন আর্তনাদ উঠল কি?

না। নবাব অন্তত তাই আশা করছিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষাও করলেন তিনি বারান্দায়। ঘরের ভেতর থেকে সে রকম একটা আর্ত প্রার্থনার আওয়াজ এলে হয়ত তখনো ভেঙে ফেলতে বলতেন তিনি গাঁথুনিটা। কিন্তু না। উন্মাদ উত্তেজনায় নবাব বললেন, আস্তাকুঁড়ের কুত্তাদের দিয়েছিলাম বাদশাহী ভোজে প্রবেশাধিকার। ছি ছি।

দ্রুত পায়ে এসে আপন বজরায় উঠলেন তিনি। এদিকে গঙ্গার বুকে ভাসমান রোশেনারা বজরায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান আগুনের

শিখা। কে দিল সে আগুন? কে জানে কে দিল।

॥ ১৬ ॥

বড়নগর, খড়দা ও পানিহাটির বিস্তীর্ণ তল্লাট জুড়ে কোম্পানীর ফৌজ গাড়ল বড় বড় তাঁবু। গঙ্গা দিয়ে রোজ এই সব এলাকায় আসতে লাগল একের পর এক করে তাদের সৈন্য বোঝাই পালের জাহাজ এবং সিপাইরা পিঠে ঝোলা ও হাতে বন্দুক নিয়ে দলে দলে নামতে লাগল কিনারায়। তাদের মধ্যে লালমুখো ইংরেজের সংখ্যা কম। বেশীর ভাগই পাগড়ী পরা লম্বা চওড়া শিখ ও বালুচ পাঠান, নয়ত খাপরা টুপি পরা কালো তেলেঙ্গী। তাদের নামিয়ে শিবিরে মোতায়েন করাতে লাগলেন ছোকরা ইংরেজ অফিসার দু'চারজন যারা সিপাহী পদবীর একটু উপরের স্তরের।

গঙ্গা তীরবর্তী রয়ড়া মধুপুরে ক্রোশ দুই জোড়া একটা আমবাগানে ছাউনি পড়েছে ক্লাইভ, ওয়াটসন, ড্রেক প্রমুখ ওপরওয়ালার। তাঁবুর সামনেই শীতলপাটি বিছিয়ে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে ঘাসের ওপর আধশোয়া অবস্থায় আলবোলা টানছেন ক্লাইভ। আর একটা নীচু আম গাছের জোড়া ডালে পা ঝুলিয়ে বসে চোখে দূরবীণ এঁটে ড্রেক দেখছেন আশেপাশে কাছে নিকটে কোথাও শত্রুবাহিনী আসছে কিনা।

ওয়াটসন খাঁচায় পোরা বাঘের মত অস্থির পায়ে চক্কর দিচ্ছেন খালি ড্রেকের আমগাছ, আর ক্লাইভের শীতলপাটিকে বেষ্টন করে।

ক্লাইভ বললেন, ভাড়াটে সৈনিকদের অস্ত্রবলের ওপর ভরসা করে এত বড় ঝুঁকি নিলাম। হাজার হলেও ওরা ত ভারতবাসী, শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের হাতিয়ার হাতে পেয়ে নবাবী ফৌজে গিয়ে ভিড়ে যায়!

ওয়াটসন পরিক্রমা থামিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক রবার্ট, তা ওরা কক্ষণো করবে না। ভারতবর্ষের এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে আপন দেশ ভাবে না। তা ভাবলে আলেকজেণ্ডার, মিহিরগুলা, বিন কাসিম, মামুদ গজনী, বক্তিয়ার খালিজী, আলবুকার্ক যুগে যুগে এদের মাটিতে থাবল বসাতে পারত না।

কিন্তু বীরও ত কম জন্মায় নি ওদের মধ্যে। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, প্রতাপ সিং, শিবাজী, শেরশাহ, আওরঙজেব, একের পর এক নাম করতে পারি।

ওয়াটসন ধপ করে পাশে বসে পড়লেন ক্লাইভের, তারপর তাঁর হাত থেকে আলবোলার নলটা টেনে নিয়ে বললেন, একক বীরত্বে ওরা অতুলনীয়। কিন্তু সংহত হয়ে কিছু করতে পারে না ওরা, কারণ দেশপ্রেম বস্তুটা ওদের সংস্কৃতিতেই নেই। ওদের সাহিত্যে দেখ না ধর্ম আছে, প্রেম আছে, দয়া আছে, আছে বিবেক বৈরাগ্য। কিন্তু দেশাত্মবোধ দেখাও ত! বক্তিয়ার খালিজী যখন বাংলাদেশ তছনছ করেছেন, তখন জয়দেব লিখেছেন গীত গোবিন্দ। এখনো দেখ নবাবের সিংহাসন টলমল করছে, এখন ওদের বিখ্যাত বই হল বিদ্যাসুন্দর। নরনারীর দেহ মিলনকেই ওরা সেরা ধর্ম মনে করে। দেশের জন্যে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে পড়লেন ড্রেক। বললেন, ঠিক ঠিক। দেখছ না খোদ প্রধান সেনাপতি, দেওয়ান এবং দেশের সেরা ধনী মানী পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করছে বিদেশীদের সঙ্গে দেশের শাসককে জহন্নামে দেবার জন্যে। এরকমটা গ্রেট বৃটেন কিংবা ফ্রান্সের ইতিহাসে ঘটেছে কখনো?

সত্যিই অদ্ভুত জাত, বললেন ক্লাইভ। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, এই জন্যেই আশা হচ্ছে জাফর আলি শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে পিছু হঠবেন এবং আমরা অনায়াসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে জয়পতাকা ওড়াতে পারব। দ্বিতীয়বার আর সেই ফলতায় প্রাণ নিয়ে পালানর মত দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

ওয়াটসন চিন্তান্বিত মুখে বললেন, কিন্তু জাফর আলিকে তার বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য দিতে হবে ত। নবাব করতে হবে ত তাঁকে। তারপর যদি বেঁকে বসেন তিনি!

তার ব্যবস্থা করব হে। প্রথমত বিলেতী মদ আর মেয়ে মানুষ দিয়ে রসাতলে তলিয়ে দোব তাঁকে, দ্বিতীয়ত গদী দেবার দক্ষিণা হিসাবে কড়ায় গণ্ডায় চুক্তির টাকা আদায় করে দেউলে করে ছেড়ে দোব রাজকোষ। তারপর? বলব এবার সরে পড়ত বাছাধন!

ড্রেক আবার ডালে ওঠার উদ্যোগ করছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ও রকম একটা চুক্তি করবেই না ঐ ধূর্ত মীরজাফর।

হো হো করে হেসে উঠলেন ক্লাইভ। বললেন, নিছক গঙ্গাস্নান করতে আমি কালীঘাটায় আস্তানা গাড়িনি ড্রেক। চুক্তিপত্র তৈরি···একটা নয়, দুটো। প্রথমটা সিরাজদ্দৌল্লার বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ বিষয়ক, দ্বিতীয়টা জাফর আলির পরবর্তী নবাব হওয়া ও তার বাবদ কোম্পানিকে দেয় নজরানা বিষয়ক···দু'এক দিনের মধ্যেই সই সাবুদ হয়ে নবাব সরকারের পাঞ্জা সহ হাতে এসে যাবে দু'টোই আমার। বুঝলে।

ওয়াটসন শটকা ফেলে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, গ্রেট বৃটেনের দোহাই বরার্ট, চক্রান্তকর, ঘুষের লেনদেন কর, গুপ্ত হত্যা কর, আপত্তি নেই। প্রেমে আর যুদ্ধে সবই চলে। কিন্তু জাল দলীল বানিয়ে কলমকে কলঙ্কিত কর না। পিছনে পদচিহ্ন রেখে যাব না আমরা ভাবী কালকে আমাদের জুয়াচোর বলে গায়ে থুথু দেবার জন্যে।

ঠোঁটের ডগায় কুটিল হাসি ফুটিয়ে ক্লাইভ বললেন, এই ভ্যাপসা গরমের দেশে এসে দেখছি তুমিও কর্মফলবাদী হয়ে পড়েছ ওয়াট। ভাবীকাল নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ো না। আজকের প্রয়োজনের মোকাবিলা কর আজকের মন নিয়ে।

ওয়াটসন বললেন, শতকরা একশ ভাগ সাধুতা রাজনীতিতে চলে না স্বীকার করি। কিন্তু শতকরা একশ ভাগ অসাধুতাতেও রাজনীতি দাঁড়ায় না।

আবার সেই আগের মত পায়চারি শুরু করলেন তিনি অস্থির ভাবে।

হঠাৎ দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ

শোনা গেল। তারপরই এসে দাঁড়াল একজন বরকন্দাজ। সে বলল, দরবেশজী এসেছেন।

ওয়াটসন বললেন, কোন্ দরবেশজী? কে লোকটা?

ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, অপেক্ষা কর, এখনি দেখতে পাবে। ধৈর্য, ধৈর্য চাই ওয়াট। মনে রেখ এই ধৈর্যের গুণেই পূর্ব ভারতে বানিয়া বুদ্ধি করতে এসে আজ আমরা এতখানি আগাতে পেরেছি।

পাহারাদারকে হুকুম দিলেন তিনি দরবেশজীকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসতে এবং তাঁর খানাপিনার বিধিমত ব্যবস্থা করতে। আমরা একটু সলা পরামর্শে ব্যস্ত আছি, একটু পরেই আসছি, একথা জানাবে তাঁকে।

লোকটি চলে যেতে ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে বললেন ক্লাইভ, আগামী তিনচার দিনের মধ্যেই আমরা অতর্কিত আক্রমণে রাজধানী দখল করতে চাই। তুমি জল পথে নবাব প্রাসাদ অবরোধ করবে, ড্রেক স্থলবাহিনী নিয়ে গিয়ে ঘেরাও করবে কোষাগার, তোষাখানা, জিমখানা ও সৈন্য বারিক। সেই সর্বাত্মক প্রস্তুতির শেষ চাবিটি ঘোরানর জন্যে চাই যে যে সংবাদ, তা জোগাড় করতে পারব এই দরবেশজীর কাছে।

ডালের ওপর থেকেই ড্রেক বললেন, এই মনুষ্যরত্নটি কে শুনতে পাই কি?

ক্লাইভ বললেন, নিশ্চয়। এ হল সেই ছদ্মবেশী শয়তান উমি চাঁদ, অর্থাৎ আমিন চাঁদ। নবাবের মাসি ঘসেটীমল, জাফর আলি, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, সকলকার বরবার গোপন বার্তাবাহী এই ধূর্ত পাঞ্জাবী দরবেশ সেজে ছোট টাট্টু চেপে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। অনেক চেষ্টা করেও সিরাজের চররা একে ধরতে পারে নি। আমার কার্যোদ্ধারের হাতিয়ার হয়েছে সে স্বেচ্ছায়।

॥ ১৭ ॥

আমিল চাঁদের বক্তব্য শুনে ক্লাইভ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন মিথ্যা সন্ধিপত্রের সুযোগে নবাবকে নিশ্চেষ্ট রেখে, সেই ফাঁকে তিনি মুর্শিদাবাদের ওপর আচমকা আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু দেখলেন চতুর নবাব তাঁর আগেই ফৈজী পাঠিয়েছেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে এবং সে ফৈজী এত বিরাট যে তার সঙ্গে ভাড়াটে সিপাই নিয়ে এঁটে ওঠা কোম্পানীর পক্ষে কঠিন। এখন তাই এক মাত্র ভরসা জাফর আলির ওপর।

তিনি বললেন, জাফর আলি শেষ পর্যন্ত হাতে থাকবেন ত? না তিনিও পিছু হঠে গিয়ে ডোবাবেন আমাদের?

আমিন চাঁদ দুহাতে তালি বাজিয়ে বললেন, তোবা, তোবা। জাফর আলি কৌশল করে সেনাপতিত্ব আদায় করে নিলেন আবার অসন্তুষ্ট নবাবের হাত থেকে, শুধু আপনাদের জন্যেই ত।

হঠাৎ কি মনে হতেই লাফিয়ে উঠলেন ক্লাইভ। বললেন, হ্যাঁ, সেই চুক্তিপত্র দু'টোর কি গতি করলেন আপনি মিঃ চাঁদ?

উমিচাঁদ দরাজ হাসি হেসে বললেন, দিচ্ছি সাহেব, দিচ্ছি। আমি যে কাজ হাতে নিই, তা হাঁসিল করতে আমার বুদ্ধি ও সময়ের অভাব হয় না। এই নিন।

ঢোলা চাপকানের ভেতর দিককার জেব থেকে গোল করে পাকানো দুখানা তুলোট কাগজের বোঁদা বের করে দিলেন তিনি ক্লাইভের হাতে। একখানা হল যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কোম্পানীর কাছে আত্ম-সম্পর্পণের সর্ত হিসাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তান্তরিত করছেন, এই মর্মের একটি একবার নামা। তাঁরই স্বাক্ষরের অনুলিপি ও শীলমোহরে সেটি তৈরী হয়েছে। অন্যখানা সম্পন্ন হয়েছে জাফর আলি ও কোম্পানীর মধ্যে, যাতে ৫০ লক্ষ মোহর নজরানা দিয়ে জাফর আলি নিচ্ছেন কোম্পানীর হাত থেকে মুর্শিদাবাদের মসনদ।

একটা লম্বা হাতল লাগান কাঁচের পরকলা পকেট থেকে বের করে ক্লাইভ উল্টে পাল্টে দলিল দুটো বেশ করে পরীক্ষা করলেন। তারপর নিজের পাৎলুনের পকেটে ও দুটো পুরে বললেন, তোফা মিঃ চাঁদ। অসাধ্য সাধন করেছেন আপনি। কিন্তু করলেন কি করে?

বোকা বোকা মুখ করে উমিচাঁদ বললেন, নবাব বাহাদুরের প্রধান কাতেব এলামুদ্দী মিঞা ঘসেটি মলের হাতের লোক। বেগম সাহেবার হুকুমে তিনি নবাবের দস্তখৎ আর পাঞ্জা বসিয়ে দিলেন এই চিঠায়। আর জাফর আলি···

হ্যাঁ, জাফর আলি কি বললেন?

তিনি বললেন, কোম্পানী বাহাদুরকে আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার একচুল ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু সাহেবও যেন তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেন।

আলবৎ। হাবেলী সহরে গঙ্গার ধারে সেই যে আমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছিল, তা দুই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের চুক্তি। তার কণামাত্র নড়চড় হবে না। আমরা খৃষ্টান, আমাদের দিক থেকে কথা দেওয়া আর মাথা দেওয়া একই।

দু'জনে কথাবার্তা কইছেন, ইতিমধ্যে ড্রেক এসে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে ক্লাইভের পিছনে।

সামনে ছায়া পড়তেই পিছন ফিরে তাকালেন ক্লাইভ। তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, মিঃ চাঁদাকে তুমিত আগেই দেখেছ ড্রেক। মুর্শিদাবাদের একজন নামী বণিক এবং কোম্পানীর একান্ত সুহৃদ উনি। আমাদের জন্যে উনি যা করেছেন, তার মূল্য টাকায় ধার্য করা যায় না।

ড্রেক বললেন, সে ত বটেই। তা ওঁর সেই গোপন দৌত সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে ত?

ক্লাইভ বললেন, ওঁর অংশটুকু উনি অত্যন্ত নৈপুণ্যেই সম্পন্ন করেছেন। আমার সঙ্গে হাবেলীতে আর এক দফা সেনাপতি জাফর আলীর মোলাকাতের ব্যবস্থাও করে এসেছেন উনি। এখন আমাদের অংশটা করতে হবে আমাদের। নৌবাহিনীর অধিনেতা হিসাবে ওয়াটসন এবং স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষরূপে তুমি এই চুক্তিপত্র দু'টোয় নাম সই কর। ব্যস, তাহলেই চুকে যাবে।

ড্রেক বললেন, আমাকে নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না তোমার রবার্ট। কিন্তু ওয়াট হল কড়া বাদাম, তাকে রাজী করান খুব সোজা হবে মনে হচ্ছে না।

তুমি চেষ্টা করে দেখ না একটু।

ঈশ্বরের দোহাই রবার্ট, আমাকে এই সুন্দর দুপুরে আর ঐ ধেঁকী কুত্তার মুখ ঝামটা খাইয়ো না।

ক্লাইভ জেব থেকে দলিল দুটো বের করলেন এবং পাশের হাত বাক্স থেকে গলায় দড়ি বাঁধা একটা পেট মোটা পেতলের দোয়াত ও একটা হাঁসের পেন বের করে এগিয়ে দিলেন ড্রেকের দিকে। বললে, লক্ষী সোনা, টুব করে সইটা করে ফেল ত ডান দিক ঘেঁষে।

দলিল দুটোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে ড্রেক খস খস করে নাম দস্তখৎ করে ফেললেন ডান দিকের কোণা দুটোয়।

ক্লাইভ তখন বললেন, এবার দেখ আমার কিস্মৎ।

পকেট থেকে জীর্ণ একখানা রোকা বের করে তার ওপর বেশ করে চোখ বোলালেন ক্লাইভ বার কতক। তারপর কলমটা ধরে আস্তে আস্তে ড্রেকের স্বাক্ষরের নীচে নিজেই ওয়াটসনের স্বাক্ষর বসালেন তিনি, ঐ কাগজে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি ছাঁদে।

ড্রেক চমকে উঠে বললেন, কি আশ্চার্য! হুবহু ওয়াটের সই, এ কি করে রপ্ত করলে তুমি রবার্ট?

ক্লাইভ দলিল দুটো দুহাতে গুটিয়ে পকেটে পুরলেন, তারপর গলা ছেড়ে হেসে বললেন, যা শক্তিতে হয় না ড্রেক, তার জন্য দরকার হয় বুদ্ধির। সেই জন্যেই হোরেস বলেছেন, বিদ্যা অর্জন করা যায় শ্রম করলে, কিন্তু বুদ্ধি মানুষ নিয়ে জন্মায়।

আমিনচাঁদ হাঁ করে ব্যাপারটা দেখেছিলেন। তিনি চমকে উঠলেন, ইনশে আল্লা! এত বড় একটা চুক্তি নামায় জাল দস্তখৎ রাখছেন সাহেব! এমন জানলে ত আমি অকারণ অত মেহনৎও করতাম না, অত টাকা বখশিসও বৃথা খরচ করে ফেলতাম না!

ক্লাইভ হাত বাড়িয়ে তাঁর পিঠে আস্তে করে একটা থাবা মেরে বললেন, ওটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মিঃ চাঁদ। ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। হ্যাঁ, যে কথাটা শুধু জানতে বাকী আছে আমার···

কি কথা বলুন।

ফাফর আলি সাহেব ঠিক কি ভাবে যুদ্ধনিরত বাহিনীকে পিছু হঠাবেন? আমি কিন্তু বেশী লোকক্ষয় করতে পারব না। জানেনই ত ওরা আমার আপন লোক নয়। ভাড়া করা।

উমিচাঁদ বললেন, আপনারা শুধু নজর রাখবেন মোহন লাল সিং আর মুদানালির ওপর। ঐ দু'জনই হল নবাবের দুটি অনুগত সর্দার, যারা জাফর আলির এক্তিয়ার মানে না। আর কারোকে নিয়েই ভাবনার কিছু নেই আপনাদের।

একটু চোখ বেঁকিয়ে মুখ কুঁচুমুচু করে এরপর উমিচাঁদ বললেন, সাহেব, কথা ছিল আজ কিছু এনাম মিলবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। জানেনই ত আমার যে কথা সেই কাজ।

এর পরই ড্রেকের দিকে তাকিয়ে ক্লাইভ বললেন, সব তৈরি ত? নিয়ে যাও চাঁদ সাহেবকে। ওঁর প্রাপ্যটা এখনি দিয়ে দাও।

আগে আগে ড্রেক, পিছু পিছু উমিচাঁদ। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দুজনে এলেন নির্জন গঙ্গার পারে। লম্বায় ৬ হাত চওড়ায় ৪ হাত, গভীরে ১০ হাত একটি চার কোনা সদ্য কাটা খানা রয়েছে সেখানে। তার এক পাশে কিছু ইঁট আর একখানা কোদাল।

ওটা কিসের খানা, জিজ্ঞাসা করলেন উমিচাঁদ।

ড্রেক বললেন, ওর তলা থেকে কৌশলে একটা জলের ধারা টেনে নিয়ে আসা হবে পানীয় জলের অভাব মেটাতে। তাকিয়ে দেখুন নীচেটা।

উমিচাঁদ এগিয়ে এসে যেই ঝুঁকেছেন সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ড্রেক গুলি করলেন পর পর দুবার তাঁকে লক্ষ্য করে এবং সচীৎকারে হেঁকে বললেন, বিশ্বাসঘাতক, তোমাতে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। যাও নিশ্চিন্তে ঘুমোওগে এবার মাটির তলায়।

ইয়া আল্লা বলে একটা চীৎকার উঠল। তারপরই সব শেষ।

॥ ১৮ ॥

দু' সপ্তাহ হয়ে গেল জাফর আলি বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছেন। এখনো তারা কোম্পানীর ফৌজের মুখোমুখিই হল না, সমূলে তাদের নির্মূল করা ত' দূরের কথা। যখনি আবিদ আলিকে তলব করেন নবাব, তিনি বলেন, জাফর আলি সুযোগের অপেক্ষা করছেন, নয়ত তাঁর জ্বর হয়েছে। নয়ত বলেন বোধহয় সামনের সোমবারেই জং শুরু হবে।

অস্থির হয়ে নবাব এনায়েৎ খাঁকে ডেকে বললেন, গতিক ত ভালো মনে হচ্ছে না খাঁ সাহেব। শয়তান মীর-জাফর কি কাছিমের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থেকেই হারামখোর আংরেজকে মুখসদাবাদ বরাবর এগিয়ে আসতে পথ করে দিচ্ছে?

মাথা চুলকে এনায়েৎ খাঁ বললেন, আমার ত এরকম সন্দেহ গোড়া থেকেই ছিল জনাব। যেদিন তাকে আপনি পাল্কী দিলেন, সেদিন থেকেই মনে মনে প্রমাদ গণেছি আমি।

এত দিন ধরে সে হাবেলীতে বসে কি করছে?

কি করছে? সেই পাঞ্জাবী গিধড় উমি চাঁদের মারফৎ কোম্পানীর কারকুন মুৎসদ্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ চালাচ্ছে।

ঐ চাঁদটাকে গিরেফতার করতে পারলে না তোমরা?

কৈ আর পারলাম!

নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে নবাব বললেন, তাহলে উপায়?

এনায়েৎ খাঁ বললেন, আপনার নিজস্ব যে ঘোড় সওয়ার ও রক্ষী বাহিনী আছে, যে জরুরি ঝটিকা ফৌজ এক সময় তৈরি করেছিলেন আপনি, তার সাহায্যে চলুন আমরাই সরাসরি যুদ্ধে নামি। আসগর ভাই নিন সৈনাপত্য।

অগত্যা। কিন্তু আর দেরী করার ত' সময় নেই।

না। পরশু মাঝ রাতেই রওনা হই আসুন আমরা।

হঠাৎ কি মনে হতেই চমকে উঠলেন সিরাজ। বললেন, আচ্ছা খাঁ সাহেব,

ছ' সপ্তাহ কি অন্নজল ভিন্ন বাঁচতে পারে মানুষ? ফয়জান কি এখনো বেঁচে আছেন?

অবিশ্বাসের সুরে এনায়েৎ খাঁ বললেন, তা কি করে সম্ভব জনাব? আবুসিনা বলেন, এক মাস দেড় মাসও কোন প্রাণী বাঁচতে পারে খানা না পেলে। কিন্তু জল না পেলে তিন দিনও বাঁচে না। আর হাওয়া না পেলে এক ঘড়িও না।

খাঁ সাহেব, চীৎকার করে উঠলেন; নবাব আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। আমি তাঁকে মুক্ত করে দোব। তাঁকে আবার তাঁর বজরায় উঠিয়ে দিতে চাই আমি।

অনেক দেরীতে বললেন জনাব।

এত দিন অভাগিনীর দেহে প্রাণও নেই, আর তাঁর সে বজরাও নেই। তবু চলুন খোসবাগে, দেখা যাক কি করা যায়।

০ ০ ০

খোসবাগের বাগানে ফুটেছে রাশি রাশি গোলাপ, টগর, বেল, জুঁই। সকালে উজ্জ্বল আলোয় পাখীরা ধরেছে অপরূপ প্রভাতী গান। আলীবর্দীর কবর থেকে ভবঘুরে কোন ফকিরের গলা শোনা যাচ্ছে। সুন্দর সুরেলা গলায় তিনি গাইছেন খাজা হাফেজের অনুপম গজল।

নবাবের হুকুমে দরজা জানালার ইটে গাঁথা অবরোধগুলো ভেঙে ফেলা হল। আস্তেব্যস্তে ভিতরে ঢুকে নবাব কি দেখলেন? দেখলেন গলিত দেহ এক জোড়া নরনারী নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছেন, সেই মখমলের বিছানায় যাতে ফৈজী বেগম এক সময় সঙ্গ দিয়েছেন নবাবকে। এক জনের পরণে ফৈজীর সেই সবুজ ঘাগরা চুনারি ওড়না, অন্যজনের পরণে নুর খাঁর সেই কল্কা তোলা বুটিদার পিরাণ ও পাজামা। কারো মুখ দেখা যায় না। পাৎলা সিল্কের কাফনে ঢাকা।

দুহাতে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে বললেন নবাব, ফয়জান, পেয়ারী, তোমায় আমি ক্ষমা করেছি। এই বোদন দুষমণ যে তোমাকে শুকিয়ে মেরেছে, তাকে তুমিও ক্ষমা করে যাও। খোদা রহমান।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গিয়ে উঠলেন নিজের বজরায়। যেতে যেতেই মুন্সী এনায়েৎ খাঁকে বললেন, দু'জনকে ঐ আম বাগানে ফুলে ঢাকা পাখী ডাকা নিরালায় কবর দেবার ব্যবস্থা করে দিও খাঁ সাহেব। ওপরে পাথরের ফলকে লিখে দিও, নবাবের আদরিনী নর্তকী ফয়জান আর তার দেহরক্ষী সালার এ আলা নুর মহম্মদ খাঁ এখানে ঘুমিয়ে আছেন।

সমাধিস্থ করার সময় উপস্থিত লোক জনরা কিন্তু বলাবলি করতে লাগল যে, মৃত নরনারী দুজন আর যেই হন ফৈজী বেগম ও নুর খাঁ নন। গলিত দেহ এই দুজন প্রৌঢ় প্রৌঢ়া কে তাহলে? কিন্তু নুর খাঁ ও ফয়জান বেগমের কি হল? এই গৃহ সমাধি থেকে বের হওয়ার কোন গোপন পথ কি জানতেন তাঁরা?

কিন্তু নবাবের ত নয়ই, এনায়েৎ খাঁর কানেও এখবর পৌঁছে দেবার সুযোগ হল না কারো।

বজরা কিনারায় ভেড়ার আগেই নবাব দেখলেন গোটা শহরে কেমন ধারা একট তোলপাড় শুরু হয়েছে যেন দলে দলে গৃহস্থ মানুষেরা খেয়া নৌকায় নদী পার হচ্ছেন। পায়ে হেঁটে, গোরুর গাড়ী নয়ত ঘোড়া চেপে সার দিয়ে ব্যাপারীরা পালাচ্ছেন শহর খালি করে। কারো কোলে ছেলে, কারো পিঠে বুড়ো মা, কারো মাথায় মস্ত বোঁচকা। হঠাৎ যেন ভূমিকম্প মহামারী কিংবা অগ্নিকাণ্ডে গোটা শহর তছনছ হয়ে গেছে। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সিরাজ।

কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না বেশী ক্ষণ। জনরবই জানিয়ে দিল তাঁকে যে যুদ্ধে কোম্পানীর ফৌজ জয়ী হয়েছে এবং তারা হুগলীর গ্রাম গঞ্জ ও লোকালয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নৌকায় ঘোড়ায় পদব্রজে সদলবলে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে। তারা আসছে নবাবকে বন্দী করতে।

ইতিকর্তব্য বিমূঢ় নবাব ঘাটের পৈঠায় পা দেবামাত্র আবিদ আলি এসে তাঁকে হাত ধরে নামালেন। তারপর বললেন, সর্বনাশ হয়েছে জনাব, আমাদের হার হয়েছে। জাফর আলিকে কিছুতেই তাঁর শিবির থেকে নড়ান যাচ্ছে না দেখে, মোহনলাল সিং মুদনালী ও দাউদী বেগ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোম্পানীর ছাউনিগুলোর ওপর। একরাত একদিন লড়াইয়ের পর যখন তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করেছে কলকতো মুখো, তখন সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নবাব বাহিনীর গতিরোধ করলেন স্বয়ং জাফর আলি এবং ভেঁপু বাজিয়ে শূন্যে সাদা নিশান উড়িয়ে দিলেন। যুদ্ধ থেমে গেল।

তাঁর নকীব মুখে চোঙা নিয়ে ঘোষণা করল, নবাব সাহেব যুদ্ধ বন্ধ করে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করার হুকুম জারি করেছেন। তোমারা সবাই উল্টো মুখে ফিরে দাঁড়াও।

মুদানালি ঠিক সেই সময় কোন গুপ্ত হাতের গুলিতে ঠিকরে পড়ে গেলেন ঘোড়া থেকে। মোহনলাল নিরুপায় হয়ে নিজেই নিজের বুকে ভোজালি বসিয়ে দিলেন সজোরে। শুধু দাউদী বেগ হাওয়ার কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এই মাত্র এসে পৌঁছেছেন হাজার দুয়োরীতে খবর জানতে। সব শেষ হয়ে গেল জনাব, সব শেষ হয়ে গেল।

হো হো করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন আবিদ আলি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদ্রূপ করে পিছন থেকে কে যেন অট্টহাস্য করল। কে? কে লোকটি?

নবাব দেখলেন ঘসেটি মলের পদাশ্রিত সরীসৃপ হুসেন কুলি। আত্মবিস্মৃত হয়ে তলোয়ারের এক কোপে দু'টুকরো করে ফেললেন তিনি তাঁকে। মনের আয়নায় ঝলক দিয়ে উঠল, ফৈজী কি নোংরা ইঙ্গিতই না করেছিলেন সেদিন তাঁর নামের সঙ্গে মাসি ঘসেটি বেগমের নাম যুক্ত করে।

লুৎফা কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যেই ধৈর্যের সঙ্গে আপন ঘরে অপেক্ষা করছিলেন নবাবের ফিরে আসার জন্যে। নবাব দেখে অবাক হলেন লুৎফার পরণে সাধারণ পল্লীনারীর পোষাক। সঙ্গে বেতের একটা ঝাঁপি হাতে নিয়ে বাঁদী গুলনার।

নবাব ভগ্নকণ্ঠে বললেন, খেলা শেষ লুৎফা।

লুৎফা বললেন কাতর হয়ো না জনাব। পোষাক পালটে নাও, চল আমরা খোদার বিস্তৃত পৃথিবীতে ঠাঁই খুঁজে নিই গে আমাদের। পশু পাখী কীটপতঙ্গ সবারই সেই দয়াময়ের রাজ্যে নিজের নিজের জায়গা আছে। আছে আমাদেরও।

কোথায় যাবে? বালেশ্বরে না কাটোয়ায়?

সেটা ভেবে ঠিক করা যাবে। চল আগে এক বিশ্বস্ত বন্ধুর আস্তানায় গিয়ে মুখ লুকাই।

এক জোড়া পল্লীবাসী গৃহস্থরূপেই বেরিয়ে এলেন দুজনে নবাব প্রাসাদ থেকে।

কাসিম খাঁ, আসগর খাঁ এনায়েৎ খাঁ, দাউদী বেগ এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্বস্ত অনুচরেরা ফটকের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত কুর্নিশ জানালেন তাঁদের।

॥ ১৯ ॥

আসগর খাঁ বললেন, চারজন বিশ্বাসী দাঁড়ি মাঝি নৌকা নিয়ে তৈরী আছে সদর ঘাটে। কিছুদিনের মত খাবার পোষাক ও পয়সা কড়ি এবং সামান্য অস্ত্রশস্ত্রও আছে ওতে, যার ওপর ভরসা করে নির্ভয়ে চলে যেতে পারবেন আপনারা উড়িষ্যা পর্যন্ত। সেখানে সুবাদার জাহান আলি আছেন, বাকী বন্দোবস্ত তিনিই করবেন।

নবাব কিছু বললেন না। নিঃশব্দে সম্মতি জানালেন।

লুৎফুন্নেসা বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু তার আগে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার আমাদের পীর বাবার সঙ্গে। এই অদিনের কথা তিনি আগেই বলেছিলেন। আর বলেছিলেন সে সময় যেন আমরা তাঁর শরণ নিই। চল আমরা তাঁর কাছে যাই। মাঝ রাত্রে নৌকা ছাড়লেই হবে।

নবাব বললেন, মাটির দুনিয়াটা বড়ই নোংরা হয়ে গেছে লুৎফা। সন্দেহ অবিশ্বাস ঘৃণা নীচতা কেন্নর মত কিল বিল করছে এর চারদিকে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি নে। তার চেয়ে ছুটন্ত স্রোতে গা ভাসালে যেন বেশী শান্তি পেতাম। যা পিছনে পড়ে রইল, তাকে নমস্কার জানিয়ে এস আমরা নৌকাতেই চেপে বসি।

লুৎফা মিনতির সুরে বললেন, না না জনাব, কথার খেলাপ করবনা। খাঁ সাহেব, আপনি আমাদের কাটরা মসজিদের পিছনে পীর কুতবালির মাজারে পাঠিয়ে দিন। রাত্রে তুলে দিবেন নৌকায়।

পীর দুটো কুকুরের সঙ্গে এক সানকিতে ঢেলে পায়েসের মত কি কি একটা জিনিস খাচ্ছিলেন। বাঁদী গুলনারকে আগে নিয়ে লুৎফা ও সিরাজ এসে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে তাঁর সামনে।

গোঁফে দাড়িতে পায়েস মাখামাখি অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে পীর সহাস্যে স্বাগত জানালেন তাঁদের। বললেন, কি মা, দেখলি ত তোর এই পাগলা বেটা আসমানের লেখা ঠিকই পড়েছিল। তা ভয় নেই। এ হল খোদার ঘর, এখানে কোন বিপদ পৌঁছবে না। তোরা যেমন করে খুসী যদিন খুসী থাক। খোদা যেদিন রাস্তা দেখাবেন, চলে যাস যেখানে ঠাঁই হবে।

ডান দিকের খোলা উঠানে সারি সারি কবর। বাঁ দিকে এক ফালি সবুজ মাঠের ওপর একটা চুড়া বিশিষ্ট মীনার। আর এরই গা ঘেঁষে ছাদওয়ালা বাঁধান উপাসনার জায়গা এবং তার পুব কোণে পর পর দুটো কুঠুরি। জানালা দিয়ে দেখা যায় একটা পুকুর এবং তার কিনারে গোরাল, হাঁস মুরগির আস্তানা।

দুপুরে এই অশুচি অসুন্দর পরিবেশে জীর্ণ তক্তপোষের ওপর বসে শুকনো রুটি, খেসাররী ডাল আর কচুর তরকারি খেতে খেতে হেসে ফেললেন সিরাজদ্দৌল্লা। বললেন, শেখ সাদী যথার্থই বলেছেন যে, ক্ষমতা ঐশ্বর্য ও আনন্দ সন্ধ্যাকালীন আকাশের রঙের মত অস্থির অনিশ্চিত। আজ সকালেও শের-এ বঙ্গাল সিরাজদ্দৌল্লা ছিলাম যে আমি, সেই আমি এখন হয়েছি প্রাণ ভয়ে ভীত পলাতক ইয়েতিম।

তাঁর কথায় চোখে জল এল লুৎফার। অন্যদিকে তাকিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলে তিনি বললেন, বাদশা হুমায়ুনের জীবনেও এক দিন এই রকম গরীবী এসেছিল জনাব। ভাবনা কি? জাহান আলির সাহায্যে আবার তুমি সৈন্য সামান্ত জুটিয়ে নেবে। বন্য হাতীর হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে মির জাফর ও তার মদৎদাতা ইংরেজ কোম্পানীর ওপর। আবার উদ্ধার করবে হারান গদী।

ভাবতে ভাল লাগছে লুৎফা। কিন্তু তগদির আর আমাকে সে ফুরসৎ দেবে কি না সন্দেহ। ক্ষমতার নেশা মদের চেয়েও তীব্র, আর আপন লোক যখন সে নেশায় মাতাল হয়ে হাতিয়ার ধরে, তখন আর তার কোন কিছুতেই বাধে না।

খাওয়া শেষ করে লুৎফা বাঁদীকে বললেন, গুলনার, দুই পাগলী ভিখারী সেজে শহরের পথে পথে ঘুরে খবর জোগাড় করে আনত সব। সন্ধ্যার আগেই ফেরবি, কারণ রাত এবং ঘড়ি পার হলেই নৌকা ছাড়ব আমরা।

গুলনার বেরিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে আসা ছেঁড়া চটের থলি থেকে একরাশ হীরা জহরৎ ও চুনী পান্না বের করলেন লুৎফা এবং বোরখার নীচে সেগুলো সযত্নে পেট কোঁচড়ে লুকালেন। একখানা খাপশুদ্ধ ছোরা রাখলেন পা জামার জেবে। নবাবকেও বললেন তাঁর ভাঁজ করা খুদে তলোয়ারখানা পিরানের তলায় লুকিয়ে নিতে।

বাইরের পথে তখন সুরু হয়েছে দারুণ সোরগোল। অচেনা বাদ্যের উত্তাল আওয়াজে গম গম করছে চার দিক। হাতীর হাঁক, বন্দুকের শব্দ, ঘোড়ার খুরের খটখটি···প্রচণ্ড একটা উৎসবের আকারে আছড়ে পড়ছে যেন আকাশে মাটিতে গঙ্গার জলে। ব্যাপার কি? বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী কি তাহলে এসে পড়ল?

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে এসে ঢুকল গুলনার। বলল, নবাবসাহেব, বেগম সাহেবা, চলুন, চলুন, এখনি পালিয়ে

চলুন। জাফর আলী সাহেবকে নিয়ে বাজি বাজনা করে ফিরিঙ্গী ফৌজ চলেছে মসনদে বসাতে। আর···

আর মিরণকে দেখলাম দরগার পিছনে দাঁড়িয়ে পীর সাহেবের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে।

বুঝতে পারছ লুৎফা, আর পালান হল না। তখনি নৌকা ধরলে হয়ত বা নিয়তির হাত ফসকান যেত।

লুৎফা বললেন, ফকির সাহেব থাকতে কেউ কিছু করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত থাক তুমি। খোদার বান্দা তিনি, নির্ঘাৎ বিপদ থেকে বের করে দেবেন আমাদের।

বিকাল পর্যন্ত ঘরের বাইরে দরজা আগলে বসে রইল গুলনার, আর কুঠুরির ভেতর নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে ভগ্নপোষে পাশাপাশি বসে রইলেন সিরাজ ও লুৎফা। সব কথা যেন ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেছে দু'জনের।

ক্রমে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সেই প্রায়ান্ধকার অপরিচ্ছন্ন কুঠুরিতে পিন পিন শব্দ করে উড়তে আরম্ভ করল মশার পাল। কোথায় কোন অদৃশ্য কোণ থেকে তক্ষক ডেকে উঠতে লাগল থেকে থেকে। আর দুপুরের সেই উল্লাস কোলাহলের দূরগত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজতে লাগল যেন করুণ একটা কান্নার মত হয়ে।

দুই হাতে অঞ্জলি করে কপালের ওপর ঠেকালেন লুৎফা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, খোদা হাফেজ!

দুজন সশস্ত্র সিপাহী ঘরে এসে ঢুকল। শহর কতোয়ালের পরোয়ানা হাতে একজন ফৌজদার এল তাদের সঙ্গে।

নবাব ও তাঁর বেগমকে গ্রেপ্তার করে ফাটকে নিয়ে যাবার হুকুম আছে, বললেন ফৌজদার সাহেব।

সিপাহী দু'জন এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে লোহার হাতকড়া পরাল সিরাজ ও লুৎফা বেগমকে। তারপরই টানতে টানতে দুজনকে এনে তুলল ত্রিপল ঢাকা একটা মহিষের গাড়ীতে। গাড়ী চলল ছড়ছড় শব্দ করে।

গাড়ী গারদে এসে ঢুকল যখন, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। কাছে দূরে উঠছে ঝিঁঝির রি রি শব্দ।

দুজনকে পিঞ্জরায় বন্দী করে ফৌজদার বললেন, ঐ কুলুঙ্গীতে দুজনের রাতের খাবার ও জল আছে, আর এই হল বিছানা।

বহুৎ আচ্ছা ভাইসাহেব, বললেন সিরাজ। তারপরই নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন তিনি সেই ভূমিশয্যায়। লুৎফা নিঃশব্দে বসলেন তাঁর পাশে এসে।

ওরা চলে যেতেই সিরাজ বললেন, বুঝলে পীর বাবা কেমন আদমি।

* * *

চেরাগ হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন তখনই স্বয়ং পীর কুতুব আলি, আর তাঁর পিছু পিছু দুই শিংওয়ালা মেড়ার মুখোসে মুখ ঢেকে ঢুকল আর একটি লোক। তার হাতে খোলা তলোয়ার।

পীর বললেন, নবাব সাহেব, আপনি ত বালেশ্বর যাবেন ঠিক করেছেন। এই লোক আপনাকে পৌঁছে দেবে সেখানে।

কে এই লোক? কেন এই ছদ্মবেশীকে এখানে এনেছেন আপনি?

এনেছি হুজুরের সঙ্গে একটা জরুরি সওয়াল করব বলে। সমশের জং আর কাদের জং নামে দুভাইকে মনে আছে জনাবের? তা দের একজনকে জ্যান্ত কবর দিয়েছিলেন আর এক জনকে···

নাক কান কেটে মুর্শিদাবাদ থেকে খেদিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ প্রথম জন কৌশলে চেয়েছিল গদী দখল করতে, দ্বিতীয় জন চেয়েছিল বেগমকে হাত করতে। নবাব আলিবর্দীর জারজ-পুত্র দুই জানোয়ার।

মাথায় ঝাকড়া চুল ও মুখের গোঁফ দাড়ি টেনে খুলে ফেললেন পীর সাহেব। বললেন, দেখুন ত' চিনতে পারেন কি না?

নবাব বললেন, পারি। শয়তান, তুমি এখনো বেঁচে আছে!

জী হাঁ। তুর্কীর বাচ্চা, প্রতিশোধ না নিয়ে মরব কেন?

চীৎকার করে উঠলেন লুৎফা, দুমমণ, ডাকাত, পীর সেজে তুমি এতদিন সারা দেশের মানুষকে ঠকিয়েছ। এই তোমাকে আমি মস্ত মুরসেদ ভেবে পূজো করেছি! ইয়া আল্লা!

পীর হেসে উঠলেন। সেই ভাঙা গলার শ্লেষ্মা বিজড়িত ভয়াবহ হাসি। মনে হয় যেন কবর ফুঁড়ে উঠছে আওয়াজটা।

এবার পিছনের লোকটি এগিয়ে এসে বলল, আর আমি মহম্মদী বেগ, তোমার পোষা কুত্তা দাউদীর ভাই। মনে আছে লাথি মেরে বের করে দিয়েছিলে আমাকে দরবার থেকে।

সিরাজ নিজের তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন বেগের ওপর। বেগ প্রস্তুতই ছিলেন. খোলা তলোয়ারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলেন তিনি সিরাজের বুক পিঠ। সঙ্গে সঙ্গে একটা মুগুর উঠিয়ে সজোরে ছুঁড়লেন পীরবেশী কাদের জং ও সিরাজের মাথা লক্ষ্য করে। তখনই জীবন শেষ হয়ে গেল তাঁর। চোখের নিমেষে লুৎফা বোরখার তলা থেকে লুকান ছোরা বের করে বসিয়ে দিলেন সেটা আমূল পীরের বুকে, তারপর আপন পেটে।

কারাগারের বাইরে সদর রাস্তায় ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছের তলায় আলীবর্দীর প্রিয় হস্তিনী সুরাইয়া ডাল ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। আর জাফর আলীর হাতী আকবর পিঠে মিরণকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা দোলাচ্ছিল অল্প দূরে। বাঁশের খাটুলিতে শুইয়ে সিরাজ ও লুৎফার মৃত দেহ দুটো চার জন বাহক ধরাধরি করে রাস্তায় নিয়ে এল। তাদের আগে আগে এল দুজন মশালচী।

মিরণ নেমে এসে কি একটা ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু লাশ দুটো সুরাইয়ার পিঠে চাপানর চেষ্টা হতেই ক্ষিপ্ত হস্তিনী লাফিয়ে চীৎকার করে শুঁড় আস্ফালন শুরু করে দিল। মাহুত সিকান্দার কিছুতেই সামলাতে না পেরে একটা সরু গলি দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে পালাল। লাশ দুটো তখন তোলা হল আকবরের পিঠে। হাতী হেলে দুলে চলতে চলতে এসে দাঁড়াল হাজার দুয়োরীর বড় ফটকের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বোরখায় মুখ ঢেকে ঘসেটি বেগম।

রাস্তায় জ্বলছে অজস্র মশাল। ফিরিঙ্গী বাদ্যকররা তৈরি হয়ে আছে বাঁশী, জয় ঢাক ও রাম চাকি নিয়ে। এখনি শোভাযাত্রা বেরবে শহর পরিক্রমায়। অপেক্ষা শুধু সিরাজের লাশটা আসার। দুধারে সার দিয়ে নির্বাক বিহ্বল জনতা দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় ভাবছেন তাঁরা এক বেলার মধ্যে কি অভাবনীয় পরিবর্তনই না ঘটে গেল ইতিহাসের পাতায়।

আগে আগে মশালের সারি। তারপর বাজন্দাররা। তারপর হাতীর পিঠে নিহত নবাবের ও তাঁর অভাগিনী বেগমের লাশ দুটো। তারপর নবাব বাড়ীর বিখ্যাত সেই সাদা ঘোড়ার তাঞ্জামে নতুন নবাব সৈয়দ জাফর আলি, তাঁর পত্নী মণি বেগম ও পুত্র মিরণ। বিশ্বাসঘাতকতার এই জয়যাত্রা নিঃশব্দে দেখল মুর্শিদাবাদের মানুষ। যাত্রা শেষ হল অনেক রাত্রে।

॥ ২০ ॥

মৃতদেহ দুটো শিয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়ানরই ইচ্ছা ছিল মৎলবী মিরণের কিন্তু একজন ইংরেজ কাপটেনের আপত্তির ফলেই তা শেষ পর্যন্ত হতে পারল না। এই ক্যাপটেনের নাম ফেয়ারলি। তিনি এসেছিলেন জাফর আলির অভিষেকে কোম্পানীর তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে।

শোভাযাত্রা শেষে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, নবাব বাহাদুর, মৃত সিরাজদ্দৌল্লা এবং তাঁর বেগমকে রাজোচিত মর্যাদায় সমাধিস্থ করুন আলিবর্দীর পারিবারিক কবরে। পতিত শত্রুকে শ্রদ্ধা দেখানই সভ্য সমাজের রীতি। মৃতের সঙ্গে লড়াই করে না কেউ। মহামান্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে একথাই আপনাকে জানানর হুকুম আছে আমার ওপর।

অগত্যা খোসবাগে আলিবর্দীর পাশে দুজনকে ভোররাত্রে চুপে চাপে মাটি দেওয়া হল। আসগর খাঁ, কাসিম খাঁ, নিয়ামৎ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ দাউদী বেগ, সিরাজের অনুরাগী কারোকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই একযোগে শহর ছেড়ে পালিয়েছেন। সরকারের বৃত্তি ভোগী বড় মসজিদের ইমাম সাহেব একা খোতবা পড়লেন, কিছু সংখ্যক আশেপাশে গরীব মুসলমান ফুল আর বাতি দিলেন বেচারা নবাব ও তাঁর সুন্দরী সহধর্মিনীর উদ্দেশে। মর্যাদাত দূরস্থান, সাধারণ নিয়ম কানুনও বিশেষ কিছু মানা হল না। নামী লোক এক জনও কেউ এলেন না অনুষ্ঠানে, কেন না জানতেই পারলেন না।

সাধারণ একটা ইঁটের গাঁথুনি উঠল যুগ্ম কবরের ওপর এবং তাতে শুধু লেখা হল, সিরাজদ্দৌল্লা নবাব উলমুলক ও বেগম লুৎফুন্নেসা।

* * *

একত্রিশ বছর পরে মুর্শিদাবাদে বেড়াতে এলেন এক পশ্চিমী গন্ধ বিক্রেতাআর তাঁর পত্নী। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। স্বামীর বয়স সত্তর ছোঁয় ছোঁয়, পত্নীরও ষাটের ঊর্ধ্বে। কিন্তু কি অসামান্য রূপ দু'জনের! বার্ধক্য যেন তুষার শুভ্র দু'খানি ওড়নার মত সারা দেহ বেষ্টন করে আছে দু'জনের। ওঁদের দিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না।

বণিক দম্পতি খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হলেন সৈদাবাদে এবং এক সুন্দর বিকেলে অনেক বাতি ও ফুল নিয়ে খোসবাগে হাজির হলেন সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখতে। কৌতূহলী শহরের মানুষ কেউ কেউ এই ভিনদেশী স্বামী স্ত্রীর সিরাজ প্রীতিতে অবাক হয়ে সঙ্গ নিলেন তাঁদের এবং পিছন পিছন তারাও এসে হাজির হলেন পরিত্যক্ত আলিবর্দীর সমাধি ভবনে।

দু'জনে ওঁরা, সিরাজ ও লুৎফার সমাধির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলেন। তারপর মহিলাটি অপূর্ব দানা সম্পন্ন গলায় ধরলেন গান,

বুল বুল তু দিন ভর গা,
রাত মে জুনাই জ্বাল চিরাগ,
আঁশু যো কুছ মিট্টিমে মিল যা,
জিন্দা হো রহে বেহস্তী সুহাগ।

আস্তে আস্তে স্ত্রীর সঙ্গে গলা মেলালেন স্বামীও এবং দুজনেরই প্রশস্ত সুন্দর চোখে জ্বল জ্বল করতে লাগল উদ্গত অশ্রুর রেখা।

গান শেষে জনতার একজনকে ডেকে কি যেন বললেন ভদ্রলোক। তারপর দুজনেই খেয়া পার হয়ে চলে গেলেন ওপারে। জনতার জটলা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে চলল তারপরও।

কেউ বললেন, ওঁরা দুজন হলেন বেগম লুৎফার বোন আর ভগিনীপতি। কেউ বললেন, না, সিরাজের বোন আয়েষা এবং তার স্বামী। কেউ বললেন, না, না, দরদী মানুষ, সিরাজ ও লুৎফার করুণ কাহিনী শুনেছেন। তাই এসেছিলেন তাঁদের সমাধিতে সালাম জানাতে।

শ্বাসকাশে জীর্ণ গোবিন ভাট শুধু ম্লান হেসে বললেন, উঁহুঁ, এই মেয়ে আর কেউ নন, স্বয়ং ফৈজী বেগম, আর এই সাহেবও বিখ্যাত, নুর খাঁ। আমি বরাবর জানি ওঁদের মৃত্যু হয় নি, ওঁরা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেছেন। লাশ দুটো ছিল দুখু মিঞা আর তার বিবির। গলা শুনে বুঝলাম এখনো বেঁচে আছেন বেগম, আর হাসি দেখে বুঝলাম বেঁচে আছেন খাঁও।

অনেকেই অবজ্ঞার হাসি হাসলেন তাঁর কথায়। দু'একজন শুধু বললেন, হতেও পারে। পৃথিবীতে অসম্ভব কি আছে?

চেম্বারের শেষ রোগীটি বিদায় নেবার পর ডাক্তার কুশারী আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালেন।

হাত ঘড়িতে এগারোটা। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা নির্জন। আজকাল দোকান-পাট গুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। দিন কাল ভালো নয়। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

পেশাগত নিরাপত্তাও বোধ করেন না ডাক্তার কুশারী। প্রায় প্রায় এমন সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে পেশার বাইরেও তিনি শারীরিক মানসিক ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তার হিসেবে আর্তের প্রাণ বাঁচানোর কর্তব্যেও তাঁকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অথচ ডাক্তার হিসেবে মুমূর্ষুর জীবনদান করাই তাঁর সামাজিক কাজ।

অথচ জবাবদিহির শেষ নেই। কাকে বাঁচাতে হবে। কাকে হবে না—এর নির্দেশ আসবে ওপার থেকে। 'আপনি একে কেন বাঁচালেন? জানেন ও কত বড় ক্রিমিনাল? আমরা কত চেষ্টা করে এই সেদিন তাকে ধরতে পেরেছি।'

আশ্চর্য আশ্চর্য, আশ্চর্য।

'তাহলে কেন ওকে আমার কাছে এনেছেন? ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য কী হবে?' 'আপনি বড় বেশি ভাবেন ডাক্তার কুশারী? আমরা আপনাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম, এর সম্পর্কে আপনি মাথাব্যথা করবেন না। বলিনি?'

'মাথাব্যথা? হোয়াট ডু য়ু মীন? তাহলে কেন আমার কাছে আনলেন? আপনাদের কর্তব্য আপনারাই করতে পারতেন?'

'হ্যাঁ। পারতাম। তাই করতেই বলা হয়েছিল আপনাকে।'

'কী?'

'আপনাকে একটা ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতে বলা হয়নি?'

'হোয়াট?'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনি এ দেশে বাস করেন না। মনে হয় আপনি জেনে শুনে ইচ্ছে করেই আমাদের সহযোগিতা করছেন না?'

'আপনি কী আমাকে কর্তব্য শোনাবেন? এই পঞ্চাশ বছর বয়েসে। ইট্স টু মাচ।'

'আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অনেক রিপোর্ট আছে। আপনি শুধু শুধু ইনভলভড হচ্ছেন।'

'মানে?'

'এই সমস্ত আহত যুবকদের আপনি চিকিৎসা করেন। বলুন, করেন না?'

'করি।'

'তবে আর কী?'

'আপনি কী বলবেন কাজটা অন্যায় হচ্ছে?'

'ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সকলের কাছে এক নয়।' 'আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছি। ন্যায়-অন্যায় সকলের কাছে এক নয়।'

'আপনার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর ভবিষ্যতের জন্যে আপনার চিন্তা হয় না, ডাক্তার কুশারী?'

'দেশের সমস্ত ছেলেমেয়ে স্ত্রীর ভবিষ্যতের জন্যেই আমার চিন্তা হয়। আমার পরিবার তো তার বাইরে নয়।'

'আই সী। আচ্ছা দেখা যাবে।'

কম্পাউণ্ডার হরিপদ বললেন, 'এবার বন্ধ করে দিই।'

ডাক্তার কুশারী বললেন, 'বাড়িতে কাজ আছে।'

'না না।' হরিপদ হাসলেন। 'এত রাত্রে খোলা রাখা মানেই বুঝতেই তো পারেন। আজকাল কোনো ডাক্তারই···'

'সেই জন্যেই তো দেরি করছি হরিপদ। রাত্রে বিপদে পড়লে মানুষ যাবে কোথায়?'

'না বলছিলাম···'

'হরিপদ এই ভাবে কোনো মানুষকেই যেন বাঁচতে না হয়। আমাকেও তুমি এই ভাবে বাঁচাতে পারবে না। দ্যাখো আমি যদি স্বাভাবিক ভাবে আমার কর্তব্য না করতে পারি তাহলে আমার কাছে জীবন ধারণের তাৎপর্য ফুরিয়ে যায়। হরিপদ, বলো আমি কী ভুল করছি কোনো?'

'না ডাক্তারবাবু, এতগুলো বছরে আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।'

ডাক্তার কুশারী বললেন, 'এক গ্লাস জল দেবে—'

হরিপদ জল এনে দিলেন।

'আমাদের সকলের হাত কেমন রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, গঙ্গার জলেও এত রক্ত ধুয়ে যাবে না···'

'আমাকে কিছু বললেন?'

'এই ছেলেগুলো আমার যৌবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা যারা আজ প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রবীণ বয়স্ক মানুষেরা ওদের জন্যে এক ফাঁদিং-ও আশা রেখে যেতে পারিনি। আমরা দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে মিথ্যা ছলনা করেছি, স্তোকবাক্য দিয়েছি।'

'কিছু বললেন কী?'

'দ্যাখো আমরা যখন প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হচ্ছি তখন ওরা সকলের আগে ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বিসর্জন দিয়েছে। শুধু এই জন্যেই ওদের ভালোবাসি, আমরা যা পারিনি, ওরা···'

ফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ সুষমাই।

'কী বলছ? কী? সুনন্দ এখনো ফেরেনি? এত রাত করা ওর পক্ষে খুবই অন্যায়। কী বলছ? থানায়? নানা, থানায়, ফোন করে কী আজকাল কোনো যুবকের খবর পাওয়া যায়? সুষমা, আমাকে ভুল বুঝোনা, যে সময়ের মধ্যে আমরা আছি, বাবা, মা হিসেবে এই উদ্‌বেগ আমাদের নিয়ত ক্ষতবিক্ষত করবে। না না, দার্শনিকতা নয়। বিশ্বাস করো আমরা ইচ্ছে করলেই তাদের আগলে রেখে চলতে পারিনে। আমরা যে কত অক্ষম বোকা নিজেই তা জানি। পাড়ার অবস্থা কেমন? তাহলে আর ভয় নেই। ও এসে পড়বে। হ্যাঁ আমিও রওনা হচ্ছি।'

হরিপদ বললেন, 'দাদাবাবু এখনো বাড়ি ফেরেননি?'

'হ্যাঁ' তাইতো শুনলাম।'

'দিনকাল বড় খারাপ···' হরিপদ মাথা নাড়লেন।

'চলো। এবার ওঠা যাক।'

বারান্দায় নেমে আকাশের দিকে তাকালেন। অন্ধকার। রাস্তার আলো গুলিও আজকাল আর জ্বলে না। একটা মাতাল টলতে টলতে রাস্তা পার হচ্ছে।

সুনন্দর এত দেরি করা উচিত নয়। ওকে একবার বকে দিতে হবে।

ডাক্তার কুশারীর কপালে চিন্তা। চোখ দুটো কুঁচকে ওঠে।

একেকটা দিন যেন ছুরির ফলার মতো, একটা উদ্‌বেগ···পুঞ্জীভূত অন্ধকার একটা বিভীষিকা, আতংক··· জীবনধারণ একটা কঠিন অভিজ্ঞতা।

ডাক্তার কুশারী গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

গলিটা এঁকে বেঁকে এবার ব্রিজের ওপর উঠল। ব্রিজের তলাটা রোজকার মতন কুৎসিত অন্ধকার। রেললাইন, রেললাইন পেরিয়ে বস্তি, বস্তি অতিক্রম করে পায়ে হাঁটা বিপজ্জনক পথটা। হ্যাঁ সেদিন এই ব্রিজের নীচেই যুবকের লাশটি পাওয়া গেল। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হার্টের রোগী অমূল্য নন্দীর চোখেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। দৃশ্যটি নতুন কিছু নয়। তবু, যুবকটির লাল শার্ট আর ট্রাউজারে জড়ানো মাটির দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়া আকৃতিটি আকর্ষণ করেছিল অমূল্যবাবুকে। এবং আশ্চর্য হয়ে তিনি ভাবছিলেন 'আমি হার্টের রুগী, আমি এই পঁচাত্তর বয়েসেও বেঁচে আছি, আর পায়ের নীচে উনিশ-কুড়ির এই যুবকটি, হার্টের অসুখ না হলেও, থুবড়ে পড়ে মরে আছে।' অমূল্যবাবু চেম্বারে এসে এই ভাবেই তাঁর দার্শনিকতা ঘোষণা করছিলেন।

'বলতে পারেন কে একে মেরেছে?'

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন; 'আপনি কী আমাকে সন্দেহ করছেন?

'কী যে বলছেন।'

'জানেন অমূল্যবাবু, আজকের দিনে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের কারুর হাতই পরিষ্কার নয়। আমি নিজেই মাঝে মাঝে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকি, কী জানি কোনও রক্ত লেগে আছে কিনা।'

বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে স্বীকার করলেন: 'এমন দুরবস্থায় আমরা কখনো পড়িনি।'

ডাক্তার চুপ করেই ছিলেন।

'যতদূর জানি কেউ একবার ওর খোঁজ নিতেও এল না।' বৃদ্ধ বললেন।

'কেন খোঁজ নেবে বলুন? ও মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। ওকে আর কেউ নাগালে পাবে না। যারা নাগালের মধ্যে রইল তাদের তো ভবিষ্যত আছে।'

'তাই বলে ও বেওয়ারিশ হয়ে যাবে···'

'মড়ার আবার পরিচয় থাকে নাকি। সে তো মড়া।'

'কী জানি, আমরা সেকেলে লোক, কষ্ট পাই।'

'কষ্ট পাই।' কথাটা স্বগত উচ্চারণ করলেন ডাক্তার কুশারী।

বৃদ্ধ বললেন, 'ভাবুন দেখি, এক ধারসে সব যুবকেরা অকালে বিদায় নেবে, আর আমরা বুড়োরা শূন্য এই সংসারে একা-একা পথ হাঁটব, পড়ে গেলেও আমাদের লাঠিটা কেউ কুড়িয়ে এনে মুঠোয় গুঁজে দেবে না।'

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে হর্ণ দিলেন ডাক্তার কুশারী। রামলাল দরজা খুলে নেমে আসতে গাড়িটা ওর জিম্মায় রেখে দোতলার সিঁড়িতে পা দিলেন।

'সুনন্দ। সুনন্দ ফিরেছে?'

রীতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'খোকা ফিরেছে?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'দ্যাখতো তোর মা এত চিন্তা করেন। বাইরে বেরোলে কী সব সময় ঠিক মতো ফেরা যায়? তোর মা বোঝেন না।'

'বারে, ভয় করে না?'

'বাড়িতে ফিরে এলেই যেন আর ভয় থাকে না।'

'বাবা তোমাকে আজ ভীষণ মুডি দেখাচ্ছে।'

'কী বললি? মুডি? হা হা। আমি কোনো দিন বাবাকে এমন বলতে পারতাম না।'

'বাবা, কী হয়েছে তোমার?'

'আমি আগে স্নানের ঘরে যাব। তোর মা কী করছেন?'

'মাকে ডেকে দেবো?'

'নাহ্।'

'কষ্ট পাই' শব্দটা আবার মস্তিষ্কে নড়াচড়া করে উঠল।

স্নান সেরে শোবার ঘরে ফিরলে সুষমা ওভালটিনের গ্লাসটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল।

'এত রাত্রে ঠাণ্ডা জলে চান করবার কী মানে হল? আমাকে বললে গরম জল পাঠিয়ে দিতাম।'

ডাক্তার কুশারী হাসলেন। 'ডাক্তারের অসুখ হলে চলে না।'

'আহা।'

'খোকা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছে?'

'হুঁ।'

'দ্যাখ তো মিছিমিছি তুমি ভাবো। ওরা আজকালকার ছেলে ওদের অনেক ভেবে চিন্তে বাইরে ঘোরাফেরা করতে হয়।...জানো রীতা আমাকে বলেছে, আমাকে নাকি ভীষণ মুডি দেখাচ্ছে।'

'লাই দিয়ে তুমি ওদের মাথা খেয়েছ। তোমাকে ওরা বাবা বলে কেয়ার করে না।'

'আর তুমি, তুমি কী আমাকে আজো পর্যন্ত স্বামী ভাবো?' ডাক্তার কুশারী শব্দ করে হাসলেন। রীতা জানাল: 'মা, আমি শুয়ে পড়েছি।'

'বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিস।'

ডাক্তার কুশারী সিগারেট ধরালেন।

সুষমা বলল: 'তোমাকে ডাক্তার সান্যাল সেদিন বলছিলেন না সিগ্রেটটা কমাতে?'

ডাক্তার কুশারী বললেন, 'কমিয়েছি তো। দ্যাখো না প্যাকেটের এটাই লাস্ট সিগারেট। এই ফেলে দিচ্ছি—'

সুষমা স্বামীর পাশে সরে এসে বলল: 'আজ বাবার চিঠি এসেছে।' 'এত করে লিখছেন যাওনা কিছুদিন জব্বলপুর ঘুরে এসো।'

'নাহ্।'

'জানোই তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। বারবার আমার দুর্বলতাকে কটাক্ষ করতে তোমার ভালো লাগে?'

'না। সত্যি না।'

ডাক্তার অনুভব করছিলেন চৈতন্য দিয়ে সুষমার অস্তিত্বকে। ও অন্ধকারেও আমার চোখ মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রয়েছে। ওর শরীরের সুবাস, আর মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল।

'কী, ঘুম আসছে না?'

'না'

'জানি। আসবেনা।'

'জানো?'

সুষমার শরীরের মধ্যে নিজেকে বিদ্ধ করে দিতে দিতে ডাক্তার ঘন গলায় বললেন, 'বিশ্বাস করো সুমি, আমি সাহসী নই, বীরপুরুষও নই, কোনো রকম উত্তেজনার আগুন পোহাতে ভালোবাসিনে। আর দশজন মানুষের মতো ভয়ের কারণ দেখলে ভয় পাই, অত্যাচারে দুর্বল হই, ক্লান্তি লাগে। কিন্তু, আমরা এমন এক কালে এসে পড়েছি যেখানে ভয় পেলেও কেউ আমাদের ছাড়বেনা। বিষম ঘটনাগুলোই আমাদের বদলে দিচ্ছে, আমাদের স্নায়ুগুলো টান টান করে বেঁধে দিচ্ছে...'

গোটা এলাকাটাকে সি আর পি কর্ডনিং করেছে। কুম্বিং অপারেশন চলেছে কিনা। তাই রাস্তা বন্ধ।

অতএব গাড়ি ঘোরাতে হবে।

ডাক্তার কুশারী পিছনে তাকালেন। ডান দিকে ঘুরিয়ে গলির মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইল খানেক উজিয়ে চেম্বারে পৌঁছতে হবে।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ডাক্তার স্বগত বললেন, এ এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি। যেন দশজনের জরুরি কাজগুলো কম্বিং-এর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

হর্ণ দিয়ে শম্বুক গতিতে গাড়ি চালালেন ডাক্তার। চলমান মানুষের মুখের ওপর মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেলছিলেন। ওঁরা কী ভাবছেন, একেক দিন এই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা (হাট-বাজার আপিস কাছারি ছেলের ইস্কুল যাওয়া), এই হাত তুলে অসহায়ের মতো পথ অতিক্রম, মেশিনগান, উদ্যত বেয়নেট। সমস্ত শহর জুড়ে জাল, জালের ফাঁদ। আর প্রতিটি মানুষ মাছির মতো আটকে আছে।

গলি পার হয়ে এবার বড় রাস্তায় মুক্তি।

ব্রিজে উঠলেন। গাড়িটা এবার নাবার মুখে। বাঁ দিকে ঘুরে ষ্টেশন রোড। তাঁর চেম্বার।

এখনো নাছোড়বান্দা রোদ বাড়িগুলোর ছাদে ফালি ফালি হয়ে আটকে রয়েছে।

গলিতে ঢুকতেই আবার অবাক হলেন ডাক্তার কুশারী। দোকানপাট বন্ধ, বাড়িগুলোর দরজা জানালাগুলো বন্ধ। দম বন্ধ, শ্বাপদের মতো রাস্তাটা করুণ নির্জন। জনপ্রাণী নেই। জমজমাট রাস্তার মোড়ের বাজারটা পর্যন্ত খাঁ খাঁ করছে।

হঠাৎ শরীরটা কেমন শির শির করে উঠল। কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য। ডাক্তার কুশারী কী ঘাবড়ে গেছেন। এগোবেন কী এগোবেন না।

উঁকি মেরে দেখলেন চেম্বারের দরজা দুটো ভেজানো। তাহলে হরিপদ আছে।

চেম্বার ঘেঁষে গাড়িটা নামাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলেন ডাক্তার কুশারী। ঠিক কয়েক হাত দূরে নর্দমাটার ধারে ধরাশায়ী যুবকের দেহ।

স্টেথেসকোপ হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার কুশারী।

তেতলার জানালা থেকে আর্ত নারীকণ্ঠ: 'যাবেন না, যাবেন না। ওধারে পুলিশ...'

সাবধানী চিৎকারে ডাক্তার কুশারী কী থমকালেন। চোখের দৃষ্টি মেদুর, হাতের আঙুলগুলো কিছু আঁকড়াতে চাইছে।

ডাক্তার কুশারী হাঁটু গেড়ে বসলেন যুবকের সামনে। যুবকের মণিবন্ধ তুলে নিলেন। স্পন্দন। কোমরের নীচে প্যান্টে চাপ চাপ রক্ত। ঠোঁটটা কী থর থর করে কাঁপছে।

'ডাক্তারবাবু!'

'হরিপদ!'

'ওধারে পুলিশ দাঁড়িয়ে...'

'একটু খাবার জল নিয়ে এসো। মনে হচ্ছে গুলিটা কোমর ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে।

হরিপদ ফিডিং কাপে একটু একটু করে যুবকের মুখে জল ঢেলে দিল। যুবকের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। লালাটে চোখে ও কিছু দেখবার চেষ্টা করছে কী।

'হরিপদ আমাকে একটু সাহায্য করো।'

ডাক্তার কুশারী ওর মাথা, গলা আস্তে করে তুলে ধরলেন, হরিপদ ওর কোমর, পা উঁচু করে ধরেছে।

'চেম্বারে নিয়ে চলো।'

ধরাধরি করে যুবকটিকে লম্বা টেবিলে শুইয়ে দেয়া হল।

কোমরের নীচে ক্ষতটা ভালো করে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার কুশারী। না, রক্ত চাপ চাপ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

ডাক্তার কুশারী বললেন, 'ইনজেকশনটা তৈরি করো। আমি উণ্ড ড্রেসিং করে দিচ্ছি।'

চিৎকার। চিৎকার কোথা থেকে ভেসে আসছে। বাইরে ভ্যানের শব্দ। শব্দটা চেম্বারের নীচেই আটকে রইল।

চেম্বারের বাইরে রাস্তায় কাদের কণ্ঠস্বর। পদশব্দ।

চেম্বারের দরজাটা কী শক্ত হাতে বন্ধ করে দেবেন ডাক্তার কুশারী। কাজের সময় গোলমাল তাঁর সহ্য হয় না।

ড্রেসিং সেরে চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে এলে ডাক্তার কুশারী দেখতে পেলেন বৃদ্ধ অমূল্যবাবু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছেন। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ। চেম্বারের প্রবেশপথ ঘিরে দাঁড়িয়ে পাড়ার মায়েরা। কে জানে, তেতলার সেই মহিলাই এঁদের জড়ো করেছেন কিনা।

ওধারে, পুলিশের ভ্যানটা তার বাহিনীদের গাড়ির মধ্যে পুরে ভিড় হটিয়ে ব্যাক করবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তার কুশারী পুলিশের গাড়িকে দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই মানুষদের দিকে তাকালেন। চেম্বার ঘিরে এই মানুষের প্রাচীর তাঁকে এতক্ষণ কর্তব্য সমাধান করতে দিয়েছে।

ডাক্তার কুশারী ডাকলেন: 'অমূল্যবাবু আসুন।'

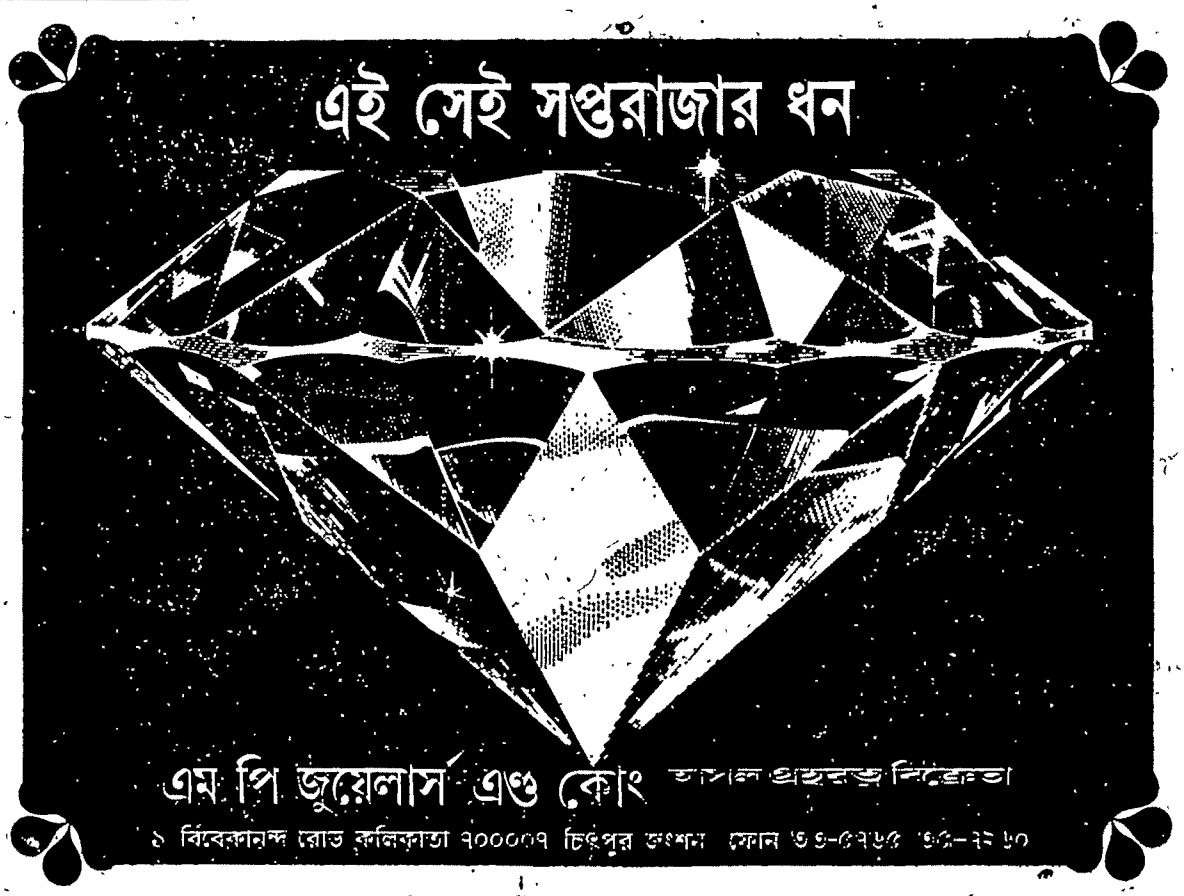

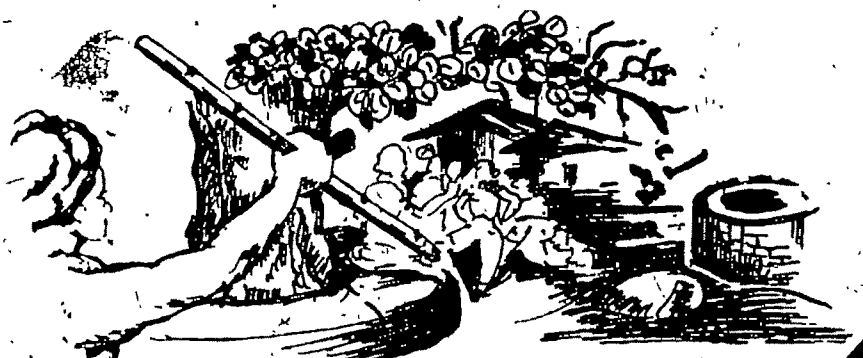

তেলুগু গল্প

এখন যে হাওয়া বইছে

রচনা: সি. এস. রাও অনুবাদ: ধোমাল্লা বিশ্বনাথম্

[সি এস রাও তেলুগু সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্পে সমাজজীবনের বাস্তব দিক চিত্রিত হয়েছে। তিনি বারটি উপন্যাস ও ছাপ্পান্নটি গল্প লিখেছেন। তিনি বিপ্লবী সাহিত্যিকদের অন্যতম সংগঠক। বর্তমান গল্পটি 'ইপ্পুডু বীস্তন্না গালি' (এখন যে বাতাস বইছে) নামক গল্প-গ্রন্থের একটি গল্প। এই গল্পের নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে।]

দুই প্রহর বেলা হল। রামালয়ের সামনের বটতলায় গাঁয়ের মাতব্বররা বসেছিল। একজনের গোঁফ বড় বড় অন্যজনের মাথায় ছিল পাগড়ি। আর এক জনের চশমা নাকের উপর গড়িয়ে পড়েছিল। চশমা পরা করণম্, নাকের ডগায় চশমা রেখে, যাতায়াত-কারীদের উপর নজর রেখেছিল। কখনও মাথা উপরের দিকে তুলে কখনও নিচের দিকে নামিয়ে খুঁজছিল ছড়িধারী মুনসেফকে—

ছড়িধারী মুনসেফ এল।

'কি ব্যাপার ? পাশের ঘরগুলোতে আগুন লেগেছে আর তোমার ঘুম ভাঙছে না ?' করণম্ বলল মুনসেফকে।

'সেই কালকে কুঁড়েঘরে আগুন লেগেছিল। এখনও কি নিভে যায়নি ?'

'নিভে আর কোথায় গেল। আরও বেশি করে জ্বলছে। আগুন ছড়াতে ছড়াতে গোটা দেশ জ্বলে উঠবে কিনা কে জানে। এখনও প্রেসিডেন্টের পাত্তা নেই।'

'খবর পাঠিয়েছি। এসে যাবে।' বলতে বলতে করণমের পাশে বসে চুট্টা ধরাল মুনসেফ। করণম্ নস্যি নিল।

পাগড়ি বাঁধা লোকটা পাগড়ির ভাঁজের ভেতর থেকে চুট্টা বের করে একপ্রান্ত দাঁত দিয়ে কেটে থুপ্ করে থুতু ফেলে মুনসেফকে বলল, 'সামান্য একটু আগুন···আগুন দেখি মামা।'

'করণম্ মশাইয়ের কাছে চেয়ে নাও।'

'আমার কাছে আগুন থাকবে কেন ? আমি তো নস্যি টানা লোক। ওসব থাকবে কেন ?' করণম্ বলল।

'তুমি চাইলে, তোমার কাছে আগুনের আসতে কি আর দেরি হবে ?' মুনসেফ খোঁচা মেরে যেন বলল।

'থাক, থাক। এসব কথা আমাদের মধ্যে হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কেউ শুনতে পেলে সত্যি ভাববে।'

'এসব কে না জানে বাওয়া।' হাসতে হাসতে মুনসেফ বলল।

এমন সময় প্রেসিডেন্ট প্রকাশমকে দেখে, আশপাশের সকলের উদ্দেশ্যে করণম্ বলল, 'ঐতো; মহান নেতা এদিকেই আসছেন। সোজাসুজি কথা বলে আজকেই একটা ফয়সালা করতেই হবে। কি, ঠিক কিনা ?'

'যা বলার তুমিই বল। আমরা কি কোনদিন তোমার কথার পিঠে কথা বলেছি ?' মুনসেফ বলল।

গুঁফো সুব্বান্না গোঁফে পাক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। প্রকাশ কাছে এলে তাকে আহ্বান জানাতে জানাতে করণম্ বলল, 'এস প্রকাশম্' এখানে বসো।'

'গাঁয়ের মাথা সবাই এখানে জড়ো হয়েছেন। কি ব্যাপার ?' বলতে বলতে করণমের পাশেই বসল প্রকাশম্।

'তুমি কি জান না কেন জড়ো হয়েছি।' বলল গুঁফো সুব্বান্না।

'সে যাক্‌গে, আসলে ব্যাপারটা কি বলত প্রকাশম্ ?' বলতে বলতে করণম্ এমন ভাব করল যেন সে সব কিছু তার কাছে জানতে চায়।'

'ব্যাপার আবার কি। কালকে তো সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে। পথঘাট কাদা কাদা হয়ে গেছিল। পাশের গাঁ থেকে একটা ছোকরা এসে মন্দিরের পাশে টিউব কলে পা ধুচ্ছিল। তাকে দেখে সুব্বানা প্রশ্ন করেছিল, "কে হে তুমি ?" জবাবে ছেলেটি বলল, "আমি আপ্পুলুর ভাগনে।"

'আপ্পুলু মানে কে ? আমাদের ঐ

ডোমপাড়ার আপ্পুলু তো?' করণম্ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ সেই।' সুব্বান্না তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল।

"জাতে তুমি ডোম। মন্দিরের কলে পা ধুচ্ছ? তোর কি পাখনা গজিয়েছে নাকি?" সুব্বানা নাকি এই কথাটা জোরে জোরে বলেছিল। এখন ছেলেটা তো মফঃস্বলের ছেলে, সেও বলেছিল, "আমরা তো মন্দিরের ভেতরে ঢুকে থাকি। কলে পা ধুয়েছি বলে তো কি?" এই কথা শুনে সুব্বান্নার রাগ হল। তারপর কথার পিঠে কথা বেড়ে গেল। তারপর নাকি ছেলেটাকে দুচার ঘা মেরেছে।'

প্রেসিডেন্ট প্রকাশম্ এইভাবে ঘটনাকে বর্ণনা করায় সুব্বান্না বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বলল, 'ঘটনাটা তো সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। হলে তো আর কথাই ছিল না। তারপর কি হল জিজ্ঞেস করুন।'

'তারপর ডোমপাড়ার মাতব্বররা —বীর পুত্রাইয়া, ডোমপল্লীর কমিটির সদস্য সোমাইয়া, দাবীদ—ঐ ছেলেটাকে আর আপ্পুলুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে বিচার চাইল। আমি তখন সুব্বান্নাকে ডেকে পাঠালাম। ওর মুখেও সব শুনলাম। দেশে অনেক মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। মন্দিরের সামনের কলে হরিজনের পা ধোয়া অপরাধ হয়নি বলে তার জন্য মারা অপরাধ হয়েছে বলে আমি বলেছিলাম। আর কোনদিন এই ধরনের কাজ না করতেও বলেছিলাম। ভবিষ্যতে কারও গায়ে ওভাবে হাত তুললে জরিমানা দিতে হবে বলেও বলেছিলাম সুব্বান্নাকে। তারপর ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে চলে যেতে বলেছি।' বলল প্রকাশম্।

'তারপর ওরা বোধহয় খুশীই হয়েছে।' বলতে বলতে মুনসেফ নিভে যাওয়া চুট্টা ধরিয়ে নিল।

'তাহলে তো কথাই ছিল না। ওরা সবাই মন্দিরে ঢুকতে চায়। ওদের ইচ্ছা আমি ওদের সঙ্গে থাকি। মানে আমাকে নিয়েই ওরা মন্দিরে ঢুকতে চায়।' বলল প্রকাশম্।'

'রাজী হয়েছেন নিশ্চয়?' করণম্ ব্যঙ্গ করে যেন বলল।

'না। আমি বলেছি চারজনের সঙ্গে আলাপ করি। তোমরা কয়েকদিন অপেক্ষা কর। অত ব্যস্ত হলে কি চলে। তবে তোমাদের দাবি ন্যায্য। এ ধরনের কথা বলে আমি ওদের বিদায় দিয়েছি।'

'যাই হোক, আগামী বারেও প্রেসিডেন্ট হওয়ার বোনাদ তৈরি হয়ে গেল। না, তোমাকে সাধারণ লোক ভেবেছিলাম, কিন্তু তা নয়, ঘটে বেশ বুদ্ধি রাখ।' করণম্ হাসতে হাসতে বলল।

প্রকাশমের ভীষণ রাগ হল। সে বলল, 'করণম্ মশাই, এই পদের জন্যে আমি প্রার্থী হয়ে দাঁড়াইনি, কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিনি। আপনারাই আমাকে ধরে বুঝিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই ঘটনাটা ভুলে যাবেন না।' বলেই ঝট্ করে উঠে প্রকাশম্ চলে যাবে এমন সময়, প্রকাশম্, অত রাগের কি আছে? আর যাই হোক, করণম্ তো পর নয়, আমাদেরই লোক।' বলতে বলতে মুনসেফ প্রকাশমকে ধরে এনে বসাল।

করণম্ মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে চাপা হাসি হাসল। টেনে একবার নস্যি নিল সে।

'প্রকাশম্, আমার উপর অত রাগ কিসের? দশ হাজার লোকের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তোমাকে প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলাম।' বলে করণম্ সুব্বান্নার দিকে তাকাল। সুব্বান্না মুখ ঘুরিয়ে থুগ্ করে থুতু ফেলল।

করণম্ আবার হাসিমুখে বলল, 'প্রকাশম্ তুমি কি জান কেন আমরা তোমাকে প্রেসিডেন্ট করেছি? আমাদের গ্রামের লোক কথায় কথায় যাতে পথে নেমে ঝগড়া না করে, কোর্ট কাছারিতে যাতে যখন তখন ছোটাছুটি না করে সেই জন্যই তো, বয়সে তুমি ছোট হলেও লেখাপড়া জানা লোক, বুদ্ধিমান, কথাবার্তা বলতে পার, আমাদের আচার বিচার ঐতিহ্য সবকিছু বুঝে শুনে তুমি ঠিক ভাবে রক্ষা করবে, এই আশাতেই তো তোমাকে প্রেসিডেন্ট করা না কি?'

'তা হয়তো হবে।'

'তাই যদি হয় তাহলে তুমি যদি ঐ ডোমদের সামনে সুব্বান্নাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে ধমক দাও তাহলে ওর মনে কি ক্ষোভ জমবে না? তুমি জান ওর ঠাকুরদা, ছোটখাটো অপরাধ করলেও ডোমদের মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতো। সুব্বান্নার বাবাও সেই রকম তেজী পুরুষ ছিল। তখনকার দিনে কেউ ভয়ে মুখ খুলতে পারত না। অত ঝুটঝামেলাও ছিল না। আর সুব্বান্না, যতই হোক ওই তো তোমার আগে প্রেসিডেন্ট ছিল। তার আমলেও মোটামুটি একই অবস্থা ছিল। এহেন লোককে তুমি যদি ডোমদের সামনে অপদস্থ কর সে বেচারা কি মনে ব্যথা পাবে না? এছাড়া, তুমি কোন্ সাহসে ওদের মন্দিরে ঢোকার দাবিকে ন্যায্য বললে? এতে কি গাঁয়ের ঐক্য নষ্ট হবে না? আচার বিচার ধ্বংস হবে না? কই, ওদের ঐক্য তো ঠিক আছে। ওরা কি ওদের আচার বিচার ত্যাগ করেছে। অত কেন, ঐ ডোমদের মন্দিরে ঢোকার পর, জিজ্ঞেস করে দেখ না, তোমার মা কি মন্দিরে ঢুকতে রাজী হবে?

'সে যাইহোক, আগে যা হয়েছে হয়েছে। এখন দিন বদলাচ্ছে। এই দিন বদলের পালায় আমরা কি না বদলে থাকতে পারি?'

'ভাল কথা বলেছ হে। যেদিকে হাওয়া সেদিকে ঘুরব। তাহলে আর আমাদের নিজেদের একটা ইয়ে, মানে স্বাতন্ত্র্য কি রইল। আমরা দিনগুলোকে বদলাব। দিনগুলোর কাছে যদি আমরা নত হই তাহলে আমাদের ক্ষমতা কিসে। তোমার বয়স এখনও কম, পাপপুণ্য জ্ঞান নেই, ছোঁয়াছুঁয়ির ধার ধার না, তুমিও ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কর সেটা আমি জানি, ব্যক্তিগতভাবে যে যা ইচ্ছে করে যাক ক্ষতি নেই কিন্তু যেটাতে সবাই জড়িয়ে যাচ্ছে এমন বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, তার ফল কি হবে ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত নয় কি প্রকাশম্?' করণম্ টিপে টিপে কথাগুলো বলল।

'ওদের কথা কি, ন্যায্য নয় বলতে চান? মন্দিরের সামনের কলে পা ধুলে কিসের ক্ষতি হয়? জল আছে কিসের জন্যে? পরিষ্কার করার জন্যে। জল পরিষ্কার করে, জল নিজে অপরিষ্কার হয় না, তাই নয় কি?'

এখন কথার পিঠে কথা ওঠে। আমরাও তো বলতে পারি, ডোম পাড়ায় ওদের তো মন্দির আছে। ওদের মন্দিরও ওরা ঢুকছে ঢুকুক। আমাদের মন্দিরে ঢোকার জন্য ওদের অত হাঁকপাকানি কোন?... আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল করণম্ এমন সময় ডোমপাড়ার মাতব্বর, ডোমপল্লীর সদস্য এবং আরও কয়েকজন ডোম সেখানে হাজির হল। করণম্ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে সবাই একেবারে জোট পাকিয়ে চলে এলি? কিরে পুত্রাইয়া, কি ব্যাপার? এক্ষুণি তোরা মন্দিরে ঢুকতে চাস নাকি?'

'আজ্ঞে, গাঁয়ের চারজন মাতব্বরকে জিজ্ঞেস করে কথা বলে জানাব বলেছেন প্রেসিডেন্ট।' বলল পুত্রাইয়া।

'ওরে শোন, শোন আমার একটা কথা শোন, আমরা এতদিন মা এবং সন্তানের মত একই গ্রামে আছি। আমাদের আচার বিচার আমরা মেনে চলি, তোদের আচার বিচার তোরা মেনে চলিস। তোদের আলাদা মন্দির আছে, হঠাৎ একদিন আমাদের মন্দিরে ঢুকেই বা তোদের কি লাভ বল? বল, আমি ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই তোদের জিজ্ঞেস করছি।'

'তা ঠিক বলেছেন। তবে কথা কি জানেন সব জায়গায় আমাদের জাতের লোক তো মন্দিরে ঢুকেছে, এখানে মন্দিরের সামনে সামনে পা ধুতে গিয়ে যখন বাধা পেল তখন সবাই বসে ঠিক করলো যে মন্দিরে ঢুকবে।'

'ও, তাহলে ঠিক করে ফেলেছিস?'

'আজ্ঞে, সে রকম তো সবাই বলছে।'

'বেশ, তোদের ঢোকার আনন্দ যখন এত চাগা দিয়েছে তখন আমি আর বারণ করি কেন। ভাল একটা দিনক্ষণ দেখে তোদের ইচ্ছা তোরা পূরণ কর। তবে হাঁকপাক করিস না; ঠাকুর দেবতা বলে কথা, তোদের কারও ক্ষতি হলে আমি মনে বড় ব্যথা পাব। আচ্ছা, এখন তোরা আয়। চল হে, যাওয়া যাক। আমাদের গ্রাম বা পেছনে থাকে কেন। দিন যখন বদলাবে বদলাক। ওঠ, চল।' বলতে বলতে করণম্ উঠে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করল মুনসেফ ও সুব্বান্না। অন্যেরা যে যার পথে চলে গেল।

প্রকাশম্ এবং ডোমপাড়ার লোক ভাবতে পারেনি যে এত সহজে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা মনে মনে খুশি হল।

করণম্ সেখান থেকে উঠে সোজা বাড়ি চলে যায়নি। যে মুনসেফ ও সুব্বান্নকে নিয়ে মুনসেফের বাড়িতে বসল। ব্যাপারটাকে নিয়ে আর একবার আলোচনা শুরু করল।

গোঁফ পাকাতে পাকাতে সুব্বান্না বলল, 'মন্দিরে ঢুকব বললেই কি ঢোকা হয়ে যাবে। অত সহজ। আসুক না এক একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।'

'সুব্বান্না' এসব ব্যাপারে অত উতলা হলে চলে না। ভাল করে চারদিক ভেবে কাজ করতে হয়। চারদিকের হাওয়া বুঝে কাজ করতে হয়। দিন-কাল ভাল নয়, কথায় কথায় যার তার মাথায় জুতো পড়ছে। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি করা ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখতে হবে। আসল গলতিটা হয়েছে কোথায় জান? প্রকাশমটাকে প্রেসিডেন্ট করাই ভুল হয়েছে।' করণম্ বলল।

'আসলে ও নাম কিনতে চায়। নেতা হতে চায়?' মুনসেফ বলল।

এসবের মূলে তো সেই লোকটা। যে নিজে ষোল আনা ব্রাহ্মণ অথচ ফস করে লিখে ফেলল 'মালপল্লী' (ডোম পল্লী)—উপন্যাস। নায়ক করল একটা ডোমকে। আমাদের জাতিভাইরা সব গালে হাত দিয়ে ভেবেছি, অতই যদি লেখার সখ হয়ে থাকে রামায়ণ মহা ভারত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলেই পারত। নিদেনপক্ষে শ্লোকের অনুবাদ বা উপ্ উপদেশাবলী লিখলেই পারত। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। বরং একটু নামও হ'ত। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল করণম্।

'ওসব কথা থাক। এখন কি করা যায় তাই বল। ওদের কি তাহলে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, আমাদের করণীয় কিছু আছে?' মুনসেফ জিজ্ঞেস করল।

'অত সহজ নয়, আগে চাকরটাকে পাঠিয়ে মুচিদের ডেকে পাঠাও।'

'ওরা কি করবে?'

'পরে বলছি, আগে ডেকে পাঠাও তো।'

'ঠিক আছে।' বলে মুনসেফ মুচি ডাকতে চাকর পাঠাল।

চাকর মুচিদের পাড়ায় গেল। ডোম-পাড়া থেকে এক ফার্লিং দূরে ছিল মুচিদের পাড়া। ডোমপাড়ার কুয়োর পাশ দিয়ে যেতে হয় সেখানে। মুচি পাড়ায় একটা মড়া বলদের চামড়া ছাড়াচ্ছিল মুচিদের মাতব্বর আপ্পি।

'মুনসেফ তোমাদের মধ্যে মাথা যারা তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।' বলল চাকরটা।

'মুনসেফ মশাই একমাস হল জুতো সেলাই করতে বলে গেছে। যন্ত্রের অভাবে জুতোটা সেলাই করতে পারলাম না। না জানি কত কথা শোনাবে।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল আপ্পি।

'ও ব্যাপারে নয়, অন্য একটা কাজ আছে।' বলে চাকরটা ফিরে গেল।

চাকরের পেছনে পেছনেই মুচি-পাড়ার আপ্পি সহ কয়েকজন এসে মুনসেফের বাড়ির সামনে জোড়হাত করে দাঁড়াল।

'তোরা ঐ পেছন দিক দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে আয়। বলে করণম্ নিজেই পথ দেখাতে দেখাতে খিড়কির দরজার কাছে গেল। সেখানে সুব্বান্না ও মুনসেফ বসেছিল।

করণম সশব্দে এক টিপ নস্যি নিয়ে বলল, 'কিরে আপ্পি, চিরকাল কি এই ভাবেই তোরা কাটিয়ে যাবি। নাকি উন্নতি টুন্নতি করার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে?

'উন্নতি কি করে হবে আজ্ঞে? জুতো সেলাই করে আজকালকার দিনে কি করে উন্নতি করব?'

'আছে, পথ আছে। উন্নতি করার

ইচ্ছে থাকলে অনেক পথ আছে। আজকাল যারা জুতো সেলাই করে তারাও সরকারের কাছে ধার পেতে পারে। কো অপারেটিভের মাধ্যমে সব কিছু করা যায়। ধার করা টাকা দিয়ে অনেক যন্ত্রপাতি কেনা যায়। হাজার হাজার জুতো তৈয়ারি করা যায়। তখন তোদের উন্নতি ঠেকায় কে? তবে হ্যাঁ সবই করা যায় যদি তোদের ইচ্ছে থাকে। তোদের ইচ্ছাটাই আসল।'

'আজ্ঞে এসব তো আমরা জানিনা। এই এখন আপনি বললেন, জানলাম। আমাদের তো বাবু অক্ষর জ্ঞান নেই, কি করে জানব এসব।'

'আমরা কি মরে গেছি? সবাই একটা কাগজে টিপসই দিয়ে দে, দেখি কি করতে পারি।' বলে করণম্ মুনসেফের দিকে তাকাল। মুনসেফ এমন ভাবে তার দিকে তাকাল যেন সে বলছে, বাব্বা, করণম্ তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে। এক দিকের আগুন দিয়ে অন্য দিকের আগুন লাগাতে চাইছ?'

ঐ চাউনি দেখে করণম্ বুঝল মুনসেফ তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারপর সে আবার বলল, 'সরকারের কাছে থেকে টাকা আনতে হলে তোমাদের মধ্যে ঐক্য চাই। দু'দিন পরে ঐ ডোমগুলো আমাদের মন্দিরে ঢুকবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলে মিশে ঢুকতে পার। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তোমরাই বা পেছনে পড়ে থাকবে কেন? ভাল কথা, তোমাদের ওরা সঙ্গে নেবে তো? আমার তো সন্দেহ আছে।

আজ্ঞে সন্দেহ কি বলছেন। ওদের কুয়োর জল তুলতে যাই তাতেই বাধা দেয়। গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক কষ্টে আমাদের এক হাঁড়ি এক হাঁড়ি করে জল তুলতে হয়।' বলল ওদের মধ্যে একজন।

'এখন আর ওসব বাধা থাকবে না। তোরা যে কোন টিপকল টিপে জল নিতে পারিস। যে কোন কুয়ো থেকে জল তুলতে পারিস। ওসব নিয়ে আর ঝগড়া ঝাঁটি হবে না। এক কাজ কর, আজ রাত্রেই তোরা ডোমপাড়ার কুয়ো থেকে জল তোল। তবে প্রথমবারে সবাই মিলে কুয়োর কাছে যায়। তবে ওরা কেউ বাধা দেবে না। ওরা তো আমাদের মন্দিরে ঢুকতে চাইছে। ওরা যদি আমাদের মন্দিরে ঢুকতে পারে তবে তোরা ওদের কুয়োর জল নিতে পারবি না কেন?"

'আজ্ঞে গোলমাল হতে পারে।'

'তোর মুণ্ডু। আমরা আছি কি করতে? এটুকু কাজে যদি তোরা ভয়ে মরে যাস আজ বাদে কাল তোরা কো-অপারেটিভ কি করে? পাড়ায় অফিসার ঢুকবে, 'তোদের কুঁড়েঘরে বসবে, তখন তোরা কি করবি। ওরে শোন, দিন বদলেছে তোদেরও এগোতে হবে। কি বল মুনসেফ?'

'সত্যি তো, অত ভয়ের কি আছে।' মুনসেফ করণমের কথা সমর্থন করল।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই মিলে বলল, 'না আমরা ভয় পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, আজ রাত্রেই তোরা কুয়োর জল আনতে বেরিয়ে পড়।' 'বলে করণম্ মুচিদের বিদায় দিল।

'তাহলে কি দাঁড়াল? ডোমগুলো মন্দিরে ঢোকার আগেই মুচিদের সংগে ওদের একচোট হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো মহা চতুর লোক হে।' হাসতে হাসতে মুনসেফ বলল।

'করণম মশাইয়ের মাথা বলে কথা।' বলল সুব্বান্না।

'পায়ের তলায় বাবলা কাঁটা ফুটলে সোনার ছুঁচ দিয়ে সেটা বের করে কেন? পুরো কাঁটাটাকে তুলে আনার জন্য। ওরা যখন আমাদের মন্দিরে ঢুকতে আসছে আমাদের বাধা দেওয়ার কি দরকার? আমরা যদি ঐ মুচি মেথরদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে কয়েকটা মাথা ফাটবে। তখন ওরা নিজেরাই ভাববে মন্দিরে ঢোকার কথা ভাবতেই যখন এতবড় বিপদ এল তখন মন্দিরে ঢুকলে না জানি কি বিপদ হবে। তারপর আর কি ন্যাজ গুটিয়ে যে যার বসে পড়বে।'

'সাবাস বাওয়া। কুরুক্ষেত্রে তোমার মত লোক অপরিহার্য।'

'সবই সঙ্গদোষ হে। আমাকে একমাত্র তুমিই চিনলে মুনসেফ।'

'আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা।' সুব্বান্না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল।

করণম এগিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা খুবই সহজ। কুয়োর কাছে ডোম আর মুচিদের মধ্যে ঝগড়া লাগবে। কয়েকজনের মাথা ফাটবে। কোর্ট কাছারি হবে। ওদের মধ্যে একপক্ষ, প্রদীপের চারদিকে যেমন পোকা ঘোরে তেমনি আমাদের চারদিকে ঘুরবে। ফলে প্রকাশমত্ত এতবড় ঘটনায় না জড়িয়ে পারবে না। ভাল কথা, মুনসেফ, সকালের আগেই তুমি থানার সংগে যোগাযোগ করে ফেল আর কোর্টের কাগজগুলো তৈরি রেখো। আমি এবার উঠি। আহা, সুব্বান্না কি করছ, গোঁফটাকে পাকাতে পাকাতে উপড়ে ফেলবে নাকি? একটু বিশ্রাম দাও গোঁফটাকে। তোমার এখন অনেক কাজ। তুমিই তো মধ্যমণি হে।' বলে করণম্ উঠে পড়ল।

'আপনি এগিয়ে যান, আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করব। যত লাগে দেবো।' বলে সুব্বান্নাও উঠল।

সেদিন রাত্রে আটটার সময় প্রকাশম্ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরছিল। ডোমপাড়ার কুয়োর পাশ দিয়ে আসার পথ। দূর থেকেই সে শুনতে পেল চেঁচামেচি। শুনেই সে তাড়াতাড়ি হেঁটে কুয়োর কাছে এল। কুয়োর কাছে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। হৈ চৈ, চীৎকার চেঁচামেচি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি হচ্ছে, 'আরে থামো, থামো, কি হচ্ছে?' বলতে বলতে প্রকাশম্ ঐ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'দেখছেন না, মুচিগুলো এসে আমাদের কুয়োর জল নিতে চাইছে। কিভাবে এসেছে দেখুন, সবাই মিলে লাঠিসোটা নিয়ে এসেছে।' ডোমপাড়ার মাতব্বর পুত্রাইয়া বলল।

'তোমরা কি জল নিতে বারণ করেছ?' প্রকাশম্ জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওদের দেখাদেখি আমাদের লোকও লাঠিসোটা এনেছে, দেখুন না, মুচিগুলো কিভাবে এসেছে। জল নিতে কেউ লাঠি আনে? আবার আমাদের ধোঁটা দিয়ে বলছে তোমরা

মন্দিরে ঢুকতে পার আর আমরা জল নিতে পারি না ?' বলল পুত্রাইয়া।

প্রকাশম্ মুচিদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আচ্ছা কি তোমরা আজ করণম্ মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলে ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ওরা বলল।

'ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।' বলে ঐ ডোম ও মুচিদের নিয়ে প্রকাশম্ নিজের বাড়িতে এল। ওদের সবাইকে খিড়কির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। কাছেই ছিল প্রকাশমদের কুয়ো। সে ওদের বলল, 'তোমরা প্রত্যেকে এই কুয়ো থেকে জল তোল। তুলে আমাকে দাও, আমি খাব। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

ওরা সবাই কিছুক্ষণ নীরব ছিল। প্রকাশমের বক্তব্য শুনে ওরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করল। তবে ওদের ধমনীতে তখনও কুসংস্কারের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ঠিক ঐ অবস্থায় তাদের কি করতে হবে ওরা ভেবে পাচ্ছিল না।

প্রকাশম্ বুঝলে তার কথায় কিছু কাজ হয়েছে। সে যা বোঝাতে চেয়েছে ওরা তা বুঝতে পেরেছে। 'যাদের তোমরা মাতব্বর ভাবছ, গণ্যমান্য মনে করছ তারা নিজেদের স্বার্থ ষোলআনা রেখেই তারপর তোমাদের কথা ভাবে। তোমরা যে তিমিরে আছ সেই তিমিরেই ওরা তোমাদের রাখতে চায়। কি হল জল তোল আমাকে দাও। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। আবেগ মিশ্রিত গলায় প্রকাশম্ বলল।

ওরা প্রত্যেকেই নাড়া পেল। নিজেদের ভুল অনুধাবন করল। পুত্রাইয়া এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে বাবু। আমাদের কুয়ো থেকে জল নিতে ওদের বলে দিন।'

প্রকাশম্ মহানন্দে বলল, 'শোন ভাই, যেকোন দেশে জাত মাত্র দুটো আছে। যাদের আছে তারা, একটা জাত, যাদের নেই তারা অন্য জাত। এছাড়া অন্য কোন জাত নেই। সত্যি সত্যি দিন যদি বদলায়, বদলাবেই, তোমরাও তোমাদের হক্ বুঝে নেবে। কাল সকালে সবাই মিলে এসো। আমি নিয়ে যাবো তোমাদের সবাইকে।'

পরের দিন সাত সকালে ডোম ও মুচিপাড়ার সবাই প্রকাশমের বাড়ির সামনে জড়ো হল। মন্দিরের সামনে এত লোক জড়ো হওয়ার ফলে যেন মনে হল উৎসব লেগেছে। মন্দিরের সামনে কল টিপে কেউ জল খাচ্ছে, কেউ পা ধুচ্ছে।

না জানি কি ঘটবে ভেবে যারা মন্দিরের কাছে এসেছিল তারা চোখ বড় বড় করে সবকিছু দেখল। করণম্, সুব্বান্না, মুনসেফ বটতলায় বসে রইল।

মন্দিরের ঘন্টা বেজে উঠল। সবাই মিলে ঠাকুরের দর্শন করল। অদূরে বটতলায় বসে ওরা আলোচনা করতে লাগল, 'শহরে ঠাকুর দেবতার মতই আমাদের ঠাকুরেরও সেই ক্ষমতা আর নেই।' এই ধরনের কথা কিছুক্ষণ বলে ওরা যে যার আস্তানায় চলে গেল।

কিন্তু এর ফলে কি হল··· ?

মন্দিরের ঠাকুর মন্দিরেই আছে।

মুচিপাড়ার লোক মুচিপাড়াতেই আছে।

ডোমপাড়ার লোক ডমপাড়াতেই আছে।

গাঁয়ের মাতব্বরা যে যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

প্রকাশম্ও নিজের ঘরেই আছে।

কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তনের জন্য এটুকু যথেষ্ট নয় ভাবল কয়েকজন। প্রকাশম্ ভাবতে শুরু করল পরিবর্তন করার পথ এটা নয়।

পিঁপড়ে মেরো না

রচনা- ইউসুফ এল সেবাই

মিশরের গল্প

অনুবাদ :-
আশিস সান্যাল

[মিশরের বর্তমান সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ইউসুফ এল সেবাই মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক। এ পর্যন্ত তাঁর একুশটি গল্প গ্রন্থ, পনেরটি উপন্যাস, আটটি প্রবন্ধের বই, চারটি নাটক এবং একটি স্মৃতি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরো অনেক রচনা।

১৯১৭ সালের ১০ জুন কায়রোতে তাঁর জন্ম। যখন তিনি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখনই তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়ে দারুণ হৈ চৈ সৃষ্টি করে। বহু আন্তর্জাতিক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ।]

খুবই ধীর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ছায়াটা.....

তার পেছন দিকে গাছের যে বিষণ্ণ ছায়া পড়েছিল, তাও যেন নিতান্তই মন্থরভাবে বেড়ে চলেছে। বেলাভূমি পেরিয়ে ধীরে ধীরে জল-রেখার দিকে। সে বসে বসে দেখছিল, কেমন অলসভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা এগিয়ে চলেছে ছায়াটা। ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তার মন। একটা বেদনা দুপ্ দাপ করতে থাকে বুকের মধ্যে। ভাবে, কেন আরো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে না ছায়াটা। কেন অন্ধকারে...গাঢ় গাঢ়তর অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে না পৃথিবী ?

তবে কি ছায়াটা বুঝতে পারছে না, এখন গজেন্দ্র গমন শোভন নয় তার পক্ষে ? বুঝতে পারছে না কি, এখনই সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলতে হবে ? জল, স্থল, অন্তরীক্ষের ব্যবধান মুছে দিতে হবে কঠিন কালো প্রলেপে। দৃশ্যমান সবকিছুকে আড়াল করতে হবে তার ? পৃথিবীকে পরিণত করতে হবে একটা উত্তাল সীমানা-হীন অন্ধকার সমুদ্রে ?

অথচ একদিন এই অন্ধকারকেই সে ঘৃণা করত। তখন তার বয়স কত হবে ? দশ এগারো বছর। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে দেখলেই কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত তার মন। মনে হত, বুঝি সব আনন্দের সমাপ্তি। রাস্তায় সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত খেলা ধুলা। মা খোলা জানলা দিয়ে হাঁক ছাড়তেন : 'খোকা, ঘরে এসো। আর নয়। এবার পড়তে বসো।'

তখন মনে হতো তার, যদি শক্তি থাকত, তবে জোর করে ধরে রাখত সূর্যটাকে। আরো অনেকক্ষণ খোলা পিঠ নদী আলোয় ঝলমল করত। আরো অনেকক্ষণ সূর্যের আলোয় শরীর ভিজিয়ে তারাও রৈ রৈ ঘুরে বেড়াতে পারত।

কিন্তু আজ ? সেই আলোকেই সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। এখন সে ভাবছে, যদি শক্তি থাকত, তবে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিত সূর্যকে পশ্চিম দিগন্তে।

এই অকারণ দেরীকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করত না।

এখন আর তার ভেতরে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার দৃষ্টি-ভঙ্গির একটা গভীরতর পরিবর্তন। আগে যে সব জিনিসকে সে ভাল বাসত, তার অনেক কিছুকেই সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে এখন। আবার ভাল লাগত না, এখন অনেক কিছু ভাল লাগছে। এক সময় যা দেখলে তার শরীরে শুরু হয়ে যেত রক্তের দাপাদাপি, এখন সে সব তার মনকে সামান্য মাত্রাতেও চঞ্চল করে না।

ছোটবেলার দিনগুলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে পড়ল, একদিনের কথা। তখন বিকেল। মা ঘরে বসে কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একটা আরশোলা এসে পড়ল তার গায়ে। মা তাড়াতাড়ি একটা ঝাঁটা নিয়ে মারতে গিয়েছিল সেটাকে। একটা বেদনায় করুণ হয়ে উঠেছিল তার মুখ। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তার সমস্ত অনুভূতি। চিৎকার করে বলে উঠেছিল সে,—'না—না, মেরো না।'

মা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি ব্যাপার? এত উতলা হয়ে উঠলে কেন?

'ঝাঁটা দিয়ে কি করবে?'

'আপদটাকে শেষ করবো।'

'মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? কি করেছে ওটা?'

'ওটা তো একটা আরশোলা। এত ভাবছ কেন ওটাকে নিয়ে।

কিন্তু কোনও ক্ষতিতো করেনি তোমার। তাহলে অকারণ মারতে যাচ্ছ কেন ওটাকে? বলতে বলতে তার গলায় ভেসে এসেছিল একটা কান্নার করুণ স্বর। মা কেমন যেন ইতস্ততঃ করতে আরম্ভ করলেন। এমন প্রশ্ন কেউ এর আগে তাকে করেনি। তবু নিজের স্বপক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে তিনি বলেছিলেন—

'আরশোলারা খুব ক্ষতিকারক।'

'মানে?'

ঘর নোংরা করে—খাবার দাবার নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু এখন তো ওটা কেবল ওপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কোন ক্ষতি করেনি তো তোমার।

এভাবেই সেদিন সে একটা ছোট কীটকে মারার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিল। একটা পিঁপড়ে বা একটা মাছিকে মারাও সে পছন্দ করত না। তার মন বেদনায় ভরে যেত। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আজ?

আজ সে নিজেই শিখে নিয়েছে মারার সমস্ত কলা কৌশল। আজ সে সব হত্যাকে আর ঘৃণা করে না। কেন না, এ এখন তার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়েছে। তার আদর্শ রক্ষার জন্য এখন প্রতিনিয়ত তাকে মারতে হচ্ছে। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রেখে, তার মানসিক দুর্বলতা গুলিকে মন থেকে উপড়ে ফেলে এখন এক নিধন যজ্ঞের সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরোহিত।

কিন্তু সত্যিই কি সে এটাকে নিছক কর্তব্য বলে মনে করে? না কি এই কাজের সঙ্গে তার মনের মিল ঘটেছে? এব্যাপারে অন্ততঃ নিজের কাছে সে সৎ। নিজের অনুভূতিকে সে কোনও দিন গোপন করে রাখেনি। কেবল এই একটা দিকেই তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসে নি। আগের মতই সে নিজের কাছে সত্যকে গোপন রাখতে চায় না। সেই সত্যের আলোকে তার মানসিকতাকে সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সে দেখল, হত্যার খেলায় এখন মন টগবগ করে ওঠে। তবে এখনও সে অকারণ একটি আরশোলা বা পিঁপড়েকে মারা অন্যায় বলে মনে করে। এখনও যারা একটি পিঁপড়েকে পিষে মেরে ফেলে, তাদের সে ঘৃণা করে। সুয়েজের ওপারে তাঁবু খাটিয়ে যারা প্রহরা দিচ্ছে, তাদের মৃত্যু পিপাসার সঙ্গে তার নিঃস্ব কর্ম পদ্ধতির পার্থক্য সে সহজেই অনুভব করে। তারা মানুষকে মারে লালসা সিদ্ধির জন্য। আর সে তার আদর্শ, স্বদেশ ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য অবিচারীর আর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।

একটা খুনের নেশা তার শরীরে মাতামাতি করতে লাগল। শত্রু সেনাকে নিহত করবার একটা দুর্মর বাসনা কেবলই দুপদাপ করতে লাগল তার মনের মধ্যে।

হ্যাঁ, সূর্য অস্তমিত হয়েছে অনেকক্ষণ। চারদিক ঢাকা পড়েছে গভীর অন্ধকারে। অমাবস্যার আকাশে চাঁদ নেই। কয়েকটা তারা কেবল মিট মিট করে জ্বলছে। খুব কাছের গাছ পালাগুলোও এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বিষণ্ণ কফিনে যেন ঢাকা পড়েছে সমস্ত পৃথিবী। পৃথিবীর ঘুম আর একটু গাঢ় হলেই শুরু হবে তাদের অপারেশন···।

তার হৃদ কম্পনের শব্দ দ্রুততর হতে লাগল। সে কি কিছুটা ভীত? সংশয় আচ্ছন্ন তার সমগ্র চেতনা? হতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তবু সে সুয়েজ অতিক্রম করবার সঙ্কল্পে অটল। ওপারে যেখানে শত্রু সেনা তাঁবু ফেলেছে,..সেখানে সে যাবেই। এরকম অল্প স্বল্প সন্ত্রস্ত ভাবতো ছোট খাট ফুটবল খেলার আগেও হয়। তার জন্যে যে দূরে বসে থাকে, সে কখনও যথার্থ খেলোয়াড় হতে পারে না।

এই সব ভাবনা চিন্তার মধ্যেই সে দেখল, প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে তাদের শিবিরে। এদিক ওদিক শোনা যাচ্ছে ফিসফাস কানাকানি। শিবিরের পেছন থেকে নৌকাগুলিকে টেনে নামান হচ্ছে জলে। সব কটি নৌকো জলে নামানোর পর কার যেন অতি মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে ঃ

ঃ তারপর?

কণ্ঠস্বর মিশে গেল অন্ধকারে। সেই স্তিমিত অন্ধকারেই সে দেখতে পেল, মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা সৈনিকেরা ভূতের মত এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে। একটা গভীর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। নির্দেশমত তারা কয়েকজন গিয়ে উঠল নৌকায়। সে শুনতে পেল এই অন্ধকারেই দু'জনের মধ্যে ফিসফিস করে কথা হচ্ছে। একজন বলছে—

'আমার নির্দেশ পাওয়া মাত্র তুমি গুলি চালাতে থাকবে। ওপারে পৌঁছে সংকেত না পাঠানো পর্যন্ত থামবে না।'

'কিন্তু ভয় হচ্ছে, হঠাৎ আমাদের গোলা গিয়ে তোমাদের উপরেই না পড়ে।'

'পড়ে পড়ুক। তাছাড়া কোনও উপায় নেই। ওপারে গিয়ে সংকেত পাঠাবার পরই বন্ধ করবে গোলাগুলি।'

'ঠিক আছে।'

'কেন গোলাগুলি চালিয়ে যেতে বলেছি, তা বুঝতে পেরেছ কি?'

'কেন?'

'যতক্ষণ এপার থেকে গোলাগুলি চলবে, ততক্ষণ ওরা ওই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকবে। ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, আমরা সন্তর্পণে সুয়েজ অতিক্রম করছি। সুতরাং তোমার দায়িত্ব কত কঠিন, বুঝতেই পারছো। ওরাই কামান দাগতে থাকবে। দু'একটা প্রাণ যেতে পারে।'

কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না। পরিবর্তে এক ফার্লং দূর থেকে গর্জে উঠল কামান। গুড়ুম··· গুম···। একটার পর একটা কামান গর্জেই চলল। রাতের অন্ধকার হয়ে উঠল আরো বিভীষিকাময়ী। মরুভূমির বাতাসে ভেসে আসতে লাগল কান্নার করুণ শব্দ। হাওয়ার থাবায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলি।

সুয়েজের বুকে সাপের মত ফণা তুলে সপ সপ শব্দে ভেসে চলল নৌকো গুলো। নৌকারোহী সকলের চোখে মুখেই একটা উৎকণ্ঠার ভাব। তার নৌকাটি কিন্তু ভেসে চলল সকলের আগেই। দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল একটা অস্পষ্ট গানের সুর। হয়তো কোনও নৈশ কাফেতে তখনও চলেছে নাচ-গানের হৈ হুল্লোড়। তার মনে জেগে উঠছিল পুরোনো দিনের অনেক কথা। কিন্তু না, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের সময় এটা নয়। এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে সামনের দিকে। আসন্ন মহা প্রলয়ের দিকে। শত্রু হত্যার একটা দারুণ উল্লাস ছুটন্ত ঘোড়ার মতো তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সুয়েজের ওপারে শত্রুসেনার শিবিরের দিকে।

এ রকম উল্লাস তো এর আগে সে কোনদিন অনুভব করেনি। শত্রুকে নিধন করার মধ্যে যে এমন একটা আনন্দ আছে তাতো উপলব্ধি করেনি সে এর আগে। তার মনে পড়ল, সেই প্রথম দিনের কথা। যেদিন তার মনে এই অনুভূতির প্রথম জন্ম হয়।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সে তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। এমন সময় একটা কালো গাড়ি এসে থামল তাদের সামনে। একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ভারী সুন্দর চেহারা। চোখে মুখে একটা পবিত্রতার ভাব। তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'কেমন আছো তোমরা? ভালো তো?'

তারা কোনও উত্তর দিতে পারেনি। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাকে। ভদ্রলোকই তাই আবার হেসে বলেছিলেন: 'এসো। একটু বসে একটু আলাপ করা যাক তোমাদের সঙ্গে। একটু চা ও খাওয়া যাক।'

প্রস্তাব শুনে তারা খুব খুশি হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তারা গিয়ে বসল একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। ঘরটার এখানে সেখানে ছড়ানো ছেটানো অজস্র বই। কতো দেশ বিদেশের ইতিহাস। সেই ভদ্রলোকটিকে ঘিরে তারা বসেছিল অনেকক্ষণ। অনেক কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। এক সময় তিনি তাদের জন্মভূমির দুর্দশার কারণগুলি ব্যাখ্যা করলেন তাদের কাছে। সেই ভদ্রলোকের প্রতিটি কথাই যেন তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। একটা আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছিল তার মন। স্বদেশভূমির কলঙ্ক মোচনের একটা দুর্মর আকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠেছিল তার মনে। ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—

'আপনার দেরি না হলে আরেকটু বসুন।'

'দেরি? দেরির কি আছে? সারাদিন তো আফিসের খোঁয়াড়ে দিন কাটে। তোমাদের সঙ্গে না হয় একটু সময় কাটালামই।'

দেখতে দেখতে অনেক সময় কেটে গিয়েছিল তাদের। খেয়ালই ছিল না, কখন বিকেল গড়িয়ে নেমেছিল সন্ধ্যা। সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছিল চার দিকে। এক সময় সেই ভদ্রলোকই বলেছিলেন—'এবার উঠতে হবে আমাকে। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'কাজ? অফিস তো ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।'

'অফিসের কাজ নয়। আরো অনেক বড় কাজ।' কথা শেষ করেই উঠে পড়েছিলেন তিনি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাস্তায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গাড়িটার দিকে।

ঠিক এই সময় একটা বন্দুকের গুলির শব্দে তারা চমকে উঠেছিল। একটা আর্তনাদের শব্দও ভেসে এসেছিল তাদের কানে ছুটে। গিয়েছিল তারা শব্দটা লক্ষ্য করে। কিন্তু একি? এ যে সেই ভদ্রলোক। মাটিতে পড়ে আছে তার নিষ্প্রাণ লাশটা। রক্তে ভেসে গেছে সমস্ত শরীর।

কেন? কেন? কেন? কি অপরাধ ছিল এই ভদ্রলোকের। দেশকে ভালবাসা কি অপরাধ? একটা তীব্র অক্রোশ টগবট করতে থাকল তার বুকের মধ্যে। সে প্রতিজ্ঞা করল, এই খুনের বদলা সে নেবেই। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ সে তুলবেই।

আর সেদিন থেকেই জেগে উঠেছে তার বুকের মধ্যে এই খুনের নেশা। এখন এ কাজ তার কাছে কেবল দায়িত্ব পালন নয়। তারো চেয়ে বেশি। তার অস্তিত্ব আর বিবেকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে এই নেশা।

অন্ধকারে সুয়েজের বুক চিরে সাপের মতো ফণা তুলে এগিয়ে চলেছে তাদের নৌকাগুলি। দাঁড়ের জল কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ একটা না···অজস্র। মনে হচ্ছে, যেন একটা বিরাট ছুরি দিয়ে জলের ন্যাড়-ভুড়ি কারা যেন কেটে ফেলছে। যে জলবিন্দুগুলি দাঁড়ের আঘাতে ছিটকে পড়েছে। সেগুলিকে মনে হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত।

দেখতে দেখতে নৌকো সুয়েজ অতিক্রম করে পাড়ে ভিড়ল। তারা

চুপে চুপে নেমে এল তীরে। সে গিয়ে দাঁড়াল সকলের সামনে। পকেট ভর্তি তার গ্রিনেড্। হাতে মেশিন গান। বালির উপর দিয়ে তারা চলতে লাগল। সামনে যে চারটি পরিখা কাটা হয়েছিল সেগুলিকে অন্ধকারে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। এদিকে তখন গোলাগুলি সমানেই চলছে।

তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। আর পঞ্চাশ গজের মধ্যে শত্রু শিবির। পরিখার মধ্যে বসে শত্রুসেনারা নিজেদের রক্ষা করছে। চারদিকে উঁচু বালির বস্তা। খুব আনন্দেই তারা সময় কাটাচ্ছে। ভাবতেই পারছে না, কতো কাছে তাদের মৃত্যু।

গোলাগুলি বন্ধ করার নির্দেশ পাঠান হল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। শত্রু সেনারা একটু হতভম্ব হল। ভাবল, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ওরা আজকের মতো ছুটি নিয়েছে। এদিকে তাদের সঙ্গে মূল শিবিরের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। প্রতিটি গেটে ফিট করা হল মাইন্। সমস্ত জগৎ থেকে আলাদা করে ফেলা হল তাদের শিবিরকে।

সে লাফিয়ে একটা পরিখার দিকে এগিয়ে গেল। ইচ্ছে সব কটাকে, খতম্ করার। একটা ধোঁয়া বোমা ছুঁড়ে মারল ওর মধ্যে। যাতে ওর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় লোকগুলি। আর তারপর···একটার পর একটা···দীর্ঘদিনের তৃষ্ণা নিবারণ করবে সে।

কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। শোনা গেল পাশের পরিখায় ফিস্ ফাস শব্দ। তারা কি বলছে, তা ঠিক বোঝা গেল না। সে দেখতে পেল, পরিখা থেকে একটা রাইফেল তার এক সহযোদ্ধাকে তাক্ করছে। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ওই রাইফেল লক্ষ্য করে সে গুলি ছুঁড়ল। একটা আর্তনাদের শব্দ নির্জন অন্ধকারে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তাহলে খতম হল একটা। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ দু'টি। সে আর একটা ধোঁয়া বোমা নিক্ষেপ করল আরেকটা পরিখায়। এবারও নানান্ রকম শব্দ শুনতে পেল সে। কিন্তু কেউই বেরিয়ে এল না।

এবার সে রাইফেলের নল ঘোরাল পরিখার দিকে। একটার পর একটা গুলি চালিয়ে যেতে লাগল। কান্নার শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ, কাঁতরানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল পরিখা থেকে। কটাকে যে সে খতম করল তার হিসেব পেল না। পকেট থেকে একটা গ্রিনেড বের করে ছুঁড়ে মারল পরিখার মধ্যে। একটা বিকট শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। তার কমেণ্ডার এগিয়ে এল তার কাছে। হাতে আর একটা গ্রিনেড তুলে দিল। সেটাকেও সে ছুঁড়ে মারল পরিখায়। আরো একটা বিস্ফোরণ।

তারপর সব চুপচাপ। কেবল কয়েকটি কাতরানির ক্ষীণ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না আর রীয়ার গার্ডদের এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। কি ভেবে আর রীয়ার গার্ডরা এগোল না।

আবার নেমে এল স্তব্ধতা। এবার ফেরার পালা। সুয়েজ অতিক্রম করে ফিরে যেতে হবে তাদের নিজস্ব শিবিরে। আহতদের টেনে নৌকোয় তোলা হল। সংকেত পাঠান হল ওপারে। একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা কামান। বিজয়ী সৈনিকরা নৌকা ভাসাল সুয়েজের বুকে। আবার দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ। হাত ভরে সে এক অঞ্জলি জল তুলে নিল। আঃ কী আরাম। যেন যাদু আছে এর মধ্যে। এতদিনের সব তৃষ্ণা তার দূর হয়ে গেল।

নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। সে লাফিয়ে পড়ল নিচে। একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করতে থাকল সে। দেখতে দেখতে পুবের আকাশটা ফর্সা হয়ে এল। অন্ধকার হাল্কা হয়ে কেবলই সরে যেতে থাকল দূরে। আলোকে এখন সে আর ঘৃণা করে না। নতজানু হয়ে সে আবাহন করল নতুন সূর্যোদয়কে।

সপ্তাশ্বরথে আবির্ভূত হলেন সূর্য দেব। বিধ্বস্ত শিবিরের পেছন থেকে ঝলমল হাসিতে ভরিয়ে দিলেন সারা পৃথিবী। মরুভূমির বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল তার শুভ আগমন সংবাদ। সুয়েজের জলে লেপটে পড়ে চিক চিক করতে থাকল তার সোনালী উত্তরীয়।

সকালে শিবিরে বসে তারা ব্রেক-ফাস্ট করছিল। সে দেখতে পেল, একটা পিঁপড়ে তার বন্ধুর গা বেয়ে উঠছে। সেটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বন্ধুটি পা বাড়াল মারতে। চিৎকার করে উঠল সে। ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল বন্ধুর পা টা।

'কি ব্যাপার?' আশ্চর্য হল বন্ধুটি।

'এটাকে মারছ কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এতো একটা পিঁপড়ে।'

'তা হোক। কিন্তু এটাতো কোনও ক্ষতি করেনি তোমার।'

'তা অবশ্য করেনি। কিন্তু···

'কিন্তু এই হাতে যে এতগুলিকে খতম করল কাল রাতে, সে একটা পিঁপড়ের জন্য এত ছটফট করছে কেন? এইতো?' বলে উঠল সে।

'হ্যাঁ, ভাবছি তাই। তুমি আশ্চর্য করলে আমাকে।'

আশ্চর্য হবার অবশ্য কিছুই নেই। এতো পরিবর্তনের মধ্যেও কয়েকটি মূল্যবোধ তার মনে সঠিক গাঁথা হয়ে আছে। জীবনের জন্যই তো জীবন দিয়ে জীবন নিয়ে তার এই সংগ্রাম।

হাটের মানুষ

তপোবিজয় ঘোষ

হাটের ও-পাশে তেঁতুল গাছটার তলায় আজ আবার কি নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে। এক সঙ্গে অনেক-গুলো মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওখানে। বুড়ো ভগীরথ ঘাড় উঁচিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। তারপর সামনের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'হেই বাপ্, গোল কিসের হুথাকে ?'

লোকটা জবাব না দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে ভগীরথ উৎসুক হয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পড়ন্ত বিকেলে হাট জমজমাট। চারপাশের গাঁ থেকে মানুষ জন জড়ো হয়েছে। পুরো এক হপ্তার যাবতীয় কেনাকাটা এই হাটেই। শনিবার পার হলে ফের আরেক শনিবারে এই হাট। সপ্তাহে একদিন। এই একটা দিনেরই মুখ চেয়ে থাকে চার পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ। কেননা এ তল্লাটে এত বড়ো হাট আর কোথাও বসে না। এত বেচা-কেনা, এত রকমারি জিনিসপত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই একটা হাটের উপরেই তাদের ঘর সংসার, রুজি রোজগার, চাষ আবাদের অনেক কিছু নির্ভর করে। হাটে কাঁচা আনাজ পত্র আসে, চাষী পরিবারের বউ ঝিরা ঝুড়ি ভর্তি করে আনে যে সব। তার বিক্রি বাট্টার উপরেই তাদের এক হপ্তার চাল ডালের যোগাড়। শহরের আড়ৎ থেকে মহাজনরা গম চিনি তেল নিয়ে আসে। ভিন্ গাঁয়ের দেহাতীরা গরু ছাগল বেচতে কিংবা কিনতে আসে। দা বঁটি খন্তা কোদাল সমেত চাষের জন্য দরকারী লোহার সরঞ্জাম আসে, প্লাস্টিকের বাসন পত্র, তাঁতের কাপড় গামছার দোকান, চীনামাটির কাপ ডিশ, সস্তা এলুমিনিয়মের কড়াই খুন্তি হাতা, মাটির বড়ো বড়ো গাম কিংবা জালা, চা মিষ্টি তেলেভাজ দোকান—রাজ্যের জিনিস জড়ো হ যদি কিছু কিনতে চাও তো এই হা যদি কিছু বেচতে চাও, তরিতরকারি পুরানো লোহা, ভাঙ্গা কাঁসা পিত কিংবা ঘরের ছাগল ভেড়া তো এই হা মরচে পড়া পুরনো জিনিসে যদি শ দিতে চাও তো এই হাট, রোগের জ শিকড় বাকড় কিংবা টোট্‌কা ও খুঁজলেও এই হাট। হাট না বস পাঁচ গাঁয়ের মানুষের হাঁড়ি অচ সংসার কানা। সকাল থেকেই হাটে শুরু। বেলা যত বাড়তে থাকে হাট তত জমতে থাকে। পায়ে পায়ে লা ধুলো উড়ে আকাশে ঢাকা পড়ে। সন্ধ্যা মুখে গ্যাস লাইট, লণ্ঠন আর হ্যাজাকে আলোতে বিস্তীর্ণ ভূমি ঝলমল করে বট পাকুড় তেঁতুলের পাতা লা ধুলোতে ছেয়ে থাকে, তার উপ আলোর রেখা পড়ে কাঁপতে থাকে রুক্ষ ধান মাঠ থেকে হু হু করে বাতা ছুটে আসে। পচাই মদের দোকা থেকে মাতালের হৈহল্লা গান চীৎকা শোনা যায়। জটাজুটধারী এক সন্ন্যাস এক রকম উলঙ্গ হয়ে ত্রিশূল হাতে ঘুরে বেড়ায় আর ভয় দেখিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষে আদায় করে। একটা বাউ বেসুরো গলায় প্রাণপণ চেঁচিয়ে গান করে, 'হাটে এলাম পঞ্চজনা, কিনব বলে কাঁচা সোনা—' ছ'দিন ঝিম্ মেরে পড়ে থাকার পর হঠাৎ নৈঃশব্দ কাটিয়ে গোটা অঞ্চলটা যেন প্রাণ কোলাহলের আবেগে থৈ থৈ করতে থাকে।

এই তল্লাটের সবচেয়ে পুরনো মানুষ ভগীরথ। হাটের ভিড়ে লাঠিতে ভর দিয়ে থুপ থুপ করে হাঁটতে হাঁটতে সে বলে, 'ছুটকালে দেখেছি দেড়কুড়ি দুকুড়ি গরু বইসত কি না বইসত। সাঁঝ হলেই থাঁ থাঁ—শ্যাল কুকুরের জুড়ি। এখুন দ্যাখ কেনে পোখুর যেন সুন্দরী হুঁইনছে। লুকে লুকে কারণ্যি—টুগচি পা ফেলার ঠাঁই নাই গো।'

বুড়ো ভগীরথ স্মৃতি থেকে পুরনো কালের হাটের কথা বলতে পারে। হাটে এসে চেনা-অচেনা লোক ধরে সব কথা শোনানো তার অভ্যাস। হাটে না এলে, আর এসব কথা পাঁচ জনকে শোনাতে না পারলে তার বড় কষ্ট হয়। এত বড় হাটে বুড়ো ভগীরথের কথা শোনার লোকেরও অভাব হয় না। পুরনো আমলের কথা শুনতে কে না ভালবাসে। ভগীরথ হাট তলায় এসে যেখানে বসে তার চারপাশে কিছু মানুষ আপনা থেকেই জুটে যায়। মুনিষ মাহিন্দার শ্রেণীর মানুষ। জমিতে মজুর খাটে কিংবা রামির কাজ করে। হয়ত কাজের সন্ধানে হাটে এসেছিল, কিছু না জোটায় কেনো মুখে ঘুরতে ঘুরতে ভগীরথের কাছে এসে বসে পড়ে। তাদেরই কেউ জিজ্ঞেস করে, 'জ্যাঠা এখুন তুমার বয়স ক'কুড়ি ?'

ভগীরথ বলতে পারে না। দন্তহীন বাদাটে মাড়ি বের করে হাসে, 'সি কি আর হিসেব করে রেখেছি বাপ্।' তারপর একটু ভেবে বলে, 'সেই যি গো যবার মজুন্দার বাবুর লুকেরা আমাদের বেবাক ঘরবাড়ি পুড়ায়ে দলেক, সিই ত্যাখুন আমি মায়ের প্যাটে। ছুটো পালাতে গিয়েই তো থান মাঠের মধ্যিখানে মা আমাকে জন্মো দিলেক—'

এ ঘটনা যারা জানে তারা মনে মনে ভগীরথের বয়সের একটা হিসেব করে নেয়। যারা জানে না তারা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সি ট কি ব্যাপার বটে জ্যাঠা?' ভগীরথ তখন হাটের কথা ছেড়ে তার জন্মের কথা শোনায়। সে কতকাল আগের কথা। জমিজরেতের খাজনা আদায় নিয়ে সেবার ভারি একটা গোলমাল বেঁধেছিল জমিদারের সঙ্গে। মজুমদারবাবুরা দুজন চাষীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারি বাড়িতে পিটিয়ে মেরেছিল। তাদের একজন ছিল সাঁওতাল। খবর পেয়ে বুনো সাঁওতালেরা তীর ধনুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। ভগীরথের বাপ কাকারাও ছিল তাদের সঙ্গে। মজুমদাররা ভয় পেয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে মিটমাট করেছিল। কিন্তু আক্রোশ মেটাতে আগুন দিয়েছিল ভগীথদের পাড়ায়। সে আগুনে গোটা গাঁ পুড়ে গেল। পুকুরগুলো পাহারা দিয়ে রাখল মজুমদারের লোকেরা। জল পাওয়া গেল না। এত বড় অগ্নিকাণ্ড এ তল্লাটে আর কখনো হয়নি। ভগীরথ তার কথাই বলে। বলার সময় তার গলায় রাগ দুঃখের একটা থমথমে ভাব ফুটে ওঠে। যেন জন্মলগ্নের আগুনের জ্বালা আর উত্তাপ এখনো সে রক্তে বহন করে। আবার কখনো এই নিয়ে সে একটু গর্বও করে. 'আমি কি যেমুন তেমুন চাষা বটি! তুরাও চাষার বেটা কিন্তুক্ জন্মালি ঘরকে, আর আমার জন্মো দ্যাখ্ থান মাঠের মধ্যিখানে। আমিই জাত চাষা বটি, তুরা ভেজাল্' বলে বুড়ো ভগীরথ হা হা করে হেসে ওঠে।

এই ভগীরথ তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হাট দেখে আসছে। শৈশবে মার আঁচল ধরে আসত কেনা বেচা করতে। একটু বড়ো হতেই বাপ্ তার মাথায় লাউ কুমড়োর ঝুড়ি চাপিয়ে দিয়ে বলত, 'লে বেটা, লিয়ে চ হাটপানে।' দরদাম বুঝিয়ে কোনো একটা গাছতলায় তাকে বসিয়ে রেখে চলে যেত মাঠের কাজে। দিনভর দোকান সাজিয়ে বসে থাকত ভগীরথ। একটা গোটা লাউয়ের দাম তখন এক আনা, একটা কুমড়ো দু আনা ছ পয়সা। একটা তামার পয়সা দিলে এক ঠোঙ্গা মুড়ি পাওয়া যেত, এক আধলায় চারটে বাতাসা। ক্ষিধে পেলে ভগীরথ মুড়ি বাতাসা কিনে জল খেত। সে সব দিনের দরদামের কথা শুনলে হাটের মানুষ এখন হাঁ করে থাকে। বিশ্বাস করতে চায় না। সন্দেহে চোখ মুখ কুঁচকে এক সময় জিজ্ঞেস করে বসে, 'তা এতই যদি বেবাক সস্তা ছিল জ্যাঠা, তা সি সময় জমিজিরেত ঘরদরজা কিছু বানিয়ে লিলে না কেনে গো? তবে তো এখুন এন কষ্ট থাকত না।'

এখানে এসেই কেমন গোলমাল বাধে। প্রশ্নটার উত্তর এই বুড়ো বয়সেও দিতে পারে না ভগীরথ। ধাঁধায় পড়ে যায়। এত সস্তার দিনেও জমি-জায়গা হাল বলদ হয় নি কেন তাদের? পেট ভরে কেন খাবার জোটে নি। গায়ে জামা ওঠে নি? মহাজনদের দেনা শোধ হয় নি? তাহলে জিনিসপত্র সস্তা ছিল—এর অর্থটা কি দাঁড়াল? এখন সব আক্রা হয়ে গেছে বললেই বা কি বোঝায়? তখন তাদের যেমন কষ্ট ছিল' এখনো তো সেই একই কষ্ট। তাহলে? মূর্খ ভগীরথ শির-ওঠা কালো রোগা হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ব্রহ্মতালুতে আঁচড় কাটে আর খুব চিন্তান্বিত মুখে বলে, 'আসলে আমাদের, মানে মুনিষ মা'দ্দিরদের মজুরি টা কম ছেল যি, তার লেগেই—'

'সি মজুরি তো এখুনো কমই রয়েছে গো—'

'তা আছে বটে। তবে কি জানিস বাপ, সি সময় পয়সার এট্টা দাম ছেল—'

'এখুন নাই?'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ।' ভগীরথ দু'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে নাচায়, 'কি দাম আছে? এক পয়সায় এট্টা বিড়িও দেও না এখুন।' একালের ছেলে-ছোকরারা বুড়োর কাছে তর্কে হারতে চায় না। কালের ধর্মে কথা বার্তাও শিখেছে কিছু। হাটের ভিড়ে বসেই তারা ভগীরথের সঙ্গে তর্ক করে, 'না গো, জ্যাঠা, কথা ট ঠিক সয়। টাকা পয়সার দাম সি কালের যেমুন ছেল, ই কালেও তেমুনই আছে। দাম নাই যদি বল সি আমাদের জানমানের। সি কালেও ছেল না, ই-কালেও নাই।'

কথাটা বুড়ো ভগীরথের মনঃপূত হয়। সাদা রুক্ষ চুলের জট-পাকানো মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে দোলাতে বলে, 'হুঁ, হুঁ। ইট ঠিক বটে, ইট ঠিক বুলেছিস তুরা। এই দ্যাখ না কেনে; আমারই তো মায়ের প্যাটে পুড়ে

মরার কথা। তার লেগেই তো বাবুরা আগুন দিলেক। সিবার কত জনাই তো মরল।' একটু দম নিয়ে ভগীরথ আবার বলে, 'আমরা হলামগে জমিনের পুকামাকড়। ধানের দাম আছে, জমিনের দাম আছে, খড় বিচালিরও এটা দাম আছে, কিন্তুক চাষার জানমানের কুন দাম নাই।' এখন হাটে আর কিছু কেনাবেচা করে না ভগীরথ। সে বয়স কি সামর্থ তার নেই। ছেলেরা বড় হয়েছে। ক্ষেত খামারের কাজ করে, মুনিষ মাহিন্দার খাটে। এখন তারাই হাটে দোকান দিতে আসে। ভগীরথ হাট দেখে বেড়ায়। হাটের অনেক মানুষই তার চেনা। ছোট থেকে বড়ো হতে দেখেছে সে। কচিৎ সমবয়সী এক আধজনকে পেয়ে যায়। ভগীরথের ভারি আনন্দ হয় তখন। ছোট পুকুরের মতো হাটটা কালে কালে কেমন সমুদ্র হয়েছে তার কথায় দুই বৃদ্ধ ঘরে ফেরার সময় ভুলে যায়। ছেলে-ছোকরাদের কাছে বলে পুরনো দিনের জ্বালা যন্ত্রণা সুখ সৌভাগ্যের কথা। কথা বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে দেয়, 'দে, ইবার এট্টা বিড়ি দে দিকি বাপ। বিড়ি টানতে টানতে সে হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে যায়, 'হুঁই দ্যাখ, হুঁই যি বাউলট গান গেছে উয়ার বাপকে কালীতলার মাঠে সাপে কেটেছিল, এ ই এত বড় এটা তকখক সাপ—'

হাটে এসে ভগীরথ নিজের ছেলেদের এড়িয়ে চলে। ওরা যেদিকটায় বসে সে মুখো হয় না। কেননা ছেলেরা তাকে পালমন্দ করে। বলে, এই বুড়ো বয়সে দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে তার হাটে আসার দরকারটা কি? হাটে এসে কার কোন 'উবগারে' লাগবে সে? তার চেয়ে ঘরে বসে ভিটের গাছপালা, উঠোনের বাঁশঝড় আগলালে অনেক কাজ হয়। একটু রাত হলেই তো বুড়ো রাতকানা, খানাখন্দে ধুবড়ে পড়বে তখন। সে আর এক অশান্তি। ফেরার সময় হাত ধরে ঠুকুস ঠুকুস নিয়ে চল তাকে।

হাটে বাপকে দেখতে পেলেই ছেলেরা রাগারাগি করে, 'ফের এয়েছ তুমি? বারণ করলুম—।'

ধরা পড়া চোরের মত মুখ করে ভগীরথ ম্লান হাসে, 'আগ্ কারস নি বাপ্। গাঁ ভেঙ্গে সব্বাই এল, আমি একলা কি ঘরকে থাকতে পারি। মনট যি হাঁচোড়—পাঁচোড় করে। জীবনভর কতবার এলম এই হাটে—'

ছোট ছেলে রীতিমতো ধমকে ওঠে, ওঠে, 'কতবার এলম। যখুন এয়েছিলে তাখুন এয়েছিলে। এখুন আর আইসবে না।'

বুড়ো ভগীরথ বাধ্য সন্তানের মতো ঘাড় কাৎ করে, 'ও-হপ্তায় আর আইসব না। এই শাষবার। এখন দশটা পয়সা দে দিনি বাপ্, এট্টু ঝালমুড়ি খাই—'

আসবে না বলে বটে, কিন্তু আবার আসে। মাতালের নেশার মতন, নিশি ডাকা মানুষের মতন—দুপুরের দিকে সুর্য একটু পশ্চিমে হেললেই ভগীরথ লাঠিখানা নিয়ে আলপথে নেমে পড়ে। হাটবারে হাটে না এলে ভগীরথের মনে হয় জীবনটাই বৃথা। মনে হয়, এই ফাঁকা ঘর, শূন্য ভিটায় একাকী বসে থাকতে থাকতে একটু পরেই দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে। তার মৃত্যু নিকটে জেনেই গাঁ সুদ্ধু লোক তাকে বাতিল' করে ঘরে ফেলে রেখে হাটে চলে গেছে। সারা শরীরে তখন কি যে কষ্ট হয় ভগীরথের।

আসলে এই বয়সে নিজের বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহের জন্যই হাটে আসতে চায় ভগীরথ। হাটের থৈ থৈ করা ভিড়ে, এত চেনা জানা মানুষজনের মধ্যে ঘুরে ফিরে কথা বলে সে যেন দেহের বল আর মনের জোর সঞ্চয় করে। রাতের দিকে ঘরে ফিরতে তার খুবই কষ্ট হয় কিন্তু পরের দিন তাকে বেশ তাজা দেখায়। তখন সে দাঁ দিয়ে বাঁশ কাটতে বসে। বাঁশের পাতলা চাঁছি বের করে ঝুড়ি বোনে। পরের হাটে ছেলের বউরা ঝুড়ি বিক্রি করতে যায়। এখন হাটে খুব গোলমাল।

দিনে দুপুরে গোলমাল, রাতেও গোলমাল। বটুকদের দলটা কথায় কথায় হাটে এখন ছুরি বোমা বার করে মারামারি বাধায়। বড়ছেলের বউ ভগীরথকে বুঝিয়ে বলে, 'আর যেও নি তুমি। তুমাদের কালের, ছুটপারা হাট তো আর নাই, সে রীতনিয়মও নাই। এখুন কত ঝামেলা—'

বড় ছেলে বলে, 'একট বুমা ফাটলে তুমি তো ছুটতে লারবে, খানাখন্দে পড়ে চিঁচাবে কেবল—'

ভগীরথ বলে, 'হঁ। যাব নি। তুরা যা। আমি থাকলম ঘরকে।' ছেলে, ছেলের বউরা চলে গেল ফাঁকা ভিটায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে ভগীরথ। তারপর বেলা যত বাড়তে থাকে তার পা জোড়ায় কিসের কষ্ট যেন ততই চেপে নামতে থাকে। যেন শরীরের সব জল আর রক্ত চুঁইয়ে পা দুটোতে নেমে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে যায়। মনে হয়, এখুনি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা চলা না করলে সর্বনাশ। তাহলে চিরকালের মতই অসাড় আর পঙ্গু হয়ে যাবে সে। বাঁশের খুঁটি ধরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় ভগীরথ। মাটির দেয়াল ধরে থুপ থুপ করে হাঁটে। তারপর একসময় দেখা যায়, ধান মাঠের সরু আলপথ ধরে সতর্ক প ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে জটপাকানো পাকাচুল মাথার একটা লম্বাটে মানুষ, বয়সের ভারে সে কুঁজো হয়ে হাঁটছে, তার উদোম খড়ি ওঠা শরীর, পরণে এফফালি ময়লা ন্যাকড়া নেংটির মতো জড়ানো, রোদের ছটা থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য সে বাঁহাতের থাবা কপালের উপর মেলে ধরেছে, একখানা খাটো গামছা জড়ানো আছে তার মাথায়, ডানহাতের মুঠোয় তেলেজলে শক্ত গিঁটওলা বাঁশের লাঠিখানা। ভগীরথ হাটের দিকে হাঁটছে—সেই পুরনো জম জমজমাট হাট আর নেই। হাটে এখন নিত্যই গোলমাল। কিন্তু ভগীরথের ভ্রূক্ষেপ নেই। গোলমালে তার মতো বুড়ো মানুষের কি ক্ষতি হবে। বরং ভয় ভাবনা তো তার যোয়ান বয়সী ছেলেদের নিয়ে, তার ছেলের বউদের নিয়ে। হামলা করলে বটুকেরা তো তাদের উপরেই করবে। হাটে তো তাদের যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তারা আছে। ছেলে গেছে, ছেলের বউরা গেছে। সে কিনা বাপ হয়ে ঘরে বসে থাকবে। তবে একটা কর্তব্যজ্ঞান নেই। সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভগীরথ সাধ্যমত জোরে জোরে পা চালায়। কে জানে হাটে এতক্ষণ কি কাণ্ড বেধে গেছে।

হাটের খবর ভগীরথের অজানা

কিছু নেই। রণপুরের সাহা আর মজুমদারের ছেলেরা দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। বছর তিনেক আগে ওই দলটাই গাঁয়ের ভোটের ঘরে বোমা মেরেছিল, ভোটের বাক্স চুরি করেছিল। ওদের ভয়ে ভগীরথের পাড়া থেকে কেউ ভোট দিতে যেতে পারে নি। তারপর রণপুরের স্কুল মাস্টার ব্রজেন পাড়ুই ওদের হাতেই খুন হল। লোকটা নাকি চাষাদের নিয়ে দল বাঁধত। মাঠের মধ্যে তার কাটা ধর আর মুণ্ড পাওয়া গেল। এখন ওই দলটাই হাটের উপর ভর করেছে। তাদের ভয়ে গোটা হাট তটস্থ।

ভগীরথ দেখেছে তাদের। জনা দশ বারো ছোকরা। মাথায় কাকের বাসার মত ঝাকড়া মাকড়া চুল, মুখগুলো ভীমরুলের চাকের মত, গায়ে লাল নীল ডোরাকাটা জামা, কোমরে সাপের চামড়ার বেল্ট—ফি হাটবারে বল বেঁধে এসে তারা হামলা করে।

হাটের ডাঙা জমি মজুমদারদের। এতদিন তাদের লোক এসে বস্তা ধরে 'তোলা' নিয়ে যেত। তরিতরকারি, চালডাল, পয়সাকড়ি। এ নিয়েও হাঙ্গামা হুজ্জতি হত—তবে তার একটা নিয়মকানুনও ছিল। হাতে পায়ে ধরলে কিছু রেহাই পাওয়া যেত। মনোমত তোলা দিতে না পারলে ঘাড় ধরে উঠিয়ে দিত হাট থেকে কিন্তু তারা চলে গেলে আবার এসে বসা যেত। একবার ভগীরথের সঙ্গেও হাঙ্গামা বেঁধেছিল তাদের। ঘরে ছাগল রেখে তিনটে বাচ্চা পেয়েছিল সেবার। তার একটা খাসি বানিয়ে হাটে বেচতে এনেছিল। মজুমদারদের লোক এসে বললে, 'এক টাকা তোলা দাও।' ভগীরথ বললে, 'ছুট খাসি, এক টাকা দিব না, আট আনা লিবেন।' তারা বললে, 'ঠিক আছে বারো আনা দাও।' ভগীরথ বললে, 'লিবেন গো, লিবেন। আগে বিচতে দ্যান কেনে।' তোলা আদায়ের লোক দু'টো ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'না, এখুনি দাও।' ভগীরথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইত ভালা মজারে, এখুন কুথাকে পাব? তিন সিকি কি লিয়ে এসেছি ট্যাঁকে গুঁজে।' 'তবে ওটা কখুন বেচা হবে তার লেগে তুর পেছাতে চৌপহর আমরা খাট পেতে বসে থাকব রে শালো!' বলে একজন এক ঝটকায় খাসির দড়িটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটা ধরল। ভগীরথের তখন ষোয়ান বয়স, তার উপর ঘর-জ্বালানো অগ্নি কাণ্ডে শীতের শক্ত ধান মাটিতে তার জন্ম, মজুমদারদের উপর একটা চাপা আক্রোশতো তার রক্তেই আছে, বোধকরি তারই তাড়নায় সে ও তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দড়িটা আবার ছিনিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'উঁহু, লিতে লারবে। ই হাতের জিনিস কেড়ে লওয়া অত সুজা লয়।' একটা হৈ হৈ ব্যাপার। তোলা আদায়কারী লোক দুটোর সঙ্গে লাঠি হাতে পাইক—তারা একসঙ্গে ভগীরথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। হাটের অন্য লোকেরা মাঝখানে পড়ে সামাল দেয়। তাদেরই কেউ একজন তিনটে সিকিও দিয়ে দেয়। এতকাল এই নিয়মেই চলে আসছিল। এখন বুট কেরা এসে সব উলেসেট দিয়েছে। এখন মজুমদারগুষ্টির ছোটতরফ হাটের দখলদার। কালীতলার সাহা গুঁড়িদের হাটতলায় দশবিঘা জমি ইজারা দিয়েছে তারা। সেই জমিতে পচাই মদের পাকা দোকান হয়েছে, কয়লার আড়ত, কাঠগোলা হয়েছে। হাট বার ছাড়াও এসব খোলা থাকে। সাহাদের ছেলে বটুক আর তার সঙ্গীদের ওখানেই আড্ডা।

হাটবারে ওরা দলবেঁধে টাকা আদায়ে নামে। 'তোলা' নয়, তার জন্য অন্য লোক আছে। তোলার বাইরে অতিরিক্ত আদায়। বটুকেরা বলে, চাঁদা। কিসের চাঁদা? না, হাট রেদের হাটে জন্য টিউবওয়েল বসানো হবে, বিশ্রামের জন্য আটচালা হবে, বটতলায় 'বাবার থানে' মন্দির উঠবে, বর্ষাকালে গাড়ী আসার জন্য রাস্তা পাকা হবে। আসলে কিছুই হয় না। জুলুম করে টাকা তুলে ওরা দল বেঁধে ফূর্তি করে। শহরে গিয়ে মদ মাংস খায়, সিনেমা যাত্রা দেখে মাগীদের ন্যাংটো নাচ দেখার জন্য কলকাতায় ছোটে। হাটের সব মানুষই জানে এসব, ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। ভোটের ঘরে বোমা আর ধান মাঠে ব্রজেন সাহার ধড় মুণ্ড আলাদা দেখার পর থেকে সবাই কেমন বোবা বনে গেছে। তারা কেবল ভয়ে ভয়ে বটুকের মুখ দেখে। গাঁট্টা গোট্টা চোয়াড়ে চেহারা, এই বয়সেই চোখ জোড়া গর্তে ঢুকেছে, ডান গালে থ্যাবড়া জড়ুল চিহ্ন, সে ছাপ মারা কুপন জাতীয় এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরে বলে, 'কই হে, দাও।'

গাঁয়ের চাষী, সের পাঁচেক পেঁয়াজ কি আদা নিয়ে বসেছে, ভয়ে ভয়ে একটা সিকি এগিয়ে ধরে খুশি করার চেষ্টায় এক গাল কষ্টের হাসি ফুটিয়ে বলে, 'ইবারে কি বানাবেন গো ছুটবাবু? পোখুর না মঠ?' সিকি দেখেই বটুকের মেজাজ গরম হয়। সে বিচ্ছিরি রকমের কালো দাঁত বের করে খিঁচিয়ে ওঠে, 'তোর পিণ্ডি বানাব শালো। ছাড়্, টাকা ছাড়। দু'টাকার কুপন দিয়েছি তোকে।' মানুষটা মিইয়ে গিয়ে বিড় বিড় করে, 'দিলেন কেনে বাবু। আমি গরীব মানুষ।' বটুক একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিয়ে বলে ওঠে, 'গরীব মানুষ! চামচিকের বাচ্চা সব! এখন শালোরা সাধু সেজে নেড়িকুত্তার মত কুঁই কুঁই করছ! সেবার যুক্তফ্রন্টের আমলে তোমরাই শালো বজেন সাহার কথায় আমার বাপের জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতেছিলে।' লোকটা আরো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'না ছুটবাবু, আমি পুঁতি নাই, সি গাঁয়ে আমার বাড়ীই লয়। আমি এজ্ঞে ফটিক, ছুঁই ন্যাড়া কদমপুরের ফটকে—' হাত পা ছুঁড়ে বাজখাঁই গলায় ধমক ওঠে বটুক, 'চো-প শালো! টাকা দিবি কিনা বল।' —দিতেই হয়। না দিলে ছাড়ান নেই। জিনিসপত্র সব টেনে আড়তে তুলবে। তারপর শুরু হবে মার। দরকার হলে ছুরিও বের করবে।

হাটে এত মানুষ কিন্তু আটকানোর কেউ নেই। কেন নেই হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে এখন সে কথা বেশ গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করে বটুক সাহা, 'শালোরা শুনে রাখ, এখন এই গাঁ ঘর, হাটবাজার সবআজ সব আমাদের।

থানা পুলিশ আমাদের গোলাম—আমাদের হুকুমের চাকর। আমরা যেমন বলব তেমন শুনতে হবে, তেমন করতে হবে।' বটুকের সঙ্গীরা সমর্থন জানিয়ে বলে, যে বাঞ্চাতে শুনবে না, পেঁচিয়ে খাল খিঁচে লিব তার।'

শুধু টাকা আদায় করেই ক্ষান্ত নয়। হাটে এখন কম বয়সী মেয়ে মানুষ আমার উপায় নেই। মুখখানা একটু সুন্দর আর হাতে পায়ে একটু ডাগর ডোগর হলেই সর্বনাশ। বটুকেরা ঠিক পেছনে ডাঁস মাছির মতো ঘুর ঘুর সুরু করবে। মুখে রকমারি শব্দ, রকমারি খেউড়। একটু সুযোগ পেলেই হাত ধরে, শাড়ীর আঁচল ধরে টানাটানি। হাটের হাজার লোকের মধ্যে দাঁত বের করে হেসে বলবে, 'রাগিস কেনে রে ছুড়ি। আলি তোকে বে করব।'

কদিন আগেই অন্ধকারে একটা মেয়ে মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। আলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে ধান মাঠে তার শরীর পাওয়া গেছে। উলঙ্গ, অচেতন শরীর। রণপুরের ডোমেদের মেয়ে। এ নিয়ে হাটে কদিন খুব উত্তেজনা। পুলিশের একটা জীপগাড়ী আসত সহর থেকে। সাহাবাবুদের আড়তের সামনে একটা পুলিশ বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। বটুকেরা জীপ গাড়ীর বনেটে বসে হাটের হাঁ করা মানুষদের দেখিয়ে দেখিয়ে চা আর সিগ্রেট খেত।

এ সব খবরই ভগীরথ শুনেছে। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা পুলিশের জীপগাড়ীও দেখেছে। উত্তেজনায় হাটের পাঁচজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, 'ই কি অনাছিষ্টি গো এমুন কাণ্ড কখুনো হয় নাই ই হাটে। ই শকুনেরা কুথা থেকে এল, কুন্ মায়ের প্যাটে জন্মাল—'

হাটের মানুষেরা তাকে সাবধান করেছে, 'হেই জ্যাঠা, চুপ যাও। চুপ যাও। শুনতি পেলি তুমাকেও ছাড়বে নাই। এখুন রা করা বারণ, চুপ যাও।'

ভগীরথ চুপ করে নি, চেঁচিয়েই বলেছে, 'কেনে, চুপ যাব কেনে? রা

হাটের মানুষেরা কাছে এগিয়ে এসে তাকে বুঝিয়েছে, 'এখুন সময় খুব খারাপ যি। শুন নাই, নতুন আইন বেরিন্‌ছে, জরুরি আইন, চেঁচিন কথা বুললেই ধরে নিয়ে যাবেক। হুঁই দেখছ না, পুলিশের গাড়ী, ডুমেদের ঘর থেকে তিনজনাকে কেমুন ধরে এনেছে।'

ধরে এনেছে? ডুমেদের ঘর থেকে? কেনে, ওদের ঘরের বিটিরই তো ধাম্মা নষ্ট হল। তবে?' ভগীরথ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। হাটের মানুষজন তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। বুড়ো মানুষ, কি বলতে আবার কি বলবে ঠিক কি। একের জন্য দশের বিপদ।

একদিন ভগীরথকেও হাটের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল ওরা। সেদিন ভিড়ের মধ্যে একজন কীর্তনীয়া খোল বাজিয়ে গান করছিল। তার বছর আষ্টেকের ছোট্ট মেয়েটা ঝমঝম করে করতাল বাজাচ্ছিল। তার সামনে মাটিতে একটা কাপড় পাতা ছিল। তাতে পয়সা পড়ছিল। খোল করতালের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ভগীরথ পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে কীর্তনীয়া তার চেনা। কদমপুরের হরি বোষ্টমের ছেলে রাসু বোষ্টম। ফোঁটা তিলক কেটে গাঁ ঘরে খোল বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করাই তার পেশা।

গানের মধ্যেই বটুকেরা এসে গেল। ছোট কুপনের মতো এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দুটো টাকা ছাড় বাবাজী!'

খোল থেকে হাত উঠিয়ে রাসু বোকার মত তাকাল, 'কিসের টাকা বাবু।'

বটুক হেসে বললে, 'তোমার বাপের বিয়েতে বাজি পুড়বে, তার টাকা। ফি হাটবারে অনেক পয়সা তুলে নিয়ে যাও তুমি। আজ কিছু ছাড় দেখি।'

রাসু বললে, 'ঠাকুরের নাম গান করি; ইয়ার লেগে হাটে তো কুনদিন তোলা লাগে নাই বাবু।' বটুক বললে 'এবার লাগবে।' বটুকের এক সঙ্গী এগিয়ে এসে রাসুর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'খোল বাজিয়ে আমাদের নামগান কর বাবাজী তাহলে 'আর লাগবেনা।' আর একজন দু'হাতের দশ আঙুলে চটাং চটাং শব্দে খোলের দু'দিকে ক'বার চাঁটি কষিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবাজী, কেষ্ট কেষ্ট না, বল, বটুকদাদা যুগ যুগ জীও, যুগ যুগ জীও—' বলেই আবার খোলে চটাং বোল তুলল। সবাই হেসে উঠল খ্যাঁক খ্যাঁক করে। রাসুর ছোট মেয়েটা ভয় পেয়ে বাপের হাঁটু খামচে ধরল।

বুড়ো ভগীরথ সব দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল,

'ই আপনাদের কেমুন ব্যাভার বাবু। সাধু বোষ্টম ফকির বাউলদের হাটে কুনদিন কি পয়সা লাগে। কখুনো লেগেছে?'

'শালো বুড়োটা কে রে!' বটুক ঘুরে তাকাল ভগীরথের দিকে। বটুকের এক চেলা, মনে হয় এই বিকেলেই দু'এক পাঁইট টেনেছে, চোখ জবাফুলের মত লাল, 'ভগীরথের থুতনি ধরে মুখটা নাচিয়ে দিয়ে বলল, 'কে বট হে তুমি, এই বাঞ্চোত—'

ভগীরথ রেগে উঠে হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমুন ধারা ছেলে তুমি। বুড়ো মানুষের গায়ে হাত দাও!'

'ওরে বাপস্, শালো ফোঁস করে যে!' জড়ানো গলায় কথা কটা বলেই সে ভগীরথের বুকে একটা থাবা বসাল, 'যা শালো, ভাগ।'

ভগীরথ এক পাশে টাল খেয়ে পড়ল।

এসব না-হক ঝামেলায় বিরক্ত হয়ে বটুক বলল, 'ছাড়্ রে, দুস্‌রা জায়গায় চল্।'

ভগীরথ তখনো মাটিতে বসে রাগে দুঃখে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তার লাঠিটা এক পাশে ছিটকে পড়েছে। হাটের লোকজন এসে তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

লোকের মুখে মুখে কথাটা ভগীরথের ছেলেরাও শুনল। সেদিন ঘরে ফিরে তুমুল ঝগড়া। বড় ছেলে বলল, 'তুমার লেগে হাটে যোয়া বন্ধ হবে আমাদের।' ছোট ছেলে বলল, 'দুকানের লেগে আর জায়গা দিবে না। মাল পত্তর লুটে লিবে।' বড় ছেলের বউ বলল, 'কেনে শুন না তুমি? হাটে কি মধু আছে তুমার?' ছোট ছেলের বউ বলল, 'ভাগের জমিন্ থেকেও

ছাড়াইন্ দিবে—তখন কুথাকে যাবে শুনি ?'

ভগীরথের বুকে তখন তুষের আগুন জ্বলছে। ওইটুকু এক ছোক্‌রা, বলতে গেলে নাতির বয়সী, সে কিনা গায়ে হাত তুলল। কোথায় ছেলেরা রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিকার করবে, তা না, উল্টে তাকেই দোষের ভাগী করা।

বড় ছেলে তড়পে উঠল, 'সি দেখার দায় তুমার লয়।'

ভগীরথ বলে গেল, 'ঘরের বিটি ছেলারা হাটে যেতে লারছে, শ্যাল কুত্তাগুলান মাঠে টেনে লিয়ে উয়াদের ধম্মো লষ্ট করছে—'

ছোট ছেলে বলে, 'যার করছে তার করছে, তুমার কি ?'

ভগীরথ রেগে ওঠে, 'কেনে, শালো, তুর ঘরে কি বউ নাই ? বিটিছেলা লয় সে ? হাটে যায় না ?'

'আমারের বউ বিটি আমরা সামাল দিব।'

'হু, সামাল দিবি।' ভগীরথ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মানুষ বটি তুরা ? তুদের গায়ে মানুষের 'অক্ত' আছে ? আমার মুয়ানি কালে এমন কাণ্ড হলে—'

'কি ? করতে কি তুমি ?'

'সব শালোর মুণ্ড কেটে মাঠে পুঁতে রাখতম।'

বাপের রাগ থেকে বড় ছেলে এবার হেসে ফেলে, 'হ, খুব বাহাদুর বট তুমি।'

ভগীরথ থামে না, সমানে চেঁচাতে থাকে, 'আগুনের মধ্যি ধান মাঠে আমার জন্মো। আমি কোন শালোকে ডরাই। সিবার ধান কাটার সময় বাবুদের একটা লুককে—'

বড়ছেলে বাধা দেয়, 'জানি। অ্যানেক বার বুলেছ। পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলে। লাগে নাই।'

'কিন্তুক সে শালো আর কুনদিন মাঠে কাজ দেখতে এসে বিটিছেলার পিছু লাগার সাহস পায় নাই।'

এবার বড়ছেলে ঠাণ্ডা মাথায় বাপকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'সি সব দিন কাল আর নাই। এখুন কথায় কথায় বুমা ছুরি। কে লাগবে উয়াদের সঙ্গে ? এখুন চুপ মেরে থাকতে হবে। আবার যখুন সময় আইসবে তখুন শুধু উঠিন্ লিব। ছেড়ে দিব নাকি ?'

ভগীরথ বলে, 'হু, সময় আইসবে। তুদের আবার সময় আইসবে।' খোঁচা খেয়ে ছেলেরা আবার রেগে ওঠে, 'আসুক না আসুক, আর হাটে যাবে না তুমি।' আগুতে অ্যানেকবার বুলেছি, আজ শ্যাষ কথা শ্যাষবার বুলে দিলম, আর কুনদিন যাবে না।'

ভগীরথ জবাব দেয় না, ওম্ মেরে বসে থাকে। জন্ম লগ্নের আগুনের উত্তাপে তার বুক চিড়্‌বিড়্ করে পোড়ে। কিন্তু সেই পোড়ানির ওষুধ কোথায়, সে জানে না। তার ছেলেরাই কি জানে !

আজও যথারীতি হাটে এসেছে ভগীরথ।

কিন্তু আজ রড়তলির হাটের সে জৌলুস নেই। গোলমালের ভয়ে হাটের মানুষ এখন সন্ধ্যা নামতে না নামতে ঘরমুখো হতে চায়। বিশেষ করে কমবয়েসী মেয়ে বউরা। ডোম-পাড়ার মেয়েটার ওই দশা ঘটার পর থেকে সোমত্ত বউঝিদের বুক কাঁপে। হাটের অন্ধকারে তারা যেন লুকনো বাঘের থাবা দেখতে পায়। সূর্য ডুবলেই মালপত্র গুটিয়ে ঘরের মুখে ছুটতে থাকে।

এখন হাটে তেমন জিনিসপত্রের চলও নামে না। আগে শহর থেকে গাড়ী বোঝাই মাল নিয়ে আসত ব্যাপারীরা। তারা অনেকেই আসা বন্ধ করেছে। একটা নাগলদোলা আসত, ম্যাজিকের তাঁবু পড়ত, মালি পাড়ার সঙ্ নাচ আসত—আর আসে না। মাদল আর বাঁশির তালে তালে সাঁওতাল মেয়েপুরুষেরা হাটের মধ্যেই নাচ দেখাত, গান করত—কীর্তনীয়া আসত, বাউলেরা আসত—এখন তাও বন্ধ হয়েছে। রড়তলির হাট এখন আর যেন হাট নয়, শান বাঁধানো চত্বরে শহুরে বাজার। হাসি গান আনন্দ নেই, শুধু দরদাম আর কেনা বেচা। হাটের সবটুকু আনন্দ নিঃশেষে শুষে নিয়েছে ওই বটুক সাহার দলটা। হাটটাকে রক্তহীন বিবর্ণ করে তুলেছে—

গাঁয়ের হাটুরে মানুষেরা বলে, 'পুকা লেগেছে, ই হাটে এখুন পুকা লেগেছে—'

আরেকজন তার সংশোধন করে, 'পুকা লয়। শ্যাল বটে। দেখনি কেমুন শ্যালের পারা মুখগুলান্—'

হাটের সবচেয়ে পুরনো মানুষ ভগীরথ বলে, 'না বাপ, শ্যাল লয়, সি তো ভাল। সাপ বটেক্। দ্যাখছ না, কুলোপানা চক্কর ? শালোরা ফোঁস করেই আছে—'

হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলার কেউ সাহস পায় না। যদি বটুকেরা শুনে ফেলে ! হাট থেকে ঘরে ফেরার পথে তারা এ নিয়ে আলোচনা করে। দুঃখ করে বলে, 'আর আইসব না, ও শনিবারে ই হাটে আর আইসব না।'

'আমিও আইসব না।' আরেকজন যোগ করে, 'কি হবেক এসে। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে লেয়। বেগার খাটুনি—'

'আমার ঠেঁয়ে আজ তিন টাকা লিলে।'

'আমার ঠেঁয়েও তিনটাকা।'

'ও শালোরা যদ্দিন থাইকবে, আর আইসব না।'

মুখে বলে বটে কিন্তু আসতে হয়। না এসে উপায় নেই। এই হাটেই যে তাদের মরণ বাঁচন ! এই হাটেই যে রুজি রোজগার।

ভগীরথ পানুর চায়ের দোকানে একখণ্ড পাথরের উপর বসে মাটির খুরিতে চা খেতে খেতে হাটের কথাই ভাবছিল। হাটের এমন লোম ওঠা কারো মনেই সুখ নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পানুকে সে কথাটাই শোনাচ্ছিল ভগীরথ, 'ই হাটে এই শ্যাষ আসা। আমিও আর আইসব নি বাপ।'

'কেনে জ্যাঠা, কি হল ?'

'ই হাটের মা লখ্মি ছেড়ে গেছেন। এখুন শ্যালকুকুরের হামলা হামলি।'

পানু ঘাড় নাড়ে, 'কথাট মিথ্যে লয়, হক কথাই বটে।'

চায়ের খুড়ি ফেলে দিয়ে একটা বিড়ি চায় ভগীরথ। পানু বিড়ি দেয়। চা বিড়ির পয়সা লাগে না। পানুর বাপ ভগীরথের খুব বন্ধু ছিল। সেই সুবাদে পানুর কাছে এই খাতিরটুকু ভগীরথ আদায় করে। বিড়ি ধরিয়ে আবার কি একটা বলতে যায়, পানু হাত নেড়ে

চাপা গলায় তাকে সাবধান করে, 'চুপ যাও। হুঁই দ্যাখ দ্যাব্‌তারা টঅলে বেরিন্‌ছেন—'

অর্থাৎ বটুকেরা টহলে বেরিয়েছে। ছোটখাটো দলটাকে হাটুরে মানুষের ভিড়ের ফাঁকফোঁকড় দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। ভগীরথের মুখ কালো হয়। বুকের মধ্যে চিড়বিড় করা দুষের জ্বলুনি। হ্যাঁ, সেই শালোকেও দেখা যাচ্ছে যে সেদিন তাকে ঠেলে ফেলেছিল। এই শ্যালকুকুরেরা আজ যায় কুন্‌দিকে যায়—

একটু পরেই তেঁতুলতলায় গোলমাল পাকিয়ে উঠল। হাটের কিছু মানুষ ছুটে গেল ওদিকে। গোল হয়ে জমাট বাঁধল। তারপর ভয় পেয়ে মুখ কালো করে কেউ কেউ আবার অন্যদিকে দ্রুত সরে পড়তে লাগল। পানু চাপা তিক্ত গলায় বলে উঠল, 'হুঁই দ্যাখ জ্যাঠা, সাপগুলান একটা ব্যাঙ্‌ ধরেছে!'

ভগীরথ শক্ত হয়ে বসে থাকল। ও সব ভিড়ে গোলমালে সে আর যাবে না; তার যাওয়া উচিত নয়, ছেলেরা দেখতে পেলে গালমন্দ করবে, তার নিজেরও হেনস্তা হতে পারে—এসব সাতপাঁচ ভেবেই সে যেন মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ধৈর্য রাখতে পারল না ভগীরথ। ওদিকে গোলমালটা আর একটু পাকিয়ে উঠতেই ভগীরথ লাঠিখানা হাতে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

পানু বলল, 'হেইগো, তুমি যেছ কুথা?'

ভগীরথ জবাব দিল, 'টুপ্‌চি দেখি কেনে, ব্যাপারট কি বটে!' বলে সে গুটি গুটি এগুল।'

হ্যাঁ, বটুক সাহাই বটে। তেঁতুল তলার মধ্যিখানে উঁচুমত চিবিটার উপর কোমরে হাত দিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন যুদ্ধ পরিচালনা করছে। ওদিকে তার সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন একটা তামাটে রোগা মানুষের দু'টো হাত শক্ত করে ধরে মোচড় দিচ্ছে। লোকটা যন্ত্রণায় আঁ আঁ করছে। যে ছোকরা ভগীরথের থুতনি ধরে ঝাঁকিয়েছিল, সে লোকটার জামার পকেট প্যান্টের পকেট হাতিয়ে কি যেন খুঁজছে। ভিড় ঠেলে ভগীরথ আর একটু কাছে যেতেই লোকটাকে চিনতে পারল। পরাণ মণ্ডলের ছেলে, ইঁদুর-উকুন মারা বলাই। গায়ে খাকি জামা, পরণে খাকি প্যান্ট। জামায়-প্যান্টে গোটা দশেক পকেট। তাতে সস্তার কলম, লটারির টিকিট, ন্যাপথলিনের প্যাকেট, চিরুণী ঠাসা। সারা শরীরে মালার মতো ঝুলছে সেপ্‌টিপিন, চুলের কাঁটা, ছুঁচ, ছোট কাঁচি-ছুরি, চাবির রিং। এ সবের সঙ্গে আছে ইঁদুর উকুন ছারপোকার মারার ছোট ছোট ওষুধের প্যাকেট। কাঁধে ঝোলানো ঢাউস থলিটায় সে সব মজুত থাকে। দুহাতের থাবায় তার কিছু উঁচু করে ধরে চলমান একটা দোকানের মত সে হাটময় ঘুরে বেড়ায় আর চিলের মত চীৎকার করে, 'ইঁদুর মরবে, উকুন মরবে, ছারপুকা মরবে—' এসবের বিক্রি ভালই হয়। গাঁ ঘরে ইঁদুরের উৎপাত খুব। তরি-তরকারি ফসল নষ্ট করে। মেয়েদের মাথায়ও উকুনের ঝাড়। মরে কিনা কে জানে—তবু হাটে এসে অনেকেই ওষুধ কেনে। এরই জন্য ওর নাম ইঁদুর উকুনমারা বলাই।

এখন বলাইয়ের চারপাশে অনেক-গুলো প্যাকেট মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পকেটের কলম—চিরুণী গুলোও মাটিতে ছিটকে পড়ছে। সেই ঢ্যাঙা ছোক্‌রা দুটো বলাইয়ের হাতে ক্রমাগত মোচড় দিচ্ছে। বলাই চেঁচাচ্ছে, 'আঃ আঃ ছেড়ে দ্যান···'

বটুক দাঁড়িয়ে বাঁকা হাসি হাসছে। সঙ্গী দুজন মোচড় দিয়ে বলছে, 'ইঁদুর মরবে। উকুন মরবে। বল্‌ বাক্কোত্‌ এবার কে মরবে? তুই মরবি, না তোর বাপ্‌ মরবে?'

যে পকেট হাতড়াচ্ছিল সে নানা জায়গা থেকে কিছু খুচরো পয়সা আর কয়েকটা নোট টেনে বের করে খুশির গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দেখ গুরু, একটা বিশ টাকার নোট!'

বটুক গম্ভীর গলায় হুকুম দিল, 'এবার ছেড়ে দে শালোকে—মোচড় খাওয়া হাত দুটো নুলোর মতো কোমরের দুপাশে ঝুলে পড়ল। হাউ মাউ করে এক রকম কেঁদে ফেলল বলাই, 'লিয়েন না বাবু, লিয়েন না। ওট ম'জনের টাকা, দেনা ওষুধে হবেক—' ততক্ষণে বটুকেরা অন্যদিকে হাঁটা ধরেছে।

কান্না থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বলাই। অবশ হাত দুটোর নড়া চড়া নেই। চোখে সর্বস্ব খোয়ানো দৃষ্টি। তাকে ঘিরে আছে হাটের মানুষজন। কিন্তু কেও কিছু বলছে না। সকলেই অস্বস্তি আর অশান্তিতে উসখুস করছে। পেটের কথা গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছে, আটকানো কথার চাপে কপালের শিরা ফুলে উঠছে, চোখের মণি দপ্‌ দপ্‌ করছে। ঘৃণা ভয় আতঙ্ক জড়ানো একটা স্তব্ধ থমথমে ভাব।

কয়েক মুহূর্তে এভাবে কাটার পর বুড়ো ভগীরথ পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। খুব কাছে এসে ডাকল, 'বলাই—'

ইঁদুর উকুন মারা বলাই আবার হাউমাউ করে উঠল, 'আমার সব লুটে লিলে গো!' ভগীরথ লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'লতুন লিলে? পরথম লিলে? উয়াদের বাপঠাকুদ্দার আমল থেকে ই খেলাই তো চেরকাল চলছে গো।' বলাই আবার ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমার তিনটে হাটের সারা দিনের ওজগার গো—' ভগীরথ তার কঁকানিতে কান না দিয়ে যেন আপন মনেই বিড় বিড় করল, 'মাঠের মধ্যি আগুনে আমার জন্ম। কিন্তুক হলি কি হবে আমার মধ্যে তো আর আগুন নাই, সব নিব্যে গেইছে। কিন্তুক তুরা তো বুড়া ল'স, যুয়ান মরদ, তুদের আগুন কেনে নিব্যে যেছে বাপ্‌! কেনে জ্বলতে লারছিস্‌ তুরা!'

ভগীরথের কথা বলাই ঠিক বুঝতে পারল না। করুণ চোখে তার মুখ দেখল। ভগীরথ এবার অস্থির অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'ইঁদুর উকুন লয় বাপ্‌, উয়ারা আর কতটুকুন ক্ষেতি করে। মানুষ মারার বিষ বিচতে লাগ্‌ বাপ্‌। গাঁ ঘরের চাষাগুলান সি বিষের ব্যাভার শিখুক—

বলে ভগীরথ ঘাড় মাথা উঁচু করে হাটের খড়ি ওঠা উদোম-গা কালো কালো মানুষের মুখ দেখে। যেন ব্যগ্র হয়ে তার কথার সমর্থন খোঁজে।

—*—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর পর্বের গল্প

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের রচনা আর উত্তর পর্বের রচনার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। বিশেষ করে তাঁর ছোট গল্প গুলির বেলায় এ পার্থক্য আরও বেশী প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম পর্ব বলতে আমরা বুঝি ১৯২৮ সাল (যে বৎসরে তাঁর প্রথম ছোটগল্প অতসীমাসী প্রকাশিত হয়) থেকে ১৯৪৩ ৪৪ সাল এই কম বেশী পনেরো ষোল বছরের রচনাকাল। আর উক্ত পর্ব বলতে বোঝায় ১৯৪৩ ৪৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ পর্যন্ত তাঁর জীবনের শেষ বারো তেরো বছর কাল। এই দুই পর্বের রচনার ধারার মধ্যে শুধু বিষয়গত পার্থক্যই নয়, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও অতিশয় স্পষ্ট। উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পের ক্ষেত্রেই যেন এ পার্থক্য অধিকতর সোচ্চার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বেলায় এমনতর পর্ববিভাজনের কারণ কী? কারণ এই যে, দুটি সুস্পষ্ট পৃথক মনোভঙ্গী পৃথক শুধু নয় বিপরীত মনোভঙ্গী, তাঁর এই দুই পর্বের রচনা রীতির মূলে সক্রিয় থেকে তাদের এক থেকে অন্যটিকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছিল। প্রথম পর্বের ছোট গল্পে তিনি ছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অন্তর্নিবেশী, আত্মরতি মূলক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী জটিল ও মর্বিড; আর শেষ পর্বের রচনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বহির্মুখ; সামুহিক চেতনায় দীপ্ত, সহজ ও অজটিল রচনা রীতির পক্ষপাতী, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিল্পী। প্রথম বয়সের লেখায় বর্ণিত চরিত্রগুলির মনোজীবনকে কেন্দ্র করে তাদের অসুস্থ কামনা বাসনা ও নির্জ্ঞান মনের কারিকুরিকে জটিল রীতিতে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁর কথা শিল্পের লক্ষ্য; আর শেষ বয়সের রচনায় তিনি ক্রমশঃ অন্তর্নিবেশ তথা নির্জ্ঞান নিরীক্ষণের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্য জীবনের বাইরের কর্মকাণ্ডকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐ সব কর্মকাণ্ডকেও আবার ব্যক্তির একক জীবনের স্তরে রূপ দেন নি, রূপ দিয়েছেন সামুহিক স্তরে, অর্থাৎ সমষ্টিজীবনের সীমায়। কোন একজন বিশিষ্ট সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন তা ছিল "জটিল ও কুটিল।"

এই বিশ্লেষণ মানিকের প্রথম জীবনের লেখা সম্পর্কে সর্বাংশেই প্রযোজ্য বলা যায় কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচনার ধারা সম্পর্কে বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা এই পর্বে মানিক অত্যন্ত সচেতনভাবে কুটিল মননের অভ্যাস পরিহার করেছিলেন, তার জায়গায় সোজা সরল ঋজুরেখ, এমনকি চাঁচাছোলা রচনা রীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের অন্ধকারে সাঁতার কেটে তিনি আর আগের মত তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, বারে বারে তাঁর কল্পনা বাইরের রৌদ্রালোকে ভেসে উঠতে চেয়েছে এই অধ্যায়ে, আর সেই রৌদ্রালোকও কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সীমানায় সীমিত নয়, গণজীবনের সুপ্রশস্ত পরিসরে বিস্তৃত। যে গণজীবন তিনি তাঁর শেষ পর্বের গল্পোপন্যাসে চিত্রিত করেছেন তা কিন্তু শোষক ও বঞ্চকের সকল অত্যাচার মুখ বুজে সওয়া নির্বিরোধ গণজীবন নয়, পক্ষান্তরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতে সমুজ্জ্বল গণজীবন।

এ দেশের সাধারণ মানুষ বলীর দর্পের কাছে বিনা আপত্তিতে মাথা নোয়ানোকেই তাদের নিয়তি বলে জানে, অত্যাচারীর প্রবল পরাক্রমের মুখে পড়ে পড়ে মার খাওয়াকেই তাদের অপরিবর্তনীয় ভবিতব্য বলে জ্ঞান করে। কিন্তু মানিক এদেশের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষগুলির এই পুরাতন পরিচিত গতানুগতিক ছকটিকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন তাঁর শেষ বয়সের গল্পগুলিতে। ব্যক্তিগত জীবনের স্তরে প্রতিকারবিহীন নিরুপায়তায় অযথা হা হুতাশ না করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাবানের কাছ থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত, নিজেদের ঐক্য শক্তিতে বিশ্বাস ও সংকল্পের দৃঢ়তা—এই সমস্ত বিভিন্ন লক্ষণে মানিকের শেষ বয়সের গল্পগুলি শুধু শিল্পকর্মই হয়ে ওঠেনি, সাধারণ মানুষের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকারও একটা পথের হদিস হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই পর্বের গল্পে শিল্প ও কর্মিষ্ঠতার এক চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাব, যা তাঁর আগের লেখায় কম বেশী অনুপস্থিত ছিল। মানিক এই পর্বের লেখায় শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্যার সমাধানেরও পথ বাতলে

দিয়েছেন। এটা তাঁর সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটা নয়া সংযোজন—নয়া আয়তন।

এ কথা অবশ্য সত্য যে মানিক তাঁর জটিল মননের সংস্কার এই পর্বেও পুরাপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি চেষ্টা করেছেন সহজ সরল হতে কিন্তু তাঁর মজ্জাগত স্বভাব জটিলতা এই অধ্যায়েও কোন কোন গল্পে তাঁকে চিন্তার জটে অস্বচ্ছ করে রেখেছে। যেমন তাঁর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত "কে বাঁচায়, কে বাঁচে,' 'সাড়ে সাত সের চাল' কিংবা 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্প তিনটিতে ভাগ্যহত সাধারণ মানুষের অনশন ও ক্ষুৎপিপাসার বেদনা চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করলেও মানিকের স্বভাবসিদ্ধ জটিল ও কুটিল মননের পশ্চাৎ টানের প্রভাব এখানেও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এমন কোন কোন গল্প আছে যেখানে তিনি এই জটিলতা-কুটিলতার পেছুটান পুরাপুরি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন "পেটব্যথা", "মাসি পিসি", "হারানের নাত জামাই," "ছোট বকুলপুরের যাত্রী", "শিল্পী", "আর না কান্না", "টিচার" প্রভৃতি গল্প। এসব রচনায় মানিক আত্ম খণ্ডন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অর্থাৎ ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তার অন্ধকার গহন থেকে নিজেকে মোচন করে তিনি এখানে পুরাপুরি মাত্রায় ঘটনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছেন, হয়ে উঠেছেন বহির্মুখ, বস্তুনিষ্ঠ, অ্যাকশন ধর্মী। চিন্তা থেকে কাজের জগতে উত্তরিত হয়েছেন। অযথা চিন্তা, অকারণ চিন্তা, এক কথায় চিন্তার আতিশয্য যে কোন কোন লেখকের রচনায় কখনও কখনও অসুস্থ মনোবিকারের কোঠায় গিয়ে পড়ে সেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বয়সের একাধিক গল্পোপন্যাসের ছাঁচ থেকে প্রমাণ করা যায়। এ কথার উদাহরণ স্বরূপে আমরা তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের হেরম্ব চরিত্র, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশী চরিত্র', "প্রাগৈতিহাসিক", "টিকটিকি", "সরীসৃপ", "কুষ্ঠরোগীর বউ" প্রভৃতি গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রণের উল্লেখ করতে পারি। মনোবিকলন অর্থাৎ মানুষের মনোবিকারের ডাক্তার সুলভ ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণে মানিকের এক অদ্ভুত উল্লাস ছিল, যার অসুস্থ প্রভাব তিনি ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠে এক সময়ে সুস্থতার জগতে পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম যুগে রচিত 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিতে কিংবা সরীসৃপ কিংবা টিকটিকি গল্পতে তিনি যে মর্বিড মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন শেষের যুগের লেখা মাসি পিসি কিংবা হারানের নাত জামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে তার ছিটেফোঁটা অবশেষও আর নেই। কেমন করে মানিকের শিল্পী জীবনে এই অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন শাধিত হলো সেটা একটা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করতে বসে প্রথমে যে কথাটা মনে উদয় হয় তা হলো মানিক তার কম বেশী সিকি শতাব্দী কাল স্থায়ী সাহিত্য জীবনে দুটি দৃষ্টিগ্রাহ্য আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আদর্শের দ্বারা; উত্তর জীবনে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা। মানিক যে পরিমাণে ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিকতাও অভ্যাস থেকে দূরে সরে গিয়ে মার্কসীয় চৈতন্যের প্রভাববৃত্তের মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই তাঁর লেখা ক্রমসুস্থ, ক্রমবাহির্মুখী, ক্রমসমাজ সচেতন হয়ে উঠেছে। তাঁর আত্মরতির মারাত্মক স্বভাব কেটে গেছে, দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে উত্তরোত্তর মাত্রায় সমষ্টিচেতনা, ঘটনাজীবিতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আবেগ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে যত বেশী সজাগ হয়েছেন তত তাঁর কলম ধারালো হয়ে উঠেছে, কলমের মুখে জেগে উঠেছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আকুতি। কোথাও কোথাও এই আকুতি বিদ্রোহের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। যেমন তাঁর মাসি পিসি, হারানের নাত জামাই, পেটব্যথা প্রভৃতি গল্পে। আমরা যদি সরীসৃপ আর টিকটিকি গল্পের জগৎ থেকে ওই তিন পূর্বোক্ত নামীয় গল্পের জগতের অভিমুখে রওনা হই তবে দেখব পাথরে-মাটি অত্যন্ত দীর্ঘ বিসর্পিত, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সাদা চোখে ঠাহর করা যায় না। দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তকে আলাদা করে রেখেছে। টিকটিকি গল্পে মর্বিডিটির চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে। সরীসৃপ গল্পে দুই মায়ের পেটের বোনের একের প্রতি অপরের যে উৎকট ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ও সর্বনাশা জিঘাংসার পরিচয় মেলে তেমন ব্যাপার একমাত্র অসুস্থ মনোবিকারের জগতেই ঘটা সম্ভব। পক্ষান্তরে মাসি পিসি, হারানের নাত-জামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে এমনতর মনোবিকারের লেশমাত্র নেই, বরং আছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এসেছে জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে। মনোবিকলন সর্বদাই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও অন্তর্নিবেশমূলক; পক্ষান্তরে বহির্মুখীনতা, ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী, সর্বদাই সমষ্টিজীবনের সঙ্গে যুক্ত। যতদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক রীতির হাতে ধরা হয়ে চলোছলেন ততদিন মানুষের সমষ্টিজীবনের সুখদুঃখ তাঁর চোখের আড়ালে ছিল; এই পর্বে তিনি কেবলই, অন্তঃলীন পরিক্রমায়, নিজের ও অপরের নির্জ্ঞান ও অর্ধজ্ঞান মনের গভীরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে লোকের অসুস্থ মানসিকতার তত্ত্ব খুঁজে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করাছলেন। নয়তো টিকটিকির মত গল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। সেই মানিকই কিনা পরে লিখলেন জনসাধারণের প্রতিরোধ-মূলক একাধিক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। যখন থেকে তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে আত্ম-কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটে সামূহিক চেতনার বিজয় ঘোষিত হলো তখন থেকেই তাঁর শিল্পদৃষ্টি প্রকৃত অর্থে খুলে গেল। এ যে কত বড় বিবর্তন তার আন্দাজ পাবো যদি মনে রাখি যে, ফ্রয়েড আর কার্ল মার্কস একে অন্যের থেকে দুই দূরতম প্রস্থান বিন্দু। দুইয়ের বিচরণ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় দর্শনের যুগ্ম পরিণাম ফল বলে মনে করেন। এ কথা ঠিক নয়। তাঁর সাহিত্য জীবনে ফ্রয়েড আর মার্কস দুইয়েরই প্রভাব স্বীকৃত, তবে এককালীন নয়। এই দুইয়ের প্রভাব

তাঁর জীবনে বর্তিয়েছিল পর্যায়ক্রমে—পরে পরে, সম সময়ে নয়। প্রথম বয়সে ফ্রয়েডীয় আত্মরতির মাত্রাহীন প্রভাব; উত্তরকালে ফ্রয়েডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মার্কসীয় চিন্তা চৈতন্য। অবশ্য এমন কিছু কিছু উপন্যাস ও ছোট গল্প আছে যার মধ্যে এই দুই দৃষ্টি কোণেরই যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'দর্পণ' ও 'অহিংসা' উপন্যাস, ছোট গল্পের ভিতর কে বাঁচায়, কে বাঁচে, হলুদ পোড়া, ছিনিয়ে খায়নি কেন প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। হলুদ পোড়া গল্পে একটি গ্রাম্য কুসংস্কারকে (লোকের উপর ভূতের ভর হওয়া ও ওঝার চিকিৎসায় সেই ভূত-ঝাড়ানোর চেষ্টা) এক হাত নেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই কুসংস্কারের এখনও যে কতখানি জোর বিদ্যমান তা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও গল্পটির মধ্যে পরাজিতের মনোভাব আত্মগোপন করে আছে। তেমনি পরাজিতের মনোভাব ছড়িয়ে আছে ছিনিয়ে খায়নি কেন গল্পে। দুর্ভিক্ষের বাজারে ব্যবসায়ীদের গুদামে ও দোকানে খাদ্য থরে থরে সাজানো থাকা সত্ত্বেও বুভুক্ষু অভাবগ্রস্ত মানুষেরা কেন খাদ্য লুঠ করে খায়নি তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গল্পে। রচনাটিতে সমালোচনা আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই। বিদ্রোহের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে যারা বিদ্রোহ করবে, খাদ্য লুঠ করে খাবে, তাদের নির্জীবতায়, প্রাণ শক্তির অভাবে দুঃশাসনীয় গল্পটিও একটি ব্যর্থতার গল্প। চমৎকার শিল্পরচনা কিন্তু ট্রাজিডির বেদনায় গল্পের রস যতই করুণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চাল চিনি কেরাসিনের মত বস্ত্রের সংকট এই গল্পের বিষয়বস্তু, গল্পের নাম থেকেই যার আন্দাজ পাওয়া যায়। গল্পের শেষটি এত ব্যথাময় যে বঞ্চক বস্ত্রচোরদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও চোখের জলে গলে যায়। রাবেয়ার জলে ডুবে আত্মহত্যা সমস্ত গল্পটির উপর একটা গভীর বিষাদের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। বস্ত্রের কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আক্রোশ প্রকাশের কথাটা যেন মনে হতেই চায় না এমনি সেই বিষাদের নিবিড়তা।

এখানে বলবার কথা এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন পর্যন্ত ফ্রয়েডবাদ আর মার্কসবাদ এর সীমান্ত-রেখায় দুলছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর লেখায় প্রতিবাদ আর প্রত্যাঘাতের চেতনা তরবারির শাণিত ধারের মত ঝলসিত হয়ে ওঠেনি, শ্রেণী সংঘর্ষের তত্ত্বকে তখনও তিনি সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেনি। কিন্তু যখন থেকে মার্কসবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে তার কোন সংশয় রইলো না তখন থেকেই তাঁর লেখায় আর এক রূপ—কি গল্পে কি উপন্যাসে। খাপ খোলা তলোয়াড়ের মতই সে-রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধার। মানিক যেদিন থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির পতাকাতলে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে তাঁর মন হতে ফ্রয়েডীয় অপতত্ত্বের প্রতি মোহ বিনিঃশেষে ঝরে গেল। মার্কসবাদের পাশে ফ্রয়েডবাদ একটা অশ্রদ্ধেয় দর্শন ভিন্ন আর কিছু নয়। ওটা বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কৌশলী হাতিয়ার। ব্যক্তির অচেতন মনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এ সমাজের যৌথ মনের চেতনাকে আড়াল করে রাখতে চায়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা এ বলে না, কেবলই নির্জ্ঞান ও চেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। মানিক প্রথম জীবনে এই বিভ্রমের কুহকের মধ্যে পড়েছিলেন আমাদের 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের দেখাদেখি। ফ্রয়েডকে গুরু মানা তখনকার কালের সাহিত্যিকদের একটা ফ্যাসান ছিল। মানিকও ওই ফ্যাসানের খপ্পরে পড়েছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, সেইহেতু ওই ফ্যাসানই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার এক ব্যবচ্ছেদী শলাকা, যা চিরে ফেঁড়ে মানুষের মনকে ফালাফালা করে দেখে অদ্ভুত আনন্দ পায়। কিন্তু এই আবেশ মানিকের লেখায় অনেককাল স্থায়ী হলেও চিরস্থায়ী হয়নি। মার্কসবাদী প্রত্যয় মধ্যপথে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। মানিক সাহিত্য জীবনের চলার পথে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আশ্রয় পেয়ে পুরনো পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। নতুন মানুষ—নতুন লেখক।

॥ ২ ॥

মাসি পিসি মানিকের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। সাধারণ মানুষের অন্তরে অত্যাচারীর জারিজুরি প্রতিরোধ করার চেতনা কতটা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে এই গল্পটি তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। উদাহরণটি দুটি আপাত অসহায় গ্রামীণ নারীর জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তার ফলোপযোগিতা আরও বেড়েছে। নেশাখোর অত্যাচারী স্বামীর হাতে পড়ে অহ্লাদীর দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। বাপের বাড়িতে কেউ নেই, দুর্ভিক্ষে সব হেজেমজে গিয়েছে, থাকবার মধ্যে দুই প্রৌঢ়া বিধবা—আহ্লাদীর মাসি আর পিসি। দুটিতে গায়ে গতরে খেটে সংসারটি কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে, নিজেদেরও একটা হিল্লে তাতে হয়েছে। একদিন স্বামীর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর আহ্লাদী বাপের বাড়ি এসে হাজির। বলে গিয়ে মাসি পিসিরই ভাল করে চলে না, নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না তার ঠিক নেই, তার উপরে আহ্লাদীর ভার। কিন্তু মাসি-পিসি এতটুকু দমে না, আহ্লাদীকে সাদরে ঘরে আশ্রয় দেয়, শুধু তাই নয়, দত্ত নিজের বিয়েকরা ইরিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তাকে স্বামীর ঘরে যেতে দেয় না। বলে কোনদিন নেশাখোর মাতালটা মেয়াকে একেবারে নিকেশ করে ফেলবে তার ঠিক কী, মেয়েকে আমরা ফেরত পাঠাবো না। এই নিয়ে দত্তর সঙ্গে মাসি-পিসির মনোমালিন্য। কিন্তু বড় শক্ত ধাত মাসি পিসির, কিছুতেই তাদের টলানো যায় না।

তারা বেঁচে থাকতে আহ্লাদীকে তারা খুনে স্বামীর ঘর করতে কিছুতেই পাঠাবে না এই তাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ। সর্বদা আহ্লাদীকে চোখে চোখে আগলে রাখে—বাজারে কেনাবেচা করতে যাবার সময়ও আহ্লাদীকে সঙ্গে করে সালতিতে বয়ে নিয়ে যায়। ছোট এক

ওরা কাজ করে……

চিত্র : গোবিন্দ রায়

চিলতে সালতি—তার দুই ধারে দুই প্রৌঢ়া, একজনার হাতে লগি, একজনার বৈঠা। আর শুধু কি খুনে সোয়ামীর হাত থেকেই 'মেয়াকে' বাঁচানো প্রয়োজন, গাঁয়ের কামার্ত বদমাইশগুলির লোকানি থেকেও কি তাকে বাঁচানো সমান জরুরী নয়? এই দুই দায়িত্বই মাসি-পিসি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

গল্পের শেষে আছে গাঁয়ের কামলোলুপ পশুগুলির কবল থেকে আহ্লাদীকে বাঁচানোর তাড়নায় মাসি ও পিসির প্রতিরোধের আয়োজন কত সংকল্পদৃঢ় ও সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে তার একটি নিখুঁত ছবি। দুটি অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মনের জোরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত চরিত্রবল যেন গল্পটির ভিতরে কথা কয়ে উঠেছে। পাঠক মর্মের উপর এ গল্পের প্রকারের কোন তুলনা নেই।

হারানের নাত জামাই মানিকের শেষ পর্বের আর একটি উৎকৃষ্ট গল্প। এ গল্পটি বহুল পঠিত, উপরন্তু অভিনয়ের দৌলতে ব্যাপকভাবে পরিচিত। সুতরাং গল্পের কাঠামোটি এখানে বিস্তার করে তুলে ধরবার আবশ্যকতা নেই। তবে ময়নার মার চরিত্রটি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ এক আশ্চর্য চরিত্র। এর কোন জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। যে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য আত্মগোপনকারী কৃষক নেতাকে নিজের জামাই বলে চালায় ও মেয়েকে ঘরের ভিতর ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় তার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সংস্কার জয়ের বলিষ্ঠতা তুলনারহিত। সবকিছুর উপরে তার চরিত্রে স্বল্পজ্জ্বল করছে তার দুর্মর শ্রেণী চেতনা, যা শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অমোঘভাবে প্রযুক্ত। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা ও একপ্রাণতা এই গল্পের আর একটি মূল্যবান আয়তন। এর একটি শিক্ষণীয় দিকও আছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে সকলে মিলে একত্রে রুখে দাঁড়ালে যে কাজ হয় অনেক বেশী তার ইঙ্গিতে গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পেটব্যথা গল্পের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধতার একই রূপ জয় দেখতে পাওয়া যায়।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় বড় কমলাপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের সময়কার পুলিশী সন্ত্রাসের চিত্র। পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের তীব্রতার ভাবটিও গল্পটির ভিতর অব্যক্ত থাকেনি।

আর না কান্না গল্পটি লক্ষণীয় এই কারণে যে, ভাতের কষ্ট দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে যে কত দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে এই রচনাটিতে তার একটি মর্মান্তিক আদল পাওয়া যায়। আপাতবিচারে দেখলে মনে হতে পারে গল্পের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ স্থূল কিন্তু এই স্থূলতা বহিরাবরণ মাত্র, কার পৃষ্ঠ ভেদ করে গোটা দরিদ্র সমাজের কান্না যেন বাষ্ময় হয়ে উঠেছে একটা মর্মভেদী শূন্যতার হাহাকারে। ভাতের কষ্ট ভাতেরই কষ্ট মাত্র নয়, তা ধুঁকে ধুঁকে জীবন্মৃতবৎ বেঁচে থাকারও কষ্ট। গভীর কারুণ্যের বেদনায় গল্পটি পরিপূর্ণ।

বোতল বোমের কারসাজি

শ্বর গুপ্ত

আসগর আলির উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরটা প্রথম দেখতে পায় গবা দত্ত, সকাল তখন নটা হবে। আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। ধানখেতের মাঝখানে হঠাৎ একটা কাপড়ের অংশ, তারপর উঁকিঝুঁকি দিতে ছেঁড়া লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা মানুষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দেখা যায়। ধানের লকলকে শিষ ভেঙেই ছুটে এসে দাঁড়ায় সে। না মরেনি। আসগরই তো। শরীরে চাকাচাকা রক্তের দাগ, ধস্তাধস্তির চিহ্ন, মাথায় জমাট রক্ত, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে, চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা মেরে গেছে আর থেকে থেকে গলা দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ।

ভিরমি খেয়ে গেল গবা দত্ত। কী গো আসগর চাচা। হইছে কী তোমার?

শরীরটা টেনে টুনে খানিকটা কাত করিয়ে দিল, আর মুমূর্ষু লোকটার গলার ঘরঘড়ানি বাড়ল কিছুটা। কিন্তু বোঝা গেলনা কিছুই। আশপাশে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। কাকে ডাকে। গবা তেমনি মরিয়া হয়ে আল ধরে ছুটে গেল প্রায় আধ মাইলটাক। একটা হেঠো পথে নেমে জনা তিনেক গাঁয়ের মানুষকে ডেকে আনলো। তারপর সবাই ধরাধরি করে তুলল আসগরের হুমড়ানো শরীরটা। মাথার তলায় একটা ভাঙা বোতল দেখা গেল-রক্তমাখা।

আসগরকে গাঁয়ে আনা হল, মাথায় চোখে জল দেওয়া হল হাওয়া করা হল কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। এমনিতেই বয়সে ষাটের মত, শরীরেও নেই কিছু। তার ওপর এই দুর্ঘটনা। কী হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। মাথায় কিসের আঘাত? শরীর অমন করছে কেন? হাসপাতাল তিন ক্রোশ দূরে, গরুর গাড়ি করে নিয়ে গেলেও ঘণ্টা পাঁচ, আর বড় রাস্তায় যদি কোনো গাড়িটাড়ি মেলে। তারজন্যও অপেক্ষা করতে হবে। কাছে পিঠে ডাক্তারও ক্রোশ খানেক দূরে। উত্তেজিত মানুষগুলো কী করবে তাই নিয়ে নির্বোধের মত জটলা করতে লাগল।

হঠাৎ আসগরের মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়া বুড়ো হরেকেষ্ট বলে উঠল, কথা, কথা বলতিছে আসগর— তাও কয়েক দণ্ডের জন্য। আসগরের মুখ দিয়ে গোটা কয়েক শব্দ শোনা গেল। অস্পষ্ট হলেও অনেকটা এই রকম— 'মরে যাই গো, ও বাবা গো,...'। মুখের গ্যাঁজলা খানিকটা যেন কমেছে, হরেকেষ্ট আর একটু জল ঢেলে দিল মুখে. গেল না গলায়—নাক মুখ দিয়ে উপচে এল। শশধর মণ্ডল গলা একটু তুলে বলল, কী হইছিল চাচা। মাথা ঘুরি পড়ি গিছলা, না কেউ পিটাইছে?

অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল— বোতল।

বোতল কীরে বাবা? বোতল দিয়ে মেরেছে মাথায়? আসগরের কিছু ধানী জমি আছে। ধান কাটার সময় হল। এখন কাজিয়া লেগেই থাকে। সেই সুবাদে কেউ বা কারা পিটিয়ে দিয়ে গেল নাকি? এমনিতে আসগরের শত্রু নেই, তবু বলা যায় না, দিনকাল ভালো নয়।

শশধর আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কেউ পিটাইছে তোমায়?

গোঁ গোঁ করে জবাব এল, বোতল।

আবার বোতল! বোতল কি কারো নাম? এই নামে তো সাত গাঁয়ে কেউ নেই। হ্যাঁ আসগর যেখানে পড়ে ছিল তার নিচে ভাঙা বোতল একটা পড়ে ছিল বটে। কিন্তু বোতল দিয়ে কে পেটালো এমন যে এই অবস্থা হতে পারে?

আসগরের শরীর ছটফট করেছে। মুখ দিয়ে আবার গ্যাঁজলা উঠছে। এবার স্পষ্ট শোনা গেল—ছি পি এম... সি পি এম? সি পি এমের কীর্তি?

পিঠের ছিলা টানটান করে গুণধর বকসি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাঁই-পাঁই ছুটল। সোজা কংগ্রেস অফিস।

তালা বন্ধ। ওখান থেকে গাঁয়ের মাতব্বর বড় মোড়লের বাড়ি। দড়াম করে ভেতরে ঢুকেই ফ্ল্যাট। লোকজন ছুটে এল।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?

খুন। সি পি এম।

দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল। থমথমে বাড়ি। দলের বিশ্বস্ত ও পুরনো কর্মী আসগর মিঞা সি পি এমের গুণ্ডাদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

কয়েক মিনিট পরেই বাড়ি থেকে বেশ বড়সড় একটা দল বেরুল। সোজা সাইকেল নিয়ে একজন গেল সদর থানায়, অন্যজন কোথা থেকে যেন কাকে টেলিগেরাম করতে গেল। আর পাঁচ ছয়জন এল সেইখানটায়, আসগরের মুমূর্ষু দেহটাকে ঘিরে সেখানে একটা জটলা তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে কথাটা। আসগরের মুখ তখনো বিড় বিড় করছে, কিন্তু তার দিকে নজর দেওয়ার অবস্থা নেই কারো। ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি বহু মোড়ল মোটা-মুটি এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিলেন—

কংগ্রেসের পুরনো কর্মী আসগর মোল্লা সকাল থেকে ক্ষেতে ছিল। কদিন থেকেই সি পি এম কর্মীরা তাকে জমির দখলি নেওয়ার জন্য শাসাচ্ছিল। সকালেই একদল সি পি এম কর্মীর সঙ্গে তার কথা কটাকাটি হয়। তারা আসগরকে বোতলবোম (?) দিয়ে আক্রমণ করে। গাঁয়ে বোতলবোম ছুঁড়ে এর আগেও সি পি এম কর্মীরা হামলা করেছে। গত শনিবার বহু মোড়লের বাড়ি বোতলবোম ছুড়ে বহুবাবুর ছোট ছেলেকে জখম করে। (শনিবার পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে বহুবাবুর ছোট ছেলের ঠ্যাং-এ চোট লাগে)। গুণধর বকসিও বোতলবোমের শিকার হয়েছে একবার। ওরা পরাণ আর সিধু মণ্ডল নামে কংগ্রেসের দুই কর্মীকে গ্রাম ছাড়া করেছে। (পরাণ বলে গাঁয়ে কোন দিন কেউ ছিল না, সিধু একটা কারখানায় কাজ পেয়ে সপ্তাহ দুই আগে ব্যারাকপুর চলে গেছে)। আজ আসগরকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ক্ষেতের মধ্যেই (আসগর এখনো মরেনি, কিন্তু মরতে আর বেশি দেরিও নেই) আপাতত ওকে হাসপাতালে পাঠাবার দরকার নেই, কারণ তাহলে লাশ পুলিশের দ্বারা গুম হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কিন্তু পুলিশকে একটা খবর তো—

পাঠিয়ে দিইছি, লোক চলে গেছে থানায়। বহু মোড়ল আশ্বস্ত করলেন সব্বাইকে। সেখেনে বলে দিইছি, লাশ নিয়ে কেষ্টপুর হাসপাতালে চলে গেছে। সেখান থেকে খবর নিতে নিতে বারোটা বেজে যাবে। তার আগে সন্ধ্যে বেলার মধ্যেই আমারা ডেড বডি নিয়ে প্রসেসান করব। কোলকাতার নেতারাও এসে পড়বে খন—

জিপে করে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই এসে গেলেন কলকাতার বাবুরা। এলেন হামিদুল্লা সাহেব, এলেন ঘোষপাড়ার ইলেকশানে হেরে যাওয়া প্রার্থী মন্টে চক্রবর্তী, হলধরপুরের যুবনেতা নৃপেন গুহ, এলেন অনিল সাঁই, গোকুল বসাক, হরিহর আইচ, মুকুন্দ পাল। সব তাবড় তাবড় নেতা। গম্ভীর থমথমে মুখে সবাই উঠলেন বহু মোড়লের গরিব খানায়। কেতাথ বহু মোড়ল যথোচিত সম্বর্ধনা করলেন ওনাদের।

রাত দশটার মধ্যে গাড়ি করে আবার সবাই সাঁই সাঁই করে শহরে ফিরে গেলেন। কলকাতায় গিয়ে মন্টে চক্কত্তী আর নেপেন গুহ মশাই কাগজের জন্য স্টেটমেণ্ট তৈরি করতে বসলেন, অনিল সাঁই দিল্লীতে কটা ট্রাংক টেলিফোন বুক করলেন, গোকুল বসাক আগেকার এক রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি সোজা চলে এলেন এগারোটা নাগাদ, আর মুকুন্দ পাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পেশ করার বয়ানটা ইংরিজি করার জন্য ব্যারিস্টার হৃষীকেশ দে কে ফোন করলেন। সব কাজ শেষকরতে করতে প্রায় রাত বারোটা পঁচিশ হল।

ইদিকে আসগরকে নিয়ে বিকেল থেকেই গাঁয়ের মানুষগুলো ভাবনায় পড়লো। বহু মোড়ল বলে গেছে, ওকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল, লোকটার অবস্থার উন্নতি হয়নি। হাত-পা খিচুনি সমানে চলেছে। মরেও মরছে না, হাসপাতালে নিলে হয়ত অবস্থার উন্নতি হত। কিন্তু বহু মোড়ল বলে গেছে। সাবধান, বোতল বোমের কেস। দারুণ ছোঁয়াচে। তাছাড়া হাসপাতালে যেতে যেতে টেঁসে গেলে তো হাসপাতালও নেবে না, ডাক্তারও সার্টিফিকেট দেবেনা। কে দায়িত্ব নেবে? তখন তোরাই পড়বি বিপদে। সি পি এমের খুনের ঝামেলা তোদের ওপর পড়বে। তারচে এখেনে পড়ে গাঁয়ের মাটিতেই পেরাণটা বেইরে যাক।

তারপর মৃতদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের করার জন্য গাঁয়ের দুই মাতব্বর ছবিবুল্লা আর রাধেশ্যামকে ডেকে নিয়ে গেছেন।

মুশকিল হয়েছে অন্য এক জায়গায়। পাশের গাঁয়ের জটেশ্বর চিনত আসগরকে। সে এসে পড়ল সাইকেলে করে আটটা নাগাদ। বলল, আমাদের আসগর নাকি টেঁসে গেছে। চ্যাংপোতা জন্তা পার্টি অপিসে খবর এয়েছে। আমাকে দেখতে পাঠালো। পার্টির বাবুরা বলছেন, আসগরকে নিয়ে ওরা এক শোক মিছিল করবেন।

জন্তা পার্টির লোক ছিল আসগর। গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া চায়ি করে।

হ্যাঁ, আসগরের খবরের জন্য বাবুরা সব বসে আছেন। টেঁসে গেলেই ওঁরা আসবেন।

তাহলে রাতটুকুন অপেক্ষা কত্তে বলে দাও। একজন বিরক্ত হয়েই বলল, সকালবেলা আসতে বোলো বাবুদের। এখনো টেঁসে নাই মিঞা।

আচ্ছা তাই বলে দেব। বলে সাইকেলে উঠে পড়ল জটেশ্বর।

রাত বাড়তে আসগরের শরীরটা ধরাধরি করে নিয়ে এল কয়েকজন লক্ষ্মীকান্তর চায়ের দোকানের ছাউনির তলায়। বিড়ি ধরিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললে, কী ফেসাদ বাধালে বল দেখি এ্যাঁ! রাত ভোর কে পাহারা দেবে বুড়োকে। তা থেকে হাসপাতালে দিলি না ক্যান?

বহু মোড়ল ব্যাখ্যাত কারণগুলো আবার সঠিক শোনাল শম্ভুচরণ। লক্ষ্মীকান্ত, বিড়িটা দাঁতে চেপে ক্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলল অ! তাই বল্।

সকাল বেলার কাগজে বেশ বড় বড় করে বেরিয়ে গেল খবরটা। বর্ধমানের গুশকরার কাছে মোল্লার হাট গ্রামে কংগ্রেসের কর্মী খুন। বোতলবোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত শরীর—তার বিস্তারিত বিবরণ। খুনের ইতিহাস সম্পর্কে বহু মোড়লের বক্তব্য। শেষে এও আছে, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়ে গেছে। তাতে স্পষ্ট করে হত্যাকারী সি পি এমের উল্লেখ করেছে। পুলিশের চোখের উপর দিয়েই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখনো কোনো দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ইত্যাদি।

উত্তেজনার খবর। ট্রাম, বাস, মোটর, লরি, কারখানা, স্কুলের শব্দ বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে খবরের তেজও। মৃত্যুকালীন জবানবন্দী। সুতরাং আর অস্বীকার করার উপায় কোথায়? আবার সেই খুনের রাজনীতি। হিংসার রাজনীতি। জঙ্গলের রাজত্ব। কিন্তু মানুষের স্টমাকে একটা গুরগুর শব্দ উঠল। কয়েকজন এম এল এ টেলিফোনে ফিক ফিক করে হাসলেন। চার পাঁচ জন কলেজের ছেলের মধ্যে একটা থাইসড্ হাতাহাতি হল। ক্রমশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংবাদটি ভাষান্তরিত হয়ে গেল। তারপর যথোচিত মর্যাদা সহকারে বিদেশেও রপ্তানি হল। রাইটার্স বিল্ডিং এ কোনো কোনো ঘরে ভুরুটুরু কুঁচকে গেল কয়েকজনের। পুলিশের সদর দপ্তরে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দুপুর নাগাদ গোটা কতক মৌন মিছিল চলমান ক্যামেরা সহ কয়েকটি পাড়া পরিক্রমণ করল, সঙ্গে পোস্টার—খুনের রাজনীতি ফিরে এসেছে। হিংসার রাজনীতির প্রত্যাবর্তন। হত্যাকারী সি পি এম কর্মীর শাস্তি চাই। দুপুর তিনটে দশ থেকে চারটে পঁচিশের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন হল। তার কিছু সংলাপ এই রকমের—

—গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। প্ল্যানটা পুরোপুরি সাকসেসফুল।

—ক্যা জী? সব ঠিক হ্যায় না?

—ইয়েস সর। যেমন বলেছিলেন। অপারেশন একজ্যাক্টলি ডান।

—টাকাটা কাল নিয়ে যাবেন।

—হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, আজকের মৌন মিছিলের ফটোসহ নিউজ যেন তৈরী থাকে।

—সন্ধ্যেবেলায় মিনার্ভায়? গুড। বাই—

—দিল্লিতে পুরো রিপোর্ট গেছে স্যর। ফরেনেও গেছে।

—সি এম এর রিএকশানের খবর পাইনি। তবে এখনি পেয়ে যাব। লোক রেডি আছে। ও কে।

—না মরেনি এখনো। তবে আজই শেষ হবার চান্স। কাল প্রশেসান না বেরোনোর কোনো কারণ নেই। আমরা রেডি।

—পুলিশ এ ইনভেস্টিগেট শুরু করেছে।

—সাবধান স্যালিধি যেন গুবলেট না হয়।.....

আসগরের গ্যাজলা-ওলা দাঁত মুখ খিঁচোনো শরীরটা সেই রাত্তিরেও ঢালা ঘরে পড়ে রইল। অদূরে লক্ষ্মীকান্ত শেষ বিড়িটা ধরিয়ে একটা ভাঙা বেঞ্চির ওপর ঢুলতে লাগল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই সদর থেকে পুলিশের দুটো জিপ এল। কয়েকজন নেমে সঙ্গে সঙ্গে আসগরের শরীরটা ধরাধরি করে তুলে নিল হাসপাতালের পথে। জিপেও ডাক্তার একজন ছিলেন। ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে চোখ টেনে লক্ষণ দেখে আপন মনে বললেন, ফরটি ফোর আওয়ার্স হয়ে গেল। এখনো কোনো ডাক্তার দেখেনি একে? আশ্চর্য। তারপর আরও খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ। তারপর গুম মেরে গেলেন। একটি কথাও বললেন না।

পুলিশের অন্যান্য অফিসারগণ গাঁয়ের লোকদের সন্ধানে বেরুলেন। উদ্দেশ্য ঘটনার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা।

বিকেল নাগাদ পুলিশের একজন স্পেশাল অফিসার হাসপাতালে ভার-প্রাপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন।

সকালের পেশেন্ট? ইয়েস অল রাইট।

অফিসারের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। রুমালে কপালের ঘাম মুছে বললেন, এ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার? জখম কি মারাত্মক ছিল? টাঙ্গি দিয়ে না দা দিয়ে কোপানো? ইন জুরি কী রকম? অপারেশন করতে হয়েছে? ব্লাড দিতে হয়েছে? একটু ডিটেল বলুন স্যার। ওপরে রিপোর্ট করতে হবে কিনা। বটলবোমটা কী ব্যাপার? কোনো বম্বিং এর প্রমাণ আছে?

প্রৌঢ় ডাক্তারটি চোখ কপালে তুলে বললেন, হোয়াট? মার্ডার? সকালের পেশেন্টের কথা বলছেন তো? সে তো এক্সিডেন্ট কেস।

—এ্যাঁ? এ্যাকসিডেন্ট? পুলিশ অফিসারের মুখের হাঁ-টা তালশাঁসের মত দেখাল।

—ইয়েস। মানে বোতলে করে জল খাচ্ছিল লোকটা। বোতলের ছিপি মুখে ঢুকে গলায় আটকে গেছিল। এ সোফ্যাগ্যাসের ভেতরে ঢুকে গেছিল। ট্রাকিয়ায় মানে উইণ্ড পাইপে পড়লে সাফোকেশানে মারাও যেতে পারত। তারই ফলে ইমভলা-শ্টরি রিফলেক্স গ্যাজলা ওঠা, গোঁ

গোঁ করা। খার পর্ড়ে গিয়ে ওই বোতলে মাথা কেটে—

—ছিপি? এবার ছিপিহীন সেই বোতলের মুখটার মতই ছোট হয়ে এল অফিসারের মুখটা।

—ইয়েস, ছিপি। ছোট্ট একটা কর্ক। গলায় আটকে গিয়ে এই বিপত্তি। তা আমরা সেটা ডাইলেট করে স্টমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আউট অফ ডেঞ্জার!

পুলিশ অফিসারটি আবার কপালের ঘাম মুছলেন। গলায় ছিপি মেরেছে—তা থেকে সি পি এম। ডেঞ্জারাস। মনে হচ্ছে ছিপিটা যেন নিজের গলার মধ্যেই আটকে আছে। অজান্তে নিজের গলায় হাত দিলেন তিনি। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুটি চেম্বারের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

রিপোর্টটা রাতেই যথাস্থানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামান্য একটা ছিপি গলায় লেগে কে এক আসগর চাষির মরোমরো অবস্থা হয়েছিল সে খবরে কার কৌতূহল থাকতে পারে?

বোধন

চিত্র : মোহন নাগ

খবরটা দিল্লী বা ক'লকাতার কোন কাগজেই ছাপা হোল না। সময়টা উনিশশো ছিয়াত্তরের জুন মাস। এমার্জেন্সী আর সেন্সর-এর দাপটে তখন সারা দেশের মুখ বন্ধ। প্রভাবশালী কোন নেতার সঙ্গে মতান্তরের পরিণাম জেল অথবা মৃত্যু। তবু খবরটা চাপা থাকেনি। মুখে মুখে দিল্লী থেকে ক'লকাতা পৌঁছতে কতই বা সময় লাগে। তবু খবরটা জেনে খুবই অবাক হয়েছিলাম। সপ্তাহে দু'দিন অন্তত দিল্লীর এবং ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান যুবনেতা রণজয় মোদীর সঙ্গে যার লাঞ্চ বা ডিনার বাধা ছিল, সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত কুন্দলালকে পুরোন দিল্লীর এক প্রকাশ্য রাজপথে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার সমস্ত শরীরটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

কুন্দলালের সেই অসামান্য চেহারা এখনো আমার মনে ছবি হয়ে আছে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। লাল টক্‌টকে রঙ। পরণে কালো টেরিলিনের প্যান্ট আর বকের পালকের মত সাদা হাওয়াই সার্ট। ডান হাতে সব সময়ে জ্বলছে দামী

হাভানা চুরুট। চলায় বলায় নম্র এবং বিনয়ী। দেখে, কথা বলে, কখনো মনেই হয় না যে তার নামে সারা দিল্লী শহর কাঁপে, দুরন্ত অঞ্চল শিউরে ওঠে। এবং তার দোস্তরা বসে আছে মসনদের আশেপাশে, যাদের সামান্য অঙ্গুলি হেলনে দিনকে রাত বানানো যায় অথবা রাতকে দিন। আমার সঙ্গে তার মাত্র দু'সন্ধ্যার জানপয়ছান। ঘনিষ্ঠতা। তবু ছবিটা আমার মনে স্পষ্ট ধরা আছে। সে ছবিটা বোধহয় ক্লাসিক।

ছিয়াত্তরের জানুয়ারি মাস। আমি দিল্লীতে গিয়েছিলাম একটা সাংবাদিক সম্মেলনে। আর নিতান্ত সাংবাদিক কৌতূহলেই আমি কুন্দলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম দিল্লীর এক সাংবাদিক বন্ধুকে। বন্ধুটি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি ব্যাপার? আণ্ডারওয়ল্ড সম্পর্কে কোন স্টোরি করবেন নাকি? বলেছিলাম, না, নেহাতই সাংবাদিক কৌতূহল। আর স্টোরি কি সেন্সর পাশ করবে? বন্ধুটি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর যাবার সময় আমার হোটেলের রুম নাম্বারটা জেনে নিয়ে, 'সি য়ু' বলে বিদায় নিয়েছিলেন।

পরদিন সকালেই ব্রেকফাস্টের পরই আমি টেলিফোন পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'কুন্দলালজীর সেক্রেটারী' বলে। তারপর সন্ধ্যে ছ'টায় আমাকে তৈরী থাকতে বলেছিলেন। ওই সময়ে ওর গাড়ী আমাকে পৌঁছে দেবে কুন্দলালের কাছে। বলতে সঙ্কোচ নেই, খবরটা পেয়ে আমি খুবই পুলকিত হয়েছিলাম আর সাংবাদিক বন্ধুর এই কর্মতৎপরতার জন্যে মনে মনে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে কুন্দলালজীর সেক্রেটারী নামীয় ভদ্রলোকের মার্কিনী উচ্চারণে চমৎকার ইংরেজী বানান ও সৌজন্য প্রকাশের কায়দায় রীতিমত চমকও লেগেছিল। জানতাম, কুন্দলাল বম্বের এক খান্‌দানী পরিবারের ছেলে। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র। ম্যাসাচুসেটসে গবেষণা করেছে অর্থ নীতিতে। কিন্তু তার সেক্রেটারীটিও যে কমতি নয়, এটা ভাবতে পারেনি।

ঘড়িতে তখন ঠিক ছটা। আমার দরজায় টোকা পড়ল। আমি অবাক হলাম ওর সময়জ্ঞান দেখে। দরজা খুলতেই দেখলাম দামী সুট পরা লম্বা চওড়া এক সুন্দর পুরুষকে। উনি আমাকে 'উইস্' করে নিজের পরিচয় দিলেন। আমি অবশ্য দেখেই অনুমান করেছিলাম যে, ইনিই কুন্দলালের সেক্রেটারী। একটা বিরাট ইম্পালা গাড়ী আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চলল দিল্লীর পথ দিয়ে। সেক্রেটারী, গাড়ী আর সোফারের পোষাক দেখে কুন্দলালের অর্থ সম্পদের অনুমান করা চলে। কিন্তু এহ বাহ্য। অবাক হবার মতো অনেক দৃশ্য আমার জন্যে তখনোও অপেক্ষা করছিল। দিল্লীর এক অভিজাত এলাকায় (ইচ্ছে করেই নামটা গোপন রাখছি।) যে বাড়ীর সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল আর দ্বারওয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল, সে বাড়ী অনেক রাজা মহারাজারাও ঈর্ষাযোগ্য। গাড়ী বারান্দার নিচে গাড়ীটা থামতেই বেয়ারা দরজা খুলে সেলাম জানাল। নেমেই দেখলাম বারান্দায় চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কুন্দলাল। ওর সেক্রেটারীই আলাপ করিয়ে দিল। অত্যন্ত সম্ভ্রমে হাতে হাত মিলিয়ে আমাকে 'শুভ সন্ধ্যা' জানালেন কুন্দলাল। তারপরই নিয়ে গেলেন তার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে। ইতিমধ্যে এক নজরে দেখে নিয়েছিলাম ওর বাড়ীর বাইরেটা। গেট থেকে গাড়ীবারান্দা পর্যন্ত সাদাকালো পাথরকুচি ছড়ানো চওড়া রাস্তা। দুপাশে টবে নানা রঙের মরশুমী ফুলের বাহার। পাঁচিলের গা দিয়ে কেয়ারী করা দেবদারু গাছের সারি। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য নিসর্গ চিত্র।

আমরা ড্রয়িংরুমে সামনাসামনি বসলাম। উর্দিপরা বেয়ারা ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। হুইস্কি সোডা বরফ। কুন্দলাল গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। গ্লাসে গ্লাস ছুঁইয়ে আমরা যে যার মুখে তুলে নিলাম। কুন্দলালই প্রথম কথা শুরু করলেন, বলুন মিঃ সেন, কি জানতে চান, বলুন।

সরাসরি তার জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ ছিল। বললাম, বুঝতেই তো পারছেন, সাংবাদিকতা আমার পেশা। সুতরাং···

কথা শেষ হোল না। কুন্দলাল হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা হাসি। আরে আমার কাছে আবার শরম কি। জীবনে ঘুরপথে কখনো চলিনি। সোজা কাজের মানুষ। যা ভাল বুঝেছি, করেছি। আর যতদিন বাঁচবো, তাই করবো। যা জিজ্ঞেস করার সোজাসুজি করতে পারেন। আমার কোন লুকোচুরির ব্যাপার নেই।

ওর দিলখোলা হাসি আর কথায় আমার সাহস ফিরল। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কুন্দলালজী, রণঞ্জয় মোদী তো তোমার খুব বন্ধু?

জবাবটা যেন ওর মুখেই ছিল। হ্যাঁ, আপনারা বলেন। দিল্লীর সকলই তাই জানে। কিন্তু আমি জানি এ দোস্তী আসলে আমাদের মধ্যে একটা সাময়িক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। রণঞ্জয় জানে ওর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যে আমাকে, মানে আমার মতন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত আর খুনীকে ওর প্রয়োজন; আর আমি জানি, আমার ধনসম্পদ রক্ষা করা আর কাজকর্ম পুরোদমে চালিয়ে যাবার জন্যে ওর মত একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠতা বা বলা যায় শেলটার পাওয়া দরকার। কিন্তু আসলে অবস্থাটা কি জানেন? যেদিনই ও বুঝবে, আমাকে আর ওর দরকার নেই, সেদিনই ও আমাকে খতম করে দেবে।

ওর ইংরেজি উচ্চারণ, মার্জিত ভঙ্গীমা আমার ভাল লেগে গেল। আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। বললাম, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, প্রয়োজনবোধে আপনিই ওকে খতম করলেন।

কুন্দলাল আবার হেসে উঠলেন। আপনি তো সাংবাদিক। কিছুই কি জানেন না? রণঞ্জয়ের সামান্য বিরাগভাজন হলে তার কি দশা হয়। ওর নিজেরেই একটা গুপ্তচর সংস্থা আজ

সারা দেশে কাজ করছে। তাছাড়া আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, ওর ঘরে দু'টো মিক্রোফোন লাগানো হয়েছে। ফলে সারা দেশের সর্বময় কর্তাদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও ঘনিষ্ঠ। এককথায় দেশে একটা সামন্তরাল সরকার চালাতে যা দরকার তা ওর হাতে। আর প্রাদেশিক সরকারের কর্তারা তো ওর মুখের হাসি দেখবার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারেন।

শুনেছি আপনি ওর খুব কাছের লোক বলে, আপনার প্রতিপত্তিও অনেক মহলে……

দেখুন, মিঃ সেন আমি রাজনীতির মানুষ নই। আর হবারও কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। অর্থনীতিতে ভাল ছাত্র ছিলাম। বিদেশে গবেষণাও করেছি। রাজনীতির ব্যবসায় নেমে পড়লে যে এদেশে এ রাজত্বে কিছু করতে পারতাম না, তাও নয়। কিন্তু ঘুরিয়ে লোক ঠকানোর ব্যবসার চেয়ে সরাসরি কেড়ে নেওয়া অনেক ভাল আমার কাছে। আমি তো আগেই বলেছি আমি সোজা পথের মানুষ। আর প্রতিপত্তির কথা বলছেন। কিসের প্রতিপত্তি? কেন? আমি শেলটার চেয়েছিলাম। পেয়েছি। ব্যস। এখন চুক্তিটা টিকে থাকে ভাল। আর না থাকলে যা হবার হবে।

এখন হালচাল কি বুঝলেন?

কিসের?

দেশ, রাজনীতি এ সবের কথা বলছি।

মশায়, সত্যি কথা বলতে কি, দেশও নেই। নীতিও নেই। আছে একটা গোষ্ঠী। কোনকালে এদের নেতার বংশের কে দেশের জন্যে জেল খেটেছিল অথবা নিজের বসতবাটী দান করেছিল। এখন সেই ভাঙিয়ে এরা পয়সা কামাচ্ছে। নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। বিদেশে ব্যাঙ্কে এদের অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা জমাচ্ছে। দেশে এদিকে আর্থনীতি ব্যবস্থা রসাতলে যাচ্ছে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে। মরছে। আর সাধারণ মানুষের নেতারা যখন সত্যি কথাটা জানিয়ে দিতে গেলেন, তখনই তাদের সি আই এ র চর বলে জেলে পোরা হোল। এমার্জেন্সী, সংবিধান বিল এনে আপনাদের কি করা হয়েছে, তা তো হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। কিন্তু এ সবই ওদের রাজনীতি। এর মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি কিন্তু শুনেছি, দিল্লীতে নাসবন্দি আর শার্কম্যান গেটের ঘটনার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কথা।

আপনি কথাটা কি শুনেছেন জানি না। আমার পেশা ডাকাতি আর প্রয়োজনে খুন। সারা দিল্লী শহর আমার নামে কাঁপে। এরকম একজন লোক যদি ওদের অত্যাচারের সময় পাশে থাকে, তাহলে ওদের কত সুবিধে হয় বলুন তো। আমাকে দিয়ে ওরা সেই সুবিধেটুকু আদায় করেছিল। দিল্লীতে ওসব কিছুর নায়িকা তো সুলক্ষণাজী। সুলক্ষণা সুলতানা। ও মহিলাটিকে আমি কিছুই জানতাম না। এখানকার এক ফাইবস্টার হোটেলে রণজয়ের সঙ্গে ও অনেক রাত কাটাত, কেবল এটুকুই আমার জানা ছিল। তারপর এমার্জেন্সির সঙ্গে সঙ্গেও নেতা বনে গেল। আমার ওপর হুকুম এল ওকে গার্ড করতে হবে। তাই করতাম। এবং এখনো করছি।

রণজয়ের কটার তৈরীর কারখানা তৈরী হবার সময় আপনিই তো লোকজন নিয়ে খুন রাহাজানী কম চালান নি।

ভাড়াটে গুণ্ডারা তো ওই কাজই করে থাকে মিঃ সেন।

কিন্তু আপনি তো ভাড়াটে গুণ্ডা নন।

আপনাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমার ওর শেলটারের দরকার। ও সেটা দিয়েছে। সুতরাং…

কিন্তু সে ব্যাপারে আপনার নিজের কি কোন স্বার্থ ছিল না?

না মিঃ সেন, একেবারেই না। গরীব, নিরীহ মানুষদের নিজেদের বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদ করে, হত্যা করে, আমি কোন স্বার্থসিদ্ধি কোন কালেও চাই নি। এখনো চাই না। আমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাকে কাজে লাগানো হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ সেন। আমাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এখনো হচ্ছে। এখন আমি ওদের হাতে শিকলে বাঁধা একটা জন্তু। আমার নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছে নেই। ওরা আমাকে যা করাবে, আমি তাই করে যেতে বাধ্য। আপনি জানেন না, আমি এখন কি অসহায়। শেষদিকে বলতে বলতে কুন্দলালের গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কুন্দলাল চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিনিট খানেকের জন্যে বোধ হয় একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন কুন্দলাল। সেই সামান্যকালের সময় টুকুতে ওর চোখেমুখে যে বেদনা দেখেছিলাম, তা এখনো ভুলিনি। আমার নিজেরও তখন ভীষণ অস্বস্তি। অজান্তে কি ওকে কোন আঘাত দিলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর পুরো এক পেগ হুইস্কি এক চুমুকে শেষ করে আমার চোখে তার চোখ রাখলেন। তারপর মিঃ সেন, আর কি জিজ্ঞাস্য?

ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এবার আমার আসল প্রশ্নে কাল যাব। বল্লাম এবার আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

এবারে যেন আর তেমন করে হাসতে পারলেন না কুন্দলাল। স্থির বিষণ্ণ গলায় জবাব দিলেন, ও প্রসংগ আজ থাক মিঃ সেন। আপনি তো ক'দিন দিল্লীতে আছেন। আরো দু'এক সন্ধ্যায় আমাদের দেখা হবেই। তখন সব বলব। হ্যাঁ, সবই বলে যাব। কাউকে তো সব কথা বলে যেতেই হবে। অবশ্য অনেক কথাই আপনারা জানেন। কোনদিন তো লুকিয়ে কিছু করিনি। আর যা করেছি, তার জন্যে মনেও কোন অনুশোচনা নেই। বাকি যেটু জানেন না, তাও বলব। তবু জানবো, সংসারে একজনকে অন্ততঃ সবকিছু বলে যেতে পেরেছি। মোহিনী জানতো। কিন্তু সে তো ঘর পাল্টেছে। এখন…

বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গেলেন

কুন্দলাল। এতক্ষণ যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। আমিও কিছু বলতে চেষ্টা করিনি। এবং আলোচনাটা অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যেই প্রশ্ন করলাম, রণজয়ের সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্ক কি রকম ?

চলছে। কেমন যেন নিস্পৃহ গলায় জবাব এল।

এবার সাংবাদিক প্যাঁচ কসলাম, বলছে মানে, তেমন ভাল নয় এইতো ?

না, মানে, এখনো তো চলছে।

আমি কিন্তু শুনেছি, নাসবন্দি নিয়ে আপনার সঙ্গে রণজয়ের মতান্তর এবং মনান্তর দুইই ঘটেছে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

কি থেকে এই মতান্তর ঘটল ?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি আর পারছি না, মিঃ সেন। নাসবন্দির নামে কি যে অত্যাচার চলেছে, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনারা যতটুকু শুনেছেন, বা জেনেছেন, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। বস্তি উচ্ছেদের নাম করে শার্কম্যান গেটে প্রায় দু'শো লোককে হত্যা করা হয়েছে। ওদের অপরাধ, ওরা একদিন ওদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রণজয়ের গাড়ী আটক করেছিল। সেদিন আমি সঙ্গে না থাকলে রণজয়কে কেউ বের করে আনতে পারত না। কিন্তু তার বদলে আমি কি পেয়েছিলাম, জানেন ? কেন ওখানে আর গাড়ী আটক হোল বলে রেগে রণজয় আমার গালে সজোরে চড় মেরেছিল। সেই মুহূর্তে রাগে জ্ঞান হারিয়ে আমিও কিছু একটা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। জানেন, তখনি আমার নিজের জানের জন্য মায়া হয়েছিল।

নিজের জানের ভয় যদি থাকে, তবে ওর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন কোন সাহসে ? সেটা তো একটা মুহূর্তের ব্যাপার। সব মানুষই কোন না কোন সময় ভয় পায়। সে ভয় এখন ঘুঁচে গেছে। নিজের ভবিতব্য সম্পর্কে তো আমি তখন নিশ্চিত। তা ছাড়া এভাবে শেলটার নিয়ে বেঁচে থাকাটাও একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে কি জেনেশুনে গোঁয়ার্তুমি করছেন ?

ঠিক জানি না। ভেবে দেখিনি। তবে রণজয়কে আমি জানি। তার চেয়ে ভীরু, অস্থিরচিত্ত কোন মানুষকে আমি দেখিনি। তাই আমাকে ধরে থাকা বা ছুঁড়ে ফেলা, তার পক্ষে সব সময়েই সম্ভব। তবে নাসবন্দির সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি ওপর মহলে যে সব চিঠি লিখেছিলাম, সেগুলো যে ওর হাতে গিয়ে পড়বে, এটা আগে ভাবতে পারিনি। কি করে সে চিঠি ওর হাতে গেল ?

আগেই তো আপনাকে বললাম; সারা দেশের প্রশাসন যেন ওকে তুষ্ট করার পাল্লায় মেতেছে। কিন্তু আমি যাকে লিখেছিলাম, তিনি তো প্রশাসনের সর্বময় কর্তা। কিন্তু তিনিও যে···

থামলেন কেন ?

না, ভাবছিলাম, কেমন করে আস্তে আস্তে দেশের সমস্ত প্রশাসনটা ওর হাতে চলে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে কোন কোয়ার্টার থেকে বাধা আসছে না ?

বাধা আসবে কোথা থেকে ? সকলেই এখন তো গুছিয়ে নেওয়া পার্টি। এর বাইরে যে কজন সৎ মানুষ ছিলেন, তাদের তো আগেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনো যে দু'একজন ওদের সঙ্গে আছেন, তারা প্রাণের ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না।

ওই অল্প ক'জন কি ভাবছেন ?

কিছুই জানি না। ওদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া ওরাও তো আমাকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন।

তা হলে রণজয়ের সঙ্গে লড়াইটা আপনার একার ?

হয়তো তাই। হয়তো তা নয়।

তা নয় মানে ?

আজ না হোক, কাল তো সকলকেই এই পথে আসতে হবে।

কিন্তু সে কাল তো আপনার জীবৎকালে নাও আসতে পারে ?

দেখুন; আমি তো পেশাদার রাজনীতি বিদ এই। আমি অ্যাকশন বুঝি। এক সময় ভেবেছিলাম কোন জটিলতার মধ্যে জীবনটাকে জড়াবো না। সমাজ ব্যবস্থা বদলের ব্যাপারটায় আমার এক্তিয়ার নেই। কখন কবে কি হবে, তা নিয়ে ভাবনা আর প্যাঁচ কষে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়। সুতরাং লুটপাট-ডাকাতি এসব করে নিজের আর সাথীসংগীদের আখের গুছিয়ে নেওয়া—এটাই ছিল আমার বেছে নেওয়া পথ। রণজয়ের সঙ্গে ছাত্র জীবনে আলাপ ছিল সে যখন ক্ষমতার চূড়োয় উঠছে, তখনি প্রয়োজনে সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর আমারো তখন সময় খারাপ চলেছে। গুজরাট বোম্বা-দিল্লী সমস্ত, জায়গাতেই পুলিশ আমার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। সুতরাং আমিও এগিয়ে গেলাম। ব্যাস, তারপর গিলতেও পারি না। ওগরাতেও পারি না। এইভাবেই শেলটার পেয়ে গেলেন ?

শুধু শেলটার পাওয়া নয়। রাতারাতি হিরো বনে গেলাম।

কি রকম ?

তারপর থেকে রণজয়ের সঙ্গে ঘুরি। তাকে সেলাম করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সকলে সেলাম জানায়। আর আমার অ্যাকশনের সময় আর আমাকে আগের মত হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। জায়গামত জানিয়ে দিলেই হোল কোথায় অ্যাকশন করবো।

রণজয়ের সঙ্গেও কি আপনার অ্যাকশনের যোগাযোগ আছে।

যোগাযোগ মানে ? কি বলতে চান আপনি ?

কুন্দলালের চোখমুখ বোধহয় একটু কুঁচকে উঠল। আমি একটু সময় নিয়ে বললাম, আসলে আমি জানতে চাইছিলাম, ডাকাতি বা লুঠের সঙ্গে রণজয়ের কোন সম্পর্ক আছে কি না।

এবার কুন্দলালের মুখে সামান্য হাসি দেখা গেল। আরে, আপনি বলেন কি ? না, মশায় না। কুন্দলাল ভাগে কারবার করে না। তবে ওকে যে আমি কোন টাকা দিইনি, এমন নয়। প্রয়োজনে বরং অনেক টাকাই আমি ওকে দিয়েছি। আর ইদানীং ওর টাকার চাহিদা শুনলে আপনিও ভিরমি খাবেন।

আচ্ছা কুন্দলালজী, রণজয় ছাড়া অন্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি

রকম। অন্য বলতে কেউ আছে নাকি? যাদের নাম শোনেন, তারা সকলেই ওর উপগ্রহ। ও আছে বলেই তারা আছে। না থাকলে তারাও থাকবে না।

আচ্ছা, দেশের প্রসাশন ব্যবস্থা ক্রমশ ওর হাতে চলে যাচ্ছে কি করে?

দেখুন মিঃ সেন, আপনি পেশায় সাংবাদিক: অনেক কিছুই আপনার জানা থাকবার কথা। আর জানেনও বোধহয়। তবে আমার মুখ থেকে কেন শুনতে চান?

আপনি তো এখন ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাই যে অন্তরঙ্গ পরিচয় আপনার জানা থাকার কথা, আমাদের মত বাইরের লোকের পক্ষে তা কি সম্ভব?

প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন কুন্দলাল। পকেট থেকে লাইটার বের করে নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলেন। লাল আগুনের আভায় এক মুহূর্তের জন্যে ওর চোখ মুখ যেন জ্বলে উঠল। আমি তখন অবশ্য মনে মনে অন্য কথা ভাবছিলাম। আসলে রণজয়ের কথায় আমার খুব প্রয়োজন নেই। ওর বিষয়ে সব কথাই আমার জানা। আমি জানতে চাই কুন্দলালের কথা। তার জীবন, তার ভালবাসা, তার বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি কথা। যদিও কুন্দলাল বলেছেন, সব বলবেন, তবু যেন দেরী সহ্য হচ্ছিল না। এসব কথায় সময় নষ্ট করার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

কুন্দলাল মুখ খুললেন, আমার মনে হয়, ও ওর মাকে ব্লাকমেল করছে। আর এখন ওর মা মানেই তো দেশ। সুতরাং ওর ক্ষমতা পেতে সময় লাগবে কেন? আর এখন ও যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে সব কিছুই ডিক্টেট করা চলে। আর ওর ক্ষমতার আসল উৎস হচ্ছে ওর উপস্থিত বুদ্ধি। ও জানে কখন কাকে কিভাবে আঘাত করতে হয়। এই তো সেদিন আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের একজনকে ও কিভাবে সরিয়ে দিল, দেখলেন না?

কিন্তু ব্লাকমেলের কথাটা কি বলছিলেন? কিভাবে এই ব্লাকমেল?

দেখুন, সকলের জীবনেরই কোনো দুর্বল অসহায় মুহূর্ত থাকে, আর সেটা জানে তারই নিকট জন। সুতরাং ওর মায়ের ওরকম কোন বিশেষ সময়ের ঘটনার কথা তো ওর না জানার কথা নয়। আর তার পাবলিক ইমেজ নষ্ট করে দিতে রণজয় ছাড়া অন্য কে তেমন করে পারে?

কিন্তু রণজয়ও তো শুনেছি, কম পারভার্ট নয়।

তা সত্যি। সে সব কথা অন্যদিন বলব। কিন্তু তার ইমেজ তো আর তার মা নষ্ট করবেন না। তার তো ধারণা রণজয়ই বংশের তৃতীয় পুরুষ হিসেবে মসনদ ধরে রাখবে।

আপনিও কি সেটা বিশ্বাস করেন?

একেবারেই না।

তবে? ওর মা কি ওর সম্পর্কে সব খবর পান না?

কি করে পাবেন? তিনি দেশের সব অবস্থারই খবরই ঠিকমত পান না। সব কিছুই রণজয়ের মারফৎ যায় যে। তার চাকর খানসামা থেকে শুরু করে সেক্রেটারী পর্যন্ত সকলেই রণজয়ের লোক। পুরোন সমস্ত লোকজনকে রণজয় কবে হাটিয়ে দিয়েছে।

আপনি তো সরাসরি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

পাগল। তা পারলে কি আর আমি চিঠি পাঠাতাম? ওর ছাড়পত্র ছাড়া আমি কেন, কোন রাজামহারাজাও ওর মায়ের কাছে যেতে পারে না। দেখেন না, পার্টি মিটিং থেকে শুরু করে প্রশাসনের মিটিং পর্যন্ত, সর্বত্রই ওর উপস্থিতি।

আচ্ছা ওর পার্টি প্রোগ্রামের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ আছে? একেবারেই না। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, ওসব বুজরুকীতে আমার কোন আস্থাও নেই।

আপনি তো বলেছিলেন যে রাজনীতির সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু রণজয়ের রাজনৈতিক প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায়, আপনি কি রাজনীতির বাইরে থাকতে পেরেছেন?

উত্তর না দিয়ে, পাল্টা প্রশ্ন করলেন কুন্দলাল, আপনিও তো একটা কাগজের রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এ রাজনীতির সঙ্গে তাহলে আপনিও যুক্ত। কি বলেন?

আমি তো চাকরি করি। ওটাই আমার জীবিকা।

আমাকেও সেইরকম ভাবতে পারছেন না কেন? নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে ওর হাত ধরেছি। ও জানে, এখন ওকে ছাড়া আমার চলবে না। তাই ও আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। এর বেশি কিছু নয়।

তাহলে মনের দিক থেকে বাধা পাচ্ছেন কেন?

হো হো করে হেসে উঠলেন কুন্দলাল, আমার কি মন বলে কিছু আছে? ওসব উপন্যাসের সস্তা সেন্টিমেন্টের রুগী আমি নই। তবে নাসবন্দির বিরুদ্ধে লড়ছেন কেন?

একে কি আপনিও লড়াই বলেন?

বলি। একের লড়াইই তো শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষের লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। আপনিও তো সামাজিক মানুষ।

আবার হেসে উঠলেন কুন্দলাল। সমাজ? সামাজিক মানুষ? না, না মশায়, কোনকালেও আমি ওসব ছিলাম না। হতেও চাই না।

অর্থনীতির ভাল ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিও করেছেন শুনেছি। বিদেশে গবেষণা করেছেন। এখন জীবনযাপনের ধারা পাল্টেছেন বলে, অতীতের কোন আকর্ষণই কি অবশিষ্ট নেই?

অনেক কথা স্বীকার করতেও এখন ভয় পাই মিঃ সেন।

কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের এই লুকোচুরিও তো চিরকালের নয়।

চিরকাল বলে কি কিছু আছে?

কথাটা দার্শনিকের মত শোনাচ্ছে না?

দার্শনিক। বেশ বলেছেন, যা হোক।

না, না কুন্দলালজী, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। একথা কি সত্যি নয় যে ১৯৭২-এ গুজরাটের এক ব্যাঙ্ক থেকে আপনি এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা লুট করেন আর সেই সমস্ত টাকা

আপনি কোন এক উগ্রপন্থী দলের হাতে তুলে দেন।

কথাটা আপনি কি করে জানলেন ? কুন্দলালের চোখে বিস্ময়।

যে ভাবেই জেনে থাকি, ঘটনাটি সত্যি কি না বলুন।

যদি সত্যি হয়ও তার মধ্যে আপনি আমার রাজনীতির গন্ধ পেলেন কি করে।

তবে দিয়েছিলেন কেন ?

সেটা নেহাৎই বন্ধুকৃত্য।

কি রকম ?

আমার ছাত্রজীবনের এক দোস্ত হঠাৎ একদিন আমার কাছে এসে হাজির হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আমার সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন করত। আর তাছাড়া ভাল ছাত্র হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। আমার সঙ্গে নানা কারণে তার খুবই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে সেদিন এসে বলল, তাদের সংগঠন, রাজনীতিক মতাদর্শের কথা। সব কথা শোনার আগ্রহ আমার ছিল না। তাছাড়া এদেশে গেরিলা লড়াই, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও, মুক্তাঞ্চল ইত্যাদি আমার ধারণায় খুবই রোমান্টিক আর অতি বাম বিচ্যুতি বলে মনে হলো। তবু সে যখন টাকার কথা বলল, আমি না বলতে পারি নি।

তবে কি আপনি মনে করেন সাংবিধানিক পথেই সব হবে ?

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস্যের কথাটা এর মধ্যে আসছে কোথায় ?

এই মাত্র তো বললেন, ওদের পথ অতিবাম বিচ্যুতি।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাই মনে হয়েছিল।

কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন, কুন্দলালজী ?

না, একেবারেই না। রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই আজ আর আমার মাথায় ঢোকে না। তবে একটা কথা বোধহয় সত্যি যে আপাতত দেশের অবস্থা মেনে নিয়ে সাংবিধানিক পথে আন্দোলন করে জনগণকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ পথে কিছু হবে না। হবার নয়।

তবে আপনি রণজয় মোদী আর তার দলকে মদত দিচ্ছেন কেন ?

প্রশ্নটা কি ঠিক হোল ? আমি মদত দেবার কে ?

রণজয় তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আপনাকে ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দেবে জেনেও কেন তবে আপনি তার সঙ্গে হাত মেলালেন।

হাত মেলাই নি। আবারও বলছি, শেলটার।

যদি বলি, এ সবই আপনার মিথ্যে কথা। আপনারাও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

না, মিথ্যে নয়। আমার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? আমি তো রাজনীতিবিদ নয়। একজন নাম করা ডাকাত মাত্র।

চুপ করে গেলেন কুন্দলাল। হাতের ঘড়ি দেখলেন। বুঝলাম আর দেরী না করে এবার উঠে পড়া উচিৎ। মনের মধ্যে তখন আমার অনেক প্রশ্ন। কেন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে কুন্দলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী নিয়ে ডাকাত হয়ে যায় ; কেন সে রণজয়ের মত রাজনীতিকের শেলটার নেয়, কেন রাজনৈতিক দলকে গোপনে অর্থ সাহায্য করে, সবই আমার কাছে প্রশ্ন। আর তারই উত্তর খোঁজার জন্য আমি আবার তার কাছে গিয়েছিলাম। তারপর আরও একদিন। আর এভাবেই জেনেছিলাম তার সমস্ত জীবনের কাহিনী। সমস্ত দুঃখ বেদনা আনন্দের ইতিহাস। তবু তার জীবন কাহিনীর মধ্যে কোথাও কোথাও ফাঁক থেকে গিয়েছিল। আর তারই সন্ধানে আমি দ্বারস্থ হয়েছি আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধুর। আর এ ভাবেই আস্তে আস্তে আমার মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠছেন একজন আস্ত মানুষ, যার নাম কুন্দলাল।

॥ দুই ॥

উনিশশো তেষট্টিতে কুন্দলাল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে।

ভূপাল শহরের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। বাবা কৃতবিদ্য ইঞ্জিনীয়ার। বিদেশী ডিগ্রির জোরে বড় চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েই দেশে ফিরেছিলেন। আর সে চাকরির দৌলতেই বাড়ী গাড়ী নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের তৃপ্তিও পেয়েছিলেন। তারপর বছর খানেকের মাথায় দেখেশুনে এক আই সি এস এর কন্যাকে বউ করে ঘরে তুলেছিলেন। খানসামা-বাবুর্চিতে অভ্যস্ত আধা মেম সে কন্যা পার্টি ক্লাব করে ঘর বাইরেকে আপন করে ফেলেছিল। কাজ পাগলা ইঞ্জিনীয়ার এভাবে জীবনটা সাজিয়ে নিতে না নিতেই তাদের ঘরে ছেলের জন্ম হোল। বাপ মায়ের অত্যন্ত আদরের ছেলে কুন্দলাল।

কিন্তু এ সুখ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কপালে বেশিদিন সইল না। কুন্দলালের বয়স যখন বছর দশেক, তখন ওর মা, তার স্বামীর এক মিলিওনিয়ার বন্ধুর সঙ্গে প্রেমে পড়লেন। তারপর নিয়ম মাফিক সংসারে অশান্তি এল ; বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা উঠল কোর্টে। এবং কুন্দলালের বারো বছরে ওর মা স্বামী পুত্র ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ভূপাল ছেড়ে চলে গেলেন।

বারো বছর জীবনের সে দিনের কথা এখনো কুন্দলালের স্মৃতিতে স্পষ্ট। ক'দিন ক'রাত যে সে কেঁদেছিল, তা মনে পড়ে না। বাবা গুম মেরে গিয়েছিলেন। অনেকদিন বাইরেই বেরোয় নি। তারপর একদিন পুরোন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, নতুন চাকরি নিয়ে ছেলের হাত ধরে বম্বেতে চলে আসেন। আর সেদিন থেকে ছেলে-বাবার সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কুন্দলালের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। আর দিনে সে ফাঁকটাই হয়ে উঠল গভীর ক্ষত। তখন সে আর কোন কিছুতেই আনন্দ খুঁজে পায় না। আর ভাল লাগে না। ভেতরে ভেতরে সমস্ত সময় একটা অস্থিরতা তার মনকে ভীষণভাবে ক্লান্ত করতে থাকে। আর এক ক্লান্ত আর একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যেই কুন্দলাল সমস্ত দিন আর ঘুম-না-আসা মধ্যরাত পর্যন্ত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। তারপর যেদিন সিনিয়র কেমিস্ট্রি পরীক্ষায় টু পয়েন্টের নিদারুণ ভালো রেজাল্ট নিয়ে কুন্দলাল বাড়ী ফিরল, সেদিন ওর বাবা কী খুশি যে হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনও কুন্দলাল হাসতে পারেনি। এবং এই

মানসিকতা নিয়েই কুন্দলাল কলেজে ভর্তি হোল। তারপর আগের মতোই বই বাড়ী কলেজ এবং কলেজ বাড়ী বই করেই তার স্বল্পপরিসর জীবনধারা। কলেজে প্রথম পরীক্ষার আগে পর্যন্ত তার দিকে কারো তেমন নজর পড়েনি। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরুবার পরই হোল বিপদ। অনেকেই তার কাছাকাছি আসবার জন্যে আগ্রহ দেখাল। কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সে কাউকেই নৈকট্যে আসবার সুযোগ দিল না। কেউ তাকে দাম্ভিক বলল। কেউ বা গেঁয়ো। কুন্দলাল সকলকে সরিয়ে দিয়ে আগের মতই রয়ে গেল। আর এ ভাবেই সে থাকতে চায়। তবু একদিন ঘটনাটা ঘটে গেল।

অন্য দিনের মত সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফিরছিল কুন্দলাল। কলেজ গেট থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসতেই, ওর সহপাঠী কয়েকজন ওকে ঘিরে ধরল। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি দাদা, বাড়ী চল্লেন? ও কোনমতে 'হুঁ' বলে পাশ কাটাতে যেতেই, আর একজন এগিয়ে এল,, চলুন না কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। ও বলল, না, সময় নেই। আর একজন এগিয়ে এল, খুব যে! চলুন চলুন। ছেলেটা ওর হাত ধরল। ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করেছিল কুন্দলাল। এক ঝটকায় ছেলেটার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে গেল। আর তখনি ওর মুখে এসে পড়ল কারো সজোর ঘুসি। এক মুহূর্তে সামলে নিতে সময় নিল কুন্দলাল, তারপর মধ্যপ্রদেশ কম্বলের বেহড় ওর রক্তে হানা দিল। হাতের বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর হাত ঘুসি চালাতে থাকল। মারের চোটে কে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল কুন্দলাল দেখেনি। বইপত্র কুড়িয়ে বাড়ী ফেরবার সময় তার মনটা শান্তি পেল। বারো বছর বয়সের পরে, এই প্রথম সে খুশী হোল। বাড়ীতে ফিরে রাতে সে বাবার সঙ্গে খেতে বসল। অন্য দিনের মত মুখ বুজে খেল না। বাবার সঙ্গে কথাও বললো।

এবং এর পর থেকেই পাল্টে যেতে থাকলো কুন্দলাল। কলেজের বকাটে মস্তান ছেলেরা তার আশে-পাশে ভিড় জমাল। আর নিজেরই অজান্তে সে কখন যেন ওদেরই একজন হয়ে গেল। এরপর থেকে সমস্ত অসামাজিক কাজেই কুন্দলালের উৎসাহ বেড়ে চলল। আর একমাত্র এ কাজেই সে আনন্দ পেত। পড়াশুনায় অত্যন্ত ভাল ছেলে বলে, তার সম্পর্কে যথেষ্ট কুৎসা সত্ত্বেও, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না। ভাল ছেলেরা তাকে দেখলে দূরে-সরে যেত, কুন্দলাল তাতেও যেন খুশি হোত।

কুন্দলাল ধাপে ধাপে নিচে নামতে থাকল। এক একদিন অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে। ওর বাবা দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করে কোন সদুত্তর পান না। কাজ ছিল বলে, সে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু অনেক কথাই তার বাবার কানে যায়। ছেলে খারাপ সংস্পর্শে মিশছে। নানা রকমের নেশা করছে। প্রায়ই অনেক রাতে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরছে। তবু তিনিও ছেলেকে বেশি কিছু বলতে পারেন না। কোথায় যেন তার অপরাধবোধ কাজ করে। তিনি ছেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয়ে পান।

এদিকে কুন্দলালের খেয়াল আর নেশার ফলে ধার দেনা হতে থাকে। বাবার কাছে টাকা চাইতে তার লজ্জা হয়। অথচ বন্ধু-বান্ধব, দোকানদার সকলের কাছেই হাত পাতার দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন কি করবে কুন্দলাল?

অথচ টাকা চাই। টাকা না হলে চলবে না কুন্দলালের। বারো বছর বয়সে জীবনে যে অন্ধকার নেমেছিল আর যে অন্ধকারের ভার মুখ বুজে সে সহ্য করে এসেছে, আজ এতকাল পরে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজ আর কোন কিছুর বিনিময়ে সে পুরোন অন্ধকারে ফিরে যাবে না। যে করেই হোক টাকা চাই। টাকার জন্যেই কিছু একটা করতে হবে। কুন্দলাল ভাবতে থাকে।

তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রামপ্রতাপ সিং পাঞ্জাবের ছেলে। দিনের পর দিন দু'জনে পরামর্শ করে। কিন্তু কেউই কোন পথ বাৎলাতে পারে না। রাম-প্রতাপ ধনী পরিবারের ছেলে। কিন্তু তাকেও বাবার পাঠানো টাকার ওপর নির্ভর করতে হয়, সুতরাং কুন্দলালের অন্তরঙ্গ হিসেবেই রামপ্রতাপও ভাবতে থাকল।

তখন বি, এ পরীক্ষার মাসখানেক বাকি। কুন্দলাল লেখাপড়া নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত। কিন্তু বই থেকে মুখ তুললেই টাকার চিন্তা। কেনসীয় অর্থনীতি, মানি, থিয়োরী, ফ্রীডম্যান, মদিগিলিয়ানী, থিয়োরী অব সারপ্লাস ভ্যালু, মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে। কিন্তু সব ছাপিয়ে আবার টাকার ভাবনা। কিন্তু সমাধান কি? কুন্দলাল ভাবতে থাকে। টাকা চাই। কিন্তু কি করতে পারি আমি? বাবার কাছে চাইবো? না, না। তাকে কেন জানাবো? কোন্ লজ্জায় তার কাছে হাত পাতবো?

পরদিন কলেজ যাবার জন্যে সবে মাত্র বাসে উঠেছে সে, আর তখনি তার চোখ পড়ল মেয়েটার ওপর। কতই বা বয়স হবে মেয়েটির। বছর পঁচিশ। কিন্তু তার মুখের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল কুন্দলাল। বারো বছর বয়সে শেষ দেখা মায়ের মুখ তার চোখের সামনে ঝলকে উঠল। ক্ষোভে রাগে মুখের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠল। হাতটা আপনা আপনি মুঠো হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে উন্মাদ হয়ে গেল সে। আর তখনি সে মুখের আভাষ ম্লান করে দিয়ে বাসের জানলা দিয়ে পড়া সূর্যের আলোয় মেয়েটির গলার হারটা ঝিকমিক করে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে পারল না কুন্দলাল। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে এক টানে, কেউ কিছু বোঝার আগেই, তার গলার হারটা ছিঁড়ে নিয়ে চলন্ত বাস থেকে এক লাফে নেমে পড়ল কুন্দলাল। ভাগ্য বোধহয় সেদিন তার ভালই ছিল। তা না হলে সামনে ট্যাক্সিটাকে কি সে, দাঁড়িয়ে থাকা দেখতে পেত। চিৎকার, কণ্ডাক্টারের ঘণ্টা, বাস থামা, ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে ঘটতেই তার ট্যাক্সিটা অনেক দূরে এগিয়ে গেল।

কুন্দলাল এই প্রথম রক্তের স্বাদ পেল। নিজের অজান্তেই সেদিন তার ভবিষ্যতের পথ নির্ধারিত হয়ে গেল।

গলার হারটা ছিঁড়ে কুন্দলাল দিল ছুট……।

কিন্তু সেদিন কুন্দলাল যত খুশি হয়েছিল, তেমন আনন্দ সে জীবনে আর কোনদিন পায়নি।

টাকার একটা—সাময়িক সমাধান হয়ে গেল। অবশ্য হারটা বিক্রির ব্যবস্থা রাম প্রতাপই করেছিল। একটা মাস, এরপর, আর বই থেকে মুখ তুলল না কুন্দলাল। বাইরেও বিশেষ বেরুত না। এক রামপ্রতাপ ছাড়া কাউকেই বড় একটা কাছে ঘেসতে দিত না। আসলে, লেখাপড়ার বাইরে, সেই হারচুরির আনন্দটা সে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল ভয়। আবার যদি কোন মেয়েকে দেখে মায়ের কথা মনে পড়ে। হাত দুটো আবার যদি শক্ত হয়ে ওঠে। নিজের মনের মধ্যে আনন্দ আর প্রতি হিংসার লড়াই চলতে থাকে কুন্দলালের অথচ এ এমন এক দ্বন্দ যা কাউকে বলা যায় না প্রাণের বন্ধু রামপ্রতাপকেও নয়।

কুন্দলাল কি নিজেকেই নিয়েই ভয় পেল রামপ্রতাপ একদিন অনুযোগ করল; কি রে, আর কি বাইরে বেরুবি না ঠিক করেছিস ?

কুন্দলাল হাসে। বলে, দাঁড়া পরীক্ষাটা মিটে যাক।

ওসব পরীক্ষার অজুহাত দেখাস না। তুই তো বসলেই ফার্স্ট ক্লাশ।

না রে, নিজের ওপর আমার আর তেমন বিশ্বাস নেই।

সে যাই হোক, অনেকদিন গলা না ভেজাতে পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি।

তার মানে তো আবার দুশ্চিন্তা। আবার টাকার সমস্যা।

থাম থাম। টাকার আর ভাবনা কি গুরু। তুমি একদিন বাসে উঠলেই তো কাজ হাসিল।

কি বললি ? আমি ছিনতাই করতে বাসে উঠি ? এত বড় সাহস তোর ? গেট আউট। গেট আউট। আই সে গেট আউট। চিৎকার করে উঠেছিল কুন্দলাল। এত জোর চিৎকার যে বাড়ীর চাকর বাকরেরা ছুটে এসেছিল। মাথা নিচু করে বসেছিল রামপ্রতাপ। কুন্দলালের চোখে জল চক্‌চক্‌ করছিল।

পরে বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু কেন সে অত রেগে গেল ? কেন বন্ধুকে অমন করে অপমান করল ? কুন্দলাল সেদিন সারা রাত ঘুমোতে পারল না। বারো বছরে শেষ দেখা মায়ের মুখ। মা কি আমার শত্রু ? কার মুখের ছবি আমার হাতের আর মুখের পেশীগুলোকে শক্ত করে দেয় ? ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কুন্দলাল। আর সেই পাতলা ঘুমের মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখল : কোন একজন ঘোমটা ঢাকা মহিলা দরজা পেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়ালেন। সে, কে বলে চেঁচিয়ে উঠতেই, মহিলার ঘোমটা সরে গেল। ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক বীভৎস কঙ্কালের মুখ। আর তার হাতদুটো আস্তে আস্তে কুন্দলালের গলার দিকে এগিয়ে এল। তার মনে হল এখুনি মহিলা তার গলা টিপে মারবে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কুন্দলাল। এক ধাক্কায় তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর দু'হাতে সে তার গলা টিপতে থাকল। মহিলা বেশ কিছুক্ষণ হাত পা ছুড়লেন। তারপর শরীরটা নিথর হয়ে যেতেই, কুন্দলাল উঠে দাঁড়াল। আর তখনই সে দেখল, সেই বীভৎস মুখের জায়গায়, তার স্মৃতিতে ধরে রাখা মায়ের মুখ। ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠেছিল কুন্দলাল। জেগে উঠে দেখল তার সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তখন সকাল।

কুন্দলাল চান করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। জামাকাপড় পরে তৈরী হয়ে বাইরে বেরুল। বাড়ীতে থেকে থেকে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। রামপ্রতাপের কাছেই যাওয়া যাক। বাড়ীর গলিটা পেরিয়ে সে বড় রাস্তায় এসে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে সে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই সে দূর থেকে একটা বাস আসতে দেখল। আর তখনই সে ভয় পেল। চারিদিকে তাকিয়ে সে পিছু হটতে থাকল। তারপর এক ছুটে সে বাড়ীতে ফিরে গেল। একেবারে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। তখন তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ, সে নিজেই শুনতে পাচ্ছিল।

পরীক্ষার ক'দিন সে ট্যাক্সি করে গেল। ট্যাক্সি করে ফিরল। শেষদিন বন্ধু রামপ্রতাপকে ধরে নিয়ে এল। রাতে ওঠবার আগে রামপ্রতাপ কথাটা তুলল, আর তো দু'চারদিন আছি। দেশে ফিরতে হবে। তার আগে চল একদিন কোথাও বসা যাক। আজ আর আপত্তি করতে পারল না কুন্দলাল। ঠিক হোল, কাল সন্ধ্যে ছ'টায় 'সি সাইড বারে' ওরা বসবে।

সে সময় বারে বেশ ভিড়। ওরা দু'জন এককোণে একটা জায়গা পেয়ে গেল। দুটো বিয়ার বোতল থেকেই গলায় ঢেলে ওরা দু'পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল। তারপর আরও দু'পেগ। সেটা শেষ করে বেয়ারাকে আরও দু'পেগের অর্ডার দেবার সময়ই রাম-প্রতাপ গণ্ডগোলটা শুরু করে। বেয়ারা অগ্রিম দামটা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রতাপ ক্ষেপে গেল, আমরা কি চোর না গুণ্ডা, যে দাম না দিয়ে পালাব? যাও আগে নিয়ে এস, তারপর টাকা। বেয়ারা যত বলে, না সাহেব, এটাই নিয়ম, ততো সে ক্ষেপে যায়। ঝগড়া যখন এভাবে চলছে, তখন বেহেড মাতাল কুন্দলাল হঠাৎ সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারার মুখে ঘুসি মারল। সে বেচারা সে ঘুসির ধাক্কা সামলাতে পারল না। সটান মেঝের উপর ছিটকে পড়ল। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত। বারের ম্যানেজার ছুটে এল। তার লোকজনও। তখনি পুলিশ ডেকে কুন্দলাল আর রামপ্রতাপকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হল।

-অনেক রাতে খবর পেয়ে কুন্দলালের বাবা থানায় ছুটলেন। তারপর অনেক টাকাকড়ি, অনেক তোষামোদ। মধ্যরাত পেরিয়ে একসময় তিনি ছেলে আর ছেলের বন্ধুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। বেয়ারাটার পড়ে যাওয়া, লোকজনের চেঁচামেচি, পুলিশের ধাক্কায় কুন্দলালের নেশা কেটে গিয়েছিল। আর তখন ও অবাক হয়ে দেখছিল বেয়ারাটার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত। রক্তের ধারা। সে দৃশ্য ওর ভালো লেগেছিল। ভীষণ ভাল লেগেছিল। ও কেমন যেন তারিয়ে তারিয়ে সে দৃশ্য দেখেছিল। পুলিশ জোর করে টেনে না নিয়ে গেলে, কুন্দলাল আরও অনেকক্ষণ সে দৃশ্য দেখত। আরও অনেকক্ষণ। পুলিশের জিপে উঠে ও ওর হাতটার দিকে অপলক তাকিয়েছিল। হাতে এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই। অনেকক্ষণ ধরে ও ওর হাতটাকে উল্টেপাল্টে রক্তের দাগ খুঁজেছিল। আর খুঁজে না পেয়ে ওর মনে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। আহা, এক ফোঁটা রক্তেরও দাগ লাগে নি কেন?

রামপ্রতাপ তার পরের পরদিন দেশে চলে গেল। কুন্দলাল আবার নিজেকে বন্দী করল নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। আবার ধীরে ধীরে তাকে পেয়ে বসল সেই একাকীত্ব। সেই বিষণ্ণতা। সমস্ত দিনরাত সে ঘরের আলো জ্বালে না। মাঝে মাঝে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বইয়ে মুখ গুঁজে নিজের কাছ থেকে পালাতে চাই। কিন্তু সেই বা কতক্ষণ। সে ক্লান্ত বোধ করতে থাকে। আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। আর এই অন্ধকার নির্জনে পাইচারি করতে করতে সে ভাবতে থাকে। কিন্তু সুস্থির ভাবে যুক্তি মেনে তো কিছুই ভাবতে পারি না আমি। নিজের কথা ভাবতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। সে মুখ সরে গেলেই বাবার চিন্তিত মুখ। তারপর। তারপর বাসের সেই মেয়েটা, হার ছিঁড়ে নেওয়া। দু একজন বন্ধুর মুখ। বার। বেয়ারাটার মুখে নাকে রক্ত। আমি মানুষ জানি না। সমাজ। মার্ক্স তো বলেছিলেন……। লেনিন। ডিক্লাসড্ হাওয়া। চীনের পথ কি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু স্টেট? শোষণের যন্ত্রটা তো সচল থাকছেই। তবে। আইন নেই, রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হবার অবকাশ নেই, চিরাচরিত সমাজ নেই। এমন একটা অবস্থা। নৈরাজ্যবাদ? কিন্তু আমার কি ভূমিকা? বাবা কি চান জানি না। আমি কি চাই? এই অন্ধকারে আর কত দিন? কুন্দলাল, তুমি কি চাও। নিজের কথা নিজে না ভাবলে কে ভাববে?

অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়ে গ্রাজুয়েট হল কুন্দলাল। বাবা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে ছেলের রেজাল্ট বেরুলে তাকে দিল্লীতে এম এ পড়তে পাঠাবেন। অন্য পরিবেশ হয়তো তাকে বদলে দেবে। হয়তো সে কাটিয়ে উঠতে পারবে তার বিষণ্ণতা এবং একাকীত্ব। সেই পরিকল্পনা মতই অর্থনীতিতে মাষ্টার ডিগ্রী করতে কুন্দলাল দিল্লী এল। হস্টেল ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা ছিল। সুতরাং……।

হস্টেলের ডাবল সীটেড রুমের একটা সে দখল করার ক'দিনের মধ্যেই অন্য দখলদার এসে হাজির হোল। বিহারের ছেলে। অবোধনারায়ণ সিনহা। লম্বা, রোগা চেহারা, রঙ কালো। কিন্তু কি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সে চোখের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। তার বিষয়েও অর্থনীতি। প্রথম দিন কথা বলেনি কুন্দলাল। দ্বিতীয় দিন অবোধ যেচে আলাপ করল। আর তার কথাবার্তায় যে বিদ্যুতের চমক, তাকে কিছুতেই অবহেলা করতে পারল না কুন্দলাল। তাকে কাছে ঘেঁসতে দিল। অবোধ সঙ্গী পেয়ে খুশী হোল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হতে না হতেই অবোধের অনুরাগীর সংখ্যা বেড়ে চলল। দলের নেতা বনে যেতে তার দেরি হোল না। কলেজ ইউ নিয়নের নির্বাচনে তার দলই জয়ী হোল। তখন কুন্দলালের মনে হয়েছিল ঘোরতর বামপন্থী অবোধনারায়ণ যেন রাজনীতি করবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। কুন্দলালের সঙ্গে তার মতাদর্শের মিল ছিল কিনা সেকথা কুন্দলাল কোনদিন ভাবেনি। অন্য কোন এক আকর্ষণে সে যেন অবোধের

ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত অবোধ কোনদিন স্পর্শ করতো না; তার একমাত্র নেশা ছিল পান। অন্যদিকে মদে আসক্ত কুন্দলাল অনেকদিন উপবাসী থাকায় ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠছিল। কিন্তু অবোধের মত মরালিস্ট পাছে সেকথা জানতে পারে, তাই সে সব সময় নিজেকে আড়াল করত।

কিন্তু সংসারে পথের লোকের অভাব বড় একটা হয় না। কুন্দলালও একদিন তার মনের মত বন্ধু পেয়ে গেল। বম্বের এক ধনী পরিবারের ছেলে প্রকাশ চোপরা। আধুনিক ইতিহাসে এম এ পড়তে এসেছে। ধনী পরিবারের বয়ে যাওয়া ছেলে বলতে যা বোঝায়, এ ছেলে তার চেয়েও এককাঠি সরেস। কোন ম-কারেই তার আপত্তি নেই। এবং ভোগের বাসনাও তার অপার। তার সঙ্গে কুন্দলালের আলাপটাও হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে। একদিন বিকেলে ছাত্র-ইউনিয়নের একটা জরুরী মিটিং হচ্ছিল। অবোধ বক্তৃতা করছিল: বন্ধুগণ, আজকে ছাত্রদের সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সে কারণেই আমরা যদি আমাদের আন্দোলনকে একটা বিচ্ছিন্ন, নেহাৎই ছাত্রদের আন্দোলন বলে মনে করি, তবে তার চেয়ে ভুল আর কিছুই নেই। আজকের আর্থনীতিক ব্যবস্থা, সমাজের এক শ্রেণীকে দিচ্ছে অর্থের পাহাড়। যারা ধনী তারা আরো ধনী হচ্ছে। আর অন্যদিকে গরীবেরা আরো গরীব হচ্ছে। শ্রেণী সংগ্রাম আমাদের তীব্রতর করে তুলতে হবে। ইতিহাস তার নিয়মেই বদলায়। আমাদের কাজ হচ্ছে তাকে দ্রুততর করা। আজকের কায়েমী স্বার্থ···।

কুন্দলাল অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথা তার কানে ঢুকছিল না। কেবল দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ শুনল একটা মন্তব্য, রাবিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা কেন? মাঠে ময়দানে গেলেই তো হয়। মন্তব্যটা যেন তার পেছন থেকেই এসেছিল। কুন্দলাল পেছন ফিরতেই দেখল প্রকাশ চোপরাকে। সে চলে যাচ্ছিল। কুন্দলাল এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ ধরল। জিজ্ঞেস করল, কি বলছিলেন মশায়? ওর কণ্ঠস্বরে বোধহয় কাঠিন্য ছিল। প্রকাশ এক ঝটকায় কাঁধ সরিয়ে নিল। বলল, কেন আপত্তি আছে?

এবার সে প্রকাশকে সামনাসামনি দেখল। ছ'ফুট লম্বা। বলিষ্ঠ। ফর্সা রঙ। এর ওপর হাত চালালে, তার হাতও চলবে। কুন্দলাল থমকে গেল। বলল, তবু এরকম মন্তব্য কি ঠিক? ছাত্রদেরও তো ন্যায্য দাবিদাওয়া আছে।

সেটা কে অস্বীকার করছে? কিন্তু অবোধের কথায় ছাত্রদের বক্তব্যটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে যে!

কিন্তু আজকে কি কোন আন্দোলনকে আলাদা করে ভাবা যায়?

তাহলে আর ছাত্র আন্দোলনের দরকার কি? দেশের বামপন্থী আন্দোলন সফল হলেই তো সকলের সব দুর্দশা ঘুচে যাবে। তা তো যাবেই। কিন্তু আন্দোলনটা সর্বস্তরে গড়ে না উঠলে···থামুন, মশায় থামুন। অবোধের প্রতিধ্বনি করবেন না। ওই জন্যেই আজ ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের সমস্যার কথা নেই, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক-কর্মচারীর বক্তব্য ভাষা পায় না, শিক্ষক আন্দোলনে পার্টি ম্যানিফেস্টো খুলে স্লোগান দেওয়া হয়।

কুন্দলাল চুপ করে গেল। সে বুঝল, ওকে বোঝান যাবে না। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই সব আন্দোলনই এক বৃহৎ দেশব্যাপী আন্দোলনের অংশবিশেষ। এর একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। আর এই ছোট ছোট আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ থেকে একদিন জন্ম নেয় এক সামগ্রিক আন্দোলন। শ্রমিকের জীবন আর রুজির লড়াই, কৃষকের জমি আর জীবিকার লড়াই, ছাত্র শিক্ষকের শিক্ষা আর পরিবেশের লড়াই তো একই আন্দোলনের অংশভাগ।

কুন্দলালকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রকাশ কেমন যেন মিইয়ে গেল। বলল, ছেড়ে দিন ওসব কথা। প্রথম দিনই ঝগড়ার মধ্যে আমাদের আলাপ হোল। আসুন দিনটাকে সেলিব্রেট করা যাক।

কি করে? কুন্দলালের গলায় জিজ্ঞাসা।

কি আর? পরস্পরের স্বাস্থ্যপান আর কি।

না মশায়। মুখে মদের গন্ধ পেলে হস্টেল থেকে তাড়াবে। আপনার তো ভাবনা নেই। নিজের বাড়ীতে থাকেন।

খুব হয়েছে। আর সতীপনা দেখাবেন না। আপনার হস্টেলের সব শালাকেই আমার চেনা আছে। কোন্‌টা নেশা করে না বলুন তো। ড্রাগ অ্যাডিক্ট তো সবাই। ওই অবোধের মত দু'একটাই যা একসেপশন। চলুন। চলুন।

কুন্দলালের সুপ্ত বাসনা তখন ওর পিঠে চাবুক মারছে। কুন্দলাল প্রকাশের হাত ধরল।

কুন্দলাল হুইস্কি খেতে ভালবাসে। কিন্তু সেই প্রথম দিন বলেই সে সম্ভবত ভয় পেয়েছিল। তারপর তো অনেক দিন, অনেক, অনেক দিন সে হুইস্কি খেয়ে নির্ভয়ে হস্টেলে ফিরেছে। কিন্তু সেদিন সে মাত্র দু'পেগ জিন খেল। গন্ধটা অন্ততঃ পাওয়া যাবে না। প্রকাশ দু ঘণ্টায় চার পেগ হুইস্কি গিলে শরীর টানটান রেখে কুন্দলালের হাত ধরে বার থেকে বেরিয়ে এল।

নিজের গাড়ীতে ওঠবার আগে প্রকাশ নিজের বাড়ীতে যাবার জন্যে তাকে নেমন্তন্ন করে গেল। আর সেই মুহূর্তে কুন্দলাল ওর মুখে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেল।

আর সেই থেকে কুন্দলাল অবোধকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। অবোধও যেন সবকিছু বুঝতে পেরে কোন তাপ উত্তাপ দেখায় না। কচ্চিৎ-কদাচিৎ জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ? ক্লাসের পর কোথায় থাক? কুন্দলাল কোন পরিষ্কার জবাব দিতে পারে না। হুঁ, না করে এড়িয়ে যায়। অবোধের মুখোমুখি হলে ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা পাপবোধ জেগে ওঠে। ওর ঋজু মনুষ্যত্বের সামনে ও যেন কেমন কুঁকড়ে যায়। অবোধ। অবোধ কেন আমার রুমমেট হোল। আমি ওর নৈকট্য চাই না। ওকে দেখলেই আমার মনের মধ্যে কোথায় একটা স্বপ্ন

বেঁচে ওঠে। সেই স্বপ্নটা, যেটা আমি ভুলতে চাই। মাঝে মাঝে আক্রোশে জ্বলতে থাকে সমস্ত শরীর। কিন্তু কেন এই আক্রোশ। আমি কি অবোধ হতে চেয়েছিলাম? ভাবনায় কোন থেই পায় না কুন্দলাল। ওর হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত বিরোধে বিতৃষ্ণায় মুখে উঠে আসে। তবু ও অবোধকে ভালবাসে। তার সঙ্গ ওকে তৃপ্তি দেয়।

প্রকাশের বাড়ীতে সেদিন প্রচুর হুইস্কি খেল কুন্দলাল। প্রকাশ নেশায় চুর। কিন্তু কুন্দলাল কিছুতেই মাতাল হতে পারে না। অনেক খেলে তার পাদুটো একটু টলমল করে, এই মাত্র। প্রকাশ তার বাড়ীতে খানসামা বাবুর্চি নিয়ে একাই থাকে। ভারতবর্ষের সব বড় শহরেই তার বাবার বাড়ী আছে। শুনেছে তার বাবা বিরাট ব্যবসাদার। কিন্তু ব্যবসাটা কিসের। কুন্দলালের মনে প্রশ্নটা উঁকি দিয়ে যায়। সেদিনই ওদের মধ্যে কিছু কথা হয়েছিল।

প্রকাশই কথাটা তুলেছিল। তুমি তো শুনেছি ভাল ছাত্র। এম এ পাশ করে কি করবে?

কুন্দলাল প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। জানিনা। কিছু ভাবিনি।

কিন্তু কিছু একটা তো ভাবতে হবেই।

কি জানি। তুমি কিছু ভেবেছ? কি করবে।

কেন আমার বাবা যা করেন।

কি করেন?

স্মাগলিং।

স্মাগলিং? কুন্দলাল অবাক চোখে প্রকাশের দিকে তাকাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। পা থেকে মাথা। এই প্রথম তার চোখের সামনে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে এক নতুন জগত। এক নতুন জীবনযাত্রা। প্রকাশ একদিন তার একজন নায়ক হয়ে উঠবে। কুন্দলাল যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, প্রকাশ উঠে যাচ্ছে ধাপে ধাপে সমাজের ওপরতলায়। আরব সাগরে তার স্পীড বোট ভাসছে। জম্বা ইম্পালা গাড়ি এরোড্রাম-বাড়ী ছুটোছুটি করছে। দেশের রথী মহারথীদের সঙ্গে লাঞ্চ-ডিনার। ব্লাক মানির পাহাড় উঠছে। টাকা কার না দরকার। নির্বাচন পার্টি রাজনীতি। অন্য এক সমান্তরাল আর্থনীতিক ব্যবস্থা। দেশ উচ্ছন্নে যাক। সমাজ অর্থনীতি সাহিত্যশিল্প সব শেষ হয়ে যাক। আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, বুর্জোয়া অর্থনীতি, এসব টিকিয়ে রাখার কোন দরকার নেই। কুন্দলাল এক সামগ্রিক ধ্বংসের ছবি দেখল কল্পনায়। সমস্ত মন ভরে গেল অসীম আনন্দে।

এই আনন্দ নিয়ে সেদিন রাতে হস্টেলে ফিরেছিল কুন্দলাল। ঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল অবোধের সঙ্গে। তার হাতে লিউ-শাউ চি র 'হাউ টু বী এ গুড কম্যুনিষ্ট'। সোজা কঠিন চোখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, পথটা কি ঠিক করে ফেললে? কোন্ পথ, কিসের পথ, কুন্দলাল অবোধকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার মত সাহস তার ছিল না। ওর সামনে দাঁড়ালে নিজেকে তার বড় ছোট মনে হয়। কোন্ কোন দিন অনেক রাতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে অবোধের কথাই ঘুরে ঘুরে মনে পাক খেতে থাকে। অবোধ কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? অবোধের সঙ্গেই কি আমার লড়াই? ও সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে। সুস্থ জীবনের কল্পনা করে তার জন্যে ও লড়ছে। হয়তো আমরণ লড়বে। কিন্তু আমার তো ওরকম কোন স্বপ্ন নেই। আলো আমার ভাল লাগে না। সেই কবে অন্ধকারে ঢুকেছি। অন্ধকারেই হয়তো থাকতে চাই। আলোকেই কি আমার ভয়। কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কতদিন কুন্দলালের সারা রাত কেটে যায়। তারপর একদিন রাতে কেমন করে যেন ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল।

সে দিন রাতে প্রকাশের বাড়ী থেকে প্রচুর মদ গিলে ফিরেছিল কুন্দলাল। একটু বেশি রাতই হয়েছিল। হস্টেলের গেটটা টপ্‌কে ফেরা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতেই সে দেখল অবোধ চোখ বুজে শুয়ে আছে। বুকের ওপর উপুড় করে রাখা মাওৎসে-তুঙের রচনাবলীর এক খণ্ড। কুন্দলাল দেখল। দেখল, তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ। আর দেখতে দেখতে মানুষটা বড় হতে থাকল। অনেক বড়। এখন তার নিজেকে খুব ছোট মনে হোল। নিজে এত ছোট? ক্ষোভে রাগে কুন্দলালের শরীর জ্বলতে থাকল। হাতের পেশীগুলো শক্ত হতে থাকল। হাত-দুটোর ওপর যেন নিজের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। তারপর যেন নিজেরই অজান্তে তার হাতদুটো এগিয়ে গেল অবোধের গলা লক্ষ্য করে। অবোধ ঘুমোয় নি। প্রচণ্ড ধাক্কায় কুন্দলালকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল। ঘরে আলো জ্বলছে। কুন্দলাল ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। নিজেই নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যাচ্ছে। কুন্দলাল ছোট হয়ে যাচ্ছে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সে খাটের ওপর বসে পড়ল। আর তখনি কুন্দলাল শুনতে পেল অবোধের শান্ত কণ্ঠস্বর, কি হয়েছে কুন্দলাল? অমন করে কাঁদছো কেন?

অবোধনারায়ণের সামনে দাঁড়ালেই কুন্দলাল যেন ছোট হয়ে যায়। খুব ছোট। আর তখনি সে অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। কখনো টেবিলের ওপর বইটা শব্দ করে রেখে ওকে চমকে দেয়। কখনো হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়। কখনো জলশুদ্ধ কাচের গ্লাসটা হাত থেকে ফেলে দেয়। ভাঙার শব্দ রিন্‌রিন্ করে ওঠে। ও চায়, অবোধ প্রতিবাদ করুক। অবোধ চিৎকার করে উঠুক। কিন্তু অবোধ কখনো ধৈর্য হারায় না। কুন্দলালের মনের মধ্যে পরাজিত মানুষটা প্রতিহিংসার ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তবুও ও অবোধের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। আত্ম-বিশ্বাসে স্থির উজ্জ্বল অবোধ তার সামনে হিমালয়ের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ কথাটা কোনদিন ও প্রকাশকে খুলে বলতে পারল না। নিজের মনের মধ্যে ও আগুন পুষে রাখল।

ইতিমধ্যে ফিফ্‌থ ইয়ারের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুল। কুন্দলালের রেজাল্ট খারাপ হয়নি। হাই সেকেণ্ড ক্লাস মার্কস। কিন্তু অবোধের ধারে কাছেও

নয়। সে যে অবহেলায় ফার্স্ট ক্লাস নম্বর পেয়েছে। কুন্দলালের বুকের তাপ বাড়ল। তারপর অবোধ যখন তাকে বলল, 'একি করলেন? আপনার রেজাল্ট তো আরো ভাল হবে আশা করেছিলোম', তখন সে আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল। ফলে সেদিন রাতে সে প্রকাশের সঙ্গে আরো বেশি মদ গিলল। প্রকাশ যা নম্বর পেয়েছে, তাতে বোধহয়, ওকে সিকৃথ ইয়ারে তুলবে না। প্রকাশ কিন্তু নির্বিকার। ও বিষয়ে সে একটা কথাও বলল না।

এরই কয়েকদিন পরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সেরে বেরুবার সময় কুন্দলাল দেখল অবোধ দাঁড়িয়ে কি সব বলে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা গোল হয়ে ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর কথা শুনছে। ও মাথা নিচু করে ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। অবোধ ওকে দেখতে পেল না। হস্টেলে নিজের ঘরে ঢুকে হাতের খাতাটা ছুড়ে টেবিলের ওপর ফেলল। ওখানে এক গ্লাস ঢাকা জলটা উলটে পড়ল। বইপত্র ভিজতে থাকল। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে জুতো-জামা পরা অবস্থায়ই খাটে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বুঝল যে, সে প্রকাশের বাড়ীর দিকেই চলেছে। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে সে ফুটপাত ধরে চলতে থাকল। হঠাৎ তার চেতনা ফিরে এল একটা সম্মিলিত চিৎকারে। তাকিয়ে দেখল তারই পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে একটা মিছিল চলেছে। তাকে এখন রাস্তাটা পেরুতে হবে। প্রকাশের বাড়ী রাস্তার ওপারে। কিন্তু মিছিলটা অনেক বড়। আর সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে ভাবল, বলে কয়ে যদি মিছিলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তবে আর অতক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। আর দাঁড়াতেও তার মন চাইছিল না। কুন্দলাল এগিয়ে গেল।

একজনকে বুঝিয়ে বলতে সে পথ ছেড়ে দিতে রাজী হোল। কিন্তু অন্যেরা ফুঁসে উঠল। না মশায়, না। মিছিলের ভেতরে ঢুকতে দেব না। কুন্দলাল আর একবার বুঝিয়ে বলতে গেল। আর তখনি কুন্দলালের সামনের লোকটি বলে উঠল, কি মশায় আপনার কি এমন রাজকাজ যে পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে পারেন না।

সে খোঁজে তো আপনার দরকার নেই। যেতে চাইছি, যেতে দিন। কুন্দলাল ভীষণ বিরক্ত।

আহা বাপের বাগানবাড়ী। ইচ্ছে হলেই ঢুকতে পারবেন। লোকটিও উত্তর দিতে ছাড়ল না। আর তখনি কুন্দলালের চোখের সামনে ওর মুখটা অবোধনারায়ণের মুখ হয়ে গেল। তার ডানহাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। পড়ল গিয়ে সোজা ওর চোয়ালে। লোকটা পড়ে গেল। আর কি ঘটল বোঝার আগেই কুন্দলালের সমস্ত শরীরের ওপর পড়তে থাকল লাথি কিল চড় ঘুসি। কুন্দলালের হাত-পাও সমানে চলতে থাকল। সেদিন মিছিলের পেছনে পুলিশের গাড়ী না থাকলে কি হোত বলা যায় না। তবু দিন সাতেক কুন্দলালকে হাসপাতালে থাকতে হোল। অবোধ রোজ বিকেলে তাকে দেখে যেত। অনেক কথা বলত। কুন্দলাল তবু তার ওপর প্রসন্ন হতে পারল না। প্রকাশ রোজ একগাদা ফল কিনে নিয়ে আসত। আর প্রকাশ আসতেই অবোধ উঠে চলে যেত। কুন্দলাল বুঝত প্রকাশ সম্পর্কে ওর মনোভাব। কিন্তু আশ্চর্য অবোধ কোনদিন তাকে প্রকাশ সম্পর্কে কোন কথা বলেনি।

ফাইনাল পরীক্ষার তখন আর মাস তিনেক বাকি। কুন্দলাল যতটা সময় পারে পড়াশুনা করে চলেছে। ভেতরে ভেতরে অবোধকে ডিঙিয়ে যাবার এক প্রবল বাসনা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। অনেকদিন ঘর থেকেই বেরোয় না। এমন সময় একদিন প্রকাশ এসে হাজির। সেদিন সন্ধ্যেয় ওর বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে গেল। বলল, কি একটা বিশেষ জরুরী কাজের কথাও সে বলতে চায়। সন্ধ্যেবেলা হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে প্রকাশ বলল, তোকে একটা কাজ করতে হবে। আর একমাত্র তুইই এ কাজটা করতে পারবি।

কি কাজ, কুন্দলাল জিজ্ঞেস করে।

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে প্রকাশ বলে, অবশ্য এ-কাজের জন্যে কিছু টাকাও তুমি পাচ্ছ।

ছিঃ ছিঃ একি কথা? তোমার একটা কাজ করে দেব, তার জন্যে আমি টাকা নেব?

আরে বাবা, টাকাটা তো আমি দিচ্ছি-না। আমি শুধু যোগাযোগ করে দিচ্ছি মাত্র। অবশ্য এ থেকে আমিও কিছু পাব।

বেশ তো। কাজটা কি বলনা।

ঠিক আছে। কাল ঠিক ছ'টায় এখানে আয়, তখন বলব।

বেশ। কুন্দলাল বেশিক্ষণ বসল না। ঘরে ফিরে আবার বইতে ডুবে গেল। রাত্রে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল, কি প্রস্তাব হতে পারে। কিন্তু ভাবনার কোন খেই পেল না।

পরদিন ছ'টায় প্রকাশ ওর হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল। বলল, এটা প্যান্টের পকেটে পুরে ফ্যাল। আমার বাড়ী থেকে অন্যদিনের মত বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরবি। সেটা নিয়ে সোজা চলে যাবি উইলিংডন এয়ারপোর্টে। সেখানে গিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে বাঁ হাতে স্টলে দাঁড়িয়ে 'লাইফ' ম্যাগাজিন দেখতে থাকবি। ঠিক সাতটায় কালো সুট পরা লম্বা ফর্সা চেহারার একজন ভদ্রলোক এসে তোকে জিজ্ঞেস করবেন, এটা কি 'কারেন্ট ইস্যু'। তুই খুব চেনার ভান করে বলবি, আরে আপনি। এরপর তিনিই যেভাবে পারেন তোর কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নেবেন। তোর কাজ শেষ। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা আমার কাছে আসবি। টাকাটা নিয়ে যাবি।

প্যাকেটে কি আছে, কেন এই লুকোচুরি, কুন্দলাল কিছুই জানতে চায়নি। কিন্তু কাজটা বেশ থ্রিলিং, কেমন একটা ক্লাইম ফিকশনের অংশ মনে হওয়ায় সে নিজেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারপর প্রকাশ যেমন যেমন বলেছিল, ঠিক অঙ্কের মত সেসব ঘটে গেল। জিনিসটা পৌঁছে গেল ভদ্রলোকের হাতে। কুন্দলাল প্রকাশের কাছ থেকে এ বাবদ পেল এক হাজার

টাকা। পরে প্রকাশ হাসতে হাসতে বলেছিল, আফিং এর একটা চালান গেল আরকি। কুন্দলাল এরকম একটা কিছুই অনুমান করেছিল। বলল, এর জন্যে আমাকে ডাকা আর টাকা দেওয়া কেন? প্রকাশ জানায় ও লোকটাকে এ-বাড়ী চেনানোর অসুবিধে আছে। এবং ও লোকটিও জানতে পারবে না, মালটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে। ওর কাজও তোমার মত আর একজনকে পৌঁছে দেওয়া।

কুন্দলাল নিজের অজ্ঞাতে ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। এরপর আরো দু একটা কাজ সে ওদের হয়ে করেছে। কিন্তু প্রথম দিন যে রকম উত্তেজনা অনুভব করেছিল, সে-রকম অনুভূতি আর কোনদিন হয়নি। অবশ্য এটা ওর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। সে পরীক্ষার জন্যে মনের মত ভাবে তৈরী হতে পেরেছিল। এম, এ-তে কুন্দলাল ফার্ট ক্লাস পেয়ে গেল। অবশ্য অবোধের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে হারল। অবোধের নাম তার ওপরেই ছিল। রেজাল্ট বেরুবার দিন অবোধের সঙ্গে দেখা। দু হাত দিয়ে কুন্দলালের হাত জড়িয়ে ধরেছিল অবোধ : তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানিনা। কিন্তু মনে রেখো, তুমি আমাকে হয়তো পছন্দ করতে না, তবু তোমাকে আমি ভালবাসতাম। আমি তোমার বন্ধু ছিলাম। আর বন্ধুই থাকবো। অবোধ চলে যেতেই, প্রকাশ এসে দাঁড়াল। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে। আবার একটা সন্ধ্যে।

পরদিনই কুন্দলাল ফিরে গেল বম্বেতে বাবার কাছে। বাবা খুশি হয়েছিলেন। আগে থাকতেই তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, ছেলে ভাল রেজাল্ট করলে আমেরিকায় পাঠাবেন গবেষণা করতে। এখন সেইমত চিঠি লেখা, পাসপোর্ট করা ইত্যাদি ব্যবস্থায় বাবা মেতে উঠলেন।

তারপরই একদিন কুন্দলাল আমেরিকায় পাড়ি দিল।

॥ তিন ॥

ম্যাসাচুসেটে কুন্দলালের গবেষণার বিষয় হোল, 'ভারতের আর্থনীতিক বিকাশে বৈদেশিক ঋণের ভূমিকা'। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ কুন্দলালের ভাল লেগে গেল। সে ইউ এন রিপোর্ট খুঁড়ে বসল। মাসখানের মধ্যেই তার কাজের অগ্রগতি দেখে অধ্যাপকেরা খুশি হলেন। কিন্তু সমস্যা হোল, লাইব্রেরী ছেড়ে বাইরে বেরুলেই তার মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে। বাসায় ফিরে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে। যার বাড়ীতে ও পেয়িং গেস্ট হিসেবে আছে, সেই মিসেস জেন্‌কিন্স, রোজ সন্ধ্যেয় ওর ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা দেখে চিন্তিত হন। মাঝে মাঝে ওকে ডেকে কথা বলেন। কিন্তু কুন্দলালের ভাল লাগে না। আবার সেই পুরোন ক্লান্তি ওকে পেয়ে বসে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে হরিণের রক্তে সে কতদিন শান্ত থাকবে? কুন্দলালের মনের যখন এই অবস্থা, তখনি একদিন সে প্রকাশের চিঠি পেল। সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর লিখেছে, রিচার্ড ওয়াকার নামের একজন আমেরিকান ছেলে তার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কাজে যোগাযোগ করবে। ছেলেটি ওর বন্ধু।

দু একদিনের মধ্যেই রিচার্ড টেলিফোন করল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী এক বিকেলে ও লাইব্রেরী থেকে বেরুল। রিচার্ড অপেক্ষা করছিল। দু'জনে গিয়ে একটা বারে বসল। অনেকদিন পরে কুন্দলাল হুইস্কির গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল।

কুন্দলালই প্রথম কথা বলল, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?

অনেক কিছুই রিচার্ড হেসে উঠল।

যেমন?

আপনি তো প্রকাশের সঙ্গে কিছু কাজকর্ম করেছেন। এখানে আমাদের সঙ্গে করতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

কুন্দলাল এক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর বলল, না, ও ধরনের কাজ আর করবো না।

কেন, কেন?

না, ভাল লাগে না। ভীষণ একঘেয়ে। কোন আনন্দ পাই না।

কিন্তু তেমন যদি কোন আনন্দ পাবার মত কাজ থাকে?

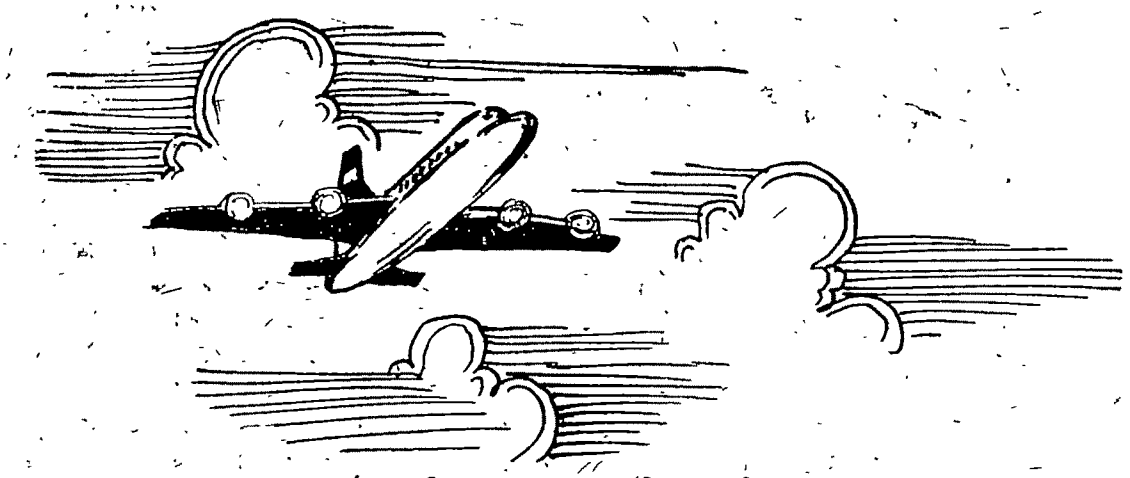

তার পরই একদিন কুন্দলাল আমেরিকা পাড়ি দিল।

বলবেন। ভেবে দেখবো।

রিচার্ড গাড়ী নিয়ে এসেছিল। যাবার সময় ওকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেল। পরে দেখা করবে বলে সে বিদায় নেবার পর হঠাৎ কুন্দলালের ভীষণ একা একা বোধ হতে থাকল। এত নিঃসঙ্গতা এর আগে এমন করে কোন দিন তাকে আক্রমণ করে নি। মনে মনে সে এখন রিচার্ডের সঙ্গে প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু কোথায় তাকে পাবে? রিচার্ড তাকে কোন ঠিকানা দেয় নি।

কয়েকদিন পরে রিচার্ড আবার টেলিফোন করেছিল। আরেকদিন একটা বারে বসে অনেক কথা হোল। কিন্তু ওদের সঙ্গে স্মাগলিং-এর কাজে জড়িয়ে পড়ায় কোন উৎসাহ পেল না কুন্দলাল। সে রিচার্ডকে ফিরিয়ে দিল।

কুন্দলালের মনের মধ্যে অস্থিরতা বাড়তে থাকে। যতটা সময় পারে লাইব্রেরীতে কাটায়। তারপর বাসায় ফিরে শুয়ে থাকে। আলো নিভিয়ে সমস্ত ঘরটা অন্ধকার করে দেয়। কোন কিছু তেমন ভাবেও না। ভাবতে পারেও না। ভাবতে গেলেই অনেক মুখের মিছিল এসে ভিড় করে। কেউ বিস্মিত, কারো মুখে ক্রোধ, কারো মুখে কঠিন জিজ্ঞাসা। মা বাবা রামপ্রতাপ প্রকাশ এবং অবোধ। নিজেও অনেক কিছুর অর্থ খুঁজে পায়। আর ভাবতে গেলেই মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। কুন্দলাল ভাবনাহীন অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে।

কিন্তু ম্যাসাচুসেট্‌সেও কুন্দলালের বেশিদিন থাকা হোল না। বছর খানেকের মাথায় একদিন ওর বাবার অফিস থেকে টেলিগ্রাম পেল, ওর বাবা খুব অসুস্থ। এখুনি যেন ও দেশে ফেরে। কুন্দলাল দেরী করল না। প্রথম যে দিনের টিকিট পেল, সেদিনই প্লেন ধরল। বম্বেতে ফেরার দুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। কুন্দলাল ভেবেছিল, ও এই শোকের ধাক্কা সামলাতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য ওর তেমন কোন অনুভূতিই হোল না। এখন ও বুঝলো আসলে বাবার সঙ্গে ওর কোনদিনই কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি বাবদ কুন্দলাল বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল। আর সেইসঙ্গে ওর বাবার সহৃদয় অফিস ওকে একটা চাকরীও অফার করলেন। সামান্য শ' আষ্টেক টাকার চাকরী। কুন্দলাল কিছু ভাবার অবকাশ পেল না। এবং একদিন সে নিজেই দেখল যে সে সুবোধ ছেলের মত দশটা পাঁচটা অফিস করে চলেছে। আর সেইসঙ্গে বাবার ফ্ল্যাটটাতেই ভদ্রলোকের মত বসবাস করছে।

এভাবেই মাসের পর মাস চলছিল। যতক্ষণ অফিসে থাকে কুন্দলাল শান্ত থাকে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে শান্তি পায়। কিন্তু অফিস থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে বিরক্ত বোধ করে। নিজের ওপর আশেপাশের লোকের ওপর। তখন নিজের বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ খুঁজে পায় না কুন্দলাল। আশেপাশের সব কিছুকেই কেমন মৃত মনে হয়। কুন্দলাল ঘামতে থাকে। হাতের পেশী শক্ত হয়। শরীরের রক্ত মুখে উঠে আসে।

এসময়েই একদিন রামপ্রতাপের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সেদিনও অফিস থেকে বেরিয়ে কুন্দলাল বাস ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল কালো রঙের একটা ফিয়াট। রামপ্রতাপই তাকে দেখেছিল। তারপর রামপ্রতাপের গাড়ীতে করে নিজের ফ্লাটে। অনেক দিন পরে পুরোন বন্ধুকে পেয়ে কুন্দলালের ভাল লাগল। রামপ্রতাপ ডানহিলের প্যাকেট আর দেশলাই ওর দিকে এগিয়ে দিল।

রামপ্রতাপই জিজ্ঞেস করল, কি রে কেমন আছিস? কতকাল পরে দেখা বলত।

কুন্দলাল এই বলে থেমে গেল।

তারপর? কি করছিস?

তেমন কিছু নয়। বাবার অফিসে একটা ছোট চাকরী।

বিয়ে করেছিস?

কি বললি? কুন্দলালের গলার স্বর রুক্ষতা।

বলছিলাম বিয়ে থা করেছিস?

য়ু শাট আপ। ননসেন্স। আই সে য়ু শাট আপ। কুন্দলাল উঠে দাঁড়াল। তার হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। শরীরের রক্ত মুখে এসে জমা হচ্ছে।

রামপ্রতাপ ওকে চেনে। ওর মুখের রঙ বদল দেখেই সে বুঝল অজান্তে সে ওকে আঘাত দিয়েছে। আর তখনি প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এই রকম একটা ছোট চাকরি নিয়ে তুই সন্তুষ্ট?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কুন্দলাল। তার মুখের রক্ত আবার শরীরে নেমে গেল। মুঠি খুলে গেল। বলল, না রে, আর পারছি না। এই ডাল ভাত চচ্চড়ির জীবন আর কিছুদিন কাটালে আমি মরে যাব।

তবে কিছু একটা কর।

কি করবো?

সত্যিই কিছু করতে চাস?

চাই। চাই। একশোবার চাই। কুন্দলাল উত্তেজিত।

আমার সঙ্গে কাজ করতে আপত্তি আছে?

কি কাজ?

সেটা তো জানতেই পারবি। এখন হ্যাঁ কি না বল।

কুন্দলাল এখন আর কোন কিছুই ভাবতে চায় না। ভাবতে পারে না। দশটা পাঁচটা অফিস করে করে নিরামিষ জীবনযাপনে আমি ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত। যে কোন একটা বদল ঘটুক। যে কোন কিছু। আমি প্রত্যেকদিন বেঁচে থাকতে চাই। প্রত্যেকদিন আমি সমাজ চাই না। সংসার চাই না। কেবল আমি। আমি বেঁচে থাকতে চাই। কুন্দলাল রামপ্রতাপ হাতে হাত মেলাল। রামপ্রতাপ যাবার সময় ওকে তার ফ্লাটে যাবার জন্যে অনুরোধ করে গিয়েছিল।

রামপ্রতাপ সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কলিংবেল টিপতে নিজেই দরজা খুলে দিল। তারপর বিলেতী স্কচের বোতল খুলে দুজনে কথাবার্তা সুরু করল। আর সেদিনই কুন্দলাল জেনে গেল তার যোগাযোগের বিশালতা। বম্বের একটা বড় স্মাগলার দলের সে কর্তা। বিদেশী দূতাবাস থেকে দেশী শাসক পর্যন্ত সর্বত্রই তার

অবাধ যাতায়াত। দু-দশ লক্ষ টাকা, তার কাছে কোন টাকাই নয়। কিন্তু এতএব শুনেও কুন্দলাল খুব একটা উৎসাহ বোধ করল না। টাকার দরকার তার আছে। কিন্তু শুধু টাকা আয় করায় তার কোন আসক্তি নেই। স্মাগলিং? এতেই বা তেমন থ্রিল কোথায়। বিদেশী কাহিনীর থ্রিলিং অ্যাডভেঞ্চার তো এদেশে কিছু নেই। টাকা ছড়িয়ে আগে থাকতেই পথ ঠিক করা থাকে। মালপাচারে কখনো কখনো নাটকীয়তা হয়, এই পর্যন্ত। যখন কেউ ধরা পড়ে, সে নেহাৎ দল থেকে তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে। আর তখনি কাগজে কাগজে খবর। কুন্দলালের এতে উৎসাহ নেই। আজও খুব উৎসাহ পেল না। তবু 'ভেবে দেখবে' বলে সেদিন চলে গিয়েছিল কুন্দলাল।

আর ভেবে দেখেও ছিল কুন্দলাল। তারপর দিন নয়। বেশ কিছুদিন পরে। তখন ক্লান্তিটা আরো বেশি করে পেয়ে বসেছে তাকে। কুন্দলাল আবার রামপ্রতাপের সঙ্গে দেখা করল। রামপ্রতাপ যেন জানতই, এমনভাবে কুন্দলালকে টেনে নিল। তারপর পকেটে বেআইনী রিভলবার পুরে অনেকবার এরোপ্লেন জাহাজে চড়ে দেশ-বিদেশে পাড়ি দিল কুন্দলাল। কিন্তু সেসব কুন্দলালের জীবনের কোন ঘটনা নয়। কুন্দলাল কদিনেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সে জানত না যে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একবার ভিড়লে আর বেরুনো যায় না। খবরটা ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে দিলে, তারা খবর জেনে নিয়ে ছোবড়ার মত ফেলে দেবে। আবার এসে পড়তে হবে এদেরই হাতে। তখন এদের দয়ার ওপর জীবন-নির্ভর। কোনদিন কোথায় যে লাশ পড়ে থাকবে তা ওরাই জানে।

তবু কুন্দলাল একদিন কথাটা বলেছিল রামপ্রতাপকে। আর তখনি তার মুখের চেহারাটা এমন পালটে গিয়েছিল যে তখন আর ওকে কুন্দলালের বন্ধু বলে মনে হয়নি। কুন্দলাল চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু রামপ্রতাপের মনের মধ্যে তারপর থেকে সংশয়। কোন বিশেষ কাজ সে তাকে দেয়না। তবু কুন্দলাল ওদের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো নামেই থাকা। রামপ্রতাপ জানত কুন্দলাল বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবুও তার পেছনে রামপ্রতাপের চর ছিল।

এদিকে কুন্দলালও আর পারছিল না। ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত আর একঘেয়ে লাগে। কোনদিন অনেক মদ খেয়ে মাতাল হতে যায়। হতে পারে না। সমস্ত চিন্তাভাবনা গুলো আরো বেশি করে তাকে তাড়া করে। কোন কোনদিন সমুদ্রের ধারে একা একা অনেকক্ষণ বসে থাকে। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় না। কি করবো? অথচ একটা কিছু করা দরকার, একটা কিছু।

একটা কিছুই বোধহয় তারজন্যে অপেক্ষা করেছিল। একদিন একটা বারে তার আলাপ হয়ে গেল পিয়ারীলালের সঙ্গে। পিয়ারীলাল তার দেশের ছেলে বলেই নয়, তার কথাবার্তায়ও মুগ্ধ হোল কুন্দলাল। তারই কাছাকাছি বয়স। লম্বা-চওড়া চেহারা। তার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে, সে আগুনে কুন্দলাল যেন উত্তাপ পেল। তার মনে হোল, এমন একজন সঙ্গীকেই যেন সে সারা জীবন ধরে খুঁজছে। নিজের বাড়ী ঠিকানা দিয়ে কুন্দলাল তাকে পরদিন সন্ধ্যেবেলা আসবার জন্যে নেমতন্ন করে এল।

পরদিন ঠিক সময়েই এসেছিল পিয়ারীলাল। সে কম কথা বলে। কিন্তু ভেতরের একটা অস্থিরতা তাকে কখনো শান্ত থাকতে দেয় না। আজ কুন্দলালের বাড়ীতেই অতিথির জন্যে মদ কেনা ছিল। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার কোনই অসুবিধা ছিল না। কুন্দলালই ওকে প্রথম বাজিয়ে নিতে চাইল: আচ্ছা পিয়ারীলালজী, আপনি কি বম্বেতেই থাকেন?

না ঠিক থাকি বললে যা বোঝায় তা নয়।

তবে?

প্রায় বছরখানেক আছি, বলতে পারেন। আসলে একটা ব্যাঙ্কে চাকরী নিয়ে এখানে এসেছি। এখন আর ভাল লাগছে না। অন্য একটা কিছু করতে চাই। এই ধোড়-বড়ি-খাড়া জীবনে কি করে জ্যান্ত মানুষ টিকে থাকে বলতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর কুন্দলাল জানে। না, কোন জ্যান্ত মানুষ এভাবে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু কিভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সে তো নিজে অনেকদিন স্মাগলিং করল। কিন্তু আজ আর ও কাজে কোন থ্রিল নেই। অন্ততঃ কুন্দলালের কাছে তো নেই। মুখে বলল, হ্যাঁ, তেমন একটা কাজ করতে পারলে তো ভালই হোত। কিন্তু কি করবো বলুন। আমি এমন একটা কাজই খুঁজছি যাতে উত্তেজনা আছে। এরকম একটা কাজ করলে তবু বেঁচে আছি বলে মনে হয়।

পিয়ারীলাল লাফিয়ে উঠেছিলদ ঠিক বলেছেন। একেবারে আমার মতের কথা। তাছাড়া আমার টাকার দরকার। অনেক টাকা।

তাহলে একটা কিছু ভাবুন।

আমি অবশ্য একটা ভেবেই রেখেছি।

কি? আগ্রহে কুন্দলালের চোখ জ্বলে উঠল।

আজ নয়। আর একটু ভাবতে সময় দিন। সময় মত জানাবো। পিয়ারীলাল আর কথা বাড়তে দিল না।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। পিয়ারীলাল রোজই সন্ধ্যেবেলায় আসে। অনেক কথা হয়। এবং এখন তারা দুজনেই নিশ্চিত যে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে। রামপ্রতাপের সঙ্গে যোগাযোগটা আছে। না রেখে তার উপায় নেই বলেই আজো আছে। ও বুঝতে পারে রামপ্রতাপের লোক সব সময় ওকে চোখে চোখে রেখেছে। ওর কথাতেই কুন্দলাল সেকথা ভাল করে বুঝল। একদিন ওর ওখানে যেতেই সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ওখানে রোজ সন্ধ্যেবেলায় যে লোকটা আসে সে কে?

দোস্ত। কুন্দলাল প্রসঙ্গ বাড়তে দিতে চায়নি।

কি রকম দোস্ত? কি করে লোকটা? আবার তার জিজ্ঞাসা।

তেমন কেউ নয়। ছোটখাট একটা চাকরি করে। আমার দেশের লোক।

সঙ্গী সাথি কেউ নেই। তাই আমার ওখানে আসে।

তার বেশি কিছু নয় তো?

কি বলতে চাইছ তুমি? কুন্দলালের গলায় রুক্ষতা।

না, কিছু না। রামপ্রতাপ চুপ করে গেল।

কাজের কথা এখন বিশেষ বলে না রামপ্রতাপ। এক দু' পেগ হুইস্কি খেয়েই উঠে পড়ে কুন্দলাল। পিয়ারীলাল নিয়মিত আসে। কিন্তু কোন কাজের কথাই আর হয় না। কুন্দলাল আবার যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ে।

কদিন পরেই পিয়ারীলাল প্রথম কাজের কথাটা বলল। শুনুন কুন্দলালজী এটাই আমাদের প্রথম কাজ। টাকা যাই হোক, এটার মধ্যে দিয়েই আমাদের মধ্যেও একটা জান পয়হান হয়ে যাবে।

কি করতে হবে? কুন্দলাল সরাসরি প্রশ্ন করে।

কাল ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় আপনি আমাদের ব্যাঙ্কে যাবেন। দেখে নেবেন আমি কোন্ কাউন্টারে আছি। সেই কাউন্টারের পাশেই দাঁড়াবেন। দেখবেন, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তার চেকটা দেবেন। প্রত্যেক মাসের তিরিশ তারিখে ওই ভদ্রলোক প্রায় দেড় লাখ টাকা তুলে নেন। ওর কর্মচারীদের পেমেন্টের টাকা। ও ভদ্রলোক চেক দিলেই আপনি তাড়াতাড়ির ভাব দেখিয়ে ভদ্রলোককে জোরে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দেবেন। তখনি ওখানে লোকজনের ভিড় জমে যাবে। সেই সুযোগে আমি আপনার হাতে টাকাটা পাচার করে দেব। তারপর ওখান থেকে পালাবার দায়িত্ব আপনার। এবং টাকাটা পেলে বখরা আধাআধি।

উত্তেজনায় কুন্দলাল লাফিয়ে উঠল। তবু সংশয়। বলল, কিন্তু আপনি সামলাবেন কি করে?

সে ভার আমার। বলব, ভদ্রলোক টাকাটা নেবার পর এই কাণ্ড ঘটেছে। আপনি তৈরী তো?

কুন্দলালের মন আনন্দে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকল। একদিনে মনের মত কাজ। পরদিন পিয়ারীলাল যা যা বলেছিল, সেইমত, কাজই হোল। ভদ্রলোক চেক দিতেই, পিয়ারীলাল ইশারায় জানিয়ে দিল। ধাক্কা মারতেই ভদ্রলোক এত জোরে ছিটকে পড়লেন যে গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুতে থাকল। সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত নোটের বাণ্ডিল ঢুকে গেল কুন্দলালের পোর্টফোলিওতে। ভদ্রলোককে সমবেদনা জানাতে সেও এগিয়ে গেল। তারপর সবলোক যখন বাতাস জল বলে চিৎকার শুরু করল, ততখনে কুন্দলাল ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছে। জীবনে এই প্রথম কুন্দলাল এরকম একটা কাজ করল। কিন্তু আশ্চর্য, তার উত্তেজনা ছিল না। সে যেন সাধারণভাবেই ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এল, এমনভাবেই ঘটনাটা ঘটাল। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল পিয়ারীলাল। ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের বড় পার্টি। তাই খুব সহজে পার পেয়ে না সে। কিন্তু আইনগতভাবে ব্যাঙ্ক পিয়ারীলালকে কোন সাজা দিতে পারল না। ভাগের টাকাটা কুন্দলাল তাকে সেদিনই দিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পিয়ারীলাল নেয় নি। বলেছিল, এখন আপনার কাছে থাক। বলা তো যায় না, পুলিশ সন্দেহক্রমে আমার বাড়ী সার্চ করতে পারে।

তবু শেষপর্যন্ত পিয়ারীলালের চাকরী রইল না। ব্যাঙ্ক অন্য এক মিথ্যে চার্জে ফাঁসিয়ে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করল। ইউনিয়ন তার হয়ে লড়তে চেয়েছিল কিন্তু তার চাকরীর ইচ্ছে তখন একেবারেই চলে গেছে। কুন্দলালও এতদিনে যেন একটা মনের মত কাজ পেয়েছে। সে খুশি। এখন আর তার কোন বিমর্ষতা নেই। এখন সে ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসতে পারে।

এরপর এক মধ্যরাতে ওরা দু'জনে মিলে এক পেট্রল পাম্পে ডাকাতি করল। তখন লোকজন ছিল না। পাম্পের ক্যাশিয়ার আর মালিক টাকা পয়সার হিসেব করছিল। দরজায় একজন দারোয়ান ঝিমোচ্ছিল। কুন্দলাল তার মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল আর পিয়ারীলাল তাকে বেঁধে ফেলল। তার গোঁ গোঁ আওয়াজে ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তখনি রিভলবার উঁচিয়ে কুন্দলাল তাকে থামাল। তারপর সে দুজনকেও বেঁধে ফেলে সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে দু'জনে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এল।

কিছুদিন পরে কুন্দলালের সঙ্গে যোগ দেয় মধ্যপ্রদেশেরই আর একটা ছেলে। সুখনলাল। পিয়ারীলালের কি রকম জ্ঞাতিভাই। পিয়ারীই ওকে নিয়ে এসেছিল কুন্দলালের কাছে। কুন্দলালের এভাবে লোক বাড়াতে আপত্তি ছিল। কিন্তু ছেলেটাকে দেখে ওর ভাল লাগল। ওরা তিনজনে মিলে এরপর এক মারোয়াড়ি বাড়ী লুঠ করে। বাড়ীর কর্তা রিভলবার দেখে কাঁপতে কাঁপতে সব বের করে দিতে দেরী করেনি। কিন্তু গণ্ডগোল বাধাল ওর ছেলে। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল সুখনলালের ওপর। রাগে কুন্দলালের হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। সোজা গুলি চালাল ওর বুক লক্ষ্য করে। ছিটকে পড়ে গেল ছেলেটা। কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে থাকল। রক্তে ভেসে গেল মেঝে। সেটা দেখে কুন্দলাল আনন্দে শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠল। তার সে চেহারা দেখে সেদিন পিয়ারীলাল আর সুখন দু'জনেই ভয় পেয়েছিল।

অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের কাছে, অন্ধকারের হাঁটা মানুষদের কোন খবর চাপা থাকে না। কুন্দলালও একদিন সে জগতে পরিচিত হয়ে গেল। এদের মধ্যে অনেকেই এখন কুন্দলালের দলে ভিড়তে চায়। কিন্তু ডাকাত দল ব্যাপারটাতেই কুন্দলালের কোথায় যেন আপত্তি। নিজের আভিজাত্যবোধে বাধে। রাস্তায় বেরুলে ওদের অনেকেই ওকে সেলাম করে। কুন্দলাল কাউকেই চেনে না। ওদের সেলামও ফিরিয়ে দেয় না। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় ওদেরই একজন এসে সেলাম করে কি বলতে গিয়েছিল। কুন্দলাল ওর মুখ দেখেই কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে এমন জোরে চড় মেরেছিল যে লোকটা ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সে খবরটাও বোধহয় জানাজানি হয়ে

যায়। তারপর থেকে বড় একটা ওর কাছে কেউ ঘেঁসতে সাহস পেত না। ইতিমধ্যে বম্বে শহরেই আরো দুটো ডাকাতি করেছে কুন্দলাল। তার মধ্যে একটা সেই কালো অ্যামবেসিডরে করে। যেটা খবরের কাগজের পাঠক মাত্রেরই জানা। অন্যটা এক মাড়োয়ারীর গদি লুঠ।

বছর দু'য়েকের মধ্যে আজ কুন্দলাল বহু লক্ষ টাকার মালিক কেবল তাই নয়। তার নামটাও যেন কি করে চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেছে। তার নামে এখন সারা শহর আর আশেপাশের অঞ্চল ভীত। কিন্তু পুলিশ তাকে ধরার চেষ্টা করে নি। সমস্ত ব্যবস্থা পিয়ারীলালই করেছিল। কিন্তু মাঝখানে একদিন ঝামেলা বাধালো রামপ্রতাপ। এক সকালে তার বাড়ীতে এসে হাজির। বললো, সন্ধেবেলায় একবার আয় না। বিশেষ দরকার। কুন্দলাল একদা বন্ধুর অনুরোধ ঠেলতে পারল না। সেদিন প্রচুর আপ্যায়নের পর রামপ্রতাপ তাকে এক বাক্স সোনা পাচার করে দিতে অনুরোধ করে।

কুন্দলাল অবাক। কেন, তোর কি হঠাৎ লোকের অভাব হয়ে পড়লো নাকি?

না। এ কাজটা একটু রিস্কি। তাই তোকে অনুরোধ করছি।

না ভাই আমার দ্বারা হবে না। কুন্দলাল স্পষ্ট জানিয়ে দিল। তা ছাড়া এ কাজ তো আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

আচ্ছা। এই কুন্দলালের সাহসের বহর? আর এর জন্যেই তোমাকে বম্বের গুণ্ডারা খাতির করে। রামপ্রতাপ ব্যাঙ্গের হাসি হেসেছিল। তাতেই খেপে গিয়েছিল কুন্দলাল। বলেছিল, বেশ ঠিক আছে। দাও প্যাকেটটা। পৌঁছে দেবো।

সেদিন নয়, অন্যদিন। প্যাকেটটা সময় মত পৌঁছেছিল কুন্দলালের হাতে। কিন্তু সে তখনো জানত না যে রামপ্রতাপ আগেই কাস্টমসের লোক তৈরী রেখেছে। এরোড্রোমে পৌঁছলেই সে ধরা পড়বে। কি এক ঈর্ষায় রামপ্রতাপ ওকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। এরোড্রোমের গেটে ঢুকতে যাবার সময়ই একজন অফিসার সোজা ওর দিকে এগিয়ে এলেন। হাত ধরে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। সেই মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল কুন্দলাল। এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, সামনের কনেস্টবলটাকে গুলি করে, সে ছুটে বেরিয়ে এল। তখন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী তার দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ছুটে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন এলো-মেলো ছোটাছুটি শুরু করে দেওয়ায় তারা কাছে আসার আগেই, কুন্দলাল নিজের গাড়ী নিয়ে পালায়। অনেক ঘুরে ঘুরে পুলিশের গাড়িকে এড়িয়ে কুন্দলাল যখন রামপ্রতাপের কাছে এল তখন অনেক রাত। আর রামপ্রতাপ যেন ভূত দেখল। তুই? একটু সামলে নিয়ে বলল, কাজ হয়ে গেল। বলেই রামপ্রতাপ উঠে দাঁড়াতে গেল।

কুন্দলাল গর্জে উঠল। তার ডান হাত প্যান্টের পকেটে। বোস। এই নে তোর প্যাকেট। বলে বাঁ হাতে প্যাকেটটা ওর টেবিলে ছুঁড়ে দিল। তারপর রামপ্রতাপ? কুন্দলালকে ধরিয়ে দেওয়া কি অতই সোজা?

কি বলছিস তুই? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিছুই বুঝতে পারছ না, না? প্যাকেটটা পাঠাবার আমি ছাড়া আর লোক ছিল না, না? কাস্টমস অফিসারকে তুই নিজেই জানিয়েছিলি না?

আমি তো তোকে আমারই কাজে পাঠিয়েছিলাম। আমি কেন তোকে ধরাতে যাব?

শাট আপ। য়ু ট্রেচারাস বাস্টার। লজ্জা করে না! মুখ তুলে কথা বলতে?

এবার রামপ্রতাপও ক্ষেপে উঠল। গেট আউট। গেট আউট। তুই না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি তাকে কুকুরে মত গুলি করে মারতাম। আর তখন কুন্দলালের হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। নিজের অজান্তে পকেট থেকে রিভলবারটা বেরিয়ে এল। আর রামপ্রতাপের বুক লক্ষ্য করে গুলিটা বেরিয়ে গেল। কুন্দলাল আবার দেখল রক্তের ধারা। অনেক অনেক রক্ত। ঘরের কার্পেটটা ভিজে যাচ্ছে। তৃপ্তিতে ভরে গেল কুন্দলালের মুখ। শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল কুন্দলাল। বেরিয়ে আসার আগে সে দেখেছিল, বাবুর্চি বেয়ারারা বাইরের ঘরের দরজায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ী চালিয়ে ফিরতে ফিরতেই কুন্দলালের মনে হোল, আজ রাতেই বম্বে থেকে চলে যেতে হবে। অন্ততঃ কদিনের জন্যে হলেও। গাড়ীর মুখটা ঘুরিয়ে সে পিয়ারীলালের বাড়ীর দিকে চললো।

॥ চার ॥

কুন্দলাল দিল্লী পৌঁছল। অশোকা হোটেলের আধুনিকতম এয়ারকুলার লাগানো ঘর। জামাকাপড় ছেড়ে ডানলোপিলোর মধ্যে ডুবে গেল সে। আর তখনি মনে পড়ল প্রকাশের কথা। প্রকাশ চোপরা। স্মাগলিং এর জগতে সে একটা বিখ্যাত নাম এখন। রামপ্রতাপের মুখে সে অনেকবার তার নাম শুনেছে। সমাজের ওপরতলায় সব মহলেই এখন তার দহরম মহরম। কে না বন্ধু তার? চাইলে কি না পেতে পারে সে। কুন্দলাল উঠে দাঁড়াল। টেলিফোন ডায়াল ঘোরাতে থাকল। এতদিন পরে কুন্দলালের টেলিফোন পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল প্রকাশ। নিজেই ছুটে এল ওর হোটেলের ঘরে।

কুন্দলালের কিছু কীর্তিকলাপ ইতি মধ্যে তার কানে পৌঁছেছিল। এখন রামপ্রতাপকে খুন করার কথা শুনল। শুনে কেন জানি না, মনে হোল, প্রকাশ বেশ খুশিই হয়েছে। একি একই ব্যবসায়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বাভাবিক মনোভাবে? না কি অন্য কিছু। কুন্দলাল এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। শুধু বলল, বম্বের পুলিশ বোধহয় এতক্ষণ আমার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। অথচ কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বম্বে ফিরতে চাই।

সে তুই কিছু ভাবিস না। প্রকাশ চোপরা অভয় দিল।

কি করবি?

দেখা যাক। বলতে বলতে নিজেই

টেলিফোন তুলে নিল প্রকাশ। তারপর একটা দুটো তিনটে টেলিফোন করে গেল। তারপর 'আজ আসি' বলে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, আজ সন্ধ্যেয় একটু ব্যস্ত থাকবো। কাল সন্ধ্যেয় আসিস। আমার সঙ্গেই ডিনার সারবি। কিছু লোকের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেব।

পরদিন সন্ধ্যেয় সে যখন প্রকাশের ওখানে পৌঁছল, তখন ওর বাড়ীর সামনে খানছয়েক গাড়ী দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে ছ'জন লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। এতদিন যাদের নাম শুনে এসেছে দূর থেকে, আকাশে চাঁদ সূর্য ওঠায় যাদের ভূমিকা আছে, এরা তাদেরই ক'জন। এখানেই সেদিন প্রথম আলাপ হোল রণজয়ের সঙ্গে। রণজয় করমর্দন করে বলল, আপানার মত একজনকেই আমি খুঁজছিলাম। আলাপ হয়ে ভালো লাগল। প্রয়োজনে হয়তো আপনাকে ডাকতে পারি। কুন্দলাল ওর কথায় খুব একটা আমল দেয় নি। হুঁ হাঁ করে সাড়া দিয়ে গিয়েছিল মাত্র। পরে জেনেছিল, এর মা বিধাতৃ দেবী দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেত্রী। এবং তারই জোরে রণজয় এখন দিল্লীতে ভীষণ প্রতিপত্তিশালী। ওর পার্শ্বচর এখন দিল্লীর নাম করা গুণ্ডা সজ্জন দাস। তার চোরাই গাড়ীর কারখানায় বসে ও এক দিন গাড়ী তৈরীর স্বপ্ন দেখত।

এত সব কথা কুন্দলালের কানে যাচ্ছিল না। কিন্তু সে তখনি বুঝে নিয়েছিল যে আপাতত পুলিশ আর তাকে ধাওয়া করে বেড়াবে না। পর দিন সকালেই সে পিয়ারীলালকে, 'কদিনের মধ্যেই ফিরছি' বলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল।

দিন চারেক দিল্লীতে থেকে গেল কুন্দলাল। অবশ্য প্রকাশেরই পরামর্শে। রোজই দিন বা রাত্রের কোন না কোন সময় তাদের দেখা হোত। অনেকক্ষণ কথাবার্তাও চলত। আর সে সূত্রেই ওর রণজয় সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেয়। এমন একজনকে হাতে রাখা খুবই দরকার, বলেছিল প্রকাশ। ওকে কৈশোরে লেখাপড়া শিখতে বিদেশে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে ওর উচ্ছৃঙ্খলতা অল্পদিনের মধ্যেই এমন চরমে ওঠে যে সেখানে থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে তাড়িয়ে দেন। দেশে ফিরে, কিছুকাল পরে ও আর ওর কয়েকজন বন্ধু মিলে, একটা গাড়ী চুরি করে। তারপর বেহেড মাতাল অবস্থায় একটা পেট্রোল পাম্পে ঢুকে পেট্রল নিয়ে পালাতে গেলে সেখানকার একজন কর্মী ওকে বাধা দেয়। তখন সে লোকটাকে ওরা এমন মারে যে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তারপরই সেই অবস্থায় ওরা গাড়ী অ্যাকসিডেন্ট করে। তখন ওর মা পরদিন ভোরবেলাই ওকে আর ওর এক বন্ধুকে কাশ্মীর পাঠিয়ে দেন। কেসটা চাপা পড়ে যায়। এই যার শুরু, সে যে কি জিনিস তা আর বোঝাতে হবে না। এখন ও স্কুটার কারখানা, মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে মেতেছে। একটা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হয়েছিল। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজী হননি বলে, তাকে ও লোক দিয়ে খুন করিয়েছে। কুন্দলাল বুঝল রতনে রতন চিনেছে।

কুন্দলাল বম্বে ফিরে গেল। যে পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল, তারা হঠাৎ ওর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়ায় পিয়ারীলাল খুব অবাক হয়েছিল। কুন্দলাল অবশ্য এই সুযোগটা নিতে ছাড়ল না। সে সারা ভারতবর্ষে তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে ফেলল। আমেদাবাদে, ভূপালে শিলং এ সে তিনটে বড় ডাকাতি করল কয়েকমাসের মধ্যে। কিন্তু বম্বেতে সে কিছুই করল না। এখানে ভালো ছেলের মত সেদিন কাটাতে থাকল। মাঝে মাঝে সে পিয়ারীলালকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। কখনো উত্তরপ্রদেশ কখনো হরিয়ানা, কখনো দিল্লী। ওইসব অঞ্চলের ক্রাইম রিপোর্টের ডাকাতির ঘরে একটা একটা করে সংখ্যা বাড়ে।

এই সময় একদিন সে দিল্লী থেকে প্রকাশের ট্রাঙ্কল পেল। সে জানাল তাকে আজই দিল্লী পৌঁছতে হবে। রণজয় দেখা করতে চায়। ভীষণ জরুরী। রণজয়ের সঙ্গে সেই একদিন দেখা হয়েছিল প্রকাশের বাড়ীতে। তারপর অনেক অনেকদিন কেটে গেছে। অনেকবার দিল্লী গেছে। কিন্তু রণজয়ের কথা মনেও হয়নি। ইতিমধ্যে সে শুনেছে, রণজয় এখন দিল্লীরই কেউকেটা নয়, ভারতবর্ষের অনেক মন্ত্রী এম এল এ-রা তার কৃপাপ্রার্থী। তার মা বিধাতৃ দেবী এখন সত্যিই দেশের বিধায়িতা। কুন্দলাল নিজের প্রটেকশনের কথাটাও ভাবে। দিল্লী-হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এখনো তার নামে কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু এগুতে হলে তো আটঘাট বেঁধে এগুনোই ভাল। আর তাছাড়া রণজয় নিজেই যখন তাকে ডাকছে, তখন সে সুযোগটা নেওয়াই উচিৎ।

কুন্দলাল দিল্লী গেল। এখন হোটেলে সারা বছরের জন্যেই ওর নামে ঘর বুক করা থাকে। প্রকাশ বাড়ীতেই ছিল। টেলিফোন করতেই বলল, আজ সন্ধ্যে সাতটায় আমার বাড়ীতে চলে আয়। এখানেই কথাবার্তা হবে। ঠিক সাতটাতেই এসেছিল রণজয়। উঁচুগলা সিল্কের পাঞ্জাবী আর পাজামা। মদের গন্ধ। মাঝে মাঝে কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু একটুও বেচাল হোল না। মেপে মেপে কথা বলল, দেখুন কুন্দলালজী, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ডেকেছি।

বলুন কি করতে পারি। কুন্দলাল একটুও বিনীত হোল না।

আমার স্কুটার কারখানার কথা তো আপনি জানেন। ওখানে জমি পেতে আমার অসুবিধে হয় নি। ওখানকার মুখ্যমন্ত্রীই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে, ওই জমিতে কয়েকশ' ঘর লোককে তোলা যাচ্ছে না। টাকা দেব বলেছি। ব্যাটারা বড় বেয়াড়া।

তা কোর্টে গেলেই তো হয়। জমিটা যখন আপনার···

থামুন্। তার জন্যে আপনাকে ডাকিনি। প্রায় ধমকে উঠল রণজয়। আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি, সেটা শুনুন।

কুন্দলাল চুপ করে গেল। বুঝল, এখন ওর শুনে যাবার পালা। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল রণজয়, আমি আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাচ্ছি। হরিয়ানায় আপনার দলের লোকদের বলবেন ওদের সাহায্য করতে। আপনি শুধু দাঁড়িয়ে দেখবেন, কাজটা ঠিকমত হচ্ছে কি না।

পুলিশ আসবে ঘটনা ঘটে যাবার পরের দিন।

আমি কিভাবে আপনার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবো?

আপনাকে কোন যোগাযোগ করতে হবে না। সোজা গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠবেন। ঘর বুক করা আছে। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাবেন। আমার লোকেরাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে।

সমস্তই রণজয়ের প্ল্যানমাফিক কাজ হল। সকালবেলাতেই রণজয়ের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সঙ্গে কুন্দলালের লোকজন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকশ' ঘর নিরীহ গরীব বাসিন্দাদের ওপর। যে যেদিকে পারল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ছুটে পালাল। জন পঞ্চাশেক লোক রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মরল। আহতও কম হল না। তাদের আর্ত চিৎকারে কোথা থেকেও কোন সাহায্য এল না। দিনের আলোয় এতবড় নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হিসেবে পকেটে বেআইনী রিভলবার নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুন্দলাল।

সেদিন বিকেলের ফ্লাইটেই কুন্দলাল হরিয়ানা ত্যাগ করে। এয়ার পোর্টেও সে ভি আই পি ট্রিটমেন্টই পেয়েছিল। আর সেদিনই ও যথার্থ উপলব্ধি করল যুবরাজের ক্ষমতা। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে অবশ্য দেরি করল না। হরিয়ানায় সে বছর মোট ডাকাতি হয়েছিল ৩৬টা। তার মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকার ৮টা ডাকাতিই করেছিল কুন্দলাল। দিল্লীতে ফিরেই ও প্রকাশকে টেলিফোন করেছিল আর পরদিন সকালেই তার হাতে এসে পৌঁছেছিল দশ হাজার টাকার একটা প্যাকেট।

এখন সকলেই কুন্দলালের নাম জানে। পুলিশ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। সে বুঝতে পারে না, কারা তার হয়ে পাবলিসিটি দিচ্ছে। কিন্তু কারো অদৃশ্য হাত যে পেছনে কাজ করে চলেছে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। কি তাদের স্বার্থ? কেন তারা করছে? কুন্দলাল ভাবে। সে কি কোন অদৃশ্য জালে আটকা পড়ে যাচ্ছে? কোন অদৃশ্য থাবায়? পুলিশের খাতায় কি লেখা হচ্ছে না তার একটার পর একটা ডাকাতির কাহিনী। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীতে-হরিয়ানায়? একটার পর একটা হত্যার রক্তের দাগ? এখনও সে ঘনামে প্লেনে চড়ে। হোটেলের ঘরও ঘনামেই বুক করা। কুন্দলাল সর্বত্রই সম্মানিত।

এই সময়েই তার জীবনে ঘটে গেল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। সেটা ১৯৭৩-এর জানুয়ারি। প্রকাশের বাড়ীতে এক পার্টিতে আলাপ হোল সোহিনীর সঙ্গে। সোহিনী গুজরাটের মেয়ে। চলায় বলায় ভীষণ আধুনিকা। ওর বাবা পার্লামেন্টের সরকার পক্ষের এক প্রভাবশালী সদস্য। বেশিরভাগ সময়েই থাকে দিল্লীতে। প্রথম আলাপেই বোধহয় সোহিনীর ভাল লেগে গিয়েছিল কুন্দলালকে। পার্টি থেকে ফেরার সময় সেই কুন্দলালকে লিফট দিয়েছিল হোটেল পর্যন্ত। আর পরদিন তাদের বাড়ী যাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। পরে এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে কুন্দলাল। সোহিনী কি তার চেহারা দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল? সে কি জানত না তার পরিচয়? কিন্তু ওখানে কি এমন কেউ ছিল যে তাকে চেনে না? না কি তার মত অসামাজিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় সেও ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। এর উত্তর অনেক পরে খুঁজে পেয়েছিল কুন্দলাল। তখন তার অনেকক্ষণ ধরে ভাবনা চলেছিল, যাবে কি যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কাছেই হেরে গিয়েছিল কুন্দলাল। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে যেন কোন তৃতীয় শক্তির টানে চলে গেল সোহিনীর বাড়ীতে।

সোহিনী যেন জানত সে যাবে। বেল টিপতে, নিজেই দরজা খুলে সাদরে ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। বেয়ারা

এক পার্টিতে আলাপ সোহিনীর সঙ্গে.....।

ড্রিংস্ নিয়ে এল। আর তখনি সোহিনী মুখ খুলল, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

কি করে জানলেন? কুন্দলালের জিজ্ঞাসা।

আমি যে চোখের ভাষা পড়তে পারি।

আশ্চর্য।

এতে অবাক্ হবার কি আছে? চিরকাল তো মেয়েরাই পুরুষের চোখের ভাষা পড়ে এসেছে।

কেন কাল কি আমি ড্রাঙ্ক ছিলাম?

আরে না, না। সোহিনী হাসতে হাসতে এবার আসল কথায় এল। আচ্ছা আপনার ভয় করে না?

ভয়? কিসের জন্যে?

যা কাণ্ডকারখানা করে বেড়ান। আপনার নামেই তো চারিদিকে ত্রাস।

এসব নিয়ে তো আমি কিছু ভাবি না।

অবাককাণ্ড। ভাবেনই না?

না সোহিনী। আমি কোনদিন কিছু ভাবিনি। ভাবতে গেলে আমার সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায়। দেশের চারদিকেই ভগ্নদশা। সবকিছুই কেবল ভাঙছে আর ভাঙছে। দেশের শাসকরা শুষিয়ে নিচ্ছে। তাদের চামচারা শুষিয়ে নিচ্ছে। যারা সুস্থ জীবনের কথা ভাবছে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে আপ্রাণ লড়ছে, তারা শুধু মার খাচ্ছে। দেশের লোকেরাও তাদের পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে না। এ এক অন্ধকার সময়। আমার তো কোন ক্ষমতা নেই।

কোন কিছু করতে পারব না। তখন ভাঙতেই সাহায্য করি। আর্থনীতিক অবস্থা, আইন শৃংখলা, সমাজ সব ভেঙে পড়ুক। এইজন্যেই বোধহয়, একদিন থ্রিল খুঁজেছিলাম। আজ নিজের কাছেই নিজে বন্দী। যা করছি তা করা ছাড়া আমার উপায় নেই সোহিনী। আর আমি এ থেকে মুক্তিও চাই না।

কুন্দলালকে চুপ করে থাকতে দেখে সোহিনী আবার জিজ্ঞেস করে, কি হোল চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলুন।

কি বলবো বলুন? আমার নিজের বোধহয় কিছু বলার নেই।

হেসে উঠেছিল সোহিনী। সে হাসির রেশটা অনেকদিন কুন্দলালের মনের মধ্যে সেতারের সুরের মত বাজতো। তারপর পরস্পরের আসা যাওয়া আর যাওয়া-আসার ইতিহাস। কুন্দলাল সোহিনীকে ভালবাসল। সোহিনী কুন্দলালকে। আর তার জন্যেই কুন্দলাল দিল্লীতে একদিন বাড়ী তৈরী করাল। দিল্লীর সবচেয়ে বড় আর্কিটেক্টকে দিয়ে ডিজাইন করাল। নামকরা ফার্ম বাড়ী তুলে দিল।

সব যখন ঠিকঠাক, তখনি একদিন ধাক্কা খেল কুন্দলাল। বাড়ী তৈরী ফার্নিচার ইত্যাদি দিয়ে সাজানোও হয়ে গেছে। কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে আসবে। তাই কুন্দলাল তখনো হোটেলে। সেদিন দুপুরে সোহিনীকে লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন করেছিল। খাওয়া দাওয়ার পর তার ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। আধশোয়া হয়ে শুয়ে ছিল সোহিনী। কুন্দলাল সোফার একটা চেয়ারে বসে পা দুটো খাটের ওপর তুলে দিয়েছিল। কুন্দলাল সোহিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তার মুখের ওপর এক আশ্চর্য তৃপ্তির ছবি খেলা করে বেড়াচ্ছে। কুন্দলাল বলল, কেমন লাগছে?

নিজে বুঝতে পারছ না? সোহিনী সেতারে সুর তুলে হেসে উঠল।

কবে ও বাড়ীতে যাবে?

তুমি যেদিন বলবে।

তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? কালই চল।

যাঃ তাই কি করে হবে?

কেন নয়?

তার আগে তো আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার।

কি বললে? কুন্দলাল যেন নিজেরই অজ্ঞাতে কঠিন হয়ে উঠল।

কেন? বিয়ে। সেটা তো সারতে হবে।

নো। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল কুন্দলাল। হাতের কাছে দামী কাচের অ্যাসট্রেটা ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল। আর তখনি কুন্দলালের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল বারো বছরে শেষ দেখা মায়ের মুখ। সোহিনীর মুখে ও মায়ের মুখ দেখল। ওর হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। শরীরের সমস্ত রক্ত চলে এল মুখে। নিজের অনিচ্ছায় ওর হাত চলে গেল প্যান্টের পকেটে। ওকি তখন রিভলবার খুঁজেছিল। উঠে দাঁড়িয়েছিল সোহিনী। এগিয়ে এসে ওকে শান্ত করেছিল। আর সেই মুহূর্তে কুন্দলাল ফিরে গিয়েছিল তার বারো বছর বয়সে।

তারপরই কুন্দলাল সোহিনীকে বলেছিল সব কথা। তার মা। তার জীবন। এবং ভালবাসা। কিন্তু না সোহিনী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না। বিয়ে করলে আমাদের সন্তান হবে। আর সন্তানের দশ বছরে তুমি অন্য কারো প্রেমে পড়বে। আর তার বারো বছরে তুমি তাকে কুন্দলাল বানিয়ে দিয়ে সংসার ছাড়বে। সে হয় না সোহিনী। সে হয় না।

সোহিনীর চোখ ফেটে জল এসেছিল। সে কি বুঝেছিল জানিনা। আর এক দিন বিয়ে না করেই কুন্দলালের হাত ধরে চলে এসেছিল তার নতুন বাড়ীতে। সোহিনীর বুকে হয়তো বেদনা ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ চিরকালের মত কুন্দলালের দুরন্তপনার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

তখন বিহার জ্বলছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের ডাকে হাজার হাজার মানুষ এসে সমবেত হয়েছে। এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অবসান চাই। সর্বাত্মক বিপ্লব। শাসন যন্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে তৈরী। কিন্তু সম্মিলিত মানুষের নাড়িতে নাড়িতে তখন বিদ্রোহের আবেগ। অসুস্থ জয়প্রকাশজী শহরে-গ্রামে যুবকের শক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সমস্ত রকমের সরকারী দুর্নীতির অবসান চাই। কংগ্রেস সমস্ত সংগঠন নিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মোকাবিলায় অক্ষম কংগ্রেস। তার লেজুড় দক্ষিণপন্থী কমুনিষ্ট পার্টি তাঁর নামে কুৎসা রটাচ্ছে। বলছে, জয়প্রকাশজী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রতিনিধি, সি আই এ-র দালাল। দক্ষিণপন্থাদের হয়ে উনি দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্তু

নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের মিছিল তখন ওদের পায়ের তলায় চেপে এগিয়ে চলেছে। নেতা জয়প্রকাশ জিন্দাবাদ।

॥ পাঁচ ॥

কুন্দলাল এখন বেশিরভাগ সময়টাই দিল্লীতে কাটায়। এবং তার চোখের সামনেই রণজয় উঠে এল রাজনীতি এবং প্রশাসনের সবচেয়ে উঁচু মঞ্চে। বিধাতৃ দেবী এখন বড় বেশি বিব্রত। চারিদিকে ষড়যন্ত্রের জাল। রণজয়ের পরামর্শ ছাড়া এক পাও তার পক্ষে এগোন শক্ত। আর এই সুযোগে রণজয় নিজের সাম্রাজ্য নির্মাণ করছে। বিধাতৃ দেবী যাতে কোন খবর সরাসরি না পেতে পারেন, তার জন্যে সমস্ত পুরোন কর্মচারীদের সরিয়ে দিয়ে সবজায়গায় নিজের বিশ্বস্ত লোক বসিয়ে দিয়েছে। সরকারী ফাইল দেখবার তার এখন অবাধ অধিকার। রাজ্যের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আলোচনায়ও সে থাকছে।

এদিকে কুন্দলালের নামে পুলিশ তখন ফাইল তৈরী করে ফেলেছে। উত্তরপ্রদেশ দিল্লী আর হরিয়ানায় প্রায় পঞ্চাশটা ডাকাতি এবং সাতটা খুনের খতিয়ান তাদের হাতে। এক সময় এসব পরোয়া করত না কুন্দলাল? নিজের পকেটে রিভলবার থাকতে জ্যান্ত তাকে ধরে কে। কিন্তু এখন সোহিনীর প্রেমে কিছুটা আত্মভালবাসা এসেছে। আরো কিছুদিন অন্তত বাঁচতে চায় সে। দিনে দিনে তাই রণজয়ের কাছে ধরা দিচ্ছে কুন্দলাল। প্রটেকশন চাই। অবশ্য তার প্রটেকশন আছে বলেই পুলিশ এখনো ফাইল হাতে করে মুখ বুজে বসে আছে।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। দিনটা ১৩ জুন ১৯৭৫। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিলেন এলাহবাদ হাইকোর্ট। দিল্লীর কর্মকর্তারা তখন ভীষণ ব্যস্ততায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। মন্ত্রীরা ছুটছেন এ ওর বাড়ীতে। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে ঘন ঘন বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলেন যে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে তার অনুগত কোন একজনকে ওই পদে বসাবেন। কার্যক্ষেত্রে অবস্থা কিন্তু হোল অন্যরকম। কথা বলেই তিনি বুঝলেন যে একবার গদি ছাড়লে আর তা ফিরে পাওয়া শক্ত। সুতরাং···। পর্যতদের নিয়ে জমে উঠলো গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র। হাইকোর্টের রায় ব্যর্থ করার চক্রান্ত হলো। প্রধানমন্ত্রীর তনয়ের হাতে চলে এল সুদর্শনচক্র।

কুন্দলাল তখন দিল্লীতে। তার চোখের সামনে ভারতবর্ষের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর ধারাপ্রবাহ চলেছে, তাতে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এই ডামাডোলের মধ্যেই দিল্লীতে সে একটা বড় ডাকাতি করে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। চুপচাপ বসে থাকতে সে পারে না। থাকলেই কি এক বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসে। সে বিষণ্ণতা সোহিনীও দূর করতে পারে না। পিয়ারীলাল এখন দিল্লীতে। বাড়ীতে থাকলে ওর সঙ্গে প্রশ্ন করেই সময় কাটায়। কচিৎ কদাচিৎ প্রকাশের বাড়ী যায়, সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। এমন সময় একদিন রণজয়ের টেলিফোন পেল কুন্দলাল। হুকুম এলো: এক্ষুণি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।··· হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছি।

কুন্দলাল গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল। রণজয় ওর সামনেই টাকাটা ওর সেক্রেটারির হাতে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে এখুনি চলে যাও। ওকে বলে দিও কাজ সেরে রাতেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। যত রাতই হোক আমি অপেক্ষা করব। এটাকা কোথায় গেল, কি কাজ কুন্দলাল কিছুই জানতে না। জেনেছিল পরদিন, যখন কয়েক'শ লোক, বিধাতৃ দেবী যুগ যুগ জিও বলে তার বাড়ীর সামনে মিছিল করে এসেছিল। কাগজে কাগজে ফলাও করে খবরটা ছাপাও হয়েছিল। টাকাটা রণজয়ের হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল কুন্দলাল, তখনি রণজয়ের হুকুম এসেছিল, বসুন, কথা আছে।

সামনের সোফাটায় বসে থাকল কিছুক্ষণ কুন্দলাল। তারপর ওর সেক্রেটারী বেরিয়ে যেতে বলল, বলুন।

রণজয় এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছেন। এখন আপনি দিল্লী ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যে কোন সময় আপনাকে আমার দরকার হতে পারে।

বেশ তাই হবে, বলে বেরিয়ে এসেছিল কুন্দলাল।

সময় ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। ২৬শে জুন দেশে এমার্জেন্সী ঘোষণা করা হোল। আগের দিন রাতেই, সি পি আই ছাড়া সমস্ত বিরোধী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। সেদিন রাতে দিল্লীর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বানচাল করা হোল যাতে পরদিন সকালে কোন সংবাদপত্র না প্রকাশিত হতে পারে। খবরের ওপর সেন্সরশিপ চালু হলো। আর তারপরই শুরু হোল নতুন ফ্যাসীবাদী শক্তির খেলা।

তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কুন্দলাল খবরের কাগজের পাতায় আবিষ্কার করল, রণজয় যুব সংগঠনের সবচেয়ে বড় নেতা বনে গেছে। তার জন্য শহরে নগরে সরকারী ভবনে লক্ষ লক্ষ টাকার অভ্যর্থনার আয়োজন। ঘন ঘন প্রেস কনফারেন্স। কি না। একদিন যারা প্রাণ দিয়ে যুব সংগঠন গড়েছিল, তাদের সংগঠন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল। তাদের জায়গায় এলো উঠতি মস্তানেরা। যুবনেতা রণজয় মোদী জিন্দাবাদ তখন চারিদিকে ত্রাস। তারপরই এই যুবনেতা পাঁচ দফা কর্মসূচী হাজির করে, সব দফার কথা ভুলে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠল। আর তখনি আর একবার ডাক পড়ল কুন্দলালের।

কুন্দলালজী, দেখতেই তো পাচ্ছেন চার দফের অবস্থা। এখন বেশিরভাগ সময়েই আপনাকে আমার আশেপাশে থাকতে হবে। রণজয় বলেছিল। আপনি যখনই আদেশ করবেন···। বিনীত হয়েছিল কুন্দলাল। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারলে আর উপায় নেই।

না, না, আদেশ কেন। দেশের এই দুর্দিনে আপনারাই তো আমার ভরসা।

দেখুন, আমি রাজনীতি বুঝি না। আর ওতে আমার উৎসাহও নেই। আপনি বলছেন, সেই যথেষ্ট।

বিনয় চৌধুরীর পো বশ হোল। কুন্দলালের গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলল, আপনাদের মত অনুগত বন্ধুরাই তো আমার ভরসা।

আর ওই অনুগত বন্ধুদের সাহায্যেই নির্বীজকরণের নামে রণজয়ের অত্যাচার চূড়ান্তে উঠল। কুন্দলাল দেখে যেতে থাকল। নীরব দর্শক ছাড়া আর কী ভূমিকাই বা সে নিতে পারত। এরকম এক ভূমিকাহীন বসে থাকার দিনে সে সুলক্ষণাকে চিনল। দক্ষিণের মেয়ে। ভীষণ সেক্সি চেহারা। ঢুকেই বলল, রণজয় আমার টাকা রেডি তো?

আরে বসবে তো। এসেই টাকা, টাকা আরম্ভ করেছ। রণজয় তাকে শান্ত করতে চাইল।

এসেছি যখন, বসব তো বটেই। কিন্তু টাকাটা এখনি চাই। বলতে বলতে রণজয়ের গা ঘেঁসে বসে পড়ল। রণজয় বাঁ হাতটা ওর ঘাড়ে তুলে দিল।

সুলক্ষণা ওর হাত থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত আছে?

বিশ হাজার।

বিশ হাজার কি করে হবে?

কেন গত সপ্তাহেই তো বিশ হাজার দিয়েছি।

দশ বিশ হাজারে কি হবে। আরো চাই।

পাবে, পাবে।

সুলক্ষণার চোখে কপট অভিমান দেখা দিল। চোখ ছলছল করে বলে গেল, ওমুককে ৬০ হাজার, ওমুককে ৮০ হাজার, অমুকজনকে ৫০ হাজার দিয়েছো। আর আমার বেলায়ই হিসেব?

রণজয় ওকে শান্ত করতে চাইল, পাবে, পাবে। তুমিও পাবে। কিন্তু কাজ কি রকম চলছে?

আমি ইতিমধ্যে কতজনকে ভ্যাসকটমি লাইগেশন করিয়েছি, সে খবর তুমি রাখ না?...বস্তিতে কজন মুসলমান বড় বাড় বেড়েছিল। তাদের খতম করিয়ে দিয়েছি। আমার হাত থেকে বাঁচবে কে? তোমার ওই শ্রীমতী রমণের চেয়ে আমার কাজ অনেক ভাল। বুঝলে? সুলক্ষণা রাতে আসবে বলে সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিল।

সুলক্ষণাকে সেদিন চিনতে পারেনি কুন্দলাল, চিনল পার্কম্যান গেটে বস্তি উচ্ছেদের নামে প্রায় দু'শো গরীব মুসলমানকে মেরে ফেলার ঘটনার দিন। সুলক্ষণার অনুচরেরাই প্রথম কাজে নেমেছিল আর তারপরই ওদের সহায়তার জন্যে এগিয়ে এসেছিল রাইফেল হাতে পুলিশ সি আর পি। ৭·৬২ আর ৩০৩ রাইফেল থেকে শ'খানেক রাউণ্ড গুলি বেরিয়ে গেল। কাটা ছেঁড়া মৃতদেহের পাহাড় জমে গেল। আর সে দৃশ্য থেকে জালিয়ান ওয়ালাবাগ—কুখ্যাত মাইকেল ও'ডায়ারও লজ্জা পেতেন। সেদিন সুলক্ষণার দু'চোখে আনন্দের বান বয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার গলায় তখন গুনগুন গান, কখনো হাততালির খুশি। কুন্দলাল এককোণে দাঁড়িয়েছিল। এতকাল সে রক্ত দেখলে খুশি হোত। আজ যেন কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। নিঃশব্দে এক সময় সরে যেয়ে নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল।

একটার পর একটা অত্যাচারের ঘটনা কুন্দলালের চোখের ওপর ঘটে যেতে থাকল। সে দিনে দিনে ক্লান্ত হতে থাকল। কিন্তু তারও আজ উপায় নেই। রণজয়ের শেলটার থেকে সে বেরুতে পারবে না। বেরুলে তার মৃত্যু অবধারিত। আর ওর সঙ্গে থেকে প্রতিদিন ও যে যন্ত্রণায় মরছে, তার হাত থেকে বাঁচে কি করে। সোহিনীও এখন যেন তেমন করে ওর দুঃখ বোঝে না। মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও। কুন্দলাল বোঝে সোহিনী নিজেও এখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

সোহিনী এখন প্রায়ই একলা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফেরার ঠিক থাকে না। কোথায় যায়, কেন যায়, কুন্দলাল কোনদিন জানতে চায়নি। দেখা হলেও তাকে এড়িয়ে যায়। একদিন অনেক রাতে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন ওর ক্লান্ত বিপর্যস্ত চেহারা দেখে কুন্দলালই জিজ্ঞেস করেছিল, ওরকম লাগছে কেন? শরীর ভাল নেই? না, বলে ঢুকে যাচ্ছিল সোহিনী। কুন্দলাল ওর হাত ধরল, কি হয়েছে তোমার?

কিছু না তো।

না বললে আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না। তোমাকে বলতেই হবে। সেদিনই বলেছিল। সব কথা খুলে বলেছিল সোহিনী। একদিন দুর্জয় দুর্ধর্ষ কুন্দলালকে ভালবেসেছিল সোহিনী। হ্যাঁ, তুমি পৌরুষ বলেই তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। জীবনের সমাজের সব বাঁধন ভেঙে বাঁচবার স্পর্ধা ছিল তোমার। সে আগুনের আকর্ষণ আমি এড়াতে পারি নি। বাড়ীর সাধারণ সামাজিক জীবনে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তখন তুমিই ছিলে আমার মুক্তি। আমার খোলা আকাশ। আজ সেসব দিন কোথায় গেল। রণজয়ের তাঁবেদার একজন পরাজিত মানুষের সঙ্গ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা কর কুন্দলাল। আমাকে ক্ষমা কোরো।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসারকে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল সোহিনী। আর কুন্দলাল সেই প্রথম অসহায় বোধ করেছিল। বড়ো বেশি অসহায়।

আর এই অসহ মানসিক অবস্থায় সব কিছুর বিরুদ্ধেই মন বিদ্রোহ করেছিল কুন্দলালের। হাজার হাজার লোককে জোর করে ভ্যাসকটমি লাইগেশন করা হচ্ছিল পুলিশ রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। খবর আসতে থাকল, যে সব ছেলেদের বিয়ে পর্যন্ত হয়-নি, তাদেরও জোর করে ধরে এনে অপারেশন করা হচ্ছে। কুন্দলালকে সব জায়গায় যেতে হয় না, সব দেখতে হয় না, কেবল রণজয়ের পাশে বসে শুনে যেতে হয়। প্রয়োজনে নিজের লোক পাঠিয়ে বা নিজে যেয়ে হাঙ্গামাকারী

দের সাবাড় করতে হয়। কিন্তু না, আর পারছে না কুন্দলাল। সে বিধাতৃ দেবীর কাছে গোপনে চিঠি পাঠাল সব জানিয়ে।

আর পথ বদল করে সে চিঠি চলে এল রণজয়ের হাতে।

রাতারাতি কুন্দলালের চোখের সামনে তার জগৎ পালটে গেল। পুলিশ আবার খাতা খুলে বসল। তারা তৈরী। কদিনের মধ্যেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। একে একে কুন্দলালের দলের লোককে ধরতে লাগল পুলিশ। কুন্দলাল বুঝল তার দিনও আসন্ন।

এখনো রণজয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ আগের মতই আছে। সেই যাওয়া আসা চলছে। রণজয় আগের মতই সহজ স্বচ্ছন্দ। তবু কুন্দলাল বোঝে দিন আসন্ন। সে মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্যে তৈরী। তারপর একদিন রণজয় বলে, কুন্দলালজী, আমার লাখ খানেক টাকার দরকার।

এত নগদ টাকা তো আমার কাছে নেই।

তাহলে যোগাড় করুন। আপনার পক্ষে এটা আর তেমন শক্ত কি?

কিন্তু পুলিশ তো আমার সাঙ্গপাঙ্গদের ছেঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

কি করে সম্ভব।

কেন? আপনি আর পিয়ারীলালই তো যথেষ্ট।

কুন্দলাল রণজয়ের চোখের দিকে তাকাল। নিজের এপিটাফ পড়ল। ওর মৃত্যুর খবরটা কি কি সঙ্গে লেখা হবে? কতটুকু মর্যাদা পাবে মৃত কুন্দলাল? কুন্দলালের প্রতি সহকারীর নামে ফাইল বন্ধ করার পর কুন্দলালকে আবার অপারেশনে ঠেলার মানে একটাই। তার ফাইলও বন্ধ হতে চলেছে।

রণজয়ের চোখে নির্মম প্রত্যাখ্যান। কুন্দলালের দরকার তার কাছে ফুরিয়েছে।

কুন্দলাল বলল, দু'জনে?

দুজনে। অফ কোর্স। আমি কিউ দিচ্ছি।

কি রকম?

আগামীকাল ছগনরাম আগরওয়াল ব্যাঙ্ক থেকে দু লাখ টাকা তুলছে। পরশু ওর মেয়ের বিয়ে। আপনি যদি কাল রাতে……সব ব্যবস্থা কমপ্লিট। ও রাস্তায় পুলিশ পাহারা থাকবে না। রাস্তায় রাত্তি থাকবে না। টেলিফোন করলেও পুলিশ যাবে না। আধাআধি বখরা।

কুন্দলাল ওর দিকে তাকাল। নির্বাক চোখ। সো, দিস ইজ দ্য এনড্। বাড়ীটাও সোহিনীকে দেওয়া হল না। সোহিনীকে তো হারাবার ভয়ে সম্পূর্ণ করে পাওয়াও হল না। জীবনে এত জিনিস অনায়ত্ত থেকে যায় কেন?

কুন্দলাল বলল, ঠিক আছে।

কুন্দলাল রণজয়কে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পিয়ারীলালও বলল, খবরটা ঠিক।

কুন্দলাল বলল, খবর খানিকটা তো ঠিক হবেই।

সত্যিই পরশু আগরওয়ালের মেয়ের বিয়ে।

ও।

রণজয়কে টাকা না দিলে……

জানি। পুলিশ। না, সে বড় অপমান।

তাহলে?

হ্যাঁ। আমরা যাচ্ছি।

এরপর রণজয় আর কিছু করতে বলবে না।

না। সব অর্থেই এটা লাস্ট অপারেশন।

মানে?

একটা হান্‌চ।

পিয়ারীলাল ও কুন্দলাল গভীর রাতে ছগনরামের বাড়ীর কাছে পৌঁছয়। দূরে গাড়িটা রাখে। রাস্তাটা অন্ধকার ছিল। অন্ধকার কখনো কখনো জীবন্ত ও সচল হয়।

পিয়ারীলালকে পেছনে ঠেলে দেয় কুন্দলাল। নিজে এগিয়ে যায়। তখন অন্ধকার তাকে কর্ডন করে, উদ্যত হয়, টিপ ঠিক করে। কুন্দলাল আরো এগোয়। এত রাইফেল কেন? কেন এত রিভলবার? ওয়েট, অপচয়। একটা বুলেটই তো……

তারপর অন্ধকার গর্জে ওঠে বন্দুক হয়ে। কুন্দলালের শরীরে নলগুলি নিঃশেষ করে বুলেট। কুন্দলালের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পিয়ারীলাল পালিয়েছিল।

রণজয় মোদী ফোনের পাশে বসেছিল। ঠিক সময়ে কাজ শেষ হলে ফোনে মেসেজ যায়। তারপর হত্যার নায়কেরা একে একে হাজির হলে মুখে খবর পায়।

অনেক রাতে পুলিশ কমিশনারের গাড়ীটা রণজয় মোদীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ফুটপাথের কাব্য

রণজিৎ কুমারসেন

ওরাও এসে একদিন কলকাতার এই ফুটপাথের ভিড়ে মিশে গেল। এখানে সবাই যে অভ্যাসগত ভিক্ষাজীবী, তা নয়। তাদের মধ্যে এমন অনেক পরিবার এসে ঠাঁই নিয়েছে—যাদের পুরনো দিনের কিছু একটা মফঃস্বলী জীবন ছিল। সে জীবন বিধ্বস্ত হয়ে ক্রমে নতুন জীবন শুরু হয়—কলকাতার ফুটপাথে। আগে পায়ের নিচে ছিল মাটি, এখন প্রস্তর। এখানে বাধা গৃহজীবন নেই, তবু জীবন যাপনের এখানে কত আশা, কত প্রলোভন!

সেই আশা আর প্রলোভনে ওরাও এসে ঠাঁই করে নিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার এই ফুটপাথে। হারু, তার বউ চাঁপা, মেয়ে টগর আর দুই ছেলে ইতু আর নিতু। হারু পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শরীর অনেকটা শিথিল, সেই তুলনায় পঁয়তাল্লিশে চাঁপা অনেকখানি অ্যাটোসাটো; ইতু আর নিতু বাইশ আর কুড়ি, পরিমিত আহার না পেয়েও শক্ত জোয়ান; টগর সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়েছে, রং শ্যামবর্ণ, যৌবনের ভারে মুখের আদলে ঈষৎ লাবণ্য ফুটেছে। একটা গাছের ছায়া দেখে যে-ফুটপাথে ওরা যায়গা ক'রে নিয়েছিল, অনেক রোদের তাপে আর ঝড়-জলেও সে যায়গার দখল ওরা ছাড়েনি। রাত্রে কিছুটা ছাউনি বেঁধে আরু ক'রে নেয়, সকালে আবার তুলে ফেলে। যেদিন ঝড়-জল নামে, সেদিন ফুটপাথের অন্যান্য জীবনের মতো ওদেরও গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় কোনো বাড়ির ছাউনি দেওয়া রকে অথবা কোনো বুল বারান্দায়। নইলে ইঁট পাতা উনুনে দু'বেলা মেটে হাঁড়ি আর কড়া চাপিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে নিতে ওদের খুব একটা সময় লাগে না।

এখানে এসে অবধি এমনি করেই দিন কাটছিল। কিন্তু কি করে যে কাটছিল, তা তারা নিজেরাই জানেনি। ইতিমধ্যে কারুর কারুর যে টগরের উপর নজর না পড়েছে, এমন নয়। অনেকে অকথ্য ইশারা করেছে, মজা পেয়ে মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে টগর। ইতু আর নিতু সারাদিন কলকাতার এপাড়া ওপাড়া চষে বেড়াতে বেড়াতে এ শহরের নাড়ীনক্ষত্র সব জেনে ফেলেছিল। রাজনীতিক উপনেতাদের আশ্রয়ে ওদের যে কিছু কিছু সুবিধে হতে পারে, একথাটা কোথা থেকে যেন উড়ে এসেছিল ওদের কানে। সেই থেকে অনেকের চোখে ধুলো দিয়ে দিনে রাত্রে ইতু আর নিতু যতক্ষণ পারে, রাজনীতির ছায়ায় ঘুরে আসে। তাছাড়া সারা শহর টহল দিয়ে বেরিয়ে বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে বেগ পেতে হয়নি ওদের। তাদের নাগরিক বুদ্ধির ছোঁয়া পেয়ে পাকা হয়ে উঠেছিল ওরা। ফলে কোথা থেকে কোন্ জিনিসটা সহজে মেলে, তা জানতে বাকী ছিল না ইতু আর নিতুর। অনেক সময় বাজে চালের ভাত মুখে তুলতে না পেরে

কোথা থেকে ভালো বাছাই চাল ডাল আর মশলা থলেয় ভরে এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে ওরা। কখনো যদি চাঁপা জিজ্ঞেস করেছে : 'কোথা থেকে পাঁসরে এত সব ? সারা জীবনে এমন ভালো চালের ভাত কখনো খাইনি।' জবাবে ইতু আর নিতু গর্বের কণ্ঠে বলেছে : 'এ কি আমাদের সেই এঁদো পাড়াগাঁ, এ হলো রাজধানী কলকাতা। কিছু রোজগারই যদি না করতে পারবো তো ঘুরে বেড়াই কি শুধু শুধু !' শুনে আশ্বস্ত হয়েছে চাঁপা, স্বামীকে ফোড়ন কেটে বলেছে : 'তুমি তো পঞ্চাশেই কোমর গুঁজে নিশ্চিন্তে আছো, ইতু আর নিতু দেখতো কেমন রুজি রোজগার ক'রে দিনের শেষে ভর্তি থলে হাতে নিয়ে ফিরছে। দেশ গাঁয়ে কোনো কালে এমন সরু চালের ভাত কখনো খেয়েছো ? দু'গ্রাস মুখে নিলে ইচ্ছে করে আর এক গ্রাস খাই। ইতু আর নিতু আমার লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।'

কিন্তু চাঁপা নিজে যে কতবড় লক্ষ্মী, তা তার আঁটোসাঁটো দেহের গড়নে এতকাল বুঝে উঠতে পারেনি সে। একদিন ঝড়ের সন্ধ্যায় বসাকদের খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই জানালার ভিতর থেকে বসাকগিন্নীর নজরে পড়ে গেল সে। ততক্ষণে চাঁপা রীতিমত ঝটিকাহত। দেখে তাকে দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে ডাকলেন বসাকগিন্নী, বললেন : 'আচ্ছা মেয়ে তো বাপু তুমি, এই ঝড়ে এতক্ষণে মাথায় কোথাও ছাউনি পেলে না ?' শির্‌শির্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে চাঁপা বললো : 'আমাদের যে ছাউনি, তা ঝড়ে টেকে না, তাইতো আপনার এই বারান্দায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম মা। আপনার দয়ার শরীর, তাই দরজা খুলে ভিতরে ডাকলেন।' বসাকগিন্নী বললেন : 'তা—এই কাছেই ফুটপাথে থাকা হয় বুঝি ?' মাথা নিচু করে লজ্জায় চাঁপা বললো : 'আজ্ঞে হাঁ।' পাশে বসে এতক্ষণ বসাকগিন্নীর মেয়ে দেওর গল্প করছিল। ঝটিকাহত চাঁপার দেহের দিকে লক্ষ্য করে তার মাথায় কি যেন একটা আইডিয়া এসেছিল, বললো : 'ফুটপাথে থাকলেও ঠিক ওখানকার লোক বলে মনে হয় না তোমাকে। তা—তুমি তো কাজের লোক খুঁজে পাওনা বৌদি, ও যদি রাত্রি থাকে তো কথা বলে দেখ না।' বসাকগিন্নী বললেন : 'ওরা কি আর বাড়ি ঘরের কাজ করবে, তাতে ওদের জাত যাবে যে !' চাঁপার দেহের কাঁপুনি তখনো যায়নি, শুনে অস্ফুটকণ্ঠে বললো : 'সত্যি আমাদের একটা জাত আর বংশ মর্যাদা ছিল মা, এখানে আসার আগে নিজের ঘরেও কখনো নিজের হাতে এঁটো কাঁটা কাচাইনি। তা আপনি বললে দুপুর দুপুর এসে আপনার জামা কাপড় সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারি।' বসাকগিন্নী বললেন : 'ঠিক আছে, কখনো দিনের বেলা এসো, কথা বলবো। কিন্তু এই ঝড়ে এখুনি তো তুমি বেরোতে পারছো না, অথচ ঠাণ্ডায় যেমন করে কাঁপছো, তাতে কিছু একটা গায়ে না চাপালেও তো নয়। দাঁড়াও দেখছি কি করা যায়—' বলতে বলতে ভিতর মহলের দিকে একবার এগিয়ে গেলেন তিনি। ততক্ষণে দেওর ব্যক্তিটি একবার চোখ নাচিয়ে বললো : 'কি, গা গতর খাটিয়ে পয়সা কড়ি কিছু রোজগার করো, না বাবু-ভাতার কেউ দেখে ?' শুনে চাঁপার আঁটো সাঁটো সারা দেহে কেমন যেন একবার কাঁটা দিয়ে উঠলো। বললো : 'আমি দেখতে এমন হলেও আমার বয়স কিছু বসে নেই, আমার বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে, ছেলেরা রোজগার করে।' ইতিমধ্যে বসাকগিন্নী এসে দাঁড়াতেই দেওর ব্যক্তিটি কোথায় উঠে গেল। নিজের একটা পুরনো অব্যবহৃত সুতির স্কার্ফ আর ঈষৎ ছেঁড়া একখানি শাড়ি চাঁপার দিকে এগিয়ে ধরে বসাকগিন্নী বললেন : 'নাও, এই দুটো গায়ে জড়িয়ে নাও, এখন থেকে ব্যবহার করতে পারবে।' কিন্তু হাত বাড়িয়ে চাঁপা তা গ্রহণ করলো না, বললো : 'যিনি এতক্ষণ এখানে ছিলেন, তাঁর কথাবার্তা ভালো নয়, আমি যাই মা। আপনার অনেক দয়া, তবু এ কাপড় আমি নিতে পারবো না।' বলে পড়ন্ত ঝড়ের মধ্যেই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো চাঁপা। অবাক বিস্ময়ে খোলা দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বসাকগিন্নী।

সেদিন কোথা থেকে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ট্রানজিসটার হাতের মুঠোয় বাজাতে বাজতে নিয়ে এলো ইতু। গান শুনে খুশীতে উপচে পড়লো টগর। জিজ্ঞেস করলো : 'কোথায় পেলিরে বড়দা ?' ইতু বললো : 'ঐ একরকম করে পেয়ে গেলাম আর কি। এটা তোর। গান নাটক, দেশ বিদেশের খবর সব শুনতে পাবি।' এক মুখ হাসি নিয়ে এবারে নিজের হাতে ট্রানজিসটারের চাবি ঘোরাতে লাগলো টগর। কাছাকাছি ফুটপাথবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু হিংসা দেখা দিলেও কাজে কর্মে শোয়া বসায় গানের মধ্যে মনটা ডুবে রইল তাদের। পথচারী দু'একজনও যে মাঝে মাঝে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে না গেল, এমন নয়। কেউ বা গানের আকর্ষণে, কেউ বা টগরের। খুব একটা কাছে পিঠে কেউ না থাকলে টগরের সঙ্গে ভাব জমাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে কেউ কেউ। অনেক সময় অন্যমনস্ক থেকেও হারু সেটা ধরে ফেলেছে। ইতিমধ্যে ছেলেদের নিয়ে খেতে বসে একদিন সে বললো : 'দিন রাত তো দুই ভাইতে তোরা হাজার মহল চক্কর দিয়ে ফিরিস। তা এই যে বোনটার এত বয়স হলো, দেখে শুনে কোনো একটা ভালো রোজগেরে পাত্র ঠিক করতে পারিস নে ?' ভাতের গ্রাস মুখে পুরে নিতু বললো : 'তোমার কি কোথাও মজুৎ টাকা আছে যে, টগরের বিয়ের কথা ভাবছো ? কিছু না করলেও দু'পাঁচশো টাকা তো লাগবেই !' কালাইচটা স্টিলের থালায় ভাতের দিকে মুখ রেখে হারু বললো : 'মজুৎ টাকা থাকলে আর এখানে প'ড়ে আছি কেন। পাত্র ঠিক ক'রে খরচ খরচাও তোদেরই দেখতে হবে।' খাওয়া শেষ ক'রে উঠতে উঠতে এবারে ইতু বললো : 'ঠিক আছে, যখন তুমি মন করেছ, টগরের বিয়ে তখন আটকাবে না। খোঁজ ক'রে দেখি আমাদের পাল্টাঘরের

ছেলে কোথায় পাই।'—মনে মনে এবারে কিছুটা আশ্বস্ত হলো হারু।

কিন্তু যত সহজ ক'রে ইতু কথাটা বললো, তত সহজে পাত্রের খোঁজ পেয়ে উঠলো না। যা খোঁজ পেলো, এ বাজারে তার দামও কম নয়। চাল, ডাল, তেল, সাবান, সে আর নিতু এর আগেই কতবার এনেছে, এবারে তার মুঠোয় এসে গেল একটা মাঝারি দামের ঘড়ি আর লকেট দেওয়া, একছড়া সোনার চেন। গোপনে মায়ের হাতে এনে তুলে দিতেই রুদ্ধ আর্তনাদে চাঁপা বলে উঠলো: 'এ তুই কার জিনিস কোথা থেকে নিয়ে এলি। লোকে যে তোকে চোর বলবে ইতু।' ঝাঁঝালো কণ্ঠে ইতু বললো: 'যে চোর বলবে, তার চোদ্দ পুরুষ চোর। এসব দেখে শুনে যোগাড় না করলে টগরকে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবে কি ক'রে? পাত্রকেও তো ঘড়ি জুতো আংটি সব দিতে হবে। তুমি বুঝেও যেন কিছু বুঝতে চাও না মা।'

ফুটপাথের এই সমাজে বাস ক'রে সব কিছু যদি বুঝতে চাইতো চাঁপা, তবে নিজেও হয়তো অনেকের চোখে ধুলো দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কিছু রোজগার করতে পারতো, কিন্তু তাতে যেমন প্রবৃত্তি আসেনি তার, তেমনি সে-কথা খুলেও বলা যায় না ছেলেদের কাছে। মা হ'য়ে সে চিরদিন সন্তানদের ইষ্ট কামনা করেছে, আর স্বামীর সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া ক'রেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে। এই ক'রেই আজ অবধি সে কাটিয়ে এসেছে। এরপর সবাইকে সুস্থ রেখে নিজে চোখ বুজে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হবে চাঁপা। তাই ইতুর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে ব্যাগসুদ্ধ ঘড়ি আর চেনছড়া তার গোপন প্যাটরার মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে রাখলো সে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। সেদিন ইতু আর নিতু দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে অনেক রাত্রে একা ফিরে এলো নিতু। হারু জিজ্ঞেস করলো: 'ইতু কোথায়, সে যে এখনও ফিরলো না? সন্ধ্যার ভাত এতক্ষণে কড়্‌কড়ে হ'য়ে হাঁড়িতে লেগে আছে। আজকাল তোরা কি হলি, বল্‌তো?' নিতু ভেবেছিল—ঘটনাটা বাবার কাছে চেপে যাবে, কিন্তু পারলো না। তবু আসল সত্য গোপন করে মুখে যতটা এলো, তাই জোড়াতালি দিয়ে বললো: 'ইস্টিশনের কাছে দু'দল লোকের মধ্যে মারপিট লাগলো। আমরা পাশ কাটিয়ে আসতেই দাদা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, তারপর দু'দলের কথাবার্তা থেকে কী আঁচ পেলো কি জানি, হঠাৎ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের মধ্যে। আমি দূরে স'রে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগলাম। প্রচণ্ড মারপিট, প্রায় রক্তারক্তি ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গাড়ী এসে অনেককেই জোর ক'রে থানায় ধরে নিয়ে গেল। দাদাও ধরা পড়লো।'

এতক্ষণ পাশে বসে চাঁপা সব শুনছিল। এবারে ত্রস্তকণ্ঠে বললো: 'রক্তারক্তি ব্যাপার, তা—ইতুর গায়ে কোনো আঁচড় লাগেনি তো? হাজতে ধরে নিয়ে গেল, হাজতেই সারা রাত তবে কাটাবে? তুই বাধা দিতে পারলি না দাদাকে, হতভাগা!'

নিতু বললো: 'বাধা দিতে গেলে আমিও যে ধরা পড়তাম। তুমি খবরটা অবধি পেতে না। তবে দাদাকে ওরা বেশীদিন আটকে রাখতে পারবে না, এ তুমি দেখে নিও মা। আমাদের পলিটিক্স দাদাদের কানে গেলে দলবল নিয়ে গিয়ে থানা একেবারে তচ্‌নচ্ ক'রে ফেলবে।'

শুনে চাঁপা তেমন একটা আশ্বস্ত হলো না, হাজার হোক মায়ের প্রাণ। মনে মনে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে হাঁড়ি থেকে থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে নিতুকে বললো: 'নে, এবারে খেয়ে শুয়ে পড়। তোদের নিয়ে আমার আর অশান্তির শেষ নেই।'

হারু ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিল। ঘটনাটা যে তার কানেও না গেল এমন নয়, কিন্তু এত রাত্রে এই নিয়ে সে আর গলা না ফাটিয়ে চেষ্টা করলো ঘুমোতে।

কয়েক গ্রাসে কোনোরকমে থালার কড়্‌কড়ে ভাত গলা দিয়ে নামিয়ে সামনের টিউবওয়েল থেকে মুখ ধুয়ে এসে নিতুও এবারে শুয়ে পড়লো। ফুটপাতের জীবনে তখন কেউ আর জেগে নেই।

কিন্তু বাপ মার কাছে নিতু আসল সত্যটা চেপে গেলেও ইতুর ধরা পড়ার ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে নিতু ও তার দাদার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্ত। পকেটমারা, ছিনতাই আর রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ডে মালগাড়ী থেকে মাল চুরির ব্যাপারে অনেকদিন থেকেই ধীরে ধীরে হাত তাদের রপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। ওপথে যাবার আগে যত ভয় ছিল, যাবার পরে দিনে দিনে তত সাহস বেড়ে উঠলো। যে গুরুর কাছে তাদের দীক্ষা, রাজনীতির গলিতে তার অবাধ বিচরণ। সেই সুবাদে ইতু আর নিতুরও পলিটিক্স-দাদাদের ছায়ায় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে বাধলো না। এসব ঘটনাকেই মায়ের কাছে রুজি-রোজগার বলে এতদিন সাফাই গেয়ে এসেছে তারা। সাফাই গাইলেও কোনদিন তাদের পুলিশের হাতে পড়তে হয়নি। এবারও পড়তে হতো না ইতুকে। আসলে দু'দল লোকের মারপিটে গিয়ে সে পড়েনি, পড়েছিল এক ওয়াগন ব্রেকারের দলে—যাদের সঙ্গে এতদিন সে কিছু-না কিছু কাজ না করেছে। দলসুদ্ধ বামাল ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। হারু, চাঁপা কিম্বা টগরের তা জানবার কথা নয়, ইতু ধরা পড়াতেও আসল সত্যটা তাদের অজানাই থেকে গেল।

কিন্তু ভাগ্য ভালো ইতুর যে পুরো তিনটে রাতও হাজতে কাটাতে হলো না। মারাত্মক সন্দেহে দু'জনকে লকারে রেখে বাকী ছ'জনকে জামিনে ছেড়ে দিল পুলিশ। সেই ছ'জনের একজন ইতু। ফিরে এলে কিছুক্ষণ অকথ্য বকাঝকা করলো হারু। চাঁপা বললো: 'অন্যলোকের মারপিটের ব্যাপারে তুই কেন গায়ে পড়ে নাক গলাতে গিয়েছিল শুনি? আর যদি কোনদিন যাবিতো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।' ফিস্ ফিস্ করে একসময় টগর জিজ্ঞেস করলো: 'হাজত কেমন রে বড়্‌দা?' নাক সিঁটকে বিতৃষ্ণার কণ্ঠে ইতু বললো: 'একেবারে বিছিরি, যেমন গুমোট, তেমনি অন্ধকার। ওখানে নাকি কেউ আবার সাধ ক'রে যায়। নিতু বললো: 'আমি মা আর বাবাকে বানিয়ে এক রকম বলে দিয়েছি দাদা, বুঝতে

পেরেছিস তো ?' চোখ টিপে ইতু শুধু জানালো : 'হুঁ্যা, বুঝেছি।'

ব্যাপারটা আপাতত এইখানেই মিটে গেল।

ইতিমধ্যে কে একটি ছোকরা যেন সেদিন সন্ধ্যায় ফুটপাথের ভিড় কাটাতে গিয়ে টগরকে হঠাৎ একবার আকর্ষণ করলো। কিছুদিন ধরেই টগরের উপর তার লোভ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে টগর বলে উঠলো : 'উঃ মাগো!' কাছেই ইতু যেন কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে তখন কথা বলছিল। দৃষ্টিটা ছিল এই দিকেই। মুহূর্তে চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটে যেতেই হঠাৎ মাথায় তার রক্ত চেপে গেল। ছোকরাটি ততক্ষণে খুব একটা এগোতে পারেনি। হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলের মুঠো ধরে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মেরে চিৎকার ক'রে উঠলো ইতু : হারামজাদা, পাজি, শয়তান, লোচ্চামির আর জায়গা পাসনি ? মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া তোকে বার করে দিচ্ছি দ্যাখ।' বলে প্রচণ্ড বেগে আর একটা চড়।

ছোকরাটিও যে রুখে ওঠেনি এমন নয়। কিন্তু ততক্ষণে চারপাশে ভিড় জমে গেছে। দেখে-শুনে ছোকরাটি নীরবে দাঁড়িয়ে মার খেলো, তারপর অনেকের অনেক শাসানি ও অভিসম্পাৎ কুড়িয়ে এক সময় দ্রুত পায়ে পাশের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ সময়ে হারু কিম্বা চাঁপা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, থাকলে কি হতো, বলা শক্ত। ইতু ঠিক করলো—আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ নয়, এবারে যে ক'রে হোক পাত্র ঠিক করে অবিলম্বে সে বোনের বিয়ে দেবে।

একটি পাত্রের কথা তার মনেও এলো। ইতিপূর্বে কিছুদিন তারা এক সঙ্গে কাজ করেছে। নাম বিষ্ণু। থাকে বারাসাতে। চেহারা সুশ্রী। বয়সে ইতুরই প্রায় সমবয়সী হবে। ওয়াগান ভেঙে মাল পাচারে তার জুড়ি নেই। ইদানীং বারাসাতেই চেষ্টা করছে—যদি ছোটখাটো একটা দোকান দিয়ে বসতে পারে। বংশে খাটো নয়। অবস্থা পড়ে যাওয়ায় অন্যদিকে পথ না পেয়ে এপথে এসেছে। ঘর দুয়ার বলতে ইতুদেরও যা, বিষ্ণুরও তাই। তার সঙ্গে রক্তের গভীর না হলেও বিষ্ণুকে ইতুর বেশ পছন্দ।

এক সময় তাকে গিয়েই প্রস্তাব করলো ইতু, বললো : 'আমাদের কাজ কারবার সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় স্বজনকে কিছু জানাবার প্রয়োজন নেই। ওটা আমাদের গোপন কাজ, গোপনেই থাক। আমার বোন টগরকে নিয়ে তুই আমাকে নিশ্চিন্ত কর ভাই। আমার যেটুকু যা সাধ্য, তা বোনের বিয়েতে খরচা করতে ত্রুটি করবো না। শুধু সিঁদুর পরিয়ে টগরকে তুই তোর জীবনে টেনে নে বিষ্ণু। দেখবি সুখী হবি।'

এরকম একটা প্রস্তাব আসবে, বিষ্ণু তা কোনোদিন ভাবেনি। মেয়ে ছেলের প্রতি তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, কিন্তু তার মতো অনিশ্চিত নিঃসম্বল জীবনে কোন্ মেয়ের বাপ নিজে থেকে সেধে এসে মেয়ে দেবে ? তাই এদিকটা সে ভুলে থাকতেই চেষ্টা করতো। হঠাৎ সেই বিস্মৃতি থেকে চমকে উঠে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একবার তাকালো সে ইতুর মুখের দিকে। বললো : 'আমার চাল-চুলো নেই জেনেও তোর বোনকে আমার সঙ্গে গেঁথে দিতে চাস ? তাতে আমি সুখী হলেও তোর বন যে সারা জীবন দুঃখ পাবে।'

ইতু বললো : 'দুঃখ কেন পাবে, তোর মতো ছেলের জীবনে এলে টগর সুখীই হবে। তোর কথা পেলে আমার মা বাবা এসে তোর মার সঙ্গে কথা বলে আশীর্বাদ করে যেতে পারে। তোরাও যাবি, আশীর্বাদ করে টগরের সঙ্গে কথা বলে আসবি। তোকে আমার এত কাছের আত্মীয় ক'রে পাবো, এ আমার ভাবতেও ভালো লাগে।'

বিষ্ণু বললো : 'ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মা তো বিধবা, তার পক্ষে গিয়ে দেখে-শুনে সব ব্যবস্থা করে আসার বাধা নেই তো কিছু ?'

ইতু বললো : 'সধবা হলেও মা, বিধবা হলেও মা, সেখানে আবার বাধা কিসের ?'

অতএব ব্যবস্থাটা সেইমতই হলো।

টগরকে দেখে বিষ্ণুর মা মেনকা একেবারে গলে গেল। বললো : 'এ যে আমার ঘরের লক্ষ্মী।' বলে টগরকে কোলের কাছে টেনে এনে দু'হাতে সঙ্গে আনা দু'গাছা বালা পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলো সে। তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে একপাশে মুখ গুঁজে বসে রইল টগর। ততক্ষণে চাঁপার সঙ্গে কথা বলে ইতু আর নিতু মিলে পান আর মিষ্টি মুখের ছোটখাটো একটা আসর জমিয়ে নিলো। পাশাপাশি ফুটপাথে যারা বাস করছিল, খুসীতে তারা তখন মুখর।

পাল্কী যখন চাঁপা আর হারু গিয়ে বারাসাতে পৌঁছালো, বিষ্ণু তখন কোনোদিকে কোনো ত্রুটি রাখতে দিল দিল না। বিষ্ণুকে দেখে অপছন্দ হল না, যেমনটি ইতুর মুখে শুনেছিল, চোখে দেখে তেমনটিই মনে হলো হারুর। বিষ্ণুর হাতে একটি আংটি আর হাতঘড়ি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলো চাঁপা। তারপর অনাবশ্যক প্রশ্ন হলেও এক সময় জিজ্ঞেস করলো : 'কি রকম কি রোজগার পাতি করছো বল তো বাবা।'

ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে প্রণামীদের প্রণামটা সেরে নিয়েছে বিষ্ণু। কিন্তু রোজগারের প্রশ্নে হঠাৎ তাকে একবার থামতে হল। তার আর ইতুর রোজগারের পথটা যে ভিন্ন নয়, একথা সে কি করে মুখ ফুটে বলে ? একথা কি আদৌ বলবার ? একটুকাল থেমে সত্য গোপন করে বিষ্ণু বললো : 'মালপত্র কেনাবেচায় হাতে যা আসে, তাতে খরচ-খরচায় কোথাও আটকায় না।'

এবারে চাঁপাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মেনকা বললো : 'আমার বিষ্ণুর রোজগার খারাপ না। বাজারে দোকান দিয়ে বসতে চেয়েছিল, একা পেরে উঠছে না বলে দেয় নি। এবারে বৌমা এলে দেখা যাক কি দাঁড়ায়।'

শুনে খুসীর চিহ্ন ফুটে উঠলো চাঁপার মুখে। ততক্ষণে হারু একবার জায়গাটা প্রদক্ষিণ করে দেখে নিলো। যে সংসারে যে-জায়গায় মেয়েকে দেবে সে, সেটা ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার বৈ কি। বারাসতের মতো মফঃস্বল জায়গা হলেও কলকাতার

ফুটপাথের মতো গিজ্‌গিজে ভিড় নেই এখানে। ওটা মোটামুটি মন্দ লাগে না হারুর। দু'দণ্ড এখানে গাছ তলায় কাথা বিছিয়ে শুয়ে থাকলে শরীর শীতল হয়। যখন ইচ্ছে করবে, মেয়ের কাছে এসে এসে ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারবে সে। মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হলো হারু।

মেনকা নিজের হাতে রান্না করে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে তবে বিদায় দিল তাকে আর চাঁপাকে। বিয়ের দিনটাও সেই সঙ্গে পাকা করে নিলো। কার্তিক এখন প্রায় যায় যায়, সুতরাং অঘ্রাণেই শুভ কাজটা ভালোয় ভালোয় চুকে যেতে পারে। হারু আপত্তি করলো না। দিনটা ঠিক হলো বারোই অঘ্রাণ।

ফিরে এসে সেই মতই তৈরী হতে লাগলো সে। ইতু আর নিতুকে কাছে ডেকে বললো 'ওদের কি কি দিতে পারবি, কিরকম কি জোগাড় যন্তর করবি। দেখে শুনে তাড়াতাড়ি করে ফেল। দেখতে দেখতে সময় চলে যাবে। এতকাল ধরে পাশাপাশি যাদের সঙ্গে এখানে আছি, তাদের কাউকেই তো বড়ো একটা বাদ দেওয়া যাবে না, টগরের বিয়ে, সকলকে মিষ্টি মুখ না করালে চলবে কেন? কিন্তু এত কিছু কি তোরা পেরে উঠবি?'

ইতু বললো: 'এসব নিয়ে তুমি এত ভাবছো কেন? যা করবার, দেখো এর মধ্যেই সব করে ফেলবো।'

শুনে নিশ্চিন্ত হলো হারু।

দু'পক্ষের আশীর্বাদে ছেলে আর মেয়েকে যে রকম দেওয়া-থোওয়া হলো, তাতে দু'পক্ষই খুশী। ইতিমধ্যে বিষ্ণুর সঙ্গে ইতুর একদিন বালিগঞ্জ রেল স্টেশনে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো: 'কি, কাজের এরিয়া কি এবার থেকে ক্যানিং, বজবজ আর লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো?'

বিষ্ণু বললো: 'না, এ-জাতার কাজ এখন আর ভালো লাগছে না। এদিকে একটু দরকার পড়েছিল, তাই দেখা হয়ে ভালো হলো। বিয়ের ব্যাপারে তুই যেন কোনো খরচ খরচার মধ্যে যাসনে। সে আমার আদৌ ভালো লাগবে না। আমি মাকে বলে দিয়েছি।'

ইতু বললো: 'খরচা কিছু আছে বৈ কি। হিন্দু ঘরের মেয়ের বিয়েতে চৌদ্দ পুরুষের মুখে জল দিতেও যে চৌদ্দ সিকি খরচা। তা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ওসব যা করবার আমার বাবাই করবে।'

কিন্তু যা কিছু করার, তা ইতুকেই করতে হলো। সঙ্গে নিতু। কিছু না বলেও বাসরের জন্যে মোটামুটি এক প্রস্ত নতুন বিছানা চাই। সেই সঙ্গে দুটো করে অন্ততঃ নতুন থালা বাটি গ্লাস। কিছু শাড়ি ব্লাউজ আর অন্ততঃ একটা আতর দিয়েও তো একটা সুটকেশ সাজিয়ে দিতে হবে। চুড়ি, আল্‌তা, আয়না, চিরুণী, সিঁদুর, চুলের ফিতে—এই বা না হলে চলে কি করে? ফুটপাথে বাসা বলে কি মেয়েকে খালিহাতে পরের হাতে তুলে দেওয়া যায়? হাজার হোক বাপ মার প্রাণ। একটা তো মেয়ে মাত্র টগর, একেবারে এটুকু না করলে কোন্ প্রাণে হারু নিজের হাতে সম্প্রদান করবে মেয়েকে?'

বাপের মুখের ফর্দ শুনে মোটামুটি তা মুখস্ত করে নিল ইতু, তারপর ছোট ভাইকে তাড়া দিয়ে বললো: 'চলতো নিতু, কোন্‌টার কিরকম দাম, একবার খোঁজ নিয়ে আসি।'

অম্লান বেরিয়ে পড়লো নিতু দাদার সঙ্গে।

ঠিক হলো—বিয়েটা কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে করিয়ে আনা হবে। তাতে যেমন ঝামেলা নেই, তেমনি খরচাও নামমাত্র। তারপর ফিরে এসে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে উলু দিয়ে তবে বর আর কনের বাসর। তাতে আপত্তি করলো না চাঁপা, বললো: 'একটা চট কিম্বা চাদর টাঙিয়ে ওদের ব্যবস্থাটা আলাদা করে দিস তা হলেই হবে।

বিষ্ণুর সঙ্গে কথা ঠিক হয়ে আছে—মাকে নিয়ে সে নিজেই বিকেল বিকেল চলে আসবে, সে জন্যে ভাবতে হবে না। এটা মেনকারই ব্যবস্থা।

কিন্তু ক'দিন ধরে টগরের যে কি হলো, তা সে-ই জানে। কথা নেই, উচ্ছলতা নেই, কেমন চুপচাপ। এতদিন সে মাকে রান্নায় সাহায্য করেছে। কথায় খই ফুটিয়েছে, এখন যতক্ষণ পারে, একান্তে বসে নিজের হাতের আশীর্বাদী বালা দু'গাছি নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, আর গালে হাত দিয়ে ভাবে।

কয়েকদিন উপর্যুপরি লক্ষ্য করে এক সময় চাঁপা বললো: 'বলি কথা বলবি তো। দু'দিন বাদে সোয়ামীর ঘর করতে যাবি, এ কদিন আমার সঙ্গে না হয় একটু বসে বসে গল্পই করলি।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে চাঁপা বললো: 'আহা, কতদিন যেন কত গল্প করেছ, এখন একেবারে গল্পের চস নেমেছে। যাও, ভালো লাগেনা আমার অমন বসে বসে বক্ বক্ করতে।'

চাঁপা বললো: 'তা-ভালো লাগবে কেন, আমি যে পেটে ধরেছি। সাত জন্মের শত্তুর আমার তুই।' বলতে বলতে কোথায় একাদকে উঠে গেল সে।

এরপর দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

ইতু আর নিতুর উপর যা যা জোগাড় যন্ত্র ক'রে আনবার ভার ছিল, তাতে তাদের আটকালো না। এ জন্যে বেশ কয়েকদিন গোপনে তাদের নানা যায়গায় হানা দিতে হয়েছে। তারপর কাজ হাসিল করে নিরাপদে ফিরেছে। ফুটপাথের কাছাকাছি বাসিন্দাদের একবেলা মুখ ফেরাবার মতো ডাল কচুর আর বোঁদের ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে মিষ্টির দোকানের এক কারিগরের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে রেখেছে।

দেখে শুনে আশ্বস্ত হয়েছে হারু। মনে করেছে—ছেলেরা তার এতদিনে সত্যিই উপযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনুনের আগুন থেকে একটা বাড় ধরিয়ে নিয়ে টানতে টানতে এক সময় সে চাঁপাকে বললো: 'এবারে ভাবনা গেল। এখন গোছগাছ করে দেখে শুনে নিজের হাতে যা হয় করো।'

তাই করলো চাঁপা।

তারপর যথাদিনে ভালোয় ভালোয় বিয়েটা চুকে গেল।

দেখে পথযাত্রীরা অবাক। ফুটপাথের জীবনে এমন বিয়ে কোনো কালে কারুর চোখে পড়ে না। ফুটপাথের বসবাসকারীদের মধ্যেই কি পড়েছে? তাই আগ্ বাড়িয়ে দু'দিন তারা আনন্দের ফোয়ারা ছোটালো। তেমনি বারোসাতে বৌ ভাতের ঘটাটা

বিষ্ণুও মোটামুটি কম করেনি। ফুল সজ্জার তত্ত্ব নিয়ে গেল ইতু-আর নিতু। সঙ্গে জামাই বাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে গেল হারু ও চাঁপা। তাদের মনে খুশী আর ধরে না। বেহান মেনকা কাকে ছেড়ে কাকে আগ্‌লোবে, বুঝে উঠছিল না। ফিরে আসার সময় বেহানের সামনেই জামাইকে কাছে ডেকে হারু ও চাঁপা বলে এলো: "দ্বিরাগমনের যাবার সময় মাকে যেন একা ফেলে রেখে যেয়ো না, অবশ্যই সঙ্গে নিয়ো; দু'দিন আমাদের কাছে কাটিয়ে আসবে, এক সঙ্গেই তোমরা ফিরবে।'

এই ভাবে যাতায়াতে যাতায়াতে একে একে অনেকগুলো মাস কেটে গেল। তারপর সব সংসারে চিরকাল যা হয়, ধীরে ধীরে সেই আসা-যাওয়ায় একসময় ভাটা পড়লো।...

ইদানীং হারুর শরীর আদৌ ভালো যাচ্ছিল না। অনেক কালের পুরনো বায়ু রোগটা ইদানীং আবার দেখা দিয়েছিল। তাই বয়সে যতটা সে বুড়ো নয়, তার চাইতে বেশী বুড়ো দেখাচ্ছিল তাকে। অথচ শরীরের বাঁধুনীতে চাঁপা এখনও যেন সোমত্ত।

সেদিন ফুটপাথেরই এক প্রতিবেশিনী তাকে চুল বেঁধে দিতে দিতে হঠাৎ বলে বসলো: 'রোগা স্বামীকে দিয়ে তুমি সুখ পেলে না দিদি, তোমার শরীরের যা গড়ন, তাতে টগরের মতো এখনো তোমাকে টোপর পরিয়ে সাত পাক ঘোরানো যায়। কোনো বাবু-ভায়ার তাতে অপছন্দ হবে না।'

মুখ টিপে হেসে চাঁপা জিজ্ঞেস করলো: 'আছে নাকি তোর জানা তেমন বাবুভায়া?'

প্রতিবেশিনী সুলোচনী বললো: 'নেই আবার! আমাকেই পছন্দ, আর তোমাকে পেলে তো কথাই নেই।'

হঠাৎ ঘুরে বসে চাঁপা এবারে কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে বললো: 'মর, মর তুই সুলো। কেবল আমার টগরের বিয়ে গেল। এরপর আমার ইতুর আর নিতুর বউ আসবে। আর আমাকে বলছিস বাবুভায়াকে পতর দেখিয়ে বেড়াতে? ছিঃ, ছিঃ, ঘেন্না।'

—'ইস্, ঘেন্না না হাতী, আমরা তবে কবেই ঘেন্নায় মরে যেতাম।' বলতে বলতে কোথায় একদিকে উঠে চলে গেল সুলোচনী।

সেদিকে একবার তির্যক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মনে মনে কি যেন একটা মন্তব্য করলো চাঁপা, তারপর একটা মেটে কলসী নিয়ে সামনের টিউবওয়েলের দিকে এগিয়ে গেল জল আনতে।

ইতিমধ্যে কে যেন একদিন কোথা থেকে শুনে এসে খবর রটালো ফুটপাথ খালি করে দেবার নোটিশ পড়েছে কর্পোরেশন থেকে। অনেক দোকানপাট ইতিমধ্যেই পাত্তাড়ি গোটাতে শুরু করেছে। তাদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করবে কর্পোরেশন; কিন্তু ফুটপাথের বাসিন্দাদের নিয়ে তাদের কিছু করবার নেই।

হারুর মাথার দু'একটা পাকা চুল বেছে দিতে দিতে একসময় চাঁপা বললো: 'তাই যদি হয়, তবে আমাদের কি গতি হবে গো। কোথায় উঠে যাবো আমরা?'

হারু বললো: 'দোকান তুলে দিতে পারে, তার টাকো আছে, তাই বলে আমরা এই হাজার হাজার মানুষ উঠে যাবো, সে কি একটা কথা। কর্পোরেশনের লোক আসুক, তখন দেখা যাবে।'

একটুকাল কি ভেবে নিয়ে চাঁপা বললো: 'বারাসাতেও যদি পথের লোককে হটতে হয়, তবে টগর বিষ্ণু ওদের কি হবে? দোকান করতে যদি না দেয়, তবে বিষ্ণুই বা দোকান আগলে বসবে কোথায়?'

হারু এবারে অন্যপাশে ঘুরে বললো: 'তোমার যত বাজে চিন্তা, কলকাতার ফুটপাথ আর বারাসাতের রাস্তা কি এক হোল? ওখানে টগরদের গায়ে আঁচড় পড়বে না।'

কিন্তু আপাতত বারাসাত মিউনিসিপালিটি আঁচড় না কাটলেও হারু বুঝতে পারলো না—তার অলক্ষ্যে কী একটা দারুণ আঁচড়ে ক্ষত হ'য়ে টগরের সমস্তটা মন অকস্মাৎ বিষিয়ে গেল।

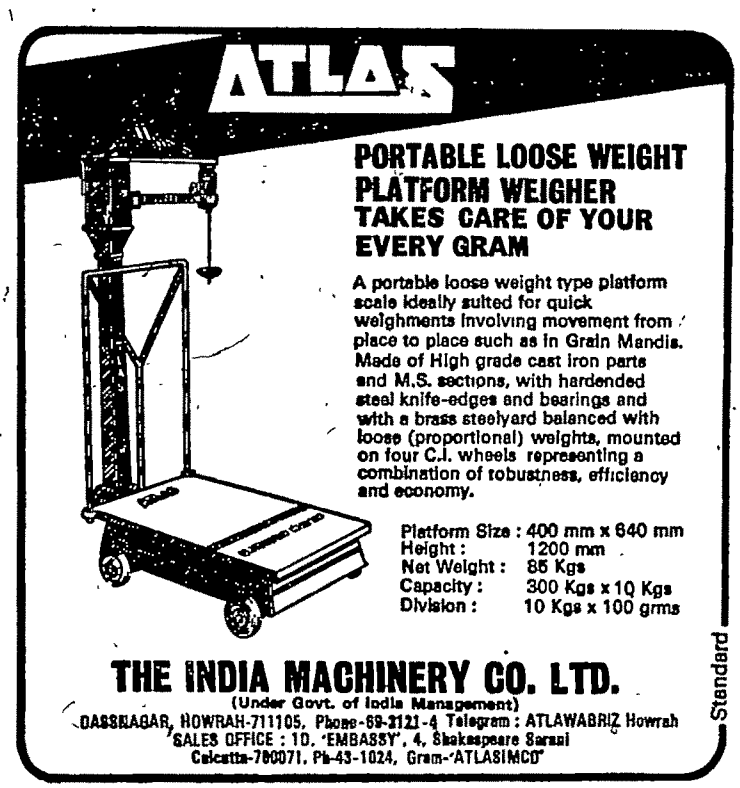

উস্কোখুস্কো চুলে আর ময়লা কাপড়ে কোনোভাবে ট্রেন ধরে একসময় ছুটতে ছুটতে এসে দাপিয়ে পড়লো সে মা আর বাবার কাছে, তারপর চোখের জলে ভেসে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো : 'তোমরা আমাকে এত ঘটা করে শেষ পর্যন্ত এক চোরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে ? পুলিশ এসে জিনিসপত্তর সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে তোমাদের জামাইকে ঘুম থেকে তুলে পেটাতে পেটাতে থানায় ধরে নিয়ে গেল। বসিরহাট লাইনে রেলের মালগাড়ী থেকে মাল লোপাটের সে নাকি পাণ্ডা। তাছাড়া পকেটমার, ছিনতাই—কোন্‌টায় নাই সে। তার দলের সবাই ধরা পড়েছে। শুনেছি দাদাদের সঙ্গে তোমাদের জামাই'র আগে থেকেই সাঙ্গাত ছিল। বেছে বেছে বড়দা তাই এই জামাই এনে দিয়েছিল তোমাদের। এর চাইতে আমার কেন গলায় দড়ি জুটলো না ?'

চাঁপা বললো : 'ও, এই জন্যেই কাল রাত্তির থেকে ইতু আর নিতু তবে এখনো ফেরেনি। এই করেই ওরা তবে এত জিনিস আনে, এত খরচা চালায়, এইটাই তবে ওদের রোজগার। আগেও তবে এই করেই ইতু থানায় ধরা পড়েছিল !'

শুনতে শুনতে হারুর মাথায় এতক্ষণ রক্ত চেপে গিয়েছিল, হঠাৎ সে একবার চিৎকার ক'রে উঠলো : 'আমার তবে যেমন ছেলে, তেমনি জামাই, অথচ বাপ হ'য়ে এতকাল আমি তা একটুও টের পাইনি। গুছোও, সব গুছিয়ে ফেল চাঁপা, এক্ষুণি আমরা এখান থেকে চলে যাবো, নইলে কর্পোরেশনের বাবুদের বদলে পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। সবাই মিলে শেষে জেলে বসে পচবো।'

চাপার চোখে তখন যেমন আতঙ্ক, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল। জিজ্ঞেস করলো : 'কোথায় যাবে, আমাদের কি মরার যায়গা আছে কোথাও ?'

হারু ততক্ষণে উঠে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে, বললো : 'দু'চোখ যেদিকে যায়, সেদিকেই চলে যাবো। কলকাতার এই ফুটপাথে আর নয়।' বলে নিজের হাতেই যেটুকু যা আছে, বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেল সে।

টগরের কান্না ততক্ষণে অনেকটা থেমে এসেছিল, কিন্তু বুক থেকে পাষাণ নামছিল না। মায়ের মুখের কাছে মুখ এনে একসময় সে অস্ফুটকণ্ঠে বললো : 'তোমাদের নাতি হলে তোমাদের জামাই যে দেখতে পাবে না মা। তার বাপের পদবী থাকবে না, পরিচয় থাকবে না ?'

বিপদে দুঃখে খান খান হয়েও অকস্মাৎ কেমন একটা আবেগে দু'চোখ পাকিয়ে চাঁপা হঠাৎ বলে উঠলো : 'তুই মা হবি, তুই তবে পোয়াতি ?'

এবারে দু'হাতে মুখ ঢেকে টগর ঝুপ করে বসে পড়লো।

—*—

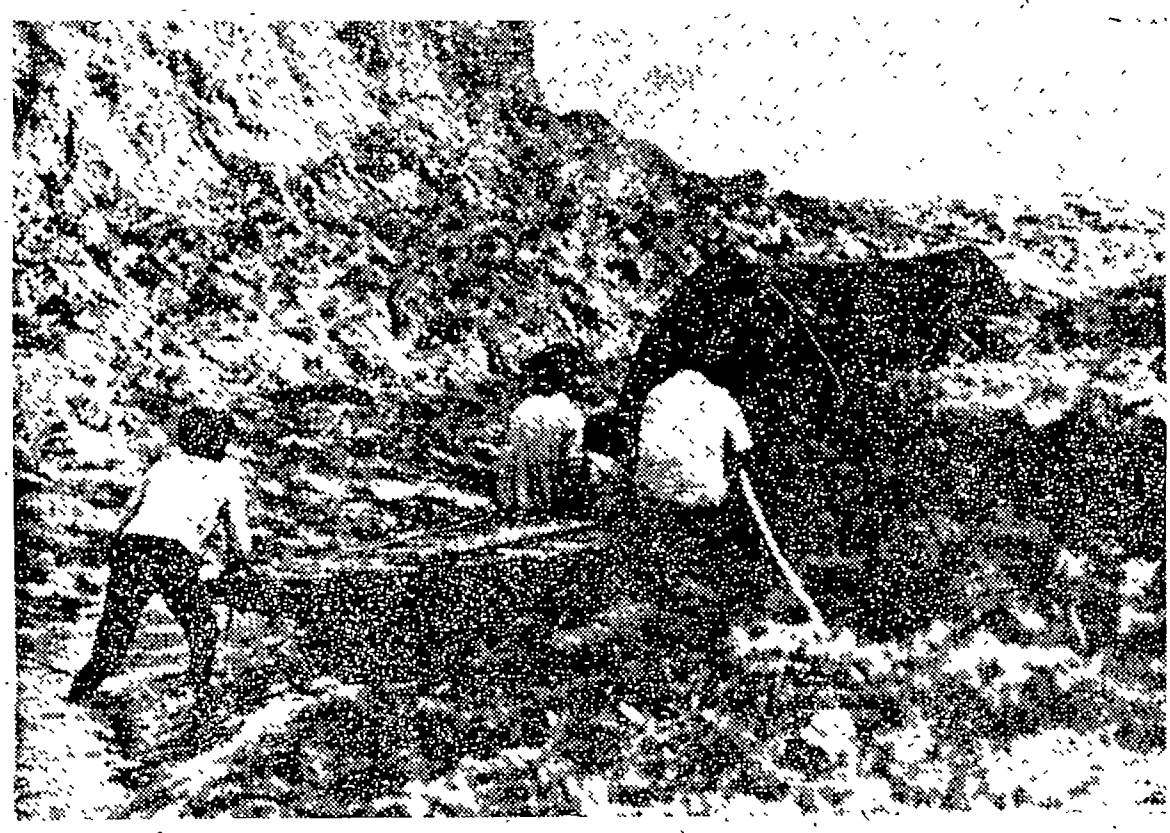

হারিয়ে যাওয়া ক্ষণিকের তরে……

চিত্র : পল্লব দত্ত

এম. ডব্লু. বণ্ড পাঠক

মহাশ্বেতা দেবী

"……at present there is no statutory minimum wage for agricultural labourers in West Bengal."—

(Minimum wage for agricultural labourers : Maitreya Ghatak : The Economic Times, 20. 6. 77).

॥ এক ॥

স্বপ্নে লখিন্দ সংগ্রামের শেষে এম ডব্লু পেয়েছিল। স্বপ্নে গৌর নস্কর ওকে এবং সকল খেতমজুরকে এম. ডব্লু দিচ্ছিল। স্বপ্ন দেখতে ওকে ঘুমোতে হয় না। লখিন্দ ভিতু ও ডরপোক মানুষ। বাস্তবে ও যা যা পায় না, যে সব পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না—চলতে ফিরতে স্বপ্ন দেখে ও সে সব পেয়ে যায়। ও বেগতিক পরিস্থিতিতে জেনারেল রমেল হয়ে যায়। স্বপ্নে। ওয়ালটার মিটির গল্প না পড়ে এবং ড্যানি কে র ছবি না দেখেও ওর পলায়নী আচরণ ওয়ালটার মিটির মত। এতেই বোঝা যায় মানুষ দেশে দেশে এক।

স্বপ্নে ও একটা আস্ত ব্যাপার পেয়েছে। চালে ছোন দিয়েছে। গৌর নস্করকে নাকে খত দিয়েছে। সাধারণতঃ ও সিকি পেটা খায়। ফলে অনাহারী শরীরে "স্বপ্ন দর্শন জীবন বিষয়ক" ঘটলে ও ইউকোরিয়া প্রাপ্ত

হয় ও নিজের অজানতে চিকচিকে হাসে।

এখন হাসতে গিয়ে ও ছিচরণের কনুয়ের গুঁতো খেল ও চমকে উঠে শুনল বসাই টুরা বলছে, না লিজ্যে কাটব, না দাওয়াল লিসতে দিব।

ছিচরণ হাত তুলল। বলল। উ লামটো মনে রাখতে লারছু হে বসাই। ইনজিরি লাম দিছু। কি যেন বললা তুমি? উ ইনজিরি লাম বুঝাও হে। লইলে লড়াই হয়।

কি লাম?

উ—ই এম. ডবলু. তুমি যা লিখা পড়া আছু, মিশনে গিছিলা।

উ লাম দিছে সরকার। মিনিমাম ওয়েজ, বাঁচার মত মজুরী দিবে এম. ডবলু।

বুঝছু হে। এখন বিতং করা বল।

তুমার মাথায় কিছু রয় না হে। কতবার বলা করলাম, তা ভুলে বসা আছু।

আগে লখিন্দর বিচার কর।

লখিন্দ চমকে উঠল। বলল, কেনী? তুমার বলদ আমি পনুডে দিই নাই।

বসাই টুরা বলল, তুমারে পনুডে দিব। খেতমজুর এম. ডবলু. পায় নাই আগে। জলপাইগুড়ি দার্জিলিং শিলিগুড়ি পেয়াছে।

আর কাও পায় নাই।

ছিচরণ বলল, তুমি যি বললা সি লকসালবাড়ি দার্জিলিঙে আছু?

আছু ত।

যদি সেথা মজুরে মজুরী পেয়াছে তবে সেথা লকসালবাড়ি হল কেনী?

সি আন কথা। এখন লখিন্দরে শুধাই। আটষট সালে মোদের জেলায় এম. ডবলু হল।

লখিন্দ বলল, খু—ব হয়াছিল। তখন আমি লিত্য রেডিও শুনাচ্ছি। বাপো রে, রেডিওতে তখন কত এম. ডবলু. হয়াছে।

হাঁ হাঁ রেডিওতে হয়াছে, কাগজে হয়াছে, সরকারী রেকর্ডে মরদ মিঞা টোকা কত পেয়াছে? তিন টাকা চুয়ান্ন পসা, তিন টাকা সাতাশ পসা, দু টাকা দু পসা।

রেকর্ডে মোরা রাজা হয়াছি।

আঁ? অত টাকা?

হাতে কত পেয়াছ?

ছ আনা। বিটিরা তাও পায় নাই।

তবে শালো বিড্ডি বাবুরে গিয়া বলা এলা কেনী যে সবে রেকর্ডের মজুরী পাই? পেয়াছ কুন—অ দিন? দেখাছ তিন টাকা চুয়ান্ন পসা?

লাঃ। লস্কর দিয়াছে ছ—আ—না কুথা হতে দেখব? কু—ন্—অ দিন দেখি লাই।

তবে শালো মিছা কবুল খেলা কেনী?

লখিন্দ এবার হাসল। বলল, লস্কর মোরে বলল থি?

বলল, বলা আয় লখিন্দ, বলা এলা তোরে ধান লয়, চাল দিব। পাঁচ রেক!

তাথেই বলা এলা?

বসাই টুরা খুবই বিমর্ষ হয়ে লখিন্দর দিকে চাইল ও এখন সে ফাদার সামুয়েলের ফাস্‌চেশন বুঝল। ফাদার বসাইদের আত্মাকে হিদেনিজমের অন্ধকার থেকে তুলতেন।

বসাইরা তাঁর কথা মন দিয়ে শুনত। কিন্তু করম, সোহরাই ধরম পূজা বা কালী পুজোয় আবার গির্জা থেকে কাট মারত। তারপর বড়দিনে আবার গির্জে যেত ও বলত। আবার মোরা এসেছি হে, টাকাটো কথলটো—অমুদটো দিঞে দাও।

ফাদার স্যামুয়েল হতাশ চোখে ওদের চেয়ে থাকতেন।

বসাই হতাশ চোখে লখিন্দর দিকে চাইল। বলল, লখিন্দ।

খেতমজুরের মরণ খেতমজুরের হাঁথে। তুমি যা বলা এলা, তাথে মোদের মরণ। পাঁচ রেক চালে লস্কর মুতা দেয়া দিবে তিন টাকা চুয়ান্ন, খেতমজুর মোরা দুই শৎ, তাথে দিন সাতশো টাকা যায়। তা না দিয়া দিল ছ-আনা। তাথে দিন চুয়াত্তর টাকা গেল। তা ছয় শৎ ছাব্বিশ টাকা দিন বাঁচাল, তাথে ক রেক চাল হয় বুঝ?

লাঃ। হিসাব কি জানি?

তবে?

আর হাঁ। বেগুন দিয়াচ্ছিল, ডিংলা, আলু।

তুমারে বুঝাবে কে?

কেনী? তুমি? তুমি লীডার আছু।

বসাই বলল, দাঁড়াও হে, টু'নি আসি।

বসাই জল ফেরাতে গেল। সোনাল ও গয়েশ্বরী গ্রামের সব খেতমজুরই এসেছে, লখিন্দ দেখল। দুটি গ্রামই গয়েশ্বরী নদীর তীরে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ল্যাণ্ড সিলিংকে কলা দেখিয়ে গৌর লস্কর একাই ঈশ্বর, বহু দেবতা হয়েছে। স্বনামে ও বহু নামে স গয়েশ্বরী নদী এ থানা গৌর ভোগ করে। তার বাড়ি দোতলা ও পাকা, তার লরি পাকা সড়ক ধরে চাল নিয়ে শহরে চলে যায়। তার গাড়াতে দোল দুর্গোৎসব রটন্তী কালীপুজো ও পনেরই আগষ্ট হয়। ওর বৈঠকখানা বাড়ি হাকিম দারোগা মন্ত্রী এম এল এ ওঠার জায়গা। ওর বসার ঘরে দুজন হাকিম, তিনজন মন্ত্রী, সিদ্ধেশ্বর বাবা, দেহশ্রী শান্তনু মিত্র ও একজন এম এল এ'র কুল্যে আটখানা ছবি টাঙানো আছে। প্রত্যেকের সঙ্গেই গৌর লস্করের ছাব আছে। গৌরের বাড়াতে শোয়ার ঘরে কাঁচা সিমেন্টের ফলকে সিদ্ধেশ্বর বাবার পায়ের ছাপ ও দুটি বেআইনী বন্দুক দেয়ালে ঝোলে।

ওর ধানের গোলা কুড়িটি, মুড়াইলের ধানকলও ওর। ওর সসাগরা পৃথিবী পাহারা দিতে ছ'জন বিহারী পাইক আছে। এত সত্ত্বেও গৌরের অন্তরের অন্তঃস্থল ফাঁকা। ছেলে নেই ওর। তিন তিন বউয়ের গর্ভে পাঁচ মেয়ে। ডোম-কুমী চামার সাঁওতাল—ওর খেতে যারা মজুর খাটে, তাদের ঘরে ঘরে পুত্র সন্তানের প্রাবল্য দেখে ওর মনে কি বছর বিজাতীয় রাগ জন্মায়। যে ঘরে হা-অন্ন জো-অন্ন সে ঘরে জন্মায় কেন ছেলেরা?

দিনকাল খুবই মন্দ বলতে হবে। এখন আর স্বপ্নে শিবও আসেন না। গৌরের বাপ বৎসরাধিক তীর্থ ভ্রমণকালে গৌরের মায়ের স্বপ্নে শিব আসেন। ফলে গৌরের জন্ম। জন্মটি ঘিরে অলৌকিক আরা বিরাজমান। এই রহস্যময় অলৌকিকত্ব বাদ দিলে গৌরই পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ গৌর যা, পশ্চিমবঙ্গের সকল জোতদারই তা। অবশ্য উৎসাহী রিসার্চ স্কলাররা এদিকে

এখনও মন রিসার্চ ফেলোশিপ অধ্যবসায় নিয়োগ করেন নি বলেই জানা যায় নি পশ্চিমবঙ্গের জোতদাররা যে সর্ব ক্ষমতাসীন—আইন আদালত পুলিশ টাঁকে রাখেন—

তার পেছনে আর্য ও লোকায়ত দেবদেবীদের অবদান ক'দ্দুর।

শিবও অসুরটসুরকে বরদান করে বিপদে পড়তেন। গৌর বর্তমানে বসাই টুরাকে নিয়ে যায়েল হচ্ছে। আজ বসাই টুরা মিটিং করছে জেনে গৌর কাল রাতে লখিন্দর ঘরে যায়। বলে, মিটিন্ আছু, বসাই কি বলো সব, বলা যাবি।

সব বলা আসব।

আমার জানা চাই।

বলা আসব। মোকে একটা টচ বাতি দিবে।

দিব।

ছাইকেল।

এখন লয়।

কেনী?

সবে বলবে তু চুকলিখোর আছু তাথে আমি ছাইকেল দিয়া করলাম। তোরে জিগালে বা তুই বলবি—

কেনী? বলব, তুমরা মিটিনে যা বল, স—ব যেয়ে লস্করকে বলছু, তাথে উ টচবাতি দিস? সাইকেল দিল?

ধুর যা।

ওকে বকেঝকে গৌর চলে যায়। তখনি লখিন্দর বউ বলে ফের চুকলি খাও?

না না, তা খাই?

লখিন্দের এখন সব কথা মনে পড়ল। কোন খাড়া করল ও। বসাই টুরাকে ওর বড় ভাল লাগে। বসাই করুককে ভয় খায় না। লখিন্দ ভয় খায় বিশ্ব-সংসারকে। ওর বউ বলে দিয়েছে, দাদা আছু, নিতাই আছু, একো কথা লস্করের কানে দিছু কি আমি ঘরে আগুন দিয়ে গয়েশ্বরী চলা যাব, হাঁ। আমি উদ্ধবের মিঞা।

ছিচরণ, নিতাই, ওরা লখিন্দর শালা। লখিন্দ বলেছে, লস্কর বলল থি?

ওরে বলবা না কিছু।

আছা। তু বাপু ঘরে আগুন দিস না।

লস্কর তুমার জাত না পাঁত সমাজ?

কেউ লয়।

উর ডরে মর কেনী?

ব্বাপো রে, উর আজ্ঞো বাস।

লখিন্দের দৃঢ় ধারণা, ভারত স্বাধীন হলেও সোশাল গয়েশ্বরী গৌর লস্করের অধীনে। স্বাধীনতার ব্যাপারেও গৌরের হাত আছে বলে ওর ধারণা। নইলে গৌর পনেরই আগষ্ট করে কি করে? লখিন্দ এ চাকলায় সব চেয়ে বোকা লোক?

ছিচরণ ওর গায়ে গুঁতো দিল, কি ভাবছু?

লাঃ। ভাবি নাই।

তবে শুন।

বসাই বলল, যাথে সভে এম, ডবলু, পায় তা দেখতে নিসপেক্টর বসাল সরকার। মোরা কথ খেতমজুর আছু তা জানু তুমরা?

তুই শৎ।—নিতাই বলল।

তুই শৎ হেথা। সকল জিলা জুড়া সাতত্রিশ লাখ। বুঝলু হে। সাতত্রিশ লাখ।

লখিন্দ হেসে ফেলল।

হাসছু কেনী? আঁ?

লাঃ। উ যে বললা না সা-ত-ত্রি-শ লাখ? অথ মনিষ কুথা হতে আঁলু? আমি চোখে দেখি এক গাঁ হতে আন গাঁ তিন মাঠের ফারাক। গাঁ গেরামে বড় বেশি হাজার মনিষ হতে পারে। অথ মনিষ লাই হে বসাই। উ সব রেডিওর কথা। আমি জানছু।

বসাই বলল, লখিন্দ। এখন লকশা অং তামোশার সময় লয় হে। শিয়রে শমত। যা বলি শুন। তুমরা জান আমি সদর গিয়াছি, ইউনিয়ান আপিস গিয়াছি। আপিস মোরে সকল রেকড দিয়াছে। বলাছে ইউনিয়ন কর তুমরা। খেতমজুর ইউনিয়ন না হলে সরকার জোতদারে গাঠছড়া খুলবে না।

ছিচরণ খেপে বলল, কতদিন উপাসী, লস্কর ধান বাড়ি দেয় না। ই চামচা লগড় করে। ফের কথা কবে লখিন্দ তো বুনের কথা বিসোঙরে তুমার বদন বেকল করা দিব। আমি উদ্ধবের বেটা, হুঁ! আর কথা লয়।

ও-পাশ থেকে কানাইবাঁশি বলল, লখিন্দ চুপ যাও হে। ঘরে উদ্ধবের বিটি, বারে উদ্ধবের বেটা।

আমি তেনার জামাই গো—বলে লখিন্দ আবার রগড় করতে যাচ্ছিল। চুপ করল। শ্বশুরকে সে চোখেও দেখেনি। কিন্তু ধানকাটা নিয়ে গৌরের বাপের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সে ধান ক্ষেতে গুলি খেয়ে পড়ে যায়, হাসপাতালে মরে। সে না কি প্রচণ্ড বদমেজাজী ছিল।

বসাই বলল, যা বলছু শুন মন দিয়া। এস ডব্লু, করল সরকার, তাথে ষোলটা জেলায় ষোলটা নিসপেক্টর বসাল, তাথে কাজ হল ঘোড়ার ডিম। আটষট্টি সালের পর চুয়াত্তর সালে ফের এম, এল্, বাড়িয়ে দিছে। মিঞা মরদ সমান সমান—পাঁচ টাকা ষাট পসা রোজ। চোদ্দ সালের উপর বয়সী টোকা চিরা চার টাকা রোজ। দিন ফুরানের খেতমজুররে জমির মালিক মুড়ি ভাত দিলে পাঁচসিকা কাটবে। বাকি পসা দিবে। টাকায় লাও, ধানে লাও, মসুরিতে লাও। পাঁচ টাকা ষাট পসার দাম পুরায় দিবে। না দিলে তা বে-আইন। মরদ মিঞা সাড়ে আট ঘণ্টা মজুরী দিবে, টোকা চিরা দিবে ছ ঘণ্টা। আধা ঘণ্টা জলখাই ছুটি। বুঝছ সবে?

সোমরা টুডু বলল, কবে হতে?

চুয়াত্তর সাল হতে।

এখন ছিয়াত্তর সাল।

সোমরা বৃদ্ধ, গয়েশ্বরী গ্রামের সাঁওতাল খেত মজুরদের প্রধান। ওর অবস্থা অনেকের চেয়ে ভাল, কেন না ও সাপে কাটার চিকিৎসা জানে। গাঁয়ে বাসবসত সাপের সঙ্গে। ফলে সোমরার চাহিদা গ্রীষ্ম বর্ষায় খুব।

সোমরা হতাশ বিস্ময়ে মাথা নাড়ল ও সাদা ভুরু তুলে বলল, আট ষটের হিসাব পাই নাই। চুয়াত্তরের হিসাব পাই নাই। ছিয়াত্তর শেষ হয়। আজও দশানা—আটানা দিয়া করে লস্কর।

বসাই বলল, লস্করের বেত্তান্ত

এখানেই শেষ লয় হে। তার বেত্তান্ত আরো আছে।

লখিন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল। সে নিতাইকে ঠেলা দিয়ে বলল, উঃ লস্করের বুদ্ধি কথ দেখছু রে? কথ টাকা হাম্ দিয়াছে বুঝে দেখ্ ও নিতাই রে! হিসাব ভাবলে মাথা ঝিমায়, ক—থ টাকা!

বসাই কপাল কুঁচকে, মনে করে বলল, আপিস বলা দিল যথ কথা, শুনা সদরে মাথা ঘুরা যেলু আমার। ই পহেলা দফা এম, ডব্লু কৃষি সরম দফতরে রেকড হয়া গেস লুটিস চলা গেল এম, ডব্লু এথ। দফতরে গিছে যখন, তখন বেবস্থা হবার পথ হলু। তাথে পঁচাত্তরের আষাঢ়ে এম ডব্লু, সাথে মাগগী ভাতা জুড়ে লেবর ডিপার্ট জানাল মিঞ্জার রেট ছ টাকা তেষট পয়সা।

হায় গ। কিছু জানি নাই মোরা— থি জানবার সি জানথ। কিন্তু দেয় নাই—

লা—আ, দেয় নাই। এখন শুন আরো। লস্করের বেত্তান্ত আরো শুন। ছিয়াত্তর সালের চৈতে লেবর ডিপার্ট লুটিসজারী করলু—মরদ মিঞ্জা মজুরী পাঁচ টাকা ষাট পসা। মাগগী ভাতা আড়াই টাকা।

তাথে কত হলু?

আট টাকা, দশ পসা।

ব্বাপো'রে।

টোকা চিরা মজুরী চার টাকা, ভাতা এক টাকা বিরাশি পসা, তাথে পাঁচ টাকা বিরাশি পসা।

কিছু দেয় নাঁ হে বসাই।

তুমরা যতদিন দশানায় মজুরী দিবা, লস্করের জুতার ধুলা চাটবা। ই ওর গাই ছাগল পনতে দিবা, ভাত না পেলা ভাত দেখলে ছুটবা তথদিন উ কিছু দিবে না। আরো শুন।

বল, হে। বলাছ ভাল' যা বলাছ মোরা মাটিখাওয়া কাম করি তাথে বলাছ। এখন বল।

মাস হিসাবে হয় আমাদের এক শত পঁয়তা।লিশ টাকা সত্তর পসা। টোকা চিরার সাতাত্তর টাকা সাঁতাশ পসা। লুটিসে আরো কথা। জমির মালিক খাতায় রেকড রাখবে। সি রেকডে লিখা থাকবে কত দিছু, কত ফাইন হছু, ওবরটাইন কত দিছু।

আরো বল হে বসাই।

ব—সা—ই।

সোমরা টুডু হাত তুলল। ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, খেতমজুরের হকের তরে কমুনিস বাবুরা লড়াছে। দেখাছি। সরকার তাদেরে মদত দেয় নাই। পুলুস তাদের ধরা করাছে। মোদের তুমি অ্যানেক গাল দিলা হে। লোয়ে আগুন রষ বয়সের আগুনে। এমন গল ছিচরণের বাপও দিয়াছো সে—

গুলিতে জাহান দিয়াছে।

হ্যাঁ। জা—হান্ দিয়াছে। খেত মজুরের লড়াই আমি যা দেখাছি তা বলি।

বল হে তুমি।

তোমাৎ আমাৎ পুরনো বিবাদ লাই বসাই। তুমার ডাকে যখন এসাছি, তখন পুরানা বিবাদ বিসোঙর হয়া এসাছি। আমি দেখাছি কি, তা শুন। খেতমজুর কাম পায় বৎসরে দু'বার। আন সময়ে লস্কর তাদিগে ধান বাড়ি, টাকা করজ দেয়।

লস্করই মোদের মাহাজন। যখন চাষ লাই, সে মাহাজন হয়া মোদের খায় একমুখে। যখন চাষ আছে তখন আর মুখে খায়।

দুই মুখা সাঁপ।

হাঁ। ই সাঁপের হাঁ বড়। চাষ কালে মজুরী দিবার কথায় হিসাব দেখায়। এথ দিছু এথ লিছু, এথ পাবু। হাথে ধরায়ে দেয় কান কড়া।

তুমরা সেনা লাও।

না লিলে খাব কি? না লিয়ে দেখাছি—হেথা কেন, দাওয়ালী কাজে বীরভূম বর্ধমান মুর্শিদাবাদ ঘুরাছি, দেখাছি—তখন মোদের খেদায়ে জোৎদার বাহারের দাওয়াল লিস্যে। আমি লিজে সি কাজ করাছি।

থাক সি কথা।

কেনী? তুমিও হিলা। মাওড়া টুকা, সঙ্গে ফিরতা। মনে লাই বসাই? বীরভূমে গোলবদন সিংয়ের আমন কাটতে মোদের লিয়ে গেলু? তার খেতমজুররা মোদের কাছে আলু? মোরা বলা দিলু গোলবদনরে। খেত হতে পুলুস হঠাও, মোরা আর উরা ধান কাটি? ধান কাটলম। মজুরী বেটে লিলম। মনে লাই? পুলুস আলু? মোদের মারা করল, উদের? মনে লাই?

আছু। মোর পিঠে চিন্ আছু।

আমি দেখি, সরকার মালিকরে মদত দেয়। ইবার কেনী সরকার খেতমজুরের হকে মদত দেয়? সরকারী লুটিস—ইউনিয়ন আপিস বসছে—ভাল কথা। ইউনিয়ন ত আমা হতে লড়বড়া হুবলা। সরকারী লুটিসে কাম হয় নাই তা থ জানা যেছে। ইউনিয়নের ভরসা লাই। ই জিলায় ইউনিয়ান বলথে সদরে তিনটা পরকলা চোখা বাবু। তারা সদর কলকাতা মুয়ে বুলে। লুটিসের কাম লস্করে দিয়ে কে করাবে? অাঁ? সি "লা" করলে মোরা যাব কুথা?

বসাই অস্বস্তি বোধ করল। তারপর অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে বলল। ই আমারও কথা বেটে। তা, সরকার যা বেবস্থা করাছে, বলি আগে?

আমি আর টুনি বলি?

বল।

পাগল আমি লই হে। আমি জানু বসাই মোদের লড়াইয়ে লামাবে। তুমাদের কথা জানি না। আমি লামা করব। কিন্তুক কুনদিক হথে মার আসে তা জেনে আগাব। ছিচরণ, দোষ ভেব্যে না, তুমার বাপ তা ভাবত না। ভেবাচিন্তা কাম সি করেনাই। বসাইরে ভাবতে হছু। দিন বড় মন্দ হে! লস্করে-পুলুসে এখন মাগ-ভাতার। লইলে মুড়াইলের মাস্টরের ছেলা মরল লস্করের লরির লিচে। লালিশ করথে যেথে পুলুস মাস্টররে দিল মিসা করা? অাঁ? সতীশ মণ্ডলও মিসা। মিসা কি তা জানি নাই। ই দেখলু। লস্করের সাথে যার লাগে সি মিসা হয়? বসাই তুমি জানছু আমি কি বলছু?

হাঁ সোমরা টুডু জানছু।

সোনালের গোবিন্দ বাউরি বলল, জেহেল মিসা হথে হলে আমি লাই।

লখিন্দ ফট করে বলল, মিসা হলে কি হয়?

গোবিন্দ, বলল, পুলুস শাঁখবাজারে

লয়ে যায়, জামাই আদরে রাখে। তু যাবু লখিন্দ?

মোর বউয়ের লাইলং লাই।

কি বললু?

লস্কর বলাছে, সতীশের বউ লাইলং পরা, সাইকেল রিকশা উঠা, সদর জেহেলে সতীশরে যেয়ে লেংচা খাওয়ায়। আমি লেংচা খাছু। তিনটা।

বসাই বলল, চুপ যাও লখিন্দ।

যেছু।

শুন।

শুনছু।

সরকার বেবস্থা করাছে এম, ডবলু, না দিলে মোরা আদালতে যেতে পারবু।

এ কথায় জমায়েতে বিদ্রূপের হাসির হর্রা উঠল। গোবিন্দ বাউরি ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, বসাই, ই তুমি কি বললা?

কোর্ট কাছারি? লস্করের নামে কোর্ট কাছারি করা আসে গ্রামে বাস করবু? তা হয়? হয়াছে?

বসাই বলল, আরো বেবস্থা। মজুর কোর্ট কাছারি লা করলু। নিসপেকটর এখন অ্যানেক। তিন শৎ পঁয়ত্রিশ ব্লকে দুই শৎ পঁয়তাল্লিশ নিসপেক্টর দিছু। নিসপেক্টর মোদের দাবি-দাওয়া লয়ে লড়া করবু।

নিসপেক্টর কুথা?

এতক্ষণে বসাই হাসল। বলল, মুড়াইলের বাংলায় মোদের কপাল, ভাল নিসপেক্টর এসেছে। ইউনিয়ান আপিস বলা দিলু লিয়ং নাই, তভেও য্যাত নিসপেক্টর সব লিখাছে জোতদার ঘর হথে। মোদের ব্লকে যি নিসপেক্টর সি জাতে তপসিল, ছেলা টেঁটা, লস্কর পায়ের লড়া খসায়ে ফেলছু, তভে তার বাড়ি থাকে নাই। লস্কর মাছ-ডিংলা পাঠাছু, তা লায় নাই।

টাকা লিছে, ডিংলা লিছে না। সি পুলুস নিসপেক্টর মনে নাই? মদ লিল না, চাল মুরগি লিল না, মোরা ভাবলু ধর্মরাজ এসাছে—কিন্তুক রাতেভিতে টাকা লিল। মোদেরকে শাল দিয়া চলা গেল।

লাঃ। ই শুনাচ্ছি ভাল।

এখন কি করা?

আমি বলি হে। তুমারদের সি কথা মনে লিলে তুমরাও বলবে।

বল।

ই—ধান—মোরা—কাটব।

মোরা কাটব।

বাহারের দাওয়াল ঘুমতে দিব না।

ঘুমতে দিব না।

ছিয়াত্তরের মজুরি দিথে হবে।

দিতে হবে।

যদি মজুরি কাটে, তভে?

তভে?

মুখের হিসাব মানব না।

মানব না।

রেজস্টারি দেখাত্ হবে।

দেখাত্ হবে।

এম ডবলু মোদের জা—হান।

জা—হান।

দিবে তভে কাটব ধা—হান।

ধা—হান।

আর কি? হয়া গেল? সোমরা ঠিক বলাছে, ইউনিয়ান লড়বড়া। তবও ইউনিয়ান মদত দিবে। আমরা ঐ সকল কথা নিসপেক্টররে জানাবু, ইউনিয়ারেও। সকল জানায়ে সিধা পথে লস্করের কাছে যাবু।

ছিচরণ বলল, বসাই, সকল কথা লিখা করো লিলে দু'ঠাঁয়ে দু'কাগজ দিতু?

লাঃ। মোর এলেম লাই হে, লিখাপড়াইয়ের কথায় লাজ পাই। লিখাপড়াই কুন মং। তাথে মিটিনের রিপোর্ট লিখা চলে না।

সোমরা বলল, তুমি পড়লা না বসাই। তুমার উপর মোদের ভস্সা ছিল কত। সাঁওতালে শিক্ষিৎ ক' জনা? তুমি পড়লা না।

উ কথা ছাড়। মোর চুল সাদা হয়া গেল। এখন উ কথায় লাভ? নিসপেকটরের কাছকে যেছু আমি। মোর সাথে গোবিন্দ, ছিচরণ আর লখিন্দ চল।

লাঃ, নিসপেকটর বন্দুক ফুটায়।

ই পুলুস লয়, এম ডবলু নিসপেকটর।

লাঃ, ডর খাই।

যেতে তোমাক্ হবে হে লখিন্দ। লয় তো, তোমাক জানু আমি, লস্কররে রিপোর্ট করবা তুমি।

লাঃ, বউ মানা করাছে। সি উদ্ধবের বিটি, বকাছে ঘরে আগুন দিয়া গয়েশ্বরী চলা যাবে।

তবে ঘর যাও, হাঃ।

তুমাক্ একটো কথা বলথাম।

বল।

লাঃ, গোপনে।

বসাই ওর কাছে এল। দু'জনে জমায়েত থেকে দূরে সরে গেল। লখিন্দ বলল, উ যে বললা দাওয়াল ঘুসতে দিব না?

বললম। তাথে কি?

আমি বুকাটা, দিমাক লাই মোক। তাথে লস্কর মোর সাক্ষাৎ সকল কথা বল্যে।

কি বলেছে?

তুমি এবার লড়াই করবা, এম ডবলু লিবা, স—ভ উ জানে। তাথে উ পাইক দিয়া দাওয়াল কুথা সি খোঁজ লিছে। দাঁড়াও, কুথাকার দাওয়াল আসতেছে, তা সোঙর করি। হু—ই পছিম হথে, পূর্ণিয়া হথে দাওয়াল আস্যে এখুন—সিধা লকসালীতে হুলুম জুলুম খুব। তাথে সভে পলায়। সি দাওয়ালরা পেট ভাতা আর সিকি মজুরিতে কাম কর্যে।

বসাই চোখ কুঁচকোল। বলল, ভাল বলছু।

তারপর ও কি ভেবে বলল, লখিন্দ। সমঝায় তুমি মোর ঘর আস। কথা আছু।

লস্কর শুধাবে যখন? মিটিনের কথা।

বলবা। বসাইরা জানেনা কিছু। নিসপেকটরের কাছে যেছু সবে।

সি যা কবে তা হবে।

নিসপেকটর লস্করের সাথ সামিল হয় য্যামন?

হলে হভে। এখন সামন্ত···পরে কব। নিসপেকটরের কাছে যেছু আমি।

॥ দুই ॥

মুড়াইলের ডাকবাংলোর খড়ের চাল দেওয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে এম. ডবলু. ইন্‌স্‌পেক্টর সুবোধ রুইদাস সংখ্যালঘু এম. ডবলু. আইদের ত্রাতা ও পাতা সামন্তকে স্মরণ করছিল।

মুড়াইলের ডাকবাংলোয় বসে এম ডব্লু ইন্সপেক্টর

সামন্ত হলেন "ডেপুটি লেবর কমিশনার ইন্‌চার্জ অফ এনফোর্সমেন্ট ল অ্যানড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ মিনিমাম ওয়েজেস্‌।"

সুবোধ রুইদাস "সংখ্যালঘু" এম. ডবলু. আই. এবং তা শুধু এই জন্য নয় যে তার পদবী রুইদাস। ন্যূনতম-বেতন ইন্‌সপেকটর নিয়োগের আগে কয়েকটি শর্ত আলোচিত হয় এবং রহস্যময় কারণে যে সব শর্ত লিখিত হয় না। মৌখিক আলোচনায় ঠিক হয়,

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীরা জমি-মালিক পরিবারের সদস্য হবে না।

(খ) যতদূর সম্ভব, তারা সিডিউল্‌ড কাস্ট ও ট্রাইবের লোক হবে।

(গ) নির্দিষ্ট কাজ বিষয়ে তাদের থাকতে হবে ইডিওলজিকাল মোটিভেশন।

কার্যকালে, দেখা যায় :—

(ক) অধিকাংশ ইন্‌সপেকটক জমি মালিক পরিবারের লোক।

(খ) সামান্য ক'জনা মাত্র তপসিলী সাম্প্রদায়ের লোক।

(গ) অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি রাজনীতিক। অধিকাংশ ইন্‌সপেকটর কংগ্রেস ও কংগ্রেসের যুব শাখার লোক।

এম. ডবলু. আই দের বেতনক্রম ৩০০—৬০০। এবং অন্যান্য আলায়েনস। পদগুলি স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত।

এই বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবর কমিশনারের পদগুলিও স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কলা দেখিয়ে সৃষ্ট।

সুবোধ রুইদাস জানে তার অবস্থা কি। শৈশব থেকেই, মেধাবী ছেলে বলে সে বিনাবেতনে লেখাপড়া করেছে। স্বাধীন ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বর্ণ জাতিভেদ নেই অফিসিয়ালি। আন অফিসিয়ালি তাকে ভুলতে দেওয়া হয়নি সে কোন্ জাতের ছেলে। সুবোধেরও জেদ ছিল। অ্যাফিডেবিট করে সে "রায়" বা "দাস" হয়নি। ফলে সুবোধ জানতে বাধ্য হয়েছে। যে সব অবিচার ওকে সহ্য করতে হয়, তার পেছনে অনেক সময়েই অবিচার-কারীদের রক্তে লালিত জাত্যাভিমান থাকে। জাত্যাভিমান আছে বললে কাম্য ও কমল মজুমদার কপচানো অফিসাররা খচে যান। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ বিচার করলে দেখা যায়। তাঁর অবিচার ও অন্যায়ের কোন লজিকাল কারণ নেই। তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা মেলে রক্তেলীন জাত্যাভিমানে।

এই চাকরি সে পাওয়ার ফলে বর্গভীমার মন্দিরে মা পুজো দেন বটে, কিন্তু চাকরি দিয়ে তাকে অণিমাণ্ডব্য করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শূলের ছুঁচলো ডগা সে জীবনে বইছে, বইতে হবে।

সে নিঃস্ব, একদা খেতমজুরের সন্তান। ফলে, এখানে আসার আগে তার ডাক পড়ে জনৈক "নামে যুবো, কাজে বাঘ" নেতার আপিসে। এ সব ডাক দিয়ে যায় সাধারণত। জীপ চড়া, মাসল-বাগানো, জুলপি ঝোলানো ভারতের ভবিষ্যৎরা। নেতাদের দেহরক্ষী। সুবোধকে যে ডেকে যায়, তার আহ্বান উপেক্ষা করা বামসিংগরও সাধ্য নয়, সুবোধ তো পুঁচমাছ। যুবনেতা সুবোধকে বসতে অবধি বলে না এবং হুমকি মেরে বলে, নতুন ওয়েজ দেবার জন্যে হাঁকপাঁক করবেন না। জোতদার-জমি মালিকদের নুনছাল উঠে গেছে। এই ল্যাণ্ড সিলিং, এই কৃষিঋণ মকুব,

এই বেগারী বন্ধ, আবার এম. ডবলু! নতুন ওয়েজ দেবার কোনই দরকার নেই তবে ক্ষেতমজুররা এখন যা পাচ্ছে, তার চেয়ে যেন কিছু বেশি পায় সেটা দেখবেন।

আমাদের ওপর ইনস্ট্রাকশন···

ইডিয়সি করবেন না। অন্য জায়গায় এম. ডবলু. আই'রা মিনিস্টার দের সঙ্গে কথা কয়ে কাজ করছে।

অফিসিয়ালি···

একা আপনি অফিসিয়ালি কাজ করে কী করে যাবেন? সব হচ্ছে আনঅফিসিয়ালি, যখন, তখন সেই প্রোসিডিয়ারই অফিসিয়াল। যান, যান। কোথায় যাচ্ছেন তা শুনেই এত কথা বলা। লস্কর আমার চেনাজানা লোক।

এইভাবে যুবনেতা সুবোধ রুইদাসের জীবনে শূল ঢুকিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। শূল নিয়ে কাৎরাতে কাৎরাতে সুবোধ সামন্তর যায় কাছে। বয়স্ক আই এ এস সামন্ত সব কথা শোনেন। তারপর বলেন, দেখুন, আর সব চাকরিই চাকরি। আপনার আমার চাকরি হল আগুন দিয়ে হাঁটা। মাইনের বেশ্ কম আছে। এই প্রোপ্ট ক্রিয়েট করার ব্যাপারটা দেখুন। তার আগে বুঝুন এম, ডবলু, ব্যাপারটা কি।

এগ্রিকালচার মানেই ক্ষেতমজুর। স্বাধীন দেশ যখন, তখন ক্ষেতমজুরদের কথাও ভাবতে হয়। ফিফটি থ্রি অব্দি এম, ডবলু ছিল শুধু দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায়। তারপর আটষট্টি চুয়াত্তর, কারেন্ট থ্রিয়াত্তরের ওয়েজ রিভিশনের কথা আপনি জানেন। মজা হল, আটষট্টি থেকে সব জেলাই এম, ডবলুর আওতায়। অথচ কোথাও খেতমজুর এম, ডবলু, পায়নি। বাঁকুড়ায় খেতমজুর পেয়েছে ছ-আনা। সেভেনটি সেভেনটি ওয়ান—সেভেনটি টু—দেশে কি চলছে, খেতমজুর পাচ্ছে ছ' আনা—লেবর কামশনার রিপোর্ট—"দ্যাট হি একুজিয়ট্স, ইজ এ মিরাকল।"

সুবোধ বলেছিল, জানি।

এসব কথা রক্তে জানে সুবোধ। সে খেতমজুরেরি ছেলে। সেভেনটি—সেভেনটি ওয়ান—সেভেনটি টুর ফলে গোড় রাঢ়ে আর্মি নামতে পারে কিন্তু খেতমজুরের মজুরী ছ' আনা থেকে উপরে ওঠাতে কোন সরকার পারে না।

সামন্ত বলেছিলেন, কেন খেতমজুর এম ডবলু পায়নি? ১৯৬৯ এ ন্যাশনাল লেবার কমিশন দেখে, ওয়েজ আক্ট করা হয়েছে। কিন্তু খেতমজুররা তা জানে না। সে আইন বলবৎ করার মত সরকারী ইচ্ছা বা ব্যবস্থা নেই। ফলে কমিশন খুব জোর দিয়ে বলে আক্টটি প্রচার করা হোক। আইন বলবৎ করার জন্য সরজমিনে লোক বহাল করা হোক, গ্রাম পঞ্চায়েতকেও ভার দেওয়া হোক।

প্রচার বলতে রেডিও আর কাগজ। লোক বলতে আপনাদের পোস্টগুলো। এ বছরের গোড়া অব্দি তো সাঁইত্রিশ লাখ খেতমজুরের জন্যে ষোলটা পোস্ট তৈরি করা হয়। তাতে কোন কাজই হয় নি। এখন আপনারা এসেছেন।

আপনারা কাজ করবেন। জোতদার ও জমি মালিক প্রচণ্ড বাধা দেবে। দেবেই। কেন না কোনদিন তারা খেতমজুরকে কিছু দেয় নি। আজ তারা আইন হয়েছে বলে রোজ আট টাকা দশ পয়সা দেবে? দেবে না। খেতমজুর চাইবে। আপনার কাজ আইন বলবৎ করা।

ভীষণ প্রেসার আসবে, আসছে। ভয় পাবেন না। কাজ করতে নেমে সৎ সাহসে কাজ করবেন। কারো পক্ষ নেবেন না। জুলফুক হলে আমি আছি।

সার,···

বলুন?

এই যে কথাগুলো আইনে বলছে—মালিক স্ট্যাটুটরি এম. ডব্লু এর চেয়ে কম টাকা দিলে খেতমজুর নিজে। অথবা কোন উকিল। অথবা লিখিত অথরিটি প্রাপ্ত রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারী, অথবা এম. ডব্লু. আই জেলা জজের কাছে প্রতিকার চাইবে—এর কি কোন মানে আছে? খেতমজুর কি মালিকের নামে কিছু বলতে সাহস পাবে? প্রোসিডিয়ারটা খেতমজুরের পক্ষে সময় সাপেক্ষ, গোলমেলে, কঠিন।

জানি। এখানে আসছে আসল কথা। দেখুন। ওদের পেছনে কোন কার্যকরী সংগঠন নেই। আজ প্রতি জায়গায় ইউনিয়ন। ফলে ইউনিয়ন লড়ে। কর্মী বিধান পায়। ওদের পেছনে যদি কোন ইউনিয়ন থাকত, তবে আমাদের কাজ সহজ হত। জোতদার ভয় খেত। ভয় খায় না, কারণ, তেমন কোন ইউনিয়ন নেই। যে ইউনিয়ন সরকারকে চাপ দিয়ে আইন বলবৎ করতে পারে। সেই জন্যেই আপনাকে কাজ করতে হবে।

কেন নেই?

থাকবে কেন? গ্রামে ডাক্তার যায় না কেন? গ্রামে গিয়ে বাবুরা ইউনিয়ন করবে? চাষাদের নিয়ে?

"ল" বা কি রিডুসে দিচ্ছে? যদি শেষ অব্দি জেলা জজের কাছে যাওয়া গেল। জজ খেতমজুরকে ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু তার টাকা দাবির টাকার দশগুণের বেশি হবে না। দাবিটি 'মিথ্যা' প্রমাণ হলে খেতমজুরের জরিমানা হবে পঞ্চাশ টাকা।

হ্যাঁ। তবে দাবি প্রমাণ হলে জোতদার বা জমি মালিকেরও পাঁচশো টাকা জরিমানা নয় তো ছ' মাস অব্দি জেল হবে। আপনি কি করবেন? খেতমজুররা আপনাকে জানালে আপনি মালিককে "শো-কজ" নোটিশ দেবেন। সে নোটিশে কাজ না হলে কেস ঠুকবেন।

বেশ। "—" বলল, লস্কর ওর চেনা।

মামাশ্বশুর। ওর বউয়ের মামা।

ও।

ভয় পাবেন না। আমি আছি।

এই ভাবে সামন্ত, যুবনেতার ছোকানো শূলের অনেকটা কেটে দেন ও অভয় দিয়ে সুবোধ রুই দাসকে বাবের মুখে ছেড়ে দেন। তারপর বলেন, আন অফিসিয়ালি বলছি। ওখানে সদরে খেতমজুর ইউনিয়নের শাখা আছে। লস্করের সঙ্গে আপনার যদি কোন এনকাউন্টার হয়, সেটা হবে আদালতে। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ ধানখেতে নয়। সেখানে লস্করকে টাইট দেবে বসাই টুডু।

কে সে?

এক সাঁওতাল খেতমজুর। কাজের লোক। এক ইউনিয়নে বহুকাল লড়ছে। লস্কর দু'বার ওর বরও জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিছুতে দমাতে পারে নি। আপনি

ওকে আইন ও ল' পয়েন্ট বুঝিয়ে দেবেন। সদর চেনা আছে ?

হ্যাঁ।

থাকবেন সদরে, কাজ করবেন ব্লকে। তবে আমার অর্ডার, মাসে পঁচিশ দিন ব্লকে থাকবেন। লস্কর আপনাকে ভেজাতে চেষ্টা করবে। ভিড়বেন না।

না।

কথাগুলি সুবোধ রুইদাস আবার স্মরণ করল। মুড়াইলে আসার পর থেকে তার ক্রমেই মনে হচ্ছে শূলের অদৃশ্য ডগাটি বড়ই ছুঁচলো। লস্কর বড়ই ঈশ্বরপ্রতিম।

সুবোধের গ্রাম অন্য জেলায়, বাস রুটের গায়ে।

এখানে গ্রাম এত ভেতরে, এমন বিচ্ছিন্ন। খোয়াই ও শীর্ণতোয়া গয়েশ্বরীর চেহারা এমন নিরানন্দ। চতুর্দিকে হা হা করছে দারিদ্র্য। শুধু লস্করের খেতে সোনালী ধানের সুঘ্রাণ, তার বাড়ি ডায়নামোর বিদ্যুতে উজ্জ্বল। সুবোধকে লস্কর একটা মাছ পাঠিয়েছিল, সে রকম মাছ সুবোধ ওদের গ্রামের জোতদার ত্রিমোহন মাইতির বাড়িতে কাজ থেকে দেখেছে। বড় মাছ সুবোধ দূর থেকেই দেখে। লস্কর একটা অটোমাটিক ওমেগা সী মাস্টার ঘড়ি পরেছিল। এই গণ্ডগ্রামে লস্কর গোল-ডক্রেক ফিলটার খায়। ওকে লস্কর জিগ্যেস্ করেছিল, বেতন কত পাচ্ছ ?

বেসিক্ তিনশো।

মোর ভাইভারে চারশো দিই। ছেলেটা লেখাই পড়াই। মোর কাজে কোট কাছারও করে।

সুবোধ জবাব দেয় নি।

বসাই টুরা বিষখোপরা আছু।

সুবোধ জবাব দেয় নি।

আপান রুইদাস আছু ?

আপনি আসুন এবার।

মাছটো লিলেন না, ফিরাই দিলেন—ছেলার বয়েসী আপচার আছু, ভাল মনে দিয়া করলম। তা, কাজকামে চৌকিদার দেখছু ? লোক পাঠাই দিব ?

না।

লস্কর তখন চৌকিদারকে ডেকে হঠাৎ, সেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সুবোধের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণের জন্যেই, প্রবল ধমক মেরেছিল, রাম ? ভাল করা-বাবুরে দেখ ভাল্ কর। লয় তো দারোগারে বলা ফাঁসায়ে দিব। শালো, সরকারী বাংলায় বসা লোক লয়ে গাঁজা টান ?

সুবোধ এখন একা বসে বসে সব কথাই স্মরণ করল। সামন্তর মুখ ও নাম মনে ধরে রাখা দরকার। নইলে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সুবোধ লস্করকে সেলাম ঠুকে ফেলবে।

জোতদারকে ভয় সমীহ করার অভ্যাসও রক্তে আছে। অস্বীকার করে লাভ কি ?

খুবই অন্যমনস্ক ছিল সুবোধ। বসাই টুরা ওর সামনে এসে দাঁড়াতে তবে ওর চমক ভাঙল। হঠাৎ ও দেখল, সামনে, খুব কাছে। একটি কালো, বেঁটে, প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। সম্ভবত প্রৌঢ়, কেননা রগের চুল সাদা। চোখ ছোট, লালচে ও উজ্জ্বল। গায়ে সস্তার বুশশার্ট, পরণে ধুতি। পা খালি। লোকটি বারান্দায়, বারান্দার নীচে তিনজন লোক।

আমি বসাই টুরা।

বসুন।

উরা সাথ আসছে।

আপনারাও আসুন।

সকলেই উঠে এল ও মাটিতে বসল। সুবোধ বলল, বলুন। আপনি কাল এলেন না ?

সদর গেছলম। বিড়ি খাবু আপনি ?

না, আপনারা খান।

খান না ?

না। যা মাইনে পাই—

এখন বলেন।

আপনি বলুন।

আমি বা কি বলি, আলেন আমন কাটার কালে। দেখেন, নামে বেনামে লস্করের জমি—সোনাল, গয়েশ্বরী, মুড়াইল ভিবর দিয়া দেড় হাজার বিঘা।

সুবোধ মনে মনে নোট নিতে থাকল।

আমরা দুই শ ঘর মিঞা মরদে। আমন চাষ হাজার বিঘায়।

তা ধানের কাজ বৎসর ধরা। আউসের চাষ তুলা দিছু।

তাথে গত সালে দিছু আটানা। ইবার দিছু দশানা। তাও আমার লড়তে হয়্যাছে।

বলুন···সি জষ্ঠিতে বীজ ধান ছড়ালাম। তা বাদে ধান নাড়লম। এখন ধান কাটা। পালা দিয়া, ধান সারা, ব—হুৎ কামআছু।

ইরা রিলিপের মাইলো সিজে খাওয়া কাম করাছে। তবও মোরা ই সনে ধান বাড়ি কম নয়্যাছি।

কে কত নিয়েছেন, রেকর্ড আছে ?

ইদের কথা বলবেন নাই। ইদের রেকড বসাই টুরার মাথা। তবুও লিখা রেখাছি। তাথেই লস্করের রোষ খুব। তুমি বসাই, মোর কিষাণ খেপাও। উদের সাথ মোর সম্বন্ধ চৈরদিন, তুমি বিষাও। বাবু। ই টুনি হিসাব না রাখলে লস্করের হাঁ বুজে না। মজুরি দিতে সি খাতা বের করেং। ই—য়া জাবদা। তাথে লিখা কথা। ই এত লিছে। উ এত লিছে। সি ত্যাত লিছে, তবে লে গা শালারা হিসাব কষ্। পাস এত, কাটলম এত, লে টাকা। হিসাবে সি পুলুস। যখন বাড়ছিছে তখন দাম কম, কাটছু দাম-চড়াং হিসাবে। ঐ লোকের সাথে লড়াই করা—।

আপনারা কি করবেন ঠিক করেছেন ?

বসাই টুরা বিড়ি টানল। তারপর বলল, ছিন্নাত্তরের এম. ডবলু লিব। আটরট্ হথে যথ পাব, —ও হিসাব লিব। লয় তো ধান কাটব লাই, ক্যারেও ধান কাটথে দিব লাই।

তাকে বলেছেন ?

বলব। তার আগ্ জেনা যাই, আপনি কি মদত দিবেন ? সিটি বলা করুন।

সে যদি রাজী হয়, ভাল।

সিধা আঙুলে ঘি দিবে না।

না হলে আপনারা আমাকে জানাবেন। লিখিত। আমি ওকে নোটিস দেব।

আপনি। মোদের কোট যেতে হবেক নাই ?

কোর্টে আপনারা সরাসরি যেতে পারেন।

লাঃ। লাভ নাই।

উকিল যেতে পারে।

উকিল বলতে কালীমুহন। লৌ চুষে লিবে।

কোন ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের অফিসারকে আপনারা ভার দিলে তিনি যেতে পারেন।

লাঃ। ইউনিয়ন বলথে খেতমজুর ইউনিয়ন অন্য জিলা জানি না।

হেথা লড়বড়া।

আমি যেতে পারি।

আপনি ?

হ্যাঁ। আইনে বলছে তাই।

বলাছে, আইনে ?

হ্যাঁ।

কি বলছে ?. শুন শুন গোবিন্দ. শুন ছিচরণ, পাইনে বলাছে নিস্‌পেক্টর যেতে পারে।

আইনে বলছে। আপনারা লস্করকে দাবি দেবেন। সে না মানলে আমাকে জানাবেন। আমি নোটিস দিয়ে বলব, দাবি কেন মানো নি কারণ দেখাও। যদি মেনে নিল, ভাল। তবে যদি না মানল, জবাব দিল না, অথবা জানাল মানব না বলে, কিংবা জানাল আমারও বলার কথা আছে। তখন আমি আদালতে গেলাম।

বাঃ, বাঃ, বাহারে। তা বাদে ?

সেখানে ওকে রেকর্ড দেখাতে হবে। ও অনেকদিন হল নোটিস পেয়েছে। কে আগাম টাকা বা ধান নিয়েছে, কাকে ও জরিমানা করেছে, কার খোরাকি বাবদ টাকা কেটেছে।

স—ব রেকর্ড চাই।

পালো, কিছু ভাঙে নাই ?

আমার কথা হল, আপনারা এখন কোন কারণেই ওর কোন খাতায় বা কাগজে টিপ দেবেন না।

দাবি না।

ওর কাছে সব খুলে বলুন। যদি ও রাজী না হয়, তবে কি করবেন ?

মোরা কাজ বন্ধ করা দিব।

ও আর কি করতে পারে ?

একটা কাম উ করবু।

কি কাজ ?

বাহার হথে দাওয়াল লিসবে।

তু জানেন ?

জানু। ই ভি জানু যে তা হলে মারপিট হবে। মোদের লৌয়ে বুনা ধান কাটতে দিব না। জাহান্ কসম খেয়ে লড়ব।

ও খাতা দেখালে তাও বেআইনী। আইন হয়ে গেছে, ও ধার বাবদ টাকা কাটতে পারে না।

বাবু। আপনি টোকাটা আছু। লস্কর যেথা, সেথা আইন কি বাবু ? পুলুস উর হাঁথে, কলকাত্তায় উর খুঁটি, এমেলে বাবু, দারোগা, মন্ত্রী উর ঘরে উঠে, খানাপিনা করে—আইনে উর কি ?

আমার উপর ক্ষমতা আছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় থাকলে পুলিস এনে দাঁড় করিয়ে ধান কাটাব।

সুবোধ, বসাই টুরার সামনেই কথাটা বলল। টেকানিকাল ভুল। এ ভুল হল কেন ? সুবোধ পরে বুঝেছে।

গৌর লস্কর ওর কাছে ত্রিমোহন মাইতি। ত্রিমোহন মাইতির কাছে সুবোধের বাপ, উৎসব রুইদাস।

এইসব লাঞ্ছনা পেয়েছে। ধান বাড়ি, টাকা ধার, কাগজে কি লেখা আছে জানতে চেও না, টিপছাপ দাও। হ্যাঁ তুমি ঐ সীজনে কাজের জন্যে এগার টাকাই পাবে, হিসাব আছে। পছন্দ না হয়, যাও শালা আদালত। আদালতে কে যায় ? আবার ধান বাড়ি, আবার টাকা।

হ্যাঁ, লস্কর ত্রিমোহন হয়ে উঠেছিল সুবোধের চোখে। অত্যাচারের ইমেজ। মূর্তি। সুবোধ সে ইমেজ ভাঙতে চেয়েছিল। তাই বসাই টুরার সামনে বলে ফেলল কথাটা। কথাটা কি ভয়ানক। কাটো তোমরা ধান, দাঙ্গা হলে পুলিস এনে মদত দেব। ইমেজ-ভাঙার ঔদগ্র্য বাসনা।

সুবোধ ভুলে গিয়েছিল, ইমেজ বা মূর্তি, সে জীবিত জোতদার বা মৃত মহাপুরুষ যারই হোক, মূর্তি ভাঙার অপরাধ সরকার সহ্য করে না ও বাতাসে কর্পূরের গন্ধ ছুঁড়ে দিয়ে মাটি রক্তে ভিজিয়ে দেয়।

তবে সব কথা হয়া গেস ?

হ্যাঁ।

তুমরা যাও। যেছি আমি।

ওরা চলে গেল। বসাই টুরা বলল, আজই যাব হোথা।

বলা আসব।

কাল গিয়ে ইউনিয়ন আপিসেও বলবেন।

হ্যাঁ। তার আগ্ ছাইকেল লিয়ে বুলে আসি, ক্যাও লস্করের কাগজে ছাপ দিবে না।

ওর কাছে গিয়ে বলে দেখুন কি বলে।

॥ তিন ॥

লস্কর বসল। ই কি কথা বলছু তুমি বসাই ? তুমরা ওয়েজ পাবা, সরকার বলাছে, দিব ওয়েজ।

দিবে ? তবে সভেরে ডাকি ?

দেখা লই বাপ। খাতা দেখি।

তুমার আবার খাতা কি লস্কর বাবু ?

এই দেখ। ধার লিচু, হিসাব নাই ?

লাঃ। আইন হয়াছে। কৃষিঋণ নাই।

ই ত কৃষিঋণ লয় বসাই।

তবে কি ?

পেটে খেতে লিাছে।

চাষী ঋণ লয় পেটে খেতে।

ই, তুমরা ত চাষী লও বসাই। ই সভার লিজ লিজ ঋণ।

ই ঋণ মহাজন ছাড়থে পারে ?

খাতা কুথা ? নিসপেকটররে দিশাবা।

লা বসাই। খাতা দেখথে দেখবে কোট।

মোদের দাবি শুন।

বল।

মোদের বুনা ধান মোরা কাটব।

তা বাদে ?

এম, ডবলু, লিব।

তা বাদে ?

ছিয়াত্তরের রেটে।

আর ?

বাহারের দাওয়াল লিয়সতে দিব না।

বাস। এই ?

এই।

বেশ। লিখা আন।

কেনী ?

লিখবা না ?

না।

বেশ।

তুমি জবাব দিয়া কর।

আমার জবাব। জবাবের কি পথ রেখাছ হে। যা বলাছ, মানলম। ততে এক কথা।

কি ?

আমি ধারের হিসাব দিব। যি যা লিছে, টিপ দিবে। তা বাদে ধানে হাথ।

লস্করবাবু। কুন্—অ কাগজে কাও টিপ দিবে না। টিপ আমরা চিরকাল দিয়াছি। মোর বাপ তুমার বাপরে টিপ দিয়াছে, মোর বাপের বাপ। তুমার বাপের বাপরে টিপ দিয়াছে। টিপ অনেক দিয়াছি হে। তাথেই এই দশা।

তুমি মাইলো চালালা, কাও ধান না নিয়া যদি উপাস থাকে তাথে মোর দোষ ?

মাইলো তুমিই ধরালা। তুমার ধান বাড়ি লিয়ে ভাত খেয়ো মোরাদের মরণ।

কথায় কথা বাড়ে বসাই।

তু ম জবাব দিলা কথা শেষ হয়।

টিপ না দিলা আমি কুন—অ কথাৎ নাই। টিপ দাও।

আমি সকল কথাৎ কবুল যেছি।

টিপ কা—ও দিবে না লস্করবাবু। ধানও খেতে পচাব তুমার।

বসাই বেরিয়ে গেল।

লস্কর বলল। লার বের কর। সদর যেছু আমি। উ বসাইরে আমি বিন্দাবন দিশাব।

বসাই আগে গেল লখিন্দর বাড়ি। বলল, এখন চল।

কথা আছে।

যেছি। আসাও।

তারপর বসাই গেল মুড়াইল। দোকানীর সাইকেল চেয়ে নিল। সুবোধকে সব কথা বলল।

হঁা, ব্যাপার গোলমেলে।

আমি যেছু এখান। ই শালাদের বিশ্বাস নাই, অমনই বেরা টিপ দিয়া করবে। সি মাসে হারপালে, হুগলী জিলা, কি হলু তা জানু আপ ন ? ই একোই গোলমাল। তবও খেতমজুররা লটেছিল। তখন ইনসপেকটর, পঞ্চায়েত সভে হাকিম অনোছিল। সেথা মালিকরা এই এথ কাগজ—স—ভে টিপ ছাপ, বলদের গাড়ি বুঝাই করা লয়া গেল। তাথে মজুর মরাছিল।

যান আপনি।

আপনি কি করবু ?

কি হয় জেনে একবার সদরে যাব। ইনস্ট্রাকশান আনাব কলকাতা থেকে।

বসাই আগে গেল বাড়ি। লখিন্দ উঠোনে বসে সতেজ লাউগাছটি দেখছিল ও স্বপ্ন দেখছিল বড় লাউটা বসাই ওকে কেটে দিচ্ছে।

বসাই বলল, শুন লখিন্দ। তখন বলি নাই, এখন বলি। গাঁ ভরা সভে জানে তুমি লস্করের চামচা। তুমি চামচা বট, কিন্তুক বুকাটা। কিছু দেয় না তুমাক লস্কর। তবও তুমি চামচা খাট।

টচবাতি দিবে।

হঁা, সব দিল, জমি জেরাত গাই ছাগল—টচবাতি দিতে বাকি।

নাঃ, দিবে না। লিব না। বউ মানা করাছে। লিলে বউ গুঁসা হবে।

ক দিন তুমাক চামচা খাটতে হবে।

কেনী ?

লস্কর এম, ডবলু, লয়ে দাংগা উঠাবু। উর সাথে ভেঁয়া হয়া যাক। কি করে বসবা। যেয়ে বল, তুমার চামচা বলা বসাই মোরে মারতে যায়। দেখ গা, সদর যাই যদি, সাথ লিতে পার ?

তা বাদে ?

যা বলে। বলা যাবে।

তা পারবু। কান ভাঙাতে আমি টেঁটন।

যাও।

ছুটতে-ছুটতে গেল লখিন্দ। খুব খুশি ও। বসাই টুরা ওকে বিশ্বাস করেছে কাজের ভার দিয়েছে। বসাই টুরা কি সামান্য লোক ? পুলুসও ডরায়।

লস্কর বেরোচ্ছিল। বলল, অঁা ? তু মোর চামচা হলু ? বেশ। হ তু চামচা। চল্ মোর সাথ। যেতে যেতে শুনা যাবে। ইঃ, চামচা বলো। উর ইউনিয়ান-বাজি ভেঙা দিব। পুসলু ঢুকায়ে দিব ঘরে।

আমি যাবু। গাঁয়ে রইল্যে মোক মারবু।

চল্ বেটা। ডর কি তুর ? মোর ঘর থাকবু ?

বউ আছে।

ধুস্। তুর বউ বছরবিয়ানী। তার হবে কি ?

লখিন্দ লস্করের সঙ্গে সদরে গেল। লরি চেপে ভোঁ করে বেরিয়ে যেতে যা মজা। মনে হয় বিশ্বসংসার দু'পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। একেবারে আবদ্ধ জীবনে বাস করে লখন্দ। তাই লরির গতিময়তা ওর খুব ভাল লাগে। যেতে যেতে ঘরের টোকা চিরাদের জন্যে কষ্ট হল। আহা ? ওরা লরি চাপেনি কখনো।

অনেক রাতে লখিন্দ বসাইয়ের বাড়ি গেল। বলল, চল হে। কথা বলা করি।

ওরা ঘরের ছামুতে এসে দাঁড়াল। শীত খুব। শুক্লপক্ষের অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। চরাচরে মলিন কুয়াশা। নদীর বুক কুয়াশায় ঢাকা। হিমমন্থর বাতাসে ধানের সুঘ্রাণ। ধানগাছগুলি লস্কর ও ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ের খবর রাখে না। বসাইদের কাস্তেতে প্রাণদানের জন্য ওরা রাতের বাতাসে মাথা নেড়ে ডাকছে বসাইদের।

লাখিন্দ বলল, শুনার খাবু ধান, না কি ?

কথ খাবে খাক। আনেক ধান। বিশ টাল।

হাঁ।

কি হল, বল।

লাখিন্দ বলল, এস ডি ও র কাছে গেলু। কি বলাছে শুনি নাই। মোক বাহারে রেখাছিল। তা বাদে আনা হয়ে দারোগারে লরিৎ উঠাল। লার ঘুরায়ে ঘুরায়ে সকল কথা বলল। সদর খুব গরম হে। ছাকাছ বসাছে। তিনটা বাঘ। হাঁতে আছে, উট আছে।

কি বললু দারোগাক্ ?

বললু, ইনস্পেকটর মুচির ছেলা, হাড়ি ডোম বাউরি সান্তালরে মদত দিতেছে। তুমি তার মদতে জোর পায়া খেতমজুর খেপাও। দাংগা করবা।

দারোগা কি বলল ?

দাংগা হলে দেখা যাবে।

আর কি বললু ?

তুমারে মিসা করথে।

তা বাদে ?

দারোগা বলছু, তুমার কথায় মিসা হবেক নাই লস্কর। হবার হলা হবে। উ নিস্‌পেকটর হিলাফালা লয়। দারোগার উপর অডার আছে। যাত নিস্‌পেকটর ডাকলে পুলুস মদত দিবে। তা বাদে দু'জনা থানার ছামুতে দাঁড়ায়ে কি বললু, শুনি নাই। লরিতে চাপা বলল, বেবস্থা হলু।

তা বাদে ?

মোক্‌ মুড়খি—লাড়ু কিনা দিল।

যাও তুমি। পরে আবার বলব। এখন লেগে থাক।

হাঁ। যেছি আমি।

যাও।

বসাই।

বল।

আমি ভাল্‌ কাজ করলু ?

হাঁ লখিন্দ। তুমি যা করলা, তা ক্যাও করতে লারত।

গাঁ বাসী রুষবে। তুমি বুকা হয়া থাকবা।

আচ্ছা।

লখিন্দ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, ভাল কাম করা তভে বুকা হয়া থাকবু কেনী ?

বুকা হয়া রল্যে সভে জানবে তুমি উর চামচা। সভে তুমারে মন্দ ভাবে তা লস্কর জানবু। তুমারে বিশ্বাস যাবু। তাথে উ কি করথে চায় মোদেক জানা হয়া যাবে। উ আর কারেও বিশ্বাস যায় না, তুমাক বিশ্বাস যায়। উ য্যামন জানবু তুমি আসলে মোদের সাথ্‌ আছু, ত্যামন তুমারে বিশ্বাস যাবু না। তাথে মোদের লুক্‌কান। এখন লড়ায়ের সময় লখিন্দ। ই ভাবে তুম মোদের রূপকার করতা পারং।

লড়াই, বসাই ? ল—ড়া—ই ?

হাঁ লখিন্দ। লড়াই।

তুমার কিছু নাই। উর বন্দুক আছু।

আমারো আছু হে। হাতিয়ার বার করি নাই। আমি উরে মথুরা দেখাবু। ধান আছু না উর ?

॥ চার ॥

আশ্চর্য, বসাই যখন বলছিল, "ধান আছু না উর ?" তখন গৌর লস্কর টর্চ হাতে। ড্রাইভার মদনকে নিয়ে ধান গাছগুলি দেখছিল। ধানখেতের সীমানা কুয়াশায় অস্পষ্ট। ফলে মনে হয় লস্করের ধানখেতের সীমানাই পৃথিবীর সীমানা। মনে হয় সমগ্র পৃথিবীই লস্করের ধানখেত। লস্করের গোলায় উঠবে বলে পৃথিবী অপেক্ষা করছে। বীরভোগ্যা।

ই স—ব আমার। লস্কর মনে মনে বলছিল। বুকের নিচে আশ্চর্য উদ্বেগ। এই ধানগাছগুলি তার অস্তিত্ব নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে। কি করবে লস্কর ? হার মানবে ? জিতবে ? বসাইয়ের রুক্ষ কথা। কিন্তুক কি করবু তুমি বসাই ? কি করথে পার ? কতদূর ক্ষমতা তুমার ? সান্‌তাল আছু, খেতমজুর। ফি বছর উসকানি দিয়া কর। আমি খেতমজুরের লৌ খাই ? তা'লে উদের সম্বৎসর বাঁচায় কে ? তুমি ? ক্ষমতা আছু তুমার ? উদের জনম-মরণ বিয়া ছরাদ-পালা পার্বণে আমি ছাড়া কে দেখে ?

বড় মন্দ সময় বাছলা তুমি। এমার্জেন্সীর কাল। কুথাকে খেতমজুর জিতে নাই বসাই, রিপোর্ট পাছু আমি। উ কালের পৌষ হথে ই সালের শ্রাবণ অবধি এক বৎসর আট মাসে তেরটা কেস হয়াছে। এগারটা কেসে ফাইন হয়াছে। ফাইন দিথে জোতদার উরেৎ না বসাই। কিসের ঋণমকুব আইন ? আইন আমার কি করবু ? ধান দিব, সুদ লিব, রেকর্ড নাই, জাবদা ক্যারেও দিশাব না, আসল লিব না, সুদ লিব, লা:। বসাই, ভুল করলা তুমি।

সরকাররে তুমি চিন না, আমি চিনি। পাবালকের দিশাল এম. ডবলু. দিছে। নিসপেক্টর পাঠাল। নিসপেক্টর কারা বসাই ? নিস্‌পেক্‌টর কারা ? মোদের জোতদারদের, ভূঁইমালিকদের ছেলা তারা। তারা দিবে খেতমজুররে হক ? লা:। দিবেক নাই। উ মুচির ছেলা কথদূর বাবু বসাই ? উর আপচার সামন্ত। সামন্তর দিন ফুরায়েছু। মোর ভাগ্নীজামাই লীডার আছু। জোতদারের ছেলা। নুন চিনি-কেরাচিন বিনা কিছু কিনে না। সি আছু, মন্ত্রী আছু, সামন্ত সরলে উ নিস্‌পেক্‌টর মরা যাবু। তুমরা এত বুকা বসাই, এমার্জেন্সী আছু, জানু না ? তুমারদের দুস্‌থে মোর বুক ফাটে। মাটি বাপের লয়, দাপের। এম. ডবলু. তুমারদের ভুসাবার, পাবলিক ভুসাবার কথা। দাংগা হলে তুমরা মরবু নিশ্চয়। তাথে সরকার মুতা দেয়। মোরা মরলে সরকার হাত-পা হারাবু। মোদের জীয়াতে এম. ডবলু। লকসাল হাংনামার কথা সোঙর নাই ? একো একো জোতদার মরথে বদ্‌লায় কথ জাহান্‌ লিছে সরকার ?

ধান আমি কাটাবু।

টাহালে উঠাবু।

তুমারে মারবু। ভাতে মারবু।

কথাগুলি ভাবতে ভাবতে লস্করের মুখেচোখে অস্বস্তি তথয়তা নামল। আরো কথ পারি বসাই। এম. ডবলু, তুমার হকের লড়াই। "দিব না এম ডবলু" মোর হকের লড়াই।

গৌর লস্কর থমকে দাঁড়াল। বলল, কাল হথে ঘরের মাইন্দাররা মাচাঙে বসবু। ধান তৈয়ার হছু। ওরা ঘরের দিকের পথ ধরল।

তিন দিন পর থেকে শুরু হল খেত-মজুরদের লাগাতার ধর্মঘট।

সুবোধ চলে গেল সদর। ট্রাংককলে সামন্ত বললেন, ভাল। আমি দেখছি। ব্যাপারটাকে কতটা পাবলিসিটি দেওয়া যায়। রেডিও আর খবরের কাগজের কাভারেজ খুব দরকার। সদরে আজ থাকুন আপনি।

আমি গ্রামে যাব না ?

এখন থাকুন। আর এমার্জেন্সীতে যাত্রাসায়র ব্লক কয়টাকট করবেন। রঞ্জিত পাত্র সেখানে এম. ডবলু. আই হাঁ হাঁ, বিশ্বাসী ছেলে। দু'জনে যাবেন। রিটুন নোটিস যাচ্ছে। এখন পাবলিসিটি ভীষণ দরকার। আপনার হিরো আকটিভ ?

ভীষণ। গ্রাম ছেড়ে নড়ছে না।

শুড। ও যেন রিপোর্টারদের মিট করে।

পাবলিসিটি। সদর থেকে জীপ

ও টাক্সি চলল গ্রামমুখো। রিপোর্ট খুব মুভিং ও ফেথফুল হল।

"টু ভিলেজেস্ মার্চ টু মডার্ণ টাইমস..."

"ন্যূনতম বেতনের দাবিতে খেতমজুর ধর্মঘট..."

"খেতমজুর কর্মী বসাই টুরা-বলেন..."

খেতগুলির ধারে ধারে মাচাং।

প্রহরারত খেতমজুর দল।

"মিঃ টুরা, আপনারা মাচাং তুলেছেন কেন?"

লইলে দাওয়াল ঘুসাবু বাহারের।

কতদিন ধর্মঘট টানবেন?

যতদিন লস্কর লা ঘাড় ভাঙে।

আপনারা কোন রেটে ওয়েজ পেয়েছেন এতকাল।

আকোব্বর বাদশার টাইনের রেটে।

মানে?

আটানা পেয়াছি, দশানা পেয়াছি, ই কুন্ অ রেট হলু? তাথে বলছি বাদশাই টাইনের রেট।

সব জমি লস্করের?

চাকলা তার।

ল্যান্ড শিলিং?

বাবু আছে, শিলিং জানছু, হিসাব কষ। শিলিং কার তরে? কুন জিলায় জোতদার মাহাজনের হাজার হাজার বিঘা নাই? কুথা শিলিং নাই? আইন করছু জোতদার পুষা। তাথে আশ্চাজ্জ মানার কি হলু?

ধর্মঘটের কারণ?

উ কুযখণ মকুবি আইন মানে না। ডিয়াত্তরী ওয়েজ দিবু, মুখে মানছু, কিন্তুক কে কি ঋণ নিয়াছে, উর লুকান্ কায়দায় টিপ দিথে হবু। মোরা দিবক্ নাই। তা হথে...

আইনের পরও?

আইন ত মোরে মারা করথে, উরে বাঁচাথে। কিসের ঋণ মকুব আইন? সাদা খাতায় লিখা ঋণ মকুব হথে পারে কিন্তুক সাদা খাতায় থাকে এক টাকার কথা। ন টাকা যে লুকান্ জাবদায় লিখা? রেকর্ড থাকে না কি? সরকার জানে না কত কোটি টাকা সুদে খাটছে?

তেঁতুল গাছের নিচে বসাইয়ের প্রেস-কনফারেন্স হয় এবং বসাই তার মাঝে উঠে গিয়ে স্লোগান দেয়—

ই—ধান—মোরা কাটব।

মোরা কাটব।

বাহারের দাওয়াল ঘুসতে দিব না।

না, না, না।

আটষট আর চুয়াত্তরের টাকা কুথা?

টাকা কুথা?

ডিয়াত্তরী মজুরি দিথে হবে।

দিথে হবে।

মুখের হিসাব মানব না, টিপসহি দিব না।

মানব না, দিব না।

এম. ডবলু মোদের জা—হান্।

জা—হান।

দিবে, তবে কাটব ধান।

কাটব ধান।

জনৈক ছোকরা রিপোর্টার তখনি স্লোগানটি টেপ করে নেয় ও স্লোগানের ফাঁকে ছাগলের ব্যা ব্যা ঢুকে যায়। সে সঙ্গীকে বলে, দিস ইজ রিয়াল মাইরি। পস্তিকাভোঁর ছবি হচ্ছে যেন। টেপে স্লোগানটার সঙ্গে পল রোবসনের গান আর ইন্টার ন্যাশনালের মিউজিক পাঞ্চ করে নিলে দারুণ হবে কিন্তু, সত্যিত।

সঙ্গীটি, রক্তের দশকের আগাগোড়া পার্ক স্ট্রীটে মারিহুয়ানা খেয়ে বিপ্লব করেছে। অত্যন্ত সম্প্রতি সে গাঁদা ফুলের চেয়েও হলদে রঙের টাকায় পুষ্ট কয়েকজন লাল-নীল জামা-পরা অতি বিপ্লবীকে দেখেছে এবং বিপ্লবে দীক্ষিত হয়েছে। ফলে তার মন এখন টলটলে এবং সে কেঁদে বলে, 'বসাই যেন চে-গুয়েভারা।'

বসাই এখন শক্ত হাতে কাজ করে। মাচাঙে মাচাঙে পাহারা বদল করে সে রাতদিন পাহারায় রাখে খানখেত। লস্কর ঘরে দোর বন্ধ করে বিপত্তারিনী মা—এমার্জেন্সীকে ডাকে। বলে, মা—এমার্জেন্সী। বাঁচাও মা। তুমার নামে পাঁঠা দিবু।

যেহেতু লস্কর দেবাশ্রিত, শিব স্বপ্নে সৃষ্ট, যেহেতু সামন্ত—বসাই ও রিপোর্টাররা মা—এমার্জেন্সীর ব্রহ্মাস্ত্রে ঘায়েল হয়। সংবাদগুলি কোন পাবলিসিটি পেল না কেউ জানল না কি হচ্ছে। রাইটার্স থেকে 'নট টু বি পাবলিশড' নোট সহ সেন্সারের খাঁচা এল।

যাঁরা এম ডবলু এর সফল রূপায়ণ চেয়েছেন, সামন্ত সেই মুষ্টিমেয় অফিসারদের একজন। এম ডবলু ব্যাপারটিকে প্রয়োজনীয় পাবলিসিটি দিতে হবে এই "ও কে" তিনি ওপর থেকে পেয়েছিলেন বলেই এগিয়ে ছিলেন। পাকা অফিসার তিনি, চালে ভুল করেন না।

তার পরেও সেন্সারের এ হেন আচরণ দেখে তাঁর মেজাজ খচে যায় এবং তিনি ব্যাপারটি নিয়ে ছুটো-ছুটি করতে থাকেন। তখন ওপরওয়ালা তাঁকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই যে লড়াই বলছেন যাকে, সেটা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের খেতমজুর খতিয়ানের রেশিওতে পড়ে না। প্রতোক বেলটে জোতদার যা দিচ্ছে, খেতমজুর তাই নিচ্ছে। ও দেখুন গে পার্সেন্টাল ফিউড হয়তো, পাড়াগাঁর ব্যাপার। আশপাশের ব্লকে লড়াই হচ্ছে না কেন? দেখুন, দেখুন, আউটকাম কি হয়। বেশ। কথা রইল। আউটকাম ভাল হলে পাবলিসিটি দিয়ে ফাটিয়ে দেব। এখন এই ব্যাপারটাকে হাইলাইট করাতে অসুবিধে আছে।

সামন্ত সবই বোঝেন ও চলে আসেন নিজ কামরায়। "অসুবিধে আছে"—নিশ্চয় আনঅফিসিয়াল অফিসারদের ওপর প্রেসার আনছে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী অথবা কোন যুবরাজ "এম-ডবলু, এর জন্য লড়াই চলছে" খবরটি তাদের পক্ষে অশুভ।

বহু জায়গায় হচ্ছে না লড়াই, এক জায়গায় হচ্ছে বলেই তো সেটি সংবাদ। সামন্ত তাঁর চেনাজানা সাংবাদিককে বলেন, সেন্সর পাশ না করা খবর ছাপেন কি করে?

ঘুরিয়ে লিখে দিই।

তাই করুন।

তাই করা হয়। ফলে ধর্মঘট চলবার সপ্তম—অষ্টম দিনে কাগজের কোণে-কোণে, নিচের দিকে সংক্ষিপ্ত সমাচারে খবরটি বেরোয় ও সকলের চোখ এড়িয়ে যায়। এই খবর "অ্যাট অল" বেরোবার ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেন না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীর কাছে দৌড়ে যান।

সরকারের গাড়ি চড়লেও সমস্ত ফিরতি পথের খরচ দেন। এহেনউগ্র সৎ অফিসারের ছল ধরা কঠিন হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে অন্যান্য এম ডবলু আই রা সাহায্যার্থে আসে। তাদের চাকরি গ্রামের ব্লকে এবং তারা থাকে কলকাতার, মন্ত্রীর বারান্দায়। তারা বলে, ওঁর কাছে না যেয়ে আমরা সরাসরি এখেনে আসি বলে উনি খচাখচি করেছিল।

ক'জন প্রসাদপুষ্ট মাকড়ার এই মন্তব্যই এক প্রবীণ, সৎ, কর্মনিষ্ঠ অফিসারকে ল্যাং দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয় ও ল্যাং দেবার আয়োজন ইলাবোরেটলি চলতে থাকে।

ন'দিন ধর্মঘট চলতেই লস্করের অবস্থা কাহিল হয়। ধান না কাটলে আর নয়। সে লখিন্দকে বলে, নিস্‌পেক্টরের কাছে যা, বল্‌গা আমি কথা কতে রাজী আছু।

সুবোধ এ কথাতে খুশী হয়। বসাইয়ের ওপর খেতমজুরদের বিশ্বাস অগেল। তাই তারা দাঁতে দাঁত টিপে ধর্মঘট চালাচ্ছে। ইউনিয়ান বাবুরা এ সময়ে চাল খেসারির পাতলা খিচুড়ির জোগাড় করে সাহায্য করেছে। কিন্তু বসাইও বোঝে এ ভাবে বেশিদিন চলে না।

লখিন্দ বসাইকে বলে, ইবার মিটমাট করে লাও হে। উ লরম পড়াছে।

সুবোধও বলে, দেখুন, দিস ইজ গুড। লস্করই মিটমাটের পথে এগোচ্ছে।

গ্রামের তেঁতুল গাছতলায় তিন পক্ষের মিটিং হয়। লস্কর—কে এম ইউনিয়ান কর্মীরা ও বসাই—সুবোধ।

বসাই বলে, তুমি মোরে বিন্দাবন দিশাতে চেয়েছিলে লস্কর। আমি বলেছিলু তুমারে আমি মথুরা দিশাব। ধান লষ্ট কার হছু?

বসাই, কাজের কথা বলা কর।

সুবোধ বলে, আপনি এদের দাবিদাওয়ার কথা জানেন।

ওরাই ধান কাটবে—এক নম্বর।

বাইরের দাওয়াল আসবে না—দু'নম্বর।

আটষট্টি আর চুয়াত্তরের রেট পুরিয়ে দেবেন—তিন নম্বর।

এবারকার মজুরী দেবেন, লেবার ডিপার্টমেন্টের নোটিফিকেশানে এপ্রিল ১৯৭৬ -র ডিকলেয়ার্ড রেটে।—চার নম্বর।

মুখের হিসাব। জাবদা খাতার হিসাব নয়। সরকারী নির্দেশ মতে যে রেজিস্টার, তাই দেখাতে হবে। পাঁচ নম্বর।

এই পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান বলুন?

লস্কর বসে, কি বলবু? সরকার বাঁশ দিলু। আপনারা আইন দিশাছু। ভাল, ঠিক কথা। কিন্তু কুন্ অ জোতদার দিছে না, আমি দিবু কেনা? সি সকল ব্লকে এম ডবলু আই নাই, না খেতমজুর নাই?

অন্য লোক বেআইনী কাজ করলে আপনি ও করবেন? আপনার যা বলার আছে বলুন।

ইউনিয়নের কমল ঘোড়ুই বলে, এটা খুব দরকারী ডিসশান। এ ব্লকের রেজাল্ট দেখার জন্যেও আশপাশের কম করে চারটে ব্লকে আনডিকলেয়ার্ড ধর্মঘট চলছে।

লস্কর বলে, সর পারব নাই। একটা মাঝপথে আসেন।

বসাই বলে, কুন্‌টা পারবা না, লস্কর বাবু।

আলোচনা সত্বর তর্ক ও ঝগড়ায় পৌঁছয়। অবশেষে সুবোধ ও ইউনিয়ান বাবুদের মধ্যস্থতায় লাভ হয় না ও লস্কর রেগে উঠে চলে যায়।

দু'দিন বাদে আবার বৈঠক বসে। এবার কেন লস্কর নরম হয় বোঝা যায় না প্রথমে। পরে বোঝা যায় পাকা ধান খাচ্ছে দেখে ভোররাতে সে কেঁদে ফেলে ও সরোষে বলে, যাঃ, আজই ফয়সলা সারবু।

সুবোধও বসাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নরম করে। এবার কাগজে লেখে শর্ত হয়।

বাইরের দাওয়াল আসবে না।

এরাই ধান কাটবে।

আটষট্টি ও চুয়াত্তরের রেট হিসাবে যা হবে, তার অর্ধেক হাতে নিয়ে তবে এরা ধান কাটবে। অর্ধেক পরের মৌসুমে দেওয়া হবে। এবার ছিয়াত্তরের রেটে এরা মজুরী পাবে। হিসাবটি বসাই লস্কর সুবোধ এক সঙ্গে তৈরি করবে।

খণ মকুবি আইন হবে।

কাগজে সই করে সুবোধ, লস্কর বসাই, ইউনিয়ন বাবু। সুবোধ বলে, কালই আপনি টাকা দিন, কাজ শুরু হোক।

লস্কর বলে, সি পরশুর আগে হচ্ছে না। কাল বেংক হথে টাকা লিসব, তবে তো।

লস্কর বাড়ি চলে যায়। সুবোধের মনে খুবই আনন্দ হয়। সে বলে, যাক? হল তবে, আঁ্যা যান, আনন্দ করুন আপনারা।

ইউনিয়ন বাবুরাও আনন্দিত হয় এবং কমল ঘোড়ুই ভুলে যায় তাদের ইউনিয়ন কত দুর্বল ও ছোট। ও বলে, দেখবে বসাই, তোমাদের এই জিতের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

বসাই খুশি হয়, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কেন যেন মন খুলে আনন্দ করতে পারে না।

সুবোধ ইউনিয়নের লোকদের সঙ্গে সদরে যায়। সদর থেকে খবর পাঠাবে সামন্তকে। বসাইকে বলে যায়, যান, আজ বিশ্রাম করুন। কাল এসে হিসাব তৈরি করব। পরশু তো টাকা পাচ্ছেন, কাজ শুরু হচ্ছে।

বসাই চিন্তাকুল মুখে বিষণ্ণ হেসে বলে, দেখেন আপনারা। উরে বিশ্বাস নাই। ক্যাও জানে না কি করবু। এমন ভাল ছেলা হয়া মেনে লিয়ে সব?

সুবোধ বলে, আমার সই থাকল, সরকার পক্ষ থেকে। কাগজও রইল আমার কাছে। অত ভাববেন না।

বাসে সদর যেতে যেতে সুবোধ কমল ঘোড়ুইকে বলে, এটা খুব অদ্ভুত। কৃষক আন্দোলন এদের বাদ দিয়ে হতে পারে?

বেশির ভাগ জমিতেই তো প্রাইভেট মালিকানা, জমিহীন খেতমজুর চাষ করে। সংগঠন নেই কেন?

কমল ঘোড়ুই প্রাজ্ঞ হেসে বলে, হবে হবে।

সদরে গিয়ে সুবোধ এই সিগনাল ডিফটরির খবর সামন্তকে পাঠায়। তারপর ক'জন সরকারী কর্মচারীর যে জয়েন্ট মেসে থাকে, সেখানে গিয়ে দুপুরে ঘুমোয়, বিকেলে সিনেমা দেখতে যায়।

পরদিন বেলা দশটার বাসে ও আসবে। কিন্তু সকালেই ওর কাছে চলে আসে একটা রোগাপানা, ভাঁড় ভাঁড় দেখতে লোক। বলে, মুড়াইলের লরি চেপা চলা আসছু বাবু। আপনি চল। সর্বনাশ হয়ে যেছু।

কি হল? তুমি কে?

আমি লাখন্দ। কুথা লুকায়ে রাখছিল এথ দাওয়াল? ভোর না হতে লস্কর খেতে ভিন গাঁয়ের দাওয়ায় ঢুকায়ে দিয়েছে। তারা ধান কাটা করে। তাথে বসাই সভারে লয়ে মাঠে নেমাছে। খুব দাংগা। লস্কর বন্দুক লয়ে যেছে।

সুবোধ তখনি থানায় ছোটে। থানা অফিসার বলেন, এস ডি ও র অর্ডার চাই।

এস ডি ও বলেন, অর্ডার নিয়ে পুলিস যাচ্ছে। আপনি যান। এম ডবলু আই এখানে কি করছেন?

সুবোধ লাখন্দকে নিয়ে গ্রামে পৌঁছয় ও যে দৃশ্য দেখে তা আশ্চর্য। মারখাওয়া খেতমজুরের ছেলে সুবোধের মনে হয় সে লিলিপুট। সামনে যা হচ্ছে তা বিশাল মাপের ঘটনা। হঠাৎ পিরামিড বা আদিনার মসজিদ বা ইলোরা দেখলে সৌধগুলির বিশালত্ব যেমন চমক লাগায়, সুবোধ সেই চমকই খায়। তফাৎ হচ্ছে, ওর সামনে কোন মৃত বিশাল সৌধ নেই, কয়েকটি মানুষ লড়ছে। বসাইরা অতিকায় দৈত্য, বিশাল হিংস্র শক্তির সঙ্গে লড়ছে। এ লড়ায়ের ছাব আকাশের ক্যানভাসে অক্ষয় রক্ত এঁকে সকল মানুষকে চিরকাল দেখতে বাধ্য করা উচিত।

ধানখেতে কালো কালো মানুষ। এদের দুইশো, ওদের বারশো। কাস্তেতে হেঁসোতে লড়াই হচ্ছে। লাঠি উঠছে নামছে। লস্কর মাচাঙে দাঁড়িয়ে, হাতে বন্দুক। সে গর্জাচ্ছে, বেরা শালো সান্‌তাল আমার খেত হতে। নয়তো বন্দুক মেরে দিব।

সুবোধ ছুটে যায়, সঙ্গে লখিন্দ। সুবোধ বলে, লস্করবাবু, কি করছেন?

হটকে যাও তুমি।

নেমে আসুন।

উ সান্‌তালরে আমি দেখে লিব। হা রে ভজন। তুমরা লাঠি মেরা মাগীদের খেদা করাও।

লস্কর অশ্রাব্য গাল পেড়ে বলে, তুমার এম, ডবলুর আম——! হটকে যাও।

এ সময়ে লখিন্দ হঠাৎ নকুলে বুদ্ধি খুঁজে পায়। বন্দুক দেখে তার বুকে কাঁপ ধরে যায় তবু সে মাচাঙের নিচে ঢুকে গিয়ে লস্করের ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়ে। টাল সামলাতে গিয়ে লস্করের বন্দুক আগে পড়ে। তারপর পড়ে লস্কর।

সুবোধ বন্দুকটি তুলে লস্কর নেয়। মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায় ও ভীষণ বর্বর ক্রোধে লখিন্দকে বলে, তু? তু যেয়ো উ শালো মুচির ছেলারে আনছু? অাঁ? লখিন্দকে ও লাথি মারে।

সুবোধ ওর বাপ-পিতামহ হয়ে যায়, অতিকায়, সামনে ত্রিমোহন মাইতি। ও লস্করকে কানের ওপর চড় মারে। লস্কর ও সুবোধ সামনাসামনি। লস্কর বন্দুকের দিকে ঝাঁপ দেয়। এ সময়ে পুলিসের জীপ এসে না পড়লে কি হত বলা যায় না।

পুলিস, পুলিস। পাকা ধান, দাওয়াল, খেতমজুর পুলিস। পুলিস হাঙ্গামা থামাতে শূন্যে গুলি ছোড়ে ধানক্ষেতে নেমে পড়ে।

দাওয়াল, ক্ষেতমজুর, সবাই ক্রমে ধানখেত থেকে বেরোয়। পুলিসের সজ্জ রণজিত পাত্রকে দেখে সুবোধ হালে পানি পায়। লস্কর আফসারকে দেখে চোখ ঘোঁচ করে ও লাখন্দ পাঁজরের লাথি ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে। সাঙাৎ দারোগা আসে নাই। পুরানা দুশমন আসছু, তাথে লস্কর বাবু ডর গেইল।

আফসার লস্করের বাড়িতে বসার আহ্বান উপেক্ষা করেন। বেআইনী বন্দুকটি নিয়ে গেল। লখিন্দ বলে। ই বন্দুকটো মাগ। বড়া বন্দুকটো, মাগের ভাতারটো ধরে আছু।

আফসার সে কথা শোনেন না। কাটা কাটা গলায় বলেন।

এম, ডব্লু, আই, কে?

আমি।

মারামার করছিলেন?

উনি আমাকে "মুচি" বলে গাল দিয়ে এই লখিন্দকে লাথি মারেন। আমার অপরাধ, ওঁর বন্দুক ছিটকে পড়েছিল, তুলে নিই, ওঁকে দিইনি।

এগ্রিমেন্ট পেপার কোথায়?

এ কথা শুনে সুবোধ বোঝে, কাগজের কথা সামন্ত জানিয়ে থাকবেন।

সে বলে, আমার কাছে।

দেখি।

সদরে মেসে আসে।

কি কথা হয়েছে?

সুবোধ সব বলে।

অফিসার বলেন, আজ ধানকাটা হবে না। পুলিস থাকবে।

কাল পুলিস দাঁড় করিয়ে রেখে ধান কাটা হবে।

আপনি সদরে চলুন। এগ্রিমেন্ট দেখব।

বসাই এগিয়ে আসে। সুবোধকে বলে। ঐ কারণেই আমি কাল আনন্দ করি নাই। দেখছু, দাওয়ায় লিয়েছে।

চরের বাথানে বসত করাছে, ভাত-জল দিছে, টাকা টাকা দিন মজুরী স্বীকার যেছে।

তুমি কে?

লস্কর চাপা গর্জনে বলে, পালের গোদা বসাই টুরা।

সান্‌তালের কারা।

চুপ যাও হে বেজথা। তুমার জন্মের বেত্তান্ত সভে জানে।

আমি সান্‌তাল, তবে বাপের ইতে জন্ম।

লস্কর এতে গর্জে ওঠে ও তাকে এবং বসাইকে চমকে দিয়ে বেঁটে অফিসার কামান গর্জনে জলস্থল কাঁপিয়ে বলেন, স্টপ।

গ্রাম, ধানখেত, নদী, মানুষ শুমরে থাকে। অফিসার সুবোধকে নিয়ে সদরে ফেরেন। এগ্রিমেন্ট দেখে বলেন, এ যে রূপকথা। স——ব মেনে নিয়েছে?

কাল পুলিস পিকেটে ধান কাটাবেন?

ইচ্ছে আছে। এরপর আসছে জেলা অথরিটি। লস্করের কলকাতার খুঁটো মুভ করলে কি হবে জানি না।

এস, পি, ঢুকবে, আমি বেরুব।

কাল আসুন।

আপনি ফিরবেন?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকছেন?

মুড়াইলে।

দাঁড়ান, আপনার স্টেটমেন্টটা নিয়ে নিই।

সুবোধ স্টেটমেন্ট দেয়।

পরদিন, এবং তার পরদিন, দু'দিন পুলিস-পিকেটে ধান কাটা হয়। অফিসারের কথায়, লস্কর টাকা দেবার কথা স্বীকার করে।

দু' দিন বাদে পুলিস পিকেট তুলে নেওয়া হয়। আমদানী দাওয়ালরা ফিরে যায় চরের বাথানে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ বসাইয়ের কাছে আসে ও বলে। তুমরা কাট, মোরাও কাটি। মোরা টাকা টাকাই লিব। মোদের ঘর বীরভূম হে। সত্তর সাল হতে পুলুসের জুলুমে গাঁ ছাড়া। জিলা-জিলায় ঘুরি।

দেখা যাবে। ধান কাটলেই ত কাজ ফুরায় না।

মোরা বিবাদ চাই না।

তুমরা চাও না, মোরা চাই না, লস্কর চায়।

পুলিস চলে যায়। টেলিগ্রাফিক মেসেজ ছোটাছুটি করে—"টাইমলি ইনটারভেনশন অফ পি ও ব্রিংস্ সিচুয়েশন আন্‌ডার কনট্রোল।"

"পিসফুল হার্ভেস্টিং গোইং অন।"

গোপন মেসেজ :—

"এম, ডব্লু, আই, ওপন্‌লি সাইডিং উইথ কে, এম্‌স।"

উত্তরে নির্দেশ :—

"কীপ এ ট্যাগ অন হিম।"

গোপন মেসেজ :—

"বসাই টুরা লীডার অফ দ্য এজিটেটর্স।"

উত্তরে নির্দেশ :—

"অ্যারেস্ট হিম আন্‌ডার মিসা অ্যাট দি ফার্স্ট চান্‌স"।

ধান কাটা হয়ে যায় কবে যেন। খেতে মাঠে পড়ে থাকে খড়। হৈমন্তি প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয় চরাচরে। গরুর গলায় ঘণ্টা বাজে।

কিন্তু আকাশ অগ্নিগর্ভ, বাতাস, পরিবেশ। স্ত্রীকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে লস্কর স্বামীকে নিয়ে সযত্নে নখ পরিষ্কার করে।

তারপর এস, পি, রঙ্গমঞ্চে ঢোকেন। অফিসার সহাস্য মুখে মঞ্চ ত্যাগ করেন। পুলিস পাহারায় ধান কাটাবার জন্য কলকাতায় তলব পান। কলকাতা গিয়ে তিনি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পড়েন। যারা স্কোয়াডে থাকে তারা এত ক্ষমতাশালী যে তিনি বিনাপ্রতিবাদে চার্জশীট মেনে নেন।

এবার লস্কর বোঝে অরায় বরাভয় ও আশ্বাস। "জয় মা—এমার্জেন্সী" বলে সে বাথানের দাওয়ালদের খবর দেয়। যে রাতে ও বাথানে খবর পাঠায়, সে রাতে বসাইয়ের বাড়িতে ডিম্‌ডিম্ করে মাদল বাজে ও শীত সপরাত আগুন ঘিরে বসে সাঁওতালরা একটানা সুরে গান গায়। দূর হতে সে গান বিলাপের মত লাগে। ওদের গানের সুরে বৈচিত্র্য নেই। লস্কর মদনকে বলল, লখিন্দ কুথা ?

পলাছে।

কুথা পলাবে ? নিমখারামি করা পলাবে কুথা ? যাবি কুথা তু লখিন্দ ?

লখিন্দ তখন মালসার আগুনে হাত তাপাতে তাপাতে তিনটে রিভিশনের এম ভবলু, নিচ্ছিল। চালে খড়, দাওয়ায় মাটি দিচ্ছিল, ছেলেমেয়েকে সদরে সার্কাস দেখাচ্ছিল।

গয়েশ্বরীর রুপোলি বালি পেরিয়ে দাওয়ালরা আসছিল। তারা বড়ই দুঃখী ও কানকাটা। যেখানে যায়,

মুনাফার পাহাড় যে ভাই আমি-ই গড়ি.....।

চিত্র : দীপক ভট্টাচার্য

সেখানেই তারা বাঁধা খেতমজুরের অন্নে ভাগ বসায়। তারজন্য মারপিট দাংগাহাংগামা হয়। সে ওদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

সে রাতেই সদর থেকে তিনটি জীপ এল।

॥ পাঁচ ॥

তিনটি জীপ চড়ে যারা এসেছিল। তারা লস্করের ভাগ্নীজামাইয়ের দলের লোক। বর্তমানে তাদের হাতে টাকা, নামে ছাপ, জীপ চড়ে তারা সদরকে ত্রাসিত করে রাখে। এরাই যুবশক্তি এবং আধমরাদের ঘা মেরে ফিনিশ করাই এদের দেশপ্রেম, মাতৃসেবা। মা যা হইয়াছেন, তাতে এই সব লেফটেনাণ্ট ছাড়া ফিল্‌ডে অপারেশন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা এসেছিল, লস্করের বাড়ি উঠেছিল। লস্করকে বলেছিল সালো, পাঁট আর পাঁঠা রেখ্যে তুমি ফুটকে যাও। মোরা মহড়া লিয়ে লিব।

ভোররাতে লখিন্দ মাঠে বসতে বেরোয় এবং লস্করের গোলাবাড়ির সামনে আগুন ঘিরে শত শত দাওয়ালকে বসে থাকতে দেখে ছুটে যায় বসাইয়ের বাড়ি।

ভোর হতে না হতে বসাই মুড়াইলে চলে যায় ও সুবোধকে খবর দিয়ে চলে আসে।

সুবোধ আসতে না আসতে লস্করের গোলাবাড়ির সামনে গ্রাম দুটির খেতমজুররা জমায়েত হয়ে জিগির তোলে। ধানের পাহাড় তারা ঘিরে থাকে।

বাহারের দাওয়াল হটাও।

হিসাবে এম, ডবলু দাও।

ঘনঘন জিগির ওঠে। সুবোধ আসতে আসতে বসাইকে বলে, আপনি বাস্ পাবেন না। সাইকেলে সদরে যান। চার মাইল মোটে। অফিসারকে বলুন।

আমি হেথা হতে যাবক্ নাই।

সুবোধের হাঁকাহাঁকিতে লস্কর বেরোয় ও লাল চোখে বলে, কি হছু?

আপনি আবার এদের এনেছেন কেন?

কাম নাই?

এগ্রিমেণ্ট পড়ুন।

এগ্রিমেণ্ট তুমি পড়। এগ্রিমেণ্ট আছে ইরা ধান কাঠবু, তা কেটাছে ধান। ধান চ্যাড়া দিবে, পালা দিবে, ধান সারবে ই কথা লিখা আছু?

বসাই তখন দেখে লস্করের ধান লস্করের গোলায় তুলতে তাদের দেবে না কেউ। সে বলে, উরাদের দিয়া ধান চ্যাড়াবা, পালা দিবা, ধান সারবা?

দিবনা মোরা, মে.দের হক।

ছুটে চলে যায় বসাই। চেঁচাতে চেঁচাতে যায়, এস হে তুমরা। লস্কর দাওয়াল উঠাল্‌ছু গোলাবাড়ি। এস হে তুমরা। লাঠি লয়ে বারাও, মারা কর দাওয়ালদিগে। ইবার হক ছাড়লে আর পাবা না। এস হে……।

আর্ত ও বিপন্ন তার কণ্ঠ। খেতমজুররা লাঠি নিয়ে ছুটে আসে ও দাওয়ালদের মারতে থাকে। মোদের হক কেড়া লিবু? মোদের হক? টাকা-টাকা রুজী লিয়ে মেয়েদের এম, ডবলু, মারবু?

দাওয়ালরা চীৎকার করে ছড়িয়ে পড়ে, পালায়। কেউ কেউ ফিরে মারে। গ্রামের মেয়েরা চীৎকার করে ছুটে আসে যে যা পায় হাতে নিয়ে। দাওয়াল মেয়েরা কাঁদে। ঠেলাঠেলিতে পোহাবার আগুন পাঁজায় ধান পড়তে থাকে। জ্বলে ওঠে। ক্রোধ ও অবিচারে উন্মত্ত বসাই বলে, জ্বলে যাক সব। বলে জ্বলন্ত ধানগাছের গোছা ধানগাদায় ছুঁড়ে মারে। ধোঁয়া, হিমভেজা গাদায় ধোঁয়া আগুন।

লখিন্দ বলে, জ্বালায়ে দিব সব। বলাছ জ্বলে যাক, জ্বালাব হে বসাই। এখন লস্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে পনেরটি যুবক। তাদের হাতে, সুবোধ সভয়ে দেখে, বন্দুক তিনটি, ছোরা, গুপ্তি।

লখিন্দকে তারা প্রথমে গুলি করে ও ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঝাঁকিয়ে জ্বলন্ত ধানের মধ্যে ফেলে। তারপর আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও নির্মমতায় খেতমজুরদের মধ্যে নেমে পড়ে। বসাই চেঁচায়, শালো গুণ্ডা লিয়সছে রি। এবং সুবোধ দেখে বসাই ছুটে আসতে আসতে দু'হাত চিতিয়ে টাল খাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, পড়ে গেল, বসাইয়ের ছেলের আতঙ্কিত মুখ, মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে সুবোধ শোনে লস্কর চেঁচাচ্ছে, শেষ কর উর জাহান্। সান্‌তালের ক্যারা।

কেউ খবর দেয়নি। অদৃশ্য টেলিপ্যাথিতে পুলিস এসেছিল। বসাই ও লখিন্দের লাশ নিয়ে যে ভ্যান যায় তাতেই সুবোধকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিস মোতায়েন থেকে দাওয়াল দের নির্ভয়ে কাজ করতে দেয়। গ্রাম দুটিকে নকড়া ছকড়া করে, ফলে বহু খেতমজুর গ্রাম ছেড়ে পালায়।

সুবোধের কোন স্টেটমেণ্টই এবার গ্রাহ্য হয় না। এবং কলকাতায় ফোন করতে চেয়ে সে শোনে। সামন্ত মৎস্য বিভাগে চলে গেছেন।

সুবোধের সাস্‌পেনশন ও চার্জশীট হয়।

লখিন্দ ও বসাইয়ের ঘর, ছিচরণের ও নিতাইয়ের ঘর, সোমাইদের মাঝিপাড়া এখন বিজুবন।

লস্কর এখন বছরে তিনটে ফসল তোলে। সে আউশ ও আমনের ওপর বোরো ধানও পাচ্ছে। এবার সে তিনটি চাষই দাওয়াল দিয়ে করাবে, টাকা টাকা রোজ।

সোনাল ও গয়েশ্বরীর খেতমজুররা গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছে।

লস্কর সদরের পুলিস ক্লাবে দশ হাজার টাকা দিয়েছে।

পানশালায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়

...দিনটা শুরু হয়েছিল তেমন ভাবেই, প্রতিদিনের মত। বাইরে বেরোতে তাড়া নেই, তাগিদ আছে—কিসের, কপাল না পেট—অতশত জানা নেই। উৎসাহ কম, ক্লান্তিও লাগে না; যেমন পেটের ধান্দায় বেরোয় আর দশটা লোক।

দিনটাত শুরু হয়েছিল তেমন ভাবেই যেমনটি রোজ হয়। কোন অলুক্ষণে মুখ দেখে ঘুম ভাঙেনি তুলসীর। চোখ খুলেই তাকায়নি কোন আঁটকুড়ো, অপয়া বা বাটপায়ের মুখের দিকে। অনেকেই মানতে চায় না, তুলসীর বিশ্বাস শালাদের মুখ দেখলে দিনটাই মাটি। কিন্তু তাওত হয়নি। সংসারে নিজেরই বউ ছেলেমেয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি, তারপর কোন এক অজানার উদ্দেশে নমস্কার লাগিয়ে, গাড়িটি নিয়ে যেমন বেরোয় তেমন। দিনটাত শুরু হয়েছিল তেমন ভাবেই; মেঘবৃষ্টি কিছু নেই, একেবারে নির্জলা খটখটে আকাশ, ফণফণিয়ে সূর্য উঠছে, বাতাসও তাত না ধরা। দু'চার-ট্রিপের আগে আর গলগলিয়ে ঘাম বেরোবার আশংকা নেই।

দিনটাত শুরু হয়েছিল...। বাড়ি থেকে, একই প্রতিদিনের মত, চামড়া-ওঠা খোয়া পাথরের বিপজ্জনক রাস্তা, রিক্সর প্যাক-প্যাক, নাচতে থাকা ঘটাং ঘটাং শব্দ স্টেশনে স্ট্যাণ্ডের কাছে বেন্দা ঘোষের চায়ের দোকান। প্রতিদিনের মত উনুনে আঁচ পড়েছিল ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা মেপেই। ব্যাটা বেন্দা তার কাল, কুৎসিৎ চেহারাটা নিয়ে তখনই দোকানের ছোকড়াটাকে হাঁক দিচ্ছিল বাজার থেকে ঘুঘনি আর আলুর দমের মাল মসলা আনতে। ঐ একই ভাবে প্রতিদিনের মত, রিক্স মালিক ললিত—জ্বালার মত পেট নিয়ে ললিত পাত্র—ধূপধুনো, জলের ছিট দিয়ে তার সোনা রূপোর দোকানটা খুলে ঠিক বাজ পাখীর মত খপিস চোখে তাকিয়েছিল স্ট্যাণ্ডটার দিকে। এ ছাড়াও মফস্বল স্টেশনটার জনজীবন শুরু হয়েছিল তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও ব্যস্ততা নিয়েই; কেবল একটু তফাত আজ ছিল ছুটির দিন।...

ভাবতে ভাবতেই দু'বারের পর ঠক করে দাওয়ায় গ্লাসটা রেখে তুলসী আওয়াজ করল, 'আর এক গেলাস দে পঞ্চা। শালা, কি তিন নম্বরী মাল। কিছুই হচ্ছে না আমার?' একটা ঠাণ্ডা আলুর বড়া কামড়ে নিল খানিকটা। সমস্ত বাড়িটা প্রায়ান্ধকার, শুধু দাওয়ায় সামান্য লম্ফের আলো পড়েছে তুলসীর ঘাম তেল মুখে। চোখ জোড়া ঘোর ঘোলাটে। বাঁশের খুটিতে ঠেস দিয়ে দু' হাঁটু ভাঁজ করে সে বসেছিল। মাথায় দু' চারগাছ কেদোর মত চুল; কপালে গজের ব্যাণ্ডেজ—জল-রক্তের কালচে ছাপ। ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জিটা ঘামে দেহে লেপটে আছে। উঠোনের ওপাশে অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তার রিক্সটা।

দু'দুবার ডাকার পর, কোত্থেকে পঞ্চার বউ এসে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'কৈ, দাও।'

'আঃ, পালিয়ে যা ছিস? দু গেলাসের দাম'ত দিলাম। টেনে নি।'

'দেবে তো দাও। শিকল লাগিয়ে দোকান হাট করতে যাব।'

পঞ্চার বউ-এর কথার ঝাঁঝে ভাঁজ করা নেতান একটা টাকা দিতেই, তবে ঘর থেকে জিনিস আসে। শাড়ির ভাঁজ থেকে গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ নজর যেতে বলল, 'মরণ। এটা কি জন্য?'

'নবার জন্য। শালাকে আজ এমন দেবনা!' বলেই লাঠির টুকরোটা সযত্নে কোলের কাছে টেনে আনল। মাথার ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে পঞ্চার বউ বলে, 'দিয়েছে বুঝি কয়েক ঘা? বুড়ো বয়সে ছোকড়াদের পিছনে কাঠি দাও কেন?' দুমদাম পা ফেলে উত্তরের অপেক্ষায় আর সময় ব্যয় করল না। নির্জন দাওয়ায় তুলসী তুলে দিল গ্লাসটা।

পানশালাটা আজ সন্ধ্যা থেকেই ফাঁকা। হৈ হট্টগোল নেই, তুলসীই একমাত্র নিঃসঙ্গ খদ্দের। পঞ্চা বাড়ির পেছনের ডোবাটার কাছে শুয়োরের খাবার মাখছিল। আক্ষরিক অর্থে পানশালা বলা যায়না এটাকে। গেরস্থ বাড়ি, পঞ্চা তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে। জাতে সে ওড়াও। হাঁড়িয়া বা তাড়ি বানান, পান করা এদের পক্ষে আইনবিরুদ্ধ নয়। সেই সুযোগে পঞ্চা বেশ কয়েক বছর থেকেই গোপনে চোলাই বেচতে শুরু করেছিল তলে তলে। এ সব অর্ধ আকালের দিনে এক কিলো চালের দাম যখন এত মাগ্গা, হাঁড়িয়া কোন ঘরেই বা বানায়, কে খায়। পঞ্চা তাই বাঁকা পথটা

বেছে নিয়েছিল। বেশিদিন চাপা থাকেনি খবরটা, দিনে দিনে ফেঁপে ফুলে উঠতে, আবগারীর লোক হানা দিয়েছে কিন্তু পঞ্চা পালায়নি। প্রথম প্রথম উপজাতী বলে আইনের ফাঁক খুজলেও, পাকা ব্যবসায়ী-বুদ্ধিতে বুঝেছে মাসোহারা বন্দোবস্ত ছাড়া এ লাইন লাভজনক নয়। পাড়ার কিছু কিছু লোক ছি ছি করেছে, নালিশ দরখাস্ত দিতেও বাদ রাখেনি কিন্তু পঞ্চাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষের লোকও কম নয়।

তবে সম্মানীয় কোন খদ্দের আসেনা এখানে, গোপন ইচ্ছে থাকলেও লোক-লজ্জাটাই প্রধান। ঢোকে নিতান্ত তুচ্ছ, মামুলি লোকেরা, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান কোন নাপিত, লাইনের রিক্সা ওয়ালা, ভদ্র সমাজে ব্রাত্য বেকার যুবক, সূতাকলের দু'চারটে মজুর, এ ছাড়া চোরা গুণ্ডারা আছে। প্রতি দিন সন্ধ্যায় পঞ্চার দাওয়া সরগরম। শুধু বাড়িটাকে মাটির দেয়াল ঘিরে এমন আবডাল করে নিয়েছে, পথ চলতি পথিকের কানে হট্টগোল পৌঁছলেও, সহসা চিহ্নিত করতে পারবেনা কেউ।

একটু একটু করে গ্লাসটা পুরো উল্টে দিয়ে, দেওয়ার খুঁটে ঠোঁট পুছল তুলসী। শালা, তিন তিনটে টাকা ফোকা হল, এখন দেখা যাক। লাঠিটা আরও কাছে টেনে মাথার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল খুঁটির গায়ে। ঘোলাটে চোখজোড়া আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে, বুকটা জ্বলছে, তবুও বিড় বিড় করল, 'শালা, তিন নম্বরী চালাচ্ছ পঞ্চা।'

...ছুটির দিনটা ছিল, মামুলি ছুটির দিনের মতই। গাড়ির লাইন গিয়ে ঠেকেছিল সেই কারখানার শেড্‌টার গায়ে। একটা ট্রিপ মারলে ফের আধঘণ্টার আগে কোন সুযোগ নেই। আর ঠিক তখনই যেন বেন্দার উনুনে ডেক্সিভরা ঘুঘনি আলুরদমের গন্ধ নাকে আসে। ওর হাতে যেন মন্তর। আদা লঙ্কা রসুন থেঁথলে মাংসের চাঁট, চটি, ছাই ভস্ম ঢেলে ফুটিয়ে তুললেই সারা চত্বরটার লোক টের পায়। যেন বাঁশি বাজালেই হল। তুলসীই আজ সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চার চারটে প্লেট চেঁটেপুটে শেষ করেছিল।

ছুটির দিনটা ছিল মামুলি ছুটির দিনের মতই। বেন্দার দোকানেই বসুক, কি গাছের ছায়ায় পোড়া কয়লায় ঘর কেটে বাঘবন্দী খেলুক, সব ক'টা ড্রাইভারের তীক্ষ্ণ চোখ থাকে কিন্তু গাড়ির লাইনের দিকে। একটু বেসামাল হলেই লাইন চুরি। আচম্বিতে পিছনের একটা রিক্স হিঁচড়ে ঢুকে যাবে সামনে। তখন পড়ে থাকে প্লেটে কামড়ান আলুর টুকরো, লণ্ডভণ্ড বাঘবন্দীর ঘুটি, লুঙ্গি মাথায় ভুলে 'হারে রে—রে' যে যায় রিক্স সামলাতে ব্যস্ত। তুলসীও নিজেরটা সামলে গাল পাড়ে, 'শালা গুয়োর ব্যাটারা।' এ খেলায় প্রতিদিন বেন্দা তাল দেয়, অন্যান্যরা মজা দেখে। ললিত কখন সখন মিটিমিটি হাসে, আর ছোট্ট একটা খাতায় অঙ্ক কষতেই থাকে—গাড়ি জমার টাকা আর সুদের হিসাব। বড় শান্ত নিরীহ মানুষটি। ধপধপে গায়ের চামড়া পরিপাটি পিছন আঁচড়ান চুল, মৃদু গলার আওয়াজ। বিকেল থেকেই শান্ত স্বরে ডাক দিয়ে দিয়ে সুদের টাকা, গাড়ির জমা দিয়ে আসতে বলে। কারও সঙ্গে অহেতুক কথা বলে না। বড় ভয় করে সবাই, কেন কে জানে। লাইনের খান তিরিশের ড্রাইভার সন্ধ্যায় সুড় সুড় করে সোনা রূপোর দোকানটায় যাতায়াত করে। কিছু আবার আছে বেন্দার কাছে বাঁধা।

এমনিভাবেই দিন আসে কেটেও যায়। সারাদিন আজ আর বাড়ির মুখো হয়নি। বেন্দার দোকানেই টুকটাক করে দিন কাটিয়েছে। অন্যান্য দিন পাড়ার পথের সওয়ারী পেলে বেলায় নামিয়ে দেয় বাড়িতে কিলো টাক চাল, কোন সুযোগে একমুঠো ডাল কিংবা কখন সখন ছিঁটে ফোঁটা আনাজ। হৈ হুল্লোড় ভুলেও যায় মাঝে মাঝে। আজ যেমন হয়েছিল।

দুপুরে এসেছিল একহাত ঘোমটায় ময়লা শাড়িতে ডেকে ভুলোর মা। দোকানের এক কোণে পাড়ার ছেলে বিশুকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ভুলোর বাপকে একটু ডেকে দিবি?

তুলসী বিরক্ত হয়। এখানেও ধাওয়া করেছে বউটা। মুখ ঝামটে বলল, 'কি কি চাই?' ঘোমটার ফাঁক থেকে চাপা উষ্মার জবাব এল, 'চাল পাঠিয়েছ? নিজের হাত কেটে উনুনে চড়াব?' তুলসীর মাথা গরম। সকাল থেকে গোটা ছয়েক টিপ দিলেও পয়সা বেরিয়ে গেছে। শয়তানের চাকায় বার দশেক প্যাডেল মারলেই, পেটে যেন কাঁচা কয়লার আগুন জ্বলে। আর বেন্দা ঘোষত' দোকান সাজিয়ে রেখেছে সেজন্যই। বউ-এর মুখের ঝাঁঝ, তেমন ভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিল তুলসী, 'তোর সে গভ্‌র্মেন্টের রত্নটা কৈ?...শালা, দেশ উদ্ধারে নেমেছে। উনি ত' বাড়ি ছাড়া, কেমন করে সংসার চলে খবর রাখে?'

'আমায় বলছ কেন? ...ও কি আর তোমার খাটনির ভাত খেতে আসে?'

'আসে না? রাত বিরেতে শেয়ালের মত হাজির হলে, তখন ত' দুটো খাওয়াতে তোর পরাণটা গলে যায়।'

রোদে তাতা, শুকনো মুখটা নিয়ে ভুলোর মা অভিমানে বাড়ির উদ্দেশে দু' পা বাড়াতেই, তুলসী ডাকে, দাঁড়া। তেজ কত। শেষে ফের ঐ ললিতের খাতায় নাম লিখিয়ে পাঁচটি টাকা এনে দিয়েছিল। 'আর ট্যাকস্ ট্যাকস্ করবি না।'

ছুটির দিনটা অন্যান্য দিনের মতই একই ভাবে আসে, চলে যায়। বাসটা ঠিক স্ট্যাণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছিল। সহিসটাকে ওরা কতদিন শাসিয়েছে, তবু ব্যাটার ভ্রূক্ষেপ নেই। ডেকে ডেকে শেষ পাসেঞ্জারটি না তুলে যেন নড়তে চায় না। শালা! তুলসীর দাঁতের পাটি হিসহিস করছিল। আবার ভুলোর নামটা মনে আসতেই নিজের ছন্নছাড়া, চাঁচের বেড়ার ঘর টুকুর কথা চিন্তায় আসে। ছেলেটার খুটিনাটি চিন্তা, অস্পষ্ট ম্লান মুখটা ভেসে আসে। আগুনে হাত ছোঁয়াতে গেছে ব্যাটা! এখন ভাবে মরলেও বুকটা জুড়োত। বুঝত ভুলো বলে এ জগতে

তার কেউ নেই। কিন্তু বেঁচে থেকেই যত রকম দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে মনটা হা হা করে উঠলেই, স্মৃতির সুঁচটা দিনরাত খুটখুট করে ব্যথা বুনে যায়। ললিতরা নিজেদের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে আলোচনা করে, তুলসী টের পায়। হঠাৎ হাজির হলেই কেমন যেন কঠিন, নীরব হয়ে যায় তারা। বেন্দা ভাল মানুষের মত মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়, 'রাত বিরেতেও ভুলো ফেরে না? কোথায় থাকে? একবার খোঁজ নাও, দিনকাল ত' ভাল নয়।' তুলসী বলে, 'গুয়োর ব্যাটার মুখ দেখতে চাই না।'

ছুটির সূর্য টাল খেয়েছিল অন্যান্য দিনের মতই। মরকুটে যজ্ঞডুমুরের গাছটায় হাওয়া খেলে, উড়ে যায় ছাই ধুলো জঞ্জাল। গজরান বাসটা আড়াল থেকে চলে যেতেই তুলসী দেখে নবা দু' নম্বরে লাগিয়ে দিয়েছে গাড়ি। ছিল একদম শেষে, ফাঁক পেয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিশ বছরের পুরনো ড্রাইভার তুলসী রক্তের রাশ টেনে রাখতে পারে না। নবার টুঁটিটা চেপে ধরতে চায়।

মাস দুয়েক আগে প্রেসিডেন্ট বাবু টাকা খেয়ে পঞ্চাশটা ড্রাইভারকে লাইনে ঢুকিয়েছিল। কথায় বলে পুরনো পাগল ভাত পায় না, নতুন পাগলের আমদানী। এমনিতেই দুশর মত ড্রাইভার। ছুটির দিন লাইন চলে যায় কারখানার শেড পর্যন্ত। দোকানদাররা চেঁচায় যার যার দোকানের মুখ থেকে সরে গাড়ি লাগাতে। কোথায় যাবে এতগুলো গাড়ি? তার উপর এই নবাদের উৎপাত। শালারা লাইন চুরি করবে, নিত্য নূতন আইন বানাবে, প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে খটাখটি লাগাবে— আবহাওয়াটাকেই বিষাক্ত করে তুলছে। কোন কিছুতেই কিছু নয়, জন্মেছেই যেন জীবনটা ফুঁকে দেয়ার জন্য। শরীরে এখন রক্তের জোরত তাই। সন্ধে হলে আর বাবুদের তেজ থাকে না। উসখুস করে আর কেমন বুঁদ হয়ে যায়।

তখন হয়ত এই বুড়ো তুলসীর পা ছুঁয়েই বলবে, 'বল না একটা নম্বর। লেগে গেলে তোমায় আদ্দেক দেব।' আর লাইন চুরির ধান্দা নেই, ফি ফের কি! রিক্স ফেলে রেখেই ছোটে লাইনের ওপাশে চাল পট্টিতে।

তুলসী ছুটে এসেছিল। নবার মুখটা রোদে তাতা, সুড়সুড় করে ঘাম বেয়ে পড়ছে কপাল, গলা, বুক নাকের ডগায়। সিটে হেলান দিয়ে মুখ শক্ত করে সে বসেছিল।

'সরে যা নবা···ফের ঢুকিয়েছিস?'

'গাড়ি ছেড়ে নবাবি মারলে লাইন থাকে না'—নবা ওর মুখের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে উত্তর দিল।

'চোখে ঠুলি গেঁথেছিলি? বাসটার আড়ালে ছিলাম না আমি?···বেন্দাই বলুক।'

নবা একই ভঙ্গিতে টিক টিক করে পা নাড়ায়, উত্তর দেয় না। তুলসীর ঘামে ভেজা কপালের রগটা মুহূর্তে কেঁচোর মত ফুলে ওঠে।

'গাড়ি সরাবি না তুই?'

'সরাব। প্যাসেঞ্জার পাই একটা।'

'প্যাসেঞ্জারের নিকুচি করেছে'— হ্যাণ্ডেলটা ধরে দুটো ঝাঁকানি দিতে সমস্ত শরীরের দড়িপাকান পেশী আর শিরাগুলো ফুলে উঠল।

'গাড়িতে হাত দিও না'—নবার ভুরু জোড়া বেঁকে গেল। তুলসীকে সে পাত্তাই দিচ্ছিল না। অসহায় ক্রোধে খানিক পিছিয়ে এসে তুলসী আর দশটা ড্রাইভার এবং বেন্দাকে সাক্ষী মানলে ওরা মজা দেখে।

'বললাম ত' প্যাসেঞ্জার পেলে লাইন ছাড়ব।' জামার কলারটা পিঠে ঠেলে দিল নবা। তুলসীর কানে কে যেন গরম কয়লা ঢালে। নেড়ি কুত্তার মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে কথায় থুথু ছিটিয়ে নবার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'গায়ের জুলুম নাকি? এটা আমার লাইন নবা। ঘাড়টা বাঁকিয়ে জবাব দিল, 'সরে যাও···ঝামেলা করো না।

'তোর মুখের কথায়?' আরও কাছে ঘেঁষে নবার কাঁধের কাছে বুকটা আনতে নবা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বলছি, সরে দাঁড়াও।' ভয়ঙ্কর ক্রোধে ঐটুকু ধাক্কাতেই তুলসীর শরীরটা বেটাল হয়ে ঘুরতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হাত তুললি?'

'বেশ করেছি।'

দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে, দু'বার মাথাটা ঝাঁকিয়ে এক লাফে বেন্দার ঝাঁপের লাঠিটা টেনে ছুটে আসতেই আশপাশের লোকেরা হা হা করে উঠল। নবা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে লাঠিটা কেড়ে উত্তেজনায় উল্টে কষিয়ে দিল এক ঘা। তুলসীর গরম টাকটা সিকি ইঞ্চি ফুটে গেল। রক্তের ব্যাপারে পাশের লোকদের সম্বিৎ ফেরে, মজা কুড়োবার ট্র্যাজেডি এমন হতে পারে ভাবতেই পারেনি। দোকানদাররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাপান্ত করল ড্রাইভারদের।

'রিক্স লাইন তুলে দেব'— বেন্দা তড়পাচ্ছে। ললিত আস্তে বেরিয়ে এসে মিষ্টিমিষ্টি গলায় বলল,

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন.....

কেশ পরিচর্য্যায়

কিংকোর আমিকা হেয়ার অয়েল

এক সার্থক ব্যতিক্রম

প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোম্পানী
(হোমিও কেমিষ্ট)
প্রাঃ লিমিটেড
পরিবেশক:
আর. ডি. এম. এণ্ড কোং
১৮৪বি, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন: ৩৪-৩৮৩৬

GRACE/KING/2/77

'হাতগুলো কেটে দাও। গাড়ি চালান বন্ধ হয়ে যাবে।' ভয়ে কারও টুঁ শব্দটি করল না। স্টেশনের নার্সিং হোমে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে তুলসী বাড়ি যায় নি। সন্ধ্যা লাগা পর্যন্ত পাঁচটা ভাড়া খেটে, শরীরটা জ্বর জ্বর লাগতে লাইন বিলিয়ে পঞ্চার বাড়ির দিকে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ললিতের গাড়ি জমা বাকি, ছুটির সন্ধ্যায় যাত্রীও মিলছিল দু চারটে, তবু তুলসী রইল না। ফিরে এসে দেখা যাবে। সযত্নে লাঠিটা নিয়ে পঞ্চার দাওয়ায় উঠেছিল সে। দিনটা শুরু হয়েছিল, শেষও হতে চলেছে। ললিতের কথা মনে নেই, ছুটির যাত্রীরা চুলোয় গেছে, পকেটের তিনটি টাকাও শেষ। নবার ব্যাপারটাও শান্ত হয়ে মস্তিষ্কের দূর বৃত্তে চলে গেছল। কেবল পঞ্চার বউ মনে করিয়ে দেয়ায় লাঠিটা সামলে রেখেছিল।...

ঠিক সংযোগ ঘটে গেল। ওপেনে পাল্টি মিলিয়ে নবা বীরের মত পঞ্চার দোর গোড়ায় প্যাঁক প্যাঁক হর্ন বাজিয়ে ডাক ছাড়ল, 'পঞ্চা ভাই। মাছি মারছ যে!' সর সর করে উঠোন পেরিয়ে, দাওয়ায় উঠতেই ভুরু কুঁচকে দূরের ঘুঁটিতে দেখল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালের নীচে এক জোড়া লালছে, চকচকে আধ বোজা চোখ ওর দিকে কুত কুত করে তাকাচ্ছে। পঞ্চাকে শুনিয়ে নবা বলল, 'শালা শুড্ডাগুলো কি পেছন ছাড়বেনা? কথাটা যেন, মনের মত হয়েছে, তুলসী টেনে টেনে বলল, 'ছাড়বে কেন? তোকে খুন করবে।'

'লে হালুয়া।' পঞ্চা গ্লাসটা সামনে রাখতে, তুলসীর দিকে তাকিয়ে নবা বলল, 'চলবে!...দাও ব্যাটাকে এক গেলাস। কেমন ছুক ছুক করছে।' থালায় পিঁয়াজ বড়াগুলো রেখে নবাও ক্রমে ক্রমে তিন গ্লাস শুষে নিল। প্রায় বেসামাল অবস্থায় দাওয়ায় দু'জনে আলাপ জমিয়েছে। পঞ্চার বউ ছোঁ মেরে লম্পটা ঘরে এনে বলল, 'তেলের পয়সা ফোকোটে আসে? বাড়ি যাও দেখি, পাট বন্ধ করব। বউটার কথা-গুলোই ছ্যাঁকা দেওয়া, পঞ্চার ঠিক উল্টো। ওরা তাই কিছু মনে করে না।।

প্রথমে অন্ধকার নিয়ে দুই বেহেডের আলোচনা চলতে চলতে তর্ক বাধল সূর্যের আকার নিয়ে; প্রসঙ্গান্তর হল জুয়োয়—কলকাতায় এখন ক'টা মটকা চলছে ইত্যাদি। তারপর ড্রাইভারদের ব্যাপার। সব শালা ফেকলু, কুত্তার-বাচ্চা। তিন চাকার গাড়ি ডাইনি। রক্ত শুষে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা চালাতে চালাতে দুই মাতাল সিদ্ধান্তে এস পুরুষের উচিৎ দিনরাত বউকে ধোলাই দেয়া।

রাতটা বাড়ছে। ঝোড়ো হাওয়া খেলছে। তুলসীর বুকের ভিতর টনটন করে। শেষে দু'জনই আস্তে আস্তে টাল সামলে ঠায় দাঁড়ানো রিক্স দুটোর কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। একটা আলু বড়ার অর্ধেক, দুটো পিঁয়াজের টুকরো, তুলসীর লাঠিখানা অন্ধকারে পানশালার দাওয়ায় এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে।

রাতটা বাড়ছে। তখনই রাস্তা থেকে কে যেন ডাকল, 'ভুলোর বাপ আছ?' 'দেখেছিস?' নবাকে সাক্ষী মেনে তুলসী বলল, 'ফের ট্যাকস্ ট্যাকস্ করতে এসেছে মাগী'। থমকে দাঁড়াতেই ঘোমটাটা সরে এসে কথা বলল, 'তোমায় খুঁজছে ঐ বাবু দুটো।'

'কোন্ বাবু?'

সামনে তাকিয়ে দেখল, পঞ্চার দেয়ালটা যেখানে শেষ হয়েছে, অন্ধকারে দুটো সাদা শার্ট। কাছে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে একজন তুলসীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি...ভুলোর বাপ?' তুলসী হাসতে হাসতে বলল, 'আজ্ঞে আপনারাও হতে পারেন।' গন্ধের ঝাঁঝে ছেলে দুটো কথাটা কানেই তুললো না। আর একটু আড়ালে, ভুলোর মাকে তফাতে রেখে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ও...ও খুন হয়ে গেছে... কাল...পুলিসের হাতে।' বাতাসে পানশালার নিমের ছায়াটা যত দুলছে, কুকুরটা চেঁচাচ্ছে অতর্কিতে, অসংলগ্ন-ভাবে। তুলসী টলতে টলতে ফের রিক্সর দিকে পা বাড়াল। একজন গলাটা বাঁড়িয়ে কি সব শ্মশানের কথা তুলতে, বিড় বিড় করে তুলসী হাত নাড়াল।

ফিরে এসে নবাকে এগিয়ে যেতে বলে বউকে তুলল গাড়িতে। ললিতের কাছে যাওয়া দরকার; একটি পয়সা হাতে নেই, খাতায় আজ আবার নাম লেখাতে হবে। অফিসযাত্রী নিয়ে দ্রুত চালাবার তাগিদ অনুভব করলেও বুঝল পা দুটো কেমন ভারি হয়ে আসছে। গাড়িতে বসে বউ একবার উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবু দুটো কি বলল? ভুলোর কোন খারাপ খবর নাত'? তুলসী বলে, 'কি জানি সব গুয়োর ব্যাটারা।' কথার যেন আর শেষ নেই, তুলসীর বুক ঠেলে উঠতে চায়। এই বেন্দা, পঞ্চা, ললিত, রিক্স স্ট্যাণ্ড, নিজের ক্ষত বিক্ষত জীবনটাকে ঘিরে অনেক কথা।

ললিতের দোকানে আজ অদ্ভুত দৃশ্য। বেন্দা, ললিতরা কয়েকজন নতুন মুখ নিয়ে কি যেন ফিস্‌ফিস্ করছে। তুলসীকে দেখে হকচকিয়ে থমকে গেল। সম্ভবত ভুলোকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজ এদের মুখগুলো কেমন শান্ত পরিষ্কার, খুশির মিহিমুখোশে ঢাকা। ললিত জমা টাকার জন্য তাগাদা দিলনা, খাতায় লিখে ধারের টাকাকটি তড়িঘড়ি তুলসীর হাতে তুলে দিল। টাকা নিতে নিতে ললিতের দিকে তাকিয়ে জীবনের প্রথম তুলসীর ভেতরটা আতঙ্ক ও ঘৃণায় হিম হয়ে গেল। চোখের কোণে দেখা দিল চিকচিকে জল।

রিক্সায় বসে বউ বলল,'...একটু জোরে চালাও।' আচমকা খুক্ খুক্ করে তুলসী হাসল, না ডুকরে কেঁদে উঠল, ঝোড়ো বাতাসে বোঝা গেলনা। সে এখন বাড়ি ফিরছে।

দিনটাত শুরু হয়েছিল.....।

শহরগুলির রাস্তার ধারে হাসপাতালের গেটটা তখন প্রায় জনহীন। একটা মাত্র ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলোয় জায়গাটা থমথমে। কচিৎ দু'একজন মানুষের আনাগোনা। কম্পাউণ্ড পার হয়ে খানিক দূরে ছাড়া-ছাড়া স্বল্প আলোয় হাসপাতালের বাড়িটা বিমর্ষ, ম্লান।

ছ'জন শববাহকের একটি দল দড়ির খাটিয়ায় সাদা কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ নিয়ে অতি নিঃশব্দে হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরিয়ে দ্রুত হারিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে। যেন সমস্ত দলটাকেই গ্রাস করে নিল মৃত্যুর মতো অমোঘ শব্দহীন অন্ধকার। তারপর হঠাৎ সেই অন্ধকার ফালা ফালা করে ভুতুড়ে ধ্বনি উঠল বল হরি হরিবোল।

আর তখনই কুঁইকুঁই করে কুকুর বাচ্চার ডাকের মতো কান্নার শব্দটা আবার শোনা গেল। কাঁদছিল সুরতিয়া। কাঁদছে সেই দুপুর থেকেই। প্রথমে তীক্ষ্ণ চিৎকারের ধনখনে শব্দে হাসপাতালের ভারি বাতাস কাঁপিয়ে কেঁদেছে বহুক্ষণ—যতক্ষণ কান্নার শ্রমে শরীরটা নেতিয়ে পড়েনি। তারপর, দীর্ঘ দিন আনাহার-অর্ধাহারের পরেও সবল (কোনো এক দুজ্ঞেয় কারণে) শরীরটা নিস্তেজ হয়ে পড়ায় গলার স্বর স্বাভাবিক ভাবেই নিচু পর্দায় নেমে এসেছে। চিৎকারের জায়গায় একটা দীর্ঘ টানা রিনরিনে আওয়াজ। তারও পরে মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়ে অল্পস্থায়ী অবসন্ন কুঁইকুঁই আর্তনাদ।

হাসপাতালের গেটের পাশে একটা মাঝারি মাপের কুলগাছের নিচে বসে এই কাণ্ডটা করে চলেছে সুরতিয়া সেই দুপুর থেকে।

কারণ, আর কিছুই নয়, সুরতিয়ার মরদ দু'খানি দোসাদ আর বেঁচে নেই। গোয়ালা লাখপতিয়ার সঙ্গে একরাত শোবার কড়ারে মেগে-আনা আধ ঘটি দুধ নিয়ে দুপুরে খাবার দেবার সময় হাসপাতালে এসে সুরতিয়া—দেখে দু'খানির বিছানা খালি। চাদর কম্বল তুলে নেওয়া হয়েছে, কালচিটে ছোপ ছোপ দাগ ধরা গদিটা যেন অনেকগুলো ক্রুর চোখ মেলে তাকিয়ে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য ভয়ে ভয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছিল সুরতিয়া। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি বা কাউকে জিজ্ঞেসও করতে হয়নি। ওয়ার্ডের জমাদার সুদর্শন, যে কয়েকবারই কাঁই-বিচির মতো দু'পাটি দাঁত আর ঘোলাটে গোল-গোল চোখের বোকাটে নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিয়ে গা চুলকোতে চুলকোতে আসতে-যেতে কুপ্রস্তাব করেছে সুরতিয়ার কাছে, সে ই এসে বলল—ক্যা দেখতানি, তুহারা মরদ, ত মর গ্যইলন্……

নিশুত রাতের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ওয়ার্ডটা অকস্মাৎ। আর সেই স্তব্ধতার বুকে সুরতিয়ার হাত থেকে মেজের ওপর ঘটি পড়ার শব্দটা তীক্ষ্ণমুখ ছুরির মতো বিঁধে গিয়েছিল।

—রাতোয়া মে চার ছ'টো উল্‌টি ভৈল। বাস্, সবেরে খেল খতম। দেখ অ অব ?

না, দেখতে যায় নি সুরতিয়া। নোংরা শতছিন্ন শাড়ির আঁচল নামক অংশটা দলা পাকিয়ে মুখের মধ্যে ঠেসে ধরে রেতালা পা ফেলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে নিদাঘ দুপুরে শস্যহীন ফুটিফাটা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে আসা হুহু বাতাসের মতো একটা রিক্ত দীর্ঘ দীর্ঘ আর্তনাদে হাসপাতালের ওপরের আকাশটাকে ফেড়ে ফেলেছিল।

তখন থেকে এই কুলগাছতলায় বসে কান্নার পালা চালিয়ে যাচ্ছে সুরতিয়া। যেন অন্তহীন কান্নার মহড়া দিয়ে যাওয়া ছাড়া ওর আর কিছু করণীয় নেই।

অবশ্য করার আর আছেই বা কি।

এই সোজা সড়কটা যেখানে লোকালয় ছাড়িয়ে লাখপতিয়ার খাটাল পার হয়ে একটা বাঁক নিয়ে ধু ধু মাঠের মধ্য দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করেছে, সেইখানে বহু পুরনো পড়ো বাড়ির কোনোমাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দেয়ালের পাশে কুড়িয়ে আনা নানা অদ্ভুত বস্তুতে তৈরি ঝোপড়িতে একমাত্র প্রতিবেশী কুটিয়া জগদীশের সংগে ওদের বসবাস। বড় ভয়ানক চেহারা জগদীশের। কুষ্ঠরোগের ঘা ওর হাত পায়ের আঙুলগুলিকে চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে। হাত পায়ের পাতাগুলো থাবার মতো। কোলা লালচে মুখটায় চাকা চাকা মাংস উঁচু হয়ে আছে। ভ্রূহীন পক্ষ্মহীন লাল চোখ। চেহারার মতো মেজাজটাও ভয়ানক জগদীশের। ওরই ভয়ে ওখানে আর কোনো বেওয়ারিশ লোক আস্তানা গাড়তে পারেনি। দীর্ঘকাল জায়গাটা ও একার দখলদারিতে রেখেছে। শুধু কেন জানি সদয় হয়েছিল দুখানি সুরতিয়ার পরে। বছর তিনেক আগে যখন না জেনে ঐখানে গিয়ে ঝোপড়ি তৈরি করতে শুরু করেছিল ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অদ্ভুত খোলা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল জগদীশ—শুয়ারের বাচ্চারা, বাপের জায়গায় বাড়ি তুলছিস···। বলতে বলতে দুই হাতের থাবায় একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর ভয়ানক মূর্তি দেখে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুরতিয়া, আর ওকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল দু'খানি। জগদীশ ড্যাব ডেবে লাল চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিল ওদের দিকে, তারপর হাতের ইট ফেলে দিয়ে বলেছিল—থাকবি থাক কিন্তু খবর্দার, আর কাউকে জোটাবি তো···

নিরন্ন দেহাত ছেড়ে পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত দুখানি-সুরতিয়ার এভাবে নতুন সংসারের পত্তন। প্রায় ভিখিরীর মতোই বেঁচে থাকা। পেলে মোট বয় দুখানি, যাদের বাঁধা কোনো কাজ নেই কিন্তু কাজের প্রয়োজন আছে তাদেরই মতো নানান কাজের ধান্দায় থাকে। কোনোদিন কিছু জুটে যায়, প্রায়দিনই জোটে না। শুকনো মাসগুলিতে সুরতিয়া গোবর কুড়িয়ে এনে পড়ো বাড়ির দেয়ালে ঘুঁটে দেয়, মাথায় ঘুঁটের ঝুড়ি নিয়ে ফিরি করে, দু'চার পয়সা পায়। ভিক্ষে ওরা করে না, শরীর অচল হলে তখন দেখা যাবে। তবে যেচে কেউ কিছু দিলে (ঘুঁটে ফিরি করার সময় বাসী রুটি-টুটি ডেকে দেয় কেউ কেউ) নিয়ে নেয় সুরতিয়া। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা হয় তাতে রোজই কিছু না কিছু পেটে দেওয়া চলে। মাঝে মধ্যে ভাগও দেওয়া যায় জগদীশকে। যেদিন জগদীশের শরীর বেশি খারাপ থাকে, বেরুতে পারে না, সুরতিয়া কিছু খাবার ওকে দিয়ে আসে। প্রথম প্রথম নিজেই চাইত জগদীশ। দু'খানি আর সুরতিয়া হয়তো খেতে বসেছে ঝোপড়ির বাইরে। টলতে টলতে এসে পাশে দাঁড়ায় জগদীশ, ঘোলাটে লাল চোখ দু'টো জ্বলে উঠত। 'এই, খাচ্ছিস? দে।' কাগজে বা পাতায় মোড়া কিছু খাবার থাবায় জড়িয়ে কুঁজো হয়ে নিজের ঝোপড়িতে গিয়ে ঢুকত। এখন জগদীশকে আর চাইতে হয় না, নিজেই দিয়ে আসে সুরতিয়া। নিঃশব্দে খাবারের পুঁটুলিটা ওর পাশে রেখে দেয়। জগদীশ তাকায়, কি যেন বলতে চায় বলে না। সুরতিয়ার আর ওকে ভয় করে না। আসলে লোকটাকে ভয় করার কিছুই নেই, বহুৎ দুগ্‌লা, দেখায় বটে কি না কি করে বসবে, কিন্তু ওর ওই পচা খেয়ো শরীরটা একটা পাঁচ বছরের বাচ্চার তাগত রাখে না। একদিন দুখানি ছিল না ঝোপড়িতে, সুরতিয়া বসে একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে কিছু সবজি কুচোচ্ছিল, হঠাৎ একটা বোটকা গন্ধ পেতেই ফিরে দেখে কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জগদীশ। সুরতিয়া বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই জগদীশ ওকে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু পারবে কেন জোয়ান সুরতিয়ার সঙ্গে, এক ঝটকায় নিজেকে শুধু ছাড়িয়েই নেয়নি ও, জগদীশকে ফেলেও দিয়েছিল ইটের টুকরো ছড়ানো জায়গাটার ওপর। কঁকিয়ে উঠেছিল জগদীশ। সুরতিয়া ওর ক্ষমতার বহর বুঝে বলেছিল—'ফিন দিপ্ করব ত···।' কি রকম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল জগদীশ, উঠে ব্যথার তাড়সে আরো কুঁজো হয়ে কাতরাতে কাতরাতে বলেছিল—'দুখানিকে বলিস না।'—'না কহব, লেকেন অ্যায়সা কভি না করনা।'

কথা রেখেছিল সুরতিয়া। দুখানিকে বলেনি। বললে জগদীশকে আস্ত রাখত না ও। জগদীশের মুরোদ দুখানিরও জানা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সুরতিয়ার ওপর কোনো হামলা বরদাস্ত করার মানুষ নয় সে। নিজের বহুর ইজ্জৎ খারাপ হতে দিতে সে নারাজ। রাস্তায় নেমেছে বলেই তো সে আর রাস্তার মেয়েমানুষ নিয়ে থাকছে না। সুরতিয়া তার রীতিমতো সাদী করা বহু। খুপসুরৎ বহুর জন্য এখনও তার বিলক্ষণ টান, গর্বও আছে থোড়াবহুৎ। জগদীশ ঢ্যামনা সাপ, সে সুরতিয়া কোন্ কচুটা করবে। তাই দুখানির গর্বের জায়গাটায় ঘা দিয়ে ওকে জগদীশের 'পরে লেলিয়ে দেয়নি সুরতিয়া। ওর ঐ কদাকার, ঘেয়ো, পচা মাংসের গন্ধওয়ালা দেহটা নিয়ে ও মনে মনে মরে আছে বলেই ঐ রকম 'যাকে খুশি যখন তখন মেরে বসতে পারে' গোছের ভাব করে। মরাকে আর মেরে কি লাভ। দুখানির মার খেলে মরেই ও যেত নির্ঘাৎ। আসলে লোকটার জন্য এক ধরনের ঘেন্না মেশানো মায়া জন্মেছে সুরতিয়ার মনে। বাড়ির পোষা কুকুরটা ঘেয়ো হয়ে গেলে যেমনটা হয় লোকের মনে।

জগদীশ এটা বোঝে, এটার কদর করে। সুরতিয়ার এই মায়াটুকুর জন্য একটা নির্বাক কাঙালপনা আছে ওর। সেটা সুরতিয়াও বেশ বুঝতে পারে। দুখানির ভয়ে হোক বা সুরতিয়ার এই মায়াটুকু হারানোর ভয়েই হোক জগদীশ আর কখনও ওর পরে হামলা করেনি। বরং ওর সাধ্যমতো বুদ্ধি দিয়ে উপদেশ দিয়ে সাহায্যই করতে চেষ্টা করে ওদের। অনেক অভিজ্ঞতা ওর, অনেক মতলব মাথায়। এ তল্লাটে নতুন দুখানি সুরতিয়ার সেগুলো কাজেই লাগে। দিন একরকম কেটে যায়।

পরের আবাদে জান কবুল পশিনা ঝরানো মেহনতের বদলে ছ'মাসের আধপেটা খাওয়া, তারপর ছুটকো কাজ যেদিন জুটল সেদিন দুমুঠোর সংস্থান, না জুটল তো পেটে কিল মেরে পড়ে

থাকা। তার ওপর মালিকের জুলুম আর পরিশনির অন্ত নেই। যে চাষার জমি নেই, হাল লাঙ্গল নেই, হেলে বলদ নেই তার নসিব আর এর চাইতে ভাল হবে কি করে। তার চেয়ে এই ঝোপড়িতে বরং সুখ। কিছু না রোজই জুটে যায়। আর ঐ ভয়ানক মুখোসটা এঁটে জগদীশ থাকায় অন্ত রকম হামলার হাত থেকেও বেঁচেছে, সুরতিষা যে বড়লোকী হামলা থেকে ওকে বাঁচাতে দেহাতে সর্বদা তটস্থ থাকতে হত দুখানিকে।

চলে যাচ্ছিল, ওদের হিসেবে দিন বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল দুখানি সুরতিয়ার।

কিন্তু কোথা থেকে চোল্লুর নেশা ধরল দুখানি আর সেটাই শেষ পর্যন্ত কাল হল তার। জগদীশ বারবার সাবধান করে দিয়েছিল দুখানিকে, সুরতিয়াকেও। 'খাসনে, খাসনে, চোল্লু খেলে একদম মারা পড়বি। খেতে পেরাণ চায় গুরমিন্টের লাইসেন্স-ওলা দুকানে গে দিশী খা। ঐ চোল্লু শালা সাক্ষাৎ বিষ। দুখানিকে সামলা সুরতিয়া, ও মুত খেতে দিসনে।

অতশত বোঝেনি সুরতিয়া। গাঁয়ে থাকতেও দুখানি মাঝে মাঝে নেশা করত, সবাই করে, লোটাভর ভাঙের সরবৎ না হয় তাড়ি। বেটাছেলে নেশাভাঙ করবেই, না করলে দিমাগ ঠিক থাকবে কেন? সুরতিয়া দেখেছে ওর বাপ ঠাকুরদাকে, গাঁয়ের যত মরদ সব্বাইকে। এই নিয়ম। নেশা নেশা, চোল্লু তাড়ির ফারাক বোঝার কথা নয় সুরতিয়ার। জগদীশের কথায় তাই তেমন আমল দেয়নি ও। লোকটা আসলে বড় ভীতু, আর মনে মনে ভালোও বেসে ফেলেছে ওদের খুব। মরদের ছোঁকছোঁকের দোষ থাকলে বড় কষ্ট মেয়েমানুষের, সে দোষ দুখানির ছিল না, তাই ও নেশা করাটাকেও বিষ নজরে দেখেনি সুরতিয়া। বরং নেশা করে দুখানি যেসব রগুড়ে কাণ্ড করত তাতে ও মজাই পেত সময় সময়। আসলে বুদ্ধিটা সুরতিয়ার বড়ই গোলা। এ থেকে যে বিপদ ঘটতে পারে সে কথাটা ওর মাথায় আসেইনি কখনো।

সেই মাথায় না আসা বিপদটাই ঘটে গেল হঠাৎ। দিন কয়েক আগে একদিন রং বেরংয়ের বমি করে হাত পা এলিয়ে চোখ উলটে শুয়ে পড়ল দুখানি। সুরতিয়ার চেঁচামেচি শুনে জগদীশ এসে দেখে বলল—এর তো লিভার পেকেছে। অত করে বললাম চোল্লু খাস না, খাস না, এখন হল তো। যা, নিয়ে যা হাসপাতালে।

দু'হাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে তার ওপর মাথা রেখে ঝিম মেরে আছে সুরতিয়া। চতুর্দিকে অন্ধকার আরো চেপে আসছে। 'কি করবে ও এখন? ওকে বহুৎ পেয়ার করত দুখানি। দশ সাল হয়ে গেল ওদের সাদী হয়েছে। যে বৌ দশ সালে বাচ্চা দিতে পারে না, দেহাতে স্বামীর ঘর করা কপালে নেই তার, তা বাচ্চা হলে তাকে খেতে দেবার মুরোদ থাকুক চাই না থাকুক। কিন্তু দুখানি অন্য কিসিমের মানুষ, অনপঢ় হলে কি হয় বহুৎ সমঝদার, সুরতিয়াকে ভরসা দিয়েছে এই বলে—'এ বহু, তোকে আমি সাদী করেছি, একটা গরুকে তো না। গরু না বিয়োলে বরবাদ, জেনানা, ঘরকা বহু, তা হবে কেন। তার দিল আছে না, দিলে পেয়ার আছে না, মরদের ভালা-বুড়ার জন্য চিন্তা আছে না। না বহু, তোকে আমি ছাড়ব না, বাচ্চা না দিলেও না, দশ বিশঠো দিয়ে বুড়ি হয়ে গেলেও না। তা ছাড়া, সারা গাঁও ঢুঁড়লে তোর মতো খুপসুরৎ জেনানা আছে নাকি কারো।' বলে সে কি হাসি আর পেয়ারের ধুম দুখানির। সেই দুখানি মরে গেল। মরে শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে আছে কোথায় কোন্ অন্ধকার কোণে। সুরতিয়ার বুক ফাঁকা। মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে কি যেন ঘুরছে। দুখানি ঐভাবেই পড়ে থাকবে? কতক্ষণ? সুরতিয়া শুনেছে হাসপাতালে মুর্দার দারিদার না থাকলে ডাক্তারবাবুরা কেটে ছিঁড়ে পড়া লিখা শেখে। দুখানিকেও...? কথাটা মনে হতে দু'হাতে মাথার চুল খিমচে ধরে সুরতিয়া। এত পেয়ার যে দিল তাকে, সে হয়ে যাবে একটা বেওয়ারিশ মুর্দা?

কিন্তু কিছুই তো জানে না সুরতিয়া, কোনো ভরসাই নেই ওর। জগদীশের ক্ষমতা নেই কিছু করার। এক গোয়ালা লাখপতিয়াকে ধরা যায়। ওর লোক-জন আছে, পয়সাও বিস্তর। ইচ্ছে করলেই পারে ও, হয়তো করেও দেবে সব ব্যবস্থা কিন্তু মুফতে না। কুল্লে দু' সের কি তিন সের দুধ দিয়েই যে অন্যের জেনানার সঙ্গে শুতে চায়, এমন মওকা পেলে কি করবে সে? এখন তো দুখানি নেই। হয়তো বলে বসবে—'সব ব্যবস্থা করে দেব, কিন্তু আমার কাছে এসে থাকবি বল্। যদি বলেই, ক্ষতি কি। ক্ষতি কিছুই না। এরপর তো ভিখ মেগেই খেতে হবে। তার চেয়ে আধবুড়ো লাখপতিয়ার মেয়ে মানুষ হয়ে থাকা মন্দ কি। তারপর লাখপতিয়া আরো বুড়ো হয়ে ব্যবসাপত্র গুটিয়ে যখন ঘরের রাস্তা ধরবে তখন সুরতিয়াও না হয় রাস্তায় নামবে। আর যদি তার আগেই সুরতিয়া পারে ওকে ভালো করে বেঁধে ফেলতে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু মন থেকে যে সায় মেলে না...

হঠাৎ খেয়াল হল সুরতিয়ার আবছায়া কারা যেন ঘুরঘুর করছে আশে পাশে। কথা বলছে ফিসফিস করে; চলে যাচ্ছে, আবার আসছে। কি চায় ওরা? কি মতলব ওদের? আজকাল হামলা করার লোকের অভাব নেই। জুলপি বাবরিওলা বহুৎ মস্তান ছোকরা লোকের ওপর জুলুম করে বেড়ায়, ওদের রোখবার কেউ নেই, বড় বড় লোকেরা ওদেরই মদৎ দেয়। হাসপাতালেও ওদের নানান ফিকিরে ঘুরতে দেখেছে সুরতিয়া। ওরাই হয়তো। মরুকগে, সুরতিয়ার ওপর হামলা করে লাভ হবে না ওদের। কিছুই নেই ওর ওর কাছে। কিন্তু শরীরটা তো আছে। কথাটা মনে হতে সুরতিয়া ভাবল, শেয়াল কুকুরের হাতে পড়ার চাইতে লাখপতিয়ার কাছে যাওয়াই ভালো। অবশ শরীরটাকে দু'পায়ে দাঁড় করানোর জন্য মনে মনে তৈরী হল ও।

ঠিক তখনই কেউ তার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—এ রেণ্ডি, মুর্দা না লেব?

হাঁটুর ওপরে রাখা মাথাটা আস্তে আস্তে তুলল সুরতিয়া। তাকাল এমন-ভাবে, এমন নির্বিবাদ নির্বোধ দৃষ্টিতে,

যেন এটাই ওর নাম, এ নামেই ওকে ডাকা হয়।

গেটের আলোটা পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন। ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না, চেহারার আদল পাওয়া যাচ্ছে।

কথা নেই সুরতিয়ার মুখে।

—মুর্দা না লেব? সুদর্শন আবার বলল, না লেব ত মড়িঘরমে চলা যায়েগা।

—লেব। বিড়বিড় করে বলল সুরতিয়া।

—ক্যায়সে লেব? কোন হ্যায় তেরা?

উত্তর নেই সুরতিয়ার।

লেপটে মাটিতে বসে পড়ল সুদর্শন, একেবারে সুরতিয়ার গা ঘেঁসে, যেটুকু আলো আসছে তা থেকেও ওকে আড়াল করে। বিড়ি ধরাল সুদর্শন। সুরতিয়া আবার হাঁটুর ওপর মাথা রাখল। লোকটার মতলব হয়তো ভালো না। কিন্তু শরীর মন অবশ, শক্তিহীন। সরে বসতেও ইচ্ছে করে না, বাধা দেওয়া দূরের কথা। সুদর্শনের গা থেকে যেন একটা শুয়ে গন্ধ।

—খায়া কুছ? সুদর্শন শুধাল।

—না।

—খাব অঅঅ?

—না।

—কেয়া নাম তেরা?

—সুরতিয়া। মাথা না তুলেই উত্তর দিল সুরতিয়া।

সুদর্শন আস্তে আস্তে কথাটা রাখল। সুরতিয়া যদি চায় দুখানির মুর্দা বের করে নিয়ে আসতে পারে ও, পোড়ানোর ব্যবস্থাও করে দিতে পারে, অনেক লোকজন হাতে আছে ওর। না, না, একটা পয়সাও লাগবে না সুরতিয়ার। হাজার হোক, দুখানি তার একই জেলার লোক। দেশোয়ালী ভাইয়ের প্রতি এটা তার কর্তব্য। এটুকু না করলে রামজী তাকে শ্রীচরণে স্থান দেবেন না। রামজীই তার ইহকাল পরকালের ভরসা। এসব কথা সুরতিয়াকে বলার সময় সুদর্শনের এক হাতে বিড়ি, অন্য হাতটা সুরতিয়ার শরীরে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। রাজী নারাজীর ঊর্ধ্বে রতিয়া।

কথা শেষে উঠে দাঁড়াল সুদর্শন—তু বৈঠ্।

একটু পরেই যেন ভেলকিবাজির মতো একটা দড়ির খাটিয়ায় দুখানির লাশ নিয়ে হাজির হল পাঁচজন লোক। ওদের একজন সুদর্শন।

চৌপায়া—কাঁধে চারজন এগিয়ে চলল। সুদর্শন এসে সুরতিয়ার হাত ধরে টেনে তুলল—চল্, জলদি চল্।

মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে গেল দলটা।

ঘোর অন্ধকার। শীতের কুয়াশায় আরো জমাট। অন্ধকারের ফাঁক-ফোঁকরে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে যেন ওরা এগিয়ে চলেছে। সামনের চারজনের কাঁধে চৌপায়ায় দুখানি। দশ পনেরো হাত পেছনে সুদর্শন আর সুরতিয়া। সুরতিয়াকে সামলে নিয়ে আসার নাম করে ওর গায়ে গায়ে লেপটে আছে সুদর্শন, বেপরোয়া হাত চালাচ্ছে শরীরের সর্বত্র। সুরতিয়া নির্বিকার, যেন ওর হুঁশই নেই।

গেটের সামনে ফ্যাকাশে আলোয় একবার দুখানির মরা মুখখানা দেখে ছিল ও। সেই থেকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে খাটিয়ার দিকে। মুখ ঈষৎ ওঠানো। কি দেখছে ও ই জানে। এই নিকষ অন্ধকার আর কুয়াশায় দুখানির শব আর শববাহকেরা ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে দেখা দৃশ্যের মতো। অস্পষ্ট একটা উপস্থিতি।

এলোমেলো পা ফেলছে সুরতিয়া, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, তবু শববাহকদের সঙ্গে তাল রেখে অসম্ভব দ্রুত হাঁটছে ও। যেন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছে।

ইতস্তত ঘোরাফেরা করা হাত দুটো হঠাৎ সুরতিয়ার নিরুত্তর শরীর থেকে সরিয়ে নিল সুদর্শন, চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠল—এ রেণ্ডি, কেয়া হুয়া তেরা? তু ভি মর্ গয়া কেয়া?

যত মাংসল আর শক্ত বাঁধুনির শরীরই হোক মেয়েছেলের, তাতে যদি উত্তাপ না থাকে, উত্তর না থাকে, তবে কি মন ভরে পুরুষ মানুষের।

ক'পা এগিয়ে সুদর্শন হাঁকল—বহুৎ জাড়া।

—তোর আবার ঠাণ্ডা কি রে শালা, অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা চলমান শব্দ উঠে এল, গরম হবার জিনিস তো সঙ্গেই আছে।

—আরে ভাই ফন্টা, এ শালী দেখনেমে জেনানা, কামমে বিলকুল মুর্দা আছে।

—একটু মাল খাইয়ে দে, দেখবি মুর্দাও কেমন জিন্দা হয়ে উঠবে।

আরেকজনের ভারিমতো গলা হাঁকিয়ে উঠল—আবে বানচোতের বাচ্চারা, চুপ যা একদম, আওয়াজ করবি না কেউ। শালাদের খুব ফুর্তি চেগেছে।

—ঠিক আছে গুরু, ঠিক আছে।

পাকা সড়ক ধরে নিঃশব্দ শবযাত্রা এগিয়ে গেল আরো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎই একটা ঢাল বেয়ে দুদ্দাড় মাঠে নেমে পড়ল। দুখানির লাশ সমেত চৌপায়ার দুলুনি অদ্ভুত অভ্যস্ত কায়দায় সামলে নিল ওরা। শুধু হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে একটা কাণ্ডই করতে যাচ্ছিল সুরতিয়া, ওকে সাপটে ধরে সামলেছে সুদর্শন।

শস্য কেটে নেওয়া ধুধু ফসলের মাঠে ওরা এখন। এবড়োখেবড়ো শক্ত মাটির ডেলা ছড়ানো মাঠ, কেটে নেওয়া শস্যের শুকনো গোড়াগুলি খালি পায়ের পক্ষে মারাত্মক। সরু আলপথ দিয়ে চলা অসম্ভব। ওরা মাঠ দিয়েই হাঁটে। ওদের পায়ে জুতো। সুরতিয়ার খালি পা। ও চলতে চলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আবার ওঠে, আবার চলে। হাত পা মুখ হাঁটু কেটে ছড়ে একাকার। তবু একটা শব্দও বেরোয় না মুখ থেকে, নিশির ডাক শোনা মানুষের মতো ওর হাঁটা। সুদর্শন ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু সুরতিয়ার শক্ত সমর্থ শরীরের ওজন সামলানো বেঁটেখাট সুদর্শনের কর্ম নয়। ও সুরতিয়ার পাশে পাশে থাকে, পড়ে যাবার মতো হলে হাত বাড়ায়—এই পর্যন্ত।

হঠাৎ ভারি গলা বলল—নাবা। বিড়ি টিড়ি খাবি তো খেয়ে নে। আর থামব না। বাকি রাস্তা এক দমে পার করব।

ওরা চৌপায়া নামিয়ে পাশে গোল হয়ে বসল।

দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো হেটেই চলছিল সুরতিয়া। ওকে টেনে এনে দল থেকে হাত কয়েক দূরে বসাল সুদর্শন।—হিঁয়া বৈঠ্।

ওরা ফসফস বিড়ি ধরাল। লাশ কাঁধে হাঁটার সময় শীত ততটা কাবু করতে পারছিল না ওদের, যতটা এখন বসতেই চেপে ধরল।

—এই ঠাণ্ডায় শালা মাল না হলে···। কথাটা শেষ না করে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল একজন।

—যা বলেছিস, শরীল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে মাইরি।

কারো হাতে ধরা একটা বোতল ওদের মাঝখানে নেমে এল। বিড়ির ক্ষীণ আলোতেও ওদের চোখগুলো চক চক করে উঠল।

—গুরু, গুরু, তোমার জবাব নেই মাইরি।

আরো দু'টো বোতল পড়ল।

—খেয়ে লে বাপের বান্‌চোৎ ছেলেরা, খেয়ে লে।

হাতে হাতে বোতল ঘুরল, মুখে মুখে চোঁচা টেনে নিতে লাগল ওরা দিশী মদের বুক গলা-পোড়ানো ঝাঁজ। বিড়ির পর বিড়ি পুড়ল। মৌতাত জমে উঠতে ওরা গায়ের চাদর-টাদর আলগা করে বসল, এখন আর ঠাণ্ডাটাকে ঠাণ্ডা বলেই মনে হচ্ছে না।

গুরু একসময় বলল—আবে, ফন্‌টা, তুই লাটুবাবুকে আগের দু'টো কেসের টাকা দিসনি কেন?

—যেতে সময় পাইনি গুরু, কাল পরশু দিয়ে আসব।

—সময় পাস না। কি আমার লাটের চাপরাশী রে। জানিস না আমাদের কলির কেষ্ট বড়বাবুর দিল্‌কি দোস্ লাটুবাবু। ও শালা লাগানি-ভাঙানি দিলে এই কারবার লাটে উঠবে। ওকে ভোটে জিতিয়েছি কি পাঁচ দশটা খুন করেছি ওর হুকুমে, শালা খচে গেলে সেসব মনেও রাখবে না। টাকা না পেলে শালা মক্ষিচুষ খচে যাবেই।

—কালই দিয়ে আসব গুরু।

—এই শালা সুদর্শন, মাগীটার কি হাল? লড়ে-চড়ে না কেন?

—কেয়া জানে···

—শালীকে একটু মাল খাইয়ে দাও গুরু, ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠবে। অনেকটা যেতে, নইলে পৌঁছতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

—ঠিক বলেছিস। যা ঠাণ্ডা·····

একটা বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল গুরু।

—লে, খা।

গুরু বোতলটা সুরতিয়ার হাতে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল।

না নড়াচড়া, না একটা উত্তর, ঠায় পুতুলের মতো বসে ও।

এবার গুরু নিজেই ওর মুখটা তুলে ধরে, হেলিয়ে, বোতলের মুখটা ওর মুখে পুরে হড়হড় করে ঢেলে দিল খানিকটা। সুরতিয়া গিলল, দিশী মদের তেজী ধাক্কায় শরীরটা শিউরে উঠল একবার।

একটু অপেক্ষা করল গুরু। থিতিয়ে নিতে সময় দিল সুরতিয়াকে। তারপর গিলিয়ে দিল আরো খানিকটা।

—সাব্বাস, এই তো বাবা, লে, বিড়ি খা।

পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বের করে সুরতিয়ার মুখে গুঁজে দিয়ে ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দেবার জন্য ঝুঁকল গুরু।

আর তখনই নেশায় ঘোলাটে চোখ দু'টো ওর গোল গোল হয়ে উঠল।

—আইব্বাস, এ যে গোবরে পদ্মফুল রে।

বিড়ি ধরানো হল না, কাঠিটা হাতেই পুড়ে পুড়ে শেষ হল, বাজপড়া মানুষের মতো গুরু দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আচমকা একটা লাথি মেরে মদের খোতলটাকে অন্ধকারে গড়িয়ে দিয়েই হামলে পড়ল সুরতিয়ার ওপর।

অন্য চারজন উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার এখন চোখ-সওয়া। ওরা গুরুর কাণ্ড কিছুটা দেখে, কিছুটা আন্দাজ করে, খলবলিয়ে উঠছে খুশিতে।

—গুরু মাইরি···। কি যেন বলতে চেয়ে একজন কাতুকুতু খাওয়ার মতো শিউরে উঠে থেমে গেল।

মাইক্রোস্কোপে দেখার মতো তন্ময় আরেকজন ওদিক থেকে তির্যক দৃষ্টি না সরিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠের মতো বলে চলল—আ হা হা হা চু চু চু চু···

ছায়া ছায়া অন্ধকারে মনে হয় একটা সাদা কিছু ছটোপাটি খাচ্ছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আধ মাতাল ফন্‌টা হাততালি দিয়ে কোমর দোলাল ক'বার—গুরু জব্বর খেল দেখাচ্ছে রে, জব্বর খেল···

সুদর্শন শুধু মিনমিন করে উঠল—এ ঠিক নেহি হোতা।

—কেন রে, বেঠিকটা কি হচ্ছে! নিজে তো শালা সারা রাস্তা চটকেছিস। খিঁচিয়ে উঠল কেউ।

তারপর হিক্কা হেঁচকি সিটির মতো অদ্ভুত সব ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, এ ওকে কাতুকুতু দিয়ে, জড়াজড়ি ধামচাধামচি করতে করতে, অশ্লীল শব্দের লহরা তুলে, শ্মশান প্রেতের বিলোল নৃত্য সহযোগে গুরুর ভৌতিক ধর্ষণের দৃশ্য দেখে আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

একটু পরে উঠে এসে গুরু বলল—যা, তোরা সেরে লে।

মাংসের টোপ-শোঁকা চারটে হাঙরের মতো অন্ধকার সাঁতরে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে পড়ে-থাকা সুরতিয়ার ওপর।

চিত হয়ে শুয়ে জরির বুটি-বসানো কালো শাড়ির মতো আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুরতিয়া। কি ঘটে গেল, কি ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝেও বোঝার মতো অবস্থা নয় ওর। দুখানি মরে গেছে, অজানা কয়েকটা লোকের সঙ্গে সুরতিয়া চলেছে কোন্ অজানা জায়গায় ওকে দাহ করতে। মুহূর্ত আগে একজন ওর জেনানার ইজ্জৎ লুটে নিয়ে গেছে। তবু দিল দুখাচ্ছে না ওর, খারাপ লাগছে না। শরাব বহুৎ মজাদার জিনিস। কোনো দিন খায়নি সুরতিয়া, আজ খেয়ে বুঝল কেন লোকে শরাব খায়, মরবে জেনেও খায়, যেমন খেত দুখানি। আহা, কি সুন্দর আসমান। বহুৎ মজা সারা শরীর, জ্বালা কষ্ট সব ফর্সা। সুরতিয়া এখন হাঁটতে পারবে কোশের পর কোশ, কিংবা ঘুমোতে পারবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দুখানি নেই তো কি হল, দুনিয়া কি কারো জন্যে বসে থাকে, যার সময় হবে রামজী তাকে তুলে নেবেনই।

এ তো সোজা হিসেব। এ নিয়ে যে মন খারাপ করে সে বিলকুল বুদ্ধু। একটু আগে জাড়ায় শরীর হিম হয়ে আসছিল সুরতিয়ার। এখন ভেতর থেকে একটা মজাদার ওম ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। নাচতে ইচ্ছে করছে ওর, গানা গাইতে ইচ্ছে করছে। নাচ মেরে বুলবুল তো পয়সা মিলেগা···প···য়···সা মি···লে···গা। আস্তে আস্তে জড়ানো গলায় গেয়ে উঠল সুরতিয়া। আরেকটু শরাব খেলে কেমন হয়? নিশ্চয় দেবে ওরা চাইলে। কেন দেবে না। সুরতিয়া উপুড় হয়ে হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল।

আবার তখনই কারা ওকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। ও অবশ শরীরটা ছেড়ে দিল, নিঃসাড়ে পড়ে রইল।

ওর জামা কাপড় ফালা ফালা হয়ে ওদের হাতে হাতে উড়ে যাচ্ছে। ও এখন পুরা নাঙ্গা। আর, ওরা ওকে ব্যথা দিচ্ছে। ওরা যা চায় তা একে একে নিক না কেন। কষ্ট দিচ্ছে কেন ওকে। ওর বুকের মাংস যেন খাবলে খাবলে ছিঁড়ে নিচ্ছে ওরা। কি চাপ, বুকের খাঁচাটাই কি মড়মড় শব্দ করছে, ভেঙেই যাবে বুঝি। হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল ও। অদ্ভুত সব শব্দ করতে করতে ওরা ওকে আরো জোরে চেপে ধরল। পা দু'টোর ওপর যেন পাথরের ভার চাপানো, নিশ্চয় এক এক পায়ে চেপে বসে আছে এক একটা মানুষ। কারো থাবার আঁচড়ে ও পেটের চামড়া ছিঁড়ে গেল বুঝি, এত যন্ত্রণার মধ্যেও পাঁচটা সরু রেখার তীক্ষ্ণ জ্বালা ওর মগজে ফুলকি ছড়াতে লাগল। আঁক্···। হঠাৎ তলপেটে তোলপাড় করা একটা ব্যথা। গা গুলিয়ে বমি পেল। বুকের ওপর তাদের অমানুষিক চাপে বমির বেগটা গলার কাছে থমকে গেল। কেউ যেন ওর ঠোঁট দুটো চিবিয়ে খেয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল সুরতিয়ার। যেন সমস্ত শরীর থেকে যন্ত্রণার ঢেউগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে ছুটে এসে মিশে যাচ্ছে, মিশে গিয়ে প্রবল আঘাতে একটা দরজা খুলে ফেলবার চেষ্টা করছে। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন দরজার ওদিক থেকে সব-জ্বালা দূর করা মিঠা বাতাস ছুটে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে সুরতিয়াকে। ব্যথার ঢেউগুলো মিলে দরজাটা পুরো খুলে ফেলতে পারলেই আর কোনো কষ্ট থাকবে না। দুখানির হাসি-হাসি মুখখানা ভাসছে উজ্জ্বল জলের স্রোতের ওপরে··· ভেসেই চলেছে···জগদীশের লাল মোম-তৈরি মুখটা কান্নায় বাঁকাচোরা···ওর স্থির চোখ দু'টো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে···। শরীরের নানা দিক থেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ঢেউগুলি সুরতিয়ার শরীরটাকে কাঁপিয়ে ফাটিয়ে ভেঙেচুরে এক হয়ে হঠাৎ আছড়ে পড়ল দরজাটার ওপর। সূচীমুখ যন্ত্রণা থেকে মুহূর্তে সুরতিয়া মুক্ত হল, একটা মাত্র মোচড়ের পরই স্থির হল শরীর, ঝিম ঝিম বাজনার সঙ্গে সরোবরের স্থির স্নিগ্ধ শীতল জলে ডুব দেওয়ার মতো একটা অনুভব হতে না হতেই কোথায় কোন অতলে নিঃশব্দে হারিয়ে গেল দুখানি দোসাদের বহু সুরতিয়া।

ওরা একে একে টলতে টলতে উঠে এল।

শেষ যে এল সে এসে বলল—মাগীটা কেমন যেন চুপচাপ পড়ে আছে গুরু। লড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। ডাকলাম···

—চ, দেখছি।

গুরু হাঁটু মুড়ে বসল সুরতিয়ার পাশে। হাতের উলটো পিঠ ওর নাকের কাছে ধরল, বুকে হাত রাখল, বুকের ওপর কান চেপে শব্দ শুনল।

তারপর উঠে বলল—শালী টেসে গেছে।

—অাঁ। কি হবে গুরু। ভয়ার্ত ফন্টা আর্তনাদ করে উঠল।

—কি হবে। কি হবে। প্রতিধ্বনি করল অন্যরা।

—শালা ডরপুক সব। কি আবার হবে। মানুষ মারা কি এই তোদের প্রথম।

গুরু খিঁচিয়ে উঠল।

—না, মানে, দিনকাল আবার আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে গুরু। টেনে ওটাকে একটা চড় কষাল গুরু। চটাস্ করে শব্দ হল।

—কিসের খারাপ রে? কিসের খারাপ দেখলি তুই?

—কি করবে এখন গুরু? ভয়ে ভয়ে শুধাল একজন।

—কি আবার করব। শালীকে তো ধনুবাবুর কাছে চালান দিতে হতই, চলে যেত কোন্ না কোন্ মুলুক, এখন না হয় ওর মদ্দাটার সঙ্গে এক জায়গাতেই যাবে। ওকে তো সাক্ষী দেবার জন্যে এ দেশে থাকতে দেওয়া যেত না। তবে?

—তবে। তবে। সাহস পেয়ে গুরুর সঙ্গে সুর মেলান অন্যরা।

—বোতল আর ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো একটা বাণ্ডিল করে লে। খালে ফেলে দেব। আর মাগীটাকে চৌপায়ায় তুলে দুটোকে একসঙ্গে ভালো করে বাঁধ।

তৎপর হয়ে উঠল ওরা। কয়েক মিনিটে যাত্রার জন্য তৈরি।

—লে, চল্।

হ্যাঁচকা নিয়ে ভারি চৌপায়াটা কাঁধে তুলে আবার মাঠ ভেঙে অন্ধকারে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে দ্রুত চলতে শুরু করল ওরা। ভারি ব্যস্ত। ওরা জানে ব্যস্ততার কারণ। শুধু ওরাই জানে, আর কেউ না।

চৌপায়ায় চাপানো দুখানি সুরতিয়ার তো জানার কথা নয়ই যে এক জোড়া মানুষের হাড়গোড়ের দাম কম করেও দেড় হাজার টাকা।

জনপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনার দাবী গণতন্ত্রেরই মৌল অধিকার

ডঃ সরোজমোহন মিত্র

ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় জনগণের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই তিরিশ বছর ধরে একটি দলই শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিল। সেই দলের নাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য ১৯৬৯ সালে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নব কংগ্রেস নামে দলটি প্রায় সাতবছর শাসনক্ষমতা চালিয়েছে। এই অভিজ্ঞতায় ভারতীয় জনগণ উপলব্ধি করেছে শাসকগোষ্ঠী অনেক বড় বড় কথা বলেছে কিন্তু কার্যত ঘটনা ঘটেছে বিপরীত।

বড় বড় পোস্টারে দেওয়ালে লেখা হল "সমাজতন্ত্র আসছে, আসবেই"; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র এলো না। এলো স্বৈরতন্ত্র, আধা ফ্যাসিবাদ।

এর মধ্যেও স্বাধীন ভারতের অনেকগুলো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। প্রতিবারই নির্বাচনের সময় অনেক ভাল ভাল বড় বড় কথা শোনা যায়। ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে অনেক মোটর গাড়ির ধুলো ওড়ে। তারপর একদিন নির্বাচন পর্ব শেষ হয়। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বিধানসভায়, সংসদে তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠে। সংবাদপত্রের পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়। যে সংবাদপত্র শতকরা আশীভাগ লোক পড়তে পারে না। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা সেখানে ঠিকমত পৌঁছতে পারে না। তারা যাকে নিজেদের লোক বলে নির্বাচিত করে পাঠান তাঁর সঙ্গে আর প্রত্যহ যোগ থাকে না। কখনো সখনো দেখা করতে গেলে বাড়ীর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়। একদিন যিনি তাদের সেবা করবার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোরে দোরে হাতজোড় করে ভোট ভিক্ষা করে ফিরেছেন নির্বাচনের পরে তিনিই তাদের প্রভু হয়ে বসেন। ভগবানের মত তখন তিনি অনেক দূরে বাস করেন। মাঝে মধ্যে কখনো কখনো তাঁর বাণী শোনা যায় তাঁর চেলা চামুণ্ডাদের মারফৎ।

এর নাম কি জনপ্রতিনিধি? জনপ্রতিনিধি বলতে কেবল কি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন ব্যক্তিকেই বোঝায়? জনগণের প্রতিনিধিত্ব বলতে সাধারণ ভাবে এটাই বোঝায় যে, যিনি বাস্তবে জনগণের সুখ দুঃখের অংশভাগী হন, জনগণের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, নানা ব্যাপারে যিনি জনগণের দাবি দাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথাস্থানে প্রকাশ করে থাকেন তিনিই জনপ্রতিনিধি। গণতন্ত্রের এটা মূল কথা। গণতন্ত্রের বহুপরিচিত সংজ্ঞাতেই বলা আছে, জনগণের, জনসাধারণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে শাসনতন্ত্র তারই নাম গণতন্ত্র।

জনসাধারণ তিক্ত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছে 'গণতন্ত্র' কথাটা যত সোচ্চারে বলা হয় অর্থটা তার তত চাপা পড়ে থাকে। এ যেন ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে কাচের আলমারীতে রাখা মিষ্টি দোকানের রসগোল্লা সন্দেশের মত। বলা হয় এসবই তার জন্য। কিন্তু পকেট ভারী না থাকলে তার কোন অর্থই তার কাছে থাকে না। দূর থেকেই তাকে প্রত্যক্ষ করে লোভ নিবৃত্ত করতে হয়, স্পর্শ করা যায় না। মাও সে-তুঙ বোধহয় এক জায়গায় বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র আসলে পাঁঠার চামড়া দিয়ে ঢাকা দেওয়া কুকুরের মাংস। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এসব কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে ভারতীয় জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনে তারা যে কত নিষ্ঠুর, নির্মম, স্বৈরতন্ত্রী হয়ে জনগণেরই কণ্ঠরোধ এবং জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারেন তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গিয়েছে। আজ ভারতবর্ষের জনগণ নির্মমভাবে উপলব্ধি করেছে এসব আসলে গণতন্ত্রের নামে ভাঁওতাবাজি। গত তিরিশ বছর ধরেই এ ভাঁওতাবাজি চলে আসছিল। আজ তাই নতুন করে সব ব্যাপারটা ভাবতে হবে; সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ধা অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পটভূমিকায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে গ্রেট ব্রিটেনের কাছে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছিল। ঐ প্রস্তাবেই কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন তাঁরা স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরি করার জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি কনসটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর অধিবেশন বসাবেন।

তারপর যুদ্ধ শেষে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহের মুখে ইংরেজ সরকার ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' করে গেল। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল ১৯৯৯ র পূর্বে নাকি প্রকাশিত হবে না। সে

যাই হোক কংগ্রেস নেতাদের অনেকদিনের আশা পূর্ণ হোল। ব্রিটিশ সরকারের পর তারা খণ্ডিত ভারতবর্ষের গদীতে বসলেন। শুরু হোল নতুন রাজত্বের আর শুরু হোল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। ব্রিটিশ রাজত্বে বারবার কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করে ছিলেন। আশ্চর্য এই কংগ্রেসী নেতারাই গদীতে বসেই শুরু করলেন একই ঘৃণিত কাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করার জন্য কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ডাকা হোল না। ভারতের বর্তমান সংবিধান রচনা করার জন্য যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বসান হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুযায়ী। (দ্রঃ India wins freedom—Maulana Abul Kalam Azad) ফলে ভারতবর্ষের জন্য যে সংবিধান রচিত হোল সেটাও শ্রেণী এবং কায়েমী স্বার্থকেই সুরক্ষিত করল। এই সংবিধান ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার ব্যবস্থা করেছে। স্বভাবতই এই সংবিধান সম্পর্কে জন সাধারণের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোল। তারা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করল প্রথম থেকেই একটা অগণতান্ত্রিক উপায়ে পৃথিবীর বৃহত্তর গণতন্ত্রের 'পবিত্র' সংবিধান রচনা করে জন সাধারণের বক্তব্যকে তার থেকে দূরে রাখা হোল।

তারপর এই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫২ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোল। তার পূর্বেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসী সরকার ৩৭৮৪ জন সংগ্রামী মানুষকে হত্যা করেছিল, ১০,০০০ জনকে আহত করেছিল, পাঁচলক্ষ মানুষকে জেলে পুরেছিল। শ্রমিক কৃষক আন্দোলন করার জন্য অনেকগুলো রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল। এমনি করে কেটে গেল তিরিশ বছরের কংগ্রেসী শাসন। বিদেশী ধনিক গোষ্ঠী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ এখনো নির্মম লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। এই তিরিশ বছরে কেবল টাটা বিড়লার মত একচেটিয়া মালিক গোষ্ঠীও ফুলে ফেঁপে ওঠেনি, চোরাকারবারী, ফাটকাবাজ, জমিদার শ্রেণী এমন কি কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও ব্যাপকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এককালে যারা প্রায় নিঃস্ব ছিলেন এখন তারা বিরাট ধনী হয়েছেন। তাই গত তিরিশ বছরে জনসাধারণ স্বাধীনতার অর্থ বলতে বুঝেছেন—জনগণকে লুণ্ঠন করা, অপহরণ করার স্বাধীনতা এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এই লুঠের মেলায় যোগ দেবার স্বাধীনতা। বিগত সাত বৎসরে এই স্বাধীনতার অর্থ আরও প্রসারিত হয়েছে। এই সময়ে স্বাধীনতার অর্থ ছিল কংগ্রেসী এম এল এ-দেরও লুটে পুটে খাওয়ার স্বাধীনতা, অবাধ সন্ত্রাস সৃষ্টির স্বাধীনতা, মস্তানি করার স্বাধীনতা এককথায় যা খুসী তাই করার স্বাধীনতা। আজ তাই নতুন করে 'স্বাধীনতা'র অর্থের সন্ধান করতে হবে।

বিশেষ করে ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ধনিকগোষ্ঠীর একাংশ এবং ভারতের সংগ্রামী জনসাধারণ ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতে প্রকৃত পক্ষে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এককালে পশ্চিম ইয়োরোপেও সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু করতে হয়েছিল। তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান দাবি ছিল রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই দাবি নিঃসন্দেহে তখন অনেক বেশী প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু তারপর সব বুর্জোয়া দেশেই পার্লামেন্টের কাজ হোল ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। তারা আমলাতন্ত্র, সৈন্য ও পুলিসবিভাগের সাহায্যে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকে কুক্ষীগত করে রাখে। ধনতন্ত্র একচেটিয়া ধনতন্ত্রে পরিণত হওয়ার পরে পার্লামেন্টের ক্ষমতা অনেক সীমিত হয়ে পড়েছে। সে জন্য এখন যেটুকু সুযোগ এবং ক্ষমতা আছে তাকে যথাযথ প্রয়োগ করতে হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনসাধারণের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা সংবিধানে স্বীকার করতেই হবে।

কারণ বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে ভোটদাতারা পাঁচ বৎসর অন্তর একদিন ভোটের বাক্সে ভোট দিতে পারেন। তার পরেই তাঁদের কর্তব্য শেষ। এই কাজকেই সাড়ম্বরে বলা হয় ভোটদাতারা তাঁদের স্বাধীন অধিবাসীর কর্তব্য পালন করছেন; তারপর আর তাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। এইরূপ ভোট ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতারণা লুকিয়ে আছে। ওপর থেকে বলা হয় এই ভোটের দ্বারা জনসাধারণ রাষ্ট্রের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করল ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পূর্বে যেমন রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থেকে গিয়েছিল, ভোট দেওয়ার পরেও সেই অবস্থাতেই থেকে গেল। এ সম্পর্কে তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধির নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আর কোন দায়িত্ব থাকে না। তিনি দল-ত্যাগ করতে পারেন, তিনি তাঁর নীতি বিসর্জন দিতে পারেন, নিজেকে বিক্রি করতে পারেন বা যা খুশী করতে পারেন, কারো কিছু করবার থাকে না।

তৃতীয়ত, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিধানসভায় বা সংসদে বহু সুযোগ-সুবিধে ভোগ করেন। তাছাড়া বিধানসভা বা সংসদে বিরাজ করে একটা বুর্জোয়া পরিবেশ। এই পরিবেশে দীর্ঘদিন কাটালে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক শ্রেণীর সদস্যদের আদর্শভ্রষ্ট হতে বিলম্ব ঘটে না। 'কমিউনিস্ট' অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত অনেকেই হয়ত নিজেকে তখন আর 'loyal opposition' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। তাঁরা তখন সংসদে কেবল দক্ষ বক্তা ছাড়া আর কিছুই কামনা করতে পারেন না। মার্কস পার্লামেন্টকে বলেছিলেন, "বক্তৃতার বাজার" (talking shop) এই বাজারে তারা তখন কেবল ব্যর্থ বেসাতি করেন।

চতুর্থত, এই সব সুযোগ সুবিধের জন্য অনেক সংসদীয় শ্রমিক সদস্যও

সংসদীয় রীতিতে এমন আবিষ্ট হয়ে পড়েন যে তারা সংসদ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। ফলে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তারাও যেনতেন প্রকারেণ ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পঞ্চমত, এই নির্বাচনগুলো বস্তুত একটা টাকার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রার্থীর ভোট পাওয়ার সঙ্গে তার অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। যে প্রার্থী যত বেশী অর্থ ব্যয় করতে পারে সে তত বেশী ভোট পায়। ভারতবর্ষের নির্বাচনে যে অর্থ একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন। ফলে দেখা যায় বুর্জোয়া নির্বাচনে গণতন্ত্রের চেয়ে ধনতন্ত্রই সব রকমের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

একথা আজ প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরার স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যেন দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা লাভের আস্বাদ পেয়েছে। ভবিষ্যতে ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যে যেন আবার স্বৈরতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারিতা গড়ে না উঠতে পারে তার জন্য সংবিধান সংশোধন করে তার পাকা ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। আগামী নভেম্বরে জনতা সরকার সংবিধান সংশোধন বিল সংসদে পেশ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এই সংশোধনকে যদি জনতা সরকার যথার্থই গণতন্ত্রের স্বার্থবহ করে তৈরী করতে চান তাহলে প্রয়োজনে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর ফিরিয়ে আনার দাবিকে স্বীকার করতেই হবে। এই দাবি স্বীকার করার অর্থ গণতন্ত্রকেই স্বীকার করা যার মূল কথা হোল রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ। তাহলে পাঁচ বছরে কেবল একদিন নয় সর্বদাই জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারবেন তাদের কিছু করণীয় আছে। দ্বিতীয়ত নির্বাচনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধির যা খুশী করার প্রবণতা বন্ধ হবে। তিনি যদি জানেন নির্বাচকমণ্ডলীর যে কোন সময়ে তার কাজকে অনুমোদন না করলে ফিরিয়ে নেবার অধিকার আছে তা হলে তিনি একদিকে যেমন সর্বদা নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন তেমনি অন্যদিকে নিজের নীতিকে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করবেন। তৃতীয়ত সংসদীয় বুর্জোয়া পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির দ্বারাও আদর্শভ্রষ্ট হবে না। কারণ তার সব সময়ই একটা পিছু টান এবং সতর্কতা থাকবে। তখন বক্তৃতার বাজারটাও কেবল বক্তৃতা সর্বস্ব হবে না। বিধানসভা এবং সংসদের জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় সে টাকাটা জোগান দেয় সাধারণ মানুষ। বর্তমানে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের যুগে বিধানসভা এবং সংসদগুলো একপ্রকার অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এখানে সদস্যদের কাজ কেবল বক্তৃতা দেওয়া এবং সমালোচনা করা। কিন্তু আসল কাজ করে মন্ত্রীদের হুকুমে কিছু "বিশেষজ্ঞ" আমলারা। সদস্যরা তার সমালোচনা করে তার খুঁটিনাটি অদল বদল করতে পারেন।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিলে সংসদীয় কাঠামোরই একটা আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তখন আর জনসাধারণের মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। সংসদ বা বিধানসভাগুলো প্রকৃত পক্ষেই বিভিন্ন আদর্শের একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। জনসাধারণ স্বীয় অধিকারবোধেই এর সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে। পার্লামেন্টারী কায়দায় কথা বলা ও চিন্তা করার মধ্যে অন্যদের প্রতারণ করা এবং অন্যদের প্রতারণা করার মধ্যে নিজেকে প্রতারণা করার যে প্রবণতা আছে সেটাও বন্ধ হবে।

বস্তুত মার্কসবাদীরা পার্লামেন্টকেও একটা সংগ্রামের ক্ষেত্র রূপেই মনে করেন। শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্বার্থে পার্লামেন্টকেও ব্যবহার করা যায় এই সচেতনতা থেকেই শ্রমিক শ্রেণী সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে যে সমাজব্যবস্থার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে তাকে ত্বরান্বিত করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনকে দ্রুত সম্ভব করে তোলেন। লেনিনও বিপ্লবের স্বার্থে ডুমার মঞ্চ ব্যবহারের কথা বলেছেন। ১৯০৭ সালে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে ডুমা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "ডুমাতে সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কাজ বাইরের আন্দোলনের অধীনে থাকবে; জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের আপস পন্থার মুখোস খুলে দেবার জন্য এবং পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী ঘোষণা ও জনপ্রিয় করার জন্য—প্রধানত এইসব কাজের জন্যই ডুমাকে ব্যবহার করতে হবে।" এটা হচ্ছে পার্টির কৌশলগত দিক। মার্কসবাদ তো বস্তুবাদ। তারা সংসদীয় মঞ্চ থেকে সমাজ জীবনে যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে তার ভিত্তিতে জনসাধারণকে প্রভূত শিক্ষা দিতে পারবেন। তাদের ক্ষেত্রেও জনসাধারণের ফিরিয়ে আনবার অধিকার থাকা উচিত। এই অধিকার তাদের আদর্শনিষ্ঠ এবং সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ রাখতে সাহায্য করবে।

স্বাধীনতার তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের যদি মর্যাদা প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনবার অধিকার (right to recall) স্বীকার করতেই হবে। এ বিষয়ে সকলের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। আশার কথা লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এই সম্পর্কে মুখর হয়েছেন।

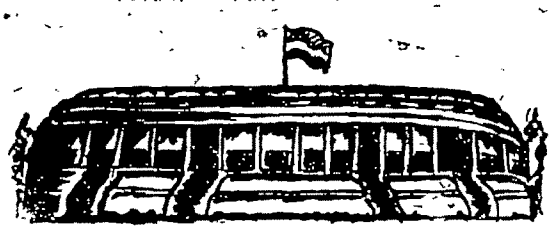

প্রতিপক্ষ

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

॥ এক ॥

কলকাতা শহরের এক প্রান্তে তিন রাস্তার মোড়ে বর্তমান থানাটা দশ বছর আগে যা ছিল এবং এখন যা হয়েছে (১৯৭১-৭২ খৃঃ) তার তুলনামূলক বিচার করলে পশ্চিম বাঙলার পুলিসী প্রশাসনের অকল্পনীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। আগে ছিল পুরনো একতলা ছোট একটা বাড়ি, কয়েকখানা মাত্র ঘর এবং দু'তিনখানা গাড়ি দাঁড়াবার মত ছোট্ট এক টুকরো উঠোন।

আমার এক বন্ধুর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ছবি তুলবার ঝোঁক আছে, এই থানার ছবিও সে এক সময় তুলে রেখেছিল (অবশ্য যখন বাড়িটা ভাঙবার সিদ্ধান্ত হয় তখন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে)। ভাঙা চোরা জীর্ণ একখানা বাড়ি, গেটে—'Police Station' লেখাটা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। এখন সেই থানার চেহারা যা হয়েছে তাতে আগের সেই বাড়ির কথা অনেকেই ভুলে গেছে। যাবারই কথা, কারণ এখন সেখানে বিশাল বিশাল অনেকগুলো বাড়ি উঠেছে। আমি যতদূর শুনেছি তাতে থানার মূল বাড়িটায় ঘরের সংখ্যা বর্তমানে চল্লিশের ওপর। দশ বছর আগে আশপাশে যে সব ঘর-বাড়িগুলো ছিল সেগুলোর কোন অস্তিত্ব আর নেই, সব ভেঙে দিয়ে থানার এলাকা বাড়ানো হয়েছে। অনেকগুলো পরিবারকে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। থানার জমির পরিমাণ এখন বিঘে দশেকের কম হবে না, ব্লক বা বাড়ির সংখ্যা বারো, তার মধ্যে কিছু অফিসার কোয়ার্টার, কিছু সিপাই বা আর্মড পুলিশের ব্যারাক। কম্পাউণ্ডের ভিতরে কয়েদী গাড়ি, পুলিস ভ্যান, জিপ এবং আরো কত রকমের গাড়ি যে মজুদ থাকে তার ইয়ত্তা নেই। ভেতরে যে পরিমাণ জায়গা তাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরো এক ডিভিসন সৈন্যের আর্মড কনভয়কে স্থান দেওয়া যায়।

উনিশ শ' সত্তর সালের সতেরই মার্চ পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। তের মাস শাসন ক্ষমতায় থাকার পর এই সরকারের পতন পশ্চিম বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু কলকাতা শহরের এক প্রান্তে ঘনবসতিপূর্ণ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের সামনে এরপর প্রথম লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল এই থানাকে ঘিরে। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেল এই থানা এবং যত দিন যেতে লাগল তত তার গুরুত্ব বেড়ে চলল, শেষে নতুন নির্বাচনের পরে উনিশ শ' একাত্তরের ২রা এপ্রিল সি পি আই সমর্থিত কংগ্রেস মুসলিম লীগ সরকার গদিতে বসার পর এই থানার গুরুত্ব পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হল কংগ্রেস সি পি আই এবং টুকরো-টাকরা এক আধটা দল নিয়ে "ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন"। সারা দেশে একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, যে পরিস্থিতির সম্পর্কে মানুষের এর আগে কোন ধারণাই ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারের একটা জরুরী তলবে হাজিরা দিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রণজিত দাশগুপ্ত জিপে করে অফিসে ফিরছিলেন। পদমর্যাদায় তিনি সি আই অর্থাৎ সার্কেল ইনস্পেকটর। হাল্কা খাকী রঙের নিখুঁত পোষাকে তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতেও তিনি সুপুরুষ প্রায় ছ'ফিটের মত লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, দুধে আলতায় রং, চোখ মুখ নাকের গড়ন শরীরের সঙ্গে মানানসই, বয়েস পঞ্চাশের কিছু বেশী। মিঃ দাশগুপ্ত অল্প কথা বলেন, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তার উপর নীতি এবং নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি প্রবণতা একটু বেশী বলে পুলিশ মহলে তাঁর প্রতি প্রশংসা এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুইই বর্ষিত হয়। অবশ্য এই নীতি মানে চিরাচরিত পুলিশী নীতি। অনেকের মতে আর একটু চালাক চতুর হলে পদমর্যাদায় তিনি আরও অনেক উঁচুতে উঠতে পারতেন। কর্তব্যে অবহেলা করবার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কখনো করেছেন বলে শোনা যায় না। তাহলেও লোকটার সম্পর্কে পুলিশ মহলের ধারণা মোটামুটি মিশ্র ধরনের।

থানার কাছাকাছি এসে দাশগুপ্তের জিপ থেমে গেল। ড্রাইভার থামিয়ে দিল, কারণ কোন দিকে যাবে সে সম্পর্কে সে দ্বিধার মধ্যে পড়ল। থানার সামনে প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে পুরুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কোলাপসেবল গেট বন্ধ। দক্ষিণ দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে গাড়ি নিয়ে কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকবার গেট। জিপ সেই গেট দিয়েই ভেতরে ঢুকবে, কিন্তু দাশগুপ্ত থানার সামনে নামবেন না ভিড় এড়াবার জন্য কম্পাউণ্ডের ভেতরে যাবেন সেই প্রশ্নই ড্রাইভারকে দ্বিধার মধ্যে ফেলল। সাধারণত তাঁকে গেটে নামিয়ে দিয়েই যেতে হয়, দাশগুপ্তর পক্ষে সেটাই সুবিধে, কিন্তু গেটের যা অবস্থা তাতে ওখানে তিনি নামতে চাইবেন কি না ড্রাইভার বুঝতে পারছিল না। গাড়ি থামিয়ে সে তাই তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

দাশগুপ্ত ইংগিতে গেটের কাছে গাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। জিপ স্টার্ট নিল। প্রচণ্ড গর্জন করে থানার গেটের দিকে এগিয়ে গেল গাড়িটা। ড্রাইভার ভিড়ের পেছনে শব্দ করে ব্রেক কষল। বিদঘুটে আওয়াজ করে দমকে দমকে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে দিয়ে ভিড়ের লোকগুলোকে যেন জানিয়ে দিল, ভাল চাওতো সরে যাও বাপু। কে এসেছে তাকিয়ে দেখ, তোমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে আমি বয়ে নিয়ে এসেছি। পারতো সেলাম ঠুকে সরে গিয়ে যাবার জন্যে পথ করে দাও।

উপস্থিত ভিড়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দাশগুপ্ত জিপ থেকে নামলেন। বলতে গেলে এটা এখন প্রতিদিনের ব্যাপার। বিকেলের দিকে রোজ এই রকম জমায়েত হচ্ছে। লোকের সংখ্যা কোনদিন বেশী, কোনদিন কম। থানার লোকেরা এখন নিত্য তৈরি থাকে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে সিপাইরাও প্রস্তুত হয়। বন্দুকধারী গেটের প্রহরীরা ধাক্কা দিতে দিতে ভিড়টাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই লাঠিপেটা করে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে হয়।

জিপ থেকে নেমে দাশগুপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। লোকগুলো জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, নড়বার নামটি নেই। তাঁকে দেখে ভিড়ের মধ্যে অবশ্য একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। ওরা কেন এসেছে তিনি জানেন, থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে এসেছে। কিন্তু থানার কোন অফিসার ওদের সঙ্গে দেখা করবেন না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ভাল করে পিটুনি দেওয়া হবে। যুক্তফ্রন্ট আমল হলে, অর্থাৎ সেই তের মাসের রাজত্ব হলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হত, তখন তিনি বা তাঁরা করেছেনও তাই। থানার সামনে মানুষজন এলে তাদের সামনে গিয়ে তাঁকে বিনীতভাবে দাঁড়াতে হয়েছে, লাঠি এবং বন্দুক হাতে সিপাইদের সরিয়ে দিতে হয়েছে, প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সবিনয়ে অনুরোধ করতে হয়েছে যে, তাঁরা যেন দয়া করে সকলকে বাইরে রেখে কয়েকজন মাত্র তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ভেতরে আসেন। এরপর তাঁর অনুরোধে রাজি হলে প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেছেন, সকলকে সসম্মানে বসতে দিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ইন্সপেক্টর নন্দ গোস্বামী (এই থানার একজন পুরনো অফিসার) এই সময় প্রায়ই রসিকতা করে বলতেন, আমরা যেন ভদ্রলোক হয়ে গেছি স্যার, আর পুলিশ নেই।

পাবলিকে এই সময়ে কেমন নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে থানায় ঢুকতো, যে সমস্ত অফিসার এবং জমাদার কনস্টেবলদের মানুষ দেখলেই লাল চোখ করে তাকানো স্বভাব হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের চোখগুলোর দৃষ্টি চেষ্টা করে ভদ্র করে আনতে হয়েছিল। এতে তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের বিরক্তির শেষ ছিল না। সাধারণ পুলিশের একটা অংশ (ইন্সপেক্টর গোস্বামীর ভাষায়) কেমন দিলদরিয়া খোশমেজাজের হয়ে পড়েছিল, যেন তাদেরও স্বরাজ এসে গেছে। গোস্বামী ছাড়াও আরও অনেক অফিসার তাঁর কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, লক্ষণটা ভাল নয় স্যার, পুলিশ ফোর্সের মধ্যে এই মনোভাব বড় সাংঘাতিক। ওপরওয়ালাদের প্রতি শুধু আনুগত্য নয়, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত আচার আচরণ মনোভাবটাও কম গুরুতর নয়। তাছাড়া এই সরকার তো চিরকাল থাকবে না। এদের আয়ু আর কতদিন।

দাশগুপ্ত থানার গেটের দিকে কয়েক পা এগোতেই কয়েকজন কনস্টেবল ব্যাটন হাতে ছুটে এলো। চেঁচিয়ে, ধমকে ঘাঁতো দিয়ে গেটের সামনে লোকগুলোকে দূরে সরিয়ে দিল। বলল, সাবধান! আর এক পা এগোলে মাথা ফাটিয়ে দেব। দাশগুপ্ত মনে মনে হাসলেন, এই ভাবেই চিরকাল থানার কাজ চলে এসেছে। ত্রিশ বছরের উপর তাঁর চাকুরী জীবন। বৃটিশ আমলে এই ভাবেই চলেছে, দেশ স্বাধীন হবার পরও এযাবৎকাল এই ভাবেই চলে

এসেছে, এই নতুন মন্ত্রিসভার আমলেও এই ভাবেই চলবে। মাঝখানে তের মাস যেভাবে চলেছিল তা নেহাতই একটা ব্যতিক্রম। তাঁদের উপর জোর করে সেটা চাপানো হয়েছিল, বলতে গেলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন সকলে, এখন আবার সব হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। ব্যাটন হাতে সিপাইগুলোর দিকে তাকিয়ে দাশগুপ্তের মনে হল ওরা যেন তাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছে, দেখুন স্যার, এব্যাপারে আমাদের দক্ষতা আমরা এখনো হারিয়ে ফেলিনি। তের মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভদ্রতার পরীক্ষা আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

কোলাপ্‌সিবল গেট বন্ধ করে রাইফেল হাতে যে দুজন আর্মড পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল তারা সেলাম করে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল। দাশগুপ্ত ভেতরে যেতে গেটটা আবার সশব্দে বন্ধ করে দেওয়া হল। একটু এগিয়ে যেতেই দাশগুপ্তের সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল ইন্সপেক্টর গোস্বামীর। গোস্বামী হন্তদন্ত হয়ে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্ছিলেন। দাশগুপ্তকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোস্বামী গাঁট্টাগোট্টা শক্ত চেহারার মানুষ। সারা মুখের মধ্যে লক্ষণীয় হল গোঁফ জোড়া, দেখলেই বোঝা যায় ওটার ওপর খুব যত্ন নেওয়া হয়। পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে তোলা, ছাঁট এবং মার্জনা খুব নিখুঁত। গোঁফ সমেত ঐ মুখের বিভিন্ন রকমের ভঙ্গী থানার লোকেদের প্রায় মুখস্থ। ওপরওয়ালাদের সামনে শান্ত কোমল রূপ, গোঁফ থাকা সত্ত্বেও খানিকটা মেয়েদের মত, ঐ গোঁফই আবার তীক্ষ্ণতা তীব্রতা পায় যখন বন্দীদের উপর নিষ্ঠুর হবার দরকার হয়, বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হলে ঐ গোঁফই বেঁকে দুমড়ে এক বিচিত্র ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে। দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে গোস্বামী সমীহ ভরে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দাশগুপ্ত এই চতুর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসারটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজ ক'জনকে ধরে এনেছেন?

গোস্বামী বিনীতভাবে জবাব দিলেন, আজ্ঞে স্যার পাঁচজন।

পাঁচজনে এত লোক?

আজ্ঞে স্যার শুধু আত্মীয় স্বজন নয়, পাড়ার মেয়েরাও দল বেঁধে এসেছে। আজকাল দেখছেন না মেয়েরাও একটু বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। সেদিন মালী বাগানে মেয়েদের উপর লাঠি চালিয়েছি বলে আপনি বললেন, লাঠি না চালালে হত না? কিন্তু স্যার—

না না ঠিক আছে, লাঠি কেন গুলিও চালাবেন, কোন নিষেধ নেই।

কথাটি বলে দাশগুপ্ত চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

ইন্সপেক্টর গোস্বামী তাঁর কথার ঝাঁঝ দেখে একটু অবাক হলেন। এমন বেপরোয়া লোক তো উনি নন, বরং একটু সতর্ক ভাবে চলাই পছন্দ করেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ওহো! আজ তো রাইটার্সে রোটাণ্ডায় পুলিস অফিসারদের একটা বড় পর্যায়ের মিটিং ছিল, উনি তো সোজা সেই মিটিং থেকেই ফিরছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দু'জনেরই সেখানে উপস্থিত থাকবার কথা। কৌতূহল আর তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। বড় বড় পা ফেলে গিয়ে আবার দাশগুপ্তকে ধরলেন, স্যার আজ মিটিং এ নতুন কিছু নিয়ে কথা হল? মানে—

দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। সে সব পরে হবে।

আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার, বলে গোস্বামী সরে দাঁড়ালেন।

দাশগুপ্ত আর কথা না বাড়িয়ে তিন তলায় নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন।

॥ দুই ॥

সারা দেশের আইন শৃংখলা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে দাশগুপ্ত খুব একটা মানসিক শান্তিতে ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ শাসনের আমলে তিনি চাকরিতে ঢোকেন। বিদেশী শাসনের সেই অবসানের যুগেও এরকম সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে পড়েন নি। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ পরিস্থিতি যা হয়ে উঠেছে, সব কিছু স্বীকৃত নিয়ম পদ্ধতি যেভাবে ধুলোয় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাতে এতদিন বাদে আজ এই প্রথম তিনি বুঝতে পারছেন যে পুলিস বিভাগে চাকরির মানসিকতা সত্যিই তাঁর আর নেই। হয়তো তিনি এই কাজ আর বেশী দিন চালিয়ে যেতে পারবেন না। থানার কাজকর্মের সমস্ত দায়িত্ব অনেক আগে থেকেই একরকম গোস্বামীর উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে গোস্বামীই উপযুক্ত লোক। কিন্তু তাঁর এই বিরাগ বা বিরক্তির পক্ষেও খুব একটা জোরালো যুক্তি যে তিনি খাড়া করতে পারছেন তা নয়। ভাল ভাল কথা যাই বলা হোক, নির্যাতন জুলুম এবং যারা ক্ষমতায় আছে তাদের হুকুমে বিরোধীদের উপরে আঘাত হানাই গোটা পুলিস বাহিনীর কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। মানবিক দিকগুলিকে জলাঞ্জলি দেবার শিক্ষা নিয়েই পুলিসের চাকরিতে আসতে হয়। সবই মানছি কিন্তু তাহলেও—

তাহলেও কি?

পুলিশ বিভাগেরও তো চিরাচরিত নিয়ম পদ্ধতি বলে এ যাবৎ কিছু কিছু স্বীকৃত নীতি নিয়ম চলে আসছিল না কি? মনকে বুঝ দেবার মত, কাজের স্বপক্ষে একটা যুক্তি খাড়া করবার মত উপায় বা পথ খোলা ছিল।

কিন্তু এখনই বা তা থাকবে না কেন? চোরেরও চুরির স্বপক্ষে খাড়া করবার মত যুক্তি থেকে থাকে।

গোস্বামীকে বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে সমস্ত পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে চলেছিলেন দাশগুপ্ত। বর্তমানে যে সরকার গঠিত হয়েছে সেটাকে কি সরকার বলা যায়? জন্মমুহূর্তেই লোকে বুঝতে পারছে এ সরকারের আয়ু বেশী দিন নয়। আজই তিনি কানাঘুষো শুনে এলেন যে বিধানসভায় এ সরকার টিকবে কিনা তার কোন স্থিরতা নেই। শোনা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্যে কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গেছে। অবশ্য বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে

পার্থক্য কিছু নেই, কিন্তু ঐ যে যুক্তফ্রন্টের আমলের মুখ্যমন্ত্রীকে পুতুল মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে রাখা এ পরিহাসের অবসান হওয়াই ভাল। লোকটা তখন বলেছিল, 'আমি যদি আবার কংগ্রেসে ফিরে যাই তবে আমার নামে কুকুর পুষবেন।' মৃদু হেসে দাশগুপ্ত আর একটা সিঁড়ির ধাপে পা রাখলেন। কংগ্রেসে ফিরে যাবার জন্যেই তো তুমি এত কিছু করেছ বাবা, এটা কি আর লোকে বুঝতে পারছে না? রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণার পরই অবশ্য তোমার সব লাফঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে তো এখন তাই বলছে। তার পরের পরিকল্পনা যে কি তারও তো কিছু কিছু আভাস আজকের মিটিংয়ে পাওয়া গেল। পুলিসী প্রশাসনকে এমন ঘৃণ্য চক্রান্তের সঙ্গে জড়ানো কি তোমাদের উচিত হচ্ছে। আড়াই ঘণ্টা ধরে মিটিং হয়েছে। সেই মিটিংয়ের বিভিন্ন দিক এবং আলোচিত বিষয়গুলি এক এক করে স্মরণ করতে গিয়ে দাশগুপ্তের বিরক্তি আরও বেড়ে চলেছিল। একটা করে সিঁড়ির ধাপে পা রাখেন আর মিটিংয়েরই কোন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে চলেন। মিটিং রুমে তাঁর পাশেই বসেছিলেন প্রবীর দত্তরায়, তাঁর সহপাঠী, এখন একটা জেলার এস পি। মৃদুস্বরে নির্দেশগুলো নিয়ে ফোড়ন কাটছিলেন তিনি এটার মানে বুঝলে? সোজা কথায় খুনী গুণ্ডাগুলোকে বাঁচাই কর (ওঁরা যেটাকে স্ক্রিনিং করা বলছেন)। স্ক্রিনিং মানেটা বুঝতে পারছ তো? অর্থাৎ সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে খুনের কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হবে যারা—

ব্যাপারটা জান? এরা নিজেদের যতই চালাক মনে করুক আসলে এরা নির্বোধ। এতে সাধারণ মানুষের কাছে এরা আরো বেশী ঘৃণার পাত্র হবে। তার থেকে পুলিসের হাতে যদি সব কিছু ছেড়ে দিত তাতে এদের কিছুটা মুখ বাঁচতো। পুলিসের হাতে? মানে আমাদের হাতে? দত্তরায় বলেছিলেন, ত ছাড়া আবার কি? শেষে কেউ অভিযোগ করলে পুলিসের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারতো। পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছে। সব কিছুর জন্যে আমলা এবং পুলিসই দায়ী। মন্ত্রীরা এ সব ব্যাপারে কিছু জানতোই না। দাশগুপ্ত হেসে বলেন, তা বটে। ভাল বলেছো। কিন্তু মানুষ যদি এত বোকা বনতে না চায়? দত্তরায় হেসে বলেছিলেন, না চায় তখন দাওয়াই দিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছিলেন দাশগুপ্ত। জুতোর আওয়াজটা চিন্তার সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছিল। একটা করে পা ফেলেন এবং আওয়াজটা কান পেতে শোনেন, তারপর আবার পা ফেলেন, আবার সেই আওয়াজটা সুস্পষ্ট ভাবে কানে না আসা পর্যন্ত পা ফেলা বন্ধ থাকে। এই ভাবে তিন তলায় উঠতে তাঁর অনেক সময় নিলো। সাধারণত যে সময়ে তিনি ওঠেন, তার থেকে অনেক বেশী সময়। নিজের মনটাকে তিনি ঘুড়ির মত শূন্যে তুলে দিয়ে সুতো ছেড়ে যাচ্ছিলেন, যত সময় লাগে লাগুক, সিঁড়ির ধাপগুলোতে পা রাখতে কেটে যাক না ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কোন ব্যস্ততা ছিল না, সময় নিয়েও মাথা ব্যথা ছিল না, সারা দিন লাগলেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সিঁড়ির সংখ্যা সীমিত বলেই বোধ হয় অবশেষে তিনি তিনতলায় পৌঁছে গেলেন। নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল সাব ইন্‌স্পেক্টর ঘোষের সঙ্গে, তাঁরই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন মিঃ ঘোষ, পুরো নাম বিমলেন্দু ঘোষ।

একটা ফোন এসেছিল স্যার।

সাব ইনস্পেক্টর ঘোষ সলজ্জ ভাবে সামনে দাঁড়ালেন।

সত্যিকারের কোন কৌতূহল না থাকলেও দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কার ফোন?

ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনার কথাই জিজ্ঞেস করছিল। বললাম, নেই।

ঘোষের কথা মুখ দিয়ে খসতে খসতে দাশগুপ্ত ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। এই ব্যাপারে তাঁর কোন কৌতূহল ছিল না। নিজের ঘরে ঢুকে যেন একটু স্বস্তি বোধ করলেন। কোমর থেকে বেল্ট খুলে বাঁ পাশের শেল্‌ফের উপর রেখে বসে পড়লেন চেয়ারে। ক্লান্তি এবং অবসাদ ভীষণ ভাবে পেয়ে বসেছে। একটু একা এবং নিরিবিলি থাকা দরকার। কিন্তু তা কি থাকবার উপায় আছে। বিরক্তিজনক ভাবে ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অস্বাভাবিক ভাবে কয়েকবার না না বলে সশব্দে রেখে দিলেন।

মিটিংয়ের বিষয়টা নিয়েই তখনো ভাবছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থা দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। ক্লান্তিটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে সিগারেট ধরালেন, বেল টিপে সিপাই ডেকে চা আনতে বললেন। দুঃখ ঠিক নয়, লোকটা ঘৃণার পাত্র, নিজের মান মর্যাদা সব খুইয়ে বসেছে। সিগারেটের ধোঁয়া তালগোল পাকিয়ে উপরে উঠছিল, সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তোমার বাবা এবার রিটায়ার করা উচিত, তোমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। সারা মিটিংটায় দেখ কেমন বুকে থুতনি ঠেকিয়ে বসে রইলে, তুমি হলে বাপু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। পুলিশ বিভাগ চলবে তোমার নির্দেশে, আবার মুখ্যমন্ত্রীও তুমি। কিন্তু দুটি চারটি কথা যা তুমি বললে তাও উপমুখ্যমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আবার কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠা সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকালেন তিনি।

যুক্তফ্রন্টের পুলিশ মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ছিল, কথা বলত বাপের ব্যাটার মত, স্বীকার করতেই হবে।

দাশগুপ্তের স্মৃতিতে প্রায় আড়াই বছর আগে অনুরূপ একটি সভার স্মৃতি ভেসে উঠলো। বিভিন্ন থানা থেকে পুলিস অফিসারেরা এবং লালবাজারের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা ঠিক আজকের মত সে দিনের সেই সভাতেও উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন উপস্থিত সকলেই মনের দিক থেকে নিজেদের প্রস্তুত করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজটা খুবই কঠিন ছিল যদিও। দীর্ঘ কয়েক দশকের পুলিশের আলখাল্লাটা প্রত্যেকের গায়েই কেমন ভারী ভারী লাগছিল। তিনি সেদিন অনেকের দিকে কৌতূহল ভরে তাকিয়ে দেখেছিলেন, এমন কি পুলিশের একেবারে

উচ্চতম মহলের অনেক মহাত্মাদের দিকে। অনেকেই কেমন ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছিলেন, ভাবখানা এমন যেন আমরা আর সেই পুরনো আমলের লোক নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার গদিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের একেবারে বদলে ফেলেছি। আমরা বিনয়ী হয়ে গেছি, ভদ্র হয়ে গেছি, আমরা মানুষের উপর নির্বিচার দমন পীড়নকে অন্যায় বলে বুঝতে পেরেছি, শ্রমিক কৃষক এবং দরিদ্র মানুষ ও তাদের নেতাদের সঙ্গে আমরা আর চোর ডাকাত এবং খুনীদের মত ব্যবহারে বিশ্বাস করি না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের পুলিশ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত হওয়ার পর সকলে কেমন নার্ভাস বোধ করেছিলেন। আর সেই লোকটা যখন কোনরকম ভণিতা না করে (আজকের সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মত ঢোক গিলে নয়) পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, আপনারা স্বাধীনতার পরেও গত একুশ বছর ধরে অনেক কুকাজ করেছেন, আমাদের সরকার এক নতুন ধরনের সরকার। আমরা শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি। মালিকের নির্দেশে, জামদার জোতদারের নির্দেশে নির্বিচারে এতদিন যাদের আপনারা খুন করেছেন, জেলে পুরেছেন, অমানুষিক নির্যাতন করেছেন আমরা তাদের প্রতিনিধি, এ বিষয়টা আপনাদের আজ ভাল করে বুঝতে হবে। এখন থেকে আপনাদের জনগণকে পীড়ন এবং নির্যাতন করতে ব্যবহার করা হবে না, জনগণের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, পুলিসকে নিতে হবে জনগণের সেবা করার ভূমিকা।

উপস্থিত সকলের মুখের অবস্থা এর পরে কেমন দেখতে হয়েছিল? দাশগুপ্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। কেমন বোকা বোকা, বিয়ের আসরে ছাঁদনাতলায় বরকে যেমন দেখায়?

ইন্সপেকটর গোস্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। সব detail আমার শোনা হয়ে গেল স্যার। হাসি মুখে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন তিনি। যেন একটা মস্ত বড় কঠিন সমস্যা মিটে গেছে।

যেন ঝিমুনি ভেঙে তাকালেন মিঃ দাশগুপ্ত। কার কাছে শুনলেন?

কেন রমেশ? আমার সহপাঠী, আই, পি, এস,। এখন লালবাজারে আছে। একটু আগে ফোন করেছিলাম। যা যা জানবার আমার জানা হয়ে গেছে।

দাশগুপ্ত চুপ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ তিন ॥

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ছিল। মিঃ দাশগুপ্ত অবাক হয়ে ভাবছিলেন ঐটুকু বক্তব্য বলতে তাঁর এত হাঁপ ধরে উঠেছিল কেন? একি শারীরিক অসুস্থতা না মানসিক উদ্যোগহীনতা? তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটি মাত্র কথা ছিল, পুলিসী প্রশাসন ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এই ঢেলে সাজানোর ব্যাপারটা যে কি তা প্রকাশ পেল উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আরও স্পষ্ট করে। কিন্তু এত বড় একটা চক্রান্ত এরা প্রশাসনের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী করতে চাইছেন, এ কি কোনদিন চাপা থাকবে?

গোস্বামী নীরবে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে চলে গেলেন।

চা নিয়ে সপাইটি ফিরে এলো। টেবিলে কাপ রেখে জিজ্ঞেস করল, স্যার আর কিছু লাগবে?

দাশগুপ্ত পকেট হাতড়ে দেখে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিলেন।

অবশ্য ওঁরা যেটা বললেন সে অনুযায়ী কাজ তো অনেক আগ থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাঁর আর কি করবার আছে? গোস্বামীই উপযুক্ত লোক, ষোল আনা দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এতে এক দিক দিয়ে তিনিও নিশ্চিন্ত।

ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, হ্যালো।

স্যার আপনার সঙ্গে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার প্রিয় গাঙ্গুলী কথা বলতে চাইছেন। গোস্বামীর গলা।

ভ্রূ কুঁচকে গেল দাশগুপ্তের। কি কথা বলবেন তিনি?

হ্যালো। কথা বলে কি করব? ফোন ধরলেই তো বলবে, পাঁচজনকে বিনা কারণে ধরে এনেছেন। ওদের ছেড়ে দিতে হবে। এ ধরনের জুলুম বন্ধ করতে হবে। বলে দিন আমি নেই।

আচ্ছা স্যার।

ফোন রেখে দিলেন দাশগুপ্ত। জুলুম বন্ধ করতে হবে, আরে জুলুম করবার জন্যেই তো আমরা আছি, সরকার আমাদের মাইনে দিচ্ছে জুলুম করবার জন্যেই। মানুষকে ভালবাসার জন্যে পুলিস ডিপার্টমেন্টে কাউকে চাকরি দেওয়া হয় না।

চা খেতে খেতে দাশগুপ্ত শুনতে পেলেন বাইরে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। কিন্তু এটা রোজকার ব্যাপার। লোক গুলোকে এবার লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। টেবিলে পড়ে থাকা ফাইল টেনে নিয়ে তিনি কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কতকগুলি তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। বাপ্‌স্ রে। চার পাতা। রীতিমত রামায়ণ। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। যত সব ঝামেলা। কি হবে এই সব দিয়ে?

গোস্বামী আবার ঘরে ঢুকলেন। স্যার, আজ এখানে একটা খুন হয়ে গেছে।

দাশগুপ্ত গোস্বামীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনে হল গোস্বামী যেন মৃদু হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন। যেন বলতে চাইছেন, সরকার যেটা চাইছে সেটা তোমাকে করে দিতে হবে। তুমি তো আজকের মিটিং থেকে শুনে এলে কি করতে হবে, কিন্তু যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার গদিচ্যুত হয়েছে সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের কি কাজ।

গোস্বামী যেন উদ্যত হাসি চেপে ওপরওয়ালার প্রতি ছদ্ম বিনয়ের অভিনয় করে বললেন, একবার খুনের নেশায় পেলে যা হয়।

দাশগুপ্ত তেমনি করেই তাকিয়ে রইলেন। তাহলে তুমি জান কারা খুন করেছে। কিন্তু ওদের কাউকে কি

গ্রেপ্তার করা হয়েছে? পাড়ায় শান্তি রক্ষার জন্যে তুমি প্রতিদিন অভিযান চালাচ্ছ। যাদের গ্রেপ্তার করে আনছ তাদের অপরাধটা কি বলতে পার?

গোস্বামীর মুখে যেন হাসি আর চাপা থাকে না। যেন বলতে চাইলেন, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আজ রাইটার্সে তোমাকে কি জন্যে ডেকেছিলেন তাঁরা, তোমাকে দিয়ে তাঁরা কি করাতে চাইছেন?

দাশগুপ্ত কানের কাছে হঠাৎ যেন কার গলার স্বর শুনতে পেলেন? কার গলার স্বর? কার? হ্যাঁ ঠিক, রাইটার্সে আজ এই গলার স্বরই তো শুনে এসেছেন। "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। দেশের বৃহত্তম স্বার্থে দরকার হলে—"

দরকার হলে কি? সেটাও বুঝবার ক্ষমতা নেই তোমার? কতদিন থানার দায়িত্বে আছ? তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না বাপু। "আপনাদের হাতে সব দেওয়া আছে, বিনা বিচারে আটক রাখার আইন, সি. আর. পি., মিলিটারি। জেল ভরে ফেলুন। এলাকায় খুন হলে সেই খুনের মামলায়।" (কাদের জড়িয়ে দিতে হবে? তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে?) দাশগুপ্ত হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। তিনি তো ঊর্ধ্বতন অফিসার, গোস্বামীকে নির্দেশ দেবেন তিনি।

ঐ খুনের সঙ্গে জড়িয়ে এই পাঁচ জনকে আসামী করে দিন।

গোস্বামীর মুখে হাসি আরও প্রসারিত হল। পথে এসো বাবা। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, কেমন করে হবে স্যার? খুনও হয়েছে সরকার বিরোধী, এরাও সরকার বিরোধী।

তাহলে? দাশগুপ্ত বিরক্ত হলেন।

গোস্বামী আবার তাঁর চতুর হাসি হাসলেন। উপায় একটা হবে স্যার। সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

গোস্বামীর শয়তানী হাসি দাশগুপ্তকে পাগল করে দিল। এবার ঠিক ঊর্ধ্বতন অফিসারের মতই চড়া সুরে বললেন তিনি, প্রয়োজনে সরকার বিরোধীকে সরকার পক্ষীয় এবং সরকার পক্ষীয়কে সরকার বিরোধী বানাতে পারবেন না?

গোস্বামী আরও বেশী কৌতুক বোধ করলেন, সে আপনি ভাববেন না স্যার। একটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ চার ॥

গোস্বামী চলে যাবার পর দাশগুপ্ত হাই তুলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। থানার কনস্টেবলদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর কাছে অভিযোগ করেছে তারা নিরাপদ বোধ করছে না। গোস্বামী তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন তারা নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য কেন হয়েছিল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন সরকার তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে।

গতকাল সকালে নারায়ণ এসেছিল।

আসতে পারি স্যার?

কে?

আমি নারায়ণ।

কি ব্যাপার?

আমাকে আশ্রয় দিতে হবে স্যার। পুলিশে চাকরি করে প্রাণের ভয়ে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।

কি হয়েছে? ঘটনা বল।

মনে হচ্ছে আমার পেছনে লোক লাগানো হয়েছে।

গোস্বামীকে বলেছ ব্যাপারটা?

তিনি আমাদের কথা শুনবেন কেন? আমরা যে নন গেজেটেড সমিতির সদস্য ছিলাম। কোন কথা বলতে গেলে আমাদের ঐ কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

সে সমিতি তো এখন নেই।

নাই বা থাকলো। দয়া করে আমাকে ব্যারাকে থাকবার অনুমতি দিন।

কিন্তু তোমার সংসার দেখবে কে?

সে যা হয় হবে স্যার। প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে।

গোস্বামীর কাছে বল গে যাও।

তিনি বলে দিয়েছেন ব্যারাকে জায়গা নেই।

আচ্ছা আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

সুশীল, মধুসূদন, রামনরেশের উপরেও নজর আছে। একটু দেখবেন স্যার। ওরাও আপনার কাছে আসবে হয় তো।

আসবে। অনেকেই আসবে। কিন্তু কি ভাবে কাকে আশ্রয় দেবেন তিনি? যাদের আশ্রয়ে জনসাধারণ শান্তি স্বস্তিতে থাকবে—

হাতের কাছে ফোনটা যেন তাঁকে চমক দেবার জন্যেই বেজে উঠল।

হ্যালো, কি ব্যাপার?

গোস্বামী ফোন করছেন।

যে পাঁচজনকে ধরে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনের অনেকক্ষণ হল জ্ঞান ফিরছে না।

দাশগুপ্তের মনে হল গোস্বামী মুখে ফোন লাগিয়ে যেন মুচকি মুচকি হাসছেন।

ফোন ধরে চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

যদি বলেন তবে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।

দাশগুপ্তের চমক ভাঙল। বললেন, আমি নিচে যাচ্ছি।

ফোন রেখে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কেনই বা তিনি নিচে যাচ্ছেন? তাঁর যাবার কি দরকার ছিল? ছেলেটাকে মেরে ফেলে দেয়নি তো? দিলেই বা তাতে তোমার অত মাথাব্যথা কেন?

নিচে নেমে তিনি অফিস ঘরে গেলেন। গোস্বামী টেবিলে একখানা কাগজে কি লিখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, লাশটা আনতে পাঠাচ্ছি।

লাশ!

দাশগুপ্ত অদ্ভুত এক ভঙ্গী করে তাকালেন তাঁর দিকে।

গোস্বামী অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে বলেছি তো। সেই যে খুনটা হয়েছে।

দাশগুপ্ত একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

লাশ আনা ছাড়া আর কি করার আছে। হত্যাকারী কে তা জেনেও কোন লাভ নেই। সরকারী বিবেচনায় লাশটা লাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

গোস্বামী দাশগুপ্তকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। মেঝেতে পড়ে আছে একটা বিশ বাইশ বছরের ছেলে জ্ঞান নেই।

একটু বেকায়দা ভাবে চোট লেগে গেছে স্যার।

হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।

গোস্বামী চুপ করে রইলেন। হাসপাতালে নেবার ইচ্ছে যে তাঁর খুব একটা আছে তা নয়। আবার একটা কেস খাড়া করতে হবে···সংঘর্ষ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা, গ্রেপ্তারে বাধা দান।

দাশগুপ্তের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তিনি নিজেও বসে পড়লেন। আর আধঘণ্টা অন্তত তিনি দেখবেন। জ্ঞান ফিরলে হাসপাতালে নেবার ঝামেলার মধ্যে যাবেন না।

গোস্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন দাশগুপ্ত, ঠিক জানেন, এরা সরকার বিরোধী কিনা?

গোস্বামী ব্যস্তভাবে বললেন, ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের নেতাদের কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছি স্যার। কাল দেখলেন না সেই মানিক ছেলেটা—কোয়ালিশন থেকে ফোন করে বলল, আমাদের ছেলে। আপনাকে জিজ্ঞেস করে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম। আপনি ভুল হয়ে গেছে বলে ক্ষমা চাইলেন।

॥ পাঁচ ॥

সাব ইন্সপেক্টর ঘোষের স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা, নাম ইলা। ছেলেপিলে নেই। তিন বছরের উপর বিয়ে হয়েছে। সাজানো গোছানো ছিমছাম ঘর-দরজা। থানার কম্পাউণ্ডের ভেতরেই কোয়ার্টার। দোতলার পুব দিকে তাঁদের ফ্ল্যাট। বিকেল পাঁচটার কিছু আগে মিসেস ঘোষ রান্নাঘরে বসে চা করছিলেন। সাব ইন্সপেক্টর ঘোষ বারান্দায় সোফায় হেলান দিয়ে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মনমরা দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে তিনি কাগজ রেখে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চা করে নিয়ে মিসেস ঘোষ যখন এলেন তখন মিঃ ঘোষ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

কি হয়েছে তোমার?

কিছু না, এমনি।

না, নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

টিপয়ের উপর ট্রে রেখে সামনের সিটে বসলেন মিসেস ঘোষ।

মিঃ ঘোষ কাপে চা ঢেলে নিলেন।

কি হয়েছে বল তো?

সেই যে নারায়ণের কথা বলেছিলাম। মনে আছে?

আছে। এসেছিল তো সেদিন।

মনে হচ্ছে তাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে।

আঃ!

মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস ঘোষ। নকশালরা—বলছে নকশালরা, কিন্তু এর মধ্যে চক্রান্ত রয়েছে।

কি হবে গো তাহলে? এই যদি অবস্থা হয়।

কিছু করার নেই।

তাহলে?

মিঃ ঘোষ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন।

কই কিছু বলছ না যে?

কি বলব?

তুমি তো আমাকে আগে একথা বলনি কখনো?

—তোমাকে বলে কি হবে?

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই মিঃ ঘোষ অফিসে এসে পৌঁছলেন। কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। রাউণ্ডে বের হবার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর উপর। ফোনে সি আই কে বললেন, আমি বেরোচ্ছি স্যার। সাড়ে সাতটায় আফসে ফিরব। কাগজপত্র সব রেডি করে যাচ্ছি।

ড্রাইভার এসে সেলাম দিল। গাড়ি বের করা হয়েছে।

যাচ্ছি।

বাইরে এসে দুজন সশস্ত্র সিপাই নিয়ে গাড়িতে উঠলেন ঘোষ। গাড়ি স্টার্ট নিতেই পেছন থেকে তিনজন যুবক উঠে বসল। একজন অসঙ্কোচে বলল, আমরাও যাব স্যার ওদিকে।

সাব-ইন্সপেকটর ঘোষ তাকালেন ছেলেটার দিকে, আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে আগে ওকে গ্রেপ্তার করা উচিত। ধমক দিয়ে বললেন, নেমে যাও গাড়ি থেকে।

কিন্তু স্যার গোস্বামীবাবু যে বললেন আপনি ওদিকেই যাচ্ছেন।

আমি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সে খবর নিয়ে তোমার কি দরকার? নেমে যাও গাড়ি থেকে।

রাইফেল হাতে সিপাই দুজন ওদের নামিয়ে দিল।

থানার দিকে ফিরে যেতে যেতে কিছুদূর গিয়ে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলল, শালা!

গোস্বামীর কাছে গিয়ে যুবকটি রাগে ফেটে পড়ল।

দেখুন স্যার, সাব ইন্সপেকটর ঘোষ আমাদের জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেন। এরকম হলে কিন্তু স্যার—

গোস্বামী থামিয়ে দিলেন। দাঁড়াও, একটু বাদেই আমাদের একটা ভ্যান যাচ্ছে, তাতে চলে যেও তোমরা।

যুবকটি বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু স্যার ওঁর কথাবার্তাগুলো বড় বেয়াড়া। মনে হয়—

গাড়ি নিয়ে সুরপাড়ায় পৌঁছলেন মিঃ ঘোষ। সি, আর, পি ক্যাম্পের পাশে গাড়ি দাঁড় করানো হল। সন্ধ্যা হতে তখনো কিছু বাকি। বরাবরের মত সেই একই দৃশ্য দেখলেন, এক দঙ্গল যুবক ঘোরাফিরা করছে, ওদের দেহ সার্চ করলে রিভলভার ছোরা ভোজালি বেরুবে। যে চায়ের দোকানে আড্ডা মারছে ওখানে পাইপগান, লোহার রড্ বোমা সব পাওয়া যাবে। কিন্তু তাহলেও তিনি সার্চ করতে পারবেন না। কেন, পারবেন না কেন? পারবেন না কারণ তাঁর অধিকার নেই। কে বলেছে অধিকার নেই? সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বেশ তো সেই অধিকার প্রয়োগ করে দেখ না! সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন সাব ইন্স্পেক্টর ঘোষ।

দশ-বারো জন যুবক এসে তাঁর গাড়ির দরজার পাশে ভিড় করল। দীপু-কানু মদন সমীর, সামনের সারির সব কটির ঠিকুজী-কুষ্টি তাঁর জানা। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

ওদের নেতৃত্ব করছে দীপু। সেই জবাব দিল।

আপনাকে একবার দাসপাড়া যেতে হবে স্যার।

সাব ইন্সপেকটর ঘোষের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

কেন, কিসের জন্যে ?

আমাদের ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করেছিল।

সে রকম কোন রিপোর্ট তো নেই।

আপনাদের কাছে রিপোর্ট পৌঁছয় নি তাই নেই। আমরা আপনার সঙ্গে যাব, ওদের চিনিয়ে দেব।

বলছ যখন আমি ঘুরে দেখে আসব।

ঐ যে স্যার বিজন দাস। ওর হাতে পাইপগান ছিল। আপনারা এখনো তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

ফিরে দাঁড়িয়ে সে কয়েকজনকে হুকুম দিল, ওঠ তোরা। বেশী না, পাঁচ জন—রতন ওঠ।

ঘোষ বাধা দিলেন, গাড়িতে কেউ উঠবে না।

সে কি কথা স্যার। আমরা না গেলে—

তোমরা না গেলেও আমার কাজ আমি করতে পারব।

গাড়ি নিয়ে ঘোষ চলে গেলেন। পথে হাজনীয়ারিং কারখানা "ডুরাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ" এর সামনে দাঁড়ালেন। গেটে দু'জন সি, আর, পি, পাহারা বসানো আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কোন গণ্ডগোল হয়েছে ?

নেহি সাব্।

কোন আওয়াজ শুনেছ ?

নোহ।

সাব ইন্সপেকটর ঘোষ ড্রাইভারকে বললেন, চলো।

দাসপাড়ায় গাড়ি ঢুকলো। যেতে যেতে তিনি দু'পাশে তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ির স্পিড কমিয়ে দেওয়া হল। লোকজন স্বাভাবিকভাবে চলা-ফেরা করছে। সমস্ত অঞ্চলটা শান্ত এবং স্বাভাবিক।

॥ ছয় ॥

ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের সম্পাদক শান্ত মুখার্জী খুব খুঁতখুঁতে লোক। জগতে এমন কিছু লোক থাকে যারা নিজের অবস্থাতেই কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চায় না। যদি হিসেব করে দেখা যায় তবে শান্তিবাবু জীবনে পেয়েছেন যথেষ্ট, যদি ধন সম্পদ এবং ক্ষমতার কথা ধরা যায় তবে তাঁর কোন অভিযোগ থাকবার কথা নয়। (অবশ্য পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায়। আগে সংসারে দুবেলা খাওয়া জুটতো না।)।

সকাল আটটা। বসবার ঘরে বসে চা খেতে খেতে শান্তিবাবু কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় দীপু এলো।

শান্তিদা ডেকেছিলেন ?

শান্তিবাবু তখন পড়ছিলেন, "শ্রমিক নেতা খুন। হাওড়া জগাছিয়া অঞ্চলে ...স্থানীয় শাখার সম্পাদক ছুরিকাঘাতে নিহত।"

খবরটা পড়ে তাঁর মন বেশ খুশী হয়ে উঠল।

শান্তিদা !

কাগজ রেখে তিনি তাকালেন। তুই শালা কিছুদিন নকশাল দলে ঢুকে ছিলি না ?

দীপু কেমন একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু আমি তো—

আরে না না, তোকে আমি সেজন্যে কিছু বলছি না। হ্যাঁ, কি বলছিলি ? তোকে আমি কেন ডেকেছি ?

তাই তো জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।

ডুরাণ্ডে শালারা হরতাল ডেকেছে। ওর মালিক কাল আমাকে ফোন করেছিল।

রতন, দিলু এবং সমীর এসে ঘরে ঢুকলো।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে দিলু বলল, শান্তিদা এরকম হলে তো আর পারা যায় না।

কি হয়েছে রে ?

থানাটাকে সায়েস্তা করুন।

কেন কি হয়েছে ?

ঐ সি, আই টা কোন কাজের না। বুড়ো হাবড়াটাকে সরান এখান থেকে। একটা জোয়ান শুয়োরের বাচ্চাকে নিয়ে আসুন।

॥ সাত ॥

মিঃ দাশগুপ্তের কাছে আবার কয়েকজন কনস্টেবল এসেছিল। দ্বিতীয় বার এসেছিল নারায়ণ। কিন্তু একটা করুন স্যার। বলেছিলেন, দেখছি। ওদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকজন পুলিশের লোক খুন হয়ে গেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আর অস্বীকার করা যায় না। সেদিন সকালে অফিসে গিয়ে তাই গোস্বামীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ওদের ব্যারাকে রাখবার ব্যবস্থা করুন। গোস্বামী বললেন, জায়গা কোথায় স্যার ?

জায়গা কোথায় বললে তো হবে না। ব্যারাকে জায়গা না থাকে এই থানার মধ্যেই কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এমন দৃঢ়ভাবে তিনি বললেন যে গোস্বামী একটু ভড়কে গেলেন।

সমাধান কিছু হল না। কিন্তু দাশগুপ্তের দিকেও আর বাধা রইল না কিছু। গোস্বামীকে যা বলার বলা হয়ে গেছে।

এরপর তিনি নিজেই থানার মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খুব একটা খারাপ জায়গায় যাতে তাদের ডিউটি না দেওয়া হয় এবং ডিউটি দিলেও যেন যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় সে নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন। এখনো পর্যন্ত কোন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটেনি।

কিন্তু তাঁকে সব থেকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে থানার পরিবেশ।

ঘোষ তাঁর কাছে কয়েকবার এ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি। বিশেষ করে ঘোষের কথায় কোন কাজ করতে যাওয়াতে বিপদ আছে। তা ছাড়া কোন ব্যবস্থা নিতে যাওয়ার ঝুঁকি যে কত সেটাও তাঁকে ভাবনার মধ্যে ফেলেছিল। ভেবেই পাচ্ছিলেন না কি করবেন তিনি ?

এই কি করবেন, কি করবেন ভাবতে ভাবতেই একটা ভয়ংকর ঘটনা সেদিন ঘটে গেল। রাত্রে লক আপের ভেতর থেকে একজন বন্দীকে বের করে খুন করে দিল ঐ বাইরের ছেলেগুলো।

খবর পেয়ে রাত দুপুরে থানায় এসে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন দাশগুপ্ত। গোস্বামী এবং ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। গোস্বামীকে বললেন, নিয়ে আসুন খুনীটাকে আমার কাছে। এত রাগ হয়েছিল তাঁর যে কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল। যুবকটিকে ধরে তাঁর সামনে নিয়ে আসা মাত্র তিনি

রাগে ফেটে পড়লেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে লক-আপে পোরা হল। নির্দেশ দিলেন কিভাবে ঘটনা ঘটল তার পুরো রিপোর্ট চাই।

ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে দাশগুপ্ত কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর সুদীর্ঘ চাকরি জীবনে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। ঘটতে পারে এটা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

বাড়িতে ফিরে তিনি বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। অন্ধকার রাত, পেছনে কৃষ্ণচূড়া গাছে রাতের পাখির পাখা ঝাপটানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনা যতই তিনি ভাবতে চেষ্টা করছিলেন ততই তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা থাকছিল না। সম্পূর্ণ একজন বাইরের লোক থানা লক আপ থেকে বন্দী বের করে থানার মধ্যে তাকে হত্যা করবে এ কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তাও সম্ভব হল এবং তিনি যে থানাতে আছেন সেই থানাতেই।

মিসেস দাশগুপ্ত এসে বললেন, শুতে চল। যা হয়েছে সে তো হয়েছেই। আহা, কোন মায়ের ছেলে গো।

বলে নিজেই আবার শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

দাশগুপ্ত তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, কি যে করব বুঝতে পারছি না। কোন্‌টা যে কিভাবে সামাল দেব আমার মাথায় আসছে না।

ফোনের আওয়াজ কানে এলো। মিসেস দাশগুপ্ত ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে। হ্যালো। কি ব্যাপার। আচ্ছা দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

দাশগুপ্ত উঠে গেলেন।

আপনাকে এখনই একবার আসতে হবে স্যার।

গোস্বামী বলছেন।

ফোন রেখে দিয়ে দাশগুপ্ত ঘুরে দাঁড়ালেন।

কি হল? মিসেস ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

একজন বড় দরের রাজনৈতিক নেতা এসেছেন। ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমার ধারণা খুব খারাপ। বুঝতে পারছি তাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

থানায় পৌঁছে অফিস ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গোস্বামী উঠে দাঁড়ালেন।

এই যে মিঃ দত্ত। আপনার খোঁজে এসেছেন স্যার।

আমার খোঁজে এত রাতে।

আপনার থানায় এসব হচ্ছে কি আজকাল?

চড়া গলায় দত্ত প্রশ্ন করলেন।

দাশগুপ্ত অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। ভদ্রলোক চেয়ারে আমরী চালে বসে আছেন, পেছনে জনা পাঁচেক যুবক দাঁড়িয়ে, তাঁদের চেহারা হাবভাব মোটেই ভদ্রোচিত নয়। চোখের চাহনি এবং ঠোঁটের কোণে হাসি রীতিমত আপত্তিকর।

দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

কি হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করছেন? থানার মধ্যে একজন বন্দীকে খুন করা হল আবার বলছেন কি হয়েছে?

কোন কথা না বলে দাশগুপ্ত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তারপর চুপ করে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোকের দিকে।

মিঃ দত্ত বললেন, এর পুরো দায়িত্ব আপনার। কালই আমি এ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে—

একটু দূরে বসেছিলেন সাব ইন্‌স্‌পেকটর ঘোষ। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু ওঁকে দায়ী না করে যারা সত্যিই দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কিছু ব্যবস্থা নিন।

যেন একটা বোমা ফাটল।

দত্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনাকে আমি চিনি। আপনাদের দুজনের জন্যেই এ থানার আজ এই অবস্থা। কোন্ সাহসে আপানারা আমাদের একজন কর্মীকে হাজতে ভরে দিলেন?

দাশগুপ্ত শান্তভাবে বললেন, কিন্তু থানার মধ্যে একজন বন্দী যদি বাইরের লোকের হাতে খুন হয়ে যায়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে দত্ত বলে উঠলেন, সে কথাই তো বলছি। এক্ষুনি ছেড়ে দিন না হলে ঠিক এই কথাই কাল আমি—

কি বললেন?

দাশগুপ্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন না?

এটাকে সাদা কথায় বলে ব্ল্যাক-মেলিং মিঃ দত্ত।

ধীরে ধীরে কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবে কথাটা বললেন দাশগুপ্ত।

দত্ত যেন অবাক হলেন। এতবড় স্পর্ধাসূচক কথা তাঁর সামনে কেউ বলতে পারে এটা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। রাগে আত্মহারা হয়ে বললেন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। যুক্তফ্রন্টের রাজত্ব আর নেই মনে রাখবেন। দেশের ভাগ্য যে পুলিশের মধ্যে আপনাদের মত বর্ণচোরা বামপন্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। মনে রাখবেন আপনাদের দিন শেষ। যে দু'চারজন আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

দাশগুপ্ত আগের মতোই শান্তভাবে বললেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নিশ্চয় আপনারা তার বিচার করবেন। সরকার যেভাবে বলবেন আমিও সেই ভাবেই চলব। এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবান্তর বলে আমি মনে করি। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি তাই বলুন। থানা লক আপ থেকে বন্দী বের করে—

কে বের করেছে? বাইরের লোক থানা লক আপ থেকে কি করে বন্দী বের করবে? করলে আপনার থানার লোকই তা করেছে। গ্রেপ্তার করতে হলে তাদের গ্রেপ্তার করুন।

এবার সত্যিই কোন জবাব দিতে পারলেন না দাশগুপ্ত। খুবই সত্যি কথা। তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। গলা রুদ্ধ হয়ে এল। কেবল অসহায়-ভাবে তাকিয়ে রইলেন এমন একটা লোকের মুখের দিকে যার সম্পর্কে তিনি ঘৃণা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে পারছে না।

মিঃ দত্ত বলে চললেন, বহু থানার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কিন্তু আপনার মত অফিসার একটিও

আমার চোখে পড়েনি। যাকে খুন করা হয়েছে তার পরিচয় জানেন আপনি? তাকে থানা পর্যন্ত আনাই উচিত হয়নি।

থানা পর্যন্ত আনাই উচিত হয়নি? কি বলছে লোকটা? এমনভাবে খোলাখুলি, নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে—

একজন আইনসভার সদস্য হয়ে তুমি কিনা এমন নির্লজ্জের মত একজন পুলিশ অফিসারকে বলছ—কি বলছ? বলছ খুন করতে? আমার মত পুলিশ অফিসার কোন থানায় নেই? থানা পর্যন্ত এনেছি বলে আমি অপরাধী? আমি জাতিচ্যুত, জাতের বাইরে?

কিন্তু আমাকে তো আইন—

দাশগুপ্ত যেন খানিকটা অসহায়ভাবে কি বলতে চাইলেন। কি যে বলবেন সেটাই যেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

রাখুন আইন। দত্ত আবার ধমকে উঠলেন। নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্যে আপনারা আইন আইন করেন। কিসের আইন? পুলিস চিরকাল যে আইনী-কাজ করে এসেছে, আজও করছে। কোনদিন তারা আইন মেনে কাজ করেছে বলতে চান? মনে করেন বুঝি আমরা আর কিছু জানি না?

কি জবাব দেবেন দাশগুপ্ত? এর কি কোন জবাব আছে? সবই তো সত্যি—সব, সব। কিন্তু জবাব চাইছে কে? কে প্রশ্ন করছে?

দত্ত আর কথা না বলে উঠে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করলেন। কারো কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখলেন না। পর পর অনেক জায়গায় অনেকগুলো ফোন করে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলা শুরু করলেন।

দাশগুপ্ত নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাশের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ফাঁকা ঘর, কেউ নেই। একটা চেয়ারে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। কেন তিনি উঠে এলেন? এভাবে চুপ করে বসে থাকবারই বা কারণ কি? ঐ লোকটার কাছ থেকে ছুটে চলে আসবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল তাঁর প্রাণটা। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? কি করবেন? এদের হুকুম অমান্য করে পার পাবার ক্ষমতা আছে তাঁর? কিন্তু হুকুম তো তিনি অমান্য করতে চান না। এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন কি করবেন তিনি?

থানার লক্-আপ খুলে বন্দী বের করবার হুকুম কে দিল? এ খুব সঙ্গত প্রশ্ন। কে হুকুম দিয়েছে, কিভাবে বন্দী বের করা হয়েছে সব খবরই তাঁর কাছে এর মধ্যে এসে গেছে। সবই জানতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন কি তিনি? অসম্ভব। অসম্ভব। এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থায় কোন নিয়ম-নীতি চলতে পারে না। মিঃ দত্তরা যা চাইবেন তাই হবে। হ্যাঁ, তাই হবে। তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এখানে তর্ক মূল্যহীন। আর সত্যিই তো পুলিশ বিভাগে নিয়ম-নীতি কবে ছিল? মিঃ দত্ত তো ঠিকই বলেছেন। থানা পুলিশ মানেই তো যত দুষ্কর্ম অপকর্ম অন্যায়—সব, সব। অন্যরকম আবার কবে ছিল। কি ছোট, কি বড়—কনস্টেবল থেকে অফিসার। কিন্তু, কিন্তু তাহলেও—

অল্পবয়সী একজন অফিসার সুশান্ত গাঙ্গুলী এসে ঘরে ঢুকলেন।

স্যার আপনাকে একবার ওঘরে যেতে হবে। ফোন এসেছে।

দাশগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওঁরা কি আছেন, না চলে গেছেন?

চলে গেছেন স্যার।

দাশগুপ্ত তাঁর পেছন পেছন আগের ঘরে এলেন।

হ্যালো।

ফোনে কান লাগিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, আচ্ছা স্যার যা বলছেন তাই করছি।

চেয়ারে এসে বসতে গিয়ে যেন তাঁর পা কেঁপে উঠল। কোনরকমে টাল সামলে নিলেন। অফিসার কর্মচারী সিপাই সকলের সামনে তিনি গোস্বামীকে ডাকলেন পরামর্শ করবার জন্যে। মনে মনে বললেন, আমার কি। আমি ওপরওয়ালার হুকুম পালন করছি। ওপর থেকে যা হুকুম আসবে আমাকে তা পালন করতেই হবে। কিন্তু সকলের কাছে তুমি অপদস্থ হলে না কি? অপদস্থ হওয়ার কি আছে, আইনতো যা করবার আমি তাই করেছিলাম। এখন তা হলে যা করছ তা আইন সঙ্গত নয়? হয়তো নয়। কিন্তু ওপরওয়ালার নির্দেশ।

যাকে হাজতে রাখা হয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। মৃতদেহটিকে জিপে করে নিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার ধারে রেখে আসবার নির্দেশ দিয়ে তিনি কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

॥ আট ॥

পরদিন সকাল।

মিঃ দাশগুপ্ত সাধারণত আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে ওঠেন। কিন্তু সেদিন অনেক রাত করে শুয়েছিলেন বলে উঠতে একটু দেরি হল। প্রাতঃকালীন কাজকর্ম সেরে তিনি বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলেন। মিসেস দাশগুপ্ত চা দিয়ে গেলেন। এইবার রাতের ঘটনাটা তাঁর ভাবনাকে অধিকার করে বসল। এতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকায় চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে তার প্রথমেই মনে হল পরবর্তী করণীয় কি। করণীয় আবার কি? কিছুই না। যা করবার গোস্বামীই করবেন। গোস্বামী, মণ্ডল, গাঙ্গুলী, তালুকদার—কত অফিসার আছেন। কেন ঘোষ নেই? ঘোষের কথা ভাবছেন না কেন তিনি? না, না, কেন ভাবব না? তবে এসব কাজ এখন ওঁদের দিয়েই ভাল হবে। ভাল হবে? কেন? ওঁদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। তাছাড়া। তাছাড়া কি? কেন, গত রাতে মিঃ দত্ত কি বললেন শোন নি? কি বললেন? বললেন ঘোষ এবং তোমার মত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ ঘোষ এবং তুমি এক শ্রেণী ভুক্ত। তোমার অপরাধ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ঘোষের অপরাধ? অপরাধ নিশ্চয় কিছু আছে। বর্তমান সরকারের নীতি অনুযায়ী ঠিকমত

কাজ দিতে পারছেন না তিনি। নিশ্চয় যা করা দরকার তিনি তা করছেন না।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এটা কিরকম হল? থানার মধ্যে ঢুকে বাইরের লোক একজন বন্দীকে—

কিন্তু তোমার ছোকরা অফিসার গাঙ্গুলী যখন তাকে লক-আপ থেকে বের করে মস্তানদের হাতে তুলে দিল তখন আইন কোথায় ছিল? এরকম ঘটনা আমি জীবনে কখনো শুনিনি, কখনো ঘটতে পারে ভাবিনি। এ পরি স্থিতিতে তুমি কি করতে পারতে? সে কথাই তো ভাবছি, কি করতে পারতাম? সমস্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা দিতেই হত কারণ যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক এই ঘটনা তাকে কাঁপিয়ে তুলত, জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিত। ...ভুল, ভুল। সেদিন আর নেই। বৃটিশ আমল হলে তাই হত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এযাবৎ যে সরকারগুলি হয়েছে সেখানেও হয়তো কিছু প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন এগুলো কিছুই না। খবরের কাগজগুলো এর জন্যে তাদের পৃষ্ঠগুলোতে কোন জায়গাই দিতে পারত না। কেউ কিছু বললে সরকার থেকে ঘটনা অস্বীকার করা হত, আর তা ছাড়া সন্ত্রাস খুন সব কিছুর জন্যে দায়ী তো বিরোধীরা।

যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তাহলে তুমি এটাকেই সমর্থন করছ। করছি সমর্থন না করে উপায় কি? এ সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল? কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তুমি সরকারের শুভ বুকে উঠতে পারছে না। না পারলে আর কি করা যাবে।

একটু বেলা করে অফিসে গেলেন মিঃ দাশগুপ্ত। রাতের ঘটনার অবশিষ্ট আর যা কিছু সব ঠিক ঠিক করা হয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাস্তা থেকে মৃত দেহ নিয়ে এসে ময়না তদন্তের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

যাক নিশ্চিন্ত। আবার যে যার মত অফিসের কাজে মন দিয়েছেন। কেবল—

কেবল, ঐ যুবকটি কে?

দাশগুপ্ত খানিকটা এগিয়ে গেলেন। এই তো সেই খুনী। এখনো থানার মধ্যে? কোন্ সাহসে এখনো সে থানার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়?:

এই শোন। এদিকে এসো।

যুবকটি এগিয়ে এলো।

তুমি এখানে কেন?

এমনি।

ঐমনি। বেরিয়ে যাও থানা থেকে। বেরিয়ে যাও—

একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা।

সাব ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন ঘটনাটা।

যাও, বেরিয়ে যাও—

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেলেন দাশগুপ্ত তার দিকে।

একজন সিপাই ছুটে এলো।

ছেলেটা উদ্ধত চোখে তাকালো দাশগুপ্তের দিকে।

সিপাইটি তাকে ধরে গেটের দিকে ঠেলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

গাঙ্গুলী এগিয়ে এলেন। ছেলেটার কাছে গিয়ে বললেন, যাও। চলে যাও। গণ্ডগোল করো না। যাও—

ছেলেটা সিপাইয়ের ধাক্কা খেয়ে একটু একটু সরতে সরতে দাশগুপ্তের দিকে প্রতিহিংসার চোখে তাকিয়ে বলল, আমি দেখাচ্ছি তোমাকে শালা। তুমি আমাকে বের করবে না আমি তোমাকে বের করব শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে সেটা। বড্ডো বাড় বেড়েছে তোমার।

গাঙ্গুলী তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন।

এ অসহ্য।

দাশগুপ্ত ঘৃণাভরে তাকিয়ে রইলেন ওর চলে যাবার দিকে।

॥ নয় ॥

সারা শহরটা যখন ঘুমোয় তখন নিশুতি রাতের বুকে থানার বড় বড় হেডলাইট দুটো জ্বালা থাকে। রাস্তায় ভাল রকম আলো থাকা সত্ত্বেও গেটের মাথায় ঐ লাইট দুটো কেন লাগানো হয়েছে কেউ জানে না। রাত শেষ হয়ে যাওয়া পরও অনেক বেলা পর্যন্ত ও দুটোকে জ্বলতে দেখা যায়। মনে হয় নেভাবার কথা বোধহয় কারো মনে থাকে না। রাতের বেলা, বিশেষ করে মধ্য রাতের জনহীন নিস্তব্ধ পরিবেশে মনে হয় যেন দুটো চোখ, শয়তানের চোখ, সারা রাত ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছে। কি দেখছে, কাকে দেখছে কে জানে। রাত যত বাড়ে চোখের জ্যোতি তত বাড়ে, শেষে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তখন ও দুটোকে খুবই ঘৃণ্য মনে হয়, রাতজাগা ক্লান্ত চোখ দুশ্চরিত্র কলঙ্কিত কেউ বলে মনে হয়।

ঐ চোখ দুটোর সামনেই সেদিন নিশুতি রাতে চারখানা লরি এসে দাঁড়ালো, চারখানাই সামরিক বিভাগের লরি এবং প্রতিখানা লরীতে পঁচিশ জন করে জওয়ান। স্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল এবং আরও নানা যুদ্ধাস্ত্রে তারা সজ্জিত।

রাত তখন দুটো। মিঃ দাশগুপ্ত নিখুঁত ভাবে পদমর্যাদা অনুযায়ী পোষাক পরে থানায় এলেন। পোষাকে এবং চেহারায় অতবড় থানার দায়িত্বের উপযোগী মর্যাদা যথোপযুক্ত ভাবে ফুটে বেরোচ্ছিল, সেই সঙ্গে তাঁকে স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী গম্ভীর এবং রিজার্ভ দেখাচ্ছিল।

নিচে অফিস ঘরে তিনি যখন এসে ঢুকলেন তখন সেখানে একজন সামরিক অফিসার বসে ছিলেন, তিনি চেয়ার ছেড়েও উঠলেন না এবং দুজনের মধ্যে কোন অভিবাদন বিনিময়ও হল না। দাশগুপ্ত একখানা চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলেন, মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর। ইন্সপেক্টর গোস্বামীর সঙ্গে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর কাগজপত্রে দ্রুত হাতে কি সব লিখে চলেছিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর ঘোষ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে নানা জনকে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দাশগুপ্তের প্রায় মুখোমুখী (একটু ডান দিক ঘেঁষে) সেই সামরিক অফিসার আর

একখানি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে উদাসীনভাবে পাইপ টানছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন তাঁর কাছে তুচ্ছ এবং অতিরিক্ত হালকা বা গুরুত্বহীন বলে মনে হচ্ছিল। ওদিকে দাশগুপ্তের মুখের দিকে তাকালেই বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত, কপালে রেখারি ভাঁজ পড়েছে, মুখখানা কুঞ্চিত, চশমার আড়ালে চোখ দুটো বিরক্তিতে ভরা। মনে হচ্ছিল উপস্থিত সমস্ত কিছু কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি যেন একান্তে সরে রয়েছেন। আসলে তাঁর মনের মধ্যে ঝড় বইছিল। এ ঝড়ের চরিত্র আলাদা। ব্যক্তিগত ভাবে একটা মানুষ নিরুপায় এবং অসহায় বোধ করলে এমন অবস্থা হয়। আগের দিন দুপুরের ঘটনাটা তিনি এখনো ভুলতে পারছেন না। এখনকার এই কর্মব্যস্ততার পেছনে কাজ করছে সেই ঘটনা। এত দ্রুত এবং ত্বরিত গতিতে ঘটনার পরিণতি তাঁকে হতভম্ব করে দিয়েছে। বেলা তখন এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে। উপরে নিজের ঘরে বসে তিনি একটা জরুরী কাজ করছিলেন এমন সময় দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে একজন লোকসভার সদস্য তাঁর ঘরে ঢুকলেন। এর আগে ঐ সদস্য তাঁর কাছে আরও দুবার এসেছেন, সেই দুবারের অভিজ্ঞতা তাঁর মোটেই ভাল নয়। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি বিনীতভাবে যথোচিত অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। মনের মধ্যে একটু শঙ্কা এবং অস্বস্তির ভাব যে ফুটে উঠল না তা নয়।

লোকসভার সদস্য কিন্তু তাঁর বিনীত অভ্যর্থনার কোন দামই দিলেন না। সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেই ভদ্রতার বিন্দুমাত্র মুখোশ না রেখে বলে বসলেন, আপনাকে থানার চার্জে আর রাখা চলবে না; আপনি এই সরকারের যারা শত্রু তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

প্রৌঢ় মিঃ দাশগুপ্ত খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন ঐ ভদ্রলোকের দিকে। এর আগে আরও যে দুবার ঐ মাননীয় সদস্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা বিশেষ করে স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে নিলেন। প্রথমবার সাক্ষাতের সময় ঐ সদস্য যখন তাঁকে ক্রমাগত অপমান করে করে কথা বলেছিলেন তখন তিনি উষ্মা প্রকাশ করে একটা পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, মনে রাখবেন, প্রয়োজন হলে আমি খোদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে হুকুম নিয়ে আসতে পারি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যোদয় হয়েছিল মিঃ দাশগুপ্তের। রাজনৈতিক জগতের খবর তিনি সবই রাখেন এবং ঐ সদস্যের ইন্দিরা গান্ধীর উপরে যে খুবই প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা আছে সেটা তাঁর অজানা ছিল না। পশ্চিমবাঙলার শাসক দল এবং সরকারের উপরও যে তাঁর অসাধারণ প্রভাব তার প্রমাণ প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক প্রভাবের সুযোগ নিয়ে একজন লোকসভার সদস্য যে তাঁকে এই ভাবে হুমকি দেবেন, অপমান করবেন এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাছাড়া লোকসভার সদস্য হলেও সদস্যটির নেহাত ছোকরা বয়েস, তাঁর বড় ছেলে যে এখন আই এ এস অফিসার হয়ে দিল্লীতে পোস্টেড আছে তার থেকে এই সদস্য সামান্যই বয়সে বড় হবেন। নিজের ছেলের বয়েসী একজন যুবক, সে লোকসভার সদস্য হলেও সে যে তাঁকে এই ভাবে অপমান করবে, ধমক দেবে, এটা তার পক্ষে হজম করা কঠিন হয়ে পড়ছিল।

ঐ ছোকরা সদস্য এর পরেই বলেছিলেন, যুক্তফ্রন্টের আমলে আপনাকে এখানে আনা হয়েছিল, মনে রাখবেন সেকথা আমরা ভুলে যাই নি।

প্রায় চুয়ান্ন বছর বয়সের এই প্রৌঢ় সি আই, যাঁর পুলিশ বিভাগে ত্রিশ বছরের উপর চাকরি হল তিনি ক্ষোভ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে অথচ বেশ সংযতভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, কোন সরকার যদি আমাকে একখান থেকে আর একখানে নিয়ে কাজের দায়িত্বে বসিয়ে থাকে তবে সে কি আমার দোষ বলে বিবেচিত হবে?

ঐ ছোকরা লোকসভার সদস্য সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে বলে উঠেছিলেন, ও সব ছেঁদো কথা রাখুন। এ অঞ্চলে সরকার বিরোধী দলগুলোর শক্তি বেশী, ঐ শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, ভেঙে দিতে হবে তাদের ঘাঁটি গুলো, আমরা কাজ চাই।

এই ধমকের পরেও মিঃ দাশগুপ্ত ধৈর্য বজায় রেখেছিলেন। শান্ত ভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে যে ভাবে হুকুম করবেন, আমি সেই ভাবেই কাজ করব।

ক্ষেপে গিয়েছিলেন ছোকরা সদস্য। বলেছিলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমি। হ্যাঁ, আমি বলছি, আপনার ওপর ওয়ালা এখন আমি। আমি যা বলছি তাই আপনাকে করতে হবে।

মোটামুটি এই হল সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতের স্মৃতি।

তারপর দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে সেই ঘটনা মিঃ দাশগুপ্তের আত্মসম্মানবোধকে শেষ নাড়া দিয়ে গেছে। গতকাল তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন ঐ লোকসভার সদস্যের নির্দেশেই তাঁর বিরুদ্ধে একটা গভীর চক্রান্ত চলেছে।

"আপনাকে আর থানার চার্জে রাখা যাবে না,"—ঐ ছোকরা সদস্যের মুখ দিয়ে উচ্চারিত এই কথাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এই থানা থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন।

আপনাকে কাল থেকেই বিরোধী দের ঘাঁটিগুলোতে কোম্বিং অপারেশন চালাতে হবে।

যাবার সময় ঐ সদস্য তাঁকে এই হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন।

এত সত্ত্বেও মিঃ দাশগুপ্ত নিজের যুক্তির বাইরে যাননি, ব্যবহারেও সংযম এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। শান্ত ভাবে বলেছিলেন, ওপর থেকে যে নির্দেশ আসে আমি সব সময়ই তা পালন করে থাকি। আপনার নির্দেশ আমি শুনলাম, কিন্তু এটা তো ঠিক

অফিসিয়াল নির্দেশ হল না। নির্দেশ এলে নিশ্চয় আমি সেটা পালন করব।

লোকসভার সদস্য যাবার সময় ক্ষিপ্ত হয়ে বলে গিয়েছিলেন, আপানার সম্পর্কে আসল নির্দেশ যাতে শিগ্‌গিরই আসে তার ব্যবস্থা আমি করছি।

এই ঘটনার পরে সারাদিন ভয়ানক মানসিক অশান্তিতে কাটিয়েছেন মিঃ দাশগুপ্ত। কোন কাজেই প্রায় মন দিতে পারেন নি।

কোয়ার্টারে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বলেছিলেন শরীর খারাপ, কেউ তাঁকে সেজন্যে বিরক্ত করেনি।

আজ সারাদিন স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছিলেন। মনে উদ্বেগ এবং অস্বস্তির ভাব সব সময়ই ছিল। অবশেষে রাত দশটায় তাঁকে লালবাজার থেকে ফোনে নির্দেশ দেওয়া হল কোম্বিং অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হতে। গোস্বামীকে ডেকে সমস্ত প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়ে তিনি রাত এগারোটায় কোয়ার্টারে ফিরেছিলেন। এর আগে অবশ্য আর একটা কাজ করেছিলেন। মিঃ ঘোষকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, কোম্বিং পার্টির সঙ্গে আপনার যাবার দরকার নেই। আসলে আমি আপনাকে যেতে নিষেধই করছি, বুঝতেই পারছেন। আপনি নিশ্চয় আমাকে ভুল বুঝবেন না।

মিঃ ঘোষ বলেছিলেন, না স্যার।

আর কোন কথা না বলে ঘোষ তাঁর সামনে থেকে সরে চলে গিয়েছিলেন। দাশগুপ্ত তাঁর চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বুদ্ধিমান অফিসারটি সবই জানেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের সভাপতি নিজে এসে তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন যে মিঃ ঘোষ বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু এ একেবারে তাহা মিথ্যা। দাবি উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার। অথচ এই অভিযোগ যে কতবড় মিথ্যা তা দাশগুপ্ত ভাল করেই জানেন। ঘোষ একজন সৎ এবং যোগ্য অফিসার। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির কোন দাম এদেশ কোনদিন দেয়নি, দিতেও জানেও না। সে যাক্ গে, পরিস্থিতি যা সেই অনুযায়ী চলতে হবে।

মিঃ গোস্বামী বাইরে থেকে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কয়েদী গাড়ি কটা সঙ্গে যাবে স্যার?

চেয়ারে যে অবস্থায় বসেছিলেন দাশগুপ্ত সেই অবস্থায় বসেই সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে জবাব দিলেন। একটা নিয়ে যান, তাতে যদি না কুলোয় কিছু লরিতে বসিয়ে আনবেন।

সামরিক অফিসার পাইপটা মুখ থেকে বাঁ হাতে নিয়ে তাকালেন মিঃ দাশগুপ্তের দিকে, ভ্রূকুটি করলেন, কি বলতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

॥ দশ ॥

বিরাট অভিযান পরিচালিত হল। চার ট্রাক জওয়ান, এক ট্রাক সশস্ত্র পুলিস, বিরাট কয়েদী গাড়ি এবং দুখানা জিপ। রাত্রির জনহীন নিঃশব্দ রাস্তা দিয়ে চলল একটা বিরাট কনভয়।

দাসপাড়ার মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল সৈন্যবাহিনী এলাকা ঘিরে রেখেছে এবং সশস্ত্র জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে পুলিস অফিসার বাড়ি বাড়ি হানা দিচ্ছেন।

পাড়ার লোক একটুও অবাক হল না কারণ এর আগে আরো দুবার এই ঘটনার সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে।

বেলা এগারোটায় কোম্বিং অপারেশন শেষ হল। তেত্রিশ জন যুবক ধরা পড়ল, এই ধরা পড়বার জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধ বা অভিযোগ কিছু নেই। সন্দেহ করা হল তারা সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ঠিক দুপুর বেলা সাব ইন্সপেকটর ঘোষ অফিসে কাজ করতে করতে একখানা চিঠি পেলেন, পোস্ট অফিসের সিল মারা একখানা খামের চিঠি। খাম খুলে চিঠি পড়ে মাথা তাঁর কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো। সেটা ক্রোধে না ঘৃণায় না ভয়ে সেটা তাঁর পক্ষে নির্ধারণ করা তখন সম্ভব ছিল না। চিঠি মানে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ, তাতে লেখা আছে—

"মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

এই কথা কটি ছাড়া কাগজটাতে আর কিছু লেখা নেই।

সাব্ ইন্সপেকটর ঘোষ চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, হাতের কাজ পড়ে রইল। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি শেষে দাশগুপ্তের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দাশগুপ্ত একখানা টাইপ করা কাগজের বাঁ পাশে মার্জিনে কি যেন নোট লিখছিলেন, চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার? কি রকম দেখাচ্ছে আপনাকে। শরীর খারাপ নাকি?

না স্যার।

ঘোষ চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে লেখা কাগজটার উপর চোখ বুলানো পর দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন?

সাব্ ইনসপেকটর ঘোষ পোস্ট অফিসের সিল দেওয়া খামখানা তাঁর হাতে দিলেন। আগ্রহ ভরে খামটা নিয়ে চিঠি এবং খাম দুটোই বার কয়েক উলটে পালটে দেখলেন দাশগুপ্ত। মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তির আভাস ফুটল। টাইপ করা যে কাগজের মার্জিনে নোট লিখছিলেন সেটার উপর চোখ রেখে বললেন, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন আর কি!

ঘোষ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাদের জীবনেরও তাহলে নিরাপত্তা বলে আজ আর কিছু নেই স্যার!

তা তো বটেই।

দাশগুপ্তের নেহাত মুখ ফস্কেই যেন কথাটা বেরিয়ে গেল।

আমাদেরই যদি নিরাপত্তা না থাকে তবে জনসাধারণের নিরাপত্তাটা কোথায়?

দাশগুপ্ত অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘোষের এই কথার কোন জবাব দিলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে শেষে বললেন, আমার সম্পর্কে অর্ডার এসে গেছে। থানার দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়েছি আমি। এই মাত্র চিঠি পেলাম, আর মাত্র তিন দিন এ থানার দায়িত্বে আছি। তারপর আপনাদের নতুন সি. আই. আসছেন।

ঘোষ সবিস্ময়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না? হাসলেন দাশ গুপ্ত।

কেন বিশ্বাস হবে না স্যার? আপনার জায়গায় কে আসছেন?

মিঃ রামচন্দ্র মহাতো।

ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠির ব্যাপারটা আমি কি কিছু অনুসন্ধান করব স্যার?

করুন, কিন্তু অনুসন্ধান করে আপনি কি কিছু করতে পারবেন? কোথায় খুঁজবেন? কাকে ধরবেন?

করতে পারা যাবে না কেন স্যার? পারা যায়, তবে তার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ঘোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপনাকে আর বিরক্ত করব না স্যার। যা ভাগ্যে থাকে হবে। আপনাকেও যখন থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন বুঝতে পারছি অবস্থা বিশেষ সুবিধের না।

দাশগুপ্তর ঘর থেকে বেরিয়ে মিঃ ঘোষ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন। মনের ভারসাম্য তাঁর দারুণ ভাবে বিচলিত হয়েছিল। থানার দায়িত্ব থেকে দাশগুপ্তকে সরিয়ে দেওয়া তাঁর কাছে একটা প্রচণ্ড দুঃসংবাদ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে তিনি একতলায় অফিস ঘরে গেলেন। যাদের গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে তাদের ব্যাপারে ঝামেলা এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু তাঁর ডিউটির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি আর বসলেন না। কানের মধ্যে দাশগুপ্তের কথাটা তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, "আমার সম্পর্কে অর্ডার এসে গেছে।" এমন একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অফিসারকে শুধু রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ নতুন যে আসবে সেই বা এর থেকে বেশী আর কি করতে পারবে?

আমাদের জীবনেরও তাহলে নিরাপত্তা বলে আর আজ কিছু নেই স্যার!...

খুনীদের সে আর একটু বেশী আশকারা দেবে, এই তো? আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার নামে আইন শৃংখলার আরও অবনতি ঘটাবে।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি দেখলেন বারান্দায় কানা রতন দাঁড়িয়ে। আরও কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেলেন আরও অনেককে—দীপু, মদন, সমীর। কানা রতন এগিয়ে এল অন্তরঙ্গ ভাবে। স্যার, আসল মাল-গুলোই ধরা পড়ল না। বিজন দাস, শশধর ঘোষ রাতে পাড়ায় থাকে না।

গত দশ বছর ধরে পুলিশের কাছে যার বহু কুকীর্তির ইতিহাস জমা রয়েছে সেই রকম একটা দাগী সমাজবিরোধীর এমন আপনজনের মত অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলাতে তাঁর ভদ্র রুচিটা শির্ শির্ করে উঠলেও তিনি তার কথা শুনবার জন্যে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দাঁড়াতে দেখে রতন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এলো। তবে ওদের কিছু কর্মী আছে স্যার এগুলোর মধ্যে।

ওর সঙ্গে তিনি কি কথা বলবেন? ঐ খুনীটার সঙ্গে? তবু মনটা তাঁর দ্বিধায় পড়ে। যা রাজত্ব পড়েছে, যা দিনকাল পড়েছে। বললেন, আসল অপরাধীদের কি আর অত সহজে ধরা যায়?

বললেন, ঐ দাগী খুনী সমাজ-বিরোধী কানা রতনের একটা চোখের দিকে তাকিয়ে। বললেন অন্তরঙ্গ ভাবে, বন্ধু ভাবে। যেন সে একজন কথা বলার যোগ্য লোক।

আসল অপরাধী? কারা সে? বিজন দাস? শশধর? কি অপরাধ করেছে তারা? এই সরকারের বিরোধী বলে? প্রতিপক্ষ? প্রতিপক্ষ হলেই সে অপরাধী বলে গণ্য হবে? রতনকে খুশী করবার জন্যে তিনি এমন কথা বলতে পারলেন? দেখাতে চাইলেন যে তিনিও তাদেরই একজন? তাদেরই মত চিন্তা করেন? হায় বিবেক! হায় শিক্ষা-দীক্ষা রুচি মনুষ্যত্ব!

আর দাঁড়ালেন না তিনি, কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ালেন। সেই চিঠিটা তাঁর পকেটে। তবে কি

তিনি ভয় পেয়েছেন ? যার দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ হয়, যাকে খুনের আসামী বলে জানেন তার সঙ্গে নিজের লোকের মত কথা বললেন কেন তিনি ? তাঁর বিবেকের টুঁটিকে দু'হাতে চেপে ধরল ? তিনি ভয় পাবার লোক নন। সত্যি কি তাই ? সারা দেশে কি চলছে ? এখানে ভয় পাবো না এমন লোক কে আছে ?

তাহলে তুমি ভয় পাবে না বলে প্রথমে যে বীরত্ব প্রকাশ করেছিলে তা ঠিক নয়। ভয় তুমি পেয়েছ, পাবার কথাই, সারা পশ্চিমবাঙলায় পুলিশ খুনের সংখ্যা কি পরিমাণে বেড়ে গেছে দেখেছ তো ?

॥ এগার ॥

শান্তি মুখার্জীর বাড়ি কালী পুজো হচ্ছে বলে সুর পাড়ার মোড়ে সেই সকাল থেকেই আনন্দ স্ফূর্তির জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল। মানতের পুজো তাই আয়োজনটাও হয়েছিল ভারী। (জ্যেষ্ঠ পুত্রের রোগমুক্তি কামনায় মানত করা হয়েছিল)। যত বেলা বাড়ছিল, সন্ধ্যা এগিয়ে আসছিল তত অবস্থা হয়ে পড়ছিল আরও বেসামাল। শান্তিবাবু নিজে আকণ্ঠ পান করে সন্ধ্যে থেকে বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য হল (নি:সন্দেহে কুরুচির পরিচায়ক) পানের আসরে তিনি তাঁর সন্তানতুল্য ছোট ছোট ছেলেদেরও সঙ্গে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

মন্ত্রিসভার দু'মাস কার্যকাল পূর্ণ হতে না হতেই তাঁর মনে বিক্ষোভ জমে উঠতে আরম্ভ করেছিল। তিনি যে নির্বাচনের সময় মনোনয়ন চেয়ে পাননি সে ক্ষোভটা তো ছিলই উপরন্তু ইদানীং তাঁর কিছুদিন যাবৎ মনে হচ্ছিল সরকারী ক্ষমতায় যাঁরা বসেছেন তাঁরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছেন না। অবশ্য তিনি যে মনোনয়ন প্রার্থী ছিলেন সে খবরটা বেশী লোকে জানে না। ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হলেন তখন ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। একমাত্র নেশাটেশা হলে কখনো-সখনো মনের সেই চাপা ক্ষোভটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ অল্পে অল্পে বেশ একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করছিল। এই ব্যাপারটাই নেশার ঝোঁকে বেশ একটা পরিতৃপ্তির আমেজে দিলুর সঙ্গে বসে আলোচনা করছিলেন তিনি। তাঁর সব চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত এবং অনুগত অনুচর দিলু নেশায় চুর হয়ে তাঁর সামনে একখানা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ছিল। চৌদ্দ থেকে ষোল বছরের তিনটি ছেলে ঘরের মেঝে এক কোণে পড়ে ঘুমুচ্ছে, আসলে তারা মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

শান্তিবাবু বলছিলেন, এম, এল, এ হবে অন্যেরা, মন্ত্রী হবে অন্যেরা, এমন কি পার্টির নেতৃত্বের উচ্চ পদেও বসে থাকবে তারাই আর আমরা লড়াই করে এলাকা ঠিক রাখবো। আবদার আর কি।

দিলুর থুতনিটা বুকের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিল, সে মুখ তুলে বলল, গুলি মারুন। সব শালা শয়তান।

শান্তিবাবু দিলুর দিকে একটু ভাল করে তাকালেন, মনে করলেন বেচারা একটু বেশী টেনে ফেলেছে। বললেন, বুঝলি দিলু, ভাবছি শালাদের একটু শিক্ষা দিয়ে দেব কিনা।

ও শালাদের দিয়ে কিছু হবে না, দিলু জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, শালাদের বাপের ঠিক নেই।

ব্যর্থতার বেদনা এই ভাবে নদীর জলের ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে খেয়ে শান্তিবাবুর মধ্যে যখন ঘুলিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ দিলুর মধ্যে সরকার বিরোধীদের একেবারে নির্বংশ করে দেবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। শান্তিবাবু যাদের সম্পর্কে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তাদের নিয়ে তার খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। সে ভাবছিল আসল শত্রু অর্থাৎ পূর্বেকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থকদের কথা। তাদের শেষ করবার চমৎকার পরিকল্পনা তার মাথায় খেলতে আরম্ভ করে দিল। সে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠে বসে বলে উঠল, বুঝলেন শান্তিদা, শালাদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত যদি—

কথাটা কানে যেতে শান্তিবাবুর নিজস্ব চিন্তা বাধা পেল। জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছিস ? কাদের কথা বলছিস ?

দিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, ফ্রন্ট সরকার ওয়ালাদের। ওদের শেষ করে দেওয়া যেত যদি স্রেফ গুলি করে সব-গুলোকে খতম করে দেওয়া যেত। ফায়ার কর আর মার। ফায়ার কর আর মার।

কথাটা শান্তিবাবুর নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্কে খুব প্রীতিকর মনে হল। বললেন, ঠিক বলেছিস। ফটফট করে একধারসে শুধু গুলি করে যেতে হবে। কেবল চাই গুলি আর বন্দুক, বন্দুক আর গুলি।

বাইরে মাইকে গান কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল, আবার চড়া গলায় গান আরম্ভ হল। শান্তিবাবু এবং দিলু যে ঘরে বসে ছিলেন তার পাশেই বাড়ির ভেতরে ঢুকবার এক প্যাসেজ, সেই প্যাসেজ দিয়ে অবিরত লোকজন যাতায়াত করছিল। হঠাৎ একদল ছেলে মধ্যবয়সী এক ভদ্র লোককে সঙ্গে নিয়ে হুড়মুড় করে সেই প্যাসেজের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর ঠেলাঠেলি করে বৈঠক খানা ঘরে। ভদ্রলোক শান্তিবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। শান্তিবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তাঁকে কিছুক্ষণ তারপর বললেন, আসুন। বসুন।

ভদ্রলোক তাঁর ঐ চাহনি দেখে একটু বিস্মিত হলেন। তারপর লোকটা নেশা করেছে বুঝতে পেরে খুশী মনে তাঁর পাশের চেয়ারটায় স্থান গ্রহণ করলেন।

চেয়ারে বসেই তিনি বললেন, ঐ অপদার্থ সি আই টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, শুনেছেন তো ? এবার একটা জাঁদরেল অফিসার আনা হচ্ছে, এলেই দেখতে পাবেন।

এতবড় একটা সংবাদের পরেও শান্তিবাবুর মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হল না। মধুর চাককে ঘিরে মৌমাছির ভিড়ের মত এক দঙ্গল যুবক আগন্তুক ভদ্রলোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে শান্তিবাবু কথা বললেন, আমাদের ছেলেদের হাতে বন্দুক দিতে হবে, গুলি দিতে হবে, ঐ ইন্দিরার বুলি আর গান্ধীবাদ জিন্দাবাদে দেশের লোককে টানা যাবে না, বুঝেছেন ব্যাপারটা ? আইন সভায়

গিয়ে মন্ত্রী হয়ে তো আপনারা ভুলে যান পেছনের ব্যাপারটা।

আগন্তুক ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ জানালেন, আপনারা কিছু না জেনেই বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের সিদ্ধান্ত শোনেন নি? আপনার এই ছেলেদের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হচ্ছে, এদের হাতে সরকারী খরচে অস্ত্র দেওয়া হবে, তারা পুলিশেরই একটা সহকারী বাহিনী হিসেবে কাজ করবে, সরকার থেকে এদের বেতন দেওয়া হবে, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে এরা যদি নিহত বা আহত হয় তবে এরা পুলিশের মতই ক্ষতিপূরণ পাবে। —এর পরেও আপনারা আমাদের দোষ দিয়ে চলবেন? সেটা কিন্তু ভারী অন্যায়।

শান্তিবাবুর যেন নিদ্রাভঙ্গ হল। বললেন, এসব যদি করতে পারেন তবে ভালই।

সি, আই-এর অপসারণের ব্যাপারটা আগন্তুক ব্যক্তি আবার তুললেন, কিন্তু এবারেও শান্তিবাবুর কাছ থেকে কোন সাধুবাদ পাওয়া গেল না। অন্যান্য সকলে ভদ্রলোককে ঘিরে গুঞ্জন করতে থাকলেও শান্তিবাবু তাঁকে অবজ্ঞা করলেন, আর তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুচর দিলুও সারটাক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

মন্ত্রী তাঁর এই অবজ্ঞাটাকে যে বুঝতে পারলেন না তা নয়, কিন্তু এটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলাকার পরিস্থিতি কি?

শান্তিবাবু যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে জবাব দিলেন, আপনাদের উপর মানুষের আর আস্থা নেই। ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়েও এখন আর বিশেষ কিছু হবে না—'গরিবী হটাও', 'বেকারী হটাও' এ সবে মানুষ আর এখন বিশ্বাস করছে না।

এতো আপনি রাগের কথা বলছেন।

রাগের নয়, লোকের মনের কথাই বলছি।

ভেতর থেকে একটা ছেলে এসে মন্ত্রী মশায়কে ডাকল, খাবার দেওয়া হয়েছে।

শান্তিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন। তিনি আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন।

নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল একটি ঘরে খাবার টেবিল পাতা। শান্তিবাবুর স্ত্রী মিনতি মুখার্জী টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করলেন। নমস্কার করে মিষ্টি হেসে তিনি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

দেবীর প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করে বিদায় নিয়ে যাবার সময় মন্ত্রীমশায় শান্তিবাবুর করমর্দন করে বন্ধুত্বের উত্তাপ মিশিয়ে বলে গেলেন, আমাদের দোষ ত্রুটিগুলো অত বেশী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখবেন না।

॥ বারো ॥

নতুন সি, আই, মিঃ মহাতোকে থানার কার্যভার বুঝিয়ে দিয়েছেন মিঃ দাশগুপ্ত। সরকারীভাবে তিনি থানার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি দাসপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ডুরাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক ইউনিয়ানের সেক্রেটারী রতন দাসকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং দাশগুপ্তের কাছে যে খবর এসেছে তা মারাত্মক। সাব-ইন্সপেক্টর ঘোষই খবরটা নিয়ে এসেছিলেন। রাত তখন প্রায় ন'টা। দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টারে দেখা করতে এসে ঘোষ কোন ভণিতা না করেই বললেন, স্যার সাংঘাতিক ব্যাপার।

কি হল?

দাশগুপ্ত তাঁকে শান্তভাবে বসতে বললেন।

বিশ্বাস করুন স্যার, রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমার কোন যোগ নেই। আমি ঐ রাজনীতি পছন্দই করি না। ডুরাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের ইউনিয়ানের সেক্রেটারী রতন দাসকে গ্রেপ্তার করে এনে আমাদের নতুন সি আই—

ঘোষের কথা মাঝখানে থেমে গেল।

কি হয়েছে বলুন। মিঃ দাশগুপ্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন।

আপনি হয়তো জানেন না স্যার—

কি হয়েছে তাই বলুন।

কাল নতুন সি আই কর্মচারী কোয়ার্টারে হানা দেন। রতন দাসকে গ্রেপ্তার করে এনে রাতের অন্ধকারে কামারডাঙ্গা মাঠে গুলি করে মেরে ফেলে রেখে এসেছেন।

দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এতো হবেই মিঃ ঘোষ। আমরা থানায় ধরে এনেছিলাম, তারপর থানার মধ্যে বন্দী হত্যা হয়েছে, এতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেদিন মিঃ দত্ত যা বললেন তার অর্থ কি? মিঃ মহাতো সেই নীতিই কার্যকরী করছেন।

কিন্তু স্যার বন্দীকে আইনত বিচার করে দণ্ড দেওয়া এক জিনিস, বা ধরুন, বিনা বিচারেও যদি আটকে রাখা হয় তাহলে কিছু বলার নেই, কারণ দেশে সে রকম আইন রয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তার করার পরেই তাকে খুন করে ফেলা—

আমাকে একথা কেন বলছেন মিঃ ঘোষ? দাশগুপ্ত সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, আমি একে জংগলের নীতি বলে মনে করি। যাঁরা এই কাজ করছেন এবং আমি যতদূর খোঁজ রাখি বহু পুলিশ অফিসারই এই জংগলের নীতিকে কার্যকরী করছেন, তাঁদের মানসিকতা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে বর্তমান সরকারের নীতিটা কি আমাকে বলতে পারেন স্যার?

ঘোষ প্রশ্ন করলেন। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

দাশগুপ্ত যেন বিরক্ত হলেন। এই ধরনের প্রশ্ন ঘোষের মত একজন বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে তিনি আশা করেন নি। বললেন, এত সব দেখে শুনেও যদি বুঝতে না পেরে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে কি করে বোঝাবো মিঃ ঘোষ?

ঘোষ চুপ করে গেলেন। দাশগুপ্তের বিরক্তিটাও বুঝতে পারলেন। সত্যিই কি তাই? সরকারের নীতিটা তিনি বুঝতে পারছেন না? এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা দাশগুপ্তের মত লোকের সামনে বললেন তিনি? বুঝতে পারছ না? নাকি নিজেকে ঐ নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছ না? কোন্‌টা ঠিক। সরকারী নীতির সমালোচনা করবার অধিকার তোমার আছে? নেই। চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে সাধারণ নাগরিকের একজন হিসেবে আগে

নিজের স্থান গ্রহণ কর, তারপর ওকথা মুখে উচ্চারণ করবে।

ঠিক। সত্য কথা। মানছি, আমি প্রতারণা করছি শ্রোতাকে, নিজেকে। কিন্তু তাহলেও আমি ন্যায়ের জন্যে, যা হওয়া উচিত তার জন্যেই ঐ প্রশ্নটা রাখছি সকলে কাছে, বিবেকবান সৎ মানুষের কাছে।

কোন লাভ নেই। তোমার কথা কেউ শুনবে না। গায়ে তোমার যে আলখাল্লাটা আছে—ঐ পোষাকটা 'তুমি' ব্যক্তিটাকে ঢেকে দিয়েছে। বেশ তো, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও।

ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পরিস্থিতি যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে আমার পক্ষে থানার মধ্যে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্যার। মনে হচ্ছে মহাতোর কাছে এর মধ্যেই আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়ে গেছে। কি যে করব বুঝতে পারছি না। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। আপনার মত আমাকে যদি সরিয়ে দিত কোথাও।

কোথায় যাবেন? দাশগুপ্ত প্রশ্ন করলেন। সেখানে গিয়ে কি আপনি অন্যরকম কিছু দেখবেন আশা করছেন?

না স্যার, তা করছি না। তবে এখানে আর আমার ভাল লাগছে না।

দাশগুপ্ত হেসে বললেন, ভাববেন না। আপনারও অর্ডার শিগ্‌গিরই আসবে।

॥ তের ॥

পরদিন সকাল বেলা।

দাশগুপ্ত বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলেন।

একটু আগে চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখেছেন।

খবরের কাগজের উপর অন্যমনস্ক ভাবে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাব ছিলেন। ভালই হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। আমি এখন খুব শান্তিতে আছি। দুটো দিন আগেও এরকম ছিল না। স্নান সেরে অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হত। এখন আর কোন তাড়া নেই, উদ্বেগ নেই।

সাময়িকভাবে হলেও বলতে গেলে তিনি এখন বেকার। মনে ক্ষোভ যাই থাকুক এই ভাবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে বেশ স্বস্তি বোধ করছিলেন। আপাতত তিনি একমাস ছুটিতে আছেন, বা বলা যায় ছুটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এরপর নতুন পদে যেখানে তাঁকে দেওয়া হবে সেখানে যাবেন।

হঠাৎ বাড়ির ভেতরে একটা মেয়ের কান্না শুনে তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। শব্দটা ভাল করে শুনবার জন্যে কান পাতলেন। হ্যাঁ, ঠিকই তো, বাড়ির মধ্যে এই সময় কে এরকম করে কাঁদছে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। বৈঠকখানা থেকে পাশের ঘরে যেতেই মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। দেখা হতেই মিসেস দাশগুপ্ত বলে উঠলেন, দেখ তো ঐ মেয়েটার বাবাকে কি করে খুন করা হয়েছে। রীণার সঙ্গে স্কুলে একসঙ্গে পড়ে, পড়াশুনায় খুবই ভাল, ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ওর বাবার নাম রতন দাস।

দাশগুপ্ত থমকে দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি স্ত্রীর পেছন পেছন মেয়ে রীণার ঘরে গেলেন। মেয়েটি মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে কাঁদছে। আস্তে আস্তে গিয়ে তিনি রীণার বিছানার এক কোণে বসলেন। ক্রন্দনরত মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রীণা, দু'জনের একই বয়েস। তাঁকে দেখে রীণা বলে উঠল, এই সীমা, বাবা।

সীমা অর্থাৎ রতন দাসের মেয়ে মুখ তুলে তাকালো, তারপর আরও জোরে কেঁদে উঠে মুখের উপর দুই হাত চাপা দিল।

রীণা বলল, বাবাকে বল না ব্যাপারটা।

মেয়ের কথা শুনে দাশগুপ্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। ওর হয়তো বিশ্বাস বাবার কাছে বললে প্রতিকার হবে।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সীমা ঘটনা বলে চলল।

দাশগুপ্ত চুপ করে বসে রইলেন সারাক্ষণ। কিছুক্ষণ বাদে তিনি উঠে আবার বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলেন। আগে যেখানে বসে ছিলেন আবার সেখানে বসলেন। মিসেস দাশগুপ্ত পেছন পেছন এলেন। তাঁকে এইভাবে নির্বিকার বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, শুনলে তো ব্যাপারটা?

দাশগুপ্ত বললেন, শুনলাম।

মেয়েটা রীণার সঙ্গে পড়ে।

তাও তুমি বলেছ।

এই রকম নৃশংস ব্যাপার চলবে?

তুমি তো জানো আমি থানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন আমার কোন ক্ষমতা নেই। আর ক্ষমতা থাকলেও আমি এর কোন প্রতিকার করতে পারতাম না।

ক্ষমতায় থাকলেও প্রতিকার করতে পারতে না। যারা একাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতে না?

যারা একাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।

কি বলছ তুমি?

মিঃ দাশগুপ্তের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটল।

তুমি রান্নাবান্না ঘরের কাজ নিয়ে থাক। যথাসম্ভব সংযতভাবে বললেন তিনি, বাইরের খবর কিছু রাখনা। রাখলে জানতে দিনকাল বদলে গেছে।

তাই বলে—

তুমি বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। কিছু করার ক্ষমতা থাকলে আমি কি এ ব্যাপারে কিছু করতাম না?

এই কথার পরে মিসেস দাশগুপ্ত আর কোন কথা বললেন না, ভেতরে চলে গেলেন। এত বড় একটা থানার দায়িত্বে কাল পর্যন্ত যে লোকটা ছিল সে যে এ ব্যাপারে কিছু করতে পারে না এটা তাঁর কাছে কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য মনে হল না।

॥ চোদ্দ ॥

মিঃ দাশগুপ্তের বাড়িতে যখন সীমা কান্নায় ভেঙে পড়ছে তখন নতুন সি আই ডিউটিতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে অস্থায়ীভাবে একটা কোয়ার্টারে উঠে এসেছেন তিনি, তারপর দাশগুপ্ত চলে গেলে সেই

হেডকোয়ার্টারে স্থায়ীভাবে উঠে যাবেন। থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর দুটো দিন কেটে গেছে। রতন দাসের খুন হওয়াটা ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের কাছে তাঁকে খুব প্রিয় করে তুলেছে। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে প্রথম তিনি খবরের কাগজগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন, তারপর স্নান সেরে পোষাক পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বার কয়েক ভাল করে দেখে নিয়েছেন। পোষাকের সম্পর্কে তিনি এমনিতেই ভীষণ খুঁত খুঁতে, কোন দিকে কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না। চেহারার দিক দিয়ে তিনি কোনদিনই সুপুরুষ নন, রং কালো, মাথার সামনেটায় টাক, নাকের মাঝখানটা থ্যাবড়া, চোখ দুটো ছোট, তবে আয়তনটা বিশাল, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরাট শরীর।

অফিসে এসে তিনি যখন নিজের দপ্তরে বসলেন তখন খবর পেলেন এলাকার জনজীবন অচল। রতন দাসের হত্যার জন্যে হরতাল হয়েছে, কলকারখানা সব বন্ধ। যানবাহন চলছে না, দোকান পাট বাজার ঘাট বন্ধ। কেবল সুরপাড়ার সি আর পি ক্যাম্পের আশপাশে কিছু দোকান খোলা আছে।

মিঃ দাশগুপ্ত যে ঘরে বসতেন সেই ঘরে বসে তিনি সমস্ত অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। অফিসারেরা সব এসে আসন গ্রহণ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এলাকার অবস্থা কি রকম বুঝছেন?

জবাব দিলেন মিঃ গোস্বামী। এখনো পর্যন্ত কোন গণ্ডগোলের খবর পাইনি স্যার।

হাতের কাছে ফোন বেজে উঠল। মিঃ মহাতো ফোন ধরলেন, হ্যালো!

কথা বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ। সি আই কথা বলছি।

পত্রিকার রিপোর্টার? হরতালের খবর? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। হরতাল ব্যর্থ হয়েছে। জোর করে বাস থামিয়ে ছিল কিন্তু যানবাহন চলাচল এখন স্বাভাবিক, দোকান পাট বাজার ঘাট সব খোলা। কলকারখানায় স্বাভাবিক-ভাবে কাজ চলছে। আচ্ছা, নমস্কার।

ফোন রেখে মহাতো তাকালেন আবার অফিসারদের দিকে। অফিসারেরা এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওই করে নিয়েছেন। তাহা মিথ্যাগুলো এমন সোজাসুজি জোরালো-ভাবে বলতে পারার ক্ষমতা দেখিয়ে নতুন অফিসার তাঁর 'জবরদস্ত' চরিত্র সম্পর্কে সকলকে আর একবার তাক লাগিয়ে দিলেন।

যা বলছিলাম, এখনো তাহলে কোন গণ্ডগোলের খবর আসেনি?

মিঃ গোস্বামীই আবার কথা বললেন, না স্যার।

সরকারের বক্তব্য আপনারা জানেন। "বিরোধীরা দেশটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে চাইছে"—আমি স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, এটাই বর্তমান সরকারের পলিসি।

অফিসারেরা সকলেই চুপ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি একবার রাউণ্ডে বের হব, আপনাদের মধ্যে একজন চলুন আমার সঙ্গে। গোস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিই চলুন না।

গোস্বামী বললেন, আপনি বললেই যাব স্যার। এতে আর কি আছে।

তবে চলুন। যান গাড়ি বের করতে বলুন গিয়ে।

অফিসারেরা এক এক করে সকলেই উঠে চলে গেলেন।

মহাতো উঠে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো এলাকার ম্যাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। গাছের ডাল ধরে একটা শুঁয়ো পোকা পিঠ উঁচিয়ে থাকলে যেমন দেখতে লাগে ম্যাপটা খানিকটা সেই রকম। আবার ঐ ডাল ধরেই আর এক দিকে আর একটা শুঁয়ো পোকা মাথা নিচু করে যেন ডন দিচ্ছে—দুই শুঁয়ো পোকা দিয়ে ঘিরে রাখা এলাকাটা তাঁর থানার নিয়ন্ত্রণাধীন। হঠাৎ শুঁয়ো পোকার কল্পনা তাঁর মাথায় এল কেন সে চিন্তা কিন্তু তাঁর একবারো মনে হল না। তিনি আবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে রিভলভার এবং কাউবয়ের ক্যাপ সমেত বেল্টটা কোমরে পরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

নিচে নেমে অফিস ঘরের কাছে আসতেই মিঃ গোস্বামী ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ফোর্স কত নেব স্যার?

পনের জন নিন।

পনের?

দিনকাল খারাপ তো।

গোস্বামী একটু বিস্ময়ের সুরে তাকালেন এই নতুন অফিসারের দিকে। এত ফোর্স নিয়ে চলেছে। সাধারণত রাউণ্ডে যেতে দু'পাঁচ জনের বেশি নেওয়া হয় না।

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মহাতো চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। থানার আশপাশের দোকানপাটগুলো পর্যন্ত বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই, বাস তো নেইই, ট্যাক্সি নেই, রিক্সা নেই, প্রাইভেট গাড়ি নেই। মানুষের এই স্পর্ধা। অর্থাৎ তিনি যেটা পছন্দ করেন না সেটা করার মত স্পর্ধা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। অধিকারের দোহাই দিয়ে যারা কথা বলে তাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর থানা এলাকার মধ্যে সব কিছু কি ভাবে চলবে তা নির্ধারণ করেন তিনি। হ্যাঁ, বলতে পারেন তবে কি আপনি ডিক্টেটর? তা যদি বলেন তবে তাই, তবে সরকারের ইচ্ছাকে কার্যকর করবার জন্যেই আমার এই ক্ষমতা দরকার। সে রকম ক্ষমতা হাতে পেলে মারের চোটে এলাকা সায়েস্তা করতে কত সময় লাগে? এ সরকার এদিক থেকে একটা ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুলিশ গুলি চালিয়ে লোক খুন করলে এখন থেকে কোন ডিপার্টমেন্টাল ইন্‌কোয়ারিও আর হবে না। এটা হয়েছে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত।

গোস্বামী এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেরি হচ্ছে দেখে বললেন, চলুন স্যার উঠে পড়ি।

দু'পা পেছনে ফিরে এসে মহাতো জিজ্ঞেস করলেন, থানার পাশে দোকান-গুলো পর্যন্ত হরতাল করে বসে আছে, এ কি রকম ব্যাপার?

গোস্বামী পাশে চলতে চলতে বললেন, ও স্যার আপনি পারবেন না কিছু করতে। এ অঞ্চলে সরকার বিরোধীদের প্রচণ্ড প্রভাব। তাছাড়া

আপনি কিছু বললে ওরা বলবে হাঙ্গামার ভয়ে দোকান খুলিনি।

থানার কাছে হাঙ্গামা?

গাড়ির দরজা খুলে আগে গোস্বামী উঠলেন, তাঁর পেছন পেছন মহাতো। সিটে ঠিক ভাবে বসতে বসতে গোস্বামী বললেন, সত্যি কথা বলতে কি থানার উপরে আজকাল আর লোকের কোন বিশ্বাস নেই স্যার। আপনি কিছু বলতে গেলে মুখের উপর সে কথা বলে দেবে।

যুক্তফ্রন্টওয়ালাদের বিশ্বাস থাকবে না সে তো জানা কথা।

মহাতোর কথার সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন গোস্বামী, না স্যার। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস নেই। সাধারণ লোক একেবারেই থানাকে বিশ্বাস করে না।

নাই থাকলো বিশ্বাস, ওতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভয় তো করবে? এটা চাই—থানাকে লোকে ভয় করবে এ অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

গোস্বামী এ কথার কোন জবাব দিলেন না।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাব স্যার?

গোস্বামীর দিকে তাকিয়ে মহাতো বললেন—

সেই কর্মচারী কোয়ার্টার।

গোস্বামী তাকালেন ড্রাইভারের দিকে।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সমস্ত পথ মহাতো থেকে থেকে গোস্বামীকে নানা প্রশ্ন করে চললেন। এলাকার খবর, বিশেষ করে থানার ভিতরের খবর, ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের সম্পর্কে এক আধটা প্রশ্ন যা গোস্বামী ড্রাইভারের পাশে বসে মোটেই উত্তর দিতে চাইছিলেন না এবং বার বারই প্রসঙ্গ পাল্টে দিচ্ছিলেন।

গাড়ি এসে ডুরাণ্ড কারখানার শ্রমিক বস্তি এবং কর্মচারী কোয়ার্টারের কাছে পৌঁছতে মহাতোর নির্দেশে গাড়ির স্পিড কমিয়ে দেওয়া হল। রতন দাসের বাড়ির কাছাকাছি আসতে মহাতো ইংগিতে ড্রাইভারকে থামতে বললেন। গাড়ি থামা মাত্র কোন কথা না বলে তিনি নেমে পড়লেন। তাঁকে নামতে দেখে গোস্বামীও নামলেন। একটু এদিক ওদিক পদচারণা করে মহাতো পাঁচজন সিপাইকে নেমে আসতে নির্দেশ দিলেন। গাড়ির পেছন দিক থেকে রাইফেল হাতে পাঁচজন সিপাই নেমে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল, বা করা দরজা বন্ধ করে বসে রইল।

রতন দাসের কোয়ার্টার থেকে খানিকটা দূরে এসে মহাতো দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক হঠাৎ বেরিয়ে এল গলির মধ্যে থেকে। সামনের লোকটার হাতে ফুলের মালা। রাস্তার বিপরীত দিক থেকে, সামনে পেছনে নানা দিক থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। কারো হাতে ফুলের মালা, কারো হাতে লাল পতাকা। মহাতো এবং সিপাইদের উপস্থিতি তারা গ্রাহ্যই করল না। এই সময় রতন দাসের মৃতদেহটা কোথা থেকে যেন এনে রাস্তার উপর খাটিয়া পেতে শোয়ানো হল। মহাতো হাতের ঘড়ি দেখলেন, বেলা এগারটা বেজে গিয়েছে। ধীর পদক্ষেপে তিনি ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, শোভাযাত্রার অনুমতি নিয়েছেন আপনারা?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পিল পিল করে লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। মহাতো এই পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারেন নি। সশস্ত্র সিপাই ক'জন তাঁর কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

শোভাযাত্রার অনুমতি লাগে না। কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

পাশ থেকে একটা ছেলে উদ্ধত ভাবে জবাব দিল।

আপনারা খুন করবেন আর খুন করার পর সেই লোকটার দেহটারও উপযুক্ত সৎকার করতে দেবেন না?

পেছন থেকে আর একটি ছেলে বলল।

মহাতো দেখলেন লোকগুলো ভীষণ কাছ ঘেঁষে এসেছে। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন, সরে যান, সব। ভিড় করবেন না। নাহলে—

ভিড় সরে যাবার বদলে আরও ঘন হয়ে এলো।

মহাতোর হাতটা কোমরে রিভলভারের খাপের উপর গিয়ে পৌঁছল।

ভিড় ঠেলে একটি যুবক সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমাদের অনেক লোক মরবে জানি, কিন্তু—

মহাতো তাকালেন ছেলেটার দিকে। কি বলতে চাও তুমি?

কি আবার বলতে চাইব। বলতে কিছু চাইনা। পরিস্থিতি যে রকম হবে, সে অনুযায়ী আমরা কর্তব্য ঠিক করব। দৃঢ়ভাবে জবাব দিল ছেলেটা।

বয়স্ক একজন লোক সামনে এগিয়ে এলেন। মহাতোর সামনে কয়েকখানা কাগজপত্র মেলে ধরে বললেন, এই যে। আমাদের কাগজপত্র দেখতে চান তো দেখুন। এখন আমরা মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে রওনা হচ্ছি।

মিঃ মহাতো কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সামনে পেছনে পাশে যেদিকে তাকান জনসমুদ্র। ভয় পেয়ে পেছন ফিরে তিনি গাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোস্বামীকে বললেন, মহড়া দিয়ে রাখলাম। গ্রাউণ্ড তৈরি হয়ে রইল। এরপর এমন শিক্ষা দেব যে বাপের জন্মে আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

॥ পনের ॥

দাশগুপ্তের কাছে সিপাইরা কেউ না-কেউ প্রতিদিনই আসে। আর আসেন মি. ঘোষ। থানার সব খবরই তাঁর কাছে পৌঁছয়। আজকাল তিনি এক নতুন বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। কোয়ার্টারের সামনে একটু ছোট্ট বাগান আছে, সামান্য কয়েকটি ফুলের গাছ, কয়েকটা পাতাবাহার এবং ঝাউ। সকালে চা খাওয়ার পর এসে বাগানে বসেন। নতুন কয়েকটা গাছ আনিয়েছেন। ঘাসের উপর পা রেখে বসে গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করেন। ছোটবেলার জীবনটা মনে পড়ে যায়। পূর্ববাঙলার ফরিদপুর জেলায় বাড়ি ছিল। গাঁয়ের ছেলে। গাছপালা খালবিল নদীনালার আকর্ষণ বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। ফেলে

আসা অতীত জীবনটা নিয়ে ভাবেন বসে বসে। ঘণ্টাখানেক বাগানে থাকেন তারপর ঘরে চলে আসেন। রেডিও খুলে গান শোনেন। মাঝে মাঝে মনে হয় পুলিস বিভাগে চাকরি না নিয়ে অন্য কিছু যদি করতেন।

কিন্তু আর কি করতে পারতেন তিনি জীবনে? বড় অফিসার? ব্যবসা? শেষেরটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রথমটা হয়তো হতে পারতো। কিন্তু চাকুরির ক্ষেত্রে বর্তমানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তোমার বিরোধটা কোথায়? বিরোধটা বিশ্বাসের। তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করছেন না। শুধু কি তাই? না, আরও কিছু আছে। বিরোধটা দাঁড়াচ্ছে আসলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে সরকারের আচরণ নিয়ে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ? বেশ। তাহলে তার সম্পর্কে কি রকম আচরণ তুমি আশা কর? কেন, বৃটিশরা যেমন করত। বৃটিশরা কি করত? কাজকর্ম সব কিছুকে আইনের আওতায় নিয়ে এসো। জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ড কি আইনসঙ্গত হয়েছিল? না হয়নি। তাহলে? বৃটিশ আমলকে সব ব্যাপারে আদর্শ করতে যেও না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে পুলিসী ব্যবস্থা কখনো আদর্শ ব্যবস্থা হতে পারে না।

কিন্তু উনিশ শ' একচল্লিশ সালে আমি পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছি। গ্রেপ্তার করার পর এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। ওকথা ছাড়। তোমার অনেক কিছু জানা না থাকতে পারে। কিন্তু গোস্বামী যা পারছেন, মহাতো যা পারছেন তুমি তা পারছ না। এটা তো ঠিক? তা ঠিক। তাহলে তোমাকে দিয়ে সরকারী নীতি কার্যকর করা যাচ্ছে না। কারণ তুমি নিজেই প্রতিপক্ষ। সরকারের কাছ থেকে তুমি এ অবস্থায় কি আশা কর?

আমি রাজনীতির ধার ধারি না।

অর্থাৎ তুমি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নও। বেশ।

কিন্তু প্রতিপক্ষ। মহাতো যে ভাবে কাজে নেমে পড়েছেন সেই ভাবে তুমিও তো নেমে পড়তে পারতে। কৈ তা তো নামো নি।

আমি আইনমাফিক চলতে চাই।

কিন্তু সরকার আইনমাফিক চলতে চায় না, এবং তোমাদের দু'জনের স্থান দুই বিপরীত কোটিতে। তাহলে তোমাকে প্রতিপক্ষ বলা যায় কি না?

আমি এই সরকারের চাকর।

সে বিপদে পড়লে। যেমন মিঃ দত্তের সামনে হয়েছিলে। অন্তরের সায় থাকলে মহাতোর কাজ তোমাকে দিয়েই হত। মহাতো এর মধ্যে আরও অনেক কাজ করেছেন। যেমন? যেমন ধর থানার সমস্ত ব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছেন। সাব ইন্সপেক্টর ঘোষের বিরুদ্ধে রিপোর্ট গেছে ওপরে। যে কনস্টেবলদের তুমি থানায় থাকতে দিয়েছিলে তাদের অন্য থানায় বদলীর অর্ডার করিয়ে দিয়েছেন।

এ সব খবর তো গতকাল মিঃ ঘোষ এসে বলে গেছেন। আর কোন খবর? নতুন কিছু? পাবে পাবে—আরও খবর পাবে।

খবর সেদিনই এলো বেলা দশটার পরে।

থানায় মহাতোর ঘরে বসে গোস্বামী তখন কথা বলছিলেন। এমন সময় দু'জন সিপাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। স্যার শিগ্‌গির নিচে চলুন।

কি ব্যাপার? মহাতো চেঁচিয়ে উঠলেন।

সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার।

কি হ'ল? কি সর্বনাশ হল? গোস্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সাব ইন্সপেক্টর ঘোষ খুন হয়ে গেছেন।

অ্যাঁ? গোস্বামী ঘরের দরজা দিয়ে ছুটে বের হলেন।

খুন হয়ে গেছেন, কোথায় হল, কি করে হল—বলতে বলতে ছুটলেন তিনি।

চারদিক থেকে থানার লোকজন ছুটে নিচে যাচ্ছে। গোস্বামীর পেছন পেছন মহাতোও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তবে খুব আস্তে, ধীরে ধীরে, শান্ত ভাবে। গোস্বামী যখন নিচে নেমে গেছেন তখনো তিনি তিন তলা থেকে দোতলায় পৌঁছন নি।

একজন অফিসার নিচে থেকে ছুটে এসে মহাতোকে সিঁড়িতে ধরলেন. মিঃ ঘোষ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন স্যার।

মহাতো শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো?

থানা থেকে দেড়শ' গজ দূরে একটা রেডিওর দোকানে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি দোকানে গিয়ে ছিলেন।

পর পর তিনটি গুলি করা হয়েছে স্যার।

নিচে নেমে মহাতো গিয়ে এক পাশে দাঁড়ালেন। ভীষণ ভিড়; থানার লোকজন সব ভেঙে এসেছে। গেঞ্জি গায়ে, জুতি পরে, খালি গায়ে, গামছা কাঁধে, অফ্ ডিউটির লোকজন যারা ব্যারাকে ছিল তারাও এসেছে। তিনি এসে পৌঁছতে সিপাই এবং কর্মচারীরা যে দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো তাতে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো লোকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁকে পথ করে দিল, কিন্তু যতখানি সম্মান দেখিয়ে সেটা করা উচিত তা করা হল না।

ঘোষের দেহটা দুটো বেঞ্চ জোড়া দিয়ে তার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। কিছু সিপাই এবং অফিসার ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। গোস্বামীও সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি পৌঁছতে কয়েকজন এমন ভাবে তাঁর দিকে তাকালো যে আর একবার তাঁর বুক কেঁপে উঠল। অবশ্য তাদের দৃষ্টিতে সত্যিই সে সেরকম কিছু ছিল তা নাও হতে পারে। হয়তো এটা তাঁর সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। কোন রকমে মৃতদেহটাকে একবার দেখে অফিস ঘরে এসে বসলেন তিনি। একটু বাদে গোস্বামী এসে তাঁর পাশের চেয়ারে স্থান গ্রহণ করলেন।

আততায়ী কে? এই প্রশ্ন তাঁদের দুজনের কারো মুখ থেকেই কিন্তু বের হল না। নেহাত তাঁদের একান্ত বশংবদ অফিসারকেও যদি তাঁরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন তবে সেও কি অবাক হয়ে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে না? মনে মনে বলবে না, এ কথা আবার তোমরা জিজ্ঞেস করছ?

অনেক ভেবে চিন্তে মিঃ গোস্বামী মহাতোকে বললেন, হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করি স্যার। তবে তার আগে মিসেস ঘোষকে একবার খবর দেওয়া উচিত।

মনে হল এ বিষয়টা মহাতোর মাথায় একদম ছিল না। বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। একজনকে তো তাঁর কাছে যাওয়া দরকার।

যদি বলেন তাহলে আমিই যেতে পারি।

খুব ভাল হয়, আপনিই যান তাহলে আর দেরি করবেন না।

নিজের মনকে যথেষ্ট প্রস্তুত করে গোস্বামী ধীরে ধীরে গিয়ে ঘোষের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন। আধ মিনিট, জোর এক মিনিট সময় নিল, এর মধ্যেই তাঁর নার্ভ ফেল করতে লাগল। ভীষণ নার্ভাস বোধ করতে লাগলেন তিনি। ঠিক এই সময় দরজা খুলে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন মিসেস ঘোষ। মনে হল ভেতরে আরও লোক রয়েছে। একজন মহিলা আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে মুখ সরিয়ে নিলেন।

আমি এসেছিলাম, আপনি হয়তো খবর পেয়েছেন—

গোস্বামী হোঁচট খেয়ে খেয়ে কথা বললেন।

মিসেস ঘোষের চোখের দিকে তাকিয়েই তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। কি অস্বাভাবিক সে দৃষ্টি।

ঐটুকু কথা বলতে বলতে মিসেস ঘোষের রুদ্ধ স্বর কানে এলো, কেন এসেছেন আমার কাছে? আপনারাই তো ওকে হত্যা করিয়েছেন।

হত্যাকারী তো আপনারা। মনে করেছেন আমি কিছু জানি না? চলে যান আমার সামনে থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা মুখের উপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

থানায় ফিরে এসে গোস্বামী মহাতোকে নিচে পেলেন না। ওপরে তাঁর ঘরে গেলেন। মহাতো তাঁর ঘরেই ছিলেন। কোথায় যেন ফোন করছিলেন, গোস্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে ফোন রেখে দিলেন।

হাসপাতাল থেকে বলছে অনেকক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে।

কথাটা বলে মহাতো গোস্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

এই খবরের জন্যে গোস্বামীর কোনই ঔৎসুক্য ছিল না। লোকটা যে মারা গেছে তা সকলেই দেখেছে। হাসপাতালের দিকে কান পেতে বসে নেই কেউ।

অনেকক্ষণ মহাতোকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি করবেন এখন?

কি সম্পর্কে?

এই যে একজন পুলিশ অফিসার খুন হল?

মিঃ মহাতো তাঁর দিকে নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলেন।

॥ ষোল ॥

গোস্বামী যখন মিসেস ঘোষের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন সেখানে মিসেস দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনিই উঁকি দিয়ে সরে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দাশগুপ্তর বাড়িতে খবর পৌঁছে যায়। ফোনে সমস্ত সংবাদ নিয়ে দাশগুপ্ত স্ত্রীকে ঘোষের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে পায়চারি করলেন। তাহলে অবস্থা কি দাঁড়ালো? এই হল প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তোমরা যা ব্যবস্থা নিচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিৎ? দুরকম প্রতিপক্ষ আছে, রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক। তোমাদের বিচারে ঘোষ একজন প্রতিপক্ষ, তবে অরাজনৈতিক। সেটা তো স্বীকার করবে? রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, আমি সেটা ভাল করে জানি। ব্যাপার হচ্ছে, বিরোধীদের সম্পর্কে তোমাদের আচরণ বিধিটার সঙ্গে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না। কথাটা সত্যি। আমি অস্বীকার করছি না। এ অভিযোগ তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আনতে পার। যে ভাবে থানার কাজ পরিচালিত হচ্ছে তার সঙ্গে তাঁর বিবেকের সায় ছিল না। তা বলে কি তাঁর বাঁচার অধিকার নেই। তোমাদের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধটার কি ভাবে মীমাংসা হবে?

কিন্তু এই বিরোধের মধ্যে সে গিয়েছিল কেন? তুমিই বা যাবে কেন?

যাব কেন?

এটা সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছাকৃত। এর জন্যে দায়ী ব্যক্তিগত মানসিক গঠন।

তোমরা যে পথে চলেছ তাতে তোমাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত এই পরিণতিই লেখা রয়েছে।

মৃত্যু?

না, না হত্যা।

কিন্তু এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা।

পায়চারি বন্ধ করে তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। এর পর কি করবেন? কি করণীয় আছে তাঁর? হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। থানায় যেতে হবে একবার, কি ব্যবস্থা হচ্ছে ওখানে দেখতে হবে। পুলিশ অফিসারের যোগ্য সম্মান যেন মৃতদেহটা পায়। মরার পরে আর তো কোন বিরোধ নেই।

কে বলেছে নেই?

আছে আছে, বিরোধ আছে। সমগ্র পুলিসী প্রশাসনের মধ্যে ক'জন ঘোষ এবং দাসগুপ্ত আছে? হয়তো আর একজনও নেই। যদি নাই থাকে তাতেই বা কি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তায় নামলেন। চলতে চলতে বার বার মাথা ঝাঁকালেন। যদিও মিঃ ঘোষের বাড়িতে তখন কেউ ছিলেন না (সকলেই তখন হাসপাতালে চলে গেছেন। সেই সঙ্গে মিসেস দাশগুপ্তও) তবু তিনি ঘোষের কোয়ার্টারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কেন দাঁড়ালেন তা তিনি নিজেই জানেন না। কিন্তু কড়ায় হাত দিলেন না। দরজা লক্ করা রয়েছে, সেদিকেও তাকালেন না। ভাবলেন, এটা কি রকম হল? ঘোষের হত্যাকারী ধরা পড়েছে? যদি না পড়ে থাকে তাহলে তাকে ধরবার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? তাদের ধরতেই হবে। হ্যাঁ নিশ্চয়। ধরতেই হবে। হত্যাকারী কারো অজানা নয়। তাদের ধরা কঠিন নয় কিছু। হয়তো থানার মধ্যেই তারা রয়েছে।

তিনি দিক বদল করে থানার দিকে চললেন।

বাংলা ছোটগল্পের রীতিচর্চা

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেকখানি শূন্যতা বিরাজ করছে বলে অনেকেই মনে করেন। সমাজ বাস্তবতার আদর্শের অনুগামী যুগ সচেতন যে সব লেখক সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের রচনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা এত অল্প আর প্রকাশের সুযোগ এত সীমিত যে শূন্যতাকে সবটা ভরতে পারছেন না। এদের বাদ দিলে, আর যাঁরা এই ক্ষেত্রে অনুশীলনে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের এক বড় অংশই বিগতকালের প্রতিনিধি। তাঁরা এখনও পুরাতনের জাবর কেটে চলেছেন, তাঁদের বেলায় যুগধর্মের সামান্য স্বাদই পাওয়া যায়। যুগ এগিয়ে চলেছে, তাঁরা পেছিয়ে পড়েছেন। তাঁদের এই সীমা বদ্ধতার দুটি কারণ থাকতে পারে— এক, এ যাবৎ চর্চিত অভ্যাসের যান্ত্রিক বশবর্তীতা, দুই, নতুনকে গ্রহণ করার অসামর্থ্য। কোন কোন সাহিত্যিকের বেলায় এই দুইই ক্রিয়াশীল। যে লেখক সারাজীবন পুরাতন পরিচিত রেখা চিহ্নের উপর দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে হাত পাকিয়েছেন, তার পক্ষে পুরনো অভ্যাস ছেড়ে নতুন অভ্যাস রপ্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। একনও কিছু পরিমাণ গল্প উপন্যাসে দেখা যায় পুরনো অভ্যাসের দাসত্ব। "বয় মিট্‌স গার্ল" ধরনের ছকবাঁধা ভালবাসার গল্পের ছড়াছড়ি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঐর গেরস্থলীর সাদা মাটা বাস্তব কল্প কাহিনীর পরিবেশন তাই সততই চোখে পড়ে। প্রেমের গল্প লিখতে বসলেই সেটা দেহজ প্রেমের গল্প হওয়া চাই, অসুস্থ মনিবড, জৈব ক্ষুধার চিত্রণ ব্যতিরেকে প্রেমের গল্প হয় না, এই ভ্রান্ত ধারণার আধিপত্য এখন বাঙলা সাহিত্যে রয়েছে। সুস্থ সুন্দর প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি সম বিশ্বাসের সূত্রে দুজন তরুণ তরুণীর মধ্যে ভালবাসা জন্মাতে পারে, কিংবা কর্মক্ষেত্রে সমরুচি বা সমপ্রাণতার সূত্রে নরনারীর মধ্যে প্রেমের বিকাশ হতে পারে—এ তাঁরা বুঝতে চাইবেন না।

জীবন জিজ্ঞাসার বিচারে উপন্যাস ও ছোটগল্প একই চরিত্রের কেননা উভয় আঙ্গিকের লেখক প্রায়শঃ একই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সমকালীন সমাজ সমস্যার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করতে না পারলেও সাধারণ ভাবে রিয়েলিজমের কখনও সখনও সুরিয়েলিজম বা নেচারেলিজমের দৃষ্টি কোণ থেকে বহু গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল দাশ, ননী ভৌমিক, গোপাল হালদার, নবেন্দু ঘোষ, রমেশ সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু প্রমুখ লেখকদের বেশ কিছু গল্প উপন্যাস যুগ বিধৃত বিষয় চেতনার উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য হয়ে আছে। বিশেষ করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি রিয়েলিজমের সাধারণ গণ্ডী পেরিয়ে তাৎপর্য মণ্ডিত দলিলের ভূমিকা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ে চিত্র আজও সাধ্যমত আন্তরিক পরিস্ফুটনের মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ষাটের দশকে এই আন্তরিকতা এক বড় অংশের মধ্যে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের কারণে নেতিবাচক, জীবন বিমুখ যৌনাশ্রয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। মুষ্টি মেয় কয়েকজন লেখক ব্যতীত অন্যান্যরা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরিত কোটিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের নামে নর্দমার আবর্জনা পরিবেশন করতে আত্মনিয়োগ করলেন। আবার ষাটের দশক থেকেই বেশ কিছু লেখক অর্ধানুকূল্য ও অপ্রস্তুত পাঠকদের স্থূল হাততালির মোহ পরিত্যাগ করে নবীন শিল্পচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ সাহিত্য প্রচেষ্টা করেছেন। এরা অভিজ্ঞতার নামে রোমান্সধর্মী চিত্রশালা খুলে বসেন না, যৌন বিকারের অসামাজিক পথ আশ্রয় করেন না। এঁদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বহির্বাস্তব অপেক্ষা অন্তর্বাস্তব অনুধাবন, অনুভূতি ও চিন্তা সূত্রের সাহায্যে আত্মসমীক্ষণের প্রয়াস।

॥ দুই ॥

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ষাটের দশকে এসে তা এক পরিণত রূপ নেয়।

একালের পীড়িত, বিক্ষিপ্ত, অসহায় মানুষের বিশেষ করে শহুরে মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্রায়নই বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তাই কখনও রিপোর্টার্জ, মনোলগ বা চেতনাপ্রবাহের রীতি অনুসরণ করা হয়। স্থিতিশীল রীতির পাশাপাশি নবীনত্বের যখন আবির্ভাব হয় তখন পাঠককে তাৎক্ষণিক বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়। অন্তর্বস্তুর অভাবে এই নবীনত্ব অচিরেই হুজুগে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতার উপরিতলের উপরে দাঁড়িয়ে সহজতর কোন উপায়ে অর্থাৎ রীতি চর্চার নতুনত্ব দ্বারা সাহিত্যের সাময়িক স্বাদ বদল করা যায় কিন্তু মন ভরান যায় না। কেননা, ফাঁকিটা রয়েছে জীবন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অস্বীকৃতিতে। দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন লেখক মূলতঃ গল্পের মাধ্যমে এই নব্য রীতি চর্চায় নিমগ্ন হন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই দেখা গেল রীতি-চর্চার এই অভিনবত্ব তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার লেখকদের হাত থেকে সরে গেল একচেটিয়া সংবাদপত্র গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে। 'পরিচয়'-এর পাতায় যে গল্পরীতি ব্যবহৃত হচ্ছিল জীবন যন্ত্রণা, জীবনসংগ্রামে সংশয় ও বিচ্ছিন্নতা প্রকাশে, একচেটিয়া পুঁজি পরিচালিত সাহিত্য পত্রিকার পাতায় সেই রীতি মনোবিকলন, যৌন বিকৃতি, অস্তিত্ববাদী পুরুষ-নারীর অযথা অসংলগ্নপ্রলাপ মালায়। এঁরা যে কোন ভাষা, যে কোন বিষয় নির্বিচারে গ্রহণ করেন। আত্মসমীক্ষণের কঠোর প্রচেষ্টায় প্রায়শই এমন টুকরো চিত্র ও চরিত্রাংশ ভিড় করে যাদের একান্তই লেখকের ব্যক্তিগত বলে মনে হয় অর্থাৎ পাঠকের মন স্পর্শ করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। কোন ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণা তা যত প্রবলই হোক তার যদি কোন সাধারণ গ্রাহ্য চরিত্র গল্পে প্রস্ফুটিত না হয় তাহলে তা সাময়িক চমক লাগাতে পারে কিন্তু সহিতত্ব অর্জন করতে পারে না।

জীবনজীবিকার সংগ্রামে সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকায় এই সব লেখকদের আস্থা কম। তাই সমস্যার পটভূমির সন্ধান বা বিশ্লেষণ নয়, সমস্যায় পীড়িত হতাশাগ্রস্ত মনের নির্বিচার, অকুণ্ঠ, অশালীন প্রকাশই এই লেখকদের লক্ষ্য। সমাজের প্রতিটি মানুষের মনের খবর তার গোপনতম প্রত্যন্ত থেকে সংগ্রহ করে যেন এঁরা প্রাজ্ঞ হয়ে বসে আছেন। বিমল কর 'এই দশকের গল্প' এর ভূমিকায় লিখেছেন: "মানুষের জীবন দু'শ বছরের মধ্যে অনেক বদলেছে। একজন বলেছেন মানুষ যেন দীর্ঘকাল ছোট ছেলের মতন বাইরে বাইরে খেলা করে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখল সে প্রাজ্ঞ প্রাচীন হয়ে গেছে। বর্তমান যুগ মানুষের কুলায় প্রত্যাবর্তন। সে স্বগৃহে ফিরে এসে সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় তার প্রবীণতা ও প্রাজ্ঞতা দিয়ে নিজের কথা ভাবছে। আমাদের জীবনের অন্তর্মুখীতা তাই এখন এত প্রবল, বেদনাময়, স্বগত।... আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশী স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি—একথা অস্বীকার করা যায় না। অপরে কি বলবেন আমি জানি না, আমার মনে হয়েছে কবিতা ও উপন্যাসের মতন ছোটগল্পেরও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।" এই বক্তব্যকে সামনে রেখে যে সব লেখক গল্প লিখে চলেছেন তার মধ্যে রয়েছেন—সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ ঘোষ, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ।

॥ তিন ॥

দু'শো বছর ধরে জীবনযাত্রা স্থিতিশীল থাকতে পারে না, পরিবর্তন ঘটবেই এবং সেই পরিবর্তনের স্বাক্ষর সাহিত্যে থাকবে—এ কোন নতুন কথা নয়। বঙ্কিমযুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কথা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হবে যে in ward turning এর মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চরিত্র সৃষ্টি এর দ্বারা পূর্ণতা প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতো বহির্বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত নয়। নেতিবাচক বা ইতিবাচক যে সৃষ্টিই হোক তা নিঃসন্দেহে সমাজাবিধৃত, উদ্দেশ্যমূলক। অন্তর্লোকে যাত্রাতো বহির্লোকের মাটি পেরিয়ে। বহির্লোকের চৌহদ্দির মধ্যেই তো অন্তর্লোকের নিভৃত কুঠুরি। হঠাৎ সেখানে প্রবেশ করা যায় না বা সব সময় সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায় না। বহির্লোকের অনিবার্য কর্মযজ্ঞে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অংশ গ্রহণের পরেই সন্ধ্যার অবকাশে নিভৃত কুলায় প্রত্যাবর্তন। আর এমন কি ঘটল যে একযোগে ঘোষণা করে দল বেঁধে নিঃসঙ্গতার সাধনা করতে হবে। এর মধ্যে এককালের বাস্তববাদী লেখকরাও ছিলেন। কারণটা রাজনীতি বিবর্জিত ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে শাসক শ্রেণীর আঘাতের মুখোমুখী হওয়ার সৎসাহসে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে কুলায়ে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়ে বক্‌বকম্ করাই অনেকে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। কেউ কেউ বা আপন দুর্গে নির্বাসিত পাগলা মেহের আলির মত 'সব ঝুট হ্যায়' বলে চীৎকারে ছদ্ম উন্মাদের ভূমিকার অভিনয়ই আত্মরক্ষার উপায় বলে স্থির করেছিলেন—অনেকে আজও তা করে চলেছেন। কিন্তু প্রকৃত মানবদরদী লেখক নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ হবে কেন? তাদের জীবন দৃষ্টি জন্ম বহির্বাস্তবকে আয়ত্তাধীন করতে সচেষ্ট হওয়া এবং শোষণ নিপীড়নের কার্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা। কিন্তু যাঁরা সদর্থক দৃষ্টিকোণে আস্থাবান নন তাঁরা হয়তো পথহারা হয়ে আন্তর বৃত্ত জরাগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হতে পারেন। তবে একদল লেখক সবসময়ই থাকেন যাঁরা প্রতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে জীবন বিমুখ অন্ধকারময়তার দর্শন বা অস্তিত্ববাদের দর্শন সচেতনভাবে প্রচার করেন।

মোটা দাগের গল্প বিন্যাসের পাশা

পাশি অন্তর্মুখী রেখাচিত্রে মননের প্রাধান্য বিস্তার করে গল্প বলার রীতি বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প সৃষ্টির শুরু থেকেই ক্ষীণভাবে অব্যাহত ছিল। য়ুরোপীয় সাহিত্যে বা এদেশীয় সাহিত্যে গল্প বলার প্রাচীন পদ্ধতি হল বক্ষ্যমান কাহিনী বিন্যাসের বাইরের দিক থেকে। লেখক যেন চরিত্র ও পাঠকের মাঝখানে সীমারেখা হয়ে দণ্ডায়মান থাকতেন। চরিত্রকে পছন্দ মাফিক dimension-এ পাঠকের সামনে হাজির করতেন তার সমস্ত dimension পাঠকের দৃষ্টিগোচর হত না—বিশেষকরে অন্তর্লোক। তাই আধুনিকতার অবদান হল চরিত্রের বহিরাবরণ নয়, অন্তর্লোকের বেশী বেশী করে উদ্‌ঘাটন। একেই সমালোচকরা নাম দিলেন inward turning। আগে একজন লেখক গল্প বলতে বলতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু নিসর্গ বর্ণনা সেরে নিতে পারতেন বা পাঠকের সঙ্গে দুদণ্ড বিতর্ক বা রসিকতা করে নিতে পারতেন। কিন্তু একালে ঘটনাকে লেখকের মর্জির বাইরে চরিত্রের দৃষ্টিকোণে বসানো হয়েছে। চরিত্রকে যুগ কাল প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসযোগ্য করাই মূল প্রবণতা হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিবেশ তার ধাত্রীমাত্র।

চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বলার অন্যতম পরিণতি হল চেতনা প্রবাহী গল্প, বিমূর্ত গল্প ইত্যাদি। চরিত্র এখানে কথা কম বলে, ভাবে বেশী। যা ভাবে তাও অবচেতনে অর্থাৎ চেতন থেকে অবচেতনে ডুব দেওয়া। তাই নানা তুচ্ছ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা গল্পে স্থান পায় ফলে ডিটেলসের প্রাধান্য, প্রতীকের যথেচ্ছতা, প্লটমুট বিহীনতা ইত্যাদি প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাঠককে এই স্রোতের আবর্তে নিক্ষেপ করে লেখক নেপথ্যে সরে যান—বেশীর ভাগ পাঠকই বুদ্ধির খেই হারিয়ে গল্পের মধ্যে আন্তরিকভাবে হাবুডুবু খান। হেনরী জেমস এই রীতিকে বলেছেন, the revelation of the story। এর প্রধান অসুবিধা হল আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্বোধ্যতার কারণে বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে দূরত্ব অনুভব করে পাঠক ক্রমশঃ দূরে সরে যান। গল্প তখন কিছু বুদ্ধি অভিমানী ব্যক্তির বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যে বিশেষ করে এই বিপদ সম্পর্কে পরবর্তী লেখকরা সচেতন হয়েছেন এবং প্রিস্টলি প্রমুখরা একটি মধ্যপন্থা অনুসরণের প্রয়াস করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও এই প্রবণতা ক্ষীণ হয়ে হয়ে পুরানো রীতির সঙ্গে এক সমনাত্ততায় এসে গেছে।

গল্পে এই subjective ভঙ্গি অনুসরণের উদ্দেশ্য বলে যা দাবী করা হয়েছে, তাহল গল্পের সঙ্গে কবিতার মেলবন্ধন এবং 'গল্পের হৃদয়কে শুদ্ধতা দেবার অভিলাষ।' এটা ঠিক যে আঙ্গিক হিসেবে গল্প শাখা অনেকখানি উদার, সেখানে কবিতা, মনোলগ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু আশ্রয় গ্রহণকারী যদি আশ্রয়দাতাকে গ্রাস করে তাহলে পাঠক তাকে গল্প বলে মেনে নেবে কেন? বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকই মোটের উপর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কারে অভ্যাসে অভিজ্ঞতায় মানুষ, তাঁদের চিন্তার গণ্ডীর সীমারেখা সাধারণভাবে এক। তাই পাঠক যদি বিভিন্ন লেখকদের রচনার মধ্যে পৌনপুনিকতা ক্লান্তি বোধ করেন তাহলে দোষ কোথায়? তাছাড়া অন্তর্লোকই সব কিন্তু তার ধাত্রী বহির্জগৎ মূল্যহীন এত তো একচক্ষুতা। মনোজগৎ ও বহির্জগৎ পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল। বাস্তবের গতিময়তা এই উভয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সাহিত্যকে এই inter action এর মধ্যেই বিধৃত করতে হবে তা গ্রাহ্য হয়ে উঠবে—কালের গণ্ডী পেরিয়ে কালান্তরকে স্পর্শ করবে। কোটরবদ্ধ পেচকের মতো 'বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি' এই উক্তি সুস্থ মানুষের নয়। কেননা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষই একমাত্র আন্তর-বৃত্ত বদ্ধ।

কেউ কেউ এর দ্বারা দাবী করে থাকেন লেখকরা গভীরতায় প্রবেশ করছেন। কিন্তু বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে অন্ধকূপে বসে প্রলাপ বকলেই সাহিত্য গভীর হয়ে ওঠে না। জীবনের পাতায় পাতায় মিলে মিশে গিয়েই মনোলোকের নবীনত্বের, গভীরতার সন্ধান করতে হয়। জীবনকে প্রকাশ করার জন্য তার সঙ্গে সহিতত্ব অর্জন করার জন্যই ভাব ভাষা-রীতি প্রকরণ ইত্যাদি। তাই নবীন গল্পকারদের কাছে নিবেদন বিষয় ভাবনায় স্থিত হন, জীবনের দিকে মুখ ফেরান, প্রকাশ রীতি ও স্বভাবিক ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হবে। প্রযত্নের আবশ্যকতা অনিবার্য কিন্তু রীতিবন্দীর অভিযত্ন বাহুল্য, বিরক্তিকর।

এই সব কিছুর পাশাপাশি রয়েছেন সমাজ বাস্তবতার আদর্শে বিশ্বাসী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহী বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান কথাশিল্পী—যাঁদের অনেকেরই শক্তিমত্তা অনস্বীকার্য।

উৎসবে
ও
উপহারে
সবরকম বেনারসী, পিওর সিল্ক, তাঁতের ও প্রিন্টেড শাড়ী, সার্টিং, স্যুটিং, মিলের যাবতীয় ধুতি ও শাড়ী এবং তৈয়ারী পোষাক
শীতের
কাশ্মিরী শাল, সোয়েটার, কম্বল
বাংলার প্রাচীনতম বস্ত্র প্রতিষ্ঠান :
রামকানাই
যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ৩৩-২৩০৩

প্রবল জীবন স্রোতে

শ্রী হলধর পটল

ব্যাপারটি বুঝতে ঠিক পারছে না রাঙা বৌ। হঠাৎ কেন এমন হচ্ছে। সারা শরীর যেন অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে। দিনরাত যেন চোখে ঘুম ঘুমভাব। মাঠে খাটতে যেতে ভাল লাগে না। যে রাঙা বৌ এক ঘণ্টার মধ্যে ছ' গণ্ডা বীজ টেনে ভাঙতো সেই রাঙা বৌর দু' গণ্ডা বীজ ভাঙতে যেন আর হাত সরে না। তবে কি। আশঙ্কায় রাঙা বৌ-এর চোখ কান গরম হয়ে উঠলো। ভয়ে সারা শরীর যেন সিঁটিয়ে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠলো তার। চোখ বুজে ফেলল রাঙা বৌ। কালো অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলো শূন্যস্থান গোল গোল হয়ে যেন ঘুরছে। মনে মনে ভাবলো রাঙা বৌ কাউকে জিজ্ঞাসা করবো। না না। শিউরে উঠলো সে। যদি সে রকম কিছু হয় তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে রটবে। বড় জা কমলী পাড়ার সবার কানে তুলে দেবে কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে চাটনীর মত খবরটাকে রসিয়ে রসিয়ে চাটবে সবাই। কি লজ্জা। তার যে সোয়ামী নেই।

রাঙা বৌ যে কিছুই জানে না। এত বয়স পর্যন্ত তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এক ফোঁটা মেয়ে যখন সে, তখন ফুল পুকুরের সুরোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। মগরা থেকে তাকে বিয়ে করে এনেছিল সুরো বাউরী। সুরো সাহিত্য পাড়ায় বংশীদের বাড়ীতে নাপাড়ে ছিল। ফুল পুকুরের দিঘীর পাড়ে ছিল সুরোর একখানি ঘর। মাটি পাঁচীল দিয়ে ঘরখানা তুলেছিল সুরো একটু একটু করে। মনিব বংশী দাসের কাছ থেকে তিনশো টাকা দেনা করে বাঁশ দড়ি আর খড় কিনে ঘরখানি ছেয়েছিল সুন্দর করে।

সুরোকে ঠাট্টা করতো বড় বউদিদি খতের বৌ কমলী। বলতো কি ঠাকুরপো বিয়ে করবে বলে বুঝি দেনা করে মাটির পাঁচীল দিয়ে ঘর তুললে। যত্ন করে ঘর ছাইলে। দেখো তুমার যে বৌ আসবে সে কুটে হবে।

: হলেই হোল। পাঁচন বাড়ীর ঘায়ে কুটেমি ছুটিই দিব বলে রাখছি।

: তার বড় জ্বালা। বৌ হবে তুমার মাথার মণি।

সুরো বিয়ের পরে সব কথাই তাকে বলেছিল। আদর করতো মানুষটা। সেই আদর করে নাম দিয়েছিল রাঙা বৌ। আসলে তার নাম ছিল শৈলী। গায়ের বর্ণটা ছিল তার কাঁচা হলুদের মতন। বাউরী ঘরে এমন রঙ কটা মেয়ের আছে। তাই সুরো ওকে বলতো রাঙা বৌ। ঐ আদরে ডাকটা শৈলীই একদিন বড় জা কমলীকে আহ্লাদ করে বলে ফেলেছিল। কমলী পাড়ায় গাবিয়ে দিলে। সবাই তাকে রাঙা বৌ বলে ডাকতে আরম্ভ করলে। শৈলী নামটা ভুলেই গেল সবাই।

ফুলপুকুরের বাউরী পাড়ায় বামুন দিঘীর চারপাড়ে, ঘর পঞ্চাশেক

বাউরীর বাস। সবাই ক্ষেতমজুর। পুরুষগুলো কেউ বামুন বাড়ীতে, কেউ মাহিষ্য পাড়ায়, কেউবা কামারদের চাষে নাগাড়ের কাজ করে। ঘরের বৌরা ক্ষেতমজুরী করে। ধান রোয়া ধান নিড়োন, ধান কাটা, ধান ঝাড়া আর পাট নিড়ানোর কাজ করে। এক কেজি চাল আর একটাকা মজুরী। বছরে আগে চার পাঁচ মাস কাজ জুটতো বাড়ীর মেয়েদের। এখন ওপাশে সেকন্দাপুরের মাঠে ডিপকল হয়েছে। বোরো ধান হচ্ছে। শ্রাবণ ভাদ্রে একটা ধান উঠছে। সারা বছর সবাই কাজ পাচ্ছে।

কাজ পাওয়া মানে কোনরকমে দুবেলা দুমুঠো জোটা। সবাইয়েরই এক ঘর এক কাঁসি। বামুনদের জায়গায় কুঁড়ে করে সবাই আছে বহুদিন। এরই মধ্যে সুরো আর রাঙা বৌদের অবস্থা একটু ভাল ছিল। খুব খাটিয়ে রাঙা বৌ। কাজ পেলে কোনদিন বসে থাকতো না। সুরোও কোনদিন কামাই করতো না। সুরোর মনিব বংশী দাস সুরোকে একবিঘে জমি ভাগে দিয়েছিল। বংশী দাসের গরু লাঙ্গল নিয়ে সুরো জমিতে কাদা করতো। রাঙা বৌ দুদিনে সেই জমি রুয়ে ফেলতো। বোরো মরশুমে সুরো একবার আটমন ধান পেয়েছিল। সেবার রাঙা বৌ সুরোর জন্য কিনেছে একখানি কাঁসার থালা, একটা জল খাবার ঘটি। আরামের নেশা জেগে ছিল রাঙা বৌয়ের। সুরোকে বলেছিল রাতে বড্ড মশা কামড়ায়। একখানা মশারি কিনে দিবে।

সুরো নকল রাগ দেখিয়ে বলেছিল ও ধান পেয়ে তোর বড় নোকী বেড়ে গেছে রাঙা বৌ। থালা কিনেচু, ঘটি কিনেচু আবার মশারি কেনে? পাড়ায় কার ঘরে মশারি আছে রে? সবাই তো গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে জন্ম কাটলো। তর আবার বাড়াবাড়ি।

রাঙা বৌ আর কথা বলে নি সোয়ামীর মুখের উপর। রেগে গেলে সুরো মারতো রাঙা বৌকে। চড় থাপ্পড় কিল ঘুষি লাথি কিছুই বাদ পড়তো না। রাঙা বৌ-এর খুব কষ্ট হোতা কিন্তু চেঁচিয়ে ও পাড়ার বিমলীর মত পাড়া মাথায় করে কাঁদতো না। তার লজ্জা হোত। যদি বড় জা, মেজ জা জানতে পারে তাহলে ঠাট্টা করবে পরের দিনই—কাল ঠাকুরপো তোকে অত চিপাচ্ছিল কেনে রে? মার খাওয়ার থেকে বেশী কষ্ট জা এদের রসিকতা। পাড়াময় বলে বেড়াবে। ক্ষেতে কাজের সময়ে যখন দলভর্তি কিষাণ খাটবে তখন সবাইকে শোনাবে ওরা। রাঙা বৌ খুব সাবধানে থাকতো যাতে সুরো রেগে না যায়। সুরো পচাই খেয়ে যেদিন বাড়ীতে আসতো সেদিন রাঙা বৌ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো। মশারির ব্যাপার নিয়ে তাই রাঙা বৌ আর কথা বাড়ায় নি।

অবাক করে দিয়েছিল দুদিন পরে সুরো। একখানা বড় মশারি নিয়ে সে মনিব বাড়ী থেকে ফিরল একদিন সন্ধ্যা বেলা। বললে লে। মনিব আজ পুইনেনের বাজার থেকে এনে দিয়েছে। ডবল মশারি। দাম লিয়েছে আঠারো টাকা। মনিব টাকা ধার দিয়েছে। পরে শোধ করে লিবে। ইবারে আরামে শো। তর আবার সোনার ভাতর। মশা কামড়ে কালি না হয়। ভাঁজ করা দড়ি দিয়ে বাঁধা মশারি খানা ছুঁড়ে দিলে রাঙা বৌ এর হাতে।

রাঙা বৌ মশারিখানাকে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে। আঃ সোয়ামী তার কত ভালো। রাঙা বৌ এর কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন। গলাটা বুজে গিয়েছিল। সুরো যখন জিজ্ঞাসা করলে—হল তো। কথার জবাব দিতে পারে নি রাঙা বৌ। ঘাড়টা কাত করে জানাতে চেয়েছিল—দারুণ খুশী।

কেরোসিনের লম্ফর আলোয় ভাত খেয়ে উঠে বিড়ি ধরালো সুরো রাঙা বৌ সুরোর পাতে ভাত খেয়ে উঠে বামুন দীঘির ঘাট থেকে থালা ঘটি ধুয়ে এনে এঁটো জায়গাটা ন্যাতা দিয়ে নিকিয়ে হাত ধুয়ে এসে চাটাই পাতলো। গাঁট দেওয়া দুটো বালিশ পাশাপাশি পাতল। তারপর বুকটা উদোম করে আঁচল পেতে চাটাই এ শুল। সুরো ওর মুখের দিকে তাকাতেই হেসে ফেললে রাঙা বৌ।

সুরো বললে মশারি খাটালি নি।

খিল খিল করে হেসে ফেললে রাঙা বৌ।

সুরো হাসিটা বুঝতে পারলে না। বললে—কি হোল। পছন্দ হয় নাই বুঝি।

রাঙা বৌ বললে—খুব পছন্দ হইছে।

ঃ তবে মশারি খাটা।

চারটা পেরেক তো চাই—মশারির খুঁটের দড়ি চাই না।

ধুর শালা। এতকাণ্ড আছে আবার। কালো বুঝতে পারে বৌ এর হাসিটা। বললে—কাল মানিব বাড়ী থিকে চারটা পেরেক আর খানিক দড়ি চেয়ে লিব। উড়ন্ত মশাগুলোর দিকে তাকিয়ে সুরো বললে লে শালারা আজকের রাতটাও তোরা রাঙা বৌর রক্ত খানিকটা খেয়ে লে। কাল থেকে আর পাবি নি। ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরো রাঙা বৌর বুকের উপরে। রাঙা বৌ আরামে চোখ বুজল।

টুকরো টুকরো অনেকদিনের কথাই রাঙা বৌ এর মনে পড়তে লাগলো। স্বামী স্ত্রীর ভাব, ভালবাসা, ঝগড়া, রাগারাগি আট বছর ধরে সুরোর সংগে ঘর করার অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। আর কান্না পেতে লাগলো। এই আট বছর রাঙা বৌ র চেহারা আরও ভরাট হয়েছিল। দুরন্ত যৌবন দেহেতে জেল্লা দিয়ে উঠে ছিল। ওকে দেখে মনিবের বৌ বলছিল তোকে দেখলে হিংসে হয় রাঙা বৌ। অত টাইট করে বুকের কাপড় কষিসনে। পুরানো কাপড় বুকের চাপে ফেটে যাবে তোর। মুচকি হাসতো রাঙা বৌ। মনিব গিন্নীর বয়স তারই মত। এই বয়সেই তিন ছেলের মা। বুকের বাঁধন আলগা হয়ে লতিয়ে গেছে। মনিব গিন্নী বলতো—তুই বেশ আছিস বৌ। তিন তিনটে ছেলে আমাকে ছড়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে।

ভাল লাগতো না মনিব গিন্নীর কথাগুলো। একদিন বলেছিল—বউ-দিদি ছেলে পিলে না হলে কি ঘর মানায়। ভগমান তো দিলে নি আমাকে এক টুকরো।

ঃ বেশ আছিস বৌ। ছেলে নয় শত্তর। শত্তর। পেটের শত্তর।

মনিব গিন্নী কিষাণের চাল মেপে

দিচ্ছিল। চাল নিয়ে আঁচলে বেঁধে মনিব বাড়ী থেকে পাড়ায় আসার সময়ে রাঙা বৌ ভাবতো তারও যদি একটা শত্তর এই ক'বছরে হোত। সেনেটের বিশালাক্ষী মায়ের শারদ নবমীর কোপ দেখতে গিয়ে এক বছর রাঙা বৌ মানত করেছিল মনে মনে—মা বিশালক্ষ্মী এবার আমার পেটে একটা দাও। তুমাকে পাঁঠা দিব। বড় ইচ্ছা হয়েছিল রাঙা বৌ এর মা হতে। আট বছর ধরে সোয়ামীর ঘর করেও যার ছেলে পিলে হয় না তার হাতের জল শুদ্ধু নয়। বড় জা কমলী বলতো তাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে। বলতো—অফলা গাছ। আঁড়া তাল গাছের মত তর মোচ আছে ছোট বৌ। ওতে ফল ধরে না। ও মোচ কাটলে তাড়ি হয়—নেশার বস্তু মিলে কিন্তুক ওতে পাকা তালের মজা নাই। কমলী অনেক কথা বলতো—আঁড়ি আঁটকুড়ো মেয়ে মানুষের মুখ আষাঢ়া। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হত রাঙা বৌ এর।

একদিন বামুন বাড়ীতে কাজের চাল আনতে গিয়ে রাঙা বৌ বামুন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বৌদিদি তুমরা তো অনেক নেকাপড়া শিখেছ। ছেলে হবার ওষুধ নাই। বামুন বৌদিদি খুব ভালো মানুষ। বলেছিল—ওষুধ আছে। ডাক্তার দেখাতে হয়। ডাক্তার স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই পরীক্ষা করে বলে দেয় কার দোষে ছেলে হয় না। তারপর চিকিৎসা করে দোষ ভালো করে।

ঃ সত্যি। রাঙা বৌ বলেছিল বউদিদি পায়ে পড়ি তুমার। আমাকে একবার ডাক্তার দেখিই দিবে। দাদাকে বলো না কেনে চুঁচুড়োর হাসপিতলে একখানা চিঠি লিখে দিবে ডাক্তার-বাবুকে, আমি ওকে লিয়ে যাবো।

ঃ বলবো বলবো। বামুন বউদিদি কথা দিয়েছিল।

রাঙা বৌ এর যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয় নি। রাঙা বৌ-এর চোখে জল এসে গেল। তখন গেলে যদি চিকিৎসা করিয়ে একটা ছেলে পুলে হত তাহলে অন্ততঃ সে জানতো। পেটে ছেলে পুলে এলে কি হয়। অস্ফুট কণ্ঠে নিজের ঘরে চাটাই এর উপর শুয়ে রাঙা বৌ-এর নিদ্রাহীন চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে রাঙা বৌ বলে উঠলো—ভগমান। হা ভগমান।

রাঙা বৌ ভাবতে লাগলো সেদিনের কথা। সুরো নাকি মদ খেয়ে টলতে টলতে রাতে বাড়ী এসে বললে—রাঙা বৌ, দ্যাখতো পাটায় কি যেন কামড়ালো। বড্ড জ্বালা করছে। শরীরটা ঝিম ঝিম করছে।

রাঙা বৌ লম্পটা হাতে করে পায়ের কাছে এগিয়ে নিয়ে দেখলে—পায়ের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ঝুঁইয়ে রক্ত ঝরছে গল গল করে। রক্তের ধারায় ক্ষতমুখ দেখা যাচ্ছে না। হাত দিয়ে রক্তটা মুছে দিয়ে রাঙা বৌ বোঝার চেষ্টা করলো কোন্ খানটায় কেটেছে। সুরো দাওয়াতে বসে খুঁটিতে হেলান দিল নির্জীবের মত। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—অভিপদ কাকাকে ডাক। মনে হচ্ছে যেন লতায় কেটেছে।

চিৎকার করে উঠেছিল রাঙা বৌ। লম্পটা ফেলে রেখে দৌড়েছিল সে বড় জা কমলীর কাছে। ওঃ দিদি, দিদিগো শীগ্‌গীর একবার আমাদের বাড়ীতে চল। তুমার দেওরকে বুঝি লতায় কেটেছে। সারা পাড়াটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল সুরোর বাড়ীতে। সাপের ওঝা পুবপাড়ার অভিপদ, বাগঘাটার সুবলো, মাহিষ্য পাড়ার ফকির সবাই দৌড়ে এসেছিল। উঠানে তিনটে দাগ দিয়ে হাত চেপে সবাই বললে—জাত সাপে কেটেছে। সারা রাত ধরে ঝাড় ফুঁক চললো। কত শিকড় গোলমরিচ দিয়ে বেটে খাওয়ান হল। পরের দিন সূর্য লাল হবার আগেই সুরো নিথর মেরে গেল। রাঙা বৌ পাগল হয়ে গিয়েছিল। এক বাড়ী লোকের সামনে মৃত স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—জোরে কাঁদে নি সে। ফুলে ফুলে উঠেছিল কয়েকবার তার দেহটি। তারপরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

রাঙা বৌ মনে মনে ভাবলে—ভগমান আমায় কেন সাপে কাটে নাই। আমি কেন মরি নাই। তাহলে আজ এই লোজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতম।

সুরো মরে যাওয়ার কিছুদিন পরে কমলী বলেছিল—ছোটবৌ দুঃখু করিস না। আমাদের বাউরী জাতের তো নিকা সাঙা আছে। তর এই ভরা যৌবন নিয়ে একা থাকবি না। মাঠে একা একা খাটতে যাবি নি। অনেক শিয়াল শুকুনি আছে রে। মড়া দেখলেই তারা ছিঁড়ে খেতে আসে।

বড়জায়ের কথায় রাঙা বৌ রাগ করতো। তুমরা যে কি বল দিদি তার কোনও ঠিক নাই। আমি শক্ত থাকলে কার বাপের সাধ্যি যে আমার গায়ে হাত দেয়।

কমলী বলতো—অত দম্ভ করিস না ছোট বৌ। মেয়ে মানুষের অত দম্ভ ভালো নয়। ওতে ভগবান রুষ্টু হয়। সারা জীবন তর সামনে বাকী। সোয়ামী অপঘাতে মরেছে বলে তুই উপায় করবি কেনে? তুই সাঙা কর।

ঃ তুমার এক কথা দিদি। বামুন ঘরের মেয়েরা তো বিধবা হলে আর সাঙা করে না। তারা থাকে কি করে?

কমলী ছোট বৌকে ভাল বাসতো। বলতো—কুন বামুন ঘরের বিধবাদের তো তর মত মাঠে ঘাটে খাটতে যেতে হয় না। তাদের বাপ ভাইরা আগলে রাখে। শিয়াল শুকুনিরা ফাঁকা পায় না। আর তর? ই পাড়ায় উ পাড়ায় খাটতে যাস। মাহিষ্য বাড়ীর, কামার বাড়ীর মানুষগুলা তর বুকের দিকে তাকিই থাকে। ওদের চোখের দিকে তাকাস দেখবি কত কথা উখানে। বামুন পাড়ার বেজা তকে অত করে কিষাণ লিতে চায় কেনে। কেনে তুমি কাজে গেলে বেজা বামুন জমিতে সারা বেলা কাটায়? পারবিনি ছোটবৌ পারবিনি। এই যৌবনের জ্বালা নিয়ে পুড়ে মরবি।

সুরো মরার ছ'মাস পরে কমলী বললে—আমার ভাইকে তর কথা বলেছি। উ রাজী। উয়ার বৌটা ছেলে হতে গিয়ে মরে গেছে। এখনও সাঙা করে নাই। তুই রাজী থাকলে উও রাজী।

কমলীর কথায় উত্তর দেয়নি রাঙা বৌ। বড় জায়ের বাপের বাড়ী পাশের

গ্রাম কালকেডাঙ্গায়। ওর ভাই কন্ন বাউরী কিষাণ খেটে খায়। নাগাড়ের কাজ করে আয়মার গয়লা বাড়ীতে। কমলীর ভাই তরণীকে রাঙা বৌ চেনে। বড় মদ খায়। বেঁচে থাকতো বৌটাকে দিনরাত পিটতো। স্বভাব ভালো নয়। বৌ মরে যাওয়ার পরে রাঙা বৌ-এর চারপাশে অনেকবার ঘুর ঘুর করেছে। দিদির বাড়ীতে ঘন ঘন আসে। দুদিন তিনদিন মদ গিলে দিদির দুয়ারে পড়ে থাকে বেহুঁশ হয়ে। ঘাতা খিস্তী করে। ওর ঘরে যেতে রাঙা বৌ এর মন ওঠে না।

একদিন কন্ন রাঙা বৌকে বলেছিল—তুই আমার ঘরে এলে আমি নেশা ছেড়ে দিব। তোকে লিয়েই নতুন নেশা করবো রাঙা বৌ।

রাঙা বৌ জবাব দিয়েছিল—বামন হয়ে চাঁদে হাত কেনে? মুখে নুড়ো জ্বেলে দিব আবার এমন কথা বললে। ঝাঁটা দেখে কন্ন আর ঘাঁটায়নি।

সুরো মরে যাবার পরে দিনকতক রাঙা বৌ মন গুমরে বসেছিল। বংশী দাসের বাড়ী থেকে চাল টাকা ধার করে কদিন চালিয়েছিল। তারপর তাকে আবার কাজে বেরোতে হয়েছে। ধান কাটা, ধান ঝাড়ার কাজ, মাঠের নানান কাজ। সকালবেলা বাসি ভাত খেয়ে কাজে যাওয়া বেলা তিনটা চারটার সময়ে চাল নিয়ে চাষী বাড়ী থেকে ফিরে আবার রান্না করে দুমুঠো ফুটিয়ে নেওয়া। সন্ধ্যা বেলাতেই খেয়ে শোয়া। এ ছাড়া অন্য কোনও কাজ নেই। একা একা ঘরে শুয়ে থাকতেও ভয়—ভয় করতো রাঙা বৌ-এর অনেকদিন। বাঁশ বাঁখারি দিয়ে তৈরী করা আগড়খানাই ছিল ঘরের দরজা। ভয় করতো রাঙা বৌ-এর আগড়ের দড়ি কেটে যদি কেউ ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় চেপে ধরে! মনে মনে ভাবতো তাহলে সে চেঁচাবে। সবাই দৌড়ে আসবে। ভয়টা কিসের?

কোন কোন সময়ে তার অসহ্য লাগতো। তালপাতার চাটাই এর শিরগুলো গায়ে বেঁধে। সুরো থাকতো এই তালপাতার চাটাই তো কখনও এমন শক্ত লাগেনি। এত অসহ্য মনে হয় নি। মনে হোত দিনকতক মগরায় বাপের বাড়ী চলে যায়। কিন্তু বুড়ো মা। বাপ নেই। ভাই ভাজ মাকেও চোখে দেখে না। বুড়ো মা কোনও রকমে সদগোপ বাড়িতে ঝিগিরি করে। ভাই ভাজ মাঠে খাটে। ওখানে গিয়েও খেটে খেতে হবে। যায়নি। মা এসেছিল জামাই মরার পরে। দিন তিনেক ছিল। চলে গেছে। মনিব বাড়ীর কাজ কামাই করলে এই বুড়ো বয়সে যদি ছাড়িয়ে দেয়। বিয়ের পরেই ওদের সমাজে এই নিয়ম। সবাই আলাদা। মা ভাই'এর কোনও ভরসা কেউ করে না। সোয়ামীরও না। কত বাউরী মেয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী পালায়। কদিন পরেই স্বামী স্ত্রীর গড়বিড় হয়ে যায়। আবার সাঙা করে। বড় খারাপ লাগে রাঙা বৌএর এসব। স্বামীর ঘর ছেড়ে পালানো মেয়েগুলোকে দেখে তার ঘেন্না হোত।

অবসন্ন শরীরে নিদ্রাহীন চোখে তালপাতার চাটাই এ শুয়ে শুয়ে কমলীর এক এক করে সব কথাই মনে হয়। সুরো বেঁচে থাকার সময়ের কথা, সুরো মারা যাওয়ার পরের এক বছরের কথা সব মনে হয়। মনে পড়ে বড় জা কমলীর কথা—মেয়ে মানুষের এত দম্ভ ভালো নয়! যৌবনের জ্বালায় পুড়ে মরবি ছোটবৌ।

সুরো মরার কিছুদিন পরেই সে বুঝেছিল যৌবনের জ্বালা কি কঠিন। সর্বশরীর জ্বালায় হা'হা করতো। সেই হাহাকারের মধ্যেই প্রথম একটি ইঙ্গিতেই দৌড়ে এসেছিল বেজা বামুন। এসেছিল রাতের অন্ধকারে তারই ঘরে। বাউরী মেয়ের গায়ের গন্ধ ওর যে অত ভাল লাগে তা জানা ছিল না রাঙা বৌ-এর। ওকে দিয়ে পা টিপিয়েছিল রাঙা বৌ। অতবড় জোতদার কেমন নিঃশাড়ে ওর পায়ের গোছগুলো টিপেছিল। বড় আরাম হয়েছিল সেদিন তার। দেহের আরাম। মনের আরাম। সেদিনই শুরু। অনেক রাতে বেজা আগড় খুলে চলে গিয়েছিল। বেজা তাকে অনেক জিনিস দিত। সাবান, তেল, শায়া, জামা যা চাইতো রাঙাবৌ তাই দিত। শেষ বেশ ধনেখালির শাড়ীখানা দিতেই পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হল।

ঐ শাড়ী পরে রাঙা বৌ পুইনেন সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

সিনেমা থেকে বাড়ী ফেরার পরেই কমলী ধরলো—ছোটবৌ! বড় ভাবন যে বাড়লো লো তোর। ঠাকুরপো বেঁচে থাকতে কুনওদিন তো এস জুটে নাই। সাবান মেখে দিঘীতে অতক্ষণ ধরে নাওয়া, ভাল ভাল শায়া জামা পরা—ধনেখালীর শাড়ী ফ্যারাং দিয়ে বাইশকোপ দেখতে যাওয়া। ব্যাপারটা কি লো! ইতো ভালো নাগছেনি বাপু!

ঝেঁকে উঠেছিল রাঙা বৌ। বলেছিল—কেউ কারও ভালত দেখতে পারেনি দিদি।

ঃ কি বললি তর দেখে হিংসে হইছে আমার। না গো না। কানে তুলো দিয়ে বসে আছু। পাড়ার লোকে কত কথা বলছে কানে বুঝি নাগে না তর। আমারা যে ঘেন্নায় মরি!

ঃ তুমাদের ঘেন্না কিসের। কারও বাপের সাধ্যি থাকে তো আমায় বলুক। ঝাঁটা দিয়ে মুখ ভেংগে দিব।

ঃ লাজ নাই লো তোর? কমলী ঝগড়ার জন্য কোমর বেঁধে বললো—আমরা তো চখের মাথা খাই নাই। নাগরের সংগে ঢলাঢলি রঙ্গ দেখে চখ যে পচে গেল ছোটবৌ।

ঃ কার সংগে এ্যাতো ঢলাঢলি দেখলে যে চখ পচে গেল। নামটা কর না কেনে গ।

ঃ নাম করব কেনে? তুই নিজে মনে বুঝে দ্যাখ না। কে রাতে আসে। গুজগুজ ফুসফুস করে? নিজের কানে শুনেছি ছোটবৌ। অপাড়ার দাসী দিদিও জানে। কমলী বলেই চললো। বলেছিলাম না সাঙা করতে। অঃ তখন দম্ভ কত। কার বাপের সাধ্যি গায়ে হাত দেয়।

ঃ তুমার ভাইকে সাঙা করি নাই বলেই তা তুমি বদনাম দিচ্ছ। সেকি আর বুঝি না। ওই মাতালটাকে কে সাঙা করবে গ দিদি।

ভাই-এর সম্পর্কে রাঙা বৌর মন্তব্য শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না কমলী। বললে: বামুন বাড়ীতে মন

মজলে কে আর বাউরী সাঙা করে ছোটবৌ। একদিন ধরে, দিব তখন তো মানবি।

ইঙ্গিতটা বেজা বামুনের দিকে হতেই রাঙা বৌ চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল আর কেঁচো খুঁড়ে লাভ নেই। সাপ বেরুবে এবার।

কদিনের মধ্যেই আলোচনাটা অনেক গেঁজিয়ে উঠেছিল। পাড়ার কালো, ভুলো, গিরিন সবাই পরামর্শ করেছিল একদিন ওরা বেজা বামুনকে ধরবে। অনেক টাকা আদায় করে নেবে। সেই টাকায় মদ গিলবে অনেকদিন ধরে।

ওদের শলাপরামর্শ জানতে পেরে ছিল রাঙাবৌ। বেজাকে বলেছিল: তুমি এখন আর এসোনি বাবু। পাড়ার লোকেরা পিছু নেগেছে। উদের কায়দা করে লি আগে।

কালো ভুলো গিরীন পাড়ার তিন জনেই ফাঁদে আটকা পড়ে গেল রাঙা বৌ-এর।

সবাই এসেছে ওর কাছে। তার যৌবনের জ্বালা মিটিয়েছে। নিজেদের মুখ বন্ধ করেছে। চুপ চুপ হয়ে গেছে বাউরী পাড়া। কিন্তু কমলী ভুলতে পারেনি। থেকে থেকে গজ গজ করতো। পুরুষ গুলা সবই হ্যাঙলা। সবাই রাঙা বৌ-এর ভেড়া। সারা পাড়াটাকে ভেড়া বানিই দিলে বাপু ছোটবৌ। হাঁ। এলেম আছে বটে উয়ার। তবে হাতে নাতে যেদিন ধরবো সেদিন বাপু ছাড়বো না। ঝেঁটিই বিষ ছেড়ে দিব। বড় জা কমলী ঝাঁটা দিয়ে হয়ত পিটবে। কি লজ্জা! কি লজ্জা। সোয়ামী থাকলে যা কত আনন্দের হত তা আজ নিন্দের হয়ে উঠছে। মুখ দেখাতে পারবে না সে। কি করবে সে? মরবে? বংশী দাসের বাড়ীতে রাখা চাষের পোকা মারা বিষ নিয়ে এসে খাবে? বেজাকে বলবে ফলিডল যোগাড় করার কথা?

উঠে বসল রাঙা বৌ। না। মরতে পারবে না সে? মরবে কেন? শক্ত হবার জন্য নানান যুক্তি দিতে লাগলো নিজেকেই। অন্যায় সে কি করেছে? যৌবনের জ্বালা মিটিয়েছে। পাড়ায় যাদের স্বামী আছে তাদেরও তো কত নাগর। সে তো জানে। পারুলের কাছে কে আসে। ছবি কার কার কাছ থেকে কাপড় জামা পায়। তার বড় জা কমলী যৌবন কালে কামারিবাড়ীতে কেন পড়ে থাকতো ভর সন্ধ্যের পর। এই ন' বছরে বামুন দিঘীর পাড়ে পঞ্চাশ ঘর বাউরী বাড়ীর মেয়ে বৌ গুলোর অনেক কথাই তো সে শুনেছে। তার শুধু স্বামী নেই। স্বামীকে সে তো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ওরা যে ঘরে স্বামী থাকতেও বাইরে নাগর জুটিয়েছে। অনেক কানা ঘুষো তো সে শুনেছে। ওরা তো মরে নি। সে মরতে যাবে কোন দুঃখে।

কিন্তু একটা কাঠি তো চাই। লতানে লাউগাছ কাঠি বেয়ে বেয়ে মাচায় ওঠে। ওর সেই কাঠিটা নেই। বেজাকে বলবে? বলবে তুমি দায় নাও। এ দায় তোমার। ভুলোকে বলবে? কালোকে? গিরীনকে? দুর দুর! সব খারিজ হয়ে যায়। ওদের ঘরে একটা করে বৌ আছে। লাভ কি? না সে কাউকেই কিছু বলবে না?

সারারাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে ভোর রাতেই সে উঠে পড়লো। কাপড়টা গুছিয়ে পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। আগড়ের দরজাটা হা হা করে খোলা রইল। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে মাঠ দিয়ে সে হেঁটে চললো। ভোর হতে তখনও অনেক দেরী। রাঙা বৌ উঠলো বড় জা-এর ভাই কন্ন বাউরীর ছিটে-বেড়ার ঘরের দাওয়ায়। ঠুক ঠুক করে আগড়খানায় শব্দ করলে।

—: কে? কন্ন ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলে।

: উঠো না একবার। তুমার সাথে কথা আছে।

: অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে কন্ন আগড়ের বাঁধন খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সামনে দেখলে রাঙা বৌকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না কন্ন। রাঙা বৌ তার ঘরে?

রাঙা বৌ ওর হাতটা ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বললে তুমি আমায় সাঙা কর। আমি তুমার ঘরেই এলম। তুমি আমাকে ফেলবে না তো?

কন্ন অন্ধকারেই ওকে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল। বললে: সত্যি বলছিস?

: সত্যি, সত্যি, সত্যি! তুমার ঘর থেকে আর যাবনি কুথাও।

আবেগে থর থর করে কাঁপছিল রাঙা বৌ। অধীর হয়ে উঠলো কন্ন বাউরী। আমার ভাইকে অপমানের শোধ নিল সেদিন।

গত একটি বছর ধরে রাঙা বৌ ধরা পড়ে নি। কমলীরও গজ গজানি থামে নি। কিন্তু এবার। রাঙা বৌ-এর চোখের জল থামতেই চায় না। ন্যাকেড়ার গাঁট দেওয়া বালিশে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে থাকে। আর কোনও পথ নেই। বিকালে সে বামুন বউ দিদির কাছে গিয়েছিল। যে বামুন বউদিদি তাকে বলেছিল স্বামী স্ত্রী দুজনকেই পরীক্ষা করে ডাক্তার বলতে পারে কার দোষে ছেলে পুলে হয় না। বিকেলে গিয়ে বামুন বউদিদির দোতলায় উঠে গিয়েছিল সে। বামুন বউদিদিরা ভাল মানুষ। বাউরী ছুঁলে ওদের চান করতে হয় না। বামুন বউ দিদিকে বলেছিল: বউদিদি তুমার তো তিন ছেলো। তুমার তো জ্ঞান হইছে ছেলে পুলে পেটে এলে মেয়ে মানুষদের কি হয়।

বামুন বউদিদি অবাক হয়ে গিয়েছিল রাঙা বৌ-এর কথায়। কানা ঘুষোও জানতো রাঙা বৌকে নিয়ে। বললে: কি হয়েছে তোর। ওসব জানতে চাইছিস কেন? তুই তো একা থাকিস

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে রাঙা বৌ। বললে: বউদিদি! আমার বোধ হয় সব্বোনাশ হইছে। আমার গা বড় খারাপ হইছে। তুমাকে বড় বিশ্বাস করে কথাটা বলছি। তুমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি যেন কাউকে বলো নি।

বউদিদি দুটি তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করেই বললে—বুকটা/খোল।

লজ্জা হয়েছিল রাঙা বৌ-এর। কিন্তু বউদিদির কথা না মেনে উপায় রইলো না। কাপড়খানা সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলে উদ্যোম হয়ে দাঁড়ালো

রাঙা বৌ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল : তোর পেটে ছেলে পুলে এসেছে. রাঙা বৌ। বউদিদির মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—যা বাড়ী যা।

রাঙা বৌ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুকটা খুলেই। তারপর এক সময় আঁচল জড়িয়ে ওখান থেকে এসেই চাটাই পেতে শুয়েছে নিজের ঘরে। ওঠে নি। এক একবার মনে হয়েছে বামুন বউদিদি জানে না। বোধ হয় ঠিক বলে নি। কিন্তু, আর কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে? নিজের বড় জা ক্রমলীকে পায়ে ধরে বলবে? না না অসম্ভব।

কদিন লুকিয়ে রাখবে নিজেকে? আস্তে আস্তে পেট টা বাড়বে। লোকের নজরে আসবে। সবাই তাকে দেখে হাসবে। তার বিচার হবে পাড়ায়। অনেক পচাই মদ দিতে হবে। জাতে উঠতে হবে। শূয়ারের মাংসর টাকা দিতে হবে। তার উপর সবাই জানাতে চাইবে কে এর জন্য দায়ী? কার কথা বলবে সে। বেজা বামুন? ভুলো? কালো? গিরীন? নাম না বললে—ধরে পেটাবে।

অনেকদিন মেয়েছেলে গায়ের পা লাগেনি। কোল থেকে নামিয়ে রাঙা বৌকে মাটিয়ে চাটাই এ শুইয়ে দিল।

রাঙা বউ উঠে বসল দ্রুত। বলল—আগে একটা কথা চাই তুমার কাছে।

: কি কথা?

: আমি পুয়াতি। অন্য লোকের ছেলে আমার পেটে। বল তাকেও তুমি লিবে?

: লিব, লিব, লিব। তিন সত্যে করনু রাঙা বৌ। ওটা পেটে না এলে তো তুই আমার ঘরে আসতিস না। তাই ওটাকেও লিব।

: যদি বিচার হয় আমার ষোল আনার মাঝখানে তখন?

: ষোল আনার মাঝখানে চেঁচিয়ে বলবো—রাঙা বৌ আমার—ওর ছেলেও আমার। ইটা আবার কোনও কথা নাকি রাঙা বৌ।

রাঙা বৌ কল্পকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরলে যেমন করে লতানে লাউ গাছ কাঠিকে আষ্টে পিষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

ঘরের কোনে পোলো চাপা দিয়ে রাখা মোরগটা ভোরের আলো দেখে পোলোর মধ্য থেকেই ডেকে উঠলো : কোঁ কোঁকঁ কোঁ।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করুন

"ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও উৎকর্ষের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক জগতকেও তাঁরা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে চাইছেন। দেশের চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রই সচেতন আছেন যে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে—যেমন চলচ্চিত্র, নাটক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে—বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের নামে যে কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। খুন জখম, অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, বিকৃত মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের সুসংগঠিত প্রচার চলেছে। সমাজ জীবনে এই বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচারের ফলাফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী—বিশেষ করে যুব সমাজের নৈতিক জীবনের ওপর।

কোনো দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। আমরা পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই—আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন এবং সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হোন।"

—মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) : ১১২১৯/৭৭

সায়েন্স ফিকশান

তাপের পাহাড়ে রাতে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আঁৎকে উঠলাম। টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। সামনেকার পাহাড়গুলো দুলতে লাগল। যেন আমিই দুলছি। ঢেউ উঠছে আমার হৃদয়-সমুদ্রে। আশেপাশের গাছগুলো কাঁপতে লাগল, যেন আমিই কাঁপছি। বিস্ময় আর উত্তেজনায় আমার স্মৃতির অরণ্য দিশাহারা।

কী আশ্চর্য। এমন যে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। অতি সাধারণ কৌতূহল বশেই ডঃ হরিবিষ্ণু আয়েঙ্গার-এর কাছে যাই। নতুন কিছু জ্ঞান বা অদ্ভুত কিছু রহস্যের স্বাদ তাঁর কাছ থেকে পাবো, এ কিন্তু একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

অবশ্য লোকটি সম্বন্ধে বরাবরই আমার কৌতূহল। পাহাড়ী শহর নৈনীতালে পা দেবার পর থেকে তা আরও বেড়ে যায়। ওখানকার এক বন্ধু বললেন, যদি সম্ভব হয় তো ডঃ আয়েঙ্গার-এর সঙ্গে একবার দেখা করো। উনি এদিকেই থাকেন। মনোবিজ্ঞান নিয়ে নিত্য নতুন গবেষণায় নিমগ্ন।

ডঃ আয়েঙ্গার এর নাম আগেও শুনেছি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তিনি। দেশজোড়া তাঁর নামডাক। কিন্তু তিনি যে ঠিক নৈনীতালেই থাকেন, তা জানতাম না।

যাই হোক, বন্ধুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ডঃ আয়েঙ্গার-এর উদ্দেশে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। আমি নিজেও মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজ জীবন থেকে এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নাম শুনেছি। অতএব তাঁকে চাক্ষুষ দেখার লোভও ছিল।

এদিকে অনেক খুঁজেপেতে তাঁর বাড়ি পৌঁছে শুনি, দেখা হবে না। তিনি অসুস্থ।

খুবই দমে গেলাম। তখুনি ফিরবো কি না ভাবছি, এমন সময় তেরো চোদ্দ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ডাকল, কা'কে চান আপনি ? বাবাকে ?

বললাম,—হুঁ। দেখা হবে ?

মেয়েটি আমতা আমতা করে বললো,—হতে পারে। একটা সর্তে ; বেশিক্ষণ বসবেন না। দেখা করেই পালিয়ে আসবেন।

বললাম,—তা তো বটেই। বিশেষ করে তিনি যখন অসুস্থ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অসুস্থ। খুবই,—মেয়েটি বলতে লাগল,—কিছুদিন থেকে ভুল বকছেন। তবে সারাক্ষণ নয়, মাঝে মাঝে। দিব্যি ভালো থাকেন এক এক সময়। কিন্তু হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়। ভুল বকতে শুরু করেন। আবোল-তাবোল একেবারে। মাথামুণ্ডু কিছুই তার বুঝি না।

বললাম,—ডঃ আয়েঙ্গার ছাড়া এবাড়িতে বয়স্ক আর কেউ থাকে না ?

মেয়েটি দিব্যি সহজ ভাবে বললো,—বাঃ রে। কে আবার থাকবে। বয়স্ক বলুন আর ছেলেমানুষ বলুন, আমিই বাবার একমাত্র সাথী। চাকর রামভজন আর ঠাকুর সুরথ প্রসাদকে তো আর সাথী বলা যায় না। বলুন না, যায় কি না বলা ?

কী যেন বলেছিলাম একথার জবাবে, আজ আর সব মনে নেই। তবে হ্যাঁ, মেয়েটির কোনো কোনো কথা আজও দিব্যি মনে পড়ে। ওর বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে দেবার সময় ও বলেছিল,—সুরথপ্রসাদকে চিনলেন তো ? সেই যে, যে নাকি ফটক থেকেই আপনাকে বিদায় করছিল।

বললাম,—হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

বলতে বলতে ডঃ আয়েঙ্গার এর ঘরে ঢুকলাম।

অগোছাল ঘর। এখানে সেখানে বইপত্তর আর কাগজের স্তূপ। ঠিক মাঝখানে এক টেবিলের গা ঘেঁষে গৃহস্বামী বসে। একমনে কী যেন পড়ছেন।

আমরা ঘরে ঢুকেছি, টেরই পেলেন না। বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

মেয়েটি ডাকল এবার,—বাবা, ও বাবা, শুনছো ? এই যে, এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—দেখা। হঠাৎ দারুণভাবে চমকে ওঠেন ডঃ আয়েঙ্গার,—যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছেন ঠিক এমনি একটা আচ্ছন্ন অবস্থার ভেতর থেকে জবাব দেন,—কী দেখা ? কেন দেখা ? কাকে ? কোথায় ?

মেয়েটি বাবার এতগুলো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। শুধুমাত্র শেষের প্রশ্নটির রেশ টেনে বললো, কোথায় আবার। এইখানে। তোমার ঘরে।

—অ্যাঁ। যেন ঘুম থেকে জাগা মাত্রই ভূত দেখলেন ডঃ আয়েঙ্গার। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

আমি এতক্ষণে তাঁকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। স্পষ্ট চোখে পড়ল, লোকটির একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল। এছাড়া চাউনিতে যেন সন্ধানী আলোর তীব্রতা। এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে বললেন,—বসুন।

আমি নিঃশব্দে বসলাম। মেয়েটি ডঃ আয়েঙ্গার-এর খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো,—খুব ব্যস্ত ছিলে। ডিস্টার্ব করলাম। কেমন ? তাই না ?

ডঃ আয়েঙ্গার গম্ভীরভাবে বললেন,—হু, তা করেছ। কিন্তু, কী ব্যাপার, বলো তো ?

মেয়েটি অপরাধীর মতো বসে-থাকা আমাকে দেখিয়ে বললো,—এই যে, উনি ; তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

এইবার আমার পালা। তাড়াতাড়ি নমস্কার করে বললাম,—আমি মিঃ শত্রুঘ্ন ঘোষ। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। অনেকদিন থেকেই আপনার নাম শুনছি। দেখা করবো, ভাবছি। কিন্তু সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। শেষকালে নৈনীতাল এসে যখন শুনলাম, আপনি এখানেই থাকেন তখন না এসে আর থাকতে পারলাম না।

—তা বেশ তো। এসেছেন বেশ করেছেন—ডঃ আয়েঙ্গার এবার শিশুর মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

তখন আমিও মুগ্ধ। এবং সেই সঙ্গে আশ্বস্তও খানিকটা। কেননা মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনো চিহ্ন তখনও অবধি ডঃ আয়েঙ্গার এর মধ্যে খুঁজে পাই নি।

—মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন বুঝি ? আমার দিকে তাকিয়ে ডঃ আয়েঙ্গার বলতে লাগলেন, তা ভালো। সায়েন্স হিসেবে সাব্‌জেক্টটার তুলনা নেই। সৃষ্টি রহস্যের একেবারে গভীরে নিয়ে যায়।

বললাম,—এই একই দাবি অন্য অনেক সাব্‌জেক্টও তো করতে পারে ?

—না, পারে না ;—ডঃ আয়েঙ্গার একটু উত্তেজিত এবার,—স্মৃতি বা মেমারি নিয়ে আর কোন্ সার্বজেক্ট মাথা ঘামায় ? অথচ এই স্মৃতিই তো সব। এর রহস্য ভেদ করা মানে, জগৎ-রহস্যের একেবারে অতলে পাড়ি দেয়া।

বললাম,—আপনারা বড়ো মানুষ। যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মুখে এসব কথা হেঁয়ালির মতো শোনায়।

—হেঁয়ালি ?—ডঃ আয়েঙ্গার রীতিমত ক্রুদ্ধ এবার—কে বললো, হেঁয়ালি ? এর চেয়ে সত্যি কথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর ক'টি আছে ?

বুঝলাম, ভদ্রলোক আবোল-তাবোল বকছেন। ওর মেয়ের কথা মনে পড়ল, —দিব্যি ভালো থাকেন এক একসময়।

কিন্তু হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কী হয়ে যায়! ভুল বকতে শুরু করেন।

—কী? চুপ করে কেন? ডঃ আয়েঙ্গার একটার পর একটা প্রশ্ন ছুড়ে যেতে লাগলেন,—কী হল? জবাব দিন আমার কথার?

আমি, সত্যি বলতে কী, জবাব না দিয়ে পালাবার পথ খুঁজলাম। কিন্তু ডঃ আয়েঙ্গার তখন ছাড়তে নারাজ। আমাকে উঠবার কোনো সুযোগ না দিয়ে বলতে লাগলেন,—শুনবেন? আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা? শুনলে খানিকটা হয়তো বিশ্বাস হবে আপনার। বুঝবেন, স্মৃতি বা মেমারি সম্পর্কে যা নাকি আমি জেনেছি, তা'র বিন্দু বিসর্গও মিথ্যে নয়।

বলে কী লোকটা!—আমি রীতিমত সন্ত্রস্ত এবার। নিরুপায় হয়ে ঘরের এদিক ওদিক তাকাই। মেয়েটিকে খুঁজি। অসুস্থ বাপের কবল থেকে একমাত্র সে-ই আমায় রক্ষা করতে পারে।

কিন্তু কোথায় সে। আমাদের কথা বলার ফাঁকে কোন্ মুহূর্তে উধাও হয়েছে।

অগত্যা বসে থাকতে হল। চুপচাপ। স্ট্যাচুর মতো। সামনের জানালা বরাবর বাইরের দিকে তাকালাম। চোখে পড়ল কয়েকটি পর্বত-চূড়া। আকাশ উঁচু। ঘন সবুজ পাইন অরণ্যে আবৃত। যেন লোমশ ঋষি সব। ধ্যান-সমাহিত সামনেই হ্রদের তীরে স্তব্ধতা।

হ্রদটিও অপরূপ। বুকে যত্রতত্র মেঘখণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। উঠছে। নামছে। যেন রাশি রাশি পুষ্পার্ঘ্য। প্রতিবেশী ঋষিদের নিবেদিত।

এছাড়া আরও আছে। পাল-তোলা নৌকোর দল। রাজহংসের মতো চঞ্চল ও প্রাণময়।

ওদিকে সূর্য অস্তোন্মুখ। পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় রোদের শেষ আভাস। একমনে দেখছিলাম সব। হয়তো বা অন্যমনস্কও হয়েছিলাম। চমক ভাঙাল ডঃ আয়েঙ্গার এর কথায়—হ্যাঁ, যা বলছিলাম; আমার অভিজ্ঞতার কথা, স্মৃতির প্রসঙ্গ। কিন্তু স্মৃতি কী?

বললাম,—কেন, একটা মানসিক ক্রিয়া। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার খানিকটা প্রতিরূপ বা 'ইমেজ'-এর আকারে মনের অবচেতন স্তরে লুকিয়ে রাখি। সেই অভিজ্ঞতাগুলোই কখনও কখনও চেতন স্তরে এসে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং—

—ব্যস ব্যস! আর বলতে হবে না। বুঝে নিয়েছি—। আমাকে বাধা দিয়ে ডঃ আয়েঙ্গার বলতে লাগলেন—, স্মৃতির সঙ্গে মনকে বড় বেশি জড়িয়ে ফেলছেন আপনি। দেহযন্ত্রকেই উপেক্ষা করছেন।

বললাম—এছাড়া উপায় কী। স্মৃতিকে মানসিক ক্রিয়া হিসেবেই তো এ যুগের বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ডঃ আয়েঙ্গার বললেন—ভুল করেন ওরা। মারাত্মক ভুল। আসলে দেহ-যন্ত্রের মাধ্যমে স্মৃতিকে বুঝতে হবে। মিল, কারপেন্টার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা ঠিকই বলেছিলেন, আমরা যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহ উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনের ফলে কম্পন শুরু হয় মস্তিষ্কে। যতদিন যায়, সময় যায় এই কম্পনও তত ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কম্পন ক্ষীণ হয়ে আসে কিন্তু একেবারে থেমে যায় না। অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের দীর্ঘদিন পরেও মস্তিষ্কের স্নায়ুতে তার রেশ থেকে যায়। অতএব, যদি এই কম্পনের মাত্রা গোড়া থেকেই খুব জোরাল হয় তবে নিশ্চয় আবার পুরাতন স্মৃতিকে উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ কী করে তা করা যায়? ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক পরিকল্পনা মাথায় এলো—আচ্ছা, ঐ যে মস্তিষ্কের স্নায়ুর ক্ষীণ কম্পন, যা নাকি বহুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে, তাকে এখন আর-জোরালো করা যায় না? যদি কোনো উপায়ে তা করা যায় তবে নিশ্চয় বহুকাল আগেকার ঘটনাও আমার স্মরণে আসবে।

দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে উঠলাম। স্নায়ুর কম্পন নিয়ে ভাবনা আমার সমস্ত সত্তাকে উদ্বেল করে তুলল। নতুন উদ্যমে শুরু হল গবেষণা।

না না, শুরুতে এ নিয়ে কাউকেই কিছু বলি নি। নিজের দুর্ভাবনার বোঝা নিজেই বয়েছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর একা গবেষণা করেছি। কত আশা নিরাশার দোলা, জয়-পরাজয়ের ভ্রূকুটি, সাফল্য অসাফল্যের হাতছানি। শেষকালে হঠাৎ একদিন—মনে হলো, সাফল্যের একেবারে দোরগড়ায় পৌঁছে গেছি। আমার উদ্ভাবিত 'মেমোরিল' সত্যি যুগান্তকারী।

ঘটনাটা খুলেই বলি, 'মেমোরিল' আসলে কী, তা বলে নিয়ে। দেখুন, জিনিসটা আসলে এক ধরনের 'কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড'। মোট এগারো রকমের এলিমেণ্ট মিলিয়ে তৈরি। দেখতে বাদামী রঙের আর তরল প্রকৃতির। এমন ভাবে প্রস্তুত দেহের ভেতর সহজেই যা'তে ইন্‌জেক্ট করা যায়।

কিন্তু কা'কে ইন্‌জেক্ট করি? কোথায় করি?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার অ্যালসেসিয়ান কুকুরের উপর চোখ পড়ল।

এই দেখুন, বলতে ভুলে গেছি, আমার ভারী সুন্দর দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। একটা মা, আর একটা তার বাচ্চা মদ্দা কুকুর। বাচ্চাটা খানিক বড় হবার পর থেকেই মায়ে ব্যাটায় মিল নেই। বাচ্চা আর মা'কে এক সঙ্গে খেতে দিলে বিপদ। মা তেড়ে এসে সব খেয়ে নেয়; বাচ্চা খেতে পায় না। তাই দু'টোকে আলাদা খাওয়ান ছাড়া উপায় ছিল না। এমনকি বাচ্চাটা বেশ তাগড়াই হবার পরও আলাদাই খেত ওরা। কারণ, তখন বিপদ আবার অন্য রকম। দুটোকে এক সঙ্গে খেতে দিলে বাচ্চা গায়ের জোরে মায়ের খাবার ছিনিয়ে নিত।

ভাবলাম, বাচ্চাটার দেহেই 'মেমোরিয়াল' ইন্‌জেক্ট করা যাক। জিনিসটা কুকুরের স্মৃতিশক্তির উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, লক্ষ্য করবো।

একদিন। সন্ধ্যে নাগাদ। 'মেমোরিল' ইন্‌জেক্ট করার খানিক পরে দু'টো কুকুরকে এক সঙ্গে খেতে দিলাম। আশ্চর্য! সেদিন মাকে ব্যাটা আদৌ বাধা দিল না। এমনকি মায়ের জন্য খাবারের সবটুকু ছেড়ে দিয়ে ব্যাটা গেল মায়ের দুধ চুষতে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, পেয়েছি। বুঝতে আর বাকী রইল না, আমার গবেষণা সফল হয়েছে; এতদিন আলেয়ার পেছনে ছুটি নি। 'মেমোরিল'-এর দৌলতে অন্ততঃ কুকুর সে তার হারানো স্মৃতিকে ফিরে পায়, তা তো চোখের সামনেই দেখছি।

অবশ্য এই এক্সপিরিমেণ্ট বা পরীক্ষা থেকে এটাও বোঝা গেল, সময়ের হিসাবটা বোঝাবার মতো বুদ্ধি কুকুরের নেই। তাই শৈশবের স্মৃতি ফিরে পেয়ে সে শিশুর মতো আচরণ করেছে। স্থান-কালের মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখতে পারে নি।

মানুষের বেলায় এ জিনিস ঘটবার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, শৈশবের কথা মনে এলে কেউ শিশুর মতো আচরণ করেছে, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কখনও আমরা শুনি নি। তাই ভরসা হল, আমার আবিষ্কৃত 'মেমোরিল' সভ্য জগতে যুগান্তর আনবে। এর সাহায্যে মানুষ তার হারানো স্মৃতিকে ফিরে পাবে। এমন সব ঘটনা মনে আনতে পারবে, সাধারণ ভাবে সেগুলো মনে আসা কোনোদিনই সম্ভব নয়।

ব্যস। শুরু হল গবেষণা। নতুন উদ্যমে। 'কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড,' যার নাম দিয়েছি 'মেমোরিল,' বার বার তাকে শোধন করলাম। কেননা, এবারের পরীক্ষা মানুষের উপর। কোথাও এতটুকু ভুলত্রুটি থাকলে রক্ষে নেই।

আগের পরীক্ষায় ত্রুটি থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, কুকুটা অপ্রকৃতিস্থ। থেকে থেকে প্রায় উন্মাদের মতো আচরণ করছে।

একবার মনে হল, এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। কুকুরের পক্ষে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। বাড়তি স্মৃতি-শক্তির দৌলতে সে দিশাহারা; অতীত আর বর্তমানের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে।—পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, 'মেমোরিল' মস্তিষ্কের স্নায়ুর উপর অস্বাভাবিক কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি তো? এমন কোনো চাপ যার প্রভাবে বর্তমানের কোনো অভিজ্ঞতাই মস্তিষ্কে আর ছাপ ফেলতে পারছে না? সেখানকার স্নায়ুতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না?

সিদ্ধান্ত নিলাম, এই যদি হয় তো 'মেমোরিল'-এর শক্তি আরও একটু কমানো দরকার। পরীক্ষার সময় অবস্থা বুঝে তার 'ডোজ' বা পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিলেই চলবে।

এ দিকে কুকুরটার পাগলামো খুব বেড়ে গেছে। তাই ওকে মেরে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় রইল না।

'মেমোরিল' নিয়ে এবার দ্বিতীয় পরীক্ষা। ঐ কুকুরটার মা'র উপর। বলা বাহুল্য, কমজোরি 'মেমোরিল' ওর দেহে 'ইনজেক্ট' করলাম। এবং ফলও বেশ ভালোই হল। ধীরে ধীরে হারানো স্মৃতিকে ফিরে পেল ও। পাঁচ সাত দিন বাদে ওর আদব কায়দা দাঁড়াল বাচ্চা কুকুরের মতো।

না, উন্মাদ ও হয়নি। বরং দিন সাতেকের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল।

আমার এই দ্বিতীয় পরীক্ষার সাফল্য আমাকে নতুন শক্তি ও উদ্যম যোগাল। ঠিক করলাম, আর দেরী নয়; এবার আসল পরীক্ষা; খোদ মানুষের উপর।

কিন্তু পরীক্ষা কীভাবে হবে? কা'কে নিয়ে? —আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রদের কথা একে একে মনে এলো। অসংখ্য মানুষ একের পর এক এসে আমার কল্পনায় মিছিল করে দাঁড়াল। কিন্তু না, কাউকেই মনে ধরল না আমার। মন যেন ভেতর থেকে নির্দেশ দিল, ভয় কী। এগিয়ে চলো। নিজের উপরেই পরীক্ষা হোক না কেন। হারানো স্মৃতি ফিরে পেলে সুবিধেও যে অনেক।

কিন্তু সত্যি কি তা ফিরে পাওয়া যাবে? ফিরে পেয়ে সুবিধে হবে কিছু? —আকাশ পাতাল ভাবি। কত সন্ধে সকাল একা বসে বসে আশা-নিরাশার জাল বুনি।

শেষকালে একদিন। নিজের উপরেই করলাম পরীক্ষা। একটা সিরিঞ্জের সাহায্যে নিজের দেহে 'মেমোরিল' ইনজেক্ট করলাম।

না না, বেশি করিনি। 'মেমোরিল'-এর পরিমাণ ছিল অল্প। কেননা, আশঙ্কা ছিল, মাত্রা বেশি হলে ফল ভয়ানক হতে পারে। স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এদিকে প্রতিক্রিয়া শুরু হল খুব ধীরে ধীরে। প্রথমটায় স্মৃতির উজ্জীবন ঘটলো না কিছু। সমস্ত সত্তা যেন অসাড় হয়ে এল। যেন ঘুমিয়ে পড়ছি। গভীর ঘুমে অচেতন হচ্ছি ক্রমে ক্রমে।

প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজেকে সজাগ রাখলাম। চিমটি কেটে বারবার দেখলাম, দেহে সাড় আছে কি না।

তারপর, ধীরে ধীরে এই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল। যেন ক্লান্তিহরা গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছি, মনে হল।

হ্যাঁ, ভালো কথা; শুরুতে এই ক্ষণিক বিপর্যয়ের কারণ কিছু বুঝলেন? এ হল চাবুক খাওয়া ঘোড়ার থমকে দাঁড়ানোর মতো ব্যাপার। আঘাতের দাপট মুহূর্তের জন্যে তাকে যেন দিশেহারা করেছিল। তাই হঠাৎ চলতে ভুলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। এমনকি তার স্বাভাবিক চলা পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়েছিল।

মনে হয়, আমার স্নায়ুতন্ত্রের আচ্ছন্ন ভাবটার সঙ্গে এই চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মিল। শুরুতে মিল; শেষেও মিল। বলতে কী, শেষের মিলটাই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ কিনা, চাবুকের দাওয়াই ঘোড়াকে যেমন আগের তুলনায় আরও দ্রুত ছুটতে বাধ্য করে, 'মেমোরিল' এর প্রভাবও আমার স্মৃতি শক্তিকে তেমনি ক্ষিপ্র ও তেজী করে তুলল।

প্রথমটায় খানিক আগেকার কিছু ঘটনা স্পষ্ট মনে এলো। এমনকি 'মেমোরিল'-এর সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে কী ভেবেছি, কী করেছি তা পর্যন্ত।

আশ্চর্য। স্মৃতির এই বৈচিত্র্য আগে তো কখনও লক্ষ্য করিনি। এত খুঁটিনাটিও মানুষের মনে থাকে!

সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে আমি যে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, দূরের এক ঝাঁক বলাকাকে দেখেছিলাম, তা পর্যন্ত মনে পড়ছে।

বলাকাগুলো বিরাট এক 'দ' রচনা করেছিল। সেই 'দ' দেখে মনে পড়ে গেল দাদোর কথা। দাদো মানে আমার

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার শহীদ ঐ কুকুরটা।

কী করে আবার আমি পুরনো ভাবনায় ফিরে এসেছিলাম? —হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

দানো থেকে দানোর মা মেমু। মেম থেকে মেমোরিল।

দেখতে দেখতে হারানো বহু ঘটনা অস্পষ্টভাবে মনে এলো। যেন ঢেউ, অগুনতি অজস্র। আর, আমি যেন ভেলায় চেপে। চলেছি তো চলেইছি। স্মৃতির সাগর পাড়ি দিচ্ছি। দেখছি কত কী! ঢেউগুলো স্মৃতির এক একটা টুকরো যেন। ভাসছে, কাছে আসছে, চিকচিক করছে।

না, এমন করে চলে না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এক সঙ্গে অনেক স্মৃতি চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে। না না, এতে আনন্দ নেই; তৃপ্তিও নেই; এর চেয়ে আলাদা আলাদাভাবে দু'একটি ঘটনা মনে আনার চেষ্টা করি; মেমোরিল-এর শক্তি যাচাই হবে, আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্যও নির্ণয় হবে।

কিন্তু কোন্ ঘটনা আগে মনে আনি? কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা? প্রথমটায় আমার অবস্থা বাঁশ বনে ডোম কানার মতো, 'সাত রাজার ধন মানিক' গাদা গাদা মোহরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আলিবাবার মতো।

ঘামতে লাগলাম। চাঞ্চল্যে উত্তেজনায় বার বার শিউরে উঠলাম। শেষকালে, নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার পর বিশেষ দু'একটি ঘটনা মনে আনবার চেষ্টা করলাম। এমন জাতের ঘটনা, যা নাকি আমার কাছে একেবারেই অস্পষ্ট অথচ যার প্রভাব আমার জীবন থেকে আদৌ মুছে যায় নি।

উদাহরণ হিসেবে বছর কয়েক আগেকার এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বলি। ট্রেনে যাচ্ছিলাম। বোম্বাই থেকে কলকাতা। এক বিজ্ঞান-সম্মিলনে ভাষণ দেবার ব্যাপারে। ট্রেন খড়্গপুরের কাছাকাছি হতেই বিপদ। হঠাৎ দেখি, চার পাঁচ জন ষণ্ডামার্কা লোক আমার সামনে। ওদের একমনের হাতে ছোরা, অন্য একজনের সঙ্গে রিভলবার। বাকীরাও নিরস্ত্র নয়। লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে সুসজ্জিত।

আমার ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় আরও তিনজন যাত্রী ছিল। সকলেই ওদের হঠাৎ আবির্ভাবে ভীত, সন্ত্রস্ত। ওরা কিন্তু বেশি কথা কইল না। আমাদের কাছে মূল্যবান যা কিছু আছে, সব যেন ভালোয় ভালোয় দিয়ে দি, এই ছিল ওদের একমাত্র দাবি। ...তা দাবি পূরণ হল। সবাই নেহাৎ গোবেচারীর মতো ঘড়ি আংটি পেন বোতাম টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে দিলাম।

ওরা সযত্নে সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করল; এবং তারপর নিমেষের মধ্যে চেন টেনে, গাড়ি দাঁড় করিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু কে ওরা? ওদের দু'তিন জনকে যেন চিনি, আগে কোথায় দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারছি না।

এইবার, মেমোরিল এর দৌলতে সব যেন স্পষ্ট মনে পড়ল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ষণ্ডামার্কা লোকটা আগের দিন নাগপুর স্টেশনে আমার কাছে কমলালেবু বিক্রি করেছে। এছাড়া, ওদের দলের বেঁটে মতো লোকটাকেও চিনি। বিলাসপুর স্টেশনে সে আমার জুতো পালিশ করেছে। আর, রিভলবার হাতে যমদূতটাকে তো খানিক আগেও দেখলাম; খড়্গপুর স্টেশনের পাণি-পাঁড়ে। দিব্যি ভালো মানুষটি সেজে পিপাসার্ত যাত্রীদের জল দান করছিল।

কী আশ্চর্য! এই লোকগুলোই এমন সমাজবিরোধী! মাত্র কয়েক ঘণ্টার ফারাকে এভাবে ভোল-বদল করে! হায়! ওদের এ পরিচয়গুলো সেদিন যদি মনে আসতো! আর কাউকে না পারি, অন্ততঃ পাণি পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করা যেত নিশ্চয়। এবং সে গ্রেপ্তার হলেই গোটা দলটা ধরা পড়ত।

এছাড়া আরও একটা ঘটনা মনে আনতে চাইলাম। এই শেষের ঘটনাটা আমার ছেলেবেলার।

আসলে হয়েছিল কী, একবার জলে ডুবি, আমাদের গাঁয়ের পাশে নদীতে। ছেলেদের মধ্যে কে যেন ধাক্কা দিয়ে আমায় ফেলে দেয়। ছেলেটাকে চকিতে একবার দেখেও ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই আর মনে আনতে পারি নি।

এইবার স্পষ্ট মনে পড়ল ওর কথা। কী আশ্চর্য! ও যে আমারই দূর-সম্পর্কের ভাই রামুর কাণ্ড! আমাকে জলে ফেলে দিয়ে ও চেয়েছিল মজা দেখতে।

আমি যে রামুর হাতের স্পর্শ অনুভব করছি এখনও! ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ভেতরের দিকে একটা কাটা দাগ ছিল। আমাকে ও যখন ঠেলল, তখন সেই দাগটার ছোঁয়া লাগল আমার ঘাড়ে। এছাড়া, ওর মুখে কী বিদঘুটে গন্ধ! এই গন্ধের ভয়ে রামুর মুখের ধারে কাছে ঘেঁষতাম না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল; এ কীর্তি রামুরই। অথচ কী আশ্চর্য! ছেলে-বেলায় এ নিয়ে কত জেরা, কত সলা-পরামর্শ, কত খোঁজাখুঁজি। কিন্তু প্রকৃত আসামী আগাগোড়া বেপাত্তায় থেকে গেল। দোষীর নাম বা চেহারা কিছুতেই মনে আনা সম্ভব হল না আমার।

এই গেল 'টেস্ট কেইস্'—দু'টি মাত্র ঘটনা। এরপর যা ঘটল তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর। এতক্ষণ স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করছিলাম আমি। খুশিমতো বিভিন্ন ঘটনা মনে আন ছিলাম। এইবার স্মৃতি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করল। যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে একের পর এক ঘটনা মনে এলো আমার। আমি অস্বস্তি বোধ করছি, সব ঘটনা মনে আনতে চাইছি না; তবুও ওরা যেন আমার উপর চেপে বসছে। এ এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না। আবার না বলে থাকাও যায় না।

পরিবর্তন অর্থাৎ স্মৃতির কর্তৃত্বের ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। রামুর কথা মনে আসার পর থেকেই হঠাৎ অনুভব করলাম, যেন ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে, ভুলে যাওয়া ছেলেবেলাকার সব ঘটনা মনে পড়ছে; হাজার চেষ্টাতেও পরবর্তী সময়ের কোনো ঘটনা মনে আনতে পারছি না।

দেখতে দেখতে একেবারে শৈশবে পৌঁছে গেলাম। মনে হল, আমি যেন আমাকেই দেখছি—তিন বছরের শিশুটিকে।

ওফ্! ঐ বয়সে কী দুরন্ত ছিলাম

The choice is easy... only KALINGA TUBES bear ISI quality mark

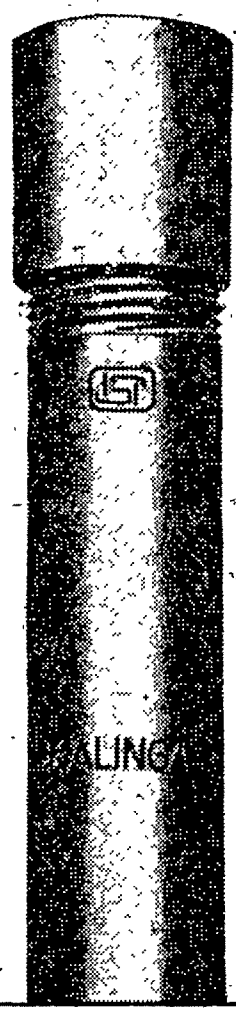

FOR QUALITY, INSIST ON KALINGA TUBES WITH ISI/ KALINGA MARK

The need for quality steel tubes in today's hydraulic, steam and gas distribution systems is ever on the increase Right from raw materials to the finished product, strict quality control at every stage of production has given KALINGA TUBES the absolute and foolproof dependability that is the primary look out for its sophisticated users. The most perfect balance between strength and weight gives you, in the long run, a lot more than what you pay for.

KALINGA TUBES LIMITED
44, Jawaharlal Nehru Road,
Calcutta-700071

ipb/kt/1/77

আমি। জ্ঞান-বুদ্ধি একবিন্দুও হয়নি। অকারণে ছুটছি, অযথা ভাঙচুর করছি।

এই সেদিন,—মনে হচ্ছে, মাত্র সেদিন যেন, মামার বাড়িতে গেছি। সকলের নজর এড়িয়ে দোতলার ন্যাড়া ছাদে উঠেছি। ব্যস। আর পায় কে। যেন আমি সম্রাট। যা খুশি করতে পারি, যেখানে খুশি যেতে পারি।

প্রথমে মনের আনন্দে ধেই ধেই করে খানিকক্ষণ নাচলাম। তারপর ছাদ থেকে একখণ্ড ঢিল উঠিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম।

আমার লক্ষ্য ছিল আকাশের গায়ে ঝলমলে একটা বস্তু, বড় হয়ে যা'কে সূর্য বলে জেনেছি।

বিশেষ ঐ বস্তুটার দিকে আমার ঝোঁক পড়ার কারণ, ভর-দুপুর তখন। ছাদে উঠেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার চোখ ঝলসে গিয়েছিল।

কিন্তু না, ঢিল ছুঁড়ে বিশেষ সুবিধে হল না। ওটা ফিরে এসে আবার ছাদের উপরেই পড়ল।

এদিকে আমিও ছাড়বার পাত্র নই। ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুঁড়লাম। এদিকে মেজমামা এসে গেছেন। আমার তল্লাসে ছাদের উপর একেবারে।

কিন্তু আমি কি ধরা দি। ঊর্ধ্বশ্বাসে দিলাম ছুট। দিগ্‌-বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য। ছাদ যে ন্যাড়া, পড়ে গিয়ে হাড়গোড় যে চুর্ণ হবে, সেদিকে হুঁশ নেই।

কী বিপদ। এ আমি কী করছি? মেজমামা আমাকে ধরছেন না কেন? এখনই যে পড়ব আমি। পড়ে গিয়ে থেঁতলে যাবো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, স্মৃতির পুনরুজ্জীবনের সময় ঠিক এই রকমই মনে হয়েছিল আমার। সময়ের নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি যেন শৈশবের ঐ আমিটির কথা ভেবে দারুণ আতঙ্কিত হয়েছিলাম।

শেষ অবধি আতঙ্কের ঘোর কাটল। মেজমামা আমাকে ধরে ফেললেন। অল্পের জন্যে সে যাত্রা রক্ষে পেলাম।

এই ঘটনার দিন কয়েক আগে, এর চেয়েও ভয়ঙ্কর এক কীর্তি আমি করেছিলাম। আমাদেরই বাড়ির পিছনে বটগাছ ছিল একটি। গাছটির চারপাশে ছিল ঘন জঙ্গল। সবাই আমাকে সেখানে যেতে বারণ করত। আর তাইতেই আমার রোখ চেপেছিল, যেমন করে হোক ওখানে যেতে হবে।

একদিন গেলামও। বড়দের ফাঁকি দিয়ে নিষিদ্ধ জায়গাটির দিকে এগোলাম। খানিক দূর এগুতেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। যেন কেউ আমাকে শাসাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক ঐরকম শব্দ করে অদৃশ্যকে শাসিয়েও দিলাম একবার। কিন্তু কে ও? দু' এক পা এগোতেই দেখি, বটগাছের ঠিক নীচে কালো কুচকুচে কী যেন একটা থেকে থেকে নড়ছে।

শৈশবের এই স্মৃতি মনে আসতেই আমি ভীষণভাবে আঁৎকে উঠলাম। কী সর্বনাশ। আমি কি ঐ কাল কেউটের দিকে এগিয়েছিলাম?

হ্যাঁ, তাই তো। আমি যে এগোচ্ছি। ঐ কালো কুচকুচে জিনিসটাকে না ধরলেই যেন নয়।

না না, ধরবো না, কোনোমতেই না। ওকে ধরা মানে যে সাক্ষাৎ মৃত্যু।—স্মৃতির উজ্জীবনের ফলে ভয়ে আতঙ্কে এবার আমি কাঁপতে লাগলাম। সেদিনের ঐ তিন বছরের আমিটিকে কী আকুলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শৈশবের আমি কোনো বাধাই মানল না। লক্ষ্যের দিকে পা টিপে টিপে এগোল

আর কয়েক হাত মাত্র। তারপরই দু'জনে মোকাবিলা হবার কথা। হয়তো বা তা হতও, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের বাড়ির কুকুর বাঘা ওখানে হাজির হ'ত। আসলে কী, আমারই খোঁজে শ্রীমান ওখানে হাজির, ঘেউ ঘেউ করতে করতে। আর সে কী চেঁচানী। যেন আমাকে ছাড়া ঐ জঙ্গলের সব কিছুকে সে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

বলতে কী, সে আসাতেই কাজ হল। কালো কুচকুচে বস্তুটা সুড় সুড় করে পালাল। আর আমি? হাততালি দিয়ে নেচেকুঁদে অস্থির। যেন বিরাট একটা যুদ্ধ, এইমাত্র জয় করলাম।

এরপর দিগ্বিজয়ীর মতো ঘরে ফেরার পালা; এবং ফিরেই সে কী হৈ-চৈ আমার। ফোঁস ফোঁস শব্দ করে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছি।

বাবা অবিশ্যি ধরে ফেলেছিলেন। আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আসল জায়গাটার কাছে নিয়ে গিয়ে সব কিছু আঁচও করেছিলেন। কিন্তু আমি কি বাগ মানি। উল্‌টে বাবাকেই ফোঁস ফোঁস করে বেশ কয়েকবার ভয় দেখিয়ে দিলাম।

হাসি পেল; এবং সেই সঙ্গে মজাও লাগল. শৈশবের কাণ্ডকীর্তিগুলোকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু হায়! তখনও কি ছাই জানতাম যে এর চেয়েও বড় কীর্তির আমি অধীশ্বর।

তখন বছর দেড়েক আমার বয়স। সবে হাঁটতে শিখেছি। কী যে মজা লাগত। হাঁটতে আর ছুটতে। ইচ্ছে হ'ত, সামনে যা কিছু দেখছি তাদের সবাইকে ডিঙিয়ে হৈ হৈ করে এগোই। কেউ আমাকে ডাকবে না, ধরবে না, নিষেধ করবে না।

একদিন। বিকেলের দিকে। আমাদের বাড়ির সামনেকার উঠোনটাকে ডিঙিয়ে সোজা এগোলাম। খানিকটা দূরে এক রাস্তা, সেটাও পেরোলাম। রাস্তা পেরিয়ে দেখি, সামনে জল; অনেক জল। বড় মজা লাগল। ইচ্ছে হল, ঐ জল নিয়ে খানিক খেলা করি। খেলতে খেলতে ছুটে যাই।

কিন্তু এ কী! সত্যি কি ঐ জলে নামবো নাকি? ঐ পুকুরের জলে?—পুরনো স্মৃতি জাগ্রত হবার মুহূর্তে এবার আমি দারুণ ভয় পেলাম। কত বার যে মনে হল, কী অন্যায়! বড়রা এখনও কেউ দেখছে না কেন? কেন কেউ ছুটে আসছে না? দেড় বছরের ঐ শিশুটিকে ধরছে না?

পুকুরের এক প্রান্তে এক ধোবা কাঁপড় কাচছিল। কী ভেবে হঠাৎ ও আমার দিকে এগোল। কিন্তু আমি ততক্ষণে তরতর করে জলের দিকে নেমে আসছি। হ্যাঁ, নামলাম, জলে পা দিলাম, হন্তদন্ত হয়ে জলের ভেতর দিয়েই এগোলাম আর একটু। কিন্তু এগোতে কি পারি! কী কষ্ট। কী কষ্ট। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে থেকে থেকে

জল খাচ্ছি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাতি ফেটে যাচ্ছে। চারিদিকে অন্ধকার।

খানিক বাদে। হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কী হল! কে যেন আমার হাত হঠাৎ চেপে ধরল। টানল আমাকে। টেনে টেনে জলের উপর তুলল।

না, সেদিন ঐ লোকটিকে চিনতে পারি নি। কিন্তু আজ চিনলাম। ও সেই বোবা, যে নাকি আমাকে জলে নামতে দেখে কাজ ফেলে রেখে এগিয়ে ছিল।

কী জানেন, মন গড়া কাহিনী নয় এগুলো। এদের প্রত্যেকটাই সত্যি। বিশেষ করে জলে ডোবার ঘটনা তো বড় হয়ে অবধি অজস্রবার শুনেছি। এছাড়া, সেদিন আরও মনে পড়ল, আরও অনেক আগেকার ঘটনা।—

তখন মাত্র সাত মাস আমার বয়স। সবে হামাগুড়ি শিখেছি। থপ থপ করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই। হাতের সামনে যা পাই, তাই মুখে পুরি। যেন তামাম দুনিয়াটা গিলে খেয়ে আমার আনন্দ।

একদিন—ওফ্! ভাবতেও ভয় হয়, এরপর বেঁচে আছি কী করে!—

হ্যাঁ, একদিন চুপি চুপি এক স্পিরিট এর বোতলের দিকে এগোলাম। তার পর বোতল ভেঙে, স্পিরিট ঢেলে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। উবুড় হয়ে শুয়ে, চেটে চেটে বেশ খানিকটা খেলাম। কাচের টুকরোও মুখে পুরলাম। নেহাৎ দাঁত ছিল না, তাই চিবোতে পারি নি। তবে বেশ কয়েকটা কাচের টুকরো মাড়িতে আটকে যায়।

যন্ত্রণা—প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করি এবার। চীৎকার করে উঠি। এরপর, সে কী কাণ্ড! বাড়িসুদ্ধ লোকের কী হৈ চৈ।

সেদিন অনেক কষ্টে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু না, সেগুলো বলে বর্ণনাকে অযথা দীর্ঘ করবো না। তার চেয়ে ছোটবেলার আর একটি অদ্ভুত কাহিনী বলি, যা ভাবলে আজও আমি বিস্ময়ে আতঙ্কে দিশাহারা হই।

তখন আমার বয়স মাত্র এক মাস। সারাদিন চিৎপাত হয়ে থাকি। কদাচিৎ সামান্য হাত পা নাড়াই। বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটে। যখনই জাগি, অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীকে দেখি। লক্ষ্য করি, পৃথিবীর ওরাও আমাকে দেখছে। কিন্তু হায়! সে দেখার মধ্যে যে খুশীর হিংস্রতা থাকতে পারে তা কি ছাই আগে জানতাম!

সেদিন,—মনে হল, এই সেদিন যেন—আমাকে ঘরের দাওয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। শীতের বিকেল, রোদ এসে লাগছে আমার গায়ে। সামনেই জঙ্গল, সেখানে ঝিঁঝি ডাকছে। আমার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। মা ঘরের ভেতর, কী একটা কাজে ব্যস্ত। বাড়ির ঝি বাসমতীয়া এতক্ষণ আমাকে দেখছিল। হঠাৎ সে-ও কোথায় গেল। আমি একা, দাওয়ায় চুপচাপ শুয়ে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, দাওয়ার এক কোণে উঠোনের ঠিক গা-ঘেঁষে জঙ্গলটা নড়ছে। যেন বুনো ঝোঁপঝাড়গুলোকে নাড়ছে কেউ।

দেখতে দেখতে ঝোপের মধ্য থেকে অদ্ভুত এক জানোয়ার বেরিয়ে এল। খেঁকশেয়াল একটা। ধীরে ধীরে দাওয়ায় উঠে আমার দিকে কেমন জ্বল-জ্বল করে তাকাল। আমি কিন্তু ভয় পেলাম না; জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে মজা পেলাম বরং। এদিকে জানোয়ারটা করল কী, নিঃশব্দে আরও একটু এগোল। ঘন ঘন জিভ বের করল কেমন বিশ্রীভাবে।

কী সর্বনাশ! স্মৃতি জাগ্রত হবার মুহূর্তে সেদিন ভীষণভাবে আঁৎকে উঠলাম আমি। বারবার আমার মনে হতে লাগল, ওটা শিকারের মতলবে এসেছে। আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সান্ধ্য আহার সারবে।

কিন্তু আমি বা অত অসহায় কেন? মা কেন আমাকে দেখছে না? বাসমতীয়ার মতো একটা অপদার্থের হাতে সব দায় সঁপে দিয়ে কে তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে বললো?

ভয়ে আতঙ্কে এবার আমি কাঁদতে লাগলাম। না না, আমি বলতে সেদিনের সেই শিশু আমি নই। আজকের এই পরিণত আমি। সেদিনের শিশু আমি কী করে বুঝবে খেঁকশিয়াল আর ঝিঁঝির হেরফের? খুবই রাগ হল। মায়ের উপর, বাসমতীয়ার উপর, বাড়ির সকলের উপর বারবার মনে হল, এই যে শিশুরা ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠে, এ নেহাৎই অ্যাক্সিডেন্ট। বড়দের এত শত অসতর্কতা ও অবহেলার মধ্যে ওদের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য।

এদিকে ঐ রাক্ষসটা ততক্ষণে আরও একটু এগিয়েছে। আমার শিয়রের একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে।

না, এবার আর রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ ওর পেটে যেতে হবে। দাঁত বের করে যমদূতের মতো ও আমাকে দেখছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখছে ও; এগোচ্ছে, খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে। হঠাৎ এক মুহূর্তের একটু ভুল। ওর পা লেগে আমার একটা ঝুমঝুমি উঠনে পড়ে গেল। আর তাইতেই মা'রও টনক নড়ল। হঠাৎ দাওয়ায় ছুটে এলেন তিনি। দেখলেন শেয়াল মহারাজ লেজ গুটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

এরপর—। কিছুক্ষণ চুপচাপ। সব কিছু ধূসর অস্পষ্ট। যেন তর তর করে খানিকটা সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে গেলাম।

অবশেষে ধূসর ভাবটা কাটল। নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেলাম আবার। এবার ভিন্ন একরূপে, এক বৃদ্ধের ভূমিকায়।—

হঠাৎ দেখি, আমি যেন এক বৃদ্ধ, পাহাড়ী পথ ধরে এগোচ্ছি। এই পাহাড় এলাকা আমার কতকালের চেনা! কতবার এ পথ ধরে এসেছি।

এই তো সেই যোশীমঠ। বদ্রীনারায়ণ এখানে থেকে কুড়ি বাইশ মাইল মাত্র।—

কিন্তু আমার পিঠের বোঝাটা অমন গুরুভার কেন? কে ওটা নিঃশব্দে চাপিয়ে দিল?

ও! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমি যে কুলি। যাত্রীদের মোট বই। হৃষীকেশ থেকে হাঁটা পথে কেদার বদ্রী যাই। ভিন্ন পথও ধরি এক একসময়, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথ।

মনে রাখবেন, বাস হয়নি সে সময়। খাদ্য দ্রব্য জিনিস-পত্তর সবই থাকতো

কুলির জিম্মায়। হৃষীকেশ থেকে প্রায় দুশো মাইল পথ হেঁটে যাত্রীকে বদ্রীনারায়ণ যেতে হত। সে যুগে এই সব পথে এমন কি ঘোড়া বা খচ্চরও ছিল দুষ্প্রাপ্য।

কিন্তু তা না হয় হল। তাই বলে মানুষের উপর এইরকম জবরদস্তি? তার পিঠকে ধনুক বানিয়ে ছাড়া।

ছিঃ ছিঃ। এদের কি মায়া দয়া নেই? আমি বুড়ো মানুষটা হাঁপাচ্ছি; যোশীমঠের এই কনকনে শীতেও গল গল করে ঘামছি। অথচ কেউ যেন দেখেও দেখছে না।

কে-ই বা দেখবে? কখন দেখবে? সবাই তো হুল্লোড় আর চেঁচামেচিতে ব্যস্ত। সকলের মুখেই এক কথা, জয় বদ্রীবিশাল কি জয়।

সামনেই চোখে পড়ছে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। তুষারাচ্ছন্ন, অপরূপ। ওরই আড়ালে বদ্রীনাথ মন্দির।

জয় বদ্রীবিশাল কি জয়।—আবার চীৎকার, যাত্রীদের কল-কোলাহল। বদ্রীনাথ সন্দর্শনের মোহে সবাই যেন অস্থির উন্মাদ।

এক একবার ইচ্ছে হয়, চেঁচিয়ে বলি, ওরে মূর্খের দল। পাগল বদ্রীনাথ তোদের এই বুড়ো কুলিটার বুকে মধ্যে। কান পাত এখানে। তাঁকে পাবি। আর নয়ত নিজেদের বুকেই হাত দে না একটু। দ্যাখ্ না খুঁজে, তিনি আছেন কি না।

ভাবছি কত কী, বোঝার ভারে থেকে থেকে নুয়ে পড়েছি, এমন সময় এক যাত্রী এগিয়ে এসে আমায় রদ্দা মারল।

মেমোরিল এর দাক্ষিণ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি, সে বলছে, জানোয়ার কাহেকা? চলনে নেই সেকতা?

বুঝুন ঠ্যালা। নিজেরা খালি হাতে চলেও আমার পিছুতে। আবার আমাকেই কিনা তড়পানো?

ভাবলাম, রুখে দাঁড়াই। প্রতিবাদ করি। কিন্তু তা'রই বা ফুরসৎ কই। কিছু বলতে যাচ্ছি অনুমান করে আর একজন যাত্রী হঠাৎ ঠেলে দিল আমায়।

আমি পড়ে গেলাম।

ওফ্। সেদিন কী কষ্ট, কী কষ্ট

ওরে মূর্খের দল! আসল বদ্রীনাথ তোদের এই বুড়ো কুলিটার বুকের মধ্যে।...

উঠতে। কিন্তু না, তবু উঠেছিলাম। সাধ্যমত প্রতিবাদও করেছিলাম। কিন্তু তখন কে আমার কথা শুনবে? সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, জয়, বদ্রীবিশালি কি জয়।

কী?. বুঝছেন কিছু?—এই অবধি বলে ডঃ হরিবিষ্ণু আয়েঙ্গার থামলেন একটু। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে বললেন,—এ হল আমার পূর্ব জন্মের কথা। 'মেমোরিল'-এর ক্রিয়ায় একদিনের জন্যে হলেও আমি যে জাতিস্মর।

কিন্তু না, এ না হলেই বুঝি ভালো ছিল। স্মৃতির শতকরা নিরানব্বুই ভাগই যে বেদনা, তা কি ছাই আগে জানতাম। কী মর্মান্তিক দুঃখ-কষ্ট আগের জন্মে ভোগ করেছি।

একমাস, দু'মাস, এমনকি তিন মাসের জন্যে এক একবার বেরোতাম। কুলি—আগা-গোড়াই কুলির কাজে।

এক একদিন দারুণ ক্লান্তি ঘিরে ধরত। সারা দেহ যেন অবশ হয়ে আসতো। সবচেয়ে প্রাণান্তকর ছিল রাক্ষুসে চড়াইগুলো। ওফ্, কী ভীষণ। বদ্রীর পথে হনুমান চটির চড়াই, কেদারের গৌরীকুণ্ড আর গঙ্গোত্রীর ভৈরব ঘাঁটির চড়াই।

কত সময় টলতে টলতে এগিয়েছি। দারুণ ঠাণ্ডায়ও গা দিয়ে গল-গল করে ঘাম ঝরেছে।

জিরোবার ফুরসৎ নেই। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই যাত্রীদের তাড়া।

অন্যমনস্ক হয়েছি এক একবার। ঘরের কথা মনে পড়েছে।—

ঘর মানে, ছোট্ট এক ডেরা; হৃষীকেশের একপ্রান্তে। একমাত্র মেয়ে লছমী, আর ওর মা দুর্গাবাঈ—এই নিয়ে সংসার। খুবই কষ্টে দিন কাটে। একদিকে অভাব অভিযোগ; অন্যদিকে জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব।

হ্যাঁ, যে সময়ের কথা বলছি, তখন হৃষীকেশ লছমনঝোলা অঞ্চলে গভীর অরণ্য। বাঘ ভাল্লুক আর হনুমান—এই তিনে মিলে সে তল্লাট জম জমাট কিন্তু তবু, উপায় নেই। হরিদ্বার-হৃষীকেশ অঞ্চলেই থাকতে হবে। কেদার-বদ্রীর যাত্রীরা এ পথ ধরেই বেশি আসে। গ্রীষ্ম বর্ষা আর শরৎ মিলিয়ে অন্তত দু'দল যাত্রীর নাগাল পাওয়া চাই। নইলে সারা বছর ভুখা।

কিন্তু হায়। এত যাত্রীর এত সেবা করেও কী দাঁড়াল? লছমী খেতে পেল? না কি ওর মা দুর্গাবাঈ পেল পরতে?—

যাত্রীরা তাড়া দেয় আর আমি ঘরের কথা ভাবি।—

লছ্‌মী এখন কী করছে? জঙ্গলে বুঝি? কাঠ আনতে গেল? আহা! বাছা আমার। ও কখনও পারে কাঠের মোট বইতে?

ওর শখ যে পাথর কুড়নো। রঙ্‌-বেরঙের পাথর। হৃষীকেশের গঙ্গাতীর থেকে। দুর্গাবাঈ এরও কত শখ। আশপাশের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ী পরবে। বসন্তে ঘোর সবুজ, শরতে ফিকে নীল। শীতে ধুসর আর গ্রীষ্মে গৈরিক।

কিন্তু কী সে পরল? যাত্রীদের ফেলে দেয়া কিছু ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু কি? ওর জামা ছিল বাবুদের দেয়া ছেঁড়া গেঞ্জী। শাড়ী বলতে তাপ্পি দেয়া কিছু ছেঁড়া কাপড়। আশ্চর্য! ওই দিয়েই কত যে কেরামতি ওর! বুনো লতাপাতার রসে ডুবিয়ে বাহার ফোটাবার কত যে চেষ্টা!

—কী হচ্ছে এসব? দুর্গাবাঈ!—কতদিন রঙীন কাপাড় জামার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছি।

—রঙ,—সংক্ষিপ্ত জবাব; অপর দিক থেকে।

—কিন্তু এভাবে কি হয় কখনও?

—হ্যাঁ, হয়। আলবাৎ হয়। এই তো, দ্যাখ না, এই যে শাড়ীটা, জঙ্গলের রঙের সঙ্গে দিব্যি কেমন মিলে গেল।

—ও, হ্যাঃ তাও তো বটে। মিলল বৈকি,—নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছি কতদিন।

কিন্তু লছ্‌মী মেনে নেয় নি। বলেছে, দুত্তোর! ও আবার রঙ্‌ নাকি। আসল রঙীন শাড়ী বুঝি আর দেখি নি? হরিদ্বারে—'হর কী গৌরীতে যাই নি বুঝি আমি? এই তো, সেদিনও তো দেখলাম, কত দোকান সেখানে। রঙ্‌-বেরঙের কত শাড়ী।

এইখানে লছ্‌মীকে থামিয়ে দি,—অ্যাই। থাম্‌। শাড়ীর কী বুঝিস রে তুই?

—বেশ, বুঝি না তো বুঝি না;—লছ্‌মী অভিমান করেছে কত সময়। এক ছুটে পালিয়ে গিয়ে খেলায় বসেছে, কুড়িয়ে আনা রঙীন পাথরগুলোকে নিয়ে।

—হ্যাঁ রে লছ্‌মী,—চুপি চুপি এগিয়ে গেছি ওর কাছে,—এত সব রঙীন পাথর দিয়ে কী করবী রে তুই?

—করবো?—এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ও বলেছে,—রঙ্‌ আর কি। পাথরগুলোকে গুঁড়িয়ে মায়ের শাড়ী রঙ্‌ করবো।

—রঙ্‌?—খুব মনোযোগী হবার ভান করি,—তা ভালো। খুব ভালো। চমৎকার।

—আচ্ছা বাবা, এক একদিন জেরা করেছে লছ্‌মী,—কোথায় যাও তুমি? বাবুদের সঙ্গে নিয়ে?

—তার কি ঠিক আছে রে! কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী—আরও কত জায়গায়।

—আমাকে নেবে?

—দুর পাগলী। তা কখনও হয়? তুই গেলে মা থাকবে কার কাছে?

কেন: মা-ও যাবে।

—কিন্তু মায়েদের যেতে নেই।

—হ্‌, নেই অমনি বললেই হল। বাবুদের সঙ্গে মায়েরা যায়, দেখি নি বুঝি!

অকাট্য যুক্তি। প্রতিবাদ করতে পারি না। তাই মাঝপথে রণে ভঙ্গ দি।

সেই থেকে চেষ্টা অনেক করেছি, লছ্‌মী আর ওর মা'কে সঙ্গে নেবার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। কোনো বাবুই রাজী হয়নি এ প্রস্তাবে। তাই এ পথে বরাবরই আমি একা। সম্পূর্ণ একা। এত সঙ্গীর মধ্যে থেকেও পুরো নিঃসঙ্গ।

এক এক সময় ভয় হত খুব। ভাবতাম দীর্ঘদিন আমি ঘরে নেই। কেমন আছে ওরা, কে জানে।

দুরু দুরু বুকে ঘরে ফিরেছি কতবার। এমনকি লছ্‌মীকেও ডাকতে সাহস হয় নি। পাছে দুঃসংবাদ পাই। পাছে আঘাতটা হঠাৎ এসে বুকে লাগে।

কিন্তু হায় অদৃষ্ট! এই আঘাতই যে আমার পাওনা, তা কি ছাই আগে জানতাম।

একবার। মাস দুয়েকের এক লম্বা পাড়ির শেষে; ঘরে ফিরে দেখি, সব ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক।

হল কী? সব গেল কোথায়?—মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় এক প্রতিবেশী এসে খবর দিল,—কে কোথায়, তা কি আমরাই জানি। তবে হ্যাঁ খুব বিপদ এখন। মানুষখেকো এক বাঘ সব কিছু তছনছ করছে।

কী বলবো, ঠিক সেই মুহূর্তে যেন বিরাট এক খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়লাম। চারিদিক অন্ধকার দেখলাম। আমার চলবার শক্তি, বলবার ক্ষমতা লোপ পেল।

কিন্তু না, তবু আশা ছাড়ি নি। লছ্‌মী আর দুর্গাবাঈকে খুঁজে বেড়িয়েছি।—খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন দেখি, একটা বুনো ঝোপ। তার গায়ে নিশানের মতো কী যেন আটকে।

এগিয়ে গেলাম। সামনে যেতেই মালুম হল, একটা ছেঁড়া গেঞ্জী। সবুজ রঙা। ঝোপের রঙের সঙ্গে দিব্যি মিলেমিশে একাকার।

বুঝতে আর বাকী রইল না, এ জিনিস কার এবং সে এখন কোথায়।

কিন্তু লছ্‌মী! তা'র যে কোনো চিহ্নই পেলাম না। হৃষীকেশে গঙ্গার তীরে কত খুঁজলাম। কত যে রঙ বেরঙের পাথর জড়ো করলাম লছ্‌মী—শুধুমাত্র লছ্‌মীরই জন্যে।—কিন্তু সে তো কই এলো না। কোনো হদিসই মিলল না তার।

কত খুঁজেছি তাকে। গঙ্গোত্রীর পথে হার্শিলের গঙ্গার তীরে তীরে, গাড়োয়াল শ্রীনগরে অলকনন্দার আনাচে কানাচে, গৌরীকুণ্ডে মন্দাকিনীর পথে পথে—কত তাকে খুঁজেছি। কিন্তু না, কোথাও দেখা নেই তার। রঙীন নুড়ির এই সেরা আড্ডাগুলোতেও সে নেই।

কত সময় যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছি। আছে সে? স্যানা চটি, উত্তরকাশী, অগস্ত্য মুণি বা পিপলকোটির কোথাও?

কতবার পাহাড়ের গায়ে রঙীন কাপড় দেখে ছুটে গিয়েছি। অবান্তর প্রশ্ন করেছি আশে পাশের লোক

জনকে,—কা'র কাপড়? কে রাঙালি? কবে? কখন?

অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে কেউ কেউ। কেউ আবার জবাব দেবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। একবার তাকিয়ে, অবাক হয়ে আমাকে দেখে নিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছে।

এদিকে কাজ ছাড়া আমারও কি চলে? খাবো কী? সময় কাটবে কী করে?

কুলির কাজ তাই চালিয়ে গেলাম। দু-এক মাস বাদে বাদে ঘরে ফিরতাম যথারীতি। কত সে আশা নিয়ে ফিরতাম। হয়তো ফিরে দেখবো, লক্ষ্মী এসেছে। ঘর আলো করে বসে আছে।

কিন্তু না, সে এলো না। সব আশাই শেষ অবধি বৃথা হয়ে গেল। শীতকালটাই বিশেষ করে অসহ্য। এ সময় যাত্রী সমাগম থাকে না। দারুণ ঠাণ্ডায় যাবারই প্রশ্ন ওঠে না কেদার-বদ্রীর দিকে। পথ বন্ধ। তুষার জমে জমে চারিদিক আচ্ছন্ন। এতএব, এ সময়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু তা'ও কি পারি। ঘরে বসলেই নিঃসঙ্গতা যেন বুকের উপর চেপে বসে। শূণ্যতার বোঝা উন্মাদ করে দেয়।

না না, একনাগাড়ে দু চারদিনের বেশি সে সময় ঘরে থাকি নি। বেরিয়ে পড়তাম। যখন যেদিকে মন চায়। দেবপ্রয়াগের সন্ন্যাসীদের আড্ডায় কখনও, কখনও আবার মোহান্তদের আশ্রমে।

দেখতে দেখতে শীত পেরোতো। বসন্তের শেষ গ্রীষ্ম আসতো। কেদার খণ্ডের পথে পথে নতুন যাত্রী চলাচল শুরু হ'ত আবার।

আমার ভাবনা নেই। পুরনো লোক। খদ্দের ঠিক জুটত। কেদার-বদরীর কখনও, কখনও বা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর। কেউ কেউ আবার চার-ধাম একসঙ্গে সারতেন। যমুনোত্রী থেকে শুরু করে বদ্রীতে গিয়ে থামতেন।

ঐ বদ্রীর পথেই একবার—

সন্ধ্যে হয় হয় তখন। সবে যোশী-মঠ পৌঁছেছি। অনেকটা নীচে অলকনন্দা চোখে পড়ছে। যেন সরু এক ফালি ফিতে, দুই পাহাড়ের মাঝ খানে বিছিয়ে রাখা।

সন্ধ্যের পর আকাশে চাঁদ উঠল। ঝলমলে পূর্ণিমার চাঁদ। আলোয় আলোয় চারিদিক ভেসে গেল।

আহা: সেদিন কী যে পরিষ্কার আকাশ! কোথায় মেঘের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত ছিল না।

এসব দিকে কদাচিৎ হয় এমন। আকাশ এমন নির্মল থাকে।

দেখতে দেখতে নেশা ধরে গেল। চাঁদের আলো মাখা আকাশ উঁচু পাহাড়গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল। নীচেও হাতছানি, অলকনন্দর খাত থেকে।—

হঠাৎ মনে হল, নীচে—অনেকটা নীচে—খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে কে যেন অলকনন্দায় নামছে। যেন লছমীর মতোই দেখতে কেউ। নামছে তো নামছেই। একমনে নামছে।

কে? কে ওখানে? কে ওখানে? চীৎকার করে উঠলাম।

অপর দিক থেকেও ঠিক একই প্রশ্ন, —কে? কে ওখানে?

যেন একটা প্রশ্ন এক মুহূর্তে বহু হয়ে ধীরে ধীরে আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল। এ কি প্রতিধ্বনি? না কি ভিন্ন কিছু? —খাদ বেয়ে সন্তর্পণে নামি আর আকাশ পাতাল ভাবি।

নামবার সময়েই হঠাৎ—

হঠাৎ কী যে হল। পা হড়কে গেল আমার। পড়ে গেলাম।

তারপর—

না না, পরের ঘটনা কিছু আর মনে নেই। সব কিছু ভাসা-ভাসা, অদ্ভুত, রহস্যময়।

কী আশ্চর্য; এ রহস্যেরও ঘোর কাটে। আবার নিজেকে খুঁজে পাই।

—যেন আমি বরফের দেশের মানুষ। বরফেরই ঘরে থাকি। বলগা হরিণের দুধ আমার প্রিয় খাদ্য। সীলের মাংস বলসে নিয়ে আমি আহার করি। এ ছাড়া, আমার ঘরে কত যে মজুত চর্বি সিন্ধু ঘোটকের চর্বি সব। অনেক যত্নে সঞ্চয় করা।

আমার যানবাহন বলতে স্লেজ গাড়ি, কুকুর অথবা বলগা হরিণের টানা। বরফের দেশের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে আমি ছুটি। গাড়ি চলার শব্দে পেঙ্গুইন পাখিরা ভয় পায়, লাফিয়ে ওঠে, দাপাদাপি করে, কখনও বা উড়ে পালায়।

আহা! কী সুন্দর ওদের চেহারা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন সব খুদে খুদে মানুষ, গা-ঢাকা সাদা কালো কোট পরে মুরুব্বির ঢঙ এ দাঁড়িয়ে। পেঙ্গুইনরা কি সভা করতে খুব ভালো বাসে? তাই যদি না হবে তো এক এক জায়গায় অমন হাজার হাজার পাখি কেন? কী করে ওরা? কী চায়? আসলে ওদের কেউই যে ভালো শ্রোতা নয়, তো অন্ততঃ স্পষ্ট। নিত্য দেখি, ওরা এক জায়গায় থাকা মানেই চীৎকার আর চেঁচামেচি। ওফ। কী যে চেঁচায় ওরা! কানে তালা লাগবার উপক্রম।

এলবাট্রস পাখিগুলো ভারী মজার। চেঁচামেচির ধার ধারে না। ঝোঁক শুধু খাবারের দিকে। একসঙ্গে সাধ্যের অতিরিক্ত খায়। খেয়ে আর উড়তে পারে না। তখন বমি ফ্যানার মতো শুধু বমি করবে; যতক্ষণ না শরীরটা আরও হাল্কা হয়, উড়বার শক্তি ফিরে আসে।

সীলগুলো কত কায়দাই না জানে। শীত একটু বেশি পড়লে সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকোয়। এদিকে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। সমুদ্রের উপর বরফ। তখন কী আর করে। নিরুপায় হয়ে বরফের আবরণ কাটাতে থাকে। শিরগুলোকে উঁচিয়ে ধরে।

সীলদের এইসব কাণ্ডকীর্তি দেখতে আমার খুব মজা লাগত। কত সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, বরফ কাটায় সব ব্যস্ত। চারিদিক থেকে কট-কট, খটাখট শব্দ ভেসে আসছে।

গ্রীষ্মে আর বসন্তে ভিন্ন পরিবেশ। তখন শীতের প্রকোপ একটু কমে। বরফ গলতে শুরু করে। এখানে সেখানে ঘাস দেখা দেয়। রঙ বেরঙের লতাপাতা চোখে পড়ে।

এছাড়া মেরুসমুদ্রে অজস্র মাছ তখন। মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের নিত্য

ভোজ। গাদা গাদা সীল ভোজ সেরে বরফের আসনে বসে আছে—দেখবার মতো দৃশ্য। তবে সীলগুলো সব নির্বোধ। বরফের নীচেই যে জল, নতুন পসা সমুদ্রের জল, সেদিকে ওদের হুঁশ নেই।

এদিকে মেরু সমুদ্রের তিমিরা কিন্তু হুঁশিয়ার। খাদ্যের সন্ধানে সারাক্ষণ তৎপর। সীলদের বরফ-আসনের তলাকার জল বেয়ে চুপচাপ ওরা আসে। তারপর সুযোগ বুঝে বরফের গায়ে মারে ধাক্কা।

ব্যাস! বরফ সরে যায়। সীল গিয়ে পড়ে তিমির খপ্পরে।

শীতকালে সীলদের বেশির ভাগই বেপাত্তা।

তখন আমরা ভিন্ন এক কায়দায় সীল শিকার করতাম।

বরফের গায়ে গর্ত খোঁড়া হত প্রথমে। আমরা সেই গর্তের চারপাশে বর্শা নিয়ে বসে থাকতাম। বলা বাহুল্য, বরফের তলায় জল; সীলের দল ওখানে ঘুর-ঘুর করছে।

গর্তের কাছাকাছি হতেই ওদের কেউ কেউ উঁকঝুঁকি মারত; এবং তারপর উঠে আসত গর্ত বরাবর।

আমরা তৈরী। সঙ্গে সঙ্গেই শিকার ঘায়েল। তারপর ধরে এনে খাওয়া দাওয়া।

সীলের চর্বি এবং মাংস আমাদের প্রিয় খাদ্য। চামড়াও ফেলনা কিছু নয়। 'কায়াক'-এর তলা ঢাকবার কাজে লাগে। কায়াক মানে এক ধরনের নৌকো, যা নাকি বরফের মাঝখানকার খুদে খুদে নদী পেরোবার সময় লাগে।

ঐ সব নৌকো কাঠের তৈরী। নৌকোর তলার দিকটা ঢাকা সীল বা বলগা হরিণের চামড়ায়, যাতে না না কোনমতে জল ঢুকতে পারে।

অবিশ্যি 'ইগলু'তে একবার ঢুকলে জল ঝড়ের ভয় নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত ইগলু মানে এস্কিমোদের ঘর, বরফে তৈরী। দেখতে অনেকটা উবুড় করা বাটির মত। এখানে বাইরের ঠাণ্ডা বরফের চেয়েও অনেক বেশি। তাই ঘরগুলোকে বলা যায় ঠাণ্ডা আটকাবার হাতিয়ার।

ঘরের ভেতরটা ধোঁয়ায় একাকার। সারাক্ষণ চর্বির বাতি জ্বলছে। ধোঁয়া বেরোবারও পথ নেই, ইগলুতে ঢুকবার ছোট্ট দরজাটি ছাড়া। দরজা মানে সুড়ঙ্গ এক ফালি কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকবার পথ।

মনে পড়ে ইগলুতে ঢুকতে কী যে কষ্ট হত এক এক সময়! বেঁটেখাটো আর মোটাসোটা ছিলাম যে।

হ্যাঁ, মোটা ওখানে সবাই। জানো য়ারের চর্বি খেয়ে খেয়ে সবাই দিব্যি নাদুস-নুদুস। 'ইন্নুইট' মানে এস্কিমোদের কেউ কেউ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান।

চান টানের বালাই নেই সে দেশে। গায়ে ময়লা জমছে তো জমছেই। শেষকালে নিরুপায় হয়ে এক একদিন গা পরিষ্কার করতাম।

না না, পরিষ্কার মানে আধুনিক পদ্ধতিতে কিছু নয়, স্রেফ আদিম কায়দায়। অর্থাৎ কিনা আমরা একে অপরের আরও কত কী যে করেছি! কত কি দেখেছি! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

অবশ্য দিন মানে চব্বিশ ঘণ্টা নয়, টানা ছ'টি মাস, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

মেরু অঞ্চলের রাত্রির সৌন্দর্যের কথা কী বলবো! অরোরার রূপ কত সময় চোখ ধাঁধিয়ে দিত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মেরুজ্যোতিঃ অরোরা বরিয়ালিস এর কথা বলছি—সৌন্দর্যে আর মাহাত্ম্যে যা নাকি বিশ্ব ভুবনে অতুলনীয়।—

লাল নীল সবুজ বেগুনি—রঙ-বেরঙের আলোর বিজয় বৈজয়ন্তী—উন্নত আকাশে পরিক্রমণশীল আলোক-ধারা—বেগে উৎক্ষিপ্ত আলোকমালার চক্রাকারে সঞ্চরণ—শত সহস্র তীব্র বৈদ্যুতিক সন্ধানী আলো যেন হাল্কা, দোদুল্যমান মাকড়সার জালের মতো আলোকজাল, তরঙ্গায়িত আলোক-তীর্থ। অরোরার ঘূর্ণনশীল আলোক-রশ্মির উদ্দাম আবর্ত বিক্ষুব্ধ অথচ জমকালো, প্রচণ্ড কিন্তু চিত্তাকর্ষক। সেই দুর্দান্ত আলোকমালার অপূর্ব বৈভব বিশ্বের সকল বিস্ময়কে মুহূর্তে ম্লান করে দেয়। সেই আলোক তরঙ্গের ভয়ঙ্কর নাচন দেখে মনে হয়, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল। বুঝিবা বিরাট আকাশ এই আলোক সমুদ্র সঙ্গে নিয়ে মাটির উপরে নেমে এল।

কতদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছি এসব। দেখেছি আর ভেবেছি, হে বিধাতা, কী বিচিত্র তোমার খেয়াল। জীবকে কতভাবে যে ভুলিয়ে রাখো!...কিন্তু তবু পুরোপুরি ভোলা কি যায়। জীবন সংগ্রাম যে বড় কঠিন। আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীবকে কম-বেশী লড়াই করতেই হয়। উত্তর মেরুতেও লড়াই চলে আমাদের। বাঁচার লড়াই। দারুণ শীতে খাদ্যের অভাব ঘটলে তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে মারামারি করি। এমন কি আপন-জনদেরও বঞ্চিত করে নিজে খাই।

না না, এজন্যে দুঃখ বা অনুশোচনা নেই। বিজয়ের-আনন্দ আছে শুধু। যেন স্বার্থসিদ্ধিই জীবনের চরম লক্ষ্য, বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতা।

ওফ্! এই স্বার্থসিদ্ধিরই কী করাল রূপ আমি দেখলাম। ভিন্ন এক জন্মে আমি বেদুইন, যখন সাহারার মরুভূমিতে ঘুরছি তখন।

হায় ঈশ্বর! মরুভূমির চাইতেও হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্থান আর কি কিছু আছে? এমন জায়গাতেও জীবনের অস্তিত্ব কেন? আর, যদি জীবনই থাকবে তো খাদ্য নেই কেন?

কতদিন নির্মম মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।

ফল হয়নি কিছু। দুঃখ বরং বেড়েছে; পানীয় জলের দুঃখ, খাদ্যের দুঃখ।

সেখানে মাইলের পর মাইল, শত শত মাইল শুধু বালি আর বালি। ঠিক সমতল নয় সে রাজ্য; উঁচু নীচু, এবড়ো খেবড়ো; খুদে খুদে বালির পাহাড়ে ঠাসা।

সূর্য উঠতে না উঠতেই আগুন ঝরে সেখানে। চারিদিক থেকে মরণ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তাকান যায় না, চোখ ঝলসে যাবার ভয়; চলা যায় না, পথ ভুল করে

চোরাবালিতে সেঁধোবার আশঙ্কা; বিশ্রাম নেয়া যায় না। একটু থামলেই চারিদিক থেকে মরীচিকার কুহক।

খুব সাবধানে পথ চলি। দল বেঁধে, উটের পিঠে চেপে। আমাদের দৃষ্টি হায়েনার চেয়েও তীক্ষ্ণ, শকুনির চেয়েও অব্যর্থ।

আমরা কী সন্ধান করি সেখানে? কিসের আশায় মরণপণ করে ঘুরে বেড়াই?

শিকার, শুধুমাত্র শিকারের আশায়। এমন সব জায়গাতেই আমাদের আনাগোনা, যেখানে দু'একটা নির্বোধ মানুষ পথ ভুল করে চলে আসে।

ওরা বেশির ভাগই পথিক। হয়তো বা লটবহর নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে।

আমরা সরাসরি এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘিরে ফেলতাম। কাজ হাসিল হবার পর ওদের ক্ষত বিক্ষত দেহগুলো শুধু পড়ে থাকতো। জিনিসপত্র, জামাকাপড় এবং উটগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতাম।

বাড়তি এই উটগুলোই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। মরুদ্যানে যে কোনো 'ফিসট' মানেই উটের মাংস।

ভারী সুন্দর ঐ মরুদ্যানগুলো। মরুভূমির বুকে আমাদের সত্যিকারের আশ্রয়। ওসব জায়গায় খানিকটা বালি খুঁড়লেই জল। কোনো কোনো মরুদ্যানে দিব্যি চাষবাসও চলে। ভুট্টা, গম আর ফলমূল উৎপন্ন হয়। এছাড়া, খেজুর তো আছেই। বড় বড় খেজুর গাছের ঝোপগুলো মরুদ্যানকে বহুদূর থেকে চিনিয়ে দেয়। মরুদ্যানের কাছে এলে কোথাও কোথাও ঘাসও চোখে পড়ে। ভেড়া এবং ছাগল সেখানে চরে বেড়ায়। এছাড়া থাকে এক ধরনের ইঁদুর এবং কাঁকড়াবিছে।

মরুদ্যানের সুখ বেদুইনকে অবিশ্যি ধরে রাখতে পারে না। চলার নেশা তাকে যেন উন্মাদ করে তোলে। শুধু চলার নেশা বললেও ভুল হয়, চলার এবং সেই সঙ্গে ভাঙচুরের। থেকে থেকে অকারণে ভাঙচুর করে সব কিছু গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে বেদুইনের যেন সোয়াস্তি নেই।

এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। এক অদ্ভুত উন্মাদনা। বেদুইন এর কবলে পড়ে রক্তলোলুপ হয়, খুনের খেলায় মাতে।

অকারণে খুন; অযথা রক্তপাত। এমনকি পরম আত্মীয়ের বুকেও কথায় কথায় ছোরা বসাতে বেদুইনের বিবেকে বাধে না।

ধরুন না কেন আমার কথা। যে সর্দার ছেলেবেলা থেকে আমায় দেখল, একদিন তারই বুকে ছোরা মারতে আমার হাত এতটুকু কাঁপে নি।

অথচ সর্দার কত ভালোবাসত আমায়। মরুর বুক থেকে একদিন সে ই তো আমায় উটিয়ে নিল।

আমি তখন তপ্ত বালির উপর পড়েছিলাম। একদল দস্যু আমার মা-বাবাকে খুন করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়; আর আমাকে ছুড়ে ফেলে মরুভূমির বুকে।

আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। অসহায়ভাবে মরুর বুকে বসে আছি। কী করবো, কোথায় যাবো, কিছুই ঠাওর করতে পারছি না। পাশেই মা বাবার রক্তাক্ত দেহ। ওরা যে বেঁচে নেই তা বুঝতে আমি অক্ষম। তাই থেকে থেকে ডাকছি ওদের। বারবার বলছি, তেষ্টায় বড় কষ্ট হচ্ছে আমার; জল চাই।

'জল' 'জল' বলে যখন চীৎকার করছি তখন হঠাৎ মনে হল, দূরে বহুদূরে বালি যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে।

দেখতে দেখতে ঐ বালির কুণ্ডলী কাছাকাছি হল আমার। উটের পিঠে চেপে কয়েকজন বেদুইন এগিয়ে এল।

ওদের মধ্যে যে মাতব্বর, সে ঐ অসহায় অবস্থায় আমাকে দেখে এক মুহূর্তে বুঝে নিল, আসল ব্যাপারটা কী। তখনই সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সে, ওকে তুলে নাও। আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।

ব্যস, সেই থেকে এই বেদুইন সর্দার আমার সঙ্গী, আশ্রয়দাতা। সাহারার বুকে ছোট্ট এক মরুদ্যানে আমি বেড়ে উঠি। সর্দার কত যত্ন করে আমায় তালিম দেয়। মরুর বুকে ঘাস আছে কোথায়, কীভাবে চললে উট তাড়াতাড়ি যেতে পারে, সব আমি এক এক করে জানি।

যখন কুড়ি বছরে পা দিলাম তখন আমিও এক খুদে ওস্তাদ। রাহাজানিতে আমার জুড়ি নেই। তবে দুটো ব্যাপারে সর্দারের নিষেধ, মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে না, আর শিশুদের কিছু করবে না।

এই নিষেধকে ঘিরেই সর্দারের সঙ্গে একদিন বচসা। জবরদস্ত একটা দলকে ঘিরে ফেলেছি, দিব্যি লুঠতরাজ চলছে, এমন সময় সর্দারের ফরমান, —অ্যাই কী হচ্ছে এসব? বেতমিজের দল। মেয়ে আর শিশুদের উপর জুলুম কেন?

এগিয়ে গিয়ে বললাম, —লুঠের সময় এখন। বাহ-বিচারের সময় তো নয়, অতএব, এসব ছেদো কথা এখন শিকেয় তোলা থাক।

সর্দার অগ্নিমূর্তি হয়ে বললে,—কী এত বড় কথা?

বললাম,—হ্যাঁ, আলবাৎ।

সর্দার বললে, —না, এ হতে পারে না। কিছুতেই না।

বললাম, —খবরদার। এখনও সময় আছে; মুখ বন্ধ করো, নইলে বিপদ।

সর্দার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, —কী বললি? বেইমান, নিজের কথা বিলকুল ভুলে গেলি এরই মধ্যে? শিশুর গায়ে হাত তুললে তুই, তুই নিজে বাঁচতি?

বললাম, —হ্যাঁ, বাঁচতাম; খোদা বাঁচালে সাধ্যি কী যে কেউ মারে—বলেই কোমর থেকেই ছোরা বের করে নিমেষের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। সর্দারের বুকে ওটা বিঁধিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম,—দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ শয়তান। খোদা মারলে সাধ্যি কী যে কেউ বাঁচায়।

ওফ্। সেদিন কী ভয়ঙ্কর চাউনী সর্দারের। যেন হাজার সূর্য ওর দুই চোখে। সেই সূর্যগুলো জ্বলছে, গলছে, আমায় অভিশাপ দিচ্ছে।

কিন্তু আমিই বা কে? আমার আসল পরিচয় কী? কোন্ সেই দূর অতীত থেকে আমার যাত্রা শুরু? —এই কঠিন প্রশ্নগুলো আজও আমায় ভাবিয়ে তোলে।.....এই অবধি বলে

যখন কুড়ি বছরে পা দিলাম তখন আমিও এক খুদে ওস্তাদ। রাহাজানিতে আমার জুড়ি নেই।

একটু থামেন ডঃ আয়েঙ্গার। খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করেন,—কী? লাগছে কেমন? যা নাকি এতক্ষণ ধরে শুনলেন, তা থেকে?

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, —এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করাই সমীচীন। ডঃ আয়েঙ্গার বললেন,—কিন্তু একটা জিনিস তো স্পষ্ট। আমি এগোচ্ছি, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, তা কি এখনও ঠাওর হল না আপনার?

বললাম, —না, সঠিক কিছুই বুঝলাম না।

—সে কী।—ডঃ আয়েঙ্গার রীতিমত অবাক,—জন্মের প্রতিটি স্তরে আমি যে-ধাপে ধাপে এগোচ্ছি, তাও বুঝলেন না? একটু ভাবুন; ভেবে দেখলেই বুঝবেন, তুর্দান্ত বেদুইনের তুলনায় মেরুদেশের এস্কিমোর জীবন অপেক্ষাকৃত উন্নত। আবার এস্কিমোর তুলনায় কেদার বদ্রির পথের কুলি অনেকসভ্য ও সংযত। একেবারে শেষ ধাপে ডঃ আয়েঙ্গার। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বিজ্ঞানী হিসেবে জগৎ রহস্য নিয়ে যা নাকি আমি চিন্তা করি, একজন কুলি, তা সে যত সজ্জনই হোক, সে-চিন্তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাহলে দাঁড়াল কী?—না, আমি এগোচ্ছি। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আমার জীবন পূর্ণতার পথে যাচ্ছে।

—কিন্তু তা কী করে মেনে নি?—আমার প্রবল প্রতিবাদ,—এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কি এ থেকে করা যায়?

ডঃ আয়েঙ্গার বেশ আস্থার সঙ্গে বললেন,—বেশ, শুনুন তবে; আরও কিছু চাঞ্চল্যকর কথা; সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পাবেন।

আমি আপত্তি জানাবার চেষ্টা করি। বাধা দিতে চাই। কিন্তু আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ডঃ আয়েঙ্গার ফের শুরু করেন—বেদুইন-জীবনের পর বিরাট শূন্যতা। ঠিক শূন্যতাও নয়, অস্পষ্টতা। যেন কত কী ঘটে যাচ্ছে আমাকে ঘিরে। কিন্তু আমি ঠিক কিছুই দেখছি না; কত কী নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে আমার আশেপাশে, কিন্তু আমি ঠিক কোনো কিছুই অনুভবে আনতে পারছি না। দৃষ্টি থাকতেও আমি যেন অন্ধ, শক্তি থাকতেও যেন নিথর।

এই খানে বাধা দিলাম হঠাৎ,—কিন্তু কেন বলুন তো? হঠাৎ আপনার এই নিষ্ক্রিয়তা? ডঃ আয়েঙ্গার ধীর শান্ত ভাবে বলতে লাগলেন,—এর উত্তর অতি সহজ। একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন। ...আসলে ব্যাপার কী জানেন, সব জীবনই তো আর আমার চিরকালের মনে দাগ কাটে নি। যে জীবনগুলো

দুঃখ ও বেদনায়, আনন্দে ও বৈচিত্র্যে অবিস্মরণীয় শুধুমাত্র সেগুলোই কেটেছে। জন্মজন্মান্তর ধরে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুর অণুপরমাণুতে বিশেষভাবে কম্পন সৃষ্টি করেছে। অতএব 'মেমোরিল' শুধুমাত্র সেই বিশেষ জীবনগুলোর স্মৃতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেই কার্যকরী।

বললাম,—বেশ, তা'ই না হয় হল। 'মেমোরিল'-এর সাহায্যে 'অবিস্মরণীয়' আর কী আপনি উদ্ধার করলেন, কিছু শুনি।

ডঃ আয়েঙ্গার বলতে লাগলেন,—দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনে; আশ্চর্যরকম ভিন্ন এক পরিবেশে। সেই জীবনও পরিবেশের সঙ্গে আজকের কোনো কিছুরই বিশেষ মিল নেই।

পৃথিবীর চেহারা তখন অন্য রকম। সবে প্রাণান্তকর এক তুষার যুগ শেষ হয়েছে। স্তূপীকৃত তুষার গলতে শুরু করেছে। এখানে সেখানে জলের শীর্ণ ধারা।

খাদ্য নেই। পশু মাংস দুর্লভ। অনেক খুঁজেও জন্তু জানোয়ার চোখে পড়ে না। অধিকাংশেরই হয়েছে তুষার সমাধি।

এদিকে ফলমূলও দুষ্প্রাপ্য। তুষারের দৌরাত্ম্যে বেশির ভাগ গাছপালাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমরা, মানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম মানুষরা বড় অসহায় তখন। প্রধান খাদ্য পশুমাংস বা ফলমূলের কোনোটাই প্রায় নেই। কদাচিৎ সামান্য দু'চারটে কংকালসার গাছ চোখে পড়ে, ধবধবে সাদা তুষারের বুকে কোনোমতে দাঁড়িয়ে। এ ছাড়া, ঝোপ ঝাড় বা লতাপাতাও খুব সামান্য; কালে ভদ্রে দেখা যায়।

পশুদের কংকাল যত্রতত্র। কোনোটা বিকৃত, আবার কোনোটা বা অবিকৃত। কোনোটার বেশির ভাগ তুষারের তলায়, আবার কোনোটা প্রুরোপুরিই ওপরে। যেন জগৎজোড়া বিরাট এক বধ্যভূমি। সর্বত্র ধ্বংস ও সর্বনাশের করাল ছায়া।

এদিকে দারুণ শীত তখনও। প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড কষ্ট। পশুর অভাবে চামড়া নেই, তাই আমাদের আবরণও নেই। এমনকি বল্কলের পর্যন্ত দারুণ অভাব। তবে সে যুগে আমরা আগুনের ব্যবহার শিখেছি। তাই মাঝে মাঝে আগুন জ্বেলে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতাম।

না না, এ আগুন কাঠকুঠো বা লতাপাতার নয়; নানারকম দাহ্য পদার্থের। ও সব পদার্থ হামেশা প্রকৃতির বুকেই পাওয়া যেত। আমরা ওদের নাম জানতাম না, মূল প্রকৃতিও না। শুধু—এটুকু জানতাম, আগুন উৎপাদনে ওরা কাজে লাগে। পাথর ঘষে ঘষে ওদের মধ্যে আগুন-সংযোগ করতে হয়।

কিন্তু তা'তেই বা কী। দেহকে তপ্ত করলেই তো আর পেট ভরে না। খাদ্য চাই।

কী জানেন, খাদ্যের অভাবে তখন আমরা মরীয়া। হন্যে হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই। বরফ গলা জল দেখলেই ছুটে গিয়ে অন্বেষণ করি, মাছ আছে কি না।

কী আশ্চর্য! মাছ পেয়েও যাই এক একসময়। কিন্তু বুদ্ধির অভাবে প্রায়ই ধরতে পারি না।

আমাদের স্বজাতির কেউ কেউ মাছ ধরার নানা কৌশল বের করে। কিন্তু না, তাতেও কুলোয় না। খাদ্যাভাব মেটে না।

অগত্যা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি। পাথরের সরঞ্জাম নিয়ে ছুটি। যখন-তখন জমাট বরফের আস্তরণ ভেদ করি। মনের কোণে ক্ষীণ আশা, জীবজন্তুর দেহাবশেষ মিলবে হয়তো।

এইখানে বলে রাখি, দারুণ ঠাণ্ডা বলে তুষারের তলায় চাপা পড়া জীবজন্তুর মাংস প্রায় অক্ষতই থাকতো এবং আমরা নির্বিচারে সেই মাংস খেতাম।

না না, একাজে এতটুকু ঘৃণা বা বিরক্তি ছিল না আমাদের; বরং এ ধরনের কিছু খুঁজে পাওয়া গেলে দখল নিয়ে বাধতো রেষারেষি। কত সময় রক্তারক্তি কাণ্ড!

একবার। দিন দুপুরে। মাছ ধরছি। হঠাৎ দেখি, কাছেই কে যেন বরফ খুঁড়ছে।

বুঝলাম, নিশ্চয় পশুমাংসের হদিস মিলেছে। খোঁড়াখুঁড়ি করে এখন তা উদ্ধারের চেষ্টা।

মাছ ধরতে ধরতে অন্যমনস্ক হলাম এক একবার। তাকিয়ে দেখতে লাগলাম অদূরে কী ঘটছে।

হঠাৎ দেখি, সংঘাত—কোত্থেকে আর এক একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটে গেল; এবং তারপর পশুমাংসের দখল নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাধল তুমুল লড়াই।

দেখতে দেখতে রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রথমে যে বরফ খুঁড়ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল।

বিজয়ীর কী উল্লাস তখন। পাথরের অস্ত্র হাতে নিয়ে কী উত্তেজনা! লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে চারিদিক মাতিয়ে তুলল।

খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখি, ও আর। একা নয়; সাকরেদরা এসে যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে।

এবার সবাই মিলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল। হৈ হল্লোড় আর দাপাদাপিতে কেঁপে উঠল তুষার-প্রাঙ্গণ।

খানিক বাদে নতুন বিপদ। ভিন্ন একটি দল ছুটে এসে পশুমাংসের দখল চাইল। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। এরাও দেবে না, ওরাও ছাড়বে না।

ব্যস, আবার শুরু হল লড়াই। এবার দু'দলের মধ্যে। পাথরের অস্ত্রের আঘাতে অনেকেই লুটিয়ে পড়ল। তামাম তুষার-প্রান্তর জুড়ে নেমে এলো বিভীষিকা।

এবার আমি একটু সরে গিয়ে মাছ ধরতে লাগলাম; এবং কী আশ্চর্য! খানিক বাদেই দেখি, বিবদমানদের মধ্যে একজন মাত্র অবশিষ্ট। বাকী সবাই হয় মৃত, আর না হয় মুমূর্ষু অবস্থায় তুষারের ওপর পড়ে।

এইবার আমার পালা। হঠাৎ খুন চাপলো মাথায়। মনে হল, এই মওকা। ক্লান্ত, অবসন্ন ওই জীবটাকে এবার গিয়ে আঘাত হানি। পশুমাংস আমার দখলে আসবে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নিশ্চয় ও পেরে উঠবে না।

মাছ মারার অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলাম প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

না, বিশেষ কিছুই করতে পারে নি সে। দু'একবার নিষ্ফল আক্রোশে

গর্জন করতে করতে তুষারের উপর লুটিয়ে পড়েছিল।

এদিকে মুমূর্ষুদের কাতরানি ভেসে আসছে তখনও। যন্ত্রণায় ওরা ছটফট করছে।

আমি কিন্তু কোনদিকেই কান দিলাম না। পশুমাংসের দখল কায়েম করবো বলে ছুটে গিয়ে কয়েকজন সঙ্গীকে শুধু ডেকে আনলাম।

ওরা আমার চেয়েও নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর। মুমূর্ষুদের একে একে খতম করল। বোধ করি, ভয় ছিল ওদের, কেউ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলে শত্রুমহলে খবর দিতে পারে।

কিন্তু সেই হিংস্র পৃথিবীতে কে শত্রু আর কে মিত্র? নিত্য দেখেছি; মিত্র শত্রুতা করছে। বিশ্বাসঘাতকতা, খুনখারাবি ও সংঘর্ষ সেখানে লেগেই আছে।

ঐ পশুমাংস নিয়েই বা কী হল? যাদের ডেকে আনলাম আমি, ভাগ বাঁটোয়ারার সময় তারাই আমাকে আক্রমণ করল।

না না, শেষ অবধি ভাগ আমি চাই নি, পাইও নি,। ছুটে পালিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করেছিলাম।

অবশ্যি পালাবোই বা কোথায়?—যেখানেই যাই সেখানেই এই হিংস্রতা, অশান্তি ও অনিশ্চয়তা।

ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এক অদ্ভুত জায়গায় হাজির হলাম। সেখানকার জীবগুলো অপেক্ষাকৃত সভ্য। কিছুদিন হল ওরা চাষবাস শুরু করেছে। ওদের এলাকায় তুষারের দাপটও অন্য সব এলাকার তুলনায় অল্প।

দেখতে দেখতে মিশে গেলাম ওদের সঙ্গে। চাষাবাদ শিখতে লাগলাম।

অবশ্যি আবাদ মানে আজকালকার মতো মোটেই নয়, একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের।

হয়তো দেখা গেল, কোনো গাছের ফল বা ফুল কোথাও পড়েছে, তা থেকে নতুন গাছ গজাচ্ছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল খোঁজাখুঁজি। সেই জাতের ফল বা ফুল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে চাষবাসের ব্যবস্থা।

এছাড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতো। বিভিন্ন গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে তাদের শুশ্রূষা। এ ব্যাপারে এতটুকুও সফল হলে অর্থাৎ কোনো ডালে একটিও নতুন পাতা গজালে আর রক্ষে নেই। কালবিলম্ব না করে গাদা গাদা ডাল পোতার ধুম লেগে যেত।

তবে গাছ গাছালির গুণাগুণ বিচারের রীতি তখনও কেউ ঠিক শেখে নি।—ফলে বিষাক্ত ফল খেয়ে সে যুগে অনেকেই বিপদ ডেকে আনতো।

বলতে কী, আমার বিপদও ঐ ফল থেকেই।—

একদিন। ভুল করে কী যেন এক জাতের ফল খেলাম। খাওয়া মাত্রই দেখি, দম বন্ধ হয়ে আসছে, দেহ অসাড় হচ্ছে ক্রমশ, চোখে অন্ধকার।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে কী ঘটে গেল, কিছু আর মনে নেই। যেন অন্ধকার, শুধুই অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চললাম। আশেপাশে কত কী শব্দ, আমি তাদের শুনেও শুনছি না; আলোকবিন্দুতে গড়া কত কী দৃশ্য, আমি দেখেও দেখছি না; অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া কত কী ঘটনা, আমি বুঝি বুঝি করেও কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

নিজেকে খুঁজে পেলাম বহুক্ষণ বাদে। কিন্তু হায়!—তখন আমি আর পুরো মানুষ নই, প্রায় মানুষ জাতীয় ভিন্ন এক জীব।

গুহায় থাকি, বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। জীবজন্তুর কাঁচা মাংস আর ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করি।

কী সংগ্রাম, কী সংগ্রাম সারাক্ষণ। এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকবার যো নেই। জানোয়াররা আমাকে টেনে-হিঁচড়ে, থেঁতলে গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।

এই বোধ করি, গুহা-মানবের জীবন। আহা, কী জীবন! কী ভীষণ আর ভয়ঙ্কর! অন্ধকার হতে না হতেই গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে প্রতীক্ষা। ধারে কাছেই হিংস্র জন্তুরা সব আর্তনাদ করছে, অথবা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি।—গুহার অন্ধকারে বসে ওদের হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছি।

এক একবার—। তামাম গুহাটাই বুঝি কাঁপতে কাঁপতে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়। গুহার মুখে রাক্ষুসে পাথর গুলোতে ঠক্ ঠক্ শব্দ। কা'রা যেন ওখানে থাবা আঁচড়ায়।

কখনও বা গুহার ছাদে থপ-থপ আওয়াজ। কাদের যেন দাপাদাপি। ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হই তখন। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করি, ওরা কা'রা। কিন্তু কিছুই ঠিক বোঝা যায় না। বরং গুহার ভেতরকার অন্ধকার আরও জমাট হয়ে ওঠে। অস্বস্তি ও অশান্তি বুকের ওপর চেপে বসে।

হায় বিধাতা! কি দারুণ অস্বস্তি! কি চরম অশান্তি! এমনকি সহবাসী অন্য কোনো গুহা মানবের স্পর্শ পেলেও ভাবি, বুঝি বাইরের কোনো শয়তান। আমাদের আস্তানায় ঢুকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফিকিরে।

সেই বিভীষিকাময় রাত্রিগুলোতে একটিই প্রার্থনা আমাদের,—ভোরের প্রার্থনা। দুরু দুরু বুকে সূর্যোদয়ের আশায় আমরা অপেক্ষা করতাম। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কতবার যে থর থর করে কাঁপতাম।

অবশেষে ভোর হ'ত। গুহার ফাঁক ফোকর দিয়ে দিনের আলোর প্রথম আভাস পেতাম।

কী বলবো, গুহায় তখন উল্লাস। অদ্ভুত এক ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ঘটা।

খানিক বাদে; ধীরে ধীরে এগোতাম আমরা। গুহার মুখের পাথর সরিয়ে খুব সন্তর্পণে বাইরে এসে দাঁড়াতাম।

না না, তখনও ঠিক আশঙ্কা কাটে নি। শয়তানরা ধারে কাছেই লুকিয়ে থাকতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে হঠাৎ—আক্রমণ বিচিত্র নয়।

দিনের বেলা দল বেঁধে চলি আমরা। যেন গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারি, কোথায় কী সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে।

তখন আমাদের অস্ত্র বলতে পাথর। নানা আকারের ছোট-বড় পাথর।

ঐ সব পাথর ঘষে ঘষেই আগুন জ্বালত কেউ কেউ। লক্ষ্য করেছি, আগুন দেখলে জানোয়াররা ভয় পায়, কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না।

অবশ্য তখনও আগুনের ব্যবহার ঠিক চালু হয়নি। কালেভদ্রে নেহাৎ খেলার ছলে এ জিনিস নিয়ে কেউ কেউ তামাসা করতো।

ঠিক তামাসা বললেও ভুল হয়। তখন জীবন ছিল নিষ্ঠুর, নির্মম। তুচ্ছ কারণে খুন খারাবি চলতো। সামান্য খেয়ালের বশে একে অপরকে মেরে ফেলেছে, এমন ঘটনাও হামেশা দেখেছি।

ধরুন না কেন আমার কথা। কী দেখলাম! বিচার, যখন তখন শুধু বিচার, অথবা বিচারের নামে প্রহসন।

একবার। এক জলা মতো জায়গায় আটকে পড়ি। আলগা পাথরে পা রেখে রেখে অতি কষ্টে সেখানে গিয়েছি। ভরসা ছিল, নিরীহ পাখি-টাখি কিছু মিলবে।

কিন্তু কোথায় কী। ওখানে যেতে না যেতেই হিংস্র কয়েকটা জলজ দানব আমাদের ঘিরে ফেলল।

পালাবার জো নেই, চারিদিকে জল। নামবার জো নেই, সামনেই দানবরা। কী করি, আকাশ পাতাল ভাবছি, এমন সময় আমাদের এক সঙ্গী অতি সহজে সমস্যার সমাধান করে দিল।

তার যুক্তি আমাদের যে কোনো একজনকে ঐ দানবদের খাবার হতে হবে। খাবার নিয়ে ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে, সুযোগ বুঝে অন্যরা তখন পালাবে।

কিন্তু কেউ রাজী হয় না এ প্রস্তাবে। অসহায়ভাবে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। তখন প্রস্তাবক জানালে, এ দলটির মধ্যে সবচেয়ে যে হৃষ্টপুষ্ট তাকেই প্রথম শিকার হতে হবে।

কিন্তু কে হৃষ্টপুষ্ট সবচেয়ে?—এই নিয়ে বাধে বচসা; তা থেকে মারা মারি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কেউ কা'রও কথা শুনতে রাজী নয়। সবাই চাইছে নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিতে।

অথচ একটু মাথা খাটালেই ব্যাপারটা কত সহজ হত? শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেত সবাই। কারণ, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম দিব্যি উঁচুমত একটা জায়গায়। সেখানে গাদা গাদা আলগা পাথর। বুদ্ধি খাটিয়ে সেই পাথরের দু'চারটে গড়িয়ে দিলে নিশ্চয় তলাকার দানবরা খায়েল হত।

বলতে কী, দু'একটা পাথর আমি গড়িয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমার কাজকে আমল দিল না। সকলেরই এক যুক্তি, জায়গায়টা এমন কিছু উঁচু নয় যে পাথর গড়িয়ে দিলে শত্রুরা ঘায়েল হবে। এতে বরং বিপদ বাড়বার সম্ভাবনা। শত্রুরা আহত হবে, ক্ষেপে গিয়ে আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

কী আর করি। অগত্যা থেমে গেলাম। নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, নিজেরা নিজেদের মারছি।

বেশিক্ষণ অবিশ্যি দাঁড়ানও গেল না। কে যেন জোর করে আমাকে ঠেলে দিল। আমি খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম।

খানিকদূর গড়াতেই দেখি, আটকে গেছি; লতার জালে।

ভাবলাম, আপাততঃ নিশ্চিন্ত। এই লতাকে আশ্রয় করেই খানিক জিরিয়ে নেয়া যাক। হাঁপাতে লাগলাম। খাড়া একটা পাথরের ওপর অতি কষ্টে হেলান দিয়ে ডাগর ডোগর দু'টো লতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম।

ওদিকে নীচে তখন তাণ্ডব। এক একজন গড়িয়ে পড়ছে আর দানবদের মধ্যে লাগছে হুড়োহুড়ি।

দেখতে দেখতে রক্তাক্ত হয়ে উঠল নীচের জলাভূমি; আর উপরের ঢিবিমত জায়গাটা, একটু আগেই যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, ক্রমশ যেন শূন্য হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম, ওখানে মাত্র একজন; টলছে, ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না।

আমি ওকে ইসারা করে ডাকলাম। আভাস ইঙ্গিতে বোঝালাম, নেমে এসো। এই আমাদের সুযোগ। দানবদের হাত এড়িয়ে এইবার আমাদের পালাতে হবে।

ও আমার কথা রাখল। টলতে টলতে নেমে এল। এবং অবশেষে আমরা দু'জন দানবদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচলাম।

না না, শত্রুরা খেয়াল করেনি আমাদের। এত খাদ্য ওরা পেয়েছিল যে আধ মরা অপদার্থ দু'টো শিকার পালিয়ে গেলেও ওদের কিছু যায় আসেনি।

কী জানেন, এইভাবে দিন কাটতো; সম্পূর্ণ প্রতিকূল আবহাওয়ায়। জলে ডাঙ্গায় গুহায় পাহাড়ের চূড়ায় কোথাও সোয়াস্তি নেই।

একদিন টিলা মতো একটা পাহাড়ের ছায়ায় বসে আছি। একা নয়, সদলবলে আছি। দিব্যি নিশ্চিন্ত সবাই। খানিক আগে সূর্য পূজা হয়ে গেছে। জটলা চলছে, আগামী উৎসবে নতুন কী কী আয়োজন হবে, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, দূরে—বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গল এলাকা দুলছে, অস্বাভাবিক রকম দুলছে।

এইখানে জঙ্গল সম্পর্কে একটু বলা দরকার। সে আমলের জঙ্গল মানে আদিম ও ভয়ঙ্কর কিছু। একালে ঠিক সে ধরনের বস্তু নেই বললেই চলে।

অজস্র লতাগুল্ম, গাছ-গাছালি, জলাভূমি আর জন্তু জানোয়ারে মিলে ওরা ছিল অদ্ভুত ও রহস্যময়। এমনকি দিনে ওখানে আলোক ঢুকত না। বর্ষণ জোরদার না হলে ওখানকার তলদেশ অবধি কখনও জল পৌঁছুত না।

অতএব জঙ্গল দুলছে মানেই বিপদের ইঙ্গিত। ওখানকার অতিকায় অতিথিদের মধ্যে কেউ হয়তো বাইরে আসবে।

আমরা কান খাড়া করে বসে রইলাম। হ্যাঁ, আসছে সে। ঐ তো, জঙ্গল থেকে বেরোল।

আগুন জ্বালো, তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালো; না হলে আর রক্ষে নেই।—দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। কিন্তু বলেছি আগেই, আগুনের ব্যবহার তখনও ঠিক চালু হয় নি। কালে-ভদ্রে পাথর ঠুকে ঠুকে দু'একজন আগুন জ্বালাত নেহাৎ-ই খেলার ছলে, তামাসার অছিলায়।

অবিশ্যি এই খেলা আর তামাসা থেকেও অনেকে বুঝে গিয়েছিল, বেশির ভাগ জানোয়ার আগুনকে ভয় ভয় পায়। তাই বিপদের মুহূর্তে আগুনের চিন্তা অনেককে ভাবিয়ে তুলল। পাথর ঠুকে ঠুকে আপ্রাণ চেষ্টা

হল আগুন জ্বালাবার।

কিন্তু না, তবু কাজ হয়নি কিছু উপযুক্ত বুদ্ধি ও ইন্ধনের অভাবে তাড়াতাড়ি আগুনের কুণ্ড গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই জানোয়ারটা বিনা বাধায় আরও খানিকদূর এগোল।

আমরা বেগতিক বুঝে প্রাণভয়ে ছুটলাম। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। কে যে কোনদিকে ছুটছি, তার হুঁশ নেই।

ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম এক নদীর প্রান্তে। বিরাট নদী। বাঁক ফিরে ফিরে এগোচ্ছে।

ঐ নদীই শেষ অবধি আমাদের বাঁচিয়ে দিল। জানোয়ারটা ওর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করল খানিকক্ষণ। নিষ্ফল আক্রোশে কত কী অঙ্গভঙ্গী করল।

আমরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনেকার পাহাড় বেয়ে উঠলাম। লক্ষ্য, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন আশ্রয়।

কিন্তু হায়। 'নিরাপদ' বলে সত্যি কি কিছু ছিল? এমন কি গাছের মগডালে বসেও শান্তি ছিল কারও?

অনুক্ষণ উৎপাৎ। সরীসৃপ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অত্যাচার।

সরীসৃপের দল এমনকি দৈত্যকায় গাছের মগডালেও অভিযান করত।

একবার—। এইরকম এক সরীসৃপের হাতে পড়েই—

না না, ভাবতে পারি না আর। ওর সেই বীভৎস চাউনি আর সর্বনাশা চেহারা আজও আমাকে আতঙ্কে বিহ্বল করে।

ধীরে ধীরে গাছ বেয়ে সে উঠল। একটা ডালকে মাঝখানে রেখে আমায় বেষ্টন করল; এবং তারপরেই চাপ, প্রচণ্ড চাপ। যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগলাম।

চেষ্টা করেছি, আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বাঁচবার। কিন্তু সব বৃথা। সে যেন সম্মোহিত করল আমাকে। চুম্বকের মতো তার কাছে টানল। তাকে দেখে এক ডাল থেকে অন্য ডালে গেলাম। নীচে নামবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব আয়োজন নিষ্ফল। নামবার মুখেই হঠাৎ সে আমায় বন্দী করল। বরফের মতো শীতল তার দেহ; সে ওটা আমার দেহের উপর ফেলল। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে একটা ডাল ধরে সামলে নিলাম নিজেকে। কিন্তু হায়। ততক্ষণে সে আমায় বন্দী করেছে। কোমর বরাবর একটা বেষ্টন রচনা করে বুক বরাবর দ্বিতীয় আর একটা রচনায় ব্যস্ত।

আমি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলাম। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই বাঁধনকে চাইলাম আলগা করতে। কিন্তু লাভ কিছু হল না। উল্টে সেই বাঁধন আরও মারাত্মক হতে লাগল।

দেখতে দেখতে পুরোপুরি বন্দী হলাম আমি। এবং তারপরেই, সেই চাপ, প্রচণ্ড চাপ। যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগলাম।

দম বন্ধ হয়ে এলো। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘাম ঝরল দরদর করে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

এরপর—

না না, এরপর আর কিছু মনে নেই। সব অন্ধকার অস্পষ্ট রহস্যময়।

এর আগের ঘটনা মনে পড়ে, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখার মতো।

আমি তখন মানুষ নই। গরিলা শিম্পাঞ্জী বা গিবনও নই। প্রায় সে জাতীয় একটা জীব। গাছের চেয়ে মাটিই আমার বেশি প্রিয়। সামনের দু'টো পা'কে হাতের মতো ব্যবহার করি। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। স্বাধীন উন্মুক্ত জীবন। নিষেধ নেই, শাসন নেই, আইন নেই, বাঁধন নেই। যখন যেখানে ইচ্ছে খাই। ঘুমোও যাই। অভাব নেই খাবারের। বনবাদাড় ফলে ফলে ভরপুর।

শত্রু সে আমলেও অবিশ্যি ছিল। খোলা জায়গায় আকাশ থেকে বিপদের সম্ভাবনা; রাক্ষুসে পাখিদের উপদ্রব।

তবে স্থলচর জীবদের কেউ আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। এত ক্ষিপ্র ছিলাম আমরা, এত বেশি চটপটে ছিলাম যে ওরা আমাদের মতলব টের পেতে না পেতেই আমরা গা ঢাকা দিতাম।

তবে ওদের থেকেও কোনদিন কোনো বিপদ হয়নি, তা নয়। একবার—একটু হলেই ওরা আমাকে পিষে ফেলতো।

আমি তখন জঙ্গল থেকে সবে বেরিয়েছি। বিরাট এক পাহাড়ী নদীতে নেমে জল খাচ্ছি। হুঁশ ছিল না, আরও যে অনেকে এদিকে আসতে পারে। নদীর ধারে ফাঁকা জায়গা পেয়ে স্থলচর দানবরা হঠাৎ আমাকে ঘিরে ফেলতে পারে, এ আমি কল্পনাও করিনি।

প্রাণভরে জল খাচ্ছিলাম। দারুণ তৃষ্ণার্ত তখন। দিনভর দাপাদাপি গেছে; জল খাইনি; খাবার ফুরসৎ পাই নি। শেষকালে জঙ্গলের একপ্রান্তে ফাঁকা মাঠের বুক-জোড়া বিরাট এক নদী দেখে ভাবলাম, জিরোই একটু। ঐখানে নেমে তেষ্টা দূর করি।

ঢক ঢক করে জল খাচ্ছি। খানিক বাদে বাদে জিরোচ্ছি একটু। আহা! কী ঠাণ্ডা জল! সারা দেহ জুড়িয়ে গেল। কেমন যেন ঝিমুনি এলো একটু। বসে বসেই খানিক বিশ্রাম নিলাম।

সে সময় অদ্ভুত কিছু শব্দ কানে আসছিল। যেন কা'রা গর্জন করছে, এগোচ্ছে আমার দিকে।

ভাবলাম, না না; ও কিছু নয়। গর্জনটা আসলে নদীর।

কিন্তু তবু, কেন জানি না, সন্দেহ হল একবার। ভাবলাম, পিছন ফিরে তাকাই। তাকাতে যাবো, এমন সময়—ঠিক এমন সময়—আমার গায়ে লাগল গরম এক ঝলক হাওয়া।

কী সর্বনাশ! হঠাৎ হল কী?—ঝড়ের বেগে মুহূর্তের মধ্যে পিছু ফিরে দেখি, বিরাট এক দানব। আমার ঠিক পেছনে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হাতের কাছে শিকার পেয়ে জিভ লকলক করছে তার।

তখুনি বুঝে নিলাম, গরম হাওয়াটা আসলে ওরই নিঃশ্বাস।

আঁৎকে উঠলাম। ভয় পেলাম ভীষণ। ওই দানবটাকে পাশ কাটিয়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু তার বুঝি উপায় নেই আর। যেদিকে যাই, সেদিকেই ওরা। দল বেঁধে এসেছে। আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে

পুজো বছরে একবারই আসে

এমন সুযোগও আসে একবার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

১৪২ তম খেলা (ডিসেম্বর উপহার) ৫.১১.৭৭

প্রথম পুরস্কার : একটি :
২,৫০,০০০ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার : একটি : ২৫,০০০ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার : দু'টি : প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
(প্রতি সিরিজে একটি)

চতুর্থ পুরস্কার : প্রতিটি ১০০০ টাকা
(১০,০০০ টিকিটে একটি)

পঞ্চম পুরস্কার : প্রতিটি ১০০ টাকা
(১,০০০ টিকিটে একটি)

ষষ্ঠ পুরস্কার : প্রতিটি ৫০ টাকা
(১,০০০ টিকিটে একটি)

লাকি ডিপ (বিক্রেতাদের জন্য) : প্রতিটি ৫০ টাকা (১০,০০০ টিকিটে দু'টি)

TCW/88L&S/77

ফেলেছে। ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস থেকে-থেকে গায়ে লাগছে-এসে।

বুঝে নিলাম আর উপায় নেই বাঁচবার। সামনে দানব, পেছনে নদী ভুলের খেসারত দিতেই হবে।

সেদিন, যখন বাঁচবার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছি, তখন হঠাৎ এক বুদ্ধি এলো মাথায়। ভাবলাম, আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় ?—দানবরা দাঁড়িয়েছে নদীর পাড়ে। আমি যদি তীর ধরে ছুটি ? নদীর জলের একেবারে গা ঘেঁষে ছুটে পালাই যদি ?

ব্যাস। যেমন ভাবনা ঠিক তেমনি কাজ। পালালাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে। দানবরা তাদের বিরাট দেহ নিয়ে নদীর একেবারে তীর অবধি আসতে আসতে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে।

এই একবার ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি। এরপর আরও একবার বেঁচে গিয়েছি অল্পের জন্য।

সেবার—। গহন অরণ্যের একেবারে মাঝখানে। কী যেন ফল খাচ্ছিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে তা যেন নড়ছে। খুব ধীরে ধীরে নড়ছে।

লাফাতে চাইলাম তখুনি, এই অস্বস্তিকর হালটা সামাল দেবো বলে। কিন্তু হায় ঈশ্বর। পারলাম না লাফাতে। আমার পা আঠা জাতীয় কী একটা পদার্থের সঙ্গে আটকে গেছে।

কী ? আসলে ওটা কী—ভালো করে তাকাতেই দেখি, রাক্ষুসে এক জানোয়ারের পিঠ। ধীরে ধীরে তা উঁচু হয়ে গেছে। এবং তারপর, নেমেছেও ধীরে ধীরে। পিঠের ওপর অসংখ্য কুঁজ, দিব্যি সারবাঁধা। মোট ছুটি সার।

কী আশ্চর্য। দু'টো ঐরকম সারের মাঝখানে কুঁজের মধ্যে আমি বন্দী। বার বার চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। এদিকে জানোয়ারটা আমাকে নিয়েই এগোচ্ছে।

অবিশ্যি আমিও জানোয়ার তখন। হিংস্র, ভয়ঙ্কর। তাই সহজে হাল ছাড়ি নি। কামড়ে আছড়ে ঐ রাক্ষসটাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি।

কিন্তু তা হলেও পারব কেন ? ওর তুলনায় আমার শক্তি কতটুকু। আমার আকৃতি বড় জোর একটা গরিলার মতো। আর, ও আমার মত অমন শ'খানেক জীবকে গিলে খেতে পারে।

হাল ছাড়িনি তবু। চেষ্টা করেছি। প্রাণপণ।—

এদিকে জানোয়ারটা তখন এগোচ্ছে। আমাকে পিঠে নিয়েই চলতে শুরু করেছে দিব্যি। জঙ্গলে মচ মচ শব্দ। ওর চলার দাপটে অজস্র গাছ ভেঙে লুটোচ্ছে। অসংখ্য লতাপাতা আর ঝোপঝাড় তছনছ হচ্ছে। যেন তাণ্ডব। তামাম অরণ্যকে গুঁড়িয়ে না দিয়ে শয়তানটা থামবে না।

এদিকে আমি তখন টলছি। দু'হাত আর দু'পায়ের ওপর ভর দিয়েও টাল সামলাতে পারছি না।

শয়তানটার কিন্তু ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাকে পিঠে নিয়ে এগোল।—

এবার জঙ্গল আরও ঘন। আগের তুলনায় আরও নিবিড়। জায়গায় জায়গায় রীতিমত অন্ধকার। কিছুই ঠিক চোখে পড়ে না। অনেক উঁচুতে গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে সূর্যের সামান্য যে আলোক এসে পড়ছে তাতে এখানকার ভয়াবহতা বাড়ছে বরং এতটুকুও কমছে না।

আঁৎকে উঠলাম,—কী সর্বনাশ। এ আমি কোথায় চলেছি। কোন্ ভয়ঙ্কর গুহায়।

খানিক বাদেই দেখি, ভয়ঙ্কর একেবারে সামনে। একটা নয়, কয়েকটা এক সঙ্গে। দেখেই চিনলাম, এরা এই শয়তানটার সগোত্র। প্রায় এরই মতো এরা দেখতে। তবে আকারে আরও অনেক ছোট।

হয়তো এরই ছেলেপুলে এরা, নয়তো নাতিপুতি। পিঠে শিকারকে বন্দী করে এই শয়তান এতক্ষণে নিজের আড্ডায় ফিরে এলো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এলো যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আধো আলো আর আধো আঁধারের মধ্যেও স্পষ্ট দেখছি, আড্ডার ঐ খুদে শয়তানগুলো আমারই দিকে এগোচ্ছে।

তবে কি আর পরিত্রাণ নেই ? ওরা আমাকে ছিঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলবে ?

যখন জীবনের সব আশাই এক রকম ছেড়ে দিয়েছি, তখন হঠাৎ দেখি, আমার ঠিক সামনেই এক লতা। বিরাট লতা, মাথার উপর ঝুলছে।

মুহূর্তের মধ্যে ঐ লতাটাকে আঁকড়ে ধরলাম। প্রাণপণে টানলাম ওটা।

কী আশ্চর্য। সঙ্গে সঙ্গেই আমি মুক্ত। আঠা জাতীয় যে পদার্থ জানোয়ারটার দুই কুঁজের মাঝখানে এতক্ষণ আমাকে বন্দী করে রেখেছিল, প্রচণ্ড টানের দাপটে তার জারিজুরি আর টিকল না। আমি লতাটাকে ধরে ঝুলতে ঝুলতে ওপরে উঠে গেলাম।

ব্যাস। এরপর আর পায় কে। বিজয়ী বীর আমি। খানিক বাদেই নিরাপদ আশ্রয়ে।

অবিশ্যি নিরাপদ বলতে কী বা তখন ছিল। অনুক্ষণ ভয় আতঙ্ক আশঙ্কা। মারাত্মক সব জন্তুদের উৎপাত। আমাদের বাড়তি সুবিধের মধ্যে শুধু এই যে আমরা দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাত দু'টোকে আত্মরক্ষার কাজে নানাভাবে ব্যবহার করি, দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দি অনেকটা দূর অবধি।

দৃষ্টির এই বাড়তি ক্ষমতাই ছিল আমাদের শক্তির উৎস। বলতে কী, বুদ্ধিতে কেউ আমাদের সঙ্গে পেরে উঠত না। রাক্ষুসে সব জানোয়াররা বুদ্ধির খেলায় যখন-তখন হার মানতো আমাদের কাছে।

একবার। হাতির চেয়েও বিশাল এক জানোয়ার আমার পিছু নিল। দেখতে অদ্ভুত ছিল সে। যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিরাট। তার দেহের সঙ্গে হাতির মিল। তবে সামনের দু'টো দাঁত অপেক্ষাকৃত বড়। পাগুলোও তাই; বড় এবং মোটা। তার সারা গা ঘন লোমে ঢাকা। লোমগুলো গা বেয়ে ঝুলছে।

জানোয়ারটা আমার পিছু নেবার কারণ, আমি ওর মহল্লায় ঢুকে পড়েছিলাম। ফলন্ত কোনো গাছে হাত দিয়েছিলাম আর কি।

হঠাৎ ও তেড়ে এলো। বন বাদাড় কাঁপিয়ে পিছু নিল আমার। আমি

রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম। জঙ্গলাকীর্ণ বিপদ-সংকুল পথ ধরে ঝড়ের বেগে এগোলাম। আমার দেহে নানা জায়গা ছড়ে গেল। দর দর করে রক্ত ঝরল। বারবার হোঁচট খেলাম। পড়ে গেলাম। কিন্তু তবু, ভ্রূক্ষেপ নেই আমার। ছুটছি তো ছুটছিই।

বেশ খানিকটা করে ছুটবার পর আমি এক মুহূর্ত পিছন ফিরে তাকাই। কিন্তু প্রতিবারই একই দৃশ্য আমার সামনে। দেখি যে, জানোয়ারটা ঠিক আমরা পিছু পিছু আসছে।

শেষকালে নিরুপায় হয়ে ফন্দী আঁটলাম একটা। জল এবং কাদায় ভরা এক ডোবার দিকে ছুটলাম।

ডোবাটা আমার বহুকালের চেনা। ওর এখানে সেখানে আলগা পাথর, কোনোমতে কাদার উপর দাঁড়িয়ে। আমি স্বচ্ছন্দে পাথরগুলোর উপর পা রেখে ডোবার মাঝখানটায় চলে যেতে পারি; কিন্তু ভারী কোনো জানোয়ার তা পারবে না। সে ও কাজ করতে গেলে হয় জলে পড়বে, আর নয়তো পাথর সমেত কাদায় ডুববে।

ব্যস, যেমন ভাবনা ঠিক তেমনি কাজ। আলগা পাথরে পা রেখে রেখে ডোবার ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওদিকে জানোয়ারটা ডোবার তীর অবধি এসে গেছে। থমকে দাঁড়িয়েছে একটু। হুঙ্কার ছাড়ছে।

সে কী বিকট আওয়াজ। সারা বনভূমি যেন থর-থর করে কাঁপছে। ডোবাটা দুলছে।

যদিও জানতাম, ডোবার জলে জানোয়ারটা সহজে নামবে না, তবুও কেন জানি না, প্রচণ্ড ভয় হল। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এক্ষুণি সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হয়তে বা পিষে মেরে ফেলবে আমায়।

এদিকে সে করল কী, খানিকক্ষণ হুঙ্কার ছাড়ার পর নিষ্ফল আক্রোশে তার সামনেকার পা দুটো দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, ধুলো উড়ছে, ডোবার জলে ঝুপ ঝুপ করে গড়িয়ে পড়ছে রাশি রাশি মাটি আর পাথর। এখানেই শেষ নয়। ঢেউ উঠছে থেকে থেকে। বড় বড় ঢেউ; ডোবার বুকে পাথর আর মাটির চাঁই নেমে আসবার সুবাদে।

ঢেউয়ের আঘাতে আলগা পাথর গুলোর অধিকাংশই বারবার জলে ডুবল। যে পাথরটার ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তা'ও বাদ গেল না। ঘন ঘন ডুবল সেটা; আমার হাঁটু অবধি জলে ভিজে গেল।

ভাবলাম, একটা কিছু করা যাক। জানোয়ারটা যা'তে ভয় পায় সে জন্যে চেষ্টা চরিত্তির করতে দোষ কী।

এবার আলগা পাথরগুলোর মধ্য থেকে দু'-চারটে বেছে নিলাম। জানোয়ারটাকে তাক করে ছুড়লাম।

কিন্তু এতে ফল দাঁড়াল ভয়ঙ্কর। সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেল। শুঁড় দিয়ে ডোবা থেকে জল উঠিয়ে নিয়ে আমাকে তাক করে ছুঁড়ল।

আমি তখন একেবারেই অসহায়। পালাতে পারছি না; দাঁড়াতেও না। এত প্রচণ্ড বেগে জল এসে আমার গায়ে লাগছে যে বার বার মনে হতে লাগল দেহটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না, তবু হার মানি নি। শেষ অবধি বাঁচার লড়াই চালিয়েছি।

কী খেয়াল হল হটাৎ, খানিক উঁচু মত একটা পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসলাম। মাথটা খুব সাবধানে নীচু করলাম একটু, যা'তে না শয়তানটা জল ছুড়ে আমাকে ঘায়েল করতে পারে।

হ্যাঁ, কাজ হল এতে। খানিকক্ষণের জন্যে হলেও জল ছোড়া বন্ধ হল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার যে-কে সেই। সেই রুদ্রমূর্তি আবার। শয়তান হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। তামাম বন ভূমিতে নেমে এলো বিভীষিকা।

ভাবলাম, পালাই এবার। যেমন করে হোক, ডোবার ভিন্ন এক তীর ধরে আত্মরক্ষার পথ খুঁজি। শয়তানটা কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না।

পালাতে যাবো, ঠিক এমন সময় নতুন বিপদ। হঠাৎ মনে হল, ডোবার জল ফুলে উঠল, আর আমি যেন সেই জলে তলিয়ে গেলাম।

অনেক কষ্টে জলের উপর মুখ তুলে দেখি, জানোয়ারটা ডোবায় নেমেছে; আর তাইতেই এই তুলকালাম কাণ্ড। কিন্তু সেতো জলচর নয়।

আমার নাগাল পাবে কী করে?

ভাবতে ভাবতে ডাঙার দিকে এগোলাম। ডোবার তীরে এসে দাঁড়ালাম।

এবার আশ্চর্য এক দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখলাম, জানোয়ারটার পা ডোবার কাদায় আটক। আধ-ডোবা অবস্থায় ছটফট করছে সে। শুঁড়টাকে অনেক কষ্টে জলের ওপরে তুলে কী যেন বোঝাতে চাইছে।

জানতাম, ওর এই পরিণতি। বুদ্ধির খেলায় ওর মতো নির্বোধ জানোয়াররা ঠিক এভাবেই আমাদের কাছে হার মেনেছে। কাদাভর্তি কোনো নদী নালা বা ডোবায় কোনোমতে ওদের একবার নামাতে পারলেই হল। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনে ওরা। নির্ঘাত আনে। কারণ, ওরা মোটে সাঁতার জানে না। এদিকে দেহ যে ভারী, কাদায় আটকে গেলে ছাড়া পাওয়া যে ওদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, সে বুদ্ধিও নেই। তবে এ সয়তানটার সঙ্গে অন্যদের তফাৎ এই যে ও আমাকে বেগ দিল একটু। অন্যদের মতো হুড়মুড় করে জলে না নেমে খানিকক্ষণ অন্ততঃ ভয় দেখাল।

এদিকে আমি তখন নতুন এক দৃশ্য দেখছি। ডোবার তীরে এক গুহার আড়ালে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করছি, আশে পাশের অরণ্যে চাঞ্চল্য। আ কা শে বা তা সে ত ৎ প র তা। জানোয়ারটার অন্তিম দশা যে আসন্ন তা যেন মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র রটে গেছে। সবাই আসছে ওর খোঁজ নিতে। না না, খোঁজ নিয়ে ওকে সাহায্য করার মতলব কারও নেই। ওর দেহটা ভাগ-বাঁটোয়ারার চিন্তাতেই সবাই মশগুল।

দেখতে দেখতে বিরাট এক পাখি এলো। ওর শুঁড়ের খানিকটা খুবলে নিয়ে শোঁ শোঁ করে পালাল। তারপর এলো বিরাট কয়েকটা সরীসৃপ। দেখতে অনেকটা কুমীরের মতো। ওরা ওর দেহটাকে ডোবা থেকে টেনে তুললো এবং তারপর মহোৎসব শুরু করল রীতিমত।

এই একবার;—এবং এছাড়া আরও

যে কতবার হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছি, সীমা সংখ্যা নেই তার।

মনে হয়, সবই যেন এই সেদিন—এই দিন কয়েক মাত্র আগেকার ঘটনা। যেন এখনও স্মরণ করতে পারছি সব। স্পষ্ট পারছি। হিংস্র জানোয়ারদের উপদ্রব, নিষ্ঠুর প্রকৃতির রুদ্ররোষ—সব কিছু ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে।

প্রকৃতির খেয়ালের কথা কী আর বলবো। সে যুগে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন লেগেই থাকতো। বেশীর ভাগ প্রাণীই জানতো না, কী করে এদের হাত থেকে বাঁচতে হবে।

অবশ্যি সঠিক আমরাও যে কিছু জানতাম, তা নয়। তবে অনুমানে, অভিজ্ঞতায় এবং ঐ যে একটু আগে বললাম, দৃষ্টির বাড়তি ক্ষমতা—এদের দৌলতে জীবনসংগ্রামে আমরা অন্যদের তুলনায় পটু ছিলাম।

অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলি। আগে মাঝেই দেখতাম, উঁচু এলাকাগুলো কাঁপছে। বিস্ফোরণ ঘটছে ওদের শিখরে। নিমেষের মধ্যে কত কী ছিটকে বেরিয়ে যেন প্রলয় সৃষ্টি করছে।

আমরা সদা সতর্ক। ঐ সব উঁচু জায়গাগুলোকে এড়িয়ে চলতাম। কোনো জায়গা সামান্য একটু কাঁপছে টের পেলেই ভিন্নদিকে পালাতাম। ভিন্ন দিকে মানে নীচু এলাকায় নয়, উঁচু অন্য কোনো জায়গায়। অন্য সব প্রাণীরা এত কিছু বুঝতো না। বিপদের আঁচ পেলেই দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতো।

আজও যেন দেখতে পাই আমি, ওরা ছুটছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগোচ্ছে গলিত লাভাস্রোত, ওরা ক্রমেই সে স্রোতের মুখোমুখি হচ্ছে।

দেখতে দেখতে জ্বলেপুড়ে শেষ হল কেউ কেউ, কেউ বা লাভাস্রোতের তলায় চাপা পড়ল; কিন্তু তবু শিক্ষা হল না অন্যদের। দেখেও ওরা শিখল না, বিপদ কখন কোন দিক থেকে আসে।

প্লাবনের সময় হামেশা ওরা ভেসে যেত। কিন্তু আমরা তখন উঁচু জায়গায়, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে।

অবশ্যি আমরা যে প্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের তাৎপর্য বুঝতাম, তা কিন্তু নয়। প্রাকৃতিক এসব বিপর্যয়ের কার্য কারণ সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না আমাদের। আমরা শুধু দেখতাম এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সতর্ক হতাম।

অগ্ন্যুৎপাত আমাদের কাছে ছিল বিরাট এক রহস্য। কেন তা হয়, তার কিছুই বুঝতাম না। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। আজ ওদের ফিরিস্তি দিচ্ছি দেখে যেন ভাববেন না, সবই সেদিনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ। আসলে মেমোরিল এর দৌলতে সেদিনের অভিজ্ঞতাকে আমি আজকের প্রজ্ঞা দিয়ে যাচাই করছি। একাল সেকাল আজ আমার মুখোমুখি!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, প্লাবনের কথা; কী ভীষণ, আর ভয়ঙ্কর! বড় বড় গাছপালাকে কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাক্ষুসে জানোয়ারদের দৌরাত্ম্য মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে।

অবশ্যি জানোয়ার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনতো নিজেদের দোষে। সর্বনাশ এগিয়ে আসছে দেখেও সতর্ক হ'ত না।

একবার। আমরা তখন পাহাড় ঘেরা এক সমতলভূমিতে, মানে উপত্যকায়। আমাদের আশে পাশে অরণ্য। হঠাৎ দেখি, অরণ্যে জল ঢুকছে। হুড় হুড় করে প্রচণ্ড জলস্রোত উপত্যকায় আছড়ে পড়ছে।

বুঝলাম, নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন। বিপদ একেবারে সামনেই।—

কিন্তু তখন আর ভাবনার সময় নেই। প্রাণপণে ছুটলাম; উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড় বরাবর।

পাহাড় বেয়ে খানিকদূর উঠে দেখি নীচে প্রলয়। জলস্রোত এরমধ্যে আরও বেড়েছে। গোটা উপত্যকা এলাকাটা জলে থৈ থৈ।

কিন্তু হঠাৎ এত জল এলো কোত্থেকে?—কিছুই ঠাওর করতে না পেরে আরও এগোলাম; খুব সাবধানে পাহাড় বেয়ে নেমে আসা জলস্রোতকে একপাশে রেখে।

বেশ খানিকদূর যাবার পর দেখি, এ যে নদী! প্রবাহ আটকে বেসামাল। সামনের পাহাড় থেকে পাথরের স্তূপ পড়ে তার স্রোত গেছে আটকে। এই পথ বদল করছে সে। ভিন্ন একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উপত্যকায় নামছে।

কিন্তু ঐ উপত্যকায় যে অজস্র জীবের বাসস্থান! কেমন আছে ওরা, কী করছে, দেখা যাক।

আবার এগোলাম। নদীস্রোতকে একপাশে রেখে উপত্যকার কাছাকাছি একটি জায়গায়। দিব্যি উঁচু সেই জায়গাটা: বলতে গেলে পাহাড়ের চূড়ায়।

কিন্তু হায় ঈশ্বর, কী দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে?—

চরম সর্বনাশ ও বিভীষিকা শুধু। দেখতে দেখতে তামাম এলাকাটা জলে ডুবল। অতিকায় জানোয়ারদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল। জলস্রোত কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত গ্রাস করল। কিন্তু জানোয়ারদের হুঁশ নেই তবু। পাহাড় বেয়ে খানিকদূর উঠলেই যে প্রাণে বাঁচবে, সে বুদ্ধি নেই। বরং ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত। জলস্রোতের দাপট সহ্য করতে না পেরে নিজেরা নিজেদের দোষারোপ করছে। ভাবছে, এ-ও এক ধরনের আক্রমণ, জন্তু জানোয়ারদের তরফ থেকে।

কী নির্বোধ, কী নির্বোধ ওরা! বিপদের মুহূর্তে বাঁচবার চেষ্টা না করে মরতে চায়! আত্মহত্যার পথ খোঁজে! প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে ওরা পেরে উঠবে কেন?

না না, পারল না। সেদিন ঐ উপত্যকার শেষ অতিকায় জানোয়ারটি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হল। স্পষ্ট দেখলাম, জল বাড়ছে ক্রমশ। তামাম এলাকাটা হ্রদ হয়ে উঠছে। আকাশ-উঁচু গাছগুলোর মাথা পর্যন্ত জলের তলায়।

কিন্তু তবু বলবো, এখানেই সব নয়। এর পরের ঘটনা আরও মর্মান্তিক—খানিক বাদে জানোয়াররা ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠল। যেন বিরাট একটা জলাশয়, তার এখানে-সেখানে কিছু ভাসমান দ্বীপ।

মনে পড়ে, একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম এই বিপর্যয়। আরও দেখেছিলাম, দূরের আকাশ হঠাৎ যেন কালো হয়ে গেল। চারিদিক কাঁপাতে কাঁপাতে মূর্তিমান একদল বিভীষিকা এগিয়ে এলো নতুন গড়ে-ওঠা হ্রদটির দিকে।

ওরা কা'রা?— ভালো করে তাকাতেই দেখি, রাক্ষুসে এক ঝাঁক পাখি। খাবারের সন্ধান পেয়ে দল বেঁধে এসেছে।

ভয়ে আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেলাম। কোনোমতে একটি গুহায় লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করলাম। আর ওদিকে তোমাম হ্রদ জুড়ে ভোজসভা। পাখির দল মৃত জানোয়ারগুলোকে খুবলে খুবলে খেল। আবার কেউ বা খাবারের খানিকটা উঠিয়ে নিয়ে উড়ল তৎক্ষণাৎ।

কী বিরাট ওই পাখিগুলো। আমার মতো অন্ততঃ দশ-বিশটি জীবকে এক মুহূর্তে নিকেশ করতে পারে। ওদের ডানার ঝাপটাও কী ভীষণ। যেন আমাকে উড়িয়ে দেবার শক্তি রাখে।

লক্ষ্য করলাম, ওদের ডানা ঝাপটানোর দৌলতেই পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট বড় অনেক পাথর গড়িয়ে পড়ছে। হ্রদের জলে টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ শব্দ।

সেদিন একমনে লক্ষ্য করছিলাম সব কিছু। এমন সময় যে পাহাড়টায় আমি দাঁড়িয়ে হঠাৎ তা প্রচণ্ডবেগে কাঁপতে লাগল। গুহার একপাশের পাথর আলগা হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল হঠাৎ। মনে হল, যেন ভিন্ন আর একটা পাহাড়, আমার ঠিক গুহার উপরে আছড়ে পড়ল। ভালো করে তাকাতেই দেখি, হ্যাঁ, পাহাড়ই বটে। বরং তার চেয়েও কিছু বিরাট।

আসলে আফ্রিকায় এক পাখি ঠিক আমার গুহার পাশটিতে। খানিক আগে পাহাড়ভূমিতে ওই নেমে আসে বোধ করি। ওরই দাপটে তামাম এলাকায় কম্পন।

কিন্তু কত বড় পাখী ওটা? কতখানি বিরাট? তার একটা পায়ের পাতা মাত্র দেখতে পাচ্ছি; এবং আমার তো ধারণা, শুধুমাত্র সেই পাতার ওপরেই আমার ধরনের গোটা কয়েক জীব শুয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু না, জায়গাটা বিপজ্জনক। শোয়া ঠিক হবে না। পাতায় গায়ে বিরাট বিরাট সব নখ। আমাকে ছিঁড়ে খাবার পক্ষে ওদের ওই একটিই যথেষ্ট।

ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হলাম এবার। বারবার মনে হল, আর রক্ষে নেই। দানবটা এখুনই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু না, কিছুই করল না ও। পায়ের পাতার ওপর খুব জোরে একটা চাপ দিয়ে আকাশে উঠে গেল। ও যখন উঠছিল, আমার আশেপাশে তখন ধুলোর ঝড়। রীতিমত তুফান। বুঝলাম, দানবের ডানা-ঝাপটানোর দৌলতেই এই অঘটন।

এদিকে ঝড়-তুফানের রহস্য বুঝতে না বুঝতেই নতুন বিপদ। আমি যে গুহায় ছিলাম, তার সংলগ্ন আরও কয়েকটা পাথর হঠাৎ আলগা হল। তারপর হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল ওরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার উপরেও কি পাথর পড়েছিল? খেয়াল নেই, হুঁশ নেই। শুধু এই টুকু মনে আছে আমি পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াচ্ছি, অতি দ্রুত নেমে আসছি নতুন গড়ে ওঠা হ্রদটির দিকে।

তারপর—

না না, আর কিছু মনে নেই। সব অন্ধকার, ঝাপসা। আকাশ-পাতাল জোড়া বিরাট এক অন্ধকার পুরী আমার সামনে দিয়ে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখি, অতিকায় এক জীব আমি; আপনারা যা'কে বলেন ডাইনোসারাস। সে-জীবনে আমার আকৃতি প্রকৃতি সবই ভয়ঙ্কর। হিংসার দহনে সারাক্ষণ আমি জ্বলেপুড়ে মরি। ইচ্ছে হয়, সব কিছু গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দি।

দিতামও। এই সুন্দর সৃষ্টির কত কিছু যে অকারণে ধ্বংস করেছি, সীমাসংখ্যা নেই তার।

জীবিত কোনো প্রাণী দেখলেই মাথায় খুন চাপতো। ওকে একেবারে শেষ না করা অবধি সোয়াস্তি ছিল না আমার। অথচ দেখুন মজা, মাংস খেতাম না। ছিলাম তৃণভোজী।

আমার জ্ঞাতিভাইরা কেউ কেউ অবশ্যি মাংসাশী ছিল। কিন্তু ওরা আকারে আমার চেয়ে অনেক ছোট।

কী বলবো, বিরাট আকারের জন্যই আমার ছিল মারাত্মক ক্ষুধা। দিনরাত খেয়ে খেয়েও আশ মিটতো না।

এদিকে খাবারও তখন অঢেল, অজস্র। ঘন অরণ্য, সবুজ ঘাস চারিদিকে। বড় বড় গাছের মগডাল পর্যন্ত আমার নাগালের মধ্যে। কোনো অসুবিধে নেই, দাঁড়িয়ে মুখ বাড়ালেই হল, রাশি রাশি খাদ্য জিভের একেবারে ডগায়।

তবে জিভটা দেহের তুলনায় ছোট। মাথাটাও তাই। দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম ছোট।

কী আশ্চর্য! এ জন্যেই কি ডাইনোসারাস জীবনে বুদ্ধি এত কম ছিল আমার? মাথায় ছোট বলেই জ্ঞান গম্যিও ছিল সামান্য?

তা হবে। কেননা, 'মেমোরিজ'-এর দৌলতে আমি তো নিজেকে নতুন করে দেখতে পেলাম আবার। স্পষ্ট দেখলাম, কত বড় নির্বোধ ছিলাম সে-জীবনে।

পূর্বাপর চিন্তা করার শক্তি নেই, কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা তো দূরের কথা। যখন যা খুশি তা'ই করছি, যেভাবে প্রাণ চাইছে ঠিক সেভাবেই চলছি, বুদ্ধি বিচারের কোনো বালাই নেই।

ইচ্ছে হল, সামনেকার ঐ নদীতে জল খাবো। একটু ঘুরে গেলেই হয়, রাশি রাশি গাছপালা ভাঙতে হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না। কিন্তু করলাম কী সামনেকার বন জঙ্গল দুমড়ে মুচকে ভেঙে একাকার করে, এগোলাম। দেহের বহু জায়গা ছড়ে গেল, রক্ত বেরোল দর-দর করে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনো হুঁশই নেই যেন।

অবশ্যি থাকবেই বা কী করে? এত বিরাট ছিল আমার দেহ এবং সে তুলনায় মগজ এবং স্নায়ুতন্ত্র এত দুর্বল ছিল যে দেহের কোনো জায়গায় আঘাত লাগলেই তা টের পেতেও সময়

লাগত অনেকক্ষণ।

একবারের কথা বলি। কী একটা জানোয়ারের সঙ্গে জোরদার লড়াই হয়েছে। ওটাকে খতম করে ফিরছি। এগোচ্ছি বিজয়ী বীরের মতো।

এগোবার সময় মনে হল, পিঠটা যন্ত্রণায় টনটন করছে। একটু শুশ্রূষা দরকার। অতএব ল্যাজটাকে কাজে লগোনো যাক।

কিন্তু ল্যাজ নাড়তে গিয়ে বিপদ। হঠাৎ খেয়াল হল, তার মাথার দিককার বেশ খানিকটা অংশ নেই। খানিক আগে লড়াইয়ের সময় কেটে বেরিয়ে গেছে।

বুঝুন ঠ্যালা। এতবড় ব্যাপার ঘটে গেল। কিন্তু তা মোটে টেরই পাই নি।

এছাড়া জল টল খাবার ব্যাপারেও মাত্রা জ্ঞান ছিল না। খাচ্ছি তো খাচ্ছিই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে খাওয়া হয়ে গেল, সে ব্যাপারে জ্ঞান নেই।

একবার। কী বিপদেই না পড়েছিলাম। জঙ্গল তছনছ করতে করতে নদীর ধারে এগিয়ে গেছি। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। (পাবেই; একে তৃষ্ণার্ত, তায় আবার আসবার পথে গাছপালা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাড়তি পরিশ্রম)।

নদীর স্রোতে মুখ রেখে মনের আনন্দে জল পান করতে লাগলাম। পান করছি তো করছিই। থামবার কথা আর খেয়াল নেই।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে হুঁশ হল, দেহটা বড় বেশি ভারী হয়ে গেছে। নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই।

অগত্যা শুয়ে পড়লাম; এবং শুয়ে শুয়েই আর এক দফা পান-পর্ব চলল।

ততক্ষণে দেহটা আরও ভারী হয়েছে। এমন কি উঠবারও শক্তি নেই।

কী করি। অগত্যা নদীর জলের গা ঘেঁসে শুয়ে রইলাম।

এদিকে নদীতে জোয়ার আসছে। জল বাড়ছে ক্রমশ।—

এইখানে বলে রাখি, সে যুগে জোয়ার ভাঁটা আজকের তুলনায় আরও অনেক প্রবল ছিল। বেশির ভাগ নদীর জলই কূল ছাপিয়ে খানিক দূর অবধি এগোত।

আমি যে নদীটির তীরে জোয়ারের ডাকে সেও ভালোভাবেই সাড়া দিয়েছে। হু হু করে জল বাড়ছে তার বুকে।

স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, দেখতে দেখতে জল এসে আমাকে স্পর্শ করল। এবং তারপর আমার দেহটা ক্রমেই জলের তলায় যেতে লাগল। উঠবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। নদী তীরের সঙ্গে দেহটা যেন আঠার মতো লেপটে আছে। অগত্যা অনেক কষ্টে মাথাটাকে একটু তুললাম। জলের ওপরে মুখ বাড়ালাম।

কী জল কী জল সেদিন। কী প্রচণ্ড জোয়ার। আর একটু হলেই ভেসে যেতাম অথবা জলের তলায় ডুবে মরতাম।

শেষ পর্যন্ত যে ডুবি নি বা ভেসে যাই নি তার কারণ বোধ করি এই যে জোয়ার স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে; আর আমিও কর্দমাক্ত দেহে উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাই।

সে জীবনে কী প্রচণ্ড শক্তি ছিল আমার। কিন্তু সে তুলনায় বুদ্ধি কত কম ছিল। এই বুদ্ধির দোষেই নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলাম।

ঘটনাটা খুলেই বলি, সে যুগের পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে। তুষার যুগ শুরু হয়েছে তখন। উঁচু এলাকা থেকে বরফের চাঁই নীচের সমভূমির দিকে নামছে। দারুণ শীত। ঠাণ্ডায় জমে যাবার দাখিল। জীবদের মধ্যে আতঙ্ক।

আমিও যে ভয় পাই নি, তা নয়। চলমান বরফের স্তূপ দেখলেই আঁৎকে উঠতাম। কিন্তু ভয় বা আতঙ্ক এক জিনিস, আর সতর্কতা অন্য।

বিপদ বুঝেও সতর্ক হলাম না আমি। উল্টে বিপদের মুখেই ঝাঁপ দিলাম।

সেদিন। জমাট বরফের স্তূপ অরণ্যের দিকে এগিয়ে আসছিল। জীবদের মধ্যে হুড়োহুড়ি কে কার আগে পালাবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। এমন সময় আমরা কয়েকজন মিলে সলা পরামর্শ করলাম। ঠিক হল, পালাবো না, কিছুতেই না। এই অরণ্যের ধারে পর্বতের ফাঁক ফোকরে আশ্রয় নেবো, যাতে বরফ আমাদের নাগাল না পায়।

হ্যাঁ নিলাম আশ্রয়, বিরাট এক গহ্বরে। বরফ প্রথমটায় আমাদের নাগাল পেল না সত্যি, কিন্তু খানিক বাদে দেখলাম, পর্বত কন্দরে অন্ধকার গাঢ় অন্ধকার। ব্যাপার কী? না বরফ চারিদিক থেকে আমাদের ঢেকে ফেলেছে।

বেরোতে চাইলাম। ঐ অন্ধকার গহ্বর থেকে মুক্তি পাবার কত চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হল না। উল্টে বরফের আবরণ ভেদ করতে গিয়ে মুখ আর মাথা হল ক্ষত বিক্ষত।

তারপর—

নতুন ভুল আবার। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। সবাই ভাবলাম, এই সর্বনাশা পরিস্থিতির জন্য আমি নই, আমারই স্বজাতির অন্য কেউ দায়ী। সে পাশেই আছে আমার। তাকে মারো।

বুঝুন অবস্থা। আলো হীন, বাতাস হীন, খাদ্যহীন সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরে নিজেদের মধ্যে মারামারি। কী নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক।

আমি নিজেও ব্যতিক্রম কিছু নই। লড়াই চালিয়েছি। আশেপাশের অনেককেই নির্বিচারে ঘায়েল করেছি। কিন্তু তবু, পারি নি শেষ অবধি। এলিয়ে পড়েছি। দেখতে দেখতে গুহার গাঢ় কালো অন্ধকারের বুকে নূতন আর এক দফা অন্ধকার নেমে এসেছে।

এর পরের ঘটনা খাপছাড়া। কোনো কিছুই ভালো মনে নেই। সব ভাসা ভাসা অস্পষ্ট। তবে এটুকু বেশ অনুভব করলাম, নতুন নতুন জীবন পরিগ্রহ করছি। বিবর্তনের পথ ধরে পিছু হঠছি। যেন জীবন সৃষ্টির একেবারে উৎসের দিকে আমার অভিযান।

ভিন্ন ভিন্ন জীবনে বিচিত্র আমার অভিজ্ঞতা। তবে ক্রমেই সব যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। কোনো কিছুই আর ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।

তবে কি 'মেমোরিয়াল' এর ক্রিয়া ধীরে ধীরে কমছে? প্রভাব ক্রমশ হাল্কা হচ্ছে?

ভাবলাম, তাই হবে। কেননা অনেকক্ষণ আগে নিজ দেহে 'মেমোরিল ইন্‌জেক্ট' করেছি আমি। মাত্রা বেশি হবার আশঙ্কায় অল্প পরিমাণে করেছি। স্মৃতি উদ্ধার করার কাজে তার শক্তি এতক্ষণে কমে যাওয়ারই কথা।

খানিকক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম, আমার অনুমান ঠিক। 'মেমোরিল'-এর শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি।

এইখানে বাধা দিলাম আমি। ডঃ আয়েঙ্গারকে বললাম,—আবার কেন 'মেমোরিল ইন্‌জেক্ট' করলেন না? আরও কিছু অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হত!

ডঃ আয়েঙ্গার উত্তেজিতভাবে বললেন—না না, আর উদ্ধারে দরকার নেই। যা হয়েছে, তাই যথেষ্ট। অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছি, এর চেয়েও বেশি কিছু জানতে গেলে কোথায় আমি যেতাম। কী জানেন—লক্ষ লক্ষ, লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস পেরিয়ে, সহস্র সহস্র জীবন পেরিয়ে আমি হয়ত সেই এককোষী প্রাণীদের যুগে যেতাম। একটিমাত্র কোষ যে প্রাণীর, আমি হয়ত সেই অ্যামিবার অনুভূতি লাভ করতাম। হয়তো দেখতাম, ঠিক অ্যামিবার মতোই এক আমি নিজেকে বহু করছি। এক কোষী অ্যামিবা যেমন তার কোষটিকে দ্বিখণ্ডিত করে, তারপর সেই কোষ আবার খণ্ডিত হয় এবং তারপর সেই কোষগুলোও আবার নতুন করে বিভাজন শুরু করে নিজেদের মধ্যে, আমিও ঠিক তেমনি করেই হয়তো নিজের বিভক্ত সত্তাকে অন্বেষণ করতে করতে এক ও অখণ্ডের স্বাদ পেতাম। হয়তো দেখতাম, অ্যামিবাতেই শেষ নয়, তারও আগে অনেক আছে। জগৎ সৃষ্টির কোটি কোটি বছরের ইতিহাস অঙ্কিত আছে আমার গায়ে। এই পৃথিবীর গাছপালা, মাটি পাথর আলো-বাতাস—সব কিছুর মূলেই এক ও অনন্ত আমি। জগৎ সৃষ্টির ঊষা কালে আমি। পৃথিবী যখন আগুনের পিণ্ড, যখন কোটি কোটি বছর ধরে সে সূর্য প্রদক্ষিণে রত, তখনও সব কিছুর পেছনে এই একই আমি। আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই। আমি অক্ষয় অব্যয় অনন্ত। আমিই সৃষ্টি, আমিই ভুবন। আমিই ঈশ্বর, আমিই জীবন। আমি এককে বহু করেছি, করছি, করে চলেছি।

এইখানে আবার বাধা দিলাম ডঃ আয়েঙ্গারকে। বললাম—তা বেশ তো আপনার এই অনুভবের কথা দশজনকে বলুন। পৃথিবীর মানুষকে 'মেমোরিল' ব্যবহারের সুযোগ দিন।

ডঃ আয়েঙ্গার ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন—না না। তা আর হয় না।

'মেমোরিল' এর সবটুকুই আমি নষ্ট করে ফেলেছি।

—বলেন কী?—আমি রীতিমত ক্ষুব্ধ—এ আপনি কী করলেন?

—ঠিকই করেছি, ডঃ আয়েঙ্গারের কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা,—কৃত্রিম উপায়ে বিশেষ এক যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে নিজেকে জেনে লাভ? স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষের যে আত্মানুসন্ধান, তা কি এর চেয়েও ঢের বেশি কাম্য নয়?

তর্ক জুড়ে দিলাম,—স্বাভাবিক বলতে কী বোঝাচ্ছেন? তা ছাড়া, আপনি নিজেই তো একটু আগে দেহযন্ত্রের কথা বলছিলেন।

ডঃ আয়েঙ্গার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে বাধা। হঠাৎ ঘরে ঢুকল তাঁর সেই মেয়ে যে আমাকে পথ দেখিয়ে এ ঘরে এনেছিল। মেয়েটি ডঃ আয়েঙ্গারকে বললো,—রাত হয়েছে। খাবার 'রেডী' আর দেরী করা ঠিক নয়।

আমি লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম,—হ্যাঁ ঠিক। অনেকটা দেরী হল। এবার আসি।

ডঃ আয়েঙ্গার বিদায় দেবার মুহূর্তে বললেন,—আবার আসবেন। কথা হবে। কী জানেন, আপনার মতো সজ্জন ও সহিষ্ণু শ্রোতা পেলে নিজের কথা কদাচিৎ কিছু কিছু বলে ফেলি।

উঠে পড়লাম। টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। বারবার প্রশ্ন করলাম নিজেকে, এসব কী? এতক্ষণ ধরে এ আমি কী শুনলাম? এর একটি কথাও কি সত্যি?

এ সব প্রশ্নের আজও কোনো জবাব পাইনি। তবে সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে এখনও। ডঃ আয়েঙ্গারের ঘর থেকে সবে বেরিয়েছি; হঠাৎ দেখি, সামনেকার পাহাড়গুলো দুলতে লাগল। যেন আমিই দুলছি, ঢেউ উঠছে আমার হৃদয়-সমুদ্রে। আশে পাশের গাছগুলো কাঁপতে লাগল, যেন আমিই কাঁপছি; বিস্ময় আর উত্তেজনায় আমার স্মৃতির অরণ্য দিশাহারা। যেন প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার নাড়ীর যোগ; এই পৃথিবীর তাবৎ মানুষ জন জীবজন্তু, গাছপালা, জলস্থল, অরণ্য প্রকৃতি—প্রত্যেকের সঙ্গে।

সাহিত্য গান ছবি : রবীন্দ্রনাথের শেষ আলোচনা

নেপাল মজুমদার

শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় পৌঁছানর দিন দুয়েক পরই—২রা জুন, (১৯৪১) বুদ্ধদেব বসু তাঁহাদের এ-কয়দিনের শান্তিনিকেতনে থাকার অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি কবির অশেষ স্নেহ ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের জন্য তাঁহাদের গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানাইয়া কবিকে এক পত্রে লিখিলেন :

..."এত সৌভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে ছিল কখনো ভাবিনি। নানা তুচ্ছ প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করেছি, সে-অপরাধ আপনি মহত্বে ক্ষমা করবেন, যে-মহিমার প্রকাশ আপনার মধ্যে দেখলাম তাতে সমগ্র মানবজাতির ও মানবজীবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। আর আপনার শান্তিনিকেতন হয়ে রইলো আমার মানসগৃহ—নিজ গৃহের চাইতেও আপন ও প্রিয়।"

সম্ভবত ৩রা জুন তারিখের ডাকে বুদ্ধদেব বসুর চিঠিখানি আসে। পরদিন ৪ঠা জুন—যেদিন মিস র‍্যাথবোনের খোলাচিঠির প্রতিবাদ পত্রখানি প্রেসে দেওয়া হয় ঐদিন কবি বুদ্ধদেববাবুকে তাঁহার জবাবি পত্রে লিখিলেন

কল্যাণীয়েষু,

এবারে আশ্রম থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ ক'রে নি'য়ে গিয়েছ। আশা করি, তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে বকুনির বাহুল্য প্রমাণ করে খুশির প্রাচুর্যকে, সেটা নিন্দনীয় নয়। তোমাদের ক'দিন এখানে ভালো লেগেছিল। ভালো লাগা জিনিসটা ফুল ফোটার মতোই রমণীয়, সেটাতে চারদিকের লোকেরই লাভ, সেইজন্য আমরাও তোমাদের আনন্দ—সম্ভোগের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তোমরা থাকতে থাকতেই শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল, আজ দু'দিন কিছু ভালো আছি। এখন তোমাদের শূন্যস্থান অধিকার ক'রে আছেন সুধাকান্ত, তাঁর বকুনির অভাব ঘটছে না, তা স্রোতের জলের মতন, দিন গুলিকে মার্জনা ক'রে দেয়। কোনো কিছু কথা কবার না থাকলেই মনের মধ্যে কলঙ্ক পড়তে থাকে, সুধাকান্তের কলকল্লোলে তার সম্ভাবনা থাকে না। আরোগ্যশালার এ একটা উপকরণ জেনো। বাজে খবর না থাকলে জীবন অসহ্য হ'য়ে ওঠে। সে খবর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই হোক বা সমাজের দ্বন্দ্বক্ষেত্র থেকেই হোক, বহন ক'রে আনতে সুধাকান্ত অদ্বিতীয়। এই আমার এখানকার প্রধান খবরা আশা করি, তোমাদের কুলায় আনন্দকাকলীতে ভ'রে উঠেছে। আকাশে এখন মেঘ সূক্ষ্ম বৃষ্টির জালে অবকাশকে আবৃত ক'রে আছে, এই রকম মেঘাচ্ছন্ন দিনে মন চায় সেই রকম কথার প্রবাহ যাতে বাক্য আছে বিতণ্ডা নেই, ভালো মন্দর বিচার নিয়ে বিতর্ক নেই। অলস মুহূর্ত গুলি মুচমুচে চিড়েভাজার মতন এসে পড়ে পাতে, জিরোতে বিলম্ব হয় না।

ওদিকে বাগানে ময়ূরটা ডেকে ডেকে উঠছে কেবল জানাতে চায় যে খুশি হয়েছি। ইতি ৪।৬।৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রসঙ্গ কিংবা সে উত্তেজনার লেশমাত্র উত্তাপ এই চিঠিতে নাই।

কোন রচনা ছাপার ব্যাপারে কবি যে কি পরিমাণ 'খুঁত্‌খুতে' স্বভাবের ছিলেন, কবির ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা তাহা ভালো করিয়া জানেন। বিশেষত, মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির প্রতিবাদ বিবৃতিটি প্রেসে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবি যে মানসিকভাবে খুবই উত্তেজিত ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু

১৯৪১ সালে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৮ই মে?) বুদ্ধদেব বসু শান্তিনিকেতনে যান। এ যাত্রায় প্রায় ১৩ দিন তাঁহারা সেখানে কবির অতিথি ছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালে শিক্ষা-সাহিত্যের নানা দিক্ লইয়া কবির সঙ্গে তাঁহার কয়েকদিনই আলোচনা হয়। এই আলোচনার কয়েকটির চুম্বক বা নোটও গৃহীত হয়। শান্তিনিকেতন ত্যাগের প্রাক্‌কালে বুদ্ধদেব তাহার দুইটি 'কবিতায়' প্রকাশের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরই এই আলোচনাগুলি প্রকাশের ব্যাপারে কবি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। কবি তাহা যথাসম্ভব সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশ্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (১৩৪৮) সেগুলি প্রকাশিত হইলে বুদ্ধদেববাবু পুনরায় কবিকে তাঁহার পূর্ব সংগৃহীত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের অনুমতি চাহিয়া পত্র দেন। বলা দরকার, কবি সে অনুমতি দেন নাই বুদ্ধদেববাবুর চিঠির জবাবও দেন নাই। এই সব সংক্রান্ত বিষয়ে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র ভবন' রক্ষিত কিছু মূল্যবান্ চিঠিপত্র ও তথ্যাদি এখানে দেওয়া হইল। এ সুযোগ দেওয়ার জন্য 'বিশ্বভারতী' কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। —লেখক

বুদ্ধদেববাবুকে লেখা চিঠিতে তাহার লেশমাত্রও আভাস ছিল না। এই হইলেন কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও কবি স্থির থাকিতে পারেন না। কবি মুখে মুখে গল্পের প্লট কিংবা শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে বলিয়া যান। কখনও প্রতিমা দেবী, কিংবা রানী চন্দ, কখনও সুধাকান্তবাবু কখনও বা আর কেহ তাহা লিখিয়া লন। কবি তাহা দেখিয়া সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করিয়া দেন। প্রতিমা দেবী লিখিতেছেন, 'প্লট বলে যাচ্ছেন..... সেই প্লট থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হলো 'বদনাম' গল্পের (নির্বাণ।। পৃঃ ৩৫ ৩৬) 'বদনাম' গল্পটি এবং সেই সঙ্গে শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত দুইটি রচনা ('সাহিত্যে গান, ছবি' এবং 'সাহিত্য ও শিল্প') আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র জন্য পাঠাইয়া দেন।

শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত রচনা দুইটির জন্যও এবার মনে কম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল না। তাহার একটা কারণও ছিল।

বুদ্ধবেদবাবু এবার শান্তিনিকেতনে থাকাকালে 'কবিতা' পত্রিকার জন্য যে দুইটি রচনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান পূর্বেই আমরা উহার বিস্তারিত উদ্ধৃতি-সহ আলোচনা করিয়াছি। রচনা দুইটি একত্রে 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস'—এই শিরোনামে কার্তিক সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও আরো একটি আলোচনার নোট বুদ্ধদেববাবু কবির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এই তিনটি রচনার জন্যই মনে মনে কবি খুবই অস্বস্তি ও উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। বয়স ও রোগভোগজনিত শারীরিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি যেন মনের স্বাভাবিক ভার-সাম্যটুকু হারাইয়া ফেলিতেছেন বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয়। অসতর্ক মুহূর্তে এবং উত্তেজনা ও তর্কাতর্কির ঝোঁকে বক্তব্যগুলি যেন কোথাও কোথাও স্বতোবিরোধী, কোথাও-বা একপেশে বা একঝোঁকা হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তাই পূর্বোক্ত রচনা দুইটি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের আগেই এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

ঠিক কোন তারিখে এই পরিমার্জিত রচনা দুইটি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, বলা শক্ত। মনে হয়, বুদ্ধদেববাবু শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর কবি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেই পূর্বোক্ত রচনা দুইটি পরিমার্জন করিয়া 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দেন (খুব সম্ভবত ২রা জুনই)। ঐদিন কবি রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখিতেছেন:

শান্তিনিকেতন,
২।৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু,

এবারে কয়দিন ধরে বুদ্ধদেব নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। আমার স্বভাবের দোষ এই, কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে উত্তর না দিয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু এই দুর্বল শরীরে তার যথেষ্ট দাম দিতে হয়। এবারে নিরতিশয় ক্লান্তিতে আমাকে অভিভূত করেছে। মুখে মুখে লেখাগুলি যা বলেছি জানিনে তা কতদূর সমাদরযোগ্য। বুদ্ধদেব ওগুলি স্বভাবতই প্রকাশ করতে ইচ্ছে করেছেন কিন্তু সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। বিচারপূর্বক যখন খুসী প্রকাশ করবেন, এ সম্বন্ধে কোনো তাড়া নেই। আমার মনের যন্ত্র এখন ভালো করে চলচে না সেইজন্যে গল্পটা সম্বন্ধে দ্বিধা রয়ে গেছে। যদি কখনো সুস্থ হই তবে ওটার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করা যাবে। এখন আমার শক্তি নেই।

আপনার রবীন্দ্রনাথ

লক্ষণীয়, বুদ্ধদেববাবুকে লেখা ৪ঠা জুনের পত্রে কবি এসব প্রসঙ্গে একটিও কথা বলেন নাই। রচনা দুইটি যে হতিমধ্যে 'প্রবাসী'তে পাঠান হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করেন নাই।

দিন চার পর পুনরায় একখানি পত্রে রামানন্দবাবুকে কবি লিখিলেন (৬ই জুন ৪১): "কিছুদিন থেকে আমার ক্লান্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। স্পষ্ট করে কিছুতে মন দিতে পারি নে। এই অবস্থায় রোগশয্যায় আমি বুদ্ধদেবদের কি সব বলেছিলুম তার বিশেষ কোনোও মূল্য নেই। আপনি তার বর্জনীয় অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করবেন অসঙ্কোচে। ওর মধ্যে যে অংশটুকু প্রকাশযোগ্য তাই রাখবেন। বোধ হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা আছে সেগুলি রক্ষণীয়। কিন্তু সেগুলি ধরতে পারেনি···। কিন্তু আপনি নিঃসঙ্কোচে এই বকুনিগুলিকে মেজে ঘষে নেবেন। আমার দিকে তাকাবেন না। আমি ভাবতেই পারি নে। গল্পটি যদি শ্রাবণ মাসের পূর্বে বের হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাতে আমি কোনো ক্ষতি দেখিনে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো তাড়া নেই। মিস্ র‍্যাথবোনকে যে চিঠি লিখেছি···"

দুদিন পর—৮ই জুন কবি পুনরায় এক পত্রে রামানন্দবাবুকে লিখিতেছেন, "এবারে বিস্তারিতভাবে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বুদ্ধদেব আমার মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আজও সুস্থ হতে পারি নি। এটা দেখা গেল আমি যা' বলেছি এবং যা' লেখা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে ঠিক মিল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তখন অসুস্থ ছিলুম্ বলে দেখে দিতে পারি নি—এখন দেখছি ভুল করেছি। তাই চিত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কোনও মতে পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করে আপনাকে পাঠিয়েছি। এ রকম করে মুখে মুখে বকুনী প্রকাশ অন্যায়। এতে নিজের মান হানি হয়, এবার তা খুব বুঝেছি। যা হোক আপনি যথোচিত বিধান করবেন।"

গল্পটির ('বদনাম') সম্বন্ধে কবির মনে কিছু সন্দেহ ও দ্বিধা রহিয়া গেলেও সাহিত্য সংক্রান্ত রচনা দুইটি প্রকাশের ব্যাপারেই কবির যে বেশী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, রামানন্দ বাবুকে লেখা উপরোক্ত তিনখানি চিঠিতে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দবাবুকে তিনি ঐ রচনা দুইটি পরিবর্তন, পরিবর্জন পরিমার্জনের চূড়ান্ত ক্ষমতাও (অর্থাৎ সম্পাদকেরও অধিক ক্ষমতা) দিয়াছিলেন ঐ পত্রগুলিতে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এবারের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবির 'সাহিত্যে গান ও ছবি' এবং 'সাহিত্য ও শিল্প' শীর্ষক রচনা দুইটি প্রকাশিত হয়। প্রথম রচনাটি একটি স্বতন্ত্র রচনা এবং

'প্রবাসী'তে এটি ছাপাও হইয়াছে আগে। বুদ্ধদেববাবু শান্তিনিকেতনে থাকাকালে 'কবিতা' পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যার রচনাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে কবি শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে যে সব মন্তব্য করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেববাবু চুম্বক আকারে তাহার নোট রাখিয়াছিলেন। এবং তাহারই ভিত্তিতে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সন্দেহ নাই, শান্তিনিকেতন ত্যাগের প্রাক্‌কালে তিনি কবির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রচনাটি রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কবি তাহাই পরিমার্জন করিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কবি স্বয়ং এই রচনাটির শুরুতেই নিজের নাম স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নলিখিত মুখবন্ধখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন :

"ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসু গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সে সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্য শিল্প নিয়ে দিন কয়েক কিছু আলোচনা হয়। দেখছি বুদ্ধদেব তার নোট রেখেছিলেন এবং তাই নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ গড়ে তুলেছেন। মুখে মুখে যে সকল আলাপ হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। স্থলবিশেষে সব কথা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না, রোগজীর্ণ শরীরের দুর্বল স্মৃতির পক্ষে তা মনে করে বলাও অসম্ভব।"

মুখবন্ধে কবির এই সতর্কীকরণ সত্ত্বেও নানা কারণে এই রচনাটির গুরুত্ব কম নয়। রচনাটিকে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে কবির চূড়ান্ত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে এটিকে কবির অন্যতম শেষ রচনা বা আলোচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কবির আলোচনার প্রকৃতিটি কি ধরনের ছিল তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমেই 'কবিতা' পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যাটির রচনাগুলির তারিফ করিয়া কবি বলেন :

"'কবিতা' পত্রিকার এবারকার সংখ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ একটা যুগের আনন্দের স্মৃতি বিচিত্র পন্থায় তোমরা এখানে এনেছ। পণ্ডিতরা বিচার করে সাহিত্যের ভালোমন্দের স্থির করেন। কিন্তু তোমরা একত্র করেছ বিশুদ্ধ উপভোগের আনন্দ। 'আমরা খুশি হয়েছি' একথা তোমরা খুব ভালো করেই বলেছ। আমার কাছে এইটেই খুব ভালো লেগেছে। এটাই সত্যিকার সমালোচনা।"

কিন্তু 'কবিতা'র রবীন্দ্র সংখ্যাটি তারিফ করলেও, লেখকদের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি ঠিক সমর্থন করিতে পারেন নাই। সমালোচকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পাঠক সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্যটি নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলেন,

"আমি মানি সাহিত্যের দুটো ক্ষেত্র আছে, একটা আনন্দের একটা বিচারের। কিন্তু বিচার করতে বসে শুধু যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্‌ঘাটন করি, তাতে লাভ নেই। সমালোচকের কাজ Physiology কে খুলে দেখানো নয়, Physiognomy কে প্রকাশ করা। আমাদের দেশে নানা বই পড়া বিদ্যাকে জাহির করাই সমালোচনা বলে। আমি তা মানি নে। একদিকে আছে ভোজ্যবস্তু, অন্যদিকে আছে ভোক্তা, এ দুয়ের মিলন ঘটানোই সমালোচনা। ভোজ্যবস্তুটা মোগল না পাঠান, সামন্ততন্ত্রী না ধনতন্ত্রী, সে খোঁজে কাজ নেই। রস জমেছে ভালো লেগেছে, এ কথাটাই ভালো করে বলো। এর মধ্যে পাণ্ডিত্য এনো না।"

রবীন্দ্রনাথের গল্পে উপন্যাসে বাস্তবতার অভাব না থাকিলেও তাঁহার অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই যে লীরিক বা গীতধর্মী, কোনো কোনো সমালোচক তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কবি যে তাহাতে কতখানি ব্যথিত হইতেন, পূর্বেই আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এই উপলক্ষেও তাঁহার সেই মনোবেদনা ব্যক্ত করতে গিয়া তিনি বলেন,

"এ কথাটা আমি মানি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লীরিক প্রতিভাতেই সবচেয়ে বড়। আমি নিশ্চিত জানি যে আমার কবিতা গল্প নাটকের ভাগ্যে ভবিষ্যতের দরবারে যা-ই জুটুক, আমার গান বাঙালি জাতিকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই হবে সকলকে, বাংলার ঘরে ঘরে, প্রান্তরে নদীতীরে"...

কিন্তু তাঁহার ছোটো গল্পগুলি সম্পর্কেও তাঁহার দরদ ও মমত্ব কম ছিল না। তিনি বলেন,

"অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে।"...

এইভাবে স্মৃতিচারণ করিয়া তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা এবং চরিত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন,—ঐসব ঘটনা চরিত্র তাঁহার কয়েকটি গল্পে রূপ পাইয়াছে। সমালোচকদের উদ্দেশে তাঁহার প্রশ্ন।

"একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।"

কতিপয় উন্নাসিক প্রগতি সাহিত্য সমালোচক সেই সময় শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের সাহিত্য বিচার এবং লেখকদের শ্রেণীবিভাগ করিতেছিলেন, কবি তাহাতে মনে মনে খুবই বিরক্তি-বোধ করিতেছিলেন। 'কবিতা'র এই রবীন্দ্রসংখ্যাতে ঐ ধরনের দুই/একটা রচনা ছিল। বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আলোচনাকালে কবি প্রকাশ্যেই তাঁহার সেই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, আর একটা কথা তোমাদের বলি। আজকালকার সমালোচনায় দেখি বড্ড নামকরণের উপর ঝোঁক—কে বুর্জোয়া, কে ফিউডাল এই সব কথা। এ সব বাজে। আর্ট কখনো দাগা বুলিয়ে চলে না, সে

আপনাতে আপনি প্রকাশিত। বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে, বললেন আমি তো এই দিলুম, এবার নিজেকে সম্পূর্ণ করো। সেই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। আর্ট যেখানে বড়ো সেখানে মহৎকে সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মানতেই চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টলতো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, ক্লোয়র বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য ;—হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এ সব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, কিন্তু তাঁরা মহাপ্রাণ, আমাদের প্রণম্য। তুমি কি বলবে, আজ আমাদের জীবনে এত দুঃখ দারিদ্র্য ব'লে আকাশে চাঁদ ওঠে না, মানুষ ভালোবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কি? তাতে তো মানুষের কোনো উপকার হবে না, কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।"

এখানে তত্ত্বগতভাবে শিল্প সাহিত্যের সামাজিক ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য এবং দায়-দায়িত্বের কথা কবি স্বীকার করেন নাই বটে, তবে মানুষের দুঃখ দুর্দশা, শোষণ পীড়ন নির্যাতন—এক কথায় সমাজ-আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কাজে শিল্পী সাহিত্যিকের নৈতিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে একদা তিনিও যে তাঁহার মত করিয়া উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন: "কর্মজীবনে আমিও নেমেছিলুম একদিন, চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের মানুষের দুর্গতি দূর করতে। হয়তো সে আমার অনধিকারচর্চা, হয়তো তাতে সার্থকও হইনি, ভালো রকম করতে পারি নি। কী করেই বা পারবো—সারাজীবন চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে এসেছি; ও তো সত্যি আমার কাজ নয়। কিন্তু বেদনা বেজেছে বুকে, চুপ করে থাকতে পারি নি।

"তবু আসলে আমি তো কর্মী নই; আমি কবি, আমি শিল্পী। কবিতা লিখেছি, গল্প লিখেছি, গান বেঁধেছি, ছবিও এঁকেছি।"

আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবির 'সাহিত্য, শিল্প' শীর্ষক দ্বিতীয় রচনাটির শুরুতেই প্রবাসী সম্পাদকের নিম্নলিখিত নোটটি প্রকাশিত হয়:

"বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, কবি তাহা স্বীয় অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব সংশোধন করাইয়া এবং কোন কোন অংশ বর্জন করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত এই ছোট প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।"

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রচনার মূল বয়ানটি ছিল এই:

"সেদিন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা বলবার বিষয় ছিল তা বেশী কিছু নয়, কেবল মাত্র এই যে, মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার পড়ে পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বারবার সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই যে মনের মতো রূপ; এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে; আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প, তার সাহিত্য দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপন অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনো অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞা ভরে তার গৌরবকে উপহাস করে তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য তার শিল্প একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।"

আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবির উপরোক্ত রচনা দুইটি পাঠ করিয়া বুদ্ধদেববাবু কিছুটা ক্ষুণ্ণ হ'ন। ঠিক কোন্ তারিখে আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'টি প্রকাশিত হয়, বলা শক্ত। সাধারণত বাংলা মাসের গোড়ার দিকেই 'প্রবাসী' প্রকাশিত হইত। সুতরাং আষাঢ়ের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৯/২০শে জুন নাগাদ উহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ২৫শে জুন (১৯৪১) বুদ্ধদেববাবু কবিকে এক পত্রে লিখিলেন,

"এবার শান্তিনিকেতনে থাকতে আপনি আমাকে 'কবিতা'র জন্য দুটি লেখা দিয়েছিলেন—একটির বিষয়

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' অংশটির সাহিত্যের উৎস। এই দ্বিতীয় লেখাটিরই চুম্বক আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তাতে তার স্বাতন্ত্র্য খর্ব হয়নি, কারণ মূল লেখাটি অনেকটা বিস্তৃত এবং সেটিই আগে লেখা। আপনার প্রবন্ধ দুটি আমি একসঙ্গে আশ্বিনের 'কবিতা'য় দেবো, তবে সাহিত্যের উৎস পড়ে সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন যে, ওটি 'প্রবাসী'র প্রবন্ধেরই সম্প্রসারণ। এই জন্যে আপনি যদি একটি ছোটো নোট ঐ সঙ্গে দিয়ে দেন তাহলে ভালো হয়। এই ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে লজ্জিত বোধ করছি; কিন্তু এসব বিষয়ে আপনার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর তা জানি বলেই কথাটা উল্লেখ করলুম। যদি দু'চার লাইনের একটি মুখবন্ধ মুক্ত করে দেন তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়, তবে তা যদি আপনার পক্ষে একান্তই সম্ভব না হয় তাহলে আমি একটি ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে দিতে চাই—আশা করি, তাতে আপনার আপত্তি হবে না। এ বিষয়ে সুধাকান্তবাবুকে আমি বিস্তারিতভাবে লিখলাম তিনি আপনাকে মুখেও বলবেন। আপনি যা ভালো মনে করেন তাই হবে।

"আশ্বিনের 'কবিতা' আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রেসে দেবো—এই সংখ্যাটি আমাদের সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। এর জন্য আপনার একটি কবিতা প্রার্থনা করি, আশা করি নিরাশ হতে হবে না।....."

এ ছাড়া 'কবিতা'র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবি যামিনী রায় মহাশয়কে যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখিয়াছিলেন, বুদ্ধদেববাবু সেটিও 'কবিতা'য় প্রকাশের অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেববাবুর এই চিঠিটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রথমত, এই রচনা বা আলোচনাগুলির নোট কে গ্রহণ করিয়াছিলেন? রামানন্দবাবুকে লেখা কবির পূর্বোক্ত তিনটি পত্র এবং 'প্রবাসী'র দুটি রচনার শুরুতে কবির এবং রামানন্দবাবুর মুখবন্ধটি পাঠ করিলে মনে হয়, বুদ্ধদেববাবু স্বয়ং এই নোট গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বুদ্ধদেববাবু তাঁহার এই সব পত্রে এবং 'মর পেয়েছির দেশে' গ্রন্থে যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় আরও কেহ এই নোট গ্রহণ করিয়াছিলেন—অন্তত তিনিই যে নিজে নোট গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা কোথাও উল্লেখ করেন নাই—এমন কি আভাসে ইঙ্গিতেও বলেন নাই।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধদেববাবু এই পত্রে তাঁহার 'কবিতা' পত্রিকায় রচনা দুইটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিবার জন্য কবিকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন কবি কি তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন? করেন নাই যে, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি 'কবিতা' পত্রিকায় রচনা দুইটি প্রকাশের চূড়ান্ত অনুমতি বা সম্মতিও দেন নাই। এমন কি বুদ্ধদেববাবুর এই পত্রের জবাবও দেন নাই,—অন্তত এখনও পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নাই। স্বয়ং বুদ্ধদেববাবু মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকার (১৩৮১) 'সাহিত্য সংখ্যা'য় কবির সঙ্গে তাঁহার পত্র বিনিময়ের সংকলন সম্পাদনায় স্বয়ং প্রথম দিকে উদ্যোগী হন। তিনিও এমন কোনো দাবী করেন নাই। তাহার কারণ এই নয়, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে কবি বুদ্ধদেববাবুর এই চিঠির জবাব দিতে সক্ষম হ'ন নাই। কেননা, এর পরও অন্তত দিন দশ/বারো কবি মোটামুটি একপ্রকার ছিলেন এবং কয়েকটি চিঠিপত্রের জবাবও দিয়াছেন। কবির এই নীরবতাই কি বুদ্ধদেববাবুর কাছে তখন গভীর অর্থব্যঞ্জক ছিল না?

তৃতীয়ত, বুদ্ধদেববাবু এখানে লিখিতেছেন, "এই দ্বিতীয় লেখাটিরই চুম্বক আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে"—এ'কথা কি ঠিক? ওটি কি সত্যিই 'প্রবাসী'র প্রবন্ধের সম্প্রসারণ? এ'কথা যে ঠিক নয়, রচনা দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আর যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কবি এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পরিমার্জিত রচনা দুইটি এবং সেই সঙ্গে রামানন্দবাবুকে পরপর তিনখানি চিঠিতে এতো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতে গেলেন কেন? আর রামানন্দবাবুই বা দ্বিতীয় রচনাটির মুখবন্ধে এত সব কথা লিখিতে গেলেন কেন?

অথচ বুদ্ধদেববাবু কবির সম্মতি কিংবা 'মুখবন্ধ' ছাড়াই আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতায়' (কবির মৃত্যুর পর) পূর্বোক্ত রচনা দুইটি প্রকাশ করিয়া দেন। বুদ্ধদেববাবু স্বয়ং রচনাটির নিম্নলিখিত মুখবন্ধখানি লিখিয়া দেন:

"এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের ('সাহিত্যের উৎস') চুম্বক 'সাহিত্য, শিল্প' নামে গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিলো। উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যদিও এক, এটি বিস্তারিতভাবে লেখা, এবং কবির সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতে হ'লে এটি দরকারি।"

'কবিতা' সম্পাদক

[কবিতা-আশ্বিন ১৩৪৮ পৃঃ ১৩]

কিন্তু শুধু 'সাহিত্যের উৎস' রচনাটিই নয়, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' শীর্ষক রচনাটিও কবি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এই রচনারও একটি 'পরিমার্জিত' বর্ধমান শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র জন্য পাঠান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই রচনাটিও কবি স্বহস্তে লিখিতে পারেন নাই। কবি মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন, সুধীর কর মহাশয় তাহার 'নোট' লইয়া পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু 'প্রবাসী'তে রচনাটি পাঠানর পর কবি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পর কবি এটির প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিয়া রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখিলেন (৭ই জুলাই '৪১):

শান্তিনিকেতন

৭/৭/৪১

প্রিয়বরেষু,

শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর 'সাহিত্যে সমসাময়িকতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশার্থে আপনাকে পাঠিয়েছেন, সেটা কিছুতেই আমার নামের সংশ্রবে প্রকাশের যোগ্য নয়। ভাব এবং ভাষায় তিনি সঠিক আমার ডাক ধরতে পারেন নি। অতএব আপনি ঐ প্রবন্ধটি ছাপাবেন না।

ইতি

৭/৭/৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

মনে হয়, 'কবিতা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' ও 'সাহিত্যের উৎস' রচনা দুইটির শিরোনাম বুদ্ধদেববাবুর দেওয়া, কবির নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, উপরোক্ত দুটি রচনায় ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং সমসাময়িক বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাবকে কবি একেবারে অস্বীকার না করিলেও রূপ ও রস সৃষ্টি এবং আনন্দদানের 'পরেই বেশী জোর দিয়াছেন। শুধু রূপ ও রস সৃষ্টিই লক্ষ্য নয়—দ্রষ্টা ও স্রষ্টার একান্ত মানসিক গঠনপ্রকৃতি এবং সৃজনশক্তির 'পরেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। কবি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,

"...এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছি আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গরের্ব বিষয় এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে।... আমার মন বলে, 'দূর হোক গে তোমার ইতিহাস।' হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে সে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে"...

এখানে ভাববাদী কবির মতই Subjectivism—অর্থাৎ শিল্পীর একান্ত মানসিক ও আত্মিক শক্তির পরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে এই আলোচনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করা হইয়াছে। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে এই মূল প্রশ্নটার একটা বিতর্কমূলক বা Polemical বিচার আলোচনার চেষ্টা ছিল। 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে সেই-রচনারীতি অনুসৃত হয় নাই।

স্পষ্টই বোঝা যায়, শেষ দিকটাতে কবি নিজের মানসিক ভারসাম্য ও রচনাশক্তির 'পরে ক্রমেই আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছিলেন, এদিকে অপরের কলমেও নিজের বক্তব্য গুছাইয়া বলিতে পারেন না। অসুস্থ শরীরে এ সব আলোচনা বা রচনায় অসতর্ক ও অসংলগ্নভাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই কবির সর্বশেষ বিচার ও অভিমত বলিয়া উত্তরকালের মানুষ গণ্য করিবে, কবি তাহা চাহেন নাই। এই কারণেই বুদ্ধদেববাবুকে দেওয়া রচনা দুটি প্রকাশের অনুমতি দিতে পারেন নাই। সম্ভবত রচনার দুর্বল দিকগুলি কবি স্বয়ং উপলব্ধি করতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যে চেষ্টা করিলেন তাহাতেও সফল অন্তত নিজে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মনে হয়, এই কারণেই সুধীর কর অনুলিখিত 'সাহিত্যে সমসাময়িকতা' প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দেওয়ার পরও কবি তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন। এ সব কারণে কবির মানসিক অসন্তোষ প্রবল হয়।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থাকিয়া যায়, কবি কি নান্দনিক বিচারে তাঁহার ভাববাদী মূল চিন্তা ও প্রবণতাগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন? শিল্প-সাহিত্যিকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক চাহিদার অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির—কিংবা মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সমর্থন করিতে পারিয়াছিলেন? শিল্পী সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা তিনি কি স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন?

নান্দনিক তত্ত্ব-বিচারে তিনি যে মুখে তাহা স্বীকার বা মানিয়া লইতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু কার্যত তাহার বিপরীতই করিয়াছেন। তাঁহার এই মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধী প্রবণতার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

অথচ আধ্যাত্মিক দিক হইতে তিনি এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরাল ভাষায় বার বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বিশ্বজগৎ এবং মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়টি উপলব্ধি প্রসঙ্গে তিনি 'বিশ্বাত্মা' ও বিশ্বমানবিকতার সাধনচর্চা সম্পর্কে যে সব আধ্যাত্মিক রচনা এবং ভাষণ দিয়াছেন, পূর্বেই আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। শান্তিনিকেতন উপদেশ মালায় Religion of Man 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায়—বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে কথিত উপদেশমালায় তাঁহার যে দার্শনিক সুদৃঢ় মত ও বিশ্বাসের যে ছবি পাই, তাহার সঙ্গে তাঁহার নান্দনিক চিন্তার সঙ্গতি কোথায়? দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক দিক হইতে যিনি বিশ্বাত্মার কল্যাণময় অভিপ্রায়টি উপলব্ধির আহ্বান জানাইলেন শিল্প সাহিত্য ও নান্দনিক দিক হইতে তা পারিলেন না কেন?

আসলে মানসিক গঠনপ্রকৃতি এবং পারিবারিক বিশেষ কালচারের শিক্ষায় শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে কবির মনে কয়েকটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল। চিরায়ত ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষত রোমান্টিক ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের মধ্যেই কবির মন পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছিল, এ তো সর্বজনবিদিত ঘটনা। তাই 'শিল্পের জন্য শিল্প' (বা 'Art for Arts sake') তত্ত্বের প্রতি তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তলে যেন একটা কোমল দুর্বলতা রহিয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু চিরায়ত ইংরেজী সাহিত্য হইতে শুধুই রোমান্টিক ভাবালুতা ও মধুর সৌন্দর্যসুধাই তিনি পান করেন নাই,—ফরাসী বিপ্লব তথা ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বলিষ্ঠ বাণী যে মহৎ সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাও কবিকে কম প্রভাবিত করে নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের এই মহান ও যুগান্তকারী ভূমিকার কথা তিনি বার বার সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন (পরিচয় ॥ মাঘ, ১৩৪১):

..."আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসি বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল, সে ছিল বেড়া-ভাঙবার

নাড়া। এই জন্মে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়ে ছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে, বিশ্বের দিকে।...

"একদা ফরাসি বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক, রাজ শক্তিই হোক, যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা-কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ; সে মুক্তদ্বার সাহিত্য সকল দেশ, সকল কালের মানুষের জন্য; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা।"...

ইউরোপীয় সাহিত্যের এই মহৎ ভাবাদর্শের দিকটার এবং তাহার যুগান্তকারী ভূমিকার কথাটাও তিনি নানা উপলক্ষে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এ-সাহিত্য তো উদ্দেশ্যহীন কিংবা অহেতুক নয়। ভাষা ও সাহিত্য এখানে যেন আজ্ঞাবাহী দাসীর মত মহৎ ভাবাদর্শের বাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, যে ভাবাদর্শ নতুন সমাজ-আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার মৌল চরিত্র ও গুণাবলীর রূপকল্পটির আভাস দেয়।

শিল্প সাহিত্যের নান্দনিক বিচারে কবির তাত্ত্বিক বক্তব্যের সঙ্গে তাঁহার সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকর্মের যে অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধী প্রবণতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়, পূর্বেই আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। কবির তত্ত্বনাট্য, কবিতা, গল্প উপন্যাস বা তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান সৃষ্টকর্মে। তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য তো 'ঠাসিয়া ঠাসিয়া-ভরা।'

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণ তো কবির মানসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই। কেননা কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা বাঁধাধরা ছকেও তো কবির জীবন অতিবাহিত হয় নাই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোন মৃণালভুক গজদন্তমিনারবাসী কবিও ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অসাধারণ স্পর্শচেতন জীবনধর্মী ও মানবতাবাদী কবি। মানুষের দুঃখ বেদনা—পীড়ন নির্যাতন শোষণ-বঞ্চনা অপমান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবনই প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন,—সাহিত্যকর্মে এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে, সব কিছুর মধ্যে। তাই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের মৌল সমস্যাসমূহ তাঁহার সাহিত্যে (সৃজনশীল) একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইয়াছে, আর সে সাহিত্য বক্তব্যপ্রধান ও উদ্দেশ্যধর্মী।

মজার কথা এই, জীবনের প্রায় অন্তিম কালে, বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আলোচনা কালে শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে কবি বাস্তববাদী ও প্রগতি লেখকদের যাহা করিতে নিষেধ করিলেন, কার্যত তিনি নিজেই তাহা করিয়া বসিলেন। এই কালের তাঁহার সর্বশেষ তিনটি গল্পে ('বদনাম' 'প্রগতি সংহার' ও 'মুসলমানীর গল্প') বিশুদ্ধ সাহিত্য কিংবা শিল্প সৃষ্টির কোনো অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায় না। এই তিনটি গল্পে; তিনি যেন গল্পের ধর্ম ও গুণাগুণ অপেক্ষা তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের দিকেই অধিক সতর্ক দৃষ্টি বা লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

এই দিক হইতে প্রথমেই তাঁহার বিখ্যাত 'বদনাম' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। নানা দিক দিয়াই কবির এই গল্পটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্ণ। বাস্তবতার দিক হইতে এর গল্পাংশে বা আখ্যানভাগ ও চরিত্রচিত্রণে কিছু কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকিলেও কবি তাঁহার নায়িকা সহ্য'র মুখে নিজের বক্তব্য অত্যন্ত সুকৌশলেই বলিয়া দিয়াছেন।

এই গল্পের যেটা সব চেয়ে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক তাহা হইতেছে: কবি তৎকালীন দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টা ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানাইয়াছেন। ইতিপূর্বে 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে এই আন্দোলনের হেয় এবং নেতিবাচক দিকটাই তুলিয়া ধরা হয়, কিন্তু 'বদনাম' গল্পে তাহা করা হয় নাই বরঞ্চ তাহার বিপরীতই করা হইয়াছে। এ গল্পে কেবল দেশের তৎকালীন বিদ্রোহ ও বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থনই জানান হয় নাই, তাহাকে মহিমান্বিত এবং প্রতিটি দেশবাসীর—এমনকি অন্তঃপুরে নারী ও গৃহস্থ বধূদেরও অবশ্য করণীয় যুগধর্ম বলিয়া যেন নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন।

ষোহিনীর মত এই গল্পের প্রধান নায়িকা সহ্যও রবিন্দ্রনাথের এক অসাধারণ সৃষ্টি। যে বশম্বদ দেশীয় পুলিস অফিসারদের সাহায্যে ইংরেজরা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, সহ্য এমনই এক অফিসারের স্ত্রী। শুধু স্ত্রী-ই নয়,—সহ্য একান্ত পতিব্রতা নারী। কিন্তু 'সতী' ও 'পতিব্রতা' নারী হইয়াও সহ্য তাহার পুলিস ইন্সপেক্টর পতির সহধর্মিনী হইতে পারে নাই। দেশপ্রেম যে পতিপ্রেম অপেক্ষা অনেক—অনেক বেশী বড়ো, এবং যদি এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষ বাধে, যদি সেই পতি দেশদ্রোহীর ভূমিকা নেয়, তাহা হইলে পতিকে ত্যাগ করিয়া যে দেশকেই বরণ করিয়া লইতে হয়, এই শিক্ষাই যেন এই গল্পের অন্যতম প্রধান 'মর‍্যাল' (Moral)। তা ছাড়া অন্তঃপুরের বাহিরে বৃহত্তর কর্মজগতেও নারীর বিরাট ভূমিকা আছে এবং পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর বন্ধনমুক্তি যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনকে বাদ দিয়া যেমন নারীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, তেমনি নারীকে বাদ দিয়াও এই রাজনৈতিক মুক্তি লাভ সম্ভব নয়, এটাও এই গল্পের আর একটা প্রধান 'মর‍্যাল'। আর এই 'মর‍্যাল' প্রচারের দৃঢ় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় লইয়াই যেন এই

গল্পের প্লট, কাহিনী, পাত্রপাত্রী, সংলাপ ও ঘটনাবলীর বিন্যাস করা হইয়াছে। এ' জন্য পুলিস ইন্সপেক্টর বিজয়বাবুর স্ত্রী সতু বিপ্লবী অনিল মিত্রের একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্যা এবং তাহার গোপন কার্য্য-কলাপের সাহায্যকারিণী যে অনিল মিত্রকে গ্রেপ্তারের জন্য ইন্সপেক্টর সাহেব এবং তাহার পুলিসবাহিনী দিবারাত্রি হন্যে হইয়া খুঁজিতেছে এবং বার বার বিপ্লবীদের হাতে নাস্তানাবুদ নাকাল ও হয়রান হইতেছে আর সে খেলায় সতুর'ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সতুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া কবি তাহার মুখে যে সংলাপ দিয়াছেন, তাহাতে কবির কম মুন্সীয়ানা প্রকাশ পায় না। ইংরেজের অত্যাচারী পুলিস অফিসারদের উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে গিয়া তিনি সতুর মুখে যে তীব্র বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, তাহাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ইন্সপেক্টর বিজয়বাবু যখন তাহার স্ত্রী সতুকে বিপ্লবী অনিল মিত্রের খবর বলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, সতু তাহার জবাবে বলে,

"তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।'

'বিজয় বসেছিলেন; লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'বলো সে কোন দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে'।

সতু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী? এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হল। আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে।'

স্বামীর মুখে বিপ্লবী অনিল মিত্রের কার্যকলাপ শুনিয়া তাহার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিতেই বিজয়বাবু সতুকে হুঁসিয়ার করিয়া দেন। সতু তাহার জবাবে বলে,

"না তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলোআনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অবলা—এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা, অবলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বলো না কেন—সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে থাকে 'সতু বড়ো লক্ষ্মী,' অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সতুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি? আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে—হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত মানো আস্তাকুঁড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সতুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।"

অবশেষে সতু একদিন নিজেই স্বামীর কাছে ধরা দেয়। সে যে এতকাল গোপনে বিপ্লবী অনিল মিত্রের সকল কার্যকলাপে সহায়তা করিয়া আসিতেছিল, তাহাই তাহার ইন্সপেক্টর স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়।—এমনভাবে স্বীকারোক্তি করে যাহাতে তাহাকে বাদ দিতে কিছুতেই অনিল মিত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা চালনা করা যায় না। সতু বলে,

'হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব বলেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!!
বিনামূল্যে!!!

ছুলি

চিকিৎসা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দাগের রঙ মিলিয়ে যেতে শুরু করে। আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি কতখানি সফল অবশ্যই একবার পরীক্ষা করে দেখুন। রোগের লক্ষণ বিস্তারিত লিখে ওষুধের একটি প্যাকেট বিনামূল্যে ব্যবহার করুন।

Lalit Ayurvedic Pharmacy (S.Y.)
P.O. Katri Sarai (Gaya)

পাকা চুলের অবসান
রটনা নয়

আমাদের আয়ুর্বেদিক তেল ব্যবহারে অসময়ে চুল পাকা বন্ধ হয় এবং সাদা চুল চিরকালের জন্য কালো চুলে পরিণত হয়। ভবিষ্যতে ও নতুন সমস্ত চুল কালো হয়েই জন্ম নেবে। চোখ এবং বুদ্ধির অপুষ্টি দূর করতে এই তেল অব্যর্থ। মূল্য ১২ টাকা।
ডাক খরচ ৬ টাকা। তিনটি শিশির ফুল কেশ ৩০ টাকা, ডাক খরচ ১০ টাকা।

Lalit Ayurvedic Pharmacy
(S.Y. 85)
P.O Katri Sarai (Gaya)

করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারী ধর্মকে ধিক। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনও ঠেলতে পারিনি; সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম—এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছনে পিছনে থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছে করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা তাদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।'

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে রচিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের সঙ্গে সদুর একটা জায়গায় মিল আছে। উভয়েই পুরুষ শাসিত 'সনাতনী হিন্দুসমাজ' এর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অন্তঃপুরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। উভয়েই সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তার বাহিরে বৃহত্তর সত্তা এবং জীবনের সন্ধান পায়। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান বিরাট। মৃণাল তাহার স্বামীর ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুরীতে গিয়া আশ্রয় লয়। পুরীর অসীম নীল সমুদ্র ও অনন্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া তাহার 'অধ্যাত্ম চেতনা'র উন্মেষ ঘটে, তাহাতেই তাহার 'আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ' ঘটে। মৃণাল তাহার পত্রের উপসংহারে লেখে,

"তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

"তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণ-কালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপন মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন এইবার মরেছে মেজবউ।

"তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরানো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। 'মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়ে মানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচাবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমিও বাঁচলুম।"

যে সমাজ শত শত বৎসর ধরিয়া এই 'নারীমেধ' যজ্ঞে বিন্দুর মত সহস্র সহস্র নারীকে আহুতি দিতেছে তাহা হইতে মুক্তির কোনো রাস্তা মৃণালের জানা ছিল না। সমাজ আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সমস্যার সমাধান সমাজ-আর্থনীতিক ও রাজ-নীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেই হইতে,—এই সত্য মৃণালের জানা ছিল না কিন্তু সদু তাহার নিজের জীবন দিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল। সদু আরও বুঝিয়াছিল, রাজনীতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ না করিলে সামাজিক অন্যায় ও পীড়ন নির্যাতন হইতেও মুক্তি নাই। তাই সে স্বামী এবং ঘর সংসার ছাড়িয়া বৃহত্তর কর্মজগতে অত্যন্ত বিপজ্জনক রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিল। সেই অর্থে সদু সমাজ ও রাজ নীতি-সচেতন। আর এই চেতনাতেই সদু যথার্থ স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ করিল।

—*—

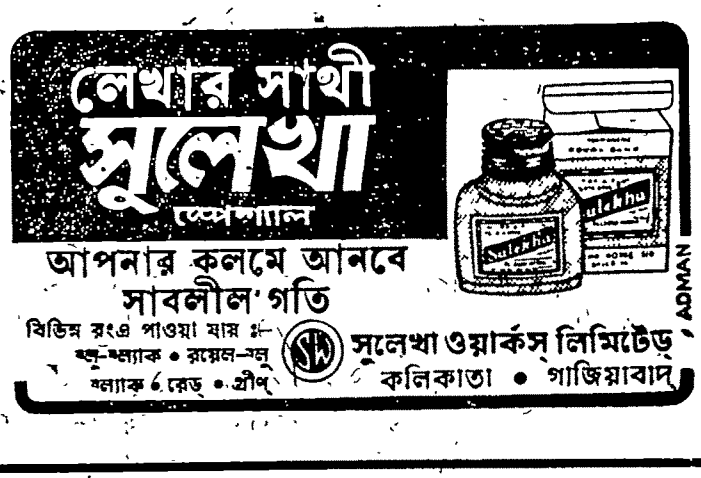

শুট ডাউন। শুট ডাউন……

ওয়েল ডান। ওয়েল ডান। হারি আপ। হারি আপ। স্পিড স্পিড।

চরার প্রাণ পুরুষটাকে ওরা নিয়ে গেলো। হেড-লাইটের আলোয় নিশুতি রাতের জমাট অন্ধকারকে এক পলক চমকে দিয়ে জিপ গাড়িটা ছুটল। পেছনে মসৃণ বালির বুকে পড়ে রইল শুধু কয়েক জোড়া বুটের গভীর ক্ষত চিহ্ন। আর একটি নীরব বেহালা।

মানুষটা থাকত লোকালয়ের বাইরে গাঁয়ের সীমা বেরিয়ে "হুই" উদম চরায়। মন্দনাথবাবুর জমিদারী শেষ প্রান্তে। সে যে কোত্থেকে এসেছিল—কী বিত্তান্ত—তা সবই ছিল ভাসা ভাসা। কারো কাছেই তেমন একটা পরিষ্কার ছিল না। জিজ্ঞেস করলে সে বলত: পরিচয় জেইনে কি কইরবা বল দিনি তোমরা। জঙ্গলী মানুষ—তা তো মোর চাল—চলন দেইখেই বুঝতি পার। নেংটি পরি থাকি। সব কিছুই কাঁচা-কাঁচা খেতাম। এই মেয়েছেলেটা যাকে তোমরা বল বউ—তার কইল্যাণে এখন দু'টো সিদ্ধ খাই। মোর কি কোন নিবাস্ন ছেল যে বইলব তোমাদের। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুইরে ঘুইরে বেড়াতাম। সেই ঘুইরতে ঘুইরতেই এখানে চইলে এয়েছি। তবে হ্যা, যা একটা ছেল বটে—ছোটবেলা দেখিছি বটে। বাপটারে মুই জানি না। দেখিছি বইলেও মনে পড়ে না।

লোকালয়ের মানুষ একে বলত ভূতের চর। রাতের বেলায় ওপথে নৌকায় নদী পাড়ি দেয়ার সময় গাঁয়ের লোকেরা নাকি প্রায়ই শুনতে পেতো এক আকুল চিৎকার: ফেইললে গো মেরে ফেইললে। কে কোথায় আছ গো; রইক্কে কর। মাত্র কয়েক মিনিট —তারপর সব চুপ। চড়ার ওখানটায় নৌকো এসে পড়া মাত্রই নাকি তাদের শরীরটা কেমন অসুস্থ অসুস্থ লাগত—গা ছম ছম করতো। আসল ব্যাপারটা যাচাই করে দেখার মত সাহসটুকুও তাদের ছিল না। ঐ বধ্যভূমিরই পেছনের দিকটাতে লোক লয়ের গা ঘেঁষে ছিল আবার শ্মশান। গাঁয়ের লোকেদের বদ্ধমূল বিশ্বাস: অতৃপ্ত আত্মারা শ্মশান থেকে উঠে এই সে রেতের বেলায় চড়ার বুকে নেত্য জুইরে দিতো।

এহেন এক চড়ায় এসে মানুষটা যখন আস্তানা গাড়ল—তখন স্বাভাবিক ভাবেই সবার অবাক হবারই কথা। তার আগমন সংবাদ লোকালয়ে পৌঁছে যাওয়া মাত্র সেদিন সবাই আঁতকে উঠেছিল। বড় বড় চোখ-গুলো কপালে তুলে তাঁরা সেদিন সবাই একসঙ্গে বলে বসল: বল কি হে। বেটার নির্ঘাৎ মরণ ঘইনে এয়েছে রে। কিন্তু দিনের পর দিন পার হয়ে যাবার পরও 'বেটা' যখন 'মইল্ল' না—দিব্যি বহাল তবিয়তে হাড় মাংস নিয়ে জলজ্যান্ত বেঁচেই রইল। লোকালয়ের মানুষগুলো তখনো সবাই একসঙ্গে আতঙ্কে বলে উঠল: বেটা লেচ্চয়ই কোন অপদেবতা ধেপতা হবে। নইলে ভূতের রাজত্বে বেঁইচে থাকতি পারে-এ তো অসাধ্য কথা। শোন হে সকলে শোন—মঙ্গল যদি চাও তো অপদেবতার সন্তুষ্টি কর—পুজো লাগাও।

গাছ-গাছালির ডাল পালা আর লতা পাতা দিয়ে মানুষটা কোন রকমে মাথা গোঁজার মত একটা ছাউনি বানিয়ে তার মধ্যেই থাকত। নদী সাঁতরে ওপারের ঘন বন থেকে ই সব উপকরণ সে সংগ্রহ করে এনেছিল। ছাউনিটা ছিল একেবারে নদী আর চড়ার কোল ঘেঁষে। যেখানে জেলেরা ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় চড়ে চরের সঙ্গে এসে তির তির করে খেলা করত—ঠিক সেখানটায়। বড় বড় ঢেউ-এর ঝাপটায় জলের কণাগুলো অনর্গল এসে পড়ত লতায় ছাওয়া ছাউনির বেড়ার গায়ে গায়ে—টুপ টুপ। সে হেসে বলত:

সোহাগী নদীর সোহাগ দেইখেছ। কি বলে বল দিনি? পাইরলে না তো বইলতে। পারবাই বা কেমন কইরে। নদীর সাথে তো আলাপ কইরে দেইখলে না—তা-বুইঝবে কি পেকারে? তোমরা শোন 'টুপ টুপ' মুই শুনি টু উ উন, টু উ উন মানে বাজাও বাজাও। আচ্ছা তোমরাই বল দিনি সব কাজ কাম ফেইলে বাজাই কি কইরে? এক উচ্ছ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলেই মানুষটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হা হা করে হেসে উঠত। তার ঐ হাসির চোটে গোটা চরাটাই যেন হকচকিয়ে যেতো। লোকালয়ের হিসেবী মানুষগুলো যেতো চুপসে—এত হাসি লোকটা হাসে কেমন কইরে। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। লোকালয়ের সাথে মানুষটার পরিচয়ের পরের কথা।

সম্পত্তি বলতে মানুষটার কিছুই ছিল না। সে দিক থেকে একেবারেই ঝাড়া-পোঁছা। থাকার মধ্যে ছিল শুধু একটা নেংটি। একটা তীর ধনুক আর একটা বেহালা। তাঁর বাঁচার পক্ষে এগুলিই ছিল যথেষ্ট। কারণ তার জীবনের বুঝ ছিল নিতান্তই সাদা-সীধে। ক্ষিদে পেলে খেতে হয়। তাই শিকারে বেরোতে হয়। তাই তীর-ধনুক। মনের স্বস্তি চাই—তাই বেহালা। কোন এক পাহাড়িয়া জঙ্গলে "লুইকে থাকা এক ভয়ঙ্কর বাবু" তাঁকে ওটা দিয়েছিল। 'লুইকে থাকা বাবুটাকে' সে বড় ভালবাসত। তার কথা উঠলেই মানুষটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত: সেই বাবুটা মোরে অনেক কিছু শেখাইছে গো। আমি তো শালা কাঠ মুখ্যু। ঐ বাবুটাই মুখে মুখে মোরে অনেক কথা বইলত। .....ওঃ বাবুটা মোর চোখ খুইলে দেছে গো। "লুইকে থাকা বাবুটা'র কথা বলতে বলতে মানুষটার চোখের কোণগুলো জলে চিক চিক করে উঠত। কি রকম একটা দরদ—এক টুকরো ব্যথায় চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসত। এই বাবুটার সঙ্গ পেতে সে তাই অবসর পেলেই বেহালায় ছড় টানত: আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। লুইকে থাকা ভয়ঙ্কর বাবুটাই তাকে এ পদ শিখিয়েছিল।

মানুষটা দেখতে অনেকটা আদিম মানুষের মতই। চাল চলনেও তাই সাত ফুট লম্বা চেহারা। রোদে পোড়া পাকা কালো মিশমিশে রং। মাথায় জট পাকানো লম্বা লম্বা চুল। পাথর কাটা স্বাস্থ্য। ভোরে আলো ফুটতে না ফুটতেই হাতে ধনুকটা বাগিয়ে পিঠে এক বোঝা তীর বেঁধে সে বেরিয়ে পড়ত শিকারের খোঁজে। ভোরের চরায় রং বেরং এর কাঁকড়াগুলো মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। ছাউনি ছেড়ে চরায় পা দিয়েই মানুষটা আপন মনেই বলে উঠত: কি, তোমরা এই য়ে গেছ সব। মানুসটার সাড়া পেলেই কাঁকড়াগুলো এদিক-ওদিক গুড় গুড় করে ছুটে পালত। সেও ছাড়বার পাত্র নয়। দৌড়-ঝাপ করে মস্ত হুল্লোর বাঁধিয়ে দিত। কাঁকড়া-গুলোকে ধরে এক জায়গায় জড়ো করে সে প্রাতঃরাশ সারত: অনেক দৌড় করিয়েছে বাপেরা। বলেই একটার পর একটা গোটা গোটা কাঁচাই মুখে পুরে দিত। এর পর চলত আসল শিকার। মাছ আর পাখি। শিকার ধরতে তার ধনুক বাগিয়ে সে সারাদিন ছুটোছুটি করত তদীর পাড় ধরে ধরে।

লোকালয়ের মানুষগুলো লোকা-লয়ের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে তার ঐ সব কাণ্ডকারখানা দেখত। কেউ কেউ বলত বেক্কদত্যি এইয়েছে গো—চরার কাঁকড়া ফুরোলেই এ দিক পানে আইসবে—সব ছাড়কার কইরে দেবে। একটু লেখা-পড়া জানা বিজ্ঞ লোকরা বলতেন: আদিম কালে মানুষ তো ঐ রকমটাই ছিল। ভালই হইয়েছে মোদের আদিম চেহারাটা দেইখতে পাচ্ছি। বাচাল ছেলেরা বলত: আশুক দেখি বেটা এদিক পানে, শিরটা নামিয়ে দেব না।

মানুষটা যে মানুষ—হঠাৎ করেই তার প্রমাণ একদিন মিলল। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের নরম নরম আলো পড়ে গোটা চরটাই একটা কবিতা। সারা দিন শিকারের পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত শরীরটাকে চরার কোলে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষটা আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই বেহালার ছড় টানছে। হঠাৎ সেই চিৎকার: কে কোথায় আছ গো রক্ষে কর।

—চুপ যা মাগী চুপ যা। খন্দনাথ-বাবুর ধান চুরি কইরে আবার চেল্লা-চেল্লি। গতরটা দে, ছেইরে দেব। খন্দনাথবাবুর লেঠেল গঙ্গারাম কোত্থেকে একটা মেয়েকে ধরে এনে শাসাচ্ছে।

—ছেইরে দাও বাপু ছেইরে দাও। ভাল চাও তো ছেইরে দাও। এই মিঠা রাইতে খুন খারাপী কইরতে চাই না—ছেইরে দাও। সাত ফুটী দীর্ঘ শরীরটাকে বেতের মত দুলিয়ে মানুষটা সটান দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল।

—কে রে···কোয়ানকার লাট সাহেব এইয়েছেন—ছেইরে দিতে বল্লিই ছেইরে দিতে হবে।

—তবে রে শালা···। শাঁ শাঁ। গঙ্গারামের আস্পর্ধা দেখে মানুষটার মাথায় খুন চেপে গেলো। কথা সে একবারই বলে। দ্বিতীয়বার আর কথা নয়—সোজা ধনুকের ছিলায়ে টান কষে। এই ভাবেই সে শত্রুকে শায়েস্তা করে। গঙ্গারামের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। দু'টো তীর এসে গঙ্গারামের বুকটাকে এ ফোড় ওফোড় করে দিল। কেমন রে শালা চোখ দু'টো থেইমে। গেলো তো। ভাল কথা বলতিছিলাম গায়ে লাগল নি—এবার বোঝ ঠেলা হা···হা···হা। এক বিকট হিংস্র হাসিতে ফেটে পড়ল মানুষটা।

দত্যির মত মানুষটাকে এত কাছে দেখে মেয়েটা ভয়ে একেবারে চুপসে গেল: এক বিপদ কাটল বটে। আবার এ কোন্ আপদ। কোন রকমে শরীটাকে গুছিয়ে নিয়ে ছুটতে যাবে, এমন সময় মানুষটা আবার হেসে উঠল: ভয় নাই গো ভয় নাই। ছুটতি গেলি পইড়ে যাবা যে। নরম নরম হাড়গুলো ভাইঙবে যে। খারাপ করার মন থাইকলে মোর সঙ্গে ছুইটে পারবা।

এই মেয়েটার মুখেই তাঁর 'অন্য' খবর গিয়ে প্রথম পৌঁছল লোকালয়ে: শোন গো শোন—সে অপদেব্‌তা লয় গো, জলজ্যান্ত মানুষ। মোদের মত মন আছে তাঁর। মোরে তো ভূতে ধরেছিল। খুন কইরবার তরে চরায়ও নিয়ে গিয়েছিল। হুই মানুষটা মোরে বাঁচায়ে দেছে। মেয়েটা সব বিতান্তই

বলল। বলল না শুধু গঙ্গারামের কথা। কারণ খন্দনাথবাবুর কানে খবরটা গেলে, গ্রামশুদ্ধ জ্বালিয়ে দেবে এই ভয়ে।

মেয়েটার সব কথাই প্রায় সবাই বিশ্বাস করল কিন্তু মানুষটাকে মানুষ বলে মেনে নিতে পারল না কেউই : দূর মেইয়ে, ভূতের সঙ্গে মানুষ লইড়বে —তার সাধ্যি কি। ও বেটা যে অপদেবতা—এতে আর সন্দেহ কি। ভূত মেইরেছে—এটাই তো বড় পেরমান। তবে খবরটা শুনে সবাই খুশী : যাক বাবা এত দিনে ভূতের চর ঠাণ্ডা—এবার দেখি ভূত বাবাজীরা যায় কোথায়।

খোদ ভূতের চরে ভূতোভবে পররর কথা শুনে সবাই স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেললেও খন্দনাথবাবু কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মানুষটার ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন। কোন রকমে একটা সুযোগ পেলেই হয় বেয়াদপী ঠাণ্ডা করে দেবেন। গঙ্গারামের মৃত্যুর বদলা হয়তো নিয়েই নিতেন যদি তার পাইক বরকন্দাজরা ভয়ে বেঁকে না বসত : না, বাবু, ও বেটা আস্ত দত্যি—ও মুখীও মোরা যাচ্ছি নে—তীর মেইরে মেইরে বুকটা একেবারে ঝাঁঝরা কইরে দেবে। তবে, খন্দনাথ বাবুও হাত পা গুটিয়ে থাকার পাত্র নন। তিনি তার ছক ধরে এগোতে লাগলেন।

* * *

এর পরের বিত্তান্ত একেবারেই আচমকা। সন্ধ্যে গড়িয়ে সরে রাত পড়েছে। সারাদিনের শিকার শেষে মানুষটা ছাউনিতে ফিরছে। তার হঠাৎ কি মনে হল। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল : ভেরম হতিছি না তো। না এত ভেরম হবার তো কথা লয়। ও নির্ঘাত আলো না হইয়ে যাচ্ছে না। ছাউনির ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু লণ্ঠনের আলো দেখে মানুষটা কৌতূহলী হয়ে উঠল : তাই তো বটে। পিদিম জাইল্ল কে?

দ্রুত পা চালিয়ে মানুষটা ছাউনীর সামনে এসে দাঁড়াল : কে গো বলা নেই, কওয়া নেই ঘরে পেবেশ করিছ বড়, ভালয় ভালয় বেইরে যাও, বাপু।

—দাঁড়াও বাপু গোঁয়ার গোবিন্দ তীরটির মেইরে বস না কেন। ছোট, একটা লক্ষ হাতে সেই মেয়েটা বেরিয়ে এল।

মেয়েটাকে দেখে মানুষটা একেবারে হতভম্ব। কি রকম বোকা বনে গেল। যে হিংস্রতা নিয়ে সে ছুটে এসেছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা কোথায় উবে গেলো। কি রকম একটা কোমল অনুভূতি যেন তাকে অবশ করে ফেলল। হাতের শক্ত মুঠিতে বাগানো তার ধনুকটা কেমন আলগা হয়ে এল : তা তুমি এখানে এইয়েছ যে বড়।

মেয়েটা তার যৌবন-মাখা দেহটা দুলিয়ে দুলিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল : কি আমার পুরুষ গো—এটাও বুইঝতে পার না।

মেয়েটা হাসে আর মানুষটা অবাক হয়ে ভাবে : কি নিলাজ বেহায়া মেইয়ে গো। ভয় নাই ডর নাই—একটা অচেনা অজানা সমর্থ পুরুষের সামনে দাঁইড়ে গতর দোলায়ে হাঁইসছে। মানুষটা কেমন বোকা বোকা চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার ঐ বোকা বোকা ভাব দেখে মেয়েটা আবার একচোট হাসিতে ফেটে পড়ল : অমন হা কইরে ভাইবতেছ কি? পুরুষের গন্ধ নাকে লেইগেছে, তাই চইলে এলাম। মোর গতরটা ছুঁইয়েই দেখ, মায়া আই সব। মনটা নরম হবে। লোকে মানুষ বইলবে। এরপর থেকে মেয়েটা তার পাশেই থেকে গেল।

খবরটা শুনে লোকালয়ের মানুষগুলো শুধু আতঙ্কে কঁকিয়ে উঠল একবার : কি সর্বনেশে কথা গো। বেটা শুধু ভূত থেকোই লয় গো, মেইয়ে মানুষও তুক করে।

এ ভাবেই কাটল বছর খানেক। একদিন মানুষটার সন্তান কোলে মেয়েটা এসে লোকালয়ে হাজির। লোকালয়ের মানুষগুলোও সব জড়ো হল। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুটির হাত-পা সব তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখে সকলে মিলে রায় দিল : তাই তো বটে। মনুষ্য সন্তানই তো বটে।

এই প্রথম লোকালয়ের মন টলল। লোকালয়ের মানুষ চরার মানুষটা সম্পর্কে নতুন কথা বলল। তবে, সংঘবদ্ধে তখনও গেল না। যাকে একদিন অপদেবতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাকে, একেবারে এক কথায় মনুষ্য সমাজে ঠাঁই দিতে কি রকম একটা বাধ বাধ ভাব। তাঁদের বয়েই গেল : লোকটা মানুষ তো বটেই। তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আরও কিছু লক্ষণ সকলে না দেইখে সমাজে ঠাঁই দিই কি কইরে বল দিনি। সহসা একটি সাহসী যুবক বলে বসল : মুই যাব হুই লোকটার কাছে।

তারপর সত্যি সত্যিই সাহসী যুবকটি একদিন চরায় গিয়ে হাজির হল। লোকালয়ের মানুষগুলো ঘরে বসে রইল নতুন খবরের প্রতীক্ষায়। যুবকটি গিয়ে দেখল : এক ছোপ সবুজ-চত্বরকে ঘিরে মানুষটা রীতিমত নাচানাচি করে দিয়েছে—এদ্দিনে পেকৃতির সুবুদ্ধি হইয়েছে। রে বউ হইয়েছে। গঙ্গারামের সাথে ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে মেয়েটার ঢোচড় থেকে ঝরে পড়া ধানের বীজগুলো রোদ-বৃষ্টি পেয়ে পেয়ে চরার বুকে ধানের চারার জন্ম দিয়েছে। তাই দেখে মানুষটা একেবারে আত্মহারা : ও বউ, ও বউ এদ্দিনে চড়া উর্বর হইয়েছে রে। দেইখেযা, দেইখে যা।

—দেখন লাইগব না। মেয়ে-ছেলের ছোঁয়া লেইগে চরা উর্বর হইয়েছে। এবার চাষ দিলেই ফসল হইবে। গতর দুলিয়ে মেয়েটা জবাব দিল। তারপর ছাউনির ভেতর থেকে একটা কোদাল এনে দাঁড়ালো এসে মানুষটার পাশে :

বাঃ বাঃ বছরখানেক হইয়ে গেল মোর কবর থেকে ধান পইড়েছিল। এতদিন লেইগে গেল চারা জন্মাতে? —চরার বুকে রস ছিল না যে। এই তো সবে রস এয়েছে বোঝা যাচ্ছে। বীজ তো সহজে মরে না। যেমনি রস পেইয়েছে, অমনি ঠেইলে উঠিছে।

সাহসী যুবকটি চরের এই নতুন বিত্তান্ত লোকালয়ে গিয়ে রাষ্ট্র করে দিল : তোমরা সবাই শোন হে সকলে। চরার মাটিতে রস এইয়েছে

গো রস এইয়েছে। সবুজের ছোপ দেখি আলাম। মানুষটা চাষে লেইগেছে।

সাহসী যুবকের কথা শুনে লোকালয়ের মানুষগুলো তো হতবম্ভ: বল কি হে মানুষটা চাষও জানে! তাহলে তো মানুষটা সভ্যও বটে। তোমাকে দেইখে লোকটা কিছু বইলল না।

—বইলল, খুব ভালো কথাই বইলল। মোরে সে বইলল—তোমরাও চলি আসনা। মিইলে মিইশে কোদাল চালাই। সোনা ফইলব। ভাতের আকাল থাইবক না।

—তারপর তুমি কি বইললে তারে?

—মুই বইলাম এ চত্তরে যত জমি দেখো, সবই খন্দনাথবাবুর। বেটার জমির আর যেন শেষ নাই—দুই আকাশে গিইয়ে মিইশেছে। এ চরার জমিও তার।

—তারপর সে কি বইললে বল?

—সে বইললে, তা কেনে হবে? এ হল গিইয়ে চরার জমি—নদী মইরে উইঠেছে। এ হল গিইয়ে প্রেকৃতির দান। এ জমি সকলের।

—এরপর তুমি তারে কি বচন শোনাইলে?

—মুই কইলাম এ তল্লাটে জমি মানেই মন্দনাথবাবুর। থানা পুলিশ সবই তার কব্জায়। তার বাভানে ভোগ না দিইয়ে ফসল ভোগ কইরবে কোন শালায়।

—তারপর সে কি বইললে?

—সে বইলল, রাখ তোমার থানা-পুলিশ। দেরস দেব মোরা আর উনি তক্তপোষে বইসে পা দুইলে দুইলে ভোগ করবেন—এ আবার কেমন বিধি গো। মোরা যখন জঙ্গলে ছিলাম তখন তো যা কিছু যোগাড় করতাম, সবাই সমান ভাগ করি খেতাম। এটাই তো আদি কথা গো—প্রেকৃতির নিয়ম গো। সেই ভয়ংকর বাবুটাও এই কথাই বইল তো। ভয়, এখানে কেন অন্য নিয়ম হতি যাবে? তোমরা আস দিনি সব—মিইলে মিইশে চা করি। কথায় বলে লোকবলই বল। যা নিয়ম কইরবা তা-ই নিয়ম হবে। বুইয়েছ।

সাহসী যুবকটির মুখে মানুষটার সর্বশেষ বিত্তান্ত শুনে লোকালয়ের মানুষগুলো এক কাট্টা হয়ে বলল: লোকটা তো ঠিকই বইলেছে। তালুকাটা রইদে ছেরম দেব মোরা, আর ভোগ কইরব খন্দবাবু—এ চলতি পারে না। পুরানা নিয়ম এবার পাল্টায়েদিব।

তারপর সত্যি সত্যিই একদিন লোকালয়ের মানুষগুলো সংস্কারের চৌকাঠ পেরিয়ে চরার বুকে এসে আছড়ে পড়ল। হাজার কোদালের ঘায়ে চরার বুকটা ফালা করে দিল। সবুজ ধানের শীষে শীষে শুকনো চরা ফলবতী হয়ে উঠল। নবান্নের শিহরণ তার অনুতে অনুতে।

তবে, তখনও বসতি গড়ে ওঠেনি। মানুষটা তখনও চরার একমাত্র অধিবাসী। সারা দিনের চাষবাস সেরে মানুষটা বেহালা বাজাতে বাজাতে গোটা ক্ষেতটাই সে চক্কর দিয়ে বেড়াত। কখনও কখনও ধানের শীষের গোছায় গালগালিয়ে আদর করে বলতঃ দুধ এইয়েছে বুঝি। আহ্লাদ আর তাই ধইরতেছে না। বাসাতের সাথে সোহাগ জমায়ে মজা কইরে খুব দোল খাওয়া হচ্ছে। মোরা যেদিন ধরে মইটকে ঘরে তুইলব—সেদিন বুইঝবা ঠেলা।.....খন্দনাথবাবু তো ওৎ পেইতে বইসে আছে। মতলব খানা কি শুনি—তার ঘরে যাইবা নাকি। এই রকম বেইমানী কইরলে কিন্তু পোড়ায়ে ছাই কাইরে দেব বইলে দিলাম।.....এই দেখো আমনি অভিমান হল বুঝি। গাল ফুলাইয়ে মাথাটা নামায়ে নিলে যে বড়...না, না, ভয় নাই। খন্দনাথবাবুর সাধ্য কি তোমাদের গায় হাত দেয়। যান দেব তো ধান দেব নি।...থাক বাবারা রেত হইতেছে—এবার সকলে নিদ্রা যাও। এই বলে ধানের শীষের গোছায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মানুষটা এক সময় বেহালা নিয়ে বসে পড়ত।

ঠিক সেদিনও মানুষটা বেহালাটা নিয়ে তন্ময় হয়েছিল। আচমকা এক ঝলক শানলো আলো অন্ধকারের কালো পর্দাটা ফুড়ে মানুষটার চোখে এসে বিধল। সাদা সিধে মানুষটা সামনা সামনি লড়াই ই শুধু বোঝে। অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে লালিত ষড়যন্ত্র যে এমনি করে আলোর ঝলক তুলে ছড়িয়ে পড়তে পাবে মানুষটার সে বোধ ছিল না। সে তাই কেমন হকচকিয়ে গেল। কি রকম এক অদ্ভুত বিহ্বলতা তার গোটা অস্তিত্বকে আড়ষ্ট করে ফেলল। আলোর ফোকাসের মধ্যেই সে সটান দাঁড়িয়ে রইল: কে গো তোমরা মোদের ছেরমের ফসল মাইড়ে দিচ্ছ বড়। খন্দনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: তোমার বাপের জমি পেয়েছ, শালা। তারপর শুধুই একটা শব্দ তরঙ্গ: শুট শুট। মানুষটা পালানো না। কারণ সে পালাতে জানে না। বেহালাটা আকাশে তুলে শুধু বলতে চাইল: আমার এটার মরণ নাই গো। এটা বাইজবে—চিরকাল বাইজবে। তারপর .....।

...তার পর একদিন বিহ্বলতা কেটে গেল। হাজার মানুষ এসে বেহালাটা তুলে নিল। বুটের ক্ষত মুখে পড়ল নতুন পদ চিহ্ন।

শারদীয়া পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কঠিন মনের জন্ম হয়

সতীশ চক্রবর্তী

কঠিন মনের জন্ম হয়
চিরকালই হয়
অন্ধকারের সুপ্ত গহ্বর থেকে।

কঠিন মনের জন্ম হয়
পথ চলতে চলতে,
বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরি
আর চোখে ঘৃণার অনুভূতি।

উর্বর জমির সবুজ ক্ষেতে
রক্ত ঝরে পড়ে। সবুজ
যেখানে কাল অন্ধকার হয়ে যায়—
কঠিন মনের জন্ম হয় সেখানেও।

অপসংস্কৃতির ঘোষণা অবাধ।
খুন, জখম অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার
হাতিয়ার। উগ্র সেক্স, ভায়োলেন্স
সংস্কৃতিবান (!) শিল্পীদের সাংস্কৃতিক মুখপত্র।

দীর্ঘ বিলম্বিত পাহাড়ের শৃঙ্খল থেকে
আজও জন্ম হয় কঠিন মনের।
কঠিন মনের জন্ম হয়
চিরকালই। সুপ্তোত্থিত অন্ধকারের
কাল গহ্বর থেকে॥

এক দুঃসাহসী নাবিক

অরুণ মণ্ডল

হাতের মুঠোয় ছিল আমার সোনারকাঠি
আমার জীবন, আমার স্বপ্ন
তাই কলম্বাসের মতো
সাত সমুদ্দুর ভাসিয়ে তরী
দূরে বহুদূরে ভেসে গেছি আমি...

আজ দামাল হাওয়ায় হারিয়ে গেল
সমস্তই হারিয়ে গেল
সেই সোনারকাঠি সেই স্বপ্ন
আর সেই বয়সের দুঃসাহসী নাবিক
এখন আমি মানুষ, কঠিন এক মানুষ।

অর্গল কিম্বা অশ্রুজল

দেবারুণ রায়

কেউ ক্লান্ত ভ্রান্ত কেউ কেউ
কেউ কেউ শব্দচয়ন করে
হাতের কাছের কোনো ফোটা ফুল
ভিজে রাস্তা প্রাইভেট গাড়ীর কাচ
এ বছর যে কত বৃষ্টি দেখলাম

কত যে ভালবাসা জমা হ'ল
তবুও অন্তঃস্থলে অচেনা শব্দেরা আসে
কুমোরের কাছে আমার মায়ের মুখের ছাঁচ
কি ভীষণ খাঁ খাঁ করছে চৈত্রের নদীর মত
আমার অর্গল ঘিরে
কত প্রতিধ্বনি পড়ে থাকলো
তবু স্বাধীনতা
সে অর্গলে আমি তোমায় বাঁধতে পারি না

সার্কাস

শংকর চক্রবর্তী

এখন নোতুন খেলা শুরু হবে উৎকর্ণ সবাই
সার্কাস এরেনা জুড়ে উৎসুক জনতা বসে আছে
প্রয়োজনে তালি দেবে কিংবা কিছু সোচ্চার বাহবা
ক্লাউন আসবে যাবে উপরন্তু কিছু পাওনা নিয়ে
বাঘ সিংহ হাতি সব এক ঘাটে জল খেয়ে ফের
ভীরু শশকের মত ফিরে যাবে নিস্তেজ গুহায়।
দুটো প্রাণবন্ত মেয়ে শূন্য থেকে মৃত্তিকায় ঝাঁপ
দিয়েও ছোঁবে না মাটি আবার শূন্যেই ফিরে যাবে।
বিদূষক আসবে যাবে রাজা থেকে দীনতম ভাঁড়
প্রাণবন্ত ভাঁড়ামো শেষে পেতে চাইবে সহর্ষ বাহবা।
চতুর বানর এসে নিয়ে যাবে সব শুপ্তধন।
বাঘের গর্জন শুনতে এসে কোনো ক্ষুব্ধ ধড়িবাজ
কৌশলে ঢিলের ঘায়ে মেজাজে আগুন
ধরাতে গিয়েই দেখবে :
কি আশ্চর্য বাঘ তো নড়ে না—
বাঘের গলায় ডাকে ঘোমটা-দেওয়া বিক্ষুব্ধ ক্লাউন॥

পরাজিত মানুষ, বিজিত সাম্রাজ্য

প্রফুল্ল অধিকারী

একটু আগেই এখানে ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে
ভাঙা গাছপালা, ওড়া ধুলোয়
কিছু চিহ্ন, প্রতি চিহ্ন—
একটা অস্থির সাম্রাজ্য ডিঙিয়ে, অন্য কোথাও
যাবার কথা ছিল আমাদের—
নির্জন রাস্তায় কুঠারের শব্দ
খেজুর বাতাসে কোলাহল
মুখর মানুষের হা হা ধ্বনি—
পাথরের গোঙানি, জঙ্গলের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে
গাঁইতিতে পথ কাটছিলাম, ঠুং ঠাং আওয়াজ
এগোচ্ছিলাম আকাঙ্ক্ষিত সড়কের দিকে—

কোনদিন সে পৃথিবী আবিষ্কৃত হবে কি না
জানি না—
রৌদ্র, রক্ত চৈতন্যের ভিতর
পরবর্তী চিত্রের অপেক্ষায়
প্রহরের ঘণ্টায় গন্ধ শুঁকছিলাম উদ্বিগ্ন স্মৃতির—

একটু আগেই সাইক্লোনে ছিঁড়ে গেছে স্বপ্ন
আমাদের বস্তী, অস্থায়ী তাঁবু—
তছনছ হয়েছে ক্ষেত, সড়ক—
আসন্ন বিষাদ ; বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে
প্রেম ও স্বপ্নের নির্মীয়মান দৃশ্য দেখতে দেখতে
হারানো সঙ্গীদের খুঁজতে খুঁজতে, আমরা
আরেক সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রতীক্ষা

সঞ্জীব ঘোষ

তোমাকে খুঁজেছি—কালবৈশাখীর পাগল করা ঝড়ে
খুঁজেছি—উন্মত্ত সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বালুচরে,
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর ছোট্ট দেশে।

তোমাকে খুঁজেছি—মরুভূমির পথ চাওয়ার মাঝে
খুঁজেছি—ঘন বর্ষণ সিক্ত ঐ মধুর সাঁঝে,
শিউলি কাশের ঐ বন ঝাড়ে।
খুঁজেছি—অন্তরের অন্তস্থলে।

তোমাকে খুঁজেছি—হেমন্তের ঐ শস্যভরা প্রান্তরে
খুঁজেছি—শীতের জীর্ণতায়-সকলের অগোচরে,
বসন্তের সেই নিবিড় ভাল লাগায়।
খুঁজেছি—আমার নিদ্রাহীন চোখের পাতায়।

তবু পাই নাই দেখা, জেনো বসে আছি, হে প্রিয়
হে সুন্দর, পরিপূর্ণতার মোহন রূপে, একবার দেখা দিও।

যন্ত্রযুগ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কে জানে কী হলো ক'দিন থেকেই বলছে আত্মারাম :
'ভেবে দ্যাখো, ওহে, ভেবে দ্যাখো।'
তাই তলিয়েই ভাবলাম।
মুক্তি কোথায় ? চিরটা কালই তো শাসনেই
আছি শিষ্ট,
পেয়েছি কি অদৃষ্ট ?

মন্ত্রই ছিলো ঈশ্বর আর ঈশ্বর ছিলো মন্ত্র
মন্ত্রচালিত ছিলো ঈশ্বরতন্ত্র।
সেটাই যে ঠিক ছিলো বা ছিলো না—
সে রকম কিছু আমি বলবো না ;
শুধুই বলছি অনেক পিছনে ফেলে
এসেছো সে যুগ ; আফ্‌সোসে নেই লাভ।
খতিয়ে দ্যাখো তো এখন কোথায় এলে—
চারিদিকে শুধু চোঙে চোঙে হুয়লাপ।
সামনে ওটা কী যন্ত্রের মতো ?
জীবিকাতাড়নে ঘোরে অবিরত
অর্জনে উৎপাদনেই রত—
জয়, বিজ্ঞান জয়।
গ্রাসাচ্ছাদন সমস্যা দেখে
অর্থকে লোকে নিয়ে এলো ডেকে—
জয়, অর্থের জয়।
চোখের সামনে সকলেই যাচে এ দুয়ের বরাভয়।
ঈশ্বর গিয়ে এসেছে অর্থ
তাতেও বেধেছে সেই অনর্থ
—সেই একই কানামাছি।
চোখে ঠুলি প'রে ঘুরছি সকলে ধ'রে যন্ত্রের কাছি।
ছিলাম মন্ত্রশাসনে এখন যন্ত্রশাসনে আছি।।

আমাদের পৃথিবীর জন্যে

দীপক ধাম

হাজার প্রশ্নের উত্তর একটিই ;
লক্ষ্য একটিই—পথ একটিই

তূণ ভরে নাও অনিবার্য শরে।

বুকের মধ্যে তোলপাড় কবিতায়
ত্রিকাল জয়ের স্পর্ধা জাগাও,

সব কষ্ট ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে
এক ফলন্ত পৃথিবীর জন্যে
ঘরে ঘরে আনো দুরন্ত নদী।

একটি চিঠি

রেবা ঘোষ

তোমাদের ওখানে, বন্ধু কি বেশে,
এসেছে জানিনা ;
অনেক দিন চিঠিও তো পাইনা।
তোমার রয়েছে অজস্র কাজ।
সংখ্যাতীত ভাবনা-চিন্তা,তোমার মনের গভীরে
তাদের জন্ম। যারা রয়েছে অন্ধকারে।
এখানে, মানে কোলকাতায়,
রাস্তায় খেলছে জলের ঢেউ ;
ফুটপাথে যাদের সংসার,
মাঝে মাঝে চলছে তাদের অরন্ধন।
উনান জ্বালাতে পারছে না কেউ।
কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ পার হয়ে
ঠেলে ঠুলে বাসে উঠে অফিসে যাচ্ছি।
একতলার কোঠা ঘরে জল..তক্তপোষে শুয়ে,
কড়ি কাঠে নজর রেখে, ভাবছি শুধু ভাবছি
তোমার রিলিফের নৌকা নিয়ে
ফিরছো তুমি গ্রাম হতে গ্রামে।
দুর্গত ; বুভুক্ষিত ; বঞ্চিতরাই রয়েছে ;
তোমার হৃদয় জুড়ে।
সেখানে এতটুকু ঠাঁই নেই কি আমার জন্যে।

নচিকেতা

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছোট্ট ছেলে
যার চারপাশে শুধু তাকিয়ে দেখার রহস্য
একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল
মেঘের আস্তরণ ছিন্ন ক'রে বৃষ্টি নেমেছে
পাহাড় সমতল
সব একাকার ক'রে।
আমাদের সমস্ত রাগ চিন্তা ভালোবাসা
সব কিছুর সমাহারে
পৃথিবী সবুজ হয়ে উঠেছে।
সে উচ্ছল হয়ে ভেঙে পড়তে চাইলো
অভিমানী যন্ত্রণার মতো—
পৃথিবীর যাবতীয় আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে দাঁড়িয়ে
ঘোষণা করতে চাইলো :
'আমি মৃত্যু চাইনা,
শুধু তার উৎসটিকে ধরতে চাই।'
মুহূর্তেই যেন বিশ্বাসের মতো
স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক—
আর সেই মৃত্যু স্থবির বার্ধক্যের
হাহাকারে ভরা উদাসী হাওয়া
ফিস ফিস করে বলতে শুরু করল :
'চুপ করো নচিকেতা,
ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না।'

নীল পাখি

দীপক হালদার

নীল পাখি দানা খুঁটে খায়।
দাঁড়ের উপরে বসে
লেজের বাঁধুনি কষে
নীল আকাশের দিকে
ফিরে ফিরে আড়চোখে চায়।

যে নীল আকাশ
আর কেঁপে ওঠা কাশ
আর পুজোর বাতাস
এককালে হাতছানি দিল তার ঝলকানো গায়।
তার দিকে আড়চোখে ফিরে ফিরে চায়।

আজ সে আকাশ নেই।
কাশবনে সাপেদের মৃত্যু হল ফলিডল খেয়ে।
পুজোর বাতাস বিষাক্ত
আলু বেগুন চ্যাঁড়সের প্রাক্তন গুণগান গেয়ে।
শুধু নীলপাখি দানা খুঁটে খায়।

কেউ বলে কি নিষ্ঠুর।
কেউ বলে, বাঃ বাঃ, কি সুন্দর পাখি।
কেউ বলে এমন পাখিকে কেউ বন্দী রাখে।
শুধু নীল পাখি

শোনে না টিনে ভরা বাক্সবন্দী এ কথা।
কেবল আড়চোখে দেখে —
দাঁড়ের উপরে বসে
ঠিকঠাক তার দানাপানি থাকে যেন
যেন ফুরিয়ে না যায়।

শেষ প্রশ্ন

টগর দাস

অনেক অনেক পথ চলা তো হলো।
পথ আর বাকি কতো।
কোথায় চলার শেষ?
আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথ প্রান্তে
যেখানে আকাশ মেশে মাটিতে
যেখানে দিনের শেষে ম্লান সন্ধ্যায়
রক্তিম সূর্য ঢলে পড়ে অস্তাচলে ;
ভাসমান মেঘ যেখানে পথ হারায়
সেখানে সকল পথ গেছে থেমে।
জীবন প্রান্তের সেই অচেনা দেশে
যখন আমিও যাব থামি,
তখনই উচ্চারিবে শেষ প্রশ্ন,
কিন্তু মিলবে কি উত্তর ?

অপসংস্কৃতি: কি ও কেন

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ব্যবহারের দিক দিয়ে 'অপসংস্কৃতি' শব্দটা খুব পুরোন না হলেও সমস্যাটি গভীরের; ক্যানসারের মত সমাজ-জীবনের শিরা উপশিরায় এর বিস্তার ঘটে এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সবকিছু কুরে কুরে খায়। ধর্মীয় গোড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, কুনো জাতীয়তাবোধ, মন্ত্রতন্ত্র ও তুক তাক, বাবানাম ও মাদুলি-কবজ সহ জীবনচর্যার সবরকম বিকৃত ও পশ্চাৎপদ ঝোঁককে অপসংস্কৃতি বলাই ঠিক।

সংস্কৃতি ব্যাপারটাই একটা জটিল প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে কালচারের বাংলা করে সংস্কৃতি বলি। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটা পছন্দ করেননি; স্থূল আদিম সভ্যতার সংস্কার করা অর্থে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। 'কৃষ্টি' শব্দের সঙ্গে কর্ষণ (কৃষ্+তি) সভতার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ইংরাজী 'কালচার' শব্দের লাতিন উৎস 'কালতুরা', যার মানে 'কোন কিছু করা'। জার্মানিতে একেই 'কুলতুর' বলে। মানুষ যখন প্রকৃতির হালচাল বুঝছিল, তাকে ঠেকাচ্ছিল, বাধার সঙ্গে লড়ছিল এবং ক্রমে পাথর ব্যবহার করে ও আগুন পেয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে, প্রকৃতিকে বাগে আনছিল তখন তাদের সকল যৌথ কাজকর্মের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ও পরবর্তী স্তর সম্পর্কে একটা বোধ, অনুভূতি ও ভাব-কল্পনার জন্ম নিচ্ছিল; অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার সূচনা হচ্ছিল এবং একেই মানব সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর বলা যায়। কিন্তু কৃষ্টি বা কৃষি-সংস্কৃতি আরও পরেকার ঘটনা। এ শব্দটি তাই কালচারের সঠিক বিকল্প হতে পারে না। মোট কথা, মানুষের সংস্কৃতি মানেই, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা গোলামী থেকে স্তরে স্তরে মুক্তির ইতিহাস।

অবক্ষয়ের সংস্কৃতি—
সংস্কৃতির অবক্ষয়

গত যুদ্ধের পর, প্রধানতঃ পঞ্চাশের দশক থেকে, সঙ্কট-জর্জর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষয়িষ্ণু একচেটিয়া পুঁজিবাদের পাহারাদারীর কাজে এশিয়া আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে অপারেশন চালিয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে 'ম্যানুপুলেটেড ম্যান' তৈরীর কর্মসূচী নিয়েছে। উৎপাদনের উপকরণগুলির সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বিচ্ছিন্নতার সময়ে, অবদমন ও অবক্ষয়ের সময়ে একদিন যেমন ধর্ম বা আত্মার তত্ত্ব এসেছিল, আজ এই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে এবং তারই রাজনৈতিক সংকটের পর্যায়ে ফ্যাসিবাদের উপরিথাক বানাতে তৎপর শাসকশ্রেণী নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, বস্তুগত বাউণ্ডুলেপনা বা বিদ্রোহ, সবকিছুতেই মূল্যবোধহীনতা, নবীন প্রবীণের সংঘাত, খুন রাহাজানি, প্রতিহিংসা, মানববিদ্বেষ, যৌন সম্ভোগের নৈরাজ্য—এই সমস্ত উপাদানে শিল্প সাহিত্য, নাটক-চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিসন ও জনগণের সবগ্র জীবনচর্যার মধ্যে চালান করছে। উদ্দেশ্য সেই একই—সব রকম ক্ষুধাই নষ্ট করে দেওয়া, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অনুভূতিগুলিকেই অসাড় করে দেওয়া, মনটাকেই বদলে দেওয়া। এই অবক্ষয়ী সমাজ যে 'অবাধ স্বাধীনতা' বা 'মুক্ত দুনিয়া'র কর্মসূচী রাখছে তা হল, নরনারীর প্রেমের গুরুত্বও। মূল্যবোধ থেকে মুক্তি, জননী হওয়ার দায় থেকে মুক্তি এবং যৌন সম্ভোগের অবাধ স্বাধীনতা (প্রধানতঃ কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদের মধ্যে)। আজ সামাজ্যবাদী ঘাতকশ্রেণীর কাছে এটাই 'বিকল্প সমাজ' যা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প সমাজের চাহিদা ও দাবি থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলী লাইন। এর ফলে কী ঘটছে?

মদের সঙ্গে যেমন চাট্, পুজোর সঙ্গে যেমন পুরুত, তেমন মূল্যবোধহীন পাশবিক যৌন সম্ভোগের সঙ্গে তেমনি নাইট-ক্লাব ও ব্রথেল ইত্যাদিতে পপ, ক্যাবারে রক এ্যাণ্ড রোল, শেক, ক্যান্‌ক্যান ইত্যাদি ভয়ংকরভাবে ব্যাপক ও শিকড় সঞ্চারী হয়েছে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র, নাটক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলিকে নিও-ফ্যাসিস্ট কায়দায় এমন যায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাতে প্রায় গোটা সমাজটাই এই ধরনের বিকারের তাড়নায় উগ্র হয়ে উঠেছে। মহান চিলীয় কবি পাবলো নেরুদা তাঁর 'কবিতা ও দুর্বোধ্যতা' প্রবন্ধে বলেছেন: 'আমার বিশ্বাস পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতি আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত···হলিউড আজ জনসাধারণকে লোভ দেখানোর জন্য এবং সিনেমাদর্শকদের মনকে নির্দয়ভাবে আচ্ছন্ন রাখার জন্য বলতে গেলে একমাত্র নগ্ন নারীদেহ ও খুন-সন্ত্রাসের বেসাতি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত সাময়িকপত্র, অসৎ শিশু সাহিত্য ও গোয়েন্দা কাহিনী গুলি সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। এই বেনিয়াসুলভ আক্রমণের মুখে পড়ে আমাদের নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সুস্থ অভিব্যক্তিগুলি ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।' আমাদের মত সামন্তবাদী অবশেষের সঙ্গে যুক্ত দেশী-

বিদেশী পুঁজির আধিপত্যে গড়া উন্নয়নশীল সমাজে সামাজ্যবাদী 'সাহায্য' ও 'সহযোগিতা' ছেড়ে কথা কইছে না। এই ধরনের মুনাফাভিত্তিক মিশ্র—অর্থব্যবস্থার পাহারা লাগাতে বিপুল পরিমাণে আমদানি হচ্ছে প্রায় নগ্ন নারীদেহের বিচিত্র লীলাভঙ্গি সম্বলিত 'নাইট ক্লাব' সিরিজের, 'ওম্যান ওব দি ওয়ার্ল্ড' সিরিজের, স্পাই সিরিজের এবং যুদ্ধ সিরিজের ছবি। এ সব ছবিতে খুনী প্রতারক গুণ্ডা সমাজবিরোধী নায়কদের কার্যকলাপকেও আদর্শায়িত করা হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের যুগে মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এই ধরনের বক্তব্য রেখে মুক্তিযুদ্ধের আবেগকেও ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে ক্রুশ্চেভোত্তর সোভিয়েত রাশিয়াও পিছিয়ে নেই। এই পর্বে তোলা ফরটি ফার্স্ট, ক্লিয়ার স্কাই ও ব্যালাড অব এ সোলজার ছবিতে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বুর্জোয়া উদারনীতি ও ব্যক্তিগত প্রেম ঢুকিয়ে বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের প্রবণতাকে থিতিয়ে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ আইজেনস্টাইন ও ডবঝেঙ্কো ও গোর্কি প্রমুখ মহান স্রষ্টাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ঐতিহ্য থেকে শিল্প-সাহিত্য সহ জীবনচর্যার সকল ধারাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কেবল সিনেমাতেই নয়, সোভিয়েতের সাম্প্রতিক (ষাটের দশক থেকে) গল্প উপন্যাসেও এই রকম হতাশা, সব রকম যুদ্ধ সম্পর্কে (মুক্তিযুদ্ধ সহ) বিতৃষ্ণা, আত্মকেন্দ্রীক জৈবমুখী যৌন-প্রেম ও তার জন্য রোমান্টিক বিষাদ এবং সেই বিষণ্ণতার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। এইগুলি তাদের বিভিন্ন এজেন্সি মারফৎ নানা দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল 'সাহায্যপ্রাপ্ত' দেশের পাঠক সমাজেও ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি শিশুদের জন্যে যে সব কমদামী বই বাজারে ছেয়ে গেছে, সেগুলিতে কি নিস্তালিনীকরণের আগেকার 'বালিকা টোনি', 'শিশুরা' কিংবা 'আমার সোভিয়েতের মানুষ' ধরনের ইতিবাচক অনভূতির স্বাস্থ্যকর গল্প পাওয়া যাচ্ছে? আদৌ তা নয়। অধিকাংশই বিষণ্ণ ও নেতিমূলক অনুভূতির ছোটদের গল্প। বাবা গত যুদ্ধে (ফাসিবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে) মারা গেছে। সে জানে না। মা চাকরী করে গ্রামীণ শহরের এক অফিসে। পাড়ার কমবয়সী ছেলেরা তাকে খেপায় তার বাবা নেই বলে। সে বিষণ্ণ হয়। এইরকম সব ক্ষতিকর গল্প। অথচ এই রকম গল্পের লেখকরাই এখন লেনিনের নামাঙ্কিত পুরস্কার পাচ্ছেন। অনুমান করা যায়, কোন্ সমাজের ফসল এইসব গল্প, কোন্ সমাজের 'উপযুক্ত নাগরিক করার প্রয়াস। মার্কিন লেখক জন স্টেনবেক যে মূল্যবোধের স্তরে ও প্রেরণায় এক সময়ে গ্রাপ্স অব রথ' এর মত উপন্যাস লিখেছিলেন সেই তিনিই শেষ দিকে ভিয়েতনামের বুকে বোমা বর্ষণকারী মার্কিন যুবকদের মধ্যে 'আদর্শ নায়ক' দেখেছেন। 'বাইসাইকেল থিভ'-এর স্রষ্টা ভিত্তোরিয়া দি সিকা পঞ্চাশের দশকে এমন সব ছবি করতে লাগলেন, যা তাঁর করা উচিত নয় বলে নিজেই সমীক্ষা করেছেন। আমাদের দেশে 'বি টি রোডের ধারে', 'গঙ্গা' ধরনের উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু শেষ পর্যন্ত 'বিবর', 'প্রজাপতি,' 'মানুষ' নিয়ে নর্দমার পাঁক ঘাঁটাকেই সার করলেন। তা ও আবার বিকারকে বিকার না বলে তাকেই বাস্তবসত্য বলে জাহির করতে সচেষ্ট। অথচ আমরা দেখেছি গোর্কির প্যাভেল (মা' উপন্যাসে) প্রথমে বুর্জোয়া অভ্যাসের মধ্যেই ছিল; ক্রমে শ্রমিক আন্দোলনের ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সঙ্গে মিলে মানুষ হিসাবেই বদলে গেল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কংক্রীট' গল্পের 'রঘু' এমনই একটি বিপ্লবী শ্রমিক চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ লেখক শিল্পীদের শোষিত ও সংগ্রামী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্বর বানায়; আর মার্কসবাদ তাঁদের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামী ধারার সঙ্গে মিলিয়ে মানুষ হিসাবেই বদলে দেয়, বিপ্লবী মানবতায় ফুটে ওঠে।

কোন সমাজে শুধুই, নেতি আর নেতি, এটা কখনই হতে পারে না; পরিমাণে কম হলেও, যাঁরা মানুষের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল, সেইসব লেখক শিল্পীরা সাহিত্য সংস্কৃতির উত্তরণের সংগ্রামে মূল্যবান অবদান রাখেন। তাই আজও সোভিয়েত রাশিয়ায় 'অবরোধ,'-এর মত উপন্যাস সৃষ্টি হচ্ছে, মার্কিন দেশে থেকেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আমাদের হাতে আসছে।

নয়া-ফ্যাসিবাদী প্রচার মাধ্যমে

রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে পদ্ধতি প্রকরণের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ যমজ ভাইয়ের মত গলাগলি করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে লাতিন আমেরিকায় নাৎসি জার্মানির 'সাংস্কৃতিক' অনুপ্রবেশের সমান্তরাল পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 'সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিভাগ' খোলেন, এরপর ১৯৪১ সালে মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরের হাতে (সামরিকীকৃত অর্থনীতির প্রয়োজনে) সমস্ত সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি চলে যায় এবং সেই থেকে 'ভয়েস অব আমেরিকা'র মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের 'সাংস্কৃতিক মিশন' দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার সম্বন্ধে নিপীড়িত জনগণের মহান সঙ্গীতশিল্পী পল রবসন তাঁর 'ফ্লাড লাইট অব পিস' প্রবন্ধে বলেছেন: 'এখানে আর একটি আমেরিকা আছে যার কণ্ঠস্বর ভয়েস অব আমেরিকায় শোনা যায় না।' এই জালেরই সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে 'স্মিথ মুদ এ্যাক্ট'-এ, ১৯৫৩ সালের 'ইউসিয়াতে'তে United States Intelligence Agency) এবং অবশেষে সি আই এ, ইউসিস প্রভৃতি। ওরা এখন ভাবছে, দেশে দেশে ইস্কুল গড়ার চেয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভিন্ন মনের কমপিউটার বানানোর কাজে টেলিভিসন সেট বেশী ও দ্রুত ফল দেয়। অল্ডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'' উপন্যাসে যেমন ঘুমের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যোগে মন বদলানোর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এই সব সাম্রাজ্যবাদী নয়া ফ্যাসিষ্ট প্রচার-যন্ত্রগুলি তেমনি উন্নত

ধরনের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে জাতীয় ঐতিহ্য, মানবতা ও সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ চালানোর কাজে লাগাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ইংলণ্ডের অধিকাংশ নাগরিক বাস্তব জীবনের ৭০ বছরের মধ্যে ১২১ বছরই টেলিভিসন দেখায় ব্যয় করে, আমেরিকার অধিকাংশ পরিবার দিনের ছ-সাত ঘণ্টা এর নেশায় বুঁদ থাকে এবং জাপানের শতকরা ৯৫ জনই প্রতিদিন টেলিভিসনের মাদকতা (যৌনতা ও হিংসার আকর্ষণে) উপভোগ করে। এ সব তো শিল্পোন্নত বুর্জোয়া সমাজে সাধারণ জনসাধারণের উপর অপসংস্কৃতি বাহী প্রচার মাধ্যমগুলির প্রভাবের খবর। আমাদের মত আধা সামন্ত তান্ত্রিক ভয়ঙ্কর শোষণশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভয়াবহ রকমের গরিব ও নিরক্ষর জনসাধারণের উপর এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ফল কী মারাত্মক ও শিকড় সঞ্চারী হতে পারে তা ভাবলে আতঙ্কে উঠতে হয়।

আকাশবাণীতে যে সব নাটক হয়, তাদের মধ্যেও অপসংস্কৃতির ছায়া থাকে; চিৎপুরপাড়ার কোনও কোনও যাত্রাভিনয়ে ক্যাবারে, ক্যান্‌ক্যানের সঙ্গে দেখানো হয়, চাষী জমি হারিয়ে সন্ন্যাসী হল এবং তাকে গুরু বলে প্রণাম করল জোতদার ও রাজা জমিদার; আর সেই দেখে গ্রামের অন্য সব চাষীরা তার শিষ্য ও হয়ে গেল —এই রকম। এইসব দল গ্রামে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে অপসংস্কৃতি-মূলক পত্র পত্রিকাগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার-গুলির অভাব ও বিষাদের শূন্যস্থানে ঢুকে পড়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মহানায়ক মার্কিন সরকারের নবতম অবদান সত্তরের দশকের ঐতিহাসিক ঘটনা 'ওয়াটারগেট' পেণ্টাগনের সঙ্গে নিকসন প্রশাসনের অবৈধ প্রণয় তথা নিও ফ্যাসিস্ট পন্থতির অপসংস্কৃতি গত দুই দশক ধরেই আমেরিকা থেকে ফ্রান্স, ইতালি ও ইংলণ্ডে যাতায়াত করছে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে এশিয়ার দেশে দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। চল্লিশের দশকে মার্কিন গণতন্ত্রের আত্মিক শক্তি সম্পর্কে আশাবাদী সিনক্লেয়ার লুইস তাঁর 'ইট কান্‌ট হ্যাপেন হিয়ার' উপন্যাসে দেখতে চেয়েছেন, মার্কিন মুল্লুকে ফ্যাসিবাদ কস্‌কে পাবে না, তাঁর সে আশায় ছাই দিয়ে ঘটল 'ওয়ারগেট' বা ট্রয়ের ঘোড়া মার্কা ফ্যাসিবাদ। এরই বিষাক্ত গ্যাসে ইতালির সাহিত্য চলচ্চিত্রে তৈরী হল 'নয়া বাস্তবতা' তাই ফেলিনি তাঁর দি রোড' ছবি সম্পর্কে বলেন: বর্তমানে মানুষের দুর্ভাগ্য তার নিঃসঙ্গতা। এর শিকড় অনেক গভীরে। এর নিরাময় আর এক নিঃসঙ্গতার শিকারের সঙ্গে মিলন। কিছুদিন আগে ফরাসী 'নিউ ওয়েভ' এর প্রখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা আলা রেঁনের 'হিরোসমা মন আমোর' দেখলাম। এটি আত্মকেন্দ্রিক ও বিষণ্ণ যৌন অনুভূতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে ঘুলিয়ে দেওয়ার এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াশীল ছবি।

এই ধরনের অনেক ছবির সঙ্গে কাম্য হামসুনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই আমাদের এখানে তৈরি হচ্ছে আপনজন, যদুবংশ, প্রজাপতি, পাতক, পাতালে এক ঋতু, অরণ্যের দিনরাত্রি, মানুষ ও থার্ড কোম্পানীর সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। এখানে 'বারবধূর মতো নাটক ছশ' রাত পেরিয়ে যায়, এস্‌ট্যাবলিসমেন্টের শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা সার্টিফিকেট দেন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিবেকী শিবির থেকে প্রতিবাদ হলে প্রতিক্রিয়ার মোচাকে ঢিল পড়ে। বন্ধুর কাছে শুনে কী ধরনের অপসংস্কৃত পেশাদারী নাট্যমঞ্চে চলছে তা দেখার জন্যে সেদিন সারকারিনায় 'অগ্নিবন্যা' দেখলাম। সেখানেও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী ঘটনার সঙ্গে ক্যান্‌ক্যান্ নাচের রগরগে যৌন পসরা! এতো পেশাদার মঞ্চে কাণ্ড; এমন কি হিন্দি হাই স্কুল মঞ্চেও ক্যাবারে চলছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যে শিল্পে যদি বুর্জোয়া ও ভুয়ামী শিবিরে অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের ছবি দেখানো হয়, তারও একটা হাতবাচক ভূমিকা থাকে, অবশ্য যদি সেই সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের নৈতিক বা মানসিক শক্তির পরিচয় দেখানো হয় তবেই। এবং অবশ্যই ব্যাপারে 'বুর্জোয়া ডিম থেকে বেরোন হলুদ ঠোঁটওয়ালা চালাক পাখিদের (লেনিন) সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকা দরকার। লেনিনই বলেছেন: যৌন জীবনের লাম্পট্য হল বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য—ক্ষয়ের লক্ষণ। সর্বহারা একটি উদীয়মান শ্রেণী। এদের পক্ষে নিস্তেজক বা উত্তেজক ওষুধের দরকার হয় না। এরা কখনই ডুববে না—কিছুতেই ডুববে না ধন-তন্ত্রকে লজ্জা ক্লেদ ও ক্রূরতা।

সামন্ততান্ত্রিক ভিতরের লাজ

কাজি নজরুল একবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: যে লাজ বাইরের দিকে তা সাধারণভাবে কাটা সহজ, কিন্তু যে লাজ ভিতরের দিকে তা কাটা শক্ত। আমাদের দেশের অপসংস্কৃতি দুই খাতে চালু হয়েছে: অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের ধর্মসংস্কার, প্রথমটি বাইরের দ্বিতীয়টি ভিতরের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী প্রকৃতি ও 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন, 'মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের সহযোগিতা নিবিড় নয়, সেখানেই বর্বরতা।' আজ আমাদের দেশে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মালটি ন্যাশনাল কর্পোরেশন ও বড় বড় ভূস্বামীদের সম্মিলিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার কারসাজিতে দুর্দশা-গ্রস্ত ও অধঃভুক্ত ক্ষেতমজুর, বেগার শ্রমিক ও মজুর মধ্যবিত্ত অংশের বেকার যুব সমাজ এমনই ক্ষয়শীল ও বিচ্ছিন্ন যে সেই ফাঁক ভরানোর জন্যে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চমী অপসংস্কৃতি একই সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে যোগান দেওয়া হচ্ছে। আজও হরি-জনদের লিঞ্চিং হচ্ছে, ধর্ম সম্প্রদায় ও ভাষা নিয়ে মারামারি হচ্ছে, শান মনসা পুজোর চাঁদা না দিলে বোমা পড়ছে ও চুরি চলছে এবং ভোলে বাবা পার করেগা'ওয়ালাদের জন্যে দিশি মদ আর নারীদেহের ব্যবসা বেড়ে গেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এদের চাট বা চাকি-গুলোর পাশাপাশি দিশি মদের দোকান

থাকছে আর ভুলি জগদ্বুর গান লাউড স্পীকার ফাটাচ্ছে।

পশ্চিমের অবক্ষয়ী সমাজে যখন অপসংস্কৃতির চাষ হচ্ছে তখন বুঝতে হবে সংশোধনবাদের ভূমি তৈরী হচ্ছে ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ঠেকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে ; কারণ, সেখানে চার্চ ও যাজকদের আধিপত্য, সামন্ততান্ত্রিক ভিৎ ও তার উপরিথাক সাধারণভাবে উচ্ছেদ হয়েছে ; অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমরা চলেছি অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে, সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পটভূমিকায় সম্পন্ন করার জাতীয় দায়িত্ব নিয়ে ; এখানে শুধুই মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়, এখানে খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বিকল্প হিসাবে অপসংস্কৃতিকে কাজে লাগাতে দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের চক্র তৎপর হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেভাবে বৈষ্ণবী হিপিবাদ, আবুরাম হার সংকীর্তন, ভোলে বাবা, শান্ত মনসাকে মদত দেওয়া হচ্ছে, এক শ্রেণীর সাংবাদিকরা সাঁইবাবার চুল নিয়ে ভাল রকম চুলকানি শুরু করেছেন।

সময় থেমে নেই

আর একটি ব্যাপার ঘটে চলেছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে গত তিরাশি বছরের উত্তর সাধনায় অর্থাৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় জাতীয় ইতিহাসের বিকৃত সাধন ; উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা আর ব্যক্তি পূজার মাল মশলায় বানানো এই সব ইতিহাস। কাজেই জাতির ইতিহাস বদলাতেই হবে। বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের নতুন দৃষ্টি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন।

যোশেফ স্তালিন তাঁর 'মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যা' বইতে বলেছেন : "সামাজিক ভিৎ হল সমাজ বিকাশের কোন এক স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ; আর উপরিথাক হল সেই সমাজে রাজনৈতিক, আইনী, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রতি ভিৎ এরই নিজস্ব উপরিথাক তৈরী হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গড়ে উঠেছে তারই নিজস্ব উপরিথাক, নিজস্ব রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারই সঙ্গে খাপ খাওয়ান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাদী ভিৎ-এরও নিজস্ব উপরিথাক আছে ; তেমনি সমাজতান্ত্রিক ভিৎ এরও তা রয়েছে। যদি ভিৎ বদলে যায় বা তাকে উৎখাত করা হয়, তবে তার পিছনে পিছনে তার উপরিথাকও বদলে যায় এবং আগেরগুলিকে উচ্ছেদ করা হয়।" অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই নিয়ম যান্ত্রিকভাবে চলে। উপরিথাক ভিৎ-নির্ভর বলেই যে, ঠুঁটো জগন্নাথ, তা নয়। সেগুলি তার অর্থব্যবস্থা ও শ্রেণী সম্পর্ক ব্যাপারে আদৌ উদাসীন থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাকে না। উন্মেষের পর ক্রমে এই উপরিথাক সমগ্রভাবে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং তার মধ্যেকার হাত নোতর লড়াই বাধে ; তখন এক অংশ স্থিতাবস্থা রাখতে অপর অংশ সমাজবিকাশের পরবর্তী স্তরের মালমশলার যোগান দিতে কোমর বেঁধে লাগে। এই 'নতুন ভিৎ গড়ার সাংস্কৃতিক ইন্ধন' (স্তালিন) যোগানোর সংগ্রামে আমাদের বামপন্থী ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মী সচেতন ও সংগঠিতভাবে কাজ করে চলেছেন।

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক অপসংস্কৃতি হল অবক্ষয়ী একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভিৎ-এর উপরিথাক। এগুলি প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। আবার দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত মানুষের চেতনায় গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের সংস্কৃতিও প্রবহমান, এর সঙ্গে মিলেছে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই ভয়ংকর ও শিকড় সন্ধানী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামটা কি ভাবে চলছে ও চলবে ? প্রধানতঃ দুই ধারায় তা চালানো দরকার : একটি সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা আলোচনা, মিছিল-পথসভা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে 'অপ সংস্কৃতিকে চিনিয়ে বুঝিয়ে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজ, ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ ; এবং অপরটি হল, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ সৃজনশীল রচনা ও শিল্প ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজ। স্মরণ রাখা দরকার রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যবহারিক দিক দিয়ে একটা নির্দিষ্ট ছকে চলে, কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রধানতঃ জনগণের অবদমিত ও অপ্রকাশিত ইচ্ছা অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলার, উন্নত করার কর্মসূচী নিয়ে চলে। প্রথমটির জন্যে দ্বিতীয়টি কোন আশু ফলনা-ও নিতে পারে। তবে সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে মেলানোর কাজই বড় কথা। বলাবাহুল্য, এ কাজে সাংস্কৃতিক কর্মীদের জনগণের দুঃখ বেদনার গায়ে কেবল হাত বুলোলেই চলবে না, তাঁদের সমস্যা ও সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ হতে হবে এবং তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে সৃজনশীল সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানব সংস্কৃতির অতীত যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সব মহৎ গুণ ও মূল্যবোধ মানুষ আজ পর্যন্ত বহে এনেছেন তাকে আজকের এই সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগে সঠিকভাবে বুঝে উন্নত ও প্রসারিত করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও অধিকারের সংস্কৃতিই তাই আজকের প্রকৃত সংস্কৃতি।

বিদেশী ছবি

অনিল সেন

কাগজে হেডিং থাকে "বিদেশী ছবি"। ভিন্ন অর্থে এর নাম হওয়া উচিত ইংরাজী ভাষার ছবি। কেননা সব ছবিকেই ইংরাজীতে কথা বলিয়ে নেওয়া হয়। কিছু কিছু ছবি থাকে সেই সব দেশের মাতৃভাষায়, যা, ইংরাজী নয়। কিন্তু সর্বসাধারণের সামনে আনার সময় তার আসল ভাষাকে ঢাকা দিয়ে ইংরাজী বসিয়ে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে ব্যবসা করার জন্ত যে সব বিদেশী ছাব পর্দায় হাজির তাদের এটাই অলিখিত নিয়ম বা প্রথা।

অবশ্য বিদেশী ছবি অন্ত উপায়ে অর্থাৎ এই প্রথার বাইরেও কলকাতায় আসে। দর্শক দেখতেও পান। তাদের সংখ্যাও নেহাত মন্দ নয়। কিন্তু তা দেখতে পায় সীমাবদ্ধ কিছু দর্শক। ফিল্ম সোসাইটিগুলোর সদস্যরা।

এবছরের যে আটটা মাস পাশ ফিরেছে তাতে ৫০টির বেশী বিদেশী ছবি কলকাতায় ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসেছিল। সংখ্যাটি আমাদের অবশ্যই উৎসাহ দিত যদি ওটা বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গে তৈরী ছাবর চেহারা হত। কিন্তু তা নয়। ওটা যে ভিন দেশের। তাই বিদেশী ছবির সংখ্যাটা আমাদের ব্রেন ম্যাটারে তত বেশী ওয়েভ সৃষ্টি করতে পারে না।

সবার পক্ষে একথাটা অবশ্য খাটে না। কেননা কেউ কেউ আবার "ইভনিংটা" ইংরাজী ছাড়া অন্ত কিছুর সান্নিধ্যে কাটানো পছন্দ করেন না। বাংলা বা হিন্দি ছবি তাদের কাছে অস্পৃশ্য। সত্য জগৎ মৃণালকে বাদ দিয়ে। (ওঁদের না দেখলে যে আবার আপ-টু-ডেট হওয়া যায় না) দেশী ছাব তাদের কাছে দেশী পারমিউমের মতই অপ্রীতির। অন্তত গত কয়েক বছর সেই অবস্থা বড় প্রকট হয়ে উঠেছিল। তখন আমদানী লাইসেন্স বাতিল। আমাদের দেশে বিদেশী ছবির সব থেকে বড় ব্যবসায়ী মার্কিনীদের ছবির সংখ্যা তখন নিতান্তই কমে গেছে। বাতিলের আগে আসা ছবিগুলো মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল। সুতরাং ইভনিং কাটানোয় ওদের অসুবিধে হচ্ছিল। এখন অবশ্য অবস্থা সামলানো গেছে। আমেরিকান মোশান পিকচার্সের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা স্বাভা বক হয়ে গেছে। ছবি আবার আসতে আরম্ভ করেছে সরাসরি। ইমপেক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাব আনার পরিকল্পনাও এখন উঠে গেছে। তবে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এব্যাপারে এগিয়ে এসেছে বর্তমানে। নিজে ছবি এনে নিজেই পরিবেশনের দায়ত্ব নিয়েছে এফ এফ সি। এতে বিদেশী ছবির সংখ্যা বাড়ল। ওদের মুসকিল অনেকটা আসান হলো। ওরা ইভনিংটা মনোমত কাটানোর প্রতিশ্রুতি পেলো।

কিন্তু ওরা তো দর্শক কুলের পুরো চেহারা নয়। যারা ছবি দেখতে চায়, যে ছবি দেখে মন ভরে। ইভনিং তখনই তাদের ভালো কাটে যদি সেটা ছবির মত ছবি হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র প্রেমীদের ভাগ্যে তেমন ইভনিং আর জোটে কই। আবার এন্টোটাও ঘটে। মাঝে মাঝে কিছু ভালো ছবির দিকে তারা পেছন ফিরে থাকে। বোঝা যায়না কেন? অবশ্য এটাও ঠিক যে এই চলচ্চিত্র প্রেমীদের সংখ্যা ব্যবসা সফল করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্রুকো, আন্তনিউনি এবং ওয়াজদার "ডে কর দি নাইট" বা "প্যাসেঞ্জার" বা "থার্টিন ক্লাইজ" ভালো ব্যবসা করেছে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই "প্যারিস আই লাভ ইউ" "এন্টার দি ড্রাগন"-এর মত প্রেক্ষাগৃহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেনি।

লঘু দর্শকের কাছে প্রিয় হতে না পারলে ব্যবসা জমেনা। এটা দেশী ছবির ক্ষত্রেও বটে। তাই মাথা বেশী না ঘামিয়ে প্রেম এবং আবেগ, হাসি এবং ভাঁড়ামী থাকলে ছাব বেশ চলে যায়। "ফ্রেণ্ডস্" এখানে প্রচণ্ড জনপ্রিয়। কিন্তু সেক্স এবং ভায়োলেন্স এসবের ঊর্ধ্বে। তাই প্যারিসপ্রীতি এবং ড্রাগনের আবির্ভাবে ব্যবসা অনেক বেশী রমরমা। "ডার্টি হ্যারি"-র চরম ভায়োলেন্স দর্শকদের খুশী করে। কিন্তু "ম্যাসাকার ইন রোম" বা "অল দি প্রেসিডেন্টস মেন" ব্যবসা জমাতে পারে না। দুটোই ভালো ছবি বলে বিদগ্ধ মহলে পার চর্ত পেয়েছিল। তার ওপর আবার দুটোতেই ছিল নামী দামী ষ্টার।

আসলে এখানে যেটা বেশী চলে তা হলো ভয়োলেন্স এবং অবশ্যই সেক্স। তাই মার্কিন ছবির চাহিদা বেশী, আসেও বেশী। ওখানে এরসের সন্ধান বেশী মেলে। অন্তত এখানে যা আসে। বলে রাখা ভালো, পাতকুড়োন খাবারই এখানে এসে থাকে। উচ্ছিষ্ট আমরা বেশী পছন্দ করি।

ভালো ছবি আসে। পোলাণ্ড, ইতালী, ফ্রান্স এমন কি মার্কিনীদের কাছ থেকেও আমরা ভালো ছাব পেয়েছি। আগে বলা ভালো ছবিগুলো এদেরই। সোভিয়েতের কাছ থেকেও ভালো ছাব পেয়েছি। কিন্তু এঁদের সকলের কাছ থেকেই এই ভালো ছাব পাওয়ার সংখ্যাটা হাতে গোনা যায়। সোভিয়েতের বর্তমান ছবিগুলোর লঘুতা

বারবারই তাঁদের চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় যেন, ব্যবসার জন্যই মার্কিনীদের পথ ধরছে। এফ ফ সি এগিয়ে আসায় চল চ্চিত্র প্রেমীরাও উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু বাছ বাছা ভালো ছবি দেখার আশা জেগেছিল। কিন্তু দেখা গেল ওদেরও বিশেষ বাছবিচার নেই।

ঐ "বিদেশী ছবি" হেডিংটা বিশেষ আলো দেখাতে পারছে না। দেখাতে পারবে এমন আপত্তি হাতের কাছে নেই। কেন নেই, কেন ভালো ছবির সংখ্যা অনেক বেশী হবে না। এর উত্তর খুব যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। যে সব দেশের ছবি এখানে আসছে তাদেরও তো ভালো ছবি তৈরী হয়। কিন্তু সেগুলো আসে না। যেমন আসে না পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ভালো ছবিগুলো, লাতিন আমেরিকার ছবিগুলো। ওসব দেশের ছবির মাঝে মধ্যে ফেস্টিভ্যাল করেই দায় সারা হয়ে যায়। চেহারাটা এবছরেই শুধু নয়, এটাই চলে আসছে।

অথচ প্রতিকার হয় না। সুস্থ চলচ্চিত্র বোধের আন্দোলন কি থেমে থাকবে শুধু ফিল্ম সোসাইটি গুলোর মধ্যে? ছবি আমাদের দেশে দেশে দেখানো হবে অথচ বাছাবাছির সুযোগ আমরা নেবো না। এটা ঠিকই যে, এ ধরনের শিল্প মাধ্যমের বিচারে শেষ কথা বলে দেওয়া যায় না। ভালো বা খারাপ সবটাই নির্ভর করছে যিনি বিচার করছেন তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি এবং বুদ্ধি বিবেচনার ওপর। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছবির তো একটা সাধারণ মান থাকা উচিত। যে ছবির বক্তব্য সমাজ জীবনকে কলুষিত করে জনগণের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে এমন ছবি দেখানোর অনুমতি কেন পাবে। এই সব ছবির প্রভাবে দেশীগুলোও প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়েছে। ভালো ছবি, বাছা ছবি, হয়ত প্রাথমিক ভাবে ব্যবসা করতে নাও পারে। কিন্তু ঐ ধরনের ছবি বেশী সংখ্যায় মুক্তি পেলে তা দেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। এবং এই নিরুপায় অবস্থাই এক সময়ে শুধু ভালো ছবি দেখাটাই নিয়মে দাঁড় করিয়ে দেবে। আমাদের দেশের ছবি করিয়েরা ভালো ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হন কিনা জানি না। কেন না তার প্রমাণ খুব বেশী হাতে নেই। বরং সহজ সরল সস্তা ফরমুলার অনুকরণেই বেশীর ভাগ ব্যস্ত। কিন্তু ভালো ছবি দেখতেও দর্শক ভীড় জমান এটা তো তখন প্রমাণ করা যাবে, আর তা থেকেই আমাদের ছবি করিয়েদের নতুন করে ভাবতে হবে।

বাংলা সবাক চিত্রের ৫০ বছর

১৯৩১ ১৯৫৫

শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর সেনগুপ্ত

আজকের দর্শকেরা যদি অতীতের দিকে ফিরে দেখেন তা হলে, দেখতে পাবেন সেই সুদীর্ঘ পথে ছিল কত না বাধা বিপত্তি। চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নে ছিল সকলের চোখে বিস্ময়। ছবি তখন নির্বাক, তারপর মৌনত্ব ভেঙে মুখরত্বের উত্তরণে বিস্ময় এলো চূড়ান্ত পর্যায়ে। নির্বাক থেকে সবাক।

প্রথম বাংলা সবাকের প্রসঙ্গ উঠলেই, বলছি খণ্ড চিত্রের কথা। শব্দধারক যন্ত্রের আমদানীর পর প্রথমেই পুরো বাংলা ছবির ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন মনে করলেন না ম্যাডাদ কোম্পানী। আজকের দর্শকেরা শুনে বিস্মিত হবেন যে সেকালের বাঘা বাঘা অভিনেতাদের অনেকেই শব্দধারক যন্ত্রের কৃপায় প্রথম পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের তালিকাভুক্ত হয়ে ছিলেন। পরে অবশ্য ত্রুটি সংশোধন করতে পেরেছিলেন তাঁরা। ম্যাডান কোম্পানী প্রথমে ঠিক করলেন পরীক্ষামূলকভাবে তুলবেন কিছু খণ্ড চিত্র। এজন্যে বাছাইকরা জনপ্রিয় নাটকের কিছু কিছু দৃশ্য চিত্রায়িত হল। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন বাংলার জনপ্রিয় নটনটীরা। এটা যে খুব একটা সাফল্যমণ্ডিত হল তা বলতে পারি না। অবশেষে ম্যাডান কোম্পানী ঠিক করে ফেললেন পুরো একটা কাহিনী চিত্র রূপায়িত করা হবে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রথম বাংলা সবাক ছবি "জামাইষষ্ঠী"। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বলতে আমরা এখন যা বুঝি এছাব অবশ্য তা নয় কারণ ছাবর দৈর্ঘ্য বর্তমানের চেয়ে অনেক কম। হাসির ছাব। কাহিনী ও নিতান্ত মামুলী পর্যায়ের। শ্বশুরালয়ে আগত জামাতাকে কেন্দ্র করে স্থূল হাস্যরসের অবতারণা। মুক্তিকাল ১১ এপ্রিল ১৯৩১ ক্রাউন সিনেমায়। পরিচালনা অমর চৌধুরী।

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রথম বাংলা ঋষির প্রেম। এ ছবির নির্মাতাও ম্যাডান কোম্পানী। পরিচালনা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী (কর্ণাটরাজ), জয়নারায়ণ (বিদেহরাজ), ধীরেন দাস (ছন্দক), কাননদেবী (রাজকন্যা উৎপলা), সরযূবালা (ঋষি কন্যা), প্রধান পুরুষ চরিত্রে পরবর্তী কালের পরিচালক হীরেন বসু। ১৯৩১ সালে ২৪ অক্টোবর ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ক্রাউন সিনেমাতে। ছবির কাহিনী লিখেছিলেন লোকান্তরিত কবি কৃষ্ণধন দে।

এই বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'। পরিচালনা করেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ছবির নায়ক-নায়িকা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী। প্রথম প্রদর্শনের বছরটির (১৯৩১) হিসেব নিলে দেখা যাবে মোট ৬টি সবাক ছবি জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে। ৩টি হাসির ছবি—জামাইষষ্ঠী, জোর বরাত, তৃতীয় পক্ষ। ২টি পৌরাণিক ঋষির প্রেম, প্রহ্লাদ। ১টি সামাজিক—দেনাপাওনা। গুণাগুণ বিচারের প্রশ্ন তুলছি না কারণ সেই অনগ্রসর যুগে অঙ্গুলি নেই-এর তালিকার মধ্যে কেবলমাত্র মোটামুটি গল্প বলে যাওয়া ছাড়া আর কি বা হতে পারে।

২য় বছরে (১৯৩২) প্রদর্শনের সংখ্যা ১০। বাঙ্কমচন্দ্র (কৃষ্ণকান্তের উইল) রবীন্দ্রনাথ (নোটির পূজা, চিরকুমার সভা), শরৎচন্দ্রের (পল্লীসমাজ) সৃষ্টিকে দর্শক সাধারণের সামনে তুলে ধরা হল। এছাড়া চিরাচারিত প্রথার সামাজিক, পৌরাণিক ও অন্যান্য ছবি ছিল যা ছিল সে দিনের দর্শকদের হয়ত বা ভালোই লেগেছিল। এবছর সবচেয়ে স্মরণীয় ছবি নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস'। কবি চণ্ডীদাস ও রাণীর জীবনকে ভিত্তি করে দেবকী বসু পরিচালনা করেছিলেন এ ছবি। বক্স অফিস সাফল্যের একটা বিরাট নজীর হিসেবে গণ্য হল চণ্ডীদাস। একই প্রেক্ষাগৃহে রজত জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপনের সৌভাগ্য অর্জন করল এই ছবি।

সবাক ছবির প্রথম ১০টি বছরের (১৯৩১ ৪০) পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মামুলী, সামাজিক, পৌরাণিক ছবি করার দিকেই ঝোঁক চিত্র নির্মাতা দের। এই কনভেনশন প্রথমে ভাঙলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। ১৯৩৫ সালে তাঁর নির্দেশনায় নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হল 'দেবদাস'। ইতি পূর্বে নির্বাক যুগেও একবার দেবদাস চিত্রায়িত হয়েছিল। চলচ্চিত্র যে নিজস্বগুণসম্পন্ন একটি অনন্য সাধারণ শিল্প মাধ্যম দেবদাসে তা প্রমাণিত হল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবির তালিকাভুক্ত বলে সকলে গণ্য করলেন দেবদাস ছবি। তখন যান্ত্রিক কুশলতার অপ্রতুলতা ছিল, আরও ছিল নানা ত্রুটি। তা সত্ত্বেও কাহিনী বিন্যাসে ও অভিনয়ে যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেল তা আজও অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং শরৎচন্দ্রও অভিভূত হয়েছিল এ ছবি দেখে। এই দশ বছরে পৌরাণিক ছবির মধ্যে আমরা পেলাম বামন অবতার, সীতা, কলঙ্কভঞ্জন, চাঁদ সদাগর, দক্ষযজ্ঞ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণসুদামা, অহল্যা, প্রভাস মিলন, একলব্য, জনক

চিত্রগ্রহণ/ধ্রুবজ্যোতি বসু
সম্পাদনা/রমেন ঘোষ
বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার/হৃষিকেশ মুখোঃ

নন্দিনী, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি। সবই ফর্মুলায় বাঁধা একই ছকের। কোন বৈচিত্র নেই, কোন বৈশিষ্ঠ্য নেই। সংগীত বহুল ছবির মধ্যে মীরাবাঈ, তুলসীদাস। দেবকী বসুর বিদ্যাপতিকেও এই তালিকাভুক্ত করা যায়। বেশ কিছু সংখ্যক হাসির ছবি এই ক'বছরে দেখান হয়েছে। হাল্কা হাসির ছবি মানময়ী গার্লস স্কুল দর্শকদের দিয়েছে আনন্দ। ডিজিটাল এক্সকিউজ মি স্যার, মাসতুতো ভাই, পথ ভুলে হাল বাংলা ইত্যাদি চলনসই এর বেশী কোনক্রমেই এগোতে পারে নি। নিতান্ত নিম্নস্তরের হাসির ছবির মধ্যে ছিল সার্বজনীন বিবাহোৎসব, সখের শ্রমিক, বেকারনাশন ইত্যাদি। হাসির ছাবতে অভিনবত্ব আনলেন প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর "রজত জয়ন্তী" দেখিয়ে। চাতুর্যপূর্ণ সংলাপ, চমকপ্রদ কৌতুকের অবতারণা সব কিছু জড়িয়ে রজত জয়ন্তী হাসির ছবির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের গোরা, চোখের বালি, শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, বিজয়া, পণ্ডিত মশাই, বড়দিদি প্রদর্শিত হয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালকদের ছাবর মধ্যে ছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার রূপলেখা, গৃহদাহ, মায়া, আধিকার, মুক্তি, রজত জয়ন্তী, শাপমুক্তি, দেবকী বসুর মীরাবাঈ, সোনার সংসার, বিদ্যাপতি, নীতীশ বসুর ভাগ্যচক্র, দেশের মাটি, দিদি, জীবন মরণ, মধু বসুর আলিবাবা, অভিনয়, হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরাজয়, সুশীল মজুমদারের রিক্তা, তটিনীর বিচার, নরেশ মিত্রের গোরা, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি।

১৯৩৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম ছোটদের ছবি তুললেন নিরঞ্জন পাল "হাতেখড়ি"। সাসপেন্স ধর্মী ছবির মধ্যে ছিল যখের ধন, কণ্ঠহার, মঞ্চ সফল নাটকের চিত্ররূপে ছিল প্রফুল্ল। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাই এই দশকে পেয়ে ছ বেশ কিছু সংখ্যক ভাল ছবি, প্রাতশ্রুতিপূর্ণ কিছু নবীন পরিচালক শক্তিমান বেশ কিছু সংখ্যক নটনটী। এই দশকের বেশ কিছু সংখ্যক ছবি বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্থায়ীভাবে স্থান পাবে বলে মনে হয়। যান্ত্রিক কুশলতার পরিচয়ও পেয়েছি এই দশকে। বিরেক উৎ যন্ত্র ব্যবহৃত হল দেবদাসে, প্লে ব্যাক পদ্ধতি চালু হল ভাগ্যচক্রে। বাক প্রোজেকসনে চিত্র গ্রহণ করা হল তটিনীর বিচারে। বাংলার বাইরে বাংলা ছবি তোলার ব্যবস্থাও হল এই দশকে। মধু বসু বোম্বের সাগর মুভিটোনের পক্ষ থেকে বাংলা ও হিন্দীতে একযোগে তুললেন কুমকুম। দেখার অযোগ্য কিছু ছাব চিরদিনই প্রদর্শিত হয়। এই দশকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অভিনবত্বের প্রসঙ্গে আর একটি সংযোজন একান্ত প্রয়োজন তা হল বাংলা ছবিতে দ্বৈতভূমিকার প্রবর্তন। সতু সেন "হস্পাষ্টার" ছাবতে এই দ্বৈত ভূমিকা অভিনয় করালেন লোকান্তরিত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। বাংলা ছাবতে রবীন্দ্রসংগীত একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর "মুক্তি" ছবিতে রবীন্দ্র-সংগীত প্রয়োগে প্রথম সাফল্য অর্জন করলেন।

এবারের আলোচনার অন্তর্বর্তী সময় ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত অর্থাৎ পথের পাঁচালী মুক্তি। এই প্রায় ১৫ বছর ভারতের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় কাল। বৃটিশ শাসনের উপর বাতগ্রন্থ ভারত, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, আগষ্ট আন্দোলন পরাধীনতা থেকে মুক্তি আরও নানাবিধ ঘটনার সমারোহ ঘটেছে এই সময়ে। স্বাভাবিক ভাবেই চলচ্চিত্রের ওপর এর প্রাতফলন ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনে ছবিতে যান্ত্রিক কুশলতা বেড়েছে ছবিকে শিল্পসম্মত করার প্রচেষ্টাও চলেছে, ব্যাপকভাবে অভিনয়ের মানও হয়েছে অনেক উন্নত।

১৯৪১ সালে বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ পরিচালক রূপে প্রথম দেখা দিলেন "নান্দনী" ছবির মাধ্যমে। ১৯৪৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম পরিচালনা করলেন "সমাধান" ছবি। ১৯৪২ সালে পাতিকার অজয় ভট্টাচার্য তুললেন ঐতিহাসিক ছবি "অশোক"।

১৯৪১ সালের শুরুতেই দেবকী বসু উপহার দিলেন "নর্তকী" ছবি— যার প্রধান চরিত্রে ছিলেন লীনা

দেশাই। তারপর এলো মধু বসুর "রাজনর্তকী"। এবারেও বোম্বাইয়ে গিয়ে তিনি ছবি করলেন—ত্রিভাষী বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী। "রাজনর্তকী"তে নাট নৈপুণ্য দেখালেন সাধনা বসু, নায়ক রূপে দেখলাম জ্যোতি প্রকাশকে যাঁর অকাল বিয়োগ সেদিনের প্রত্যেকটি চিত্রামোদীদের মনকে ব্যথিত করেছিল।

১৯৪৪ সালে প্রদর্শিত হল বিমল রায়ের "উদয়ের পথে"। এক কথায় বাংলা ছবিতে নতুন যুগের সূচনা। ক্যামেরাম্যান ছিলেন বিমল রায়, পরিচালক হিসেবে এই তাঁর প্রথম কাজ। কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়, নায়ক নায়িকা রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিনতা রায়। অসাধারণ জনপ্রিয় এই ছবিতে ছিল বুদ্ধদীপ্ত তির্যক সংলাপ, শ্রেণী বৈষম্যের উপর নির্মম কষাঘাত, ওপর তলার মানুষদের হীনমন্যতা, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানবিক আবেদন। এই প্রথম ছবিতেই বিমল রায় প্রথম সারির পরিচালকদের মধ্যে স্থান পেলেন। আজও ছবিটি প্রদর্শিত হলে দর্শকেরা অভিভূত হন। মনেই হয় না যে ছবিটি বিস্মৃত হয়েছে আজ থেকে তিন দশকেরও বেশী আগে। পরাধীনতা থেকে মুক্তির ফলে এ সময়ে দেশাত্মবোধক ছবির একটা হিড়িক দেখা যায়। সরাসরি এ জাতীয় ছবি না করলেও অনেকে স্থান বিশেষে বা সংলাপাংশে দেশাত্মবোধক নানা উক্তি ছবিতে সংযোজিত করে ছেলেন। বন্দেমাতরম, সংগ্রাম, দেশের দাবী, আমার দেশ, জাগ্রত ভারত ইত্যাদিকে এই শ্রেণ ভুক্ত করা যায়। দেশাত্মবোধক উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে ছিল পথের দাবী, ভুল নাই, নীলদর্পণ, আনন্দ মঠ ইত্যাদি।

জীবন চিত্রের ওপর অনীহা বাংলা ছবিতে বিগত দিনে দেখেছি। শ্রীচৈতন্যের জীবন অবলম্বনে যে সব ছবি ইতপূর্বে হয়েছিল সে গুলোকে তথ্যনিষ্ঠ জীবন চিত্র বলে গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিৎ নয়। এ পর্যায়ে অমর মল্লিক পরিচালিত স্বামিজী চিত্রটি হল উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

পি এল টি-র 'টিনের তলোয়ার' নাটকের একটি দৃশ্যে মৃণাল ঘোষ ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। এ বছর এইচ এম ভি লং প্লেয়িং রেকর্ডে টিনের তলোয়ার ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বেরিয়েছে।

নানান বিধানবেধের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছবিটি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে প্রদর্শনীর পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অবলম্বিত এই ছবিকে সবাই স্বাগত জানাবেন। স্বামীজীর সাফল্যের পর আমরা দেখলাম মধু বসুর মাইকেল মধুসূদন, কালিপ্রসাদ ঘোষের বিদ্যাসাগর ইত্যাদি।

দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে চিত্র শিল্পী নিমাই ঘোষ তুললেন 'ছিন্নমুল'। ছিন্নমুল প্রথম বাংলা ছবি যার দৃশ্যাদি গৃহীত হয়েছিল স্টুডিওর বাইরে বাস্তব পরিবেশে। ছবিটি অর্থকরী সাফল্যমণ্ডিত না হলেও দেশ বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল যথেষ্ট।

এ দেশে ছোটদের ছবি হয়ত খুবই কম, আর যা হয় তা ছোটদের অভিভূত করতে পারে না। সত্যেন বসু তার "পরিবর্তন" ছবিতে ছোটদের ভাল লাগার সব কিছু উপাদান দিয়ে অনবদ্য কিশোর চিত্র গড়ে তুললেন যার আবেদন আজও অম্লান। সৌমেন মুখোপাধ্যায় এ সময় তুললেন ছোটদের ছবি 'খেলাঘর'।

প্রচলিত কাহিনী ছেড়ে অভিনবত্ব দেখাবার জন্যে কার্তিক চট্টোপাধ্যায় তুললেন কাব্য 'মহাপ্রস্থানের পথে'। বহির্দৃশ্য ও অন্তর্দৃশ্যের সমন্বয়ে এই ভ্রমণ কাব্য রূপায়িত হল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রধান দুই চরিত্রে দেখা দিয়েছিলেন সেদিনের নবাগত বসন্ত চৌধুরী ও অরুন্ধতী দেবী।

বোম্বের হিন্দী ছবিকে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে দেখাবার প্রচেষ্টা প্রথম দেখলাম ১৯৫২ সালে। ভি শান্তারামের বিখ্যাত ছবি 'অমর ভূপালী' বাংলাতে ওই একই নামেই প্রদর্শিত হল। ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। প্রধান চরিত্রে বোম্বের সন্ধ্যা।

সংগীত বহুল বাংলা ছবি অতীতে ছিল, এ সময়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। হীরেন বসু পরিচালিত 'শ্রীতুলসীদাস' ছবিতে সংযোজিত হল অজস্র সংগীত। উচ্চাঙ্গ সমেত অন্যান্য সংগীতের সমন্বয় ঘটল পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের 'দুলা', নীরেন লাহিড়ীর 'য২৩ট', ফণী বর্মার 'জয়দেব' ইত্যাদিতে।

বিতর্কিত ছবির মধ্যে আছে হেমেন গুপ্তের '৪২'। ১৯৪২ সনের ভারত ছাড় আন্দোলনে বৃটিশ সরকার যে অকথ্য দমননীতির প্রয়োগ করেছিলেন তারই পটভূমিকায় এই কাহিনী ছবিটির সব কিছুকে ছাড়িয়ে অত্যাচারের ভয়াবহতা জন মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তাই অদ্যুবধি ছবিটিকে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। তবে এই নিয়ে অপর্যাপ্ত আলোচনাদি প্রকাশ্য বক্তৃতা ইত্যাদির ফলে অবশেষে ছাড়পত্র

আসছে বড়দিনে

চিত্রগ্রহণ পরিচালনা/বিজয় দে
চিত্রগ্রহণ/শান্তি দত্ত
শিল্প নির্দেশনা/সূর্য চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা/রমেন ঘোষ

মেলে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে আর কোন বাংলা ছবি নিয়ে এত আলোচনা হয় নি। ১৯৫১ সালের ১৪ আগষ্ট '৪২' মুক্তি লাভ করে।

বাংলা ছবি দীর্ঘকাল ধরে চলে না। সীমিত সময়কালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ব্যতিক্রম ঘটালেন শৈলজানন্দ তার 'মানে না মানা' ছবিতে। ১৯৪৫ সালে এই ছবি হীরক জয়ন্তী সপ্তাহ পালন করল।

উচ্চ শিল্পকলাসম্মত এবং কলা কৌশলের কাজের উৎকর্ষ যাতে ছায়া ছবির মাধ্যমে উন্নীত হয় সেই উদ্দেশ্যে উৎসাহদানের জন্যে প্রাতন ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি কতকগুলো সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারদপ্তর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ব্যবস্থা শুরু করেন ১৯৫৪ সাল থেকে। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে প্রযোজিত ছবির বেলায় শুধু সর্বভারতীয় ছবির গুণাগুণ বিচার করে ঐ পর্যায়ের পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রত্যেক ভাষা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। আঞ্চলিক পুরস্কার দেওয়ার জন্যে বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে আঞ্চলিক কমিটিও নিযুক্ত হয়।

১৯৫৪ সালে শ্রেষ্ঠ ছবির প্রশংসাপত্র পায় বিমল রায় প্রযোজিত পরিচালিত বোম্বেতে গৃহীত দো বিঘা জমিন ও দেবকী বসু প্রযোজিত ও পরিচালিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ১৯৫৫ সালে বাংলা ছবির জন্য পুরস্কার পায় 'যত্নভট্ট' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির'।

১৯৫৫ সালের ২৬শে আগষ্ট বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। শুধু বাংলা কেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রের এটা প্রযোজ্য। এই দিন মুক্তি লাভ করে সত্যজিত রায়ের 'পথের পাঁচালী'। নির্মাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই চিত্রের নির্মাণকালের নানারকম বাধা বিপত্তির কথা আজ সকলেরই জানা। নতুন করে এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই অনন্য সাধারণ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত হল পথের পাঁচালী। বিশ্বের চলচ্চিত্র মানচিত্রে পথের পাঁচালী একটা বিশেষ স্থান করে নিল, সত্যজিত রায় চিহ্নিত হলেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকরূপে। সারা বিশ্বব্যাপী সে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পথের পাঁচালী।

পথের পাঁচালী সম্পর্কে একটা নতুন কথা জানায়—১৯৭৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সলবেলো। সলবেলোর বিখ্যাত ও পুরস্কৃত উপন্যাস 'হারজোগ'-এ পথের পাঁচালীর উল্লেখ আছে। তাঁর নিঃসঙ্গ নায়ক একদিন একটি সিনেমা হলে ঢুকে পথের পাঁচালী দেখে এবং এই ছবি তার মনে গাঢ় ছাপ ফেলে দেয়, বার বার মনে পড়ে বাংলার গ্রাম্য দৃশ্য। বৃষ্টির কথা এক সময় তার ইচ্ছে হয় ভারতে চলে এসে আচার্য ভাবের সংগে পদ যাত্রায় যোগ দিতে।

পথের পাঁচালী থেকে যে নতুন অধ্যায়ের শুরু হল তারই জের টেনে বাংলা ছবি এগিয়ে চলেছে। অনেক শক্তিমান পরিচালক আবির্ভূত হলেন—তাঁদের অনেকেরই সৃষ্টি সার্বজনীন স্বীকৃতি পেল।

বাংলা ছবির সবাকত্ব লাভের পর দীর্ঘ ২৫ বছরে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুনত্ব দেখাবার প্রয়াসী হয়েছেন মুষ্টিমেয় পরিচালক। এই দীর্ঘ ২৫ বছরে দেখা দিয়েছেন অজস্র খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী—তাঁদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক মানের। শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রেও অনেক কুশলীদের আবির্ভাব ঘটেছে।

ছবিতে সুর বৈচিত্র্য এনেছেন অনেক সংগীত পরিচালক। জনপ্রিয় সংগীত পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাসগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত, অনুপম ঘটক, আনন্দ বাকচী, সলিল চৌধুরী, রাজেন সরকার, পণ্ডিত রবিশংকর, রবীন চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত রায় আরো অনেকে।

বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা মূলতঃ বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এতদিন। কখন কখন বাংলা ছবি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে অন্যত্রও দেখান হয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে পথের পাঁচালীর পর। পথের পাঁচালীর আগে ১৯৫২ সালে কার্লোভী ভারী চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি "বাবলা" সামাজিক উন্নতিমূলক ছবি হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। পথের পাঁচালী দেখার পরই বিদেশে ভারতীয় বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্র দেখার ঔৎসুক্য বাড়ে। সেই ঔৎসুক্য আজ ও অব্যাহত।

বাংলা ছবির আর্থিক সংকট

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছবির সংকট কি একটা—হাজারো রকমের সংকট। বাংলা ছবির বাজার ছোট, সেই ছোট বাজারেও হিন্দি ছবির দাপটে বাংলা ছবি কোণঠাসা, বাংলা ছবির আর্থিক সাফল্য এই শিল্পে ক্রমহ্রাসমান অর্থ বিনিয়োগ, ছবি তৈরীর সংখ্যা হ্রাস। স্টুডিওর স্বল্পতা ও জরাজীর্ণ দশা; বঞ্চিত কলাকুশলী ও স্টুডিও কর্মীর ক্ষোভ, সরকারের কর নিপীড়ন, ছবি মুক্তির সমস্যা—আরও কত কি। এই এতরকম সংকটের মধ্য দিয়ে বাংলা ছবি আজও চলছে। ছবি তৈরী বন্ধ হয়ে যায়নি।

চলচ্চিত্র আজ এমন একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম, যেখানে শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনই নয়, চিন্তা ও প্রেরণার খোরাক মেলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনবোধ বিশেষ তাৎপর্য পায়। তবে কথা হচ্ছে এই, বাংলা ছবি এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে ঠিকমত তিয়ার হিসেবে কতখানি ব্যবহার করতে পেরেছে। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ছবির গরিষ্ঠাংশই সে দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে। দু'একটি বাংলা ছবি আবার ভুবন জয় করে, কিন্তু অধিকাংশ ছবিই চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে পরাজয়ের গ্লানি বহে—এই খানেই বাংলা ছবির ট্রাজেডি।

তা হলে? এই হাজারো রকমের সংকটের মধ্যে থেকেও দু'একটি ছবিও বিশ্ব সভায় তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনটি লাভ করে। তুলনায় বেশীর ভাগ ছবির কপালে জোটে কেন জুটেনা? এ কথা বলি না যে, সব ছবিই সার্থক চলচ্চিত্র হয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে। কোন দেশেই সেটা হয় না, হতে পারে না। তাই বলে সব দেশেই বাংলা ছবি এত অপাঙক্তেয় হয় কেন? কেন হবে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ? এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, ভাল ছবি দর্শক নেয় না। ছবি যদি ভাল হয়, হয় যদি রসোত্তীর্ণ—সাধারণ দর্শক সমাজ তাকে বরণ করে নেবেই—ব্যর্থ হবার নয়। কেন এখানে সৎ চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে না বেশী করে—এই প্রশ্ন নিয়েই আজ মাথা ঘামানোটা বেশী জরুরী।

স্বীকার করি, এখানে ছবি তৈরী করার পরিবেশটা মোটেই অনুকূল নয়। সহস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয় পদে পদে। দৈত্য অক্টোপাশের মত জড়িয়ে আছে। আজও সরকার এই শিল্পটিকে 'ইণ্ডাস্ট্রি' হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। অবহেলার সীমা পরিসীমা নেই। কালার ছবি তুলতে গেলে আজও বোম্বে কিংবা মাদ্রাজে ছুটতে হয়—একটা কালার লেবরেটরী পর্যন্ত এখানে নেই। মান্ধাতা আমলের ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে ছবি তুলতে হয়—কোন সংস্কার নেই, সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনাও নেই।

অথচ মোটামুটি আবেদনধন্য সৎ বাংলা ছবি যদি কিছু বেশী সংখ্যায় নির্মিত হতে পারত। তবে বোধকরি, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের শোচনীয় এই হাল অন্ততঃ হত না। উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র যে এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতেও সম্ভব, তাতো সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী পরিচালক দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন কি তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারও সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছবি তৈরীর নজির রেখেছেন। তবে সেখানে বাংলা ছবি একটা সাধারণ মান শুধু বজায় রেখে রসবেদনা সৃষ্টি করতে পারে না কেন বেশী সংখ্যায়? এখানে শিল্প পরিস্থিতির দুরবস্থার দোহাই দিয়ে সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। আসল গলদ হল, চলচ্চিত্র পরিচালনায় ন্যূনতম যোগ্যতার অভাব। এখানে কুশলী কলাশিল্পীর তেমন একটা অভাব আছে বলে মনে হয় না। সেই কুশলী কলা শিল্পীদের যিনি নির্দেশনা দিয়ে একটি ছবি তৈরীর দায়িত্ব পালন করেন, সেই পরিচালকই যদি অপদার্থ হন, তবে ছবি আর ভাল হয়ে উঠবে কোথা থেকে? সে ক্ষেত্রে কলাশিল্পীর দক্ষতা স্রেফ মাঠেই মারা যায়। ছবি ভাল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সে দক্ষতা কোন কাজেই আসেনা। একটা ছবিতে শুধু ক্যামেরার কাজ ভাল হলেই কি সার্থক চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে? কিংবা শব্দগ্রহণের কাজ নিপুণ হলে কি সে ছবির সার্বিক সাফল্য ঘটে? একটা ছবি তৈরীর ব্যাপারে পরিচালক হলেন মস্তিষ্ক স্বরূপ। মস্তিষ্কই যদি অচল হয়, তবে তো পুরোপুরি ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে যায়। আজকে বেশীর ভাগ বাংলা ছবি যে অকিঞ্চিৎকর, তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী অক্ষম পরিচালকের দল। সুতরাং গোড়ায় গলদ হল এটাই—পরিচালনায় অযোগ্যতা।

কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না। বেশী দূর পেছিয়ে যাবার দরকার নেই। এই তো বাইশ বছর আগে ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' যখন বাংলা তথা ভারতীয় ছবির একটা মোড় ঘুরিয়ে দিল, নিয়ে এলো ছবির জগতে নতুন জোয়ার, তখন তো কত প্রতিশ্রুতিই পাওয়া

তোমাদের ছবি আসছে

ডলফিন ফিলমস নিবেদিত

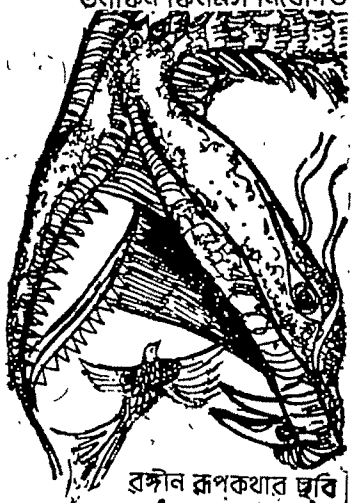

রঙীন রূপকথার ছবি

অরুণ বরুণ ও কিরণমালা

চিত্রনাট্য পরিচালনা বরুণ কাবাসী

সঙ্গীত—অমল মুখার্জী

চিত্রগ্রহণ—দীপক দাস

পরিবেশনা কমলীনা পিকচার্স

প্রযোজনা—বিকাশ দে উদয় পাল

নন্দু তুলসান

কমলীনা পিকচার্স/

৬এ, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা—১৩

গিয়েছিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দীপ্ত পতাকা হাতে নিয়ে একদল শিল্পনিষ্ঠ পরিচালকেরও তো অভ্যুদয় দেখা গেল। সৃষ্টিও তো হল কিছু শিল্প চিত্র। উত্তেজনাও রইল কিছুদিন। কিন্তু তারপর হাউই এর মত সব কিছুই যে আবার নিভে গেল একদিন। কিছু রেশ থেকে গেল অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে। কিন্তু বেশীর ভাগই হয়ে গেলেন গড্ডালিকা স্রোতের শিকার। বেশ কিছু অবাঞ্ছিতের অনুপ্রবেশও ঘটে গেল। দেখা গেল আবার সেই নিয়ম মাফিক হক বাঁধা বাধবন্দী খেলা। সেই মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ ভাবালুতা, মূল্যবোধ, বস্তুপচা এক ঘেঁয়েমী জোলো সব ব্যাপার স্যাপার। হঠাৎ আলোর ঝলকানির পর আবার সেই চিরন্তন আঁধার বাংলা ছবিকে গ্রাস করে ফেলল।

তথাকথিত 'চলচ্চিত্র আন্দোলন' তো কত হল ফিল্ম সোসাইটিগুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু অবস্থা যেমনকার তেমনই রইল। বরং আরও অধোগতি হল। দর্শক তৈরী আর হয়ে উঠলনা। দর্শক সমাজের সঠিক মানসিকতাও গড়ে উঠল না। যৌন সর্বস্ব হুল্লোড়ভরা হিন্দি ছবির তাৎক্ষণিক প্রমোদেই দিশেহারা হয়ে পড়লেন বাংলার দর্শককুল। একেতো বাংলা ছবির দীনদশা—আকর্ষণ করার কোন ক্ষমতাই নেই, তার ওপর দর্শকবৃন্দের হিন্দী ছবি প্রীতি—আর্ট ফিল্মের প্রতি এক জাতীয় অনীহা—বাংলা ছবির অবস্থা ত্রাহি ত্রাহি করে ছাড়ল। সুস্থ সুন্দর বাংলা ছবি তৈরী করে তাঁদের সেই বিরাক্তকেই দূর করে তাঁদেরকে অনুরক্ত করে না তুললে যে বাংলা ছবির জগৎ বাঁচবে না—এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না। আর এটা সম্ভব হবে তখনই, যখন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে সুদক্ষ পরিচালক যত বেশী এগিয়ে আসবেন।

'বাংলা ছবি দেখুন'—এই স্লোগান তুললেই তো চলে না। বাংলা ছবি দেখার মত না হলে লোকে দেখবে কেন? আর ছবি যদি লোকে নাই দেখে তাহলে তো ছবির ব্যবসায়ে পুরোপুরি লোকসান। ছবি যদি ব্যবসাই না করতে পারে, তবে তো 'ইণ্ডাষ্ট্রি'ও বাঁচে না। কিন্তু ছবির ব্যবসা আজও চলছে, তবে চিমেতালে। সেটা চলছে অনেক ক্ষেত্রে 'কালো টাকা'র দৌলতে। তবে এটাকে কি ঠিক-চলা বলে?...

এদেশে একজন কেরাণী হওয়ার চেয়ে ছবির পরিচালক সেজে বসা অনেক সহজ। কোন শিক্ষা বা জ্ঞানের দরকার নেই, যে কেউ শুধু নানা ধান্দা আর ফন্দী করে 'ফাইনান শিয়ার' পাকড়াতে পারলেই সোজা একেবারে চলচ্চিত্র পরিচালক। 'ফাইনান শিয়ার'-এর কিছু কামনা বাসনা তাকে অবশ্যই মেটাতে হয়। সেটা আর এমন বেশী কথা কি—'ডিরেক্টর' হাওয়া গেল তো। এই যেখানে অবস্থা—সেখানে শিল্পের দুরবস্থা ঘটবে—সে আর বড় কথা কি। বিস্ময়ের কথা আজও এখানে বিধিসম্মত প্রথায় পরিচালানার জন্য কোন শিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। অবশ্য এ শিল্পের সংগে যুক্ত কোন কলাকুশলীর জন্যই এমনতর ব্যবস্থা নেই। তবে কলাকুশলীদের হাতেনাতে কাজ করতেই হয়—তাঁদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় কাজ করতে করতেই এবং কাজের নৈপুণ্য ও আসে এভাবেই। কিন্তু পরিচালক!—তিনি যেন স্বয়ম্ভু—এমনই একটা নিজে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তিনি ছবির রাজ্যে প্রবেশ করেন—যেখানে সবটা ফাঁকি!

পরিচালক যিনি হবেন, তাঁর যে থাকা চাই বিদ্যাবুদ্ধি, উন্নত কল্পনা শক্তি শিল্প চেতনা, বিষয়বস্তুর রূপায়ণে সিনেমাটিক জ্ঞান; বিশেষ করে ক্যামেরা ও এডিটিং এ পারদর্শিতা। নইলে তিনি যত নিপুণ কলাকুশলী সহযোগিতাই গ্রহণ করুন না কেন সুসমঞ্জস সুন্দর অবয়বের একটা ছবি দাঁড় করাতে পারবেনা। নান্দনিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা তো পরের কথা। কারণ একমাত্র চিত্র পরিচালকের ধ্যান ধারণাতেই থাকে ছবিটি কেমন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং কলাকুশলীর সহায়তায় সে কাজটাই তিনি সম্পন্ন করেন সুচারুভাবে। সেই নেতৃত্ব যিনি যোগ্যতার সংগে না দিতে পারবেন তিনিই গণ্য হবেন অপদার্থ পরিচালক রূপে। আর এই অপদার্থ অযোগ্য পরিচালকের সংখ্যাই আমাদের বাংলা ছবির রাজ্যে শংকাজনকভাবে ক্রমবর্ধমান। বাংলা ছবির আজিকার সংকট এখানটাতেই।...

যে ছবি হ'ল না, হয় না

নির্মল ধর

ঠিক মনে পড়েছে না।

ঘটনাটি গতবছরের মহালয়ার দিনের, কি কয়েকবছর আগের। কলকাতার বিখ্যাত 'ইন্দ্রজগত' ষ্টুডিওতে মহরত হচ্ছে নতুন ছবির, আরও পাঁচটি অনুষ্ঠানের থেকে এই 'নকল সন্ন্যাসী' ছবির মহরত অনুষ্ঠানটি একটু আলাদা, চেহারায় ও চরিত্রে বিশেষত্ব আছে।

কেন, তাই বলি?

এই ছবির পেছনের কলকাঠি নাড়া এক নিশিকান্ত ঢোল, দুই পুঁটিরাম মণ্ডল, বিলা নোটিশেই একদিন আমার অফিসে এসেছিলেন যাতে ছিল দু'ফুট বাই আড়াই ফুট সাইজের একখানা নিমন্ত্রণপত্র। খামটির উপর রুপোর জলে লেখা 'শুভ মহরত'। প্রণয়ে পায়ে হাত ঠেকিয়ে জনে অনুরোধ করেছিলেন 'দাদা আপনি না এলে চলবে না। আমাদের প্রথম ছবি, আপনার উপদেশ-আশীর্বাদ না পেলে এগোতেই পারবো না।'

নিমন্ত্রণপত্রটি খুলে দেখি রাজ্যের খ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানের প্রধান আতিথি। তরাং ওঁদের অতিথি না হয়ে পায় ছিল না আমার।

যথাসময়ে যথাদিনে হাজির য়েছি 'ইন্দ্রজগত' ষ্টুডিওতে গেটে াকার মুখে দেখে এসেছি বন্ধ ালকাটা চালুটোন ষ্টুডিওটি লু করার দাবি নিয়ে পোষ্টার পড়েছে রদিকে। কবে নাকি একটা মিটিং াছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য ষ্টুডিওর মীরা চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। জোর আর বেশী বাকি নেই, তাই।

ফ্লোরটায় ঢুকে দেখি সুসজ্জিত ক্ষ প্রধান আতিথির অপেক্ষায় য়মান। অপ্রধান অতিথিরা বস্ফারিত চোখে তারক তারকাদের জতে ব্যস্ত। প্রযোজক নিশিকান্ত াল মশাই সবাদ্য (পাবলিসিটি ফসার) ফ্লোরের দরজায় হাজির। বার বাবা মানে প্রযোজকের যিনি ষোজক অর্থাৎ ফাইনান্সিয়ার মহোদয় ঞ্জাবী ধুতি পাম্পসুতে নতুনদা সেজে যোজক মশাইয়ের পাশে নৈবেদ্যের ফল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ তাঁকি কেউই চেনেন না।

চেনার কথাও নয়। ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিংয়ের দশ বারোটা ফ্লোরে অমন অফিসার আছেন কয়েকশো। তাঁদের মধ্যে থেকে আলাদা করে পুঁটিরাম মণ্ডলকে চিনে রাখার কোন কারণও নেই। গত কয়েক বছরে তিনি অসামান্য নিষ্ঠা পরিশ্রম আর দূরদৃষ্টির জোর লেকটাউনে একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি করেছেন। আর সম্পত্তি বলতে আছে গোটা দশেক বিলিতি কোম্পানী কয়েক লাখ টাকার শেয়ার। সেটা অবশ্য উপার্জন করেছেন তার স্ত্রী, নিজে নয়। এখন এগিয়ে এসেছেন বাংলা ছবির উন্নতির মহাকল্পে।

কোনো এক রাত্রিতে অলিম্পিয়ার আলো আঁধারী ভেদ করে জাঁদরেল ম্যানেজ মাষ্টার নিশিকান্ত ঢোল কিভাবে যে এই আই টিও পুঁটিরাম মণ্ডলকে বগলদাবা করেছিল সেটা জানা না। তবে আচরাৎ যে তিনি বাংলা ছবি তৈরী সম্পর্কে কি করণে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন তার কিছু সংবাদ আজানা ছিল না আমার।

এই নিশিকান্ত ঢোল পুঁটিরামকে বাংলা ছবির সুন্দরী নায়িকাদের ভাইটাল ষ্ট্যাটিসটিকস জানিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল শ্যামলী সেনকে ছবির হিরোইন করুন আপনার পায়ের তলায় থাকতে রাজী হবে। বেচারী খুব কষ্টে আছে। ওর 'বাবুমশাই' আজকাল অন্য আর এক সোনালী চুলের খপ্পরে পড়েছে।

আসলে নিশিকান্ত ঢোলই শ্যামলী সেনের প্রেমের ডোবায় হাবুডুবু খেয়ে ঢোল হয়ে বসে আছেন। পুঁটিরামের বঁড়শি দিয়ে তাকে ডাঙায় তোলার চেষ্টা আর কি।

ডায়মণ্ড হারবারের 'সাগরিকা' এবং হোটেল হিন্দুস্থানে কয়েকটি সরস মিটিং এর পর পুঁটিরাম মণ্ডল বাংলা ছবির রাঘব বোয়ালদের গলাধকরণ করার আশায় নিশিকান্তর হাতে গলার দড়িটি বাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে ষ্টুডিওর নির্ধারিত সময়ের পর ঘড়ির ছোট কাঁটা অবাধ্যের মত দু'পাক ঘুরতে চলেছে। মন্ত্রী মশাই তখনো এসে পৌঁছননি। প্রোডাকশন ম্যানেজার একবার মহাকরণ আর একবার মন্ত্রীমশাই এর বাড়িতে টেলিফোন করে চলেছেন। নো রিপ্লাই। হঠাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত দেবদূতের মত টেলিফোনে খবর এলো 'মন্ত্রীমশাই জাষ্ট লেফট।'

আমিও খবরটা পেয়ে ফ্লোরে ঢুকলাম। সামনের সারির সবচাইতে ভালো সিটটা দখল করিতে হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করেও ভালো সিটটা দখল করিতে পারিনি।

এদিকে ঘড়ির ছোট কাঁটাটিকে স্বাধীনভাবে দু'পাক ঘুরতে দিয়েই মন্ত্রীমশাই এলেন, সস্ত্রিক ক ছবির প্রকাশ্য প্রযোজক নিশিকান্ত ঢোল বলির পাঁঠার মত কাচুমাচু হয়ে মন্ত্রীমশাইকে হাত কচলাতে কচলাতে নিয়ে তুললেন মঞ্চে। মিসেস মন্ত্রীকে নিজের চেয়ারটি ছেড়ে দিতে হলো। আর ছাবর গোপন প্রযোজক পুঁটিরাম মণ্ডল জ্বলজ্বল চোখে হিরোইন শ্যামলী সেনকে দেখছেন। উপস্থিত অপ্রধান অতিথিদের এহাট্ট পার্সেন্টের দৃষ্টি পুঁটিরাম মণ্ডলের দৃষ্টিকেই অনুসরণ করছে। টেন পার্সেন্ট (যাঁদের অধিকাংশই মহিলা) মিসেস মন্ত্রীকে দেখতে ব্যস্ত আর বাকি দশ ভাগ অনুষ্ঠান শেষ হলেই বাঁচি এমন অবস্থার প্রতীক্ষারত।

যথাবিহিত মাল্যদান পর্ব শুরু হলো এই জাতীয় অনুষ্ঠানের সবচাইতে অপরিহার্য বিরক্তিকর পর্ব। মন্ত্রীমশাই প্রধান অতিথি হিসাবে অপ্রধান আতিথিদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন।

তাঁর 'নাতিদীর্ঘ' ভাষণের বিশাল বক্তব্যটি হলো—'টালীগঞ্জের সবাই ই যদি আজ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন হতে চান তাহলে এই রুগ্ন ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিকে সরকারের বাপের সাধ্যি নেয় বাঁচাতে পারে, আমিতো কোন ছার। কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করুন। 'অমানুষ' তৈরী করুন আপনারা। সত্যজিৎ মৃণাল আমাদের নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু ওদের পথ ধরলে পেট ভরবে না। আপনারা এই পরিচালক সবজান্তা সর্বাধিকারীর 'নকল সন্ন্যাসী'র মত ছবি করুন। আসল সন্ন্যাসীতে আমাদের কাজ নেই। আসল সন্ন্যাসী অধিক হলেই গাজন নষ্ট হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্ত্রীমশাই বোধহয় ফিল্মটাকে আঁকিং হিসাব ব্যবহার করার কথা বলছিলেন। রগরগে নাচ, ঠনঠনে তলোয়ার খেলা, কোমর দুলে ওঠা গান, রিক্সা-ওয়ালার সঙ্গে লাখপতি নায়িকার প্রেম এইসব দিয়ে জীবনকে ভুলিয়ে রাখা।

এরপর মহরত পর্ব, নিমন্ত্রণ পত্রটিতে লেখা ছিল ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন নায়ক নিস্ফল কুমার কিন্তু তাঁর পোষা অ্যালসেশিয়ানটি নাকি হঠাৎ বিকেলবেলা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি কুকুরের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। জানিয়েছেন আসতে পারবেন না। অগত্যা নায়িকা শ্যামলী সেনকে হাজির হতে হল ক্যামেরার সামনে। কাপড় দিয়ে তৈরী একটা ভাঙা বস্তির দেয়াল। সেই দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল বস্তির মেয়ে সেজে শ্যামলী সেন। পোষাক আশাকে তাঁকে গ্র্যাণ্ডের রিসেপসানিষ্ট বলে মনে হলো। পরিচালক সবজান্তা সর্বাধিকারী শ্যামলী সেনকে নির্দেশ দিলেন 'বুক ফাটানো একটা প্রেম দৃষ্টি দিবেন ক্যামেরায়। ব্যস। নো ডায়লগ।' কেন কারাদকে-সিচুয়েশন কি জানার দরকার মনে করলেন না নায়িকা। পরিচালকও রহিলেন নীরব।

কিন্তু ক্ল্যাপস্টিক কে দেবে?

স্বয়ং মন্ত্রীমশাই উপস্থিত থাকতে কেউই আর ঐ কাজটি করার জন্য এগিয়ে আসতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত ক্ল্যাপস্টিক দেবার জন্য ঠিক করা হলো মন্ত্রীমশায়ের স্ত্রীকে।

মিসেস মন্ত্রীমশাই-এর হাতে তুলে দেওয়া হলো ক্ল্যাপস্টিকের কালো কাঠটি। সবজান্তার নির্দেশে আলো গুলো জ্বলে উঠতেই কাঁপা কাঁপা হাতে ক্ল্যাপস্টিক মারলেন মিসেস মন্ত্রী। একটু দূরে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই লক্ষ্য করলুম ক্ল্যাপস্টিকের কাঠটিতে কিছুই লেখা নেই। শূন্য কাঠ। এই অপূর্ব দৃশ্যটিতো আর কারও নজরে এলো না।

পরে জেনেছি ছবির নামকরণ ফাইনাল হয়নি বলেই নাকি এই ব্যবস্থা। ভুল নয় ওটা।

শব্দ করতে গিয়ে ক্ল্যাপস্টিকের কাটটিই সশব্দে পড়ে গেল ফ্লোরে। দু-একটা ঝলকানি মুখে হাত চাপা পড়ল। শব্দ করেতো হাসা যাবে না ফ্লোর। বাঞ্ছিত লুকটি শ্যামলী সেন অনায়াসেই দিলেন। 'কাট্' শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য প্রযোজক নিশিকান্ত ঢোলি গোপন প্রযোজক জাঁদরেল আই টি ও পুঁটিরাম মণ্ডল দু'পাশ থেকে ঢুকে গিয়ে সপাটে জড়িয়ে ধরলেন শ্যামলী সেনকে। যেন দু'জন ভাগীদার তাঁদের অধিকার সর্বসমক্ষে জাহির করতে চাইলেন।

নিশিকান্তবাবু এসে এক ফাঁকে আমার কানে 'রাত্রিবেলা বন্দোবস্ত আছে' শব্দ তিনটি ইঙ্গিতপূর্ণ সুরে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সেই রাত ছিল আমার কাছে ফুটফুটে জোৎস্নার মত ডবল রাত। এই আগামী ছবির স্বাস্থ্য শুধু নয়, শ্রাদ্ধ পর্যন্ত পান করে ছিলাম আমরা সেই রাতে। আমরা মানে নিশিকান্ত পুঁটিরাম সবজান্তা শ্যামলী আমি। বাড়ি ফিরেছি পরদিন ভোরে।

এরপর দুমাস কেটে গেছে।

এরপরও পুঁটিরামবাবু স-নিশিকান্ত দু-একবার এসেছিলেন আমার অফিসে। স্যুটিং সুরু করছেন সেই সংবাদ জানতে এবং সেই সঙ্গে সেনের নাম করে সরকারী তহবিল তছরুপের কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কি না তা পরামর্শ চেয়েছিলেন, মন্ত্রীমশাই-এর সঙ্গে আমার আস্থাই তখনও ছিল। ইঙ্গিতটা ছিল অন্যত্র। পারিনি সাহায্য করতে।

দু'তিন মাস বাদে হঠাৎই একদিন দেখা নিশিকান্ত ঢোলের সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রীটের এক পরিবেশকের অফিসে তিনি বসে আছেন। সঙ্গে সবজান্তা সর্বাধিকারী দুজনেরই চেহারা বিষণ্ণ। মাত্র দু' রিং ছবি রেডি। এখন ওঁরা কানে দুটোকে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে এই পাড়ায় ঘুরছেন সেই গোপন প্রযোজক পুঁটিরাম মণ্ডল নাকি সটতে পড়েছেন। হাজার সত্ত টাকা খরচ করার পর তিনি আ নিশিকান্তর মুখ দর্শন করেন নি।

পরে পুঁটিরামের কাছ থেকে ছেলে নিশিকান্তবাবু আর শ্যামলী সেন না তাঁকে ব্ল্যাক মেইল করে প্রায় সত্ত হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে। একরা টিনোপলে ধোয়া হোয়াইট টাক অন্য রংয়ের নয়। এ ভুল কেন করলে পুঁটিরামবাবু মশাই? বেচারী তা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর ন যথেষ্ট হয়েছে।

এখন নিশিকান্তকেই তাই ঘুরতে হ পথে পথে। নায়ক নিস্ফলকুমা বাড়তি পঞ্চাশ হাজার টাকা না পে ফ্লোরে পা দেবেন না জানিয়ে দিয়েছেন শেষ তিন দিনের স্টুডিও ভাড়াও বাকি ওঁরা দুজনে স্টুডিও মুখো হতে পারছে না। এ পরিবেশক ও পরিবেশকে দরজায় দরজায় ধর্ণা দিচ্ছেন নগ পার্টি ফিফ্ট করার আশায়।

আমি জানি সে আশাও কম ধর্মতলা বেল্টিক স্ট্রীটের দর্মবন্ধ ক ঘরগুলোতে এরকম সবজান্তা নিশিক পুঁটিরাম অনেক রাঘব বোয়ালে উদরস্ত হয়েছে, হচ্ছে। সেই অনা ছবির আর নামকরণ কোনদিনই হ উঠবে না।

এই ফিল্ম লাইনে সবাই 'অমানু হয়েই আছে। মানুষ নেই থাক এই অনামী ছবির মত কয়েক শ আন চাইল্ডের জন্ম হতো না টালিগঞ্জে।

এই হয়, এই হচ্ছে। নিশিক ঢোলের মত ম্যানেজার, পুঁটির মণ্ডলের মত আই টি ও বা ভেলি ব্যবসায়ী বা স্ক্র্যাপ লোহার ক বারীদের না হটাতে পারলে এরক হবে, হচ্ছেও। এই রচনায় উল্লি চরিত্র নাম ঘটনা সবই কাল্পনিক।

সাম্প্রতিক নাটক : একটি সমীক্ষা

প্রলয় কুমার দেব

হাল আমলে কলকাতার রঙ্গালয়ে বেশ কয়েকটি পেশাদারী ও অপেশাদারী নাটক অভিনীত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় পেশাদারী নাটকের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ এবং কিছু কিছু নাট্য সমালোচকের অপরিমিত উৎসাহ সত্ত্বেও তার মধ্যে সমাজ প্রগতির কোন অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সমকালীন হয়েও এই নাটক পারিভাষিক অর্থে আধুনিক নয়। মাঝে মাঝে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় জীবনের কতিপয় সমস্যা বা ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, ধর্মীয় সংস্কার বা বুর্জোয়া মানবতাবাদ। কিন্তু যে নাটক প্রগতিশীল সমাজচিন্তা, সংগ্রামী জীবনদর্শন অথবা গঠনমূলক মতবাদ প্রকাশ করে না তার জন প্রিয়তা যতই হোক তাকে আমি আধুনিক বলতে পারি না। পেশাদারী নাটকে আমাদের মন ভরে না। আত নাটকের অপোচ্ছ্বাসে অথবা বিষয়বস্তুর দুর্বলতায় প্রায়শঃ বিলীন হয়ে যায় সঠিক পথের নিশানা।

সম্প্রতি আবার অপসংস্কৃতির জোয়ার এসেছে পেশাদারী নাটকে। ক্যাবারে নর্তকীর 'বস্ত্রবিপ্লব' এবং অশ্লীল আদিরসাত্মক সংলাপ অন্যতম আকর্ষণ হিসেব বিজ্ঞাপিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ভালোবাসার 'ব্লো হট' নাটকের জ্বালায় সাধারণ ব্যতিব্যস্ত। নাটকে আদি রসাত্মক ব্যাপার থাকতেই পারে। কিন্তু যেখানে শুধু ব্যবসায়ীক সাফল্যের কথা ভেবে আদিরসের আমদানি সেখানে স্বভাবতই অসুন্দরের প্রকাশ। নারী শরীরের নির্লজ্জ প্রদর্শনকামিতায় একমাত্র যৌনবিকৃত পুরুষই খুশি হতে পারেন। শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। সেখানে কেন দেহ সর্বস্ব উত্তেজনার ক্ষণিক বিলাস? আমি এমন কথা বলছি না যে, নগ্নতামাত্রই অসুন্দর অথবা অশৈল্পিক। প্র্যাক্সিটেলিস ও বত্তিচেল্লির 'ভেনাস' যুগ থেকে যুগান্তরে সমাদৃত। কিন্তু কল্পনা করুন ভেনাস-এর পায়ে জুতো এবং কানে দুল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার গা নিশ্চয়ই ঘিন ঘিন করে উঠবে। আসলে পেশাদারী নাটকে এই ধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ নগ্নতাই দেখা যাচ্ছে। মূল ঘটনার পক্ষে অপরিহার্য নয়, নিতান্তই বিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্যে শুধুমাত্র কুরুচিপূর্ণ দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি নারীর ধীরে ধীরে আবরণহীন হওয়া কোন মতেই শিল্প সম্মত হতে পারে না। একেই বোধহয় বলা যায় সফিসটিকেটেড পারভারশন, যার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক 'রক্ত নদীর ধারা' নাটকে। 'ব্যভিচার' নাটকেও ক্যাবারে নর্তকীর নাচ আছে। নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ভণ্ডতপস্বী আনন্দের মুখোস অনাবৃত করার জন্য এই নাচের প্রয়োজন ছিল। তা হবে হয়তো। কিন্তু অনিবার্য প্রশ্ন : যে দর্শককে নাট্য আন্দোলনের সামিল করতে হবে তাঁর কাছে যৌনবিলাসের ক্লেদাক্ত ছবিটি তুলে ধরাই কি প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার লক্ষণ হয়?

পেশাদারী নাটক সম্বন্ধে সাধারণ দর্শকের উৎসাহ খুবই কম নয়। কয়েকটি নাটক বেশ কিছুদিন চলেছে, এখনো চলছে, যদিও প্রকৃত অর্থে তাদের রসোত্তীর্ণ বলা যায় না। কোন বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ বা নাটক ভাবুকতার কোন মৌলিক পরিচয় দর্শকের মনে আদৌ রেখাপাত করে নি। কেউ কেউ চিত্রতারকাদের দেখার বাসনা নিয়ে ছুটে ছেন। কেউ কেউ আবার দেখতে চেয়েছেন আঙ্গিকের উৎকর্ষ। আসলে পেশাদারী নাটকের প্রযোজক অনেক টাকা পয়সা খরচ করেন এবং বক্স-অফিস খাতে নিয়ত সক্রিয় থাকে তার জন্য নানাবিধ চমক সৃষ্টির আয়োজন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী বা সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতের জন্য নিয়োগ করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। এছাড়া চিত্রভারকারদের অভূতপূর্ব সমন্বয় তো আছেই। এইসব কারণেই অপেশাদারী নাট্য সংস্থার পক্ষে পেশাদারী প্রযোজনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। অপেশাদারী নাট্যসংস্থার অনেক সমস্যা : অর্থের সমস্যা; অভিনেত্রীর সমস্যা, নিখরচায় বা স্বল্প পারিশ্রমিকে কলাকুশলীদের জোগাড় করার সমস্যা। তদুপরি কোন কোন নাট্যসমালোচক তো কলম উঁচিয়েই আছেন। পেশাদারী নাটকের আলোচনায় এঁদের উদ্যম অনবসিত। কেননা সেখানে এঁরা আশ্চর্যজনকভাবে অনেক প্রশংসনীয় দিক খুঁজে পান। অথচ অপেশাদারী নাটক আলোচনা করতে গিয়ে এঁরা প্রায়ই আঘাত দিয়ে আনন্দ লাভ করেন।

পেশাদারী নাট্য প্রযোজনার কথা বলছিলাম। অনেকদিন ধরেই বিশ্বরূপায় নিয়মিত মঞ্চস্থ হচ্ছে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বিমল মিত্রের বৃহদায়তন উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন রাসবিহারী সরকার। নাটক পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। নাট্যজগতে চিত্রতারকা সুপ্রিয়া দেবীর প্রথম আবির্ভাব, দ্রুতদর্শন মঞ্চরীতি, তাপস সেনের আলোর খেলায় ট্রেন-অ্যাকসিডেন্ট-এর শিহরণকারী দৃশ্য এবং সর্বোপরি ক্যাবারে নর্তকীর উত্তে-

জক নাচ, এই সব রকমারি আকর্ষণের সমাহার এই নাটকে। কাশী বিশ্বনাথমঞ্চে চলছে 'অঘটন'। বনফুলের 'ভীমপলশ্রী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন বীরু মুখোপাধ্যায়। নাটকের নির্দেশক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে দৌড়েছে ভগ্নস্বাস্থ্য মোটর স্টেশন সাইকেল, প্ল্যাটফর্ম এ দেখা গেছে ট্রেন। অভিনয়াংশে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অনুপকুমার ও গীতা দে। । স্টার রঙ্গমঞ্চের সাম্প্রতিক নাটক 'সম্রাট'। নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা রঞ্জিৎমল কাংকারিয়ার। নির্দেশকও তিনি। মূল কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন অসিত বসু।

এছাড়া বিভিন্ন পেশাদারী মঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে অনেকগুলি নাটক।

পেশাদারী নাট্য প্রযোজনার তুলনায় অপেশাদারী বা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা সংখ্যায় অনেক বেশি। গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা সম্বন্ধে এখন অনেকেই বিশেষ ভাবে আগ্রহী। কেননা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন তাঁরা। হাজার সমস্যার মোকাবিলা করে কখনো চক্ষুস্তর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আবার কখনো নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর ভেঙে ফেলে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন প্রগতির পথে। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে, আমাদের দেশের গণনাটকীয় ঐতিহ্য স্বাঙ্গভূত করেই তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইছেন। বস্তুনিষ্ঠ যুগচেতনার পরিপ্রেক্ষাপটকায় জীবনকে সম্বোধন করে তাঁরা ইতিমধ্যেই মূর্ত করে তুলেছেন একটা গভীর বিশ্বাস। আসলে যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নাটক লিখে একদিন বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী ও সলিল সেন যে নব নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন আজও তার অগ্রগতি অব্যাহত। গ্রুপ থিয়েটারের প্রায় সব নাটকই সমাজজীবনের দর্পণ, শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার এবং আগামী দিনের পথ নির্দেশ।

পুরোনো কিছু নাটক বা বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'; অপেশাদারী দলের প্রযোজনা 'রজনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'। দিলীপ মজুমদারের নির্দেশনায় পদাতিক গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'ন্যায়সা কি ত্যায়সা।' রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের নাট্যরূপ উপস্থাপিত করেছেন রবিরঞ্জনী ও গন্ধর্ব যথাক্রমে 'গৃহপ্রবেশ' ও 'বদনাম' নাটকে। শেষোক্ত নাটকটি সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। এর নাট্যরূপকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশক দেবকুমার ভট্টাচার্য। শরৎ শতবার্ষিকীর সম্মান রক্ষার্থে প্রযোজিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের নাটক অথবা তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ। রবীন্দ্র সদনের নট্যোৎসবে পরিবেশিত হয়েছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক: দেশবন্ধু গার্লস কলেজ এর 'অরক্ষণীয়া,' মহলার 'বিপ্রদাস', প্রতীকের 'বিন্দুর ছেলে', ইন্দ্রসভার 'চরিত্রহীন', অঙ্গীকারের 'পরিণীতা', অঙ্গমের 'বিরাজ বৌ', রঙ্গসভার 'চন্দ্রনাথ', চতুর্মুখের 'ষোড়শী,' এম জি এন্টার প্রাইজ এর 'বৈকুণ্ঠের উইল,' আই, বি, এ এর 'রমা।' তবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে অভিনব প্রক্রিয়ায় শ্রদ্ধা জানিয়েছে শৌভনিক। শরৎসাহিত্য থেকে ঝাড়াই ছাঁছাই করে কোন কাহিনী গ্রহণ না করে তাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন ব্যক্তিমানুষ শরৎচন্দ্রের দিকে। 'ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র' নাটকে এই সংবেদী মানুষটির নিভৃত জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের স্নেহ-ভালোবাসা মায়া মমতা এবং শোক বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ রেখেছিলেন সন্তোষ সেন। কৃষ্ণ কুণ্ডুর পরিচালনায় নাটক ভালোভাবেই উতরে যায়। লাইম-লাইট এর উদ্যোগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন অজিত সান্যাল। নির্দেশনাও তাঁর।

জীর্ণ গতানুগতিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন কয়েকটি নাট্যসংস্থা। কখনো আমরা অনাবিল হাসির তরঙ্গে ভেসে গেছি, কখনো হারিয়ে গেছি শৈশব কল্পনার রূপকথায়, আবার কখনো মুগ্ধ হয়েছি মেজাজী সুরের খেলায়। শৌভনিকের 'নাটের গুরু' তাঁদের আগের নাটক 'ছুটির ফাঁদে'র মতোই নির্ভেজাল কৌতুকরসে অভিসিঞ্চিত। সমরেশ বসুর কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন অসিত ঘোষ। নির্দেশনায় আছেন অমল মুখোপাধ্যায়। সুরারোপ করেছেন ভাস্কর মিত্র। নিমু ভৌমিকের অভিনয় এই নাটকের পরম সম্পদ। দুটি শিশুনাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আনন্দ থিয়েটার এর 'কাকাজু,' যার পরিচালক তপন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিশু রঞ্জনের 'জাদুর দেশে জগন্নাথ'। শেষোক্ত নাটকটির রচয়িতা ও নির্দেশক শৈলেন ঘোষ। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিষয়বস্তুর আবেগ নিবিড়তা এবং করণ কৌশলের অভিনবত্ব এই নাটককে সত্যিই উপভোগ্য করে তুলেছে। ওয়াই এস, মুলকীর সুরারোপিত নামগুলো শুধুশ্রাব্য নয়, হৃদয়গ্রাহী। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে পাঁচবছর বয়সী শিশু শিল্পী পলাশ দেব ও পৃথা গাঙ্গুলীর নাচ সমবেত দর্শক মণ্ডলীর বিস্ময় উদ্রেক করে।

সঙ্গীতবহুল নাটকের তালিকায় একতারা শিল্পী চক্রের জন্যে আমি একটি স্বতন্ত্র মহান নির্দেশ করব। এঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'কোলকাতা থেকে দূরে।' নাটকের রচনা পরিচালনা ও সুরসংযোজনার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শম্ভু চৌধুরী এবং প্রতিটি কাজেই তিনি গভীর আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু যেমন পরিশীলিত তেমনি আবেশ সঞ্চারী এর সঙ্গীত। লোক শিল্পও লোক সংস্কৃতির মাধুর্য আমাদের মনে ঢেউ খেলিয়ে দেয়। ইদানীং অনেক নাটকেই গানের ব্যবহার লক্ষ করছি। কিন্তু একতারা শিল্পী চক্রের নাটকে গান নাট্যভাবনার তাৎপর্য বাড়িয়ে দেয়। থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ-এর 'আবু হোসেন' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের মূল নাটক অবলম্বনে একটি মজাদার অপেরা।

পঙ্কজ মুন্সী এর রচয়িতা, নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন দেবাশিস দাশগুপ্ত। বিচিত্র স্বাদের নাটকগুলোর মধ্যে বহুরূপীর 'যদি আর একবার' উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফ্যান্টাসিধর্মী, অসম্ভবের খেয়ালী ছন্দে রচিত এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' স্মরণে আনে। নাটকের রচয়িতা বাদল সরকার। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভৃপ্তি মিত্র। কেউ কেউ এই নাটক সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও নাটকটি দেখে নিরাশ হতে হয়।

সরাসরি রাজনীতির আদর্শ নিয়ে লেখা কয়েকটি নাটক এ বছরে অভিনীত হয়েছে। এই রাজনীতি মুখ্যত বিপ্লবভিত্তিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পসম্মত প্রচার ধর্মিতার মূল ছুঁয়ে একযোগে ব্যাপ্ত ও বিকশিত। কবচকুণ্ডলের 'চলো সাগরে' (নাটক/নির্দেশনা : বিজন ভট্টাচার্য,) থিয়েটার স্টাডি গ্রুপ এর 'স্বাধীনতা' (নাটক : অনল গুপ্ত/নির্দেশনা : বিনয় গাঙ্গুলী), সায়কের 'ভ্যামপায়ার' (নাটক/নির্দেশনা : শিশির বসু), যাত্রিকের 'গঙ্গা তুমি বইছ কেন' (নাটক : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য/নির্দেশনা : নিখিল ভট্টাচার্য), অবেক্ষণের 'সওয়াল' (নাটক : নিমাই ঘোষ/নির্দেশনা : মানবেন্দ্র গোস্বামী), রূপান্তরীর 'মন্থন' (নাটক/নির্দেশনা : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি নাটকে কখনো শ্রেণী সংগ্রামের শপথ আবার কখনো সাম্যবাদের স্লোগান অগ্নিবীণার মতো বেজে উঠেছে। সমসাময়িক রাজনীতির কথা মনে রেখে শ্লেষ, বিদ্রূপ, নির্মম প্রত্যক্ষ সমালোচনা অথবা তির্যক রূপকের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কায়েমী স্বার্থের শিবির নিশ্চিহ্ন করে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে দুটি বিচিত্র আঙ্গিকের নাটক, পি এল টি'র 'এবার রাজার পালা' এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর 'নরক গুলজার'। প্রথম নাটকটির রচয়িতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত। দ্বিতীয় নাটকটির রচয়িতা মনোজ মিত্র, পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী। 'ব্যারিকেড' বা 'টিনের তলোয়ার'-এর সঙ্গে এবার রাজার পালা'র তুলনা যেমন অবাঞ্ছিত ঠিক তেমনি নিরর্থক 'চাকভাঙা মধু'র সঙ্গে 'নরক গুলজার'-এর তুলনা। বরং এই কথাই বলা ভাল যে, দুটি দলই ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছিলেন।

চলতি বছরের আরও কয়েকটি নাটক উল্লেখ করা প্রয়োজন। থিয়েটার ক্যালকাটার প্রয়োজনা 'স্বর্ণ ভিলা'। নাটকটি লিখেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা করেছেন বরুণ দাশগুপ্ত। গ্রুপ থিয়েটারের কাছে আমাদের যে আশা তার অবলুপ্তি ঘটে যায় এই নাটক দেখলে। মঞ্জু দের অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য মনে রেখেও এটা বুঝা কঠিন যে রবীন্দ্র সদনে এই নাটক নিয়মিত মঞ্চস্থ করার সুযোগ দেওয়া হল কেন। সুজন সেনগুপ্ত পরিচালিত চতুরঙ্গের 'হবো ইতিহাস' এবং ওয়ার্কাস থিয়েটার-এর 'লোহার নূপুর' (নাটক/নির্দেশনা অসিত বসু) খুব একটা সাড়া জাগাতে পারে নি। 'কলকাতার হ্যামলেট' আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু 'লোহার নূপুর' তেমন করে বাজল না। থিয়েটার সেন্টার-এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক 'আর হবে না দেরী' (নাটক/নির্দেশনা : তরুণ রায়) খুব খারাপ হয় নি। থিয়েটার ইউনিট-এর 'পন্ত লাহা' ব্রেখ্‌টের 'হের পানটিলা এ্যাণ্ড হিজ ম্যান ম্যাট্টি' নাটকের রূপান্তর। এই নাটকে সব দিক থেকেই শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সাফল্য অনস্বীকার্য। তাঁর প্রয়োগ কুশলতায় ব্রেখ্‌ট আমাদের কাছের মানুষ হয়েছেন। নান্দীকারের 'সওদাগরের নৌকা' (নাটক : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/নির্দেশনা : রাধারমণ তপাদার) আগাগোড়াই কাব্যময়। নির্জন বেদনায় দোসর হয়ে যে সওদাগর উত্তাল নদীতে ময়ূরপঙ্খী ভাসায় তাকে আমরা ভালোবাসা দিয়েই আপন করে নিতে চাই।

থিয়েটার কমিউন এর 'দানসাগর' নাট্যকারের 'ফুটবল' এবং চেতনার 'জগন্নাথ'। প্রেমচন্দের 'কফন' গল্প অবলম্বনে দেবাশিস মজুমদার লিখেছেন 'দানসাগর', নাটকের নির্দেশনায় এবং প্রধান চরিত্র চিত্রণে আছেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। নাটকটি সত্যিই ভালো হয়েছে। শ্রেণী শোষিত সমাজের বাস্তব, তীক্ষ্ণ জীবনযন্ত্রণা, অন্ধকার অস্তিত্বের ক্ষুব্ধ অবসাদ এবং সেইসঙ্গে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ এই নাটকের গণ আবেদন নিবিড় করেছে। পিটার টার্সনের 'জিগার-জ্যাগার' নাটকের রূপান্তর 'ফুটবল' (রচনা/নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) একটি পরিচ্ছন্ন প্রযোজনা, ব্রেখ্‌টীয় আঙ্গিকে সমৃদ্ধ। কিন্তু সমকালীন নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকের মূল্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। নাটকটিতে প্রমোদ উপকরণের অভাব নেই। নাচ, গান হাস্যপরিহাস সবকিছুই জমজমাট। 'জগন্নাথ' নাটকের কাহিনীসূত্রে লু শুনের 'The True Story of AH Q।' কিন্তু নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনভাবে নাটকটি রচনা করেছেন যে আমাদের মনে হয় মৌলিক কল্পনা প্রতিভারই উদ্ভাস ঘটেছে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, কখনো চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে, কখনো মূকাভিনয়ের প্রয়োগ, আবার কখনো সাঙ্গীতিক আবহরচনায়। বিষয়বস্তুর কাঠামোতে শ্রেণীচেতনা বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঋজু পরিচয় না থাকলেও তত্ত্ব ও কাব্যতা, বুদ্ধি ও অনুভূতির একত্র সম্মিলনে ঠাস বুনটের এই নাটক একালের একটি স্মরণীয় প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত হবে। জগন্নাথের চরিত্রে রূপদান করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের গান

শম্ভু চৌধুরী

নাটকে গানের কদর খুবই স্বাভাবিক। মুখশ্রাব্যতা ছাড়াও গান নাটকের সংলাপের এক ঘেয়েমিকে দূর করে 'রিলিফ' এনে দেয়। নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি এবং চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনেও গানের রসালো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বাক্য সহা বলিতে পারেনা গান তাহাই বলে।" অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার, নাটকের গান যদি নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ না হয়, নাটকের গতিকে ব্যাহত করে তবে সে গান দর্শকের বিরক্তির কারণ ঘটায়।

আমাদের নাটকে গান এসেছে যাত্রার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। তাই সূচনা কাল থেকেই বাংলা নাটক গীতি বহুল। মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই একই ট্রাডিশন। মধুসূদন এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকের গানগুলো রচিত হয়েছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে অবলম্বন করে— কোথাও রাগরাগিনীর হুবহু অনুসরণে, কোথাও রাগের আশ্রয়ে বা টপ্পার ঢংয়ে। ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকেও তাই। তবে ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকের গান হালকা ধরনের মিশ্রসুরের গান এবং তাঁর যে যে গানে নাচ যুক্ত হয়েছে তাতে দ্রুত তাল, আর ছন্দ এসেছে। মধুসূদন থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্য্যন্ত প্রতিটি নাটকে গান অসংখ্য। এই নাটকগুলিতে গান যে সবসময় প্রয়োজনে এসেছে তা নয়। সেই সময়ের নাটকগুলিতে গানের সংখ্যা দেখে মনে হয় অন্য নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান ঢোকানো হতো। দ্বিজেন্দ্র লালের নাটকে মোটামুটিভাবে সার্থক নাট্য সঙ্গীতের প্রথম সন্ধান মেলে। গানের বাণী ও সুরের এমন হরপার্বতী মিলন এর আগে কদাচিৎ দেখা যায়। সুরের দিক থেকেও তিনি নতুনত্ব সৃষ্টি করলেন। দিশী সুরের সঙ্গে বিলিতি সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে গানে নাটকীয় গতি সঞ্চার করলেন। নাটকে গান সবচেয়ে সার্থক হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথে এসে। কি প্রয়োজনের তাৎপর্যে কি বাণী ও সুরের সামঞ্জস্যতায় কি সুরের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকের গানের ক্ষেত্রে সার্থক স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যেমন আছে, তেমনি আছে গান, আছে নাচ। কিন্তু একটা থেকে আরেকটা আলাদা নয়। তাঁর নাটক, নাচ, গান মিলিমিশে একাকার। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে অপরেশ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ নাট্যকারগণেরও নাটকে কম বেশি স্থান পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানের নাটকের যে রীতি স্থাপন করেছেন তাদের নাটকে তা লক্ষ্য করা যায় না। নাটকের গানের রবীন্দ্র রীতির ব্যতয়ই শুধু নয়, নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অতীতের পৌরাণিকতা বা রবীন্দ্র কাব্যধর্মীতার পরিবর্তে একালের নাটকে কঠোর বাস্তবতার সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য পায়। একটা কৌতূহল জাগে। ঐ আমলে নাটকের বিষয়বস্তুর বদল হলো। ভালো কথা। কিন্তু গানের নাটকের রবীন্দ্র রীতি বজায় রইলো না কেন?

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে বাংলা নাটকের বর্তমান ধারার সূচনা হলো। একালের নাটকে গানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার আগে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দু,চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের গানকে কেউ কেউ ঢালাও ভাবে গণ সঙ্গীত আখ্যা দিয়েছেন। কথাটা ঠিক নয়। বর্তমান কালের সব নাটকইতো আর গণনাট্যীয় নয়। ফলেই বর্তমান নাটকের গান মাত্রই গণ সঙ্গীতও নয়। তাছাড়া একেবারে হাল আমলের 'মারীচ সংবাদ'-এর পূর্ব পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক গণনাট্যধর্মী নাটকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় গান রয়েছে। গণনাট্যেরও যে যে নাটকে গান আছে তারও সব আবার গণসঙ্গীত নয়। 'নবান্নের' কথাই ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকে নাট্যকার মাত্র ৩০টি গান দিয়েছেন। সেটিও দেশাত্মবোধক বা গণসঙ্গীত বা দেহতত্ত্বজাতীয়।

সাম্প্রতিককালে বাংলা নাট্যজগতে 'বহুরূপী' পি এল টি নাট্যসংস্থাদ্বয় সর্বাগ্রে উচ্চারিত নাম। বহুরূপী সঙ্গীতকে একপাশে সরিয়ে রেখে নান্দনিক নাটকের চেষ্টায় ব্রতী। ফলেই একমাত্র রাবীন্দ্রিক প্রযোজনা-

পান্না হীরে চুনী, সোনা বৌদি
'অচেনা অতিথি' ও 'নয়ন'-এর
অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবার

চিত্রগ্রহণ পরিচালনা/বিজয় দে
চিত্রগ্রহণ/শান্তি.দত্ত, শিল্প নির্দেশনা/সূর্য চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা/রমেন ঘোষ

গুলো ব্যতিরেকে বহুরূপীর অন্যান্য নাটকে গানের ভূমিকা নগন্য। পি এল টিও তাই। কি যাত্রায়। কি নাটকে উৎপল দত্ত গানের বিশেষ পক্ষপাতী নয়। তবু এরই মধ্যে তাঁর যে দুটি একটি নাটকে গান আছে সেগুলো হলো 'তিতাস একটি নদীর নাম', "কল্লোল' 'টিনের তলোয়ার'। 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে যে গান তা লোকসংগীত। 'কল্লোল' নাটকের কয়েকটি গান গণসঙ্গীত জাতীয়—। 'টিনের তলোয়ার' এ যে কখানি গান আছে (গীতিকার সুরকার উৎপল দত্ত নয়) সেগুলোকে ব্যঙ্গগীতি বলা যায়— অতীত সমাজকে ব্যঙ্গ করে লেখা। ইদানীং কালের দুটি নাট্যসংস্থাকে জানি যারা পুরোপুরিভাবে গানের নাটকই করছে। সেগুলো হলো রূপকার গোষ্ঠী এবং একতারা শিল্পী চক্র। রূপকার গোষ্ঠীর সবিতাব্রত দত্ত পুরনো আমলের দুটি গানের নাটকে 'ব্যাপর্কা বিদায়' এবং 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরী' এখনও করছেন। তাছাড়া তাঁর 'এক্টনি কবিয়াল' এবং 'লালন ফকির' নাটক দুটিও গানে সমৃদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধকার রচিত ও সুরারোপিত একতারা'র দুটি গানের নাটক "গায়ক যখন নায়ক" এবং 'কোলকাতা থেকে দূরে' এখনও চলছে। ব্রেখট অবলম্বনে নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা'য় অজিতেশবাবু গানের কথা, সুর এবং প্রয়োগে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। চেতনা গোষ্ঠীর "মারীচ সংবাদ" এ গান যেমন নাটকের প্রধান সম্পদ তেমনি "ভালো মানুষের পালা"তে গান নাটকের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। হালের আর একটি সফল গান বহুরূপী নাটক হলো ব্রেখ্‌ট অবিলম্বে গণনাট্য সংঘের শিল্পীচক্র শাখা এবং অবেক্ষণ প্রযোজিত 'বিধি ও ব্যতিক্রম'। নাটকটির পরিচালক মানবেন্দ্র গোস্বামী এবং গীতিকার সুরকার বর্তমান প্রবন্ধকার। অন্বেষক গোষ্ঠীর 'বিদ্রোহ ১৭৯২' নাটকে বেশ কটা গান আছে। কিন্তু সেগুলো সুপ্রযুক্ত নয়। সুরের দিক থেকেও সাদামাঠা। সাহানার 'ইকুয়েশন' নাটকে গানের সংখ্যা অনেক। গানগুলোর প্রয়োগ যথাযথ এবং সুরও সুন্দর। সংলাপ গোষ্ঠীর 'ইলিশ মারীর চর' নাটকের গানগুলো নাটককে সাহায্য করেছে। সুরের দিক থেকেও খানকয়েক গান ভালো উতরেছে। থেকে সাধারণ। টি এল জি'র 'শিবের অসাধ্য' এবং 'আবু হোসেন' (গিরিশ ঘোষ রচিত) নাটক দুটিতে গান আছে। বিশেষ করে আবু হোসেনে তো কথায় কথায় গান। দেবাশীষ দাসগুপ্তের সুর ভালো। কিন্তু গানের সংখ্যাধিক্য দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়েছে। নাট্যায়ন প্রযোজিত 'গুপী বাইন বাঘা বাইন' নাটকের গানও সুপ্রযুক্ত এবং দেবাশীষ দাসগুপ্তের সুরে চমৎকার শুনিয়েছে। লাইম-লাইটের 'পদ্মানদীর মাঝি'র (সুর হেমাঙ্গ বিশ্বাস) গান বিচ্ছিন্নভাবে ভালো লাগলেও কয়েকটি গান নাটককে সাহায্য করে না। সায়ক গোষ্ঠীর 'ল্যাম্পপোস্ট' নাটকেও কোরাসের ঢংয়ে কতগুলো গান আছে। কিন্তু প্রয়োগে এবং সুরারোপে একেবারেই ব্যর্থ সে গানের পসরা। গণনাট্য সংঘের কলকাতার শাখার "হারাণের নাত জামাই" নাটকটিতে কয়েকটি গান আছে যার প্রয়োগ ও সুর সুন্দর।

——•——

আপনার দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রয়োজন যেমন :—

* সরষের তেল
* মশলাপাতি
* ডাল
* লবণ
* বেবীফুড
* নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধুতি, শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি
* বাংলার তাঁতের শাড়ী ইত্যাদি...

...ইত্যাদি সবকিছু ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যাচ্ছে আপনার নিকটবর্তী ক্রেতা সমবায়ে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে এবং ন্যায্যমূল্যে খাঁটি দ্রব্য সংগ্রহ করতে আজই আপনার নিকটবর্তী ক্রেতা সমবায়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনাদের সেবায় :—

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ফেডারেশন অব হোলসেল কনজ্যুমারস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটিজ লিঃ

পি-১, হাইড লেন, কলিকাতা—১২
ফোন :—৩৪-৭০১১

গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা

দেবনারায়ণ গুপ্ত

বর্তমান কালে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোন কোন নাট্যকর্মী গিরিশ চন্দ্রের নাট্য প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাঁদের কারুর কারুর লেখনীর মুখে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি নাট্য পদবাচ্য বলা যায় কিনা, এমনতর সংশয়ের ভাবও প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ নাট্য সংস্থার মধ্যেই আজকাল বিদেশী নাটকের ভাবাবলম্বনে (অথবা অনুবাদ করে) নাটক রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার মধ্যে কোন মৌলিকত্ব নেই। ফলে, আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা এই সব নাটকে প্রায়ই অনুপস্থিত।

সেক্সপীয়ার ওদেশে আজও বাসী হয়ে যান নি। আজও ওদের দেশে সেক্সপীয়ারের আদর এবং কদর আছে। সেই সঙ্গে ধ্রুপদী নাটক হিসাবে পূর্ব সূরীদের নাটক এখনও মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। দীনবন্ধু, মাইকেল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকী আমাদের কৈশোর যৌবনে নানাকারণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এইসব কারণের মধ্যে প্রধান কারণ ছিল সে যুগের এই সব নাটকে দেশ, জাতি আর সমাজের একটা প্রকৃত ছবি ফুটে উঠতো, আর সেই সঙ্গে পরাধীনতার দুঃসহ বেদনার কথাও বৈধৃত হোত। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদ সে যুগে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কবি, গীতিকার ও অভিনেতা। নাটকের জন্য কলম ধরেছেন তিনি চৌত্রিশ বছর বয়সে। তাঁর আগে তাঁর রচিত গান গুলি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। জোড়াসাঁকো স্বদেশ মমিতির অনুরোধে যে গানটি তিনি রচনা করেন, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেন আর ভাবছ অত,
দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে
এস ভাই থাকি সবাই,
মায়ের ছেলে মায়ের হয়ে॥
স্বদেশী কাপড় নিতে,
পেছিও না ভাই দু'পাই দিতে
হার হবে না, যাবে জিতে,
দেশে টাকা যাবে রয়ে॥
ইত্যাদি...

এই সময় তাঁর রচিত 'সোনার বাংলা' নামক গানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশমাতৃকা ও দেশের সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক উক্তিগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধরই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

এইভাবে সন্তানের ও দেশমাতৃকার শক্তির মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ গানটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি নিখুঁত ছবি অঙ্কিত হয়ে আছে। আজকের দিনে যার মূল্যায়ন করা যেতে পারে কেবলমাত্র ইতিহাসের পটভূমিকায়। সাহিত্যের দ্বি-সত্তা। আজকের সাহিত্যের মাধ্যমে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে, উত্তর-কালের পাঠকেরা এই সময়কার দেশের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা এই সাহিত্যের মধ্য থেকেই জানতে পারবেন। কাজেই সাহিত্যিক মাত্রেরই এ বিষয়ে একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে। গিরিশচন্দ্র এ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

অনেকের ধারণা গিরিশচন্দ্র গুরুকে 'ব-কলম' দেওয়ার পর, ধর্মজীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে কর্মজীবনে তিনি আর কোন উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা যদি পুঙ্খানুপঙ্খরূপে গিরিশ রচনাবলীর আলোচনা করি, তা'হলে দেখতে পাব ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে।

চল্লিশ বছর বয়েসে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করেছিলেন বাং ১২৯১ (ইং ১৮৮৪) সালের শেষের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহা সমাধি লাভ করেন বাং ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬) সালের ৩১শে শ্রাবণ। গিরিশচন্দ্র পুরো তিন বছরও ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান নি। অথচ এই অল্পদিনের মধ্যে পরমহংসদেবের অগণিত ভক্ত-জনের মাঝে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

১২৯৩ সালের ২০শে আষাঢ় ষ্টার থিয়েটারে "বিল্বমঙ্গল" নাটক মঞ্চস্থ হয়, আর ঐ বছরেই শ্রাবণ মাসে ঠাকুর দেহত্যাগ করেন। 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশ-চন্দ্রের ৩৯তম নাটক। 'বিল্বমঙ্গল' রচনার পরেও তিনি ৫১ খানি নাটক রচনা করে গেছেন। যার মধ্যে আছে— 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'মায়াবসান', 'নসীরাম', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি শিবাজী', 'পাণ্ডব গৌরব', 'ম্যাকবেথ', 'জনা', প্রভৃতি। এর দ্বারায় প্রমাণিত হয় নাকি, যে তিনি নাট্য রচনায় স্তব্ধ হয়ে যান নি?

আচারে আচরণে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত দুর্বিনীত; কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বইতো সতস্ফূর্ত প্রেম-ভক্তির ফল্গুধারা। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর দেশ-প্রেম ও দেশভক্তির কথা বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র 'পরুড়'

নামক একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখেন—মাতৃমন্ত্র ইউরোপেই ফলে এমত নহে। বিপদ দীক্ষিত আকবর রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন, রাণা একজন মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় অধিক গৌরববর্ধিনী। যখন সমস্ত রাজপুতনা আকবরের সিংহাসন-তলে যুগপৎকরে দণ্ডায়মান, তখন পুরুষ সিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবল্লী পর্বত শুনিতেছে।...ইহা সকলই সেই মাতৃ মন্ত্রের ফল। শতদ্রু সলিল বিকম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল—ইংরাজ শুনিল। দেখিতেছি এ মন্ত্র-হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কেহই ঈদৃশ হীন নাই—যিনি মনে করিলে এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধমন্ত্র রহিয়াছে, হায়! কেহ কি গ্রহণ করিতে নাই?

গিরিশচন্দ্র কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে, কি প্রবন্ধে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তিনি চেষ্টা করেছেন, স্বদেশ চেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে।

অনেকের ধারণা তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'ই দেশাত্মবোধক নাটক; কিন্তু তাঁর বহু সামাজিক নাটকের মধ্যেও দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৯৭ সালে গিরিশচন্দ্র 'মায়াবসান' নাটক রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র নিজে পানাসক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁর লেখনী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'মায়াবসান' নাটকে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে একটি সংলাপের মাধ্যমে তিনি বলেছেন—"মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন, বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে তাকে সামাজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপরে দেখছেন দীন-দারিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না। তাতে যে কি সর্বনাশ হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। এমন কুটির নাই, যেখানে মদের বোতল, শ্লিপ বোতাম, সাবান এসেন্স নাই। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন। পরহিতকারী হতে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন-দরিদ্রের সাহায্য করুন।" 'মায়াবসান' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র কালীকিঙ্করের সংলাপের মাধ্যমে বলেছেন—'গ্রাম, পল্লী, শহর মোকর্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে সকল বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত করে মোকর্দমার সর্বনাশ নিবারণ করুন। তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট ফি বেঁচে যাবে' কৌন্সলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে সে টাকা দেশে থাকবে। চরক বলেন, যে দেশ উকিল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম কারণ। এ ব্যয় আপনাদের হাতে আছে, এইটে আগে করুন।"

আজ থেকে আশী বছর আগে গিরিশচন্দ্র 'মায়াবসান' নাটকটি রচনা করেন। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, আশী বছর পূর্বে তিনি পঞ্চায়েতের কথা বলেছেন, রকেটে করে মহাকাশ পরিভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছেন। নাটকটি পড়তে পড়তে মনে হয়, কি দূরদৃষ্টিই না ছিল গিরিশচন্দ্রের। যে কল্পনা-শক্তি আজকের সমাজ জীবনের ওপরেও

শেষ শয্যায় গিরিশচন্দ্র। শিয়রে একমাত্র পুত্র দানীবাবু

প্রভাববিস্তার করে। 'মায়াবসান' নাটকে মাধব ও হলধরের সংলাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ঐ সুস্পষ্ট সংলাপের মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ সে যুগের বড় বড় কংগ্রেস-সেবীদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা সে যুগে বাইরে ভ্রাতৃভাব দেখিয়ে, দেশোদ্ধারের দোহাই দিতেন—আর অন্তরের অন্তভাব পোষণ করতেন।

১৮৯৭ সালে গিরিশচন্দ্র 'হীরক জুবিলী' নাটক রচনা করেন। এই নাটকের এক জায়গায় তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন—"কেন মা দুর্গ নির্মাণ, কেন এত বেতন ভোগী গোরাসৈন্য? কেন এত অর্থব্যয়? চেয়ে দেখ তোমার রাজপুত সৈন্য দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ রণব্রত রাজ্য-বৎসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মাদ্রাজী, পার্শী অসিকরে দণ্ডায়মান। প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার দৃঢ় প্রাচীর। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখবে যে ভিক্টোরিয়ার অধিকারে আক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। মা, অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারত রক্ষার অধিকার দাও।"

সে যুগে ইংরেজের গোরাসৈন্য আমদানীর বিপক্ষে তিনি যেমন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানতে দ্বিধা করেন নি। তেমনি সেই সঙ্গে সে যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুকূলে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশও করেছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর রচিত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক নাটকের মধ্যে বহুস্থানে স্বদেশভক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচিত প্রহসনগুলিতেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে, রাজনীতি ও সমাজনীতির কথা বিশেষভাবে বিধৃত হয়ে আছে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা-দেশটাকে দু'টুকরো করতে উদ্যত হলে। সারা দেশ সোচ্চার প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। শুরু হোল আন্দোলন। স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোল সারা দেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উদ্ধত কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী ও ধূর্ত বলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে জেগে উঠলো বাংলার যুব সমাজ। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সারা দেশ তখন তরঙ্গায়িত। গ্রামে, গঞ্জে, সহরে জাগ্রত জনগণের প্রকাশ্য সভায় দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে দেশবাসী যখন বদ্ধপরিকর, সেই উপযুক্ত সময়ে গিরিশচন্দ্র একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। ১৯০৫ সালে 'সিরাজদ্দৌলা' ১৯০৬ 'মীরকাশিম', ১৯০৭ সালে 'ছত্রপতি শিবাজী।' ইতিপূর্বে ইংরেজ রাজা শক্তি নাটকের অপরিসীম শক্তির পরিচয় পেয়েছিল দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। তাই ১৯০৫ সালে জাতীয় আন্দোলনের সময় গিরিশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক নাটকগুলির অভিনয় বা এক বিশেষ মুদ্রণ, আদেশ বলে ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভের পর, এক সময় গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের সংস্রব ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে সরাসরি মনোভিলাষ ব্যক্ত করে বলেন: তোমায় পেয়েছি, আর ও সব করা কেন? উত্তরে ঠাকুর জানান—না না, ও কাজ ভাল। ওতে লোক শিক্ষা হয়। জমি ভাল করে পাট করলে, তাতে যা রুইবি তাই ফলবে। গিরিশচন্দ্র সারাজীবন জমি পাট করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছিলেন। সে জমি দেশের জমি, দেশের মানুষের মনের জমি।

শতবর্ষের আলোয় কলকাতা ফুটবল

মানিক ঘোষাল

"নগেন্দ্রপ্রসাদের (সর্বাধিকারীর) জননী হেমলতা দেবী প্রতিদিন বাড়ীর গাড়ী করিয়া বাবুঘাটে গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। সংগে থাকিত বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ। একদিন সকালে গংগার ঘাটে যাইবার সময় ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার নিকটস্থ কয়েকজন বিশালকায় গোরাকে একটি গোলমত জিনিস লইয়া ছোটাছুটি করিতে দেখিয়া বালক উদগ্রীব হইয়া দেখিতে দেখিতে জননীকে গাড়ী থামাইতে বলে এবং গাড়ী হইতে নামাইয়া উহাদের নিকটস্থ হইয়া সাহেবদের খেলা দেখিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সেই গোলমত বস্তুটি গড়াইতে গড়াইতে নগেন্দ্রপ্রসাদের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে বালক তৎক্ষণাৎ তাহা হাতে করিয়া ধরে। বলটি হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় একজন সাহেব নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলে কিক্ ইট্ টু মি (..) নগেন্দ্রপ্রসাদ এতক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে যে, কি করিয়া সাহেবরা পদাঘাতে বলটি দূরে ঠেলিয়া দেয়, কাজেই আদেশ পাইয়া উৎসুক চিত্তে ঠিক অনুকরণ করিয়া দুম করিয়া এক পদাঘাতে উহা সাহেবদের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। ভারতে এই প্রথম দশ বৎসরের বালকের দ্বারা ফুটবল বাঙালীর পদস্পর্শ করিল।"

শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত কলকাতা ফুটবলের প্রথম প্রাণ পুরুষ এই নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীই ভারতীয় ফুটবলের জনক। একশো বছর আগে এই স্মরণীয় ঘটনার পরই বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ ও বিখ্যাত ধনী শীল পরিবারের সন্তান হরিদাস শীল ও অন্যান্য বন্ধুরা কুড়ি টাকা দিয়ে একটি বাতাবী বল নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করে হেয়ার স্কুল সংলগ্ন মাঠে। তখন কলেজ স্ক্রীটে শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে পড়ে একরকম অদ্ভুত খেলা তারা জীবনে প্রথম দেখে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জি এ স্টাক সেই ঘটনা দেখে মাঠে নেমে পড়েন। নগেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্যদের ডেকে বলেন যে, এটা বাতাবী বল। আর ফুটবল খেলায় সবাই একসংগে বলের পিছনে ছোটে না। পরদিন তিনি নিজেই দুটি ফুটবল এনে ছাত্রদের খেলা শিক্ষা দেন আর বলা বাহুল্য নগেন্দ্রপ্রসাদকে অধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করেন।

যৌবনে নগেন্দ্রপ্রসাদ রূপান্তরিত হয়েছিলেন কিংবদন্তির পুরুষে। আশ্চর্য তার ক্রীড়াকুশলতা, অসাধারণ তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা। কৈশোরে বয়েজ ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব, ফ্রেণ্ডস ক্লাব ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে প্রেসিডেন্সি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই ক্লাবগুলিকে একত্রিত করে শোভাবাজার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া হাওড়ায় হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, খিদিরপুর ভুকৈলাস রাজবাড়ীতে ন্যাশনাল ও চুঁচুড়ায় টাউন ক্লাব ও চিনসুরা স্পোর্টিং-এর প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসামান্য।

ভারতবর্ষে প্রথম কবে ফুটবল খেলা হয়। সিপাহি বিদ্রোহের কিছু আগে ১৮৫৪ সালে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসপ্লানেড ময়দানে ক্যালকাটা ক্লাব অফ সিভিলিয়ান্স ও জেন্টলম্যান অফ ব্যারাকপুর। আসলে খেলার চেয়ে সেখানে বড় ছিল সাহেব মেমদের খানা পিনা ও আমোদ ফুর্তির ব্যবস্থা।

তারপর কেটে গেল আরও চৌদ্দ বছর। ১৮৬৮ সালে ইটনের প্রাক্তন ছাত্ররা ইটোনিয়ান্স বনাম অবশিষ্ট দলের খেলার আয়োজনও করে। আই সি এস দের নিয়ে গড়া অবশিষ্ট দল তিন গোলে হার স্বীকার করে। স্বয়ং কলকাতার গভর্ণর জেনারেল রবার্ট ভ্যানসিটার্ট দুটি গোল দিয়েছিলেন সে খেলায়।

ভারতের মাটিতে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিক কার? ১৮৮৯ সালে শুরু হয় ট্রেডস কাপ। প্রথম ভারতীয় দল শোভাবাজার প্রথম রাউণ্ডে শক্তিশালী সেণ্ট জেভিয়াস কলেজের কাছে হেরে যায় তিন গোলে। ভারত থেকে সর্বপ্রথম যিনি ওলিম্পিকে যোগদান করে মেডেল পায়। সেই লর্মান প্রিচার্ড একাই তিনটি গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক করেন। সেই প্রথম হ্যাটট্রিক। বৃষ্টিভেজা মাঠে শোভাবাজার প্রথম গোল করেছিল। রেফারী তা নাকচ করেন। সেযুগে সাহেব রেফারীদের স্বজাতি প্রীতি একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। অতীতের নামী খেলোয়াড়রা যে কয়েক জন বেঁচে আছেন তাঁদের মুখে একথা বহুবার শুনেছি।

প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ কোনটি? ১৮৯৪ সালে শীল্ড বিজয়ী রয়াল আইরিশ রাইফেলস ও বাংলার নেটিভ দলের খেলাটি সম্ভবতঃ ডালহৌসী মাঠে খেলা হয়েছিল। নেটিভদল তিন গোলে জেতে। সে খেলায় টিকিট বিক্রি হয়েছিল ১৫০০ টাকা। তার একবছর আগে শীল্ডের আসর শুরু হয়। প্রথম

বারের পুনরানুষ্ঠিত ফাইনালে দশহাজার লোক মাঠে আসেন। ১৯১১ সালে ঐতিহাসিক শীল্ড ফাইনালে টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৬৯১৪ টাকা। সব মিলিয়ে মাঠে লোক হয়েছিল আশি হাজার।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় ইডেনে। ক্রাক অস্ট্রেলিয়ান টুয়েলভ বনাম প্রেসিডেন্সি ক্লাব টুয়েলভ। প্রেসিডেন্সি দলের অধিনায়ক হন নগেন্দ্রপ্রসাদ। খেলা ড্র হয়। মাঠে দর্শকাসনে হাজির ছিলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস, দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানর্জী ও আরো অনেকে। ১৮৯২ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদ পরিচালনায় মহারাজা, কোচবিহারের মহারাজা স্যার আলেকজাণ্ডার আপকার সবাই মিলে ইণ্ডিয়ান ফুটবল আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭—১৯০২ পর্যন্ত তিনি সে যুগের অদ্বিতীয় "সেন্টার ফরোয়ার্ড" সাতশর বেশী ম্যাচ খেলেছেন। পেশায় হাই কোর্টের এ্যাটর্নী তবু সেকসপীয়রের সমগ্র ইংরেজী রচনার বাংলা অনুবাদ করে করে যান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম দেন "ক্রীড়া সম্রাট"।

১৮৯৮ সালে আই এফ এ লীগ শুরু হয়। ষোল বছর ভারতীয়দের তাতে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনের প্রবর্তন সত্ত্বেও এই দয়া দেখানো হয় ১৯১৪ সালে মোহন বাগান ও এরিয়ানকে। মোহনবাগান পরের পরই প্রথম ডিভিশনে উঠলো। এরিয়ান ও একবছর পরে। ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিসনে খেলে। সেই ঘটনার জেরও অনেকদূর গড়ায়। আই এফ এ'র সম্পাদক মেডলিকট সাহেব নীলরক্তের ঠাট বজায় রাখতে পদত্যাগ করেন। দুটির বেশ তিনটি দলকে ওরা প্রথম ডিভিসনে খেলতে দিতে রাজী নয়। ভারতীয় ফুটবলের প্রথম শহীদ কুমারটুলি। মোহনবাগান, এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গল কেউ লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিসনে আসেনি।

কুমারটুলি ১৯১৭ ১৮ দু'বছর লীগ রানার্স। ১৯১৯ সালে লীগ জয়ী। পরের বার শীল্ড ফাইন্যালিষ্ট। তা সত্ত্বেও জোর করে কুমারটুলীকে বাধ্য করা হয়েছে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে। ইস্টবেঙ্গল খেলতে আসার পর থেকে সেই বাধা অপসারিত হয়। তবে প্রথম ভারতীয় হিসাবে লীগ জয় করে মহামেডান। ১৯৩৪ সাল আবির্ভাব লগ্নটিকেই তাঁরা স্মরণীয় করে রাখেন।

সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে সব বাধা নিষেধ। খালিপায়ের যুগ পেরিয়ে প্রচলন হয়েছে বুটের—সেও অনেকবছর আগে। কলকাতা মাঠে সমারোহে উদযাপিতত হলো শতবার্ষিকী উৎসব। গত ১০ ফেব্রুয়ারী উজবেকিস্থানের পাখতাকোর ও মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার লগ্নেই উদবোধন হলো নৈশ ফুটবলের যুগ। কলকাতার ফ্লাড লাইট ফুটবল শুরু হলেও সাবেকী আমলের ঘুণ ধরা কাঠের প্যালারী এখনও লজ্জা দেয়। সাহেবেরা করে যায়নি বলেই কি স্বাধীনতার ত্রিশবছর পরেও কলকাতায় একটি ফুটবল ষ্টেডিয়াম হয়ে উঠেনি?

আমরা পিছিয়েই রই

সন্তোষ শীল

ইলা পাল কর্নেলিয়া এনডার হতে পারে না। পূর্ব জার্মানীর এই মেয়েটি জলে তুফান তুলেছে। মুঠোয় মুঠোয় ওলিম্পিক পদক কর্নেলিয়া কেড়ে নিয়েছে। সার্থক তার জনম। তার জন্য পূর্ব জার্মানীতো বটেই সারা বিশ্ব গর্ব করতে পারে। কেননা একই আকাশের নীচের আমরা রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

পূর্ব জার্মানীর লোকসংখ্যা দু'কোটির কাছাকাছি। সত্তর কোটি লোক ভারতবর্ষের। পশ্চিম বাংলারই চার কোটি। এই বাংলারই মেয়ে সাঁতারু ইলাপাল। ছেলেবেলা থেকেই ইলার সাঁতার ধ্যান জ্ঞান। জলকন্যা শেষ পর্যন্ত জলপরী হয়ে উঠতে পারেনি। সে দোষ আমাদেরই। একবেলা পেট পুরে খেতে না পাওয়া এই মেয়েটি জাতীয় সাঁতারে অন্ধ্র রাজ্যের নামী-দামী সাঁতারুদের টেক্কা দিয়েছে। বাংলাকে এনে দিয়েছে বেশ কিছু খেতাব। কতই বা বয়স তাঁর। টিন এজারের এই কিশোরীটিকে ক্ষুধার হাঙ্গর হিংস্র দাঁত বসিয়েছে। কে হেরে যায়। ইলা না আমরা।

মাস কয়েক আগে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু রোলাণ্ড ম্যাথুস দমদম বিমানবন্দর ছুঁয়ে যায়। পূর্ব জার্মানীর এই সাঁতারু জানতে চেয়েছিলেন এই নদীমাতৃক দেশে সাঁতারু তৈরী করা হয় না কেন? নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে তাঁকে পালটা প্রশ্ন করেছিলাম: তোমাদের দেশে কেমন করে গড়ে-পিটে নাও সে কথা বলো।

ম্যাথুস জানিয়েছিলেন, সেখানে পাঁচ ছয় বৎসর বয়স থেকেই জলে নামা শিশুদের বাধ্যতামূলক, কড়া পাহারা, সজাগ দৃষ্টি আর কর্ম কুশলতায় হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে তালিম দেওয়া রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য। তবে সেই সংগে ম্যাথুস আরও জানিয়েছেন—নদীতে বা পুকুরে সাঁতার শেখা একরকম আর সুইসিং পুলে শিক্ষা নেওয়া অন্যরকম। শেষেরটাই শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। এরকম ভাবেই ওরা ছুটছেন ট্রাকে। ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে, দাপাদাপি করেন ফুটবল মাঠে।

আর আমরা। এই ভারতবর্ষে সক্ষম সবল যুবকদের খাওয়ার সংস্থান নেই। তারা খেলাধুলা শেখার সুযোগ পান কতটুকু। খেলার মাঠ নেই। স্কুল কলেজে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক এখনও করা হয়নি। কম বয়স থেকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টাই বা কোথায়! অবহেলিত জাতীয় খেলা কবাডি,

ভলিবল, খো খো, হাডুডু এখনও অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। অথচ কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হয় নানাভাবে। কতজন সাঁতারু, ক'জন কবাডি খেলোয়াড়, ক'জন অ্যাথলেট বিদেশে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। অথচ হকিন নামে শ্বেতহস্তী পোষার খরচ বহন করা হয়, ফুটবল সফরের নামে অমূল্য বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় চলে, ক্রিকেটের বিলাসিতা বিদ্রূপ বাড়ায়, টেবিস টেনিস ঘিরে আলোর রোশনাই বাড়ে।

আর তাই নিজের চেষ্টায় দুএকজন মনোরঞ্জন পোড়েল, সুব্রত দেবনাথ, শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, শেখ অঞ্জিস—ইনসান, ইলাপাল ও বুলা নাথ বড় হবার প্রেরণায় সারা জীবন ছুটে চলে; আর আমাদের বিবেক ও দায়িত্ব নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্‌সে ভারতের মান খুবই নীচে

অ্যাথলেটিক্‌সে ভারতের অবস্থা মর্মান্তিক। মন্ট্রীল ওলিম্পিকের ফলাফল থেকে ডুসেলডর্ফে বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসে কিছু ভালো হবার আশা ছিল। কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি।

দুটো জায়গাতেই ভারতের বড় ভরসা ছিল শ্রীরাম সিং ওলিম্পিকে শ্রীরামকে দু'বার 'হিটে' নামতে হয়। ফাইনালে শেষপর্যন্ত ১ মিঃ ৪৫'৭৭ সেকেণ্ড সময়ে সপ্তম স্থান পেয়েছিলেন। আশা করা গিয়েছিল ডুসেলডর্ফে শ্রীরাম ৮০০ মিটার একটু অন্যভাবে নেবেন। কিন্তু কৌশল নেওয়ায় আবার ভুল হয়। এবার আর হিট ছিল না। তাই ফলাফল সংশোধনের সুযোগ শ্রীরামের আসেনি।

শ্রীরাম আটজনের মধ্যে অষ্টম হলেন। আগের সময়ের থেকে এবারে তার সময় লেগেছে বেশী। ১ মিঃ ৪৭'৩ সেকেণ্ড সময় লাগে। কিউবার আলবার্টো জুয়ানটোরেনার তুলনায় শ্রীরাম ১'৫৩ সেকেণ্ড বেশী সময় নিয়েছেন। মন্ট্রীলে শ্রীরাম মিউনিখের রেকর্ড ভাঙলেও আর কিছু করতে পারেননি। পরবর্তী পর্যায়েও তেমন উন্নতির আভাস শ্রীরামের দৌড়ের মধ্যে ছিল না।

ওলিম্পিকের জুয়ানের পিছনে ছিলেন বেলজিয়মের ইভো ভ্যানডাম ও যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড উলহুটার। ভ্যানডামির সময় ছিল ১ মিঃ ৪৩·৮৬ সেকেণ্ড এবং রিচার্ডের ছিল ১ মিঃ ৪২'১২ সেকেণ্ড। অথচ বিশ্ব কাপে রূপো আর ব্রোঞ্জ পেলেন অন্য দু'জন। একজন কেনিয়ার মাইক বয়েট। অপরজন হলেন উইলি উয়েলবেক। জুয়ান নিজে বলেছেন যে, বয়েট মস্কোতে আলোড়ন তুলবেন। তবে উইলির সময় রিচার্ডের সময়ের থেকে অনেক বেশী। বয়েট (১ মিঃ ৪৪'১

জয়ন্ত মুখার্জী

সেকেণ্ড) ও উইলি (১ মিঃ ৪৫'৫ সেকেণ্ড) ভ্যানডামি এবং রিচার্ড পদকচ্যুত করেছেন। মন্ট্রীলে জুয়ানের থেকে শ্রীরাম ২'২৭ সেকেণ্ড পিছনে ছিল, ডুসেলডর্ফে শ্রীরাম জুয়ানের থেকে ৩'২৭ সেকেণ্ড পরে দৌড় শেষ করেছে। তাহলে এটা বোঝা গেল ভারতীয় অ্যাথলেট শ্রীরামের প্রগতি অন্যান্যদের তুলনায় এত কম যে পদক প্রাপকদের থেকে শ্রীরামের সময়ের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে।

এবার লোহার বল ছোড়ার বিষয়ে আসা যাক। ভারতীয় অ্যাথলেট বাহাদুর সিং র দূরত্ব হয় ১৭'৪৯ মিটার। ভারতীয় প্রতিযোগী দূরত্বের দিক থেকে সপ্তম স্থানে আসেন। অথচ মন্ট্রীলের স্বর্ণ পদক বিজয়ী উদো বায়ার মনট্রীলের ২১'০৫ মিটারের জায়গায় ২১'৭৪ মিটার দূরত্ব পার করেন। কিন্তু সোভিয়েতের যে দুজন রূপো ও ব্রোঞ্জ পেলেন তাঁরা কিছু পাননি। ফিন-ল্যাণ্ডের রেইজো স্টালবার্গ (২০'৪৬ মিটার) ও পশ্চিম জার্মানীর রালফ রিচেনবাক (১৯'৯৭ মিটার) যথাক্রমে রূপো ও ব্রোঞ্জ দখল করেন।

বিশ্ব কাপে ম্যারাথন দৌড় ছিল না। কারণ ওকে কেন্দ্র করে গ্রীস ওলিম্পিক গড়ে ছিল। মন্ট্রীলে ভারতের শিবনাথ সিং একাদশ স্থান পেয়েছেন। একাদশের উপরে আগে কোন দিন কোন ভারতীয়ের নাম ছিল না। ভারতের অনুসুয়া বাঈ ৪×১০০ মিটার রীলেতে এশীয় দলে আসতে পারেন নি। ট্রায়ালে ১২'৫৬ সেকেণ্ড সময় নিয়ে পঞ্চম স্থান পেয়ে বাদ গেছেন।

ডিসকাস নিক্ষেপে মনট্রীলে রৌপ্য জয়ী পূর্ব জার্মানীর উলফগ্যাং স্মিড বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন। আর ভারতের পরভীন কুমার ৬ষ্ঠ স্থানে জায়গা পেলেন। উলফগ্যাং আগের ৬৬'২২ মিটার থেকে ৬৭'১৪ মিটারে তার দূরত্বকে টেনে তোলেন। ওলিম্পিকের প্রথম স্থান অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক উইলকিন্স আগের

৬৭·৫০ মিটার দূরত্বের জায়গায় ৬৬·৬৪ মিটারে এসে যান। ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেয়ে ম্যাকের সতীর্থ জন পাওয়েল বিশ্ব কাপে খালি হাতে বিদায় নেন। উপরের দিকে যখন এরকম উঠা নামা ভারত তখন ব্যবধান এক সুতো বাড়াতে পারছে না।

৪০০ মিটার দৌড়ে ছ'জনের মধ্যে ভারতীয় অ্যাথলেট উদয়কৃষ্ণ প্রাভু ষষ্ঠ স্থান দখল করেন। কিউবার জুয়ান টোরেনীর এটাও কেভারিট ইভেন্ট। জুয়ান মনট্রীলে ৪৪·২৬ সেকেণ্ড সময় নিয়েছিলেন। ডুসেলডর্ফে নেন ৪৫·৩৬ সেকেণ্ড। আর উদয় নিয়েছেন ৪৭·৭৫ সেকেণ্ড সময়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেড নিউহাউস (৪৪·৪০ সেকেণ্ড) ও হেরম্যান ফ্রোজয়ার (৪৪·৯৫ সেকেণ্ড) যথাক্রমে রূপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন মনট্রীলে। তাঁরা এবারে কোন স্থান পান নি। পূর্ব জার্মানীর ভলকার বেক (৪৫·৫০ সেকেণ্ড) রূপো ও যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট টেলর (৪৫·৫৭ সেকেণ্ড) ব্রোঞ্জ দখলে নেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ তার অ্যাথলেট দের সম্পর্কে যে ধারায় চিন্তা করেন, ভারতে সেই চিন্তার কোন আভাস পাওয়া যায় না। এমন কি শোচনীয় ব্যর্থতার পরেও ভারতীয় অ্যাথলেটগণ নিজেরা তেমন চিন্তা করেন বলে মনে হয় না। কারণ না দেখিয়ে এরকম দোয়ারোপে অনেকে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাই একটু বিশ্লেষণে আসা যাক।

মনট্রীলে দুটি বিষয়ে সোনা পাওয়ার পর জুয়ান টোরেনা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাক ও ফিল্ডে আবার দুটি সোনা জেতেন। কয়েক মাসের পর বিশ্বকাপে দুটো সোনা হাতে রাখলে ও জুয়ান মস্কো নিয়ে চিন্তিত। মস্কোয় ১৫০০ মিটারের সময় আরও কমবে—এই কথা চিন্তা করে জুয়ান একটা ইভেন্টে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চান। মিউনিখে রবার্ট টেলর ১০০ মিটারে রূপো পেলেও মনট্রীলে কিছু পান নি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যাপারটা বুঝেসুঝে টেলর ডুসেলডর্ফে ৪০০ মিটার দৌড়ে নামলেন। প্রতিযোগী মাত্রেরই পদক পাবার জন্য সচেষ্ট থাকা দরকার। প্রয়োজনে চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত নিয়ে ইভেন্ট বদলানো কোন অপরাধ নয়। বয়স, দৈহিক শক্তি ও নমনীয়তা প্রভৃতিকে পর্যালোচনার পর প্রথম শ্রেণীর অ্যাথলেটগণ একটার পর একটা ইভেন্টের কথা চিন্তা করে নিজেকে যথাযথ স্থানে রাখতে সক্ষম হন।

ভারতীয় প্রাশক্ষণে প্রাশক্ষক ও শিক্ষার্থীর সজাগ ভাব ততটা নয়। যে প্রতিযোগী বাহাত্তর সালে কোন পদক পায় নি ছিয়াত্তরে সে সহজেই তা পেয়েছে। তবে চার বছরের ফাঁকটুকুকে কাজে লাগাতে সে কসুর করে নি। কিন্তু ভারত ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার ময়দানে যেভাবে অ্যাথলেটিকস চলে তা দেখলে লজ্জা হয়। কাছাকাছি রবীন্দ্র সরোবরে সিণ্থার ট্রাককে কাজে না লাগিয়ে যে কোন এবড়ো খেবড়ো মাঠে বাঁশী বাজিয়ে শুরু আর ফিতে ধরে শেষ করেই দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আদৌ যায় না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আজ ব্যাপকভাবে অ্যাথলেটিকসে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের মতন কর্মসূচী না নিলে কিছু হবে না। তাই সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। অ্যাথলেটিকস, জিমন্যাস্টিক ও সাঁতারের দিকে আগে নজর দিতে হবে। সব খেলায় একই সঙ্গে সম্রাট হবার মতন অর্থের পরিমাণ যখন নেই তখন আন্তর্জাতিক সুনাম পাওয়া যায় আবার খরচও কম হবে—সেই সব বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। আবার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও মর্যাদা দেব না ভাবলে দশ জনের মধ্যে দশম ছাড়া প্রথম হওয়া কল্পনায় সম্ভব। ওলিম্পিক বা বিশ্ব, বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল, সিনিয়র বা জুনিয়র কোন স্তরেই পতাকাকে উপরে তোলা সহজে সম্ভব নয়। বিনা অনুভূতিতে কাউকে ঠেলে তোলা যায় না। ভারতের জাতীয় রেকর্ড ভাঙলো কি ভাঙলো না—তা নিয়ে অন্যান্যরা চিন্তিত নয়। চিন্তিত হবে তখনই, যখন জাতীয় রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ড একই সঙ্গে ভেঙে যাবে।

বিশ্বকাপে ভারতের কোন আনন্দের খবর নেই। তবে এশিয়ার দেশ হিসাবে একটা সান্ত্বনা আছে। তাহ'ল—ডুসেলডর্ফে মহিলাদের ১০০ মিটার হার্ডলে ইজরায়েলের এসথার রট (১৩·২৬ সেকেণ্ড) চতুর্থ স্থান পান। তাছাড়া দলগতভাবে এশিয়া পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই অষ্টম ও শেষ স্থান পেয়েছে।

রাবণের চিতা

অনির্বাণ রায়চৌধুরী

অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল রতিকান্ত।

সন্ধ্যে নেমেছে। উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে। শীত করছে একটু একটু। তবু বসে আছে ঠায়। মাথাটা ভার ভার, তুলতে কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভেতর কোথায় যেন যন্ত্রণা একটা চিনচিনিয়ে উঠছে। রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে মুঠো করে ধরলো। মুখ দিয়ে দাঁতে সুপারি কাটার মত একটা শব্দ বেরিয়ে গেল, শালা হারামির বাচ্চা কোথাকার!

সারি সারি তাঁবু খাটানো ছিল এতদিন। একে একে সবাই উঠে গেছে। চলে গেছে যে যার ভিটের দিকে। শুধু রতিকান্ত এখনো উঠে যেতে পারে নি। সামর্থ্য নেই। ধরতে কাউকে আর বাকী রাখে নি। শেষ পর্যন্ত আজকে বিকেলে অঞ্চল অফিসে গিয়ে যখন শুনলো ওপর অফিস থেকে আসা তালিকায় তার নাম নেই, সেই তখন থেকেই তার বুকের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে।

এ বছরে বর্ষার মুখে নদীর বন্যায় এপারের ভুরুঙ্গামারী, শীতলদি, থানাচক, একেবারে ভেসে গিয়েছিল। কতো লোক নিরাশ্রয় হয়েছে। ফসল নষ্ট হয়েছে। গরু-বাছুর জলে ডুবে মরেছে, তার হিসেব নেই।

নদীর পাড়ের উঁচু বাঁধ ভেঙে গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকে ছিল। সমস্ত মাটির ঘর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই জলের ধাক্কায়। স্রোতের টানে ভেসে গেছে খড়ের চাল। নদীর ঘোলা জলের স্রোত গাঁয়ের মানুষের জীবন যাপনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আশ্রয় বলতে এই উঁচু রাস্তাটা। গত ক বছর ধরে রাস্তাটা এমনি পড়ে আছে। সবে বাঁধে মাটি পড়ছিল। ইট খোয়াও এসেছিল। কিন্তু রাস্তাটা হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে।

এ গাঁয়ের মানুষদের অনেকদিনের দাবি, একটা বড় রাস্তা হোক। সেই পুরনো আমলের ইউনিয়ন বোর্ড থেকে এখনকার অঞ্চল অফিসে পর্যন্ত গাঁয়ের মানুষের অনেকবার ধরনা দিয়েছে। কিন্তু ফল কিছুই পায়নি। একবার অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারীবাবু রতিকান্তকে বলেছিল, তোরা সব বছর বছর কম্যুনিষ্টদের ভোট দিবি, আর কংগ্রেস রাস্তার বায়না করিস?

এই বন্যায় সেই পড়ে থাকা উঁচু বাঁধটায় এখন রতিকান্তর মত অনেক মানুষের আশ্রয়।

গত দু'তিন বছর জমির ধান জমিতেই মিশিয়ে যাচ্ছে। তুলে আনা যায় নি। দু'এক বিঘে জমি যাদের আছে, তাদের অবস্থা একেবারে সঙ্কটজনক।

রতিকান্তর তাও নেই। জমি বলতে ভিটেটুকুই যা আছে। পৈতৃক-সূত্রে কিছু জমি তারও ছিল, রাখতে পারেনি। গেছে দেনার দায়ে। বছর বছর ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী ঋণের জন্যে অঞ্চল অফিসে দরখাস্ত করেছিল রতিকান্ত। কিন্তু সে টাকা হাতে আসেনি। তার দরখাস্ত নাকি মনোনীত হয়নি। দু'তিন বার এমনি হবার পর একদিন রতিকান্ত অঞ্চল অফিসে গিয়ে ধরনা দিয়েছিল। সেক্রেটারীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল:

বাবু, আমার টাকাটা কবে আসছে?

ওটা আর করা গেল না হে।

কেন বাবু?

সে সব তুমি বুঝবে না। আর একবার বরং দরখাস্ত দিয়ে যেও; দেখবো কি করা যায়।

আমি যে একেবারে মরে যাবো বাবু।

তা কি করি বলো? টাকা দেবার মালিক তো আমরা নয়। লিখে পাঠালে কারো যদি উপকার হয়, তাই করি।

তবে যে বাবু শুনেছিলুম, আমার নামে টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

কে বললো?

গ্রামসেবকবাবু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ভুলটা করেছে, তোমার দরখাস্তর ওপরও 'নোট' দিতে ভুল করেছিল।

গ্রামসেবকবাবুকে তবে আবার বলবো বাবু?

না না, তার দরকার নেই। আমি বলে দেবো'খন তাকে।

আচ্ছা। ফিরে এসেছিল রতিকান্ত।

আবার দরখাস্ত করেছিল। এবার শুনলো, টাকা পেয়েছে বিন্দু সাহা আর জগাই নস্কর। অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারীবাবুর সঙ্গে বিন্দু সাহা জগাই নস্করের মেলা-মেশা, মাখা মাখি সবাই জানে।

এদিকে যে জন্যে দরখাস্ত করা, তার প্রয়োজন থাকলো না। দু'শ টাকায় তার জমিটুকু বাঁধা পড়েছিল বিন্দু সাহার কাছে। তিন বছরের মেয়াদে হাত কওলা করা ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা দিতে না পারলে জমি বিন্দু সাহার হয়ে যাবে।

রতিকান্ত বিন্দু সাহার কাছে গিয়ে তাকে অনেক মিনতি করেছিল। বলেছিল, দাদা আর মাস পাঁচেক সময় দাও, তোমার টাকা যেমন করে হোক মিটিয়ে দেব।

রতিকান্তর মিনতি শুনে গম্ভীর-ভাবে মাথা দোলালো বিন্দু সাহা।

বললো, তা-তো আর হয় না। এমনিতেই মাস তিনেক সময় তোমাকে আগেই ছেড়ে দিই নি?

তা দিয়েছ। রতিকান্ত প্রায় ককিয়ে উঠলো, কিন্তু জমিটুকু গেলে আর কি করে খাবো দাদা?

কেন, পাতির কাজ তেমন চলছে না?

কই আর? এখন তো লোকে মাদুর কেনে। ঝাঁতলা দেখে বলে, এর দাম এই। তাহলে তো মাদুর কেনা ভালো।

আর ঝোড়া-চুপড়ি?

ওটা টুক-টাক চলছে। ওই তেল নুনের খরচটা আসে। কিন্তু ও দিয়েতো পেট চলে না দাদা। ধানী জমিটাই সম্বল। তাই বলছি, আরো যদি কটা মাস—,

না না, সে কেমন করে হয় হে? বিন্দু সাহা গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললো, তবে তুমি যখন এতো করে বলছো তো আরো না হয় গোটা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যাও। পাতি কিনে ঝাঁতলার কাজটাই ভালো করে করো, দু-পয়সা আসবে।

কিন্তু বেচার ব্যাপারটা—

ওটা বরং এক কাজ করো। পনের দিন ছাড়া এক কুড়ি করে ঝাঁতলা আমাকে দিয়ে যেও, আর টাকা নিয়ে যেও তোমার সংসার খরচের মত। মানে, ব্যবসাটা আমার, তুমি যেন কর্মচারী—কাজ করছো, খোরপোষ পাচ্ছো।

শুনে গাটা ঘুলিয়ে উঠেছিল রতিকান্তর। কিন্তু সামলে নিয়ে বলেছিল, তাতে আমার কি লাভ দাদা?

বারে, এখন তোমার টাকার অভাব। সংসার চলে না। তখন তেমনটা আর থাকবে না।

বিন্দু সাহা কৌট থেকে বিড়ি বার করে দু তিনবার ফুঁ দিয়ে বিড়ির নীচের দিককার সুতোয় জোর একটা পাক দিলো। পরে ফস করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরালো। একটা জোর টান দিয়ে খক খক করে কেসে উঠলো। একটু সামলে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কৌটটা রতিকান্তর দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, নেবে নাকি হে, নাও না।

রতিকান্ত থতমত খেয়ে বিন্দু সাহার দিকে চাইলো। আস্তে বললো, না থাক।

তবে, ওই কথাই রইলো। টাকাটা বিকেলে এসে নিয়ে যেও। বিন্দু সাহা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

রতিকান্তও উঠে পড়লো। তখন তার বুকের ভেতরটায় জ্বলছে। বিন্দু সাহার গলার নলীটা তার শক্ত সমর্থ দু'টো হাত দিয়ে দলে পিষে ফেলার অদৃশ্য ইচ্ছেটাকে চাপতে চাপতে প্রায় উন্মাদের মত সেখান থেকে চলে এসে ছিল রতিকান্ত।

রাত বাড়ছে। চারদিকটা নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। শীতের হাওয়া গায়ে বিঁধছে। আশপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। রতিকান্তর চোখের সামনে কালো ছায়া দুলছে। সুনু পাশে দাঁড়ালো। ওগো খোকার জ্বরটা বাড়ছে। ছটফট করছে খোকা। সুনুর স্বরে অজ্ঞর আভাস। রতিকান্ত তার দিকে মুখ তুলে চাইলো। তার মুখটা ভালো করে দেখতে না পেলেও বুঝলো, সুনু এতক্ষণ কাঁদছিল। এইবার রতিকান্ত নিজেকে বড় অসহায় মনে করলো।

কি করবো আমি!

একটু ওষুধ—,

শুধু হাতে গেলে তো ডাক্তার দেবে না সুনু।

তবে?

ভগবানের ওপর ছেড়ে দে। তার জিনিস, রাখলে থাকবে, না—

না না। সুনু ছুটে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। রতিকান্ত জানে, সুনুর বুকের মধ্যে কথাটা বেজেছে। কিন্তু এছাড়া কি-ই বা আর বলতে পারে সে, কি সান্ত্বনা দেওয়া যায়। এই একটি মাত্রই ছেলে তাদের। এর আগের মেয়েটি আঁতুর ঘরের পাট চুকতে না চুকতেই মরে গেছে।

রাত বাড়ছে। খোকার জ্বরও বাড়ছে।

রতিকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে তাঁবুর দিকে ফিরলো।

তার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইলো সুনু। খোকার মাথার কাছে বসে সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। কিন্তু কোন শব্দ হচ্ছিল না। রতিকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুনুর চোখের জল দেখলো। খোকার জ্বর তপ্ত শীর্ণ শরীর দেখলো। লণ্ঠনের আলোয় তার রোগ পাণ্ডুর মুখটা দেখলো।

রতিকান্তর পা দু'টো যেন কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রতিকান্ত আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো। মাথার ওপরে কালো আকাশ। চোখের সামনে কালো অন্ধকার। পেছনে তখনও সুনুর ফুঁপিয়ে কান্নার মৃদু শব্দ কানে আসছে। রতিকান্তর সমস্ত চেতনা শক্তি যেন লোপ পাচ্ছে। ভাবতে পারছে না এখন কি করা উচিত। তবে একটি পথ আছে। সে বিন্দু সাহার কাছে যেতে পারে। আর—'

নাঃ। আর ভাবা যায় না। রতিকান্ত তার শেষ সম্বলটুকুও এখন হারাতে বসেছে।

জল নেমে যাবার পর একে একে সকলকেই নিজেদের ভিটেতে ফিরে গেছে, বাঁশ কঞ্চির ছিটে বেড়া দিয়ে খোড়ো চাল কিংবা ছইয়ের চালা তুলে ছেলেপুলে নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে।

ভিটেতে ফিরে গিয়ে ইঁটের পিলার

দিয়ে ঘর তুলেছে বিন্দু সাহা। আর গাঁয়ের এই অবস্থায় তার মহাজনী ব্যবসাটা বেশ ফাঁপিয়ে তুলেছে। বন্যা পীড়িত মানুষদের জন্য যে সরকারী রিলিফ এসেছিল, অঞ্চল অফিসের বাবু বিন্দু সাহা এবং আরো জনা কয়েককে নিয়ে সেই রিলিফ বণ্টন করে দিয়েছিল।

রতিকান্ত জানে, ওই সেক্রেটরী বাবুর সহায়তাতেই সে সময় বিন্দু সাহা অনেক কিছুই আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু কোনো কথা বলতে সাহস করেনি। বরং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অনেক বেগার খেটে দিতে হয়েছে রতিকান্তকে।

ইতিপূর্বেই নিজের ভিটেটুকু পর্যন্ত বাঁধা পড়েছিল বিন্দু সাহার কাছে। কথায় কাথায় বিন্দু সাহা বলেছিল তার 'চে' এক কাজ করো না—

কি দাদা ?

রতিকান্ত জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে ছিল বিন্দু সাহার দিকে। বিন্দু সাহা থেকে থেকে বলেছিল—বলছি কি—বাঁধা রাখার চে' একেবারে বিক্রিই করে ফেল না কেন ? তাতে দুটো পয়সা বেশীই পাবে। আর একবার বন্ধক দিলে তো আর ছাড়াতে পারবে না—শেষে এমনি এমনিই যাবে। বিক্রি করবো বাপ ঠাকুরদার ভিটে ?

হ্যাঁ তাতে কি—দরকার পড়লে অমন কত কি-ই না চলে যায়।

তবু—না দাদা। পারবো না—

তবে আর কি করা যায়। ভালো যুক্তিই দিয়েছিলুম ভাই। নিলে না। বাঁধাই রেখেছিল রতিকান্ত। বিক্রি করেনি বাপ ঠাকুরদার ভিটে।

কিন্তু আজ আর বুঝি রাখা যায় না। এবার—

রতিকান্ত প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বিন্দু সাহার বাড়ীর সামনে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে হাঁক পাড়লো, বিন্দু দা—,

কে রে—এত রাতে ?

আমি রতিকান্ত।

অ।

বিন্দু সাহা একটা লণ্ঠন হাতে বাইরে এলো। মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললো—তা কি ব্যাপার, এই এত রাতে— ?

বিন্দু দা—সেই না তুমি বলেছিলে, আমার ভিটেটা বিক্রি করবো কি না—তা মনস্থির করেছি ; তোমাকে ওটা বেচেই দেবো। নেবে ?

তা নিতে পারি। তবে কিনা—

কি ?

এখন হাতটা বড় টান চলছে হে।

তবু কত দিতে পারবে ?

সে যা হয় হবে। কাল সকালে দেখা যাবে।

না দাদা—আমার এক্ষুণি টাকা চাই।

তবেই তো ? তা কতো টাকা ? শ'খানেক ?

শ'খানেক ! তা দাও।

আরে, তোমার সব পাওনা গণ্ডা নিয়ে বন্দক জমির হিসাব করে এর চে' বোধ হয় আর খুব বেশী হলে দু'দশ টাকা পাবে।

দাদা, আমার ছেলেটার অসুখ।

আহা—তাই টাকা চাই ? তা বেশ টাকা এখন দিচ্ছি। জানই তো ভাই, অন্য কারো কাছে—ওই যে ও পাড়ার ভূপতি মণ্ডল—ও হলে তো তোমাকে বলতো আগে বন্দক জমি ছাড়াও, তবে বিক্রির কথা। তা না পারলে বলতো, টাকা ধার নাও—জমি ছাড়াও তারপর জমি বিক্রি করে সুদ সমেত ধার শোধ করো। তার মানে বুঝতেই পারছো, টাকা আর হাতে করে ঘরে ফিরতে হ'ত না। তুমি বন্যের সময় আমার খুব উবগার করছো, তাই তোমাকে এসব থেকে রেহাই দিলুম ভাই—তা যাই—

বিন্দু সাহা লণ্ঠনটা বসিয়ে রেখে টাকা আনতে ভেতরে চলে গেল।

মনে পড়লো রতিকান্তর সেই বন্যের দিনের কথা। জল যখন বাঁধ ভেঙে গাঁ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে সময় বিন্দু সাহার বউ-ছেলে-মেয়ে একটা উঁচু ঢিপিতে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে কলাগাছের ভেলায় করে যখন ঐ উঁচু রাস্তাটার দিকে আনা হচ্ছিল, তখন ছোট ছেলেটা জলে পড়ে যায়।

সকলেই হা হা করে উঠেছিল। দূর থেকে রতিকান্ত দেখতে পেয়েছিল। জলে তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটাকে জল থেকে বাঁচিয়েছিল। আর তাই তার সুদের টাকা ছেড়ে দিয়ে বিন্দু সাহা তাকে প্রতিদান দিচ্ছে।

বিন্দু সাহা টাকা নিয়ে এল। গুণে দিল রতিকান্তের হাতে। তারপর হঠাৎই বললো—কিন্তু ভাই—কালই শহরে গিয়ে জমিটা রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে কিন্তু।

এখন এখানে একটি টিপ দে দাও দেখি।

একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরলো বিন্দু সাহা। সঙ্গে একটা কাজললতা এনেছিল। সেটা থেকে কালি নিয়ে রতিকান্তের হাতে দিতে টিপ বসিয়ে দিল সে। তারপর টাকা কটা নিয়ে প্রায় টলতে টলতে বিন্দু সাহার সামনে থেকে চলে এল রতিকান্ত।

তার মাথা ঘুরছিল। পা টলছিল। এক ঝলক রক্ত তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর অন্য দিকে মন নেই রতিকান্তর। টাকা কটা হাতের মুঠোয় পুরে গাঁয়ের ডাক্তার পুষ্প চককোত্তির বাড়ী গেল। তাকে ঘুম থেকে তুলে খোকার জ্বরের কথা বলতেই ডাক্তার প্রায় হুঙ্কার ছাড়লেন, এতক্ষণ কি ঘুমিয়ে ছিলে ?

না—মানে, টাকা, টাকা—

টাকা এনেছ ? দু টাকা লাগবে। আর কাল সকালে রুগী দেখতে যাবো, আরো তিন,—এই মোট পাঁচ টাকা এনেছো ?

অ্যাঁ হ্যাঁ। মাথা নাড়লো রতিকান্ত।

তারপর ওষুধ নিয়ে তাঁবুতে ফিরতে রাত আরো গভীর হয়ে গেল।

চারদিক অন্ধকার। আকাশে অনেকগুলো তারা ফুটেছে। রতিকান্ত প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরলো।

সুনু—সুনু খোকার জন্যে ওষুধ এনেছি।

রতিকান্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সুনু চুপ করে বসে আছে। চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। কুপির আলো নিবু নিবু। সেই মৃদু আলোয় রতিকান্ত দেখলো, সুনুর একটা হাত নেমে এসেছে খোকার

[২৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

যুদ্ধফেরত

সঞ্জয় সিকদার

গাছের কাণ্ডটা সরাসরি সোজা উঠে প্রথম যেখানে ডাল মেলেছে সেখানে গুলতির ফাঁদের মতো জায়গাটিতে দুটো পা ঝুলিয়ে ঠেসান দিয়ে বসেছিল সে অর্থাৎ ভেলভেলুয়া। তাঁর ঘাড়টা বাঁদিকে ঝুলছিল, চোখ বোজা, কান দুটো সজাগ। এমন করেই সে দুপুর পড়বার আগে থেকেই বসেছিল। প্রথম শীতে রোদে তাত নেহাৎ কম নয়, বাতাস ছুটে যাচ্ছে উত্তরে শিশু জঙ্গলের বুক চিরে, সুঁই সুঁই শব্দের রেশ টেনে। জনমানবহীন এই প্রান্তরের ঠিক মাঝ মধ্যিখানে এই একপায়ে দাঁড়ান গাছ, গাছের মাথায় একবুক উত্তেজনা আর একপেট খিদে নিয়ে বসে ভেলভেলুয়া। একটা বড় সাইজের কাঠ পিঁপড়ে পাতা থেকে ডাল, ডাল থেকে ভেলভেলুয়ার পিঠ ঘাড় বেয়ে কানের লতিতে কুট্টুস করে এক কামড় দিতেই চমকে ওঠাতে তাঁর মুখ থেকে এক ফোঁটা লালা ধুপ করে ঝরে ধুলোর মধ্যে মিশে যায়।

কানের লতিটা খুস খুস চুলকোতে চুলকোতে তার লাল চোখদুটো চারপাশে খুঁজে ফিরতে লাগলো মানুষের হুল্লা, কানদুটো সজাগ করে অনুভব করতে চাইলো মানুষ আর যুথবদ্ধ মহিষের পাল আর কত দূরে। ঘাড়টা পেছনে হেলিয়ে বেলা ঠাহর করতে যেতেই তার পেটের পাকদণ্ডী বেয়ে কি যেন এক ভয়ানক অস্বস্তি মোচড় মেরে কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে আসে। মুখ ভোরে ওঠে লালায়। তার বোকা বোকা মুখটায় এক ভয়ানক ক্রুরতা জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। কুকুরের মত জিভটা বার করে সে লালা ঝরাতে থাকে, যেমন করে গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ে শিশির—ধুলোয় হারিয়ে যায়। ভেলভেলুয়া দেখেছে এমনি করে কিছুক্ষণ লালা ঝরাবার পর খিদেটা কেমন যেন ঝিম মেরে যায়। শরীরটা বেশ হাল্কা হাল্কা বোধহয়। সেই প্রত্যাশা ও সান্ত্বনা নিয়ে লালা ঝরানোর খেলায় মেতে উঠলো সে।

খিদে মারার এই বহু ব্যবহৃত পথটাই বেছে নেবার পর ভেলভেলুয়ার মনে এল গতকালের সেই রাজসিক ভোজের কথা। সকালেই গোনাই মোড়লের ইঁদারার লাটখাম্বার গায়ে কাটা হয়েছিল বড় সড় কালো রঙের পাঁঠাটা। গাঁয়ের মানীরা পেয়েছিল মাংসের ভাগ আর ভেলভেলুয়ারা কজন নাড়িভুঁড়ি। সেগুলো থেকে ময়লা আর নাদিগুলো বার করে কঞ্চির ডগায় পুড়িয়ে নিমক আর মিরচাই দিয়ে কি খাওয়াটাই খেয়েছিল। আঃ। কথাকটা ভাবতেই তার সারা শরীর কেঁপে উঠলো মুখে নেমে এল প্রশান্তি। গোটা দেহটা ঝাঁকিয়ে ডালের ওপর উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো ডুমুরিয়ার দিক থেকে আসছে মানুষ আর মহিষের পাল। কালো মানুষগুলোর কোন সাজ নেই। মোড়লদের ধুতি আর ফতুয়া তাদের মধ্যে বড়ই বেমানান। যত সাজ আজ মহিষগুলোর। সারা গা তেল চুপচুপে, যেন রোদ্দুর পিছলে যাচ্ছে। শিংগুলো সিঁদুরের রঙে রঙে ঝাঁ ঝাঁ। গলায় কড়ির মালা, মোষগুলোও যেন আজ তাদেরই পরব। দুলকি চালে রাজকীয় ভঙ্গিমায় তারা পা ফেলছে, যেন কতগুলো কালো সচল পাথর গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। সারা শরীরে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা নিয়ে ঘোলা ঘোলা চোখে ভেলভেলুয়া দেখাচ্ছিল সেই দৃশ্য। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে তখন শুধু যুথবদ্ধ মহিষের হেঁটে যাওয়া, তাদের সিঁদুর মাখানো শিঙের উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই। কানে আসছিলো না মানুষের হল্লা কিংবা মনে ছিল না একটু আগে এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে কাঠঠোকরার সেই একঘেঁয়ে ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ।

তন্ময়তার গভীরতা থেকে মুক্তি পেয়ে ভেলভেলুয়া বিস্ময়ের সমুদ্রে নামে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে গোটা মাঠ মানুষে আর মহিষের পালে থৈ থৈ। উল্লসিত মানুষের চীৎকারে আর জানোয়ারগুলোর অধৈর্য আস্ফালনে মাঠজুড়ে গমগম গমগম—একটানা শব্দের লহরা। ভেলভেলুয়া কেউ তাকে দেখে ফেলার আগেই দ্রুত গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে চাইলো। পাতা ঝরার দিনে ছোট শরীরটা লুকোতে তার হিমসিম অবস্থা। আতঙ্কে তার বুকের পাঁজরের মধ্যে শব্দ উঠতে থাকে। সে চায়না কেউ তাকে দেখুক, গাছের মাথায় জুটুক কোন ভাগীদার। গাছের মগডালে বসে সে দেখলে চারপাশের গাঁ থেকে তখনও আসছে মানুষ আর মহিষ। মাঠের মাঝে মহিষদের তোয়াজে ব্যস্ত তাদের মালিকরা। দর্শকরা ব্যস্ত নানা জল্পনা কল্পনায়। কয়েকজন

মানুষ বাঁশের আড়া থেকে বৃহৎ শূয়োরটাকে নামিয়ে পেছনের দুটো পায়ে শক্ত করে বাঁধছে হাত পঞ্চাশেক লম্বা এক কাছি। শূয়োরটা জ্বল জ্বল করে মজা দেখার চোখে সব দেখছে। ভেলভেলুয়ার শূয়োরটার জন্য বুকের মধ্যে একটা ব্যথা ব্যথা করে। বেচারা জানেনা পলকয় পরেই তার নধর শরীরটা ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে উঠবে। ব্যথাটা অবশ্য বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না সে। অন্যদিকে চোখ ঘোরাতেই দেখলো বৃদ্ধ মোড়লের এক চোখ কানা মেষটাকে ঘিরে বড়সড়ো মানুষের বৃত্ত। এই মোষটাই গত দু'বছর হুররা পরবে জিতেছে। তাই তার এত কদর। মোষটা ঘাড় কাত করে আপন মনে জাবর কাটছে, পাশে বুক চিতিয়ে মোচে তা দিচ্ছে বৃদ্ধ মোড়ল, গর্বিত চোখে চাইছে এদিক-সেদিক। ভেলভেলুয়া ভেবে অবাক হয় এই নির্বোধ ভঙ্গীতে জাবর কাটা মোষটাই পরব শুরু হলে কি রুদ্র ভঙ্গীতে লড়াই এ নামবে।

অবশেষে পরব শুরু হয়। লম্বা টানটান জিয়াননন্দ উরুতের উপর লুঙ্গিটা তুলে শূয়োরের পায়ে বাঁধা দড়িটা হাতে ধরে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে দানোর মত মাঠের মাঝখানে দাঁড়ায়। তার কপালে মোড়লের এঁকে দেওয়া সিঁদুরের ফোঁটা রাজতিলকের মত জ্বলে। রক্তজবার মতো চোখ দুটোকে সে চরকির মত চারপাশে ঘোরাতেই মাঠের মাঝে জমে থাকা মানুষগুলো দুদ্দাড় করে ছুটে চারপাশের ছোট ছোট ঢিবিগুলোতে দলা পাকালো। শিশু মোষগুলোকে একদল টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত মাঠটাতে আশ্চর্য এক স্তব্ধতা নেমে আসে। এসব দেখে গাছের মাথায় ভেলভেলুয়ার ছোট্ট শরীরটা উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে। চোখের পাতা কাঁপছে তির তির তির তির। সে গাছের ডালটাকে জড়িয়ে ধরলো আরো শক্ত হাতে। উত্তেজনা কমাতে হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকলো।

সমস্ত স্তব্ধতাকে হঠাৎই বিদীর্ণ করে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত জিয়াননন্দ হাতের দড়িটা ধরে ছুটতে লাগলো, মুখ থেকে একটানা শব্দ গোঙার মত ছিটকে যায় হুররা—রা—রা—রা—রা……। সম্বিত ফিরে পেয়ে সমস্ত মানুষগুলো হাতের লাঠিগুলো বাতাসের পায়ে আছড়ে গলা মেলালো—রা—রা—রা—রা……। সমস্ত মানুষের মিলিত বীভৎস চীৎকারে, আস্ফালনে এবং দড়ির টানে মাটির গায়ে হেঁচড় পেঁচড় হতে হতে শূয়োরটা হিক্কা তোলার মত একটানা আর্তনাদে ফেটে পড়ে। মানুষের সম্মিলিত ধ্বনির সঙ্গে শূয়োরের গ্যাঁওক গ্যাঁওক গ্যাঁওক—অন্তিম আর্তনাদে মহিষের পাল আকাশের দিকে মুখ তুলেই কি যেন টের পায়। তারপর মাতালের মত যেন তাঁদের রক্তেও বেজে উঠলো মাদল। তারা একযোগে ক্ষিপ্ত আক্রোশে রুদ্রমূর্তিতে ধেয়ে এল ক্রীড়া ভূমিতে। মাঠের চারপাশ থেকে বেজে উঠলো জয়ঢাক আর শিঙা। কালো কালো দৈত্যের হুঙ্কারের মধ্যে জিয়াননন্দ কুশলী খেলোয়াড়ের মত দাড়তে দিল টান। শূয়োরটা মোষদের নাগালের বাইরে যেতেই খ্যাপামির আগুন জ্বলে উঠল গোটা মাঠে। মোষগুলো ভীম বেগে ছুটে এসে শিঙে গেঁথে ফেলতে চায় শূয়োরটাকে আর জিয়াননন্দ চকিতে দড়িতে টান দিয়ে ফুলকির মত ছুটে বেড়ায় সেই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে। তার ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো কপালের সিঁদুর ঘামের মিশেল হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ সূর্যের আলোয়, ধুলোয়, মহিষের খুরের শব্দে চারপাশের মানুষের বীভৎস চীৎকারে আর শূয়োরের আর্তনাদের সঙ্গে ঢাকের শব্দে ভেলভেলুয়া থর থরিতে কেঁপে ওঠে। তার দুই চোখে খেলা করে যায় মৃগের বিষণ্ণতা, কখনো বা শৃগালের চতুরতা, চিতার নিষ্ঠুরতা। সমস্ত মাঠের/মানুষের বীভৎস আদিম মুখের মত তার কচি কিশোর মুখেও নেমে আসে বন্যতা। সে সাপের মত নিঃশব্দে নেমে আসে একেবারে শেষ ডালটায়, মাটি থেকে মাত্র হাত দশেক ওপরে। রক্তপিপাসু হায়নার মত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একীভূত করে অপেক্ষায় থাকে একটি সুযোগের, সেই চরম মুহূর্তের।

সময় যত বয়ে যেতে থাকে মাঠের তাণ্ডব ততই বাড়তে থাকে। অধৈর্য মানুষেরা হাতের লাঠি সাঁই সাঁই করে ঘুরিয়ে বুকের মধ্যে জমা বায়ুতে ভর করে উচ্চ চিৎকারে ফেটে পড়ে। ঢাকের শব্দে সমস্ত তাল ভেঙে ভীষণ বাজতে থাকে। ক্ষিপ্ত মহিষের পাল শূয়োরটিকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। শূয়োরের আর্তনাদ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। তার কালো শরীর ছিঁড়ে দেখা যায় সাদা চর্বির সঙ্গে লাল রক্তের ধারা। জিয়াননন্দ ঘোরলাগা মানুষের মত, মাতালের মত একটানা চীৎকারের সাথে সারা মাঠে দানোর মত মহিষের পালের মধ্যে উল্কার গতিতে ছুটে বেড়াতে থাকে। মোষের গায়ের ধাক্কায় গাছটি বার বার কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। খেলা চলতেই থাকে। যতক্ষণ কোন মোষ শূয়োরটাকে শিঙে গেঁথে নিতে না পারবে ততক্ষণ খেলার শেষ নেই। এ পরবের এই রীতি।

অকস্মাৎ সমবেত মানুষের অট্ট চিৎকারের মধ্যে একটা মোষ এক ছুটে শূয়োরের পেটের মধ্যে শিঙ ভরে তুলে নেয়। তারপরেই ছুটতে থাকে ক্ষ্যাপার মত। শেষ আর্তনাদে শূয়োরটা স্তব্ধ হয়। বাকি মোষগুলো ভীম বিক্রমে ছুটতে থাকে সেই বিজয়ী মোষটির পেছনে। এই ছোটাছুটির ফাঁকেই শূয়োরটি মোষের শিঙ থেকে ছিটকে পড়ে। শিঙের ডগায় বেধে থাকে বড়সড়ো এক খাবলা মাংস। ভেলভেলুয়ার সমস্ত শরীর কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় টান টান হয়ে ওঠে। যাত্রায় দেখা অর্জুন যেমন শুধু পাখীর চোখ দেখেছিল তেমনি তাঁর চোখের সামনে শুধু জেগে থাকে মোষের শিঙে সেই মাংসের টুকরো। আর চেতনা থেকে মুছে যায় সমস্ত মানুষের উপস্থিতি, সেই বিকট চিৎকার। তার দুই চোখ জ্বলে ওঠে আহত বাঘের মত। এমনই এক চরম মুহূর্তে মোষটা শিঙের আগায় মাংসের টুকরোটা নিয়ে গাছের তলা দিয়ে ছুটে যাওয়ার ফাঁকে ভেলভেলুয়া গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে মাংসের টুকরোটা কেড়ে নিতে চেষ্টা

করে। মাঠের সমস্ত মানুষ তার এই দুঃসাহসিকতায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কয়েকশ মানুষের জোড়া জোড়া চোখ কেড়ে নেয় এই ভয়ানক খেলা। বার তিনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর ভেলভেলুয়া চোয়াল শক্ত করে ছুটে যাওয়া মোষের শিঙে আটকে থাকা মাংসের থাবলাটা খপ্ করে চেপে ধরে। মাংসটি কিন্তু তার হাতে উঠে আসে না। শূয়োরের ছাল মোষের শিঙে আটকে থাকাতে এক হ্যাঁচকা টানে ভেলুভেলুয়ার গাছের ডাল ধরা হাত শিথিল হয়ে যায়। সে সমস্ত শক্তিতে গাছ থেকে পড়ার ফাঁকে হাতের মুঠোয় টেনে নেয় মাংসের টুকরোটা।

সে মাটিতে পড়তেই মোষগুলো যেন নতুন শিকারের গন্ধে ক্ষেপে ওঠে। তারা ভীমগতিতে ছুটে আসতে থাকে এই শিকার শিঙে গেঁথে নিতে। ভেলুভেলুয়া বুকের মধ্যে মাংসের টুকরোটা চেপে ধরে চকিতে দেখতে পায় তার চারপাশে দানবের দল নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞায় ধেয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে সে গড়াতে শুরু করে, হামাগুড়ি দিয়ে একটি মেষের পেটের তলা দিয়ে আর মোষের পেটের তলায় চলে যায়। সে যেন মেতে ওঠে লুকোচুরি খেলায়। শিকারের চতুরতায় মিলিত আক্রমণে উদ্যত হয় মহিষের পাল। মাঠের চারপাশের মানুষ বোবা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হৈ হৈ তে ফেটে পড়ে। এই চীৎকারে উৎসাহিত ক্ষিপ্ত মোষের দল ভেলুভেলুয়াকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চায়। ভেলভেলুয়ার লুকোচুরি ধরা পড়ে যায়, চকিতে একটি দানব তার পাঁজরার ওপর ভীষণ আঘাত হানে। উরু ফেড়ে ফেলে। তবু সে হার মানে না। অচেতনতার অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে সে শরীরকে এদিক ওদিক সরিয়ে আঘাত এড়াতে চেষ্টা করে। ক্রমেই তার শরীর অচল হয়। কণ্ঠনালীতে ভয়ানক যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। চারিপাশের সমস্ত দৃশ্য তার চোখ থেকে মিলিয়ে যেতে থাকে। মাংসের টুকরোটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সে যেন পাশ ফিরে গভীর ঘুমে ডুবে যেতে থাকে।

আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যাবার আগে ভেলভেলুয়া দেখতে পায় যুথবদ্ধ মানুষ লাঠি হাতে নেমে পড়েছে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে।

★ রাবণের চিতা ★

[২৭৫ পৃষ্ঠার পর]

মাথার ওপর। এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে খোকা।

সুনু!

রতিকান্ত ওষুধগুলো একধারে রেখে নীচু হয়ে বসে থাকলো অনেকক্ষণ।

কোন শব্দ নেই, তাঁবুর বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। নিভে আসছে ঘরের আলো। শীতের হাওয়া এসে এখানেও গায়ে লাগছে। কিন্তু পাশাপাশি দুটি নির্বাক হৃদয় প্রদীপের মত প্রাণরসের মৃদু ধারায় জ্বলছে।

যাক, সব শেষ।

রতিকান্তর চোখ দু'টো জ্বালা করছে। জলে ভারী হয়ে উঠেছে। তবু মুছল না। বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। জানিস বউ, এই রাস্তাটা পাকা হবে। তাই আমাকে নুটিশ দিয়েছে। যেন তিনদিনের মধ্যে গাঁয়ের ভেতরে উঠে যাই। কিন্তু এখন তাও আর হবে না। এই মাত্তর বাপ ঠাকুদ্দার ভিটেও বিকিয়ে দিয়ে এলুম।

গলা ধরে এলো রতিকান্তর। চুপ করে বসে থাকলো খানিকক্ষণ। তার পর পিঠের শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়ালো। সুনুকে ডেকে বললো ওঠ। সব গোছগাছ করে নে। এ তাঁবু ছেড়ে যাবো। এ গাঁ ছেড়ে যাবো আজ রাতেই। খেটে খাবো, তবে ভয় কিসের।

রাত আরো গভীর হয়েছে। শিশির ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে বিঁধছে। রতিকান্ত কাজ শেষ করে তাঁবুর বাহিরে এসে দাঁড়ালো। বাহিরেই দাঁড়িয়েছিল সুনু। দরকারী জিনিস পত্রগুলো বেঁধে নিয়েছে। এবার চলে যাবে তারা। হঠাৎ তাঁবুর দিকে চেয়ে কেঁদে উঠলো সুনু। রতিকান্ত প্রায় ফিস ফিস করে শাসালো, কাঁদবি না, কাঁদবি না বলছি। কাঁদলে গলা টিপে দোব একেবারে।

রতিকান্তর মুখটা ভীষণ উয়ে উঠেছে। হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। কপালের শিরাগুলোও ফুলে উঠেছে।

একটা মশাল জ্বেলে তাঁবুতে আগুন ধরালো রতিকান্ত। দেখতে দেখতে তার পুলিনের তাঁবুটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

রতিকান্ত বোঝাটা নিজের পিঠে তুলে নিলো। তারপর সুনুর হাত ধরে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চলে গেল। ওই জ্বলন্ত তাঁবুর নীচে মাটি খুঁড়ে তারা রেখে গেল তাদের শিশু সন্তানকে।

সত্যযুগ পাতা

মাস্টারদার চিঠি

মহলয়া
২৫শে আশ্বিন ১৩৮৪

স্নেহের ভাইবোন,
পুজোর ডালি সাজিয়ে দিলাম
আজ তোমাদের পাঠশালাতে,
খুশীর জোয়ার বইবে জানি
বইটি খোলার সাথে সাথে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে গল্প-গাঁথা
ছড়া-ছবির সমাবেশ এ,
রূপকথারই ঐ দৈত্য-দানো
হাজির তারা হেথায় এসে।

রাজকন্যা বন্দিনী আজ
দৈত্য-দানোর সাজে মহলে,
রাজার ছেলে খবর পেয়ে
টাট্টুঘোড়া ছুটিয়ে চলে।

তরুণ-কিশোর কচি-কাঁচা
সবার তরেই এ পাঠশালা,
বিদায় এখন নিচ্ছি আমি
রইলো প্রীতি পরান-ভরা।

তোমাদের শুভার্থী
মাস্টারদা

টগর ও প্রকৃতিরাণী

মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত

আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে। সূর্য চলে গেছে মেঘের আড়ালে। অন্ধকার হয়ে এসেছে চতুর্দিক। আর ঠিক তখন ফুলের বাগানে ফুলগাছগুলি শুরু করল ঝগড়া। বেলী, যুঁই, চামেলী, মাধবী, মালতী, কাঞ্চন, কামিনী, গুলঞ্চ, প্রত্যেক গাছই বলছে, 'প্রকৃতিরাণী সবচেয়ে বেশী ভালবাসে আমাকে।' শুধু টগর কিছু বলে না, সে চুপ করে থাকে।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে ডেকে উঠলো মেঘ। শনশনিয়ে উঠলো বাতাস। প্রকৃতিরাণী বর্ষার নূপুর পরে রিমি ঝিমি ধ্বনি তুলতে তুলতে ফুলের বাগানে এসে দাঁড়াল। ফুলগাছগুলি একসঙ্গে বলে ওঠে, এই তো প্রকৃতিরাণী এসে গেছে।

বেলীগাছ বলে, বল তো, প্রকৃতিরাণী, সবচেয়ে কোন্ ফুল তোমার প্রিয়। কাকে তুমি বেশী ভালবাস? বেলী নিশ্চয়ই।

অন্যান্য ফুলগাছগুলি চেঁচিয়ে ওঠে, না, না, বেলী নয়। আমি, আমি—আমাকে, আমাকে।

টগরগাছ শুধু নীরবে ফুল ফুটিয়ে চলে। সে কিছু বলে না।

প্রকৃতিরাণী তার সবুজ সাজিখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "তোমরা প্রত্যেকে একটি করে ফুল আমাকে দাও।

সব গাছই একটি করে ফুল প্রকৃতিরাণীর সাজিতে রাখলো। টগর শুধু ছিল না। প্রকৃতিরাণী টগরগাছকে শুধোয়, কি গো, তুমি ফুল দিলে না যে!

কামিনী গাছ হেসে বলে, ওর খুব লজ্জা। ওর দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। ওর না আছে মিষ্টি গন্ধ, না আছে রূপ, মানুষরা ওর কদর দেয় না।

বেলী, যুঁই, মাধবী, মালতী, চামেলী, কাঞ্চন, গুলঞ্চ একসঙ্গে সায় দেয়, ঠিক, ঠিক, টগরের কোনও দাম নেই।

প্রকৃতিরাণী নিজেই হাত বাড়িয়ে টগর গাছ থেকে একটি ফুল তুলে সাজিতে রাখলো। তারপর বললো—"এবার আমি চলি। আবার আসবো হেমন্তে, শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে। বছর শেষে আবার আসবো বর্ষায়। সেদিন বলব, কাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।

বছর ঘুরে আবার এল শ্রাবণ। আকাশ মেঘে মেঘে সাজলো ঠিক তেমিভাবে। গুড়গুড়িয়ে উঠলো মেঘ ঝর ঝরিয়ে উঠলো বাতাস। ফুল গাছগুলি অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকৃতিরাণীর। বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। বর্ষার ঘুঙুর পরে রুমঝুম বাজাতে বাজাতে এলো প্রকৃতিরাণী। তার হাতে ছয়টি ফুলের সাজি। সাজিগুলি ঘাসের ওপর রেখে প্রকৃতিরাণী বললো, সব ঋতুতে যে ফুল দিয়েছে, সেই আছে সব সাজিতে। তোমরা দেখে বল কে আছ সব সাজিতে।

বেলী, যুঁই, কামিনী, কাঞ্চন, গুলঞ্চ, মাধবী, মালতী, চামেলী—প্রতিটি গাছ সাজিগুলি দেখে বিষণ্ণ হয়। ওরা প্রত্যেকে বলে, 'মা প্রকৃতিরাণী, সব সাজিতে আমি নেই। কি করে থাকবো? সব ঋতুতে তো আমি ফুল ফোটাতে পারি না।'

টগর ঝলমলিয়ে ওঠে খুশীতে। সে হাসতে হাসতে বলে, "এই যে আমি সব সাজিতেই আছি।"

প্রকৃতিরাণী টগরগাছকে জড়িয়ে ধরে বলে, সারা বছর তুমি আমার গলায় মালা পরাও। অথচ তোমার অহংকার নেই। তুমই সকলের সেরা। আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসি।

ছড়া

গরেশ ঘোষ

নিরাপদ সাহারায়
জেগে ছিল পাহারায়,
চোর এসে খুট্-খাট্
ক'রে দিলো শুরু।

নিরাপদ লাঠি তুলে
জানালার ডালা খুলে
ফিস্-ফিস্ ক'রে বলে—
'কী খবর গুরু?'

অ্যাই সওয়ারি। নতুন গাড়ি—
কোথায় যাবে, রাসবিহারী?
হুস্-মন্তর। ভটভটিয়ে—
এই দেখোনা পৌঁছে গেলো।

অ্যাই সওয়ারি। নতুন গাড়ি,
নতুন ব'লে দেমাক ভারি?
না ঠেলো তো নড়বে নাকো
সবাই মিলে এবার ঠেলো।

জ্বালা

কুমারেশ ঘোষ

মাধববাবুর মুদীখানার দোকান বেশ ভালই চলে।

কারণ, তিনি ঘদ্দেরকে ওজনে ঠকান না। আর দোকানে ভেজাল জিনিস রাখেন না। তাছাড়া খোলা জিনিস বেচবার সময় একটু ফাউ দিয়ে থাকেন। ব্যবসাদার মাধববাবু জানেন, আসলের চাইতে সুদ মিষ্টি।

কাজেই মাধববাবুর দোকানে বিক্রী ভালই, কিন্তু দোকানের কাজের জন্য ভাল একটা ছোকরা আজ পর্যন্ত পেলেন না তিনি। দোকানে সব সময় মন দিয়ে কাজ করতে হবে, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে বিড়ি ফোঁকা যাবে না। দোকানের এটা-ওটা জিনিস সরানো যাবে না এমন ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির পাওয়া খুব শক্ত।

যাক, শেষ পর্যন্ত পেলেন একটা ছোকরাকে। বছর ন'দশ বয়েস হবে। গরীব বিধবার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটি ফায়ফরমাস-খাটে, কথা বললে কথা শোনে—তবে একটু চঞ্চল প্রকৃতির।

সেদিন মাধববাবু সকালে দোকানে এসে দরজায় চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ফুলুদ্দীর গণেশ ঠাকুরের সামনে ধূপকাটি জ্বালিয়ে প্রণাম করে নিজের জায়গাটিতে বসলেন।

আর একটু পরেই দোকানে ঢুকতে এলো নতুন ছোকরাটা।

—এই আস্তে আয় দরজায় গঙ্গাজল ছিটিয়েচি। উল্‌টে যাবি।—তাড়াতাড়ি সাবধান করলেন তাকে মাধববাবু।

তারপর ঝাঁটা নিয়ে দোকানের সামনেটা ঝাঁট দেবার জন্য বাইরে যাবার সময় আবার ছোকরাটাকে সাবধান করে দিলেন—এই আস্তে যা দরজায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েচি। উল্‌টে যাবি।

নতুন ছোকরাটাকে নিয়ে মাধববাবুর এই এক জ্বালা হলো, কেবল তাকে সাবধান করা। কিন্তু সব বৃথা হলো। ঝাঁট দিয়ে দোকানে ফিরে এসেছিল ছোকরা, কিন্তু বাইরে হঠাৎ ঢাকের বাজনা শুনতে পেয়ে, ছেলে মানুষ, ছুটে যেতে গেল বাইরে।

—এই, এই উল্‌টে যাবি—মাধববাবুর মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই ছোকরা দরজার ভিজে চৌকাঠে পিছলে গেল উল্‌টে।

—হলো তো।—মাধববাবু তড়াং করে লাফিয়ে উঠলেন। তখন থেকে পইপই করে সাবধান করচি, দরজায় গঙ্গাজল ছিটিয়েচি, উল্‌টে যাবি। তাই গেলি তো। আমার হয়েচে এ এক নতুন জ্বালা।

মাধববাবুর এই নতুন জ্বালা কারণ ছোকরাটার নাম গণেশ।

আর কে না জানে, গণেশ উল্টানো খুব খারাপ।

হাতির দাম

রবিদাস সাহারায়

মন্ত্রী হাতি লাখ টাকা ভো,
জ্যান্ত হাতির দাম কত?
পোনের লাখ না হলেও
পাঁচ লাখ তো অন্ততঃ।

জুলির হাতি জ্যান্ত বটেই,
ছুটে চলে, নাড়ায় শুঁড়;
ব্যস্ত সবাই হাঁক শুনে তার
পথটি ছেড়ে পালায় দূর।

শুনলে আরো অবাক হবেন
কিনেছে সে তিন টাকায়;
বিশ্বাস না করেন যদি
দামের খবর নিন চকিায়।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকা

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

খামখেয়ালী ছুঁচো রাজার
এক যে ছিল গোলাম—
শ্রীচামচিকা নাম;
মাস ফুরুলে চৌদ্দ সিকা
মিলত কাজের দাম।

রাজার চেয়ে রাজ গোলামের
প্রতাপ ছিল অতি,
পুতুল সেজে থাকত বসে
উজির সেনাপতি।

রাজার সাথে গোলাম প্রবর
করত ওঠা বসা,
দাগ্‌ত কামান এক নাগাড়ে
মারতে বনের মশা।

থাকত গোলাম ছায়ার মতন
রাজার পাশে পাশে
রাজার দয়ায় মিলত প্রচুর
ইনাম মাসে মাসে।

উদোর দোষে বুদোর ফাঁসি
হ'লই কয়েকমাস,
ছুঁচো রাজা আনলে ডেকে
নিজের সর্বনাশ।

সইবনা আর ছুঁচো রাজার
খেয়াল খুশীপণা—
থাকলে পরে ধমনীতে
একটি শোণিত কণা।

উঠলো রুখে পশু-পাখি,
বাঁধল মহাজোট।
বাঘের নাতি রাজা হলেন
পেয়ে দশের ভোট।

ছুঁচো রাজার উঁচু মুখে
মারল কষে লাথি,
পুরল জেলে চামচিকাকে
কেঁদো বাঘের নাতি।

খেল্ ফুরুলো শ্রীচামচিকার
মুখটি ছুঁচোর চুন।
খামখেয়ালীর মাশুল গুনে
দিলো সে দশগুণ।

খেলা ঘরের খেলা

রঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ কথা না হলে আবার বিয়ে হয় নাকি কারো? ঠোঁট উলটে পূরবী ওরফে বুড়ি বললো। কথা হচ্ছিল ওদের সিঁড়ির তলায় পুতুল খেলার ঘরে।

রীতা বেশ ঝাঁঝের সুরে বললো: একশো বার হয়। তুই কটা বিয়ে দেখেছিস্‌রে? আমি বলে পাঁচ পাঁচটা পুতুলের বে দিলাম। কৈ, লক্ষ কথাতো কখনও হল না? যত সব অনাছিষ্টি কথা তুই শুনাচ্ছিস আমাকে।

সকাল বেলা এহেন তর্কাতর্কি। সিঁড়ির তলায়, ওদের খেলা ঘরে তখন আর কেউ নেই।

জেঠু বেরুচ্ছিলেন বাজারের থলে হাতে— ব্যস্ত হয়ে। পূরবী পথ আগলে দাঁড়ালো কোমরে হাত রেখে। উদ্দেশ্য এর একটা ফয়সালা তার চাই।

: কি ব্যাপার? কোন ঝগড়া টগড়া নাকি? বললেন জেঠু ফোকলা মুখে।

বুড়ি বললো: ঝগড়াই তো! ভাল কথা বলতে মন্দ হচ্ছে?

: কার সাথে? রীতার সাথে? বললেন জেঠু।

: তা নয় তো কি। এই দ্যাখোনা জেঠু, পাতার লুচি। কাদার মেঠাই। মোচার খোলা ভাজা, সবই হয়ে গেল। ও বাড়ীর মঞ্জুদি আমার পুতুলের গায়ে হলুদ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। বাকী মাত্র লক্ষ কথা হওয়া। এখন কিনা রীতা বলছে লক্ষ কথা না বলেই বিয়ে হবে? লক্ষ কথা না হলেও নাকি বিয়ে হয়। শোন কথা মেয়ের? আমি এতে মত দিই কি করে জেঠু তুমিই বলো?

জেঠুর কপালে ভাবনার রেখা।

: তাইতো? তা' রীতার বুঝি অমত হচ্ছে লক্ষ কথা হবে বলে? ও বুঝি লক্ষ কথা বলতে চায় না?

: তা নাতো কি? এই নিয়েই সকাল বেলা ঝগড়া। আমি বলছি লক্ষ কথা হবে। ও বলছে, না হবে না। তাহ'লে বিয়েটা হবে কি করে শুনি? আর বিয়েই যদি না হয় তাহলে এই কাদার মেঠাই; মোচার খোলা ভাজা, পাতার লুচিগুলোর উপায় কি হবে বলো তো? এ সব করতে বুঝি কষ্ট হয়নি আমার?

: তা হলে তো দারুণ সমস্যা। তবে এক কাজ করো। দু'জনেরই কথা থাক। মেয়ের যখন গায়ে হলুদ হয়ে গেছে। তুমি আড়াইশো কথা বলো, রীতা আড়াইশো কথা বলুক। দু'জনের কথা মিলিয়ে হবে তাহলে পাঁচশো কথা। লক্ষেতে যেয়ে কাজ নেই। পাঁচশোতেই বিয়েটা হয়ে যাক।

পেছন ফিরে বুড়ি দেখলো তিপুন, চন্দন, কাঞ্চন, রীণা, তপু, রাজু, মঞ্জু, সুমি, প্রণত, খোকন, রীতা, সকলেই সায় দিচ্ছে জেঠুর কথায়।

অগত্যা বুড়িরও মত। বললো: তুমি যখন বলছো জেঠু, তবে তাই হোক।

সকলেই তখন হাসছে। হাসির ঘটনা ঘটলো যে। তাই সবার মুখেই হাসি ফুটলো। মঞ্জুদি তখন শাঁকে ফুঁ দিল কয়েকবার। 'বর এসেছে' রব উঠলো।

অন্য মেয়েরা উল দিয়ে উঠলো। এতক্ষণে বুড়ির মেয়ের তবে বিয়ের ফুল ফুটলো। বিয়ের পর সাত দিনও হ'ল না। পই পই করে জামাই ষষ্ঠীও এসে গেল। নেমতন্ন হ'ল জেঠুরও।

জেঠু আবার ছড়া টড়া লেখেন। ওদেরকেও শুনান। ওরা সব্বাই জেঠুর ছড়ার তারিফও করে।

যথারীতি জামাই ষষ্ঠীর দিন জেঠু ওদের খেলা ঘরের সামনে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন ছড়া লিখতে। নানান কাজে বুড়িরাণী ব্যস্ত। জামাইকে নিয়ে আসবে রীতা বেহান। বুড়ি শাশুড়ীর তাই কাজের অন্ত নেই। এমনি সময় সেই লজ্জার কাণ্ডটি ঘটলো। কী কাণ্ড? জেঠুর ছড়াতেই শোন,

বুড়ী রাণীর জামাই আজি আসবে
সকাল বেলা।
তাইতো বুড়ীর সকাল থেকে
কাজের বেজায় ঠেলা॥
ঘর নিকানো, বার গোছানো
শতেক টুকিটাকি।
সবই হ'ল, এখন কেবল জামাই
আসাই বাকী॥
সদর গেটে শব্দ হতেই, চাইলো
বুড়িরাণী
জিভ কেটে সে পালিয়ে এলো
ঘোমটা মাথায় টানি।
জামাই কোলে বেহান রীতা,
নামলো গাড়ি থেকে,
সেজেগুজে বুড়ীরাণী আনলো
মেঠাই মেখে।
জল ও আসন পাতাই ছিল,
এগিয়ে দিল থালা,
আম জাম আর দই সন্দেশ
ষষ্ঠী পূজোর মালা।
অলুক্ষণে কাণ্ডখানা এমনি
সময় ঘটে,
দৌড়ে যেতে পড়লো বুড়ী
হোঁচট খেয়ে চটে।
হাসির বোমা পড়লো ফেটে,
বুড়ীর মুখটি কালো
দারুণ লজ্জা পেয়েই বুড়ী চট্ করে
সামলালো।
আমরা বলি খেলা ঘরে সবাই
আছাড় খাই,
জগৎ জোড়া এ খেলা ঘর
নতুন কিছুই নাই॥

ছড়া শুনে সব্বাই দারুণ খুশী হল। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো বুড়ীও। আশাকরি গল্পটা পড়ে তোমরা খুশী হবে।

ক্যাকটাসের আদি নিবাস আমেরিকা

শচীন কুণ্ডু

ভারী অদ্ভুত রকমের এই গাছ। নাম তার ক্যাক্‌টাস। এর আদি নিবাস ছিল আমেরিকা। অধুনা পৃথিবীর সর্বত্রই এর বাস। তোমরা নিশ্চয়ই এই গাছ দেখেছো। হয়তো অনেকের বাড়ীতেই এই গাছের বেড়া দেওয়া আছে তাই না। বহু বিচিত্র রকমের ক্যাকটাস ভারত, রাশিয়া, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আপনা আপনি জন্মায়। দেখতে সুন্দর হলে হবে কি এর জন্য খুব বেশী যত্ন-আত্তি লাগে না মোটেই। দিব্যি রূপসী দেখতে। এজন্য এর কোন অহঙ্কারও নেই। এই গাছ আবার উপকারীও বটে।

একে তো সুন্দরী তায় উপকারী ফলে মানুষ ও গরু-ছাগলের লোভ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই হয়তো সজারুর কাঁটার মত গায়ে বড় বড় কাঁটা আছে।

এই গাছের ডালপালা আরফুলগুলো সত্যিই লোভনীয়। ফুলের মন মাতানো রঙে চোখ জুড়িয়ে যায় একরকম। ক্যাকটাস মরুভূমিতেই বেশী জন্মায়। আর দেখা যায় গরমের দেশে। ডাল পালাতে অনেক জল জমিয়ে রাখে ক্যাকটাস। কারণ মরুভূমি আর গরমের দেশে থাকেতো তাই অসময়ে যাতে কোন সময় ঝঞ্ঝাটে পড়তে না হয় তাই।

এর রস কিন্তু খুব মিষ্টি। আমেরিকার মিস্টার লুথার বর্বাঙ্ক কাঁটা হীন ক্যাকটাস পশু খাদ্যের জন্য প্রথম চাষ শুরু করেন। আমেরিকানরা এর মিষ্টি রসে তৃষ্ণা মেটান। আর মেক্সিকোর বাজারে তো ক্যাকটাস ঢালাও বিক্রি হয়। আহাঃ এর তরকারী নাকি দারুণ খেতে লাগে।

এর ডালপালাগুলো যেমন বিচিত্র আকারের তেমনি এ গাছের আবার কি বিচিত্র সব নাম। যেমন মেলো ক্যাক্‌টাস দেখতে গোল তরমুজের মত, মেয়েদের চুলের ফিতের মত দেখতে এপিফাইলাম, আবার অনেকটা সজারুর কাঁটাওলা একিনোক্যাক্‌টাস। কেন, আমাদের বাংলা দেশেই-তো আছে ফণী মনসা যা মনসা পূজায় লাগে। কিছু কিছু ক্যাক্‌টাসের ডাল দেখলে মনে হয় যেন একটা সাপ ফণা তুলে আছে।

জানো ক্যাক্‌টাসের গায়ে আবার চটচটে সাদা দুধের মত কষ আছে। এর গায়ে একটু আঁচড় দিলে বা কাটলেই টসটস করে কষ বেরোয়। যেমন আমাদের কেটে গেলে রক্ত বেরোয় তেমনি।

এমন সুন্দর গাছ দিয়ে অনেকেই ঘর সাজায়। তোমরাও তো পারো পড়ার ঘর সাজাতে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। শুধু টবের মধ্যে দোঁআশ বেলে মাটি আর কিছু নুড়ি পাথর মিশিয়ে এর গাছ লাগিয়ে দেওনা। তবে দেখ জল যাতে গোড়ায় না দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যস কিছুদিন পরই দেখবে গাছটা কেমন সুশ্রী সুন্দর চেহারা নিয়ে তোমায় সুপ্রভাত জানাচ্ছে। কি মজা হবে বলতো।

॥ ছড়া ॥

ষষ্টিপদ চট্টোপাধ্যায়

শেয়াল নাকি খেয়াল গায়,
নেংটি ইঁদুর দেয়াল বায়?
বাঘের নাকি মাসী আছে
গল্পে গরু ওঠে গাছে?
ওরে ও ভাই শেয়াল রে—
গা না রে তুই খেয়াল রে;
নেংটি ইঁদুর পালিয়ে গেল
টপকে চীনের দেয়াল রে।

বাবার জন্য হবার ছড়া

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাবনাটাই বিপদ হলো বাবার;
এই তো সবে মাসের শুরু,
কতদিনে আবার—
হবে যে মাস কাবার?

বাবা আমার পান না সময়
আকাশ পাতাল ভাবার;
চিন্তা তবু বাবার—
দুখের রাতটি ফুরিয়ে কবে
সকাল হবে আবার?

বাবার বন্ধু, সবাই আছেন বেশ,
দেন উপদেশ:
লটারিতে টিকিট কাটো আবার
ভাগ্যটাকে রাতারাতি ফেরাতে চান
বাবার।

গোঁফ খেজুরে নাতনী জামাই
বুঝে সুজে চাল দিচ্ছেন দাবার;
রেডিওটা দিচ্ছে খবর
ভারত এবার লাভ করেছে 'রাবার।'
এ সবে কি নেই প্রয়োজন, বাবার?

ভাবতে ভাবতে দিন ফুরাল
বছর হচ্ছে কাবার
ফুরায় না তো সাজিয়ে রাখা
দোকানের ঐ রঙ-বাহারি খাবার।
ওদিকে যে বাবার দফা সাবাড়;
হল কি মাস কাবার?

চাঁপার ডালে আজ সকালে
ফুল ফুটেছে আবার।

তোমরা জান, সংগীত জিনিসটা এমনই, যা কেউ শুনলে খুসী না হয়ে পারে না। মানুষ ত' বটেই; যতোই সে রূঢ়রাগী বা কঠোর হোক্ না কেন সংগীতের প্রভাব তাকে কাবু করবেই। বন্য-জীবদের মধ্যে দেখা যায়, তারাও অনেকে সংগীত ভালবাসে। এমনকি হিংস্র পশুদের মধ্যেও অনেককে। দেখা যায় সংগীতের সুর তাকে এমনই মোহিত করে তোলে যে, সেই সময়টুকুর জন্য তার আর অন্য কোন দিকেই খেয়াল থাকে না।

তেমনি, তোমরা শুনে অবাক হবে যে, সংগীত শুনে গাছেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। হাস্‌ছো ত'। ভাব্‌ছো, এ আবার কি কথা। না, ব্যাপারটা ঠিক হাস্যকর নয়; আর একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই এ বিষয় বিভিন্নভাবে গবেষণা চলেছে। তবে তেমন ব্যাপক ভাবে নয়; যার জন্য ব্যাপারটা তোমরা ঠিক মত জানবার সুযোগ পাওনা। গবেষণায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, সংগীতের এমনই একটা প্রভাব আছে, যা গাছকেও উৎফুল্ল করে তুলে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এ বিষয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু সুষ্ঠু মন্তব্যও আছে।

তোমরা শুনে আরও অবাক হবে, এই যে বিষয়টি নিয়ে এত গবেষণা চলছে, তার সূত্রপাত কিন্তু আমাদেরই দেশের বিশেষ একজন বিজ্ঞানির হাতে।

দক্ষিণ ভারতের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সিং ও তাঁর সহকর্মী মিস্ পানিরা এ বিষয় সর্বপ্রথম গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এই গবেষণা করতে গিয়ে, তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবিত গাছের বৃদ্ধি অনেক বেশী; এর কারণ দেখিয়ে তাঁরা যে ব্যাখ্যা করে গেছেন তা হল—

ছোট ছোট কোষ দিয়েই দেহ তৈরী; ঐ সব কোষগুলির বিশেষ উপাদান হল' 'প্রোটোপ্লাজম্', এরই বৃদ্ধির সংগে সংগে ও প্রচুর পরিমাণ খাদ্য তৈরীর ফলেই গাছেরও বৃদ্ধি সম্ভব হয়। কোষের ঐ 'প্রোটোপ্লাজম'গুলি শব্দ তরঙ্গ দ্বারা সহজেই উত্তেজিত হয়, আর তার ফলেই সাধারণ গাছের তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা অধিক খাদ্য তৈরী করে। সংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তরঙ্গে প্রভাবিত গাছগুলির সাধারণ গাছের তুলনায় আর একটি বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়, তা হল', ওরা একই সময়ের মধ্যে ৩০/৪০ ভাগ বেশী 'অক্সিজেন্' বাতাস ছেড়ে দিতে পারে।

এ বিষয় আমাদের দেশের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ডঃ সিং-এর গবেষণার ফলেই, পৃথিবীর আরও অনেক জায়গার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

উত্তর আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারবার্ট জেমস্ বলেছিলেন যে—সংগীতের প্রভাবে বীজের অঙ্কুর গজিয়ে ওঠার কাজটি যে খুব দ্রুত হ'তে পারে, তা তিনি পরীক্ষার দ্বারা সহজেই লক্ষ্য করেছিলেন।

ওয়েন্ ক্লিট প্রদেশের কোন এক ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক, ব্যাপারটা তাঁর শস্য-ক্ষেতের ওপর কাজে লাগিয়ে, যার পর-নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে তাঁর শস্য ক্ষেতের ওপর, কয়েক ঘণ্টা ধরে, লাউড্-স্পীকারের সাহায্যে সংগীতের বিভিন্ন সুর পরিবেষণ করতেন। এর ফলে দেখা গেল—অন্যান্য বছরের তুলনায় সে বছর তাঁর ফসল শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ বেশী হ'ল। শুধু তাইই নয়, অন্যান্য বছরের শস্যের দানা অপেক্ষা আকারে ও পরিপুষ্টিতে কিছু বড়ও হ'ল।

এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে—আমেরিকার উইলক্‌নসিন প্রদেশের মিঃ লকার নামে আর এক ভদ্রলোক ও তাঁর ছেলে আরও অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফুলের বাগানে সংগীত পরিবেষণ করে, ফুলের আরও দ্রুত বৃদ্ধি, এমনকি ফুলের রঙ ও সৌন্দর্য পর্যন্ত এনে দিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন সংগীত শিক্ষক তাঁর সংগীত চর্চার বিশেষ ঘরখানিতে বসে লক্ষ্য করেছিলেন—আশপাশের গাছগুলোর তুলনায় তাঁর ঐ ঘরটির সংলগ্ন গাছগুলিই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাপারে ক্যালিফোর্নিয়ার কোন এক কাগজ 'প্যাসাডেনা' 'ইনডিপেনডেণ্ট ষ্টার'-এর সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন—"ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ সিং-এর গবেষণার ফলে একটা নতুন বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করায়, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে—যারা সংগীত জানে না, আমার এমন সব বন্ধুদের চেয়ে, আমার বাগান ও বাড়ীর লনে প্রত্যেক মাসেই, বেশী করে ঘাস ছেঁটে ফেলতে হয় কেন।

অবশ্য এখনও পর্যন্ত একমাত্র নিছক একটা কৌতূহল ছাড়া, এ বিষয়ে ব্যাপক-ভাবে কোন গবেষণা চলছে বলে শোনা যায় না; হয়তো ভবিষ্যতে এর গবেষণা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে—তখন হয়তো সংগীতের বিপুল চাহিদা মেটাতে, ঘরে ঘরে নতুন রেকর্ড তৈরির হিড়িক পড়ে যাবে।

যদি বর্তমান কালে নানান পর্যায়ের গবেষণাই, আমাদের সকলকে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে; কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যে সব বৈজ্ঞানিক যে যে বিষয় নিয়ে, সর্ব প্রথম পদক্ষেপ রেখে গেছেন, তাদের কথা আমরা একেবারেই ভুলে যাচ্ছি।

শীতের বাজারে

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিন গেল। কার্তিক এল। সেই সঙ্গে খুব সন্তর্পণে একটু একটু করে শীত আসছে। এক ভদ্রলোক থলি হাতে বাজারে গিয়েছেন। বাজারে নানা রকম তরিতরকারী। তরিতরকারীদের সবার লক্ষ্য কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের দিকে। তারা সবাই মিলে তাঁকে ডাকতে লাগল। ভদ্রলোক তো একেবারে নাজেহাল হয়ে যাবার মত অবস্থা। সবার আগে তাঁকে ডাকে এক ঝুড়ি ধবধবে সাদা ফুল কপি।

ফুলকপি : শুনুন শুনুন আরে মশাই
নতুন এলাম এই,
একটা বছর পরে দেখা
আমায় মনে নেই ?

ভদ্রলোক : মনে আছে, মনে আছে
ভুলতে তোমায় পারি ?
এখন তোমায় ছোঁওয়া কঠিন
দাম যে রাড়াবাড়ি।

টমেটো : [রাঙা মুখে হাসতে হাসতে]
বাবু মশাই দেখুন দিকি
আমার পানে চেয়ে
কয়েকটা নিন, তৃপ্তি পাবেন
চাট্‌নি আমার খেয়ে।

ভদ্রলোক : তা বটে ঠিক ভালোই হত
কিলো খানিক নিলে,
ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে
লজ্জা শুধু দিলে।

আলু : ডাকাডাকি করা বাবু
আমার স্বভাব নয়,
অল্প হলেও আমায় নেবেন
নেই কোন সংশয়।

ভদ্রলোক : আমার ঘরে সবার মুখে
নিত্য তোমার নাম।
অল্প কিছু নিতেই হবে
যতই বাড়ুক দাম।

লাউ : বাবু মশাই এইযে হেথায়
বসেই আছি আমি,
ওদের মতন অতটা আর
নই তো তেমন দামী ?

ভদ্রলোক তখন একটা মাঝারি লাউ এর গায়ে হাত বুলিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। তারপর তার গায়ে দু'চার বার নখ ফুটিয়ে লাউটা কচি কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। শেষে দর কষাকষি করে যেই না তাকে থলিতে পুরতে যাবেন তক্ষুণি ফুলকপি, আলু, টমেটো সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

ফুলকপি, আলু, টমেটো : (একসঙ্গে)
করেন কি যে। করেন কি যে।
মাছের বাজার যান,
আগে গিয়ে দেখুন সেথায়
চিংড়ি যদি পান।
তা না পেলে ওকে নিয়ে
করবেন আবার কি ?
চিংড়ি ছাড়া লাউ যেন ঠিক
অম্বলেতে ঘি।

ভদ্রলোক তখন আর কি করবেন। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর লাউটাকে যথাস্থানে নামিয়ে রেখে তরিতরকারীর বাজার ছেড়ে সোজা চলে গেলেন একেবারে চিংড়ি মাছের বাজারের দিকে।

কাবুলীওলা

পিনাকী রঞ্জন কর্মকার

কাবুলীওলা ! কাবুলীওলা !
ঝোলায় তোমার কি ?
বই পত্তর ? মণ্ডা-মেঠাই ?
কিম্বা গাওয়া ঘি।
অমন ক'রে হাসছো কেন ?
ভুল করেছি কী ই যেন।
তুমিই বলো—কিসে ভরা
লম্বা ঝোলাটি ?
খুকুর কথায় কাবুলীওলা
মিষ্টি হেসে কয়—
ঝুলি ভরা পেস্তা বাদাম
বই পত্তর নয়।
পেস্তা-বাদাম পিষে নিয়ে
তা'তে কাঁচা দুধ মিশিয়ে
রোজ খেলে পর যে কোন লোক—
ঠিক পালোয়ান হয়।

আলাপ সালাপ সরলদে

খেলুম দেলুম উড়ে এলুম
মস্ত উড়োজাহাজে,
বাঘুর বাড়ি সোঁদরবনে
আমার বাড়ি কাঁহা যে।
হালুম্ বাঘের ভাগ্‌না বলে
হচ্ছে মালুম নাকি এ ?
আলাপ-সালাপ করতে এলুম—
দেখই না হে-তাকিয়ে।
তুমি কি সেই বেবুন ছানা
লাজুক খোকা বেবুটা ?
বাংলাদেশে কী খাও তুমি
গাছের কলা লেবুটা ?
আরে আরে ভালুকছানা
থাপুস্ থুপুস্ নেচে নে,
আলসে ভালুক ঝুলছে ডালে ?
ঝুলুক—তাকে কে চেনে ?
শাদা বাঘের খাতির ভারি,
আছে কি নাক উঁচিয়ে ?
সিংহমশাই, হল্লা করে
ঘুম কে দিল ঘুচিয়ে ?
এই যে দাদা, হাতিদাদা,
পয়সা তোলো শুঁড়েতে—
মজা মজা বহুৎ মজা
দেখছি আলিপুরেতে !
আচ্ছা বাঘু, বাচ্চা বাঘের
কেমন খানা পিনা রে ?
মাংস দেবে ? হাড় কি দেবে ?
আর কি দেবে ডিনারে ?
ওয়াক্ ! থু-থু ! খাইনা আমি
দুধের সাথে সাগু আর।
নেহাৎ বোকা নই রে আমি
ছোট্ট খোকা জাগুয়ার ॥

দর্পচূর্ণ

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রকাণ্ড বড় বন। এ বনে বাস করে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে হাতীর দল। ছোট ছোট প্রাণীর ত কথাই নেই। বনের ভিতর বিরাট এক সরোবর। সেখানে রয়েছে কত রকমের পাখী। সবাই সুখে দিন কাটাত।

হঠাৎ এই সুখের ছেদ পড়ল। কোত্থেকে এসে সরোবরের কাছেই এক গর্তে ঘর বানাল এক শঙ্খচূড় সাপ। তার দাপটে কেউ সরোবরের জল স্পর্শ করতে পারে না। এলেই ফোঁস ফোঁস করে তাড়া করে যায়। আগে হাঁসদের ডিম পড়ে থাকত ঝোপে, জঙ্গলে। শঙ্খচূড় আসার পর সে খেয়ে সাবাড় করে দিত। হাঁসরা বাধা দিতে এলে ছোবল মেরে শেষ করে দিত। শঙ্খচূড়ের দাপট বেড়ে গেল অপরিসীম। সরোবরের কিনারায় ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে বেড়াত সে।

একদিন এলো এক হাতীর দল সরোবরে জল খেতে। শঙ্খচূড়ের তাড়া খেয়ে ভয়ে পালাল হাতির দল। তারপর এল ভালুক। সে-ও জল খেতে সাহস করল না। এরপর এলো নেকড়ে। সে প্রথমে লম্ফ ঝম্ফ করল। কিন্তু সেও জল না খেয়ে পালাল। সকলের শেষে এলো বনের রাজা বাঘ। শঙ্খচূড় তাকেও জল খেতে দিল না। সেও চলে এলো।

এবার শঙ্খচূড় বুক ফুলিয়ে দর্প করে বেড়াচ্ছে। বনের রাজাই যদি ভয় খায়, শঙ্খচূড় তবে আর কাকে ভয় পাবে? তার অত্যাচার দিন দিন বেড়ে গেল।

এদিকে শঙ্খচূড়ের তাড়া খেয়ে বাঘ মহা ভাবনায় পড়ল। ভেবে ভেবে শেষে বেজীর কাছে গিয়ে হাজির। তখন সবে সন্ধ্যে। বেজী খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

এমন সময় কে যেন মোটা গলায় তাকে ডাকছে,—

বেজী ভাই, বেজী ভাই—
ঘুমিয়ে গেছ নাকি?

বেজী বিরক্ত হয়ে বললে,

কে ডাকে এই অসময়ে।
বলি, ব্যাপারটা কি?

আমি বনের রাজা বাঘ।

বাঘের নামে বেজী ব্যস্ত হয়ে উঠল। গর্ত হতে মুখ বার করে বেজী বললে, 'আমায় ডাকছেন কেন মহারাজ?'

বাঘ বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বেজী ভাই।

বেজী বললে—'হুকুম করুন মহারাজ'?

বাঘ বলল, সরোবরের ধারে এক শঙ্খচূড় এসে বাসা করেছে। ওর জ্বালায় কেউ সরোবরের জল খেতে পারে না। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও, ভাই। নয়তো আমার রাজ্য টল্‌মল্।

বেজী বললে—'কালই ওর ব্যবস্থা করব, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কথা দিচ্ছি'।

বাঘ চলে গেল খুশী হয়ে।

পরদিন। ভোর হতেই বেজী ছুটল সরোবরের দিকে। শঙ্খচূড় তখন বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিল। বেজী দেখে থমকে গেল। বললে,—কে তুই?

বেজী বললে—'তোর যম!'

বেজীর কথা শুনে শঙ্খচূড় হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। বললে,—জানিস আমি কে? আমি শঙ্খচূড়, সাপের রাজা। এক ছোবলে যাবি তুই যমের বাড়ীতে।

বেজী বললে, 'ইল্লি! দে'না ছোবল। মজা দেখাই।

শঙ্খচূড় বললে ও, লড়াই করবি? হাঃ হাঃ হাসি পাচ্ছে। তোর কথা শুনে। তারপর সুর করে বল্লে,

'হাতি, ঘোড়া হল তল,
মশা বলে কত জল!"

বাঘ, ভালুকই ভয়ে পালাল—এখন তুই করবি লড়াই?

'বাজে বকিস না', বেজী ধমক দিয়ে উঠল, শঙ্খচূড়কে।

শঙ্খচূড় বুক ফুলিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল। বললে—তবে মর তুই। বলেই, শঙ্খচূড় ছোবল ছুঁড়ে মারল বেজীকে। বেজী কিন্তু আগে থেকেই সতর্ক ছিল—সাঁ করে পিছনে সরে গিয়ে লাফ দিল।

শঙ্খচূড় ভীষণ খেপে গেল। কিন্তু মাথা তুলবার আগেই বেজী শঙ্খচূড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার ধারাল নখ দিয়ে শঙ্খচূড়ের মাথাটা ফালি ফালি করে দিল। রক্তে ভেসে গেল মাটি। শঙ্খচূড় নেতিয়ে পড়ল। ফোঁস ফোঁসানি বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের তরে।

বেজী বললে—কি ভাই শঙ্খচূড়? অত দর্প গেল কোথায় এখন? শেষে কিনা মশার হাতেই যমের বাড়ী চলে গেলে? বলেই ধারালো দাঁত দিয়ে শঙ্খচূড়কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দিয়ে চলে গেল। বন নিরাপদ্ হল। বাঘের রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এলো।

বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে
পড়েছে জোর সাড়া।
কচিকাঁচা পড়ল স'রে
খেয়ে বিষম তাড়া।
লাফিয়ে উঠে ঘোৎনা বলে
'বন্দুকটাই আনি,
এক গুলিতেই বাঘ বাবাজীর
ভাঙবো পাঁজরখানি।'

বন্দুকটা নিয়ে এসেই
করতে গেল তাগ—
ঘোৎনা অবাক, বাঘ কোথা এ?
এ যে খোদন বাগ!

আরমানের ঘুম

তরুণকুমার রায়

ছোট্ট ছেলে আরমান। রাতের অন্ধকারে ঘরের এক পাশে সে শুয়ে আছে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। এ পাশ ওপাশ করে আরমান ঘুম আনার চেষ্টা করছে। তবু ঘুম আর আসে না।

ব্যাপারটা টের পেলো আরমানের দাদু। সে আরমানের পাশের খাটে শোয়া অবস্থায় নাতিকে সম্বোধন করে বলে উঠল—

—"কি দাদুভাই—রাত তো অনেক হলো, এখনো ঘুমোয়নি কেন?" আরমান ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, "কিছুতেই যে ঘুম আসছে না, দাদু"।

দাদু বললো, "শুয়ে শুয়ে এক থেকে হাজার পর্যন্ত গুণেছিলে"?

আরমান বললো "তাতে একটুও ঘুম আসে নি"।

—তাহলে তোমার চোখ থেকে ঘুম সত্যিই পালিয়ে গেছে?

—ঘুম আবার পালিয়ে যায় না কি'?

দাদু হো হো করে হেসে উঠে বল্লো, "পালায় বৈ কি? নিশ্চয়ই পালায়।"

—'তাহলে এখন কি হবে'? —আরমান করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

দাদু একটু হেসে বল্লো, কি আর হবে উঠে পড়ো। চলো আমরা দু'জনে মিলে ঘুম যেখানে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসি।"

আরমান ও তার দাদুটি এরপর বিছানা ছেড়ে ঘুমকে খুঁজতে বেরুলো। হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা এসে পৌঁছালো বাড়ীর পেছনের বাগানে। সেই বাগানে কয়েকটা বেশ বড়ো-সড়ো কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিলো। দাদু ঐ কাঠের গুঁড়িগুলো আরমানকে দেখিয়ে বল্লো, "দাদুভাই' ঐ কাঠের গুঁড়ির ভেতরেই তোমার ঘুম লুকিয়ে আছে। এবার আর ঘুম বাছাধন পালাতে পারবে না"। দাদুর কথায় আরমান তো একেবারে থ।

—আরমানও নেহাৎ বোকা নয়। সে ঐ কাঠের গুঁড়িগুলো দেখিয়ে বল্লো, "কোন গুঁড়িতে ঘুম লুকিয়ে আছে তা কি করে বোঝা যাবে?"

আরমানের এই প্রশ্নের উত্তরে দাদু মুচকি হেঁসে, তাঁকে একটা কুড়ুল নিয়ে আসতে বল্লো।

খানিক বাদেই আরমান একটি কুড়লি হাতে মাঠে হাজির। বুড়ো দাদুর কথামতন ছোট্ট ছেলে আরমান একে একে সব কাঠের গুঁড়িগুলোকেই কেটে দু'খণ্ড করলো। কিন্তু কোনটার মধ্যেই ঘুমকে আর খুঁজে পাওয়া গেলা না। তখন দাদু বল্লো, "ঘুম কাঠের গুঁড়ির ভেতর যখন নেই, তখন এই বাগানের ভেতরেই কোথাও আছে।" সে আরমানকে কুয়ো থেকে বালতি করে জল আনতে বল্লো। আরমান দাদুর কথামতন কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে আনলো। আর ঐ জল বাগানের সমস্ত গাছ এর গায়ে ছিটোতে শুরু করলো।

দাদু আরমানকে এই কাজে খুব উৎসাহ দিতে লাগলো। সে বল্লো, "এই-ভাবে জল ঢালতে ঢালতে, ঘুমের গায়ে যেই জল পড়বে সে তখন বাগান ছেড়ে পালিয়ে তোমার চোখে আশ্রয় নেবে।" দাদুর এই কথায় আরমান দৌড়ে দৌড়ে কুয়ো থেকে জল তুলে বাগানে ছিটোতে লাগলো। দাদু বাগানের এক কোণে চুপটি করে বসে নাতির কাজ দেখে মনে মনে হাসতে থাকলো। এমনিভাবে বাগানে জল ছিটোতে ছিটোতে একসময় চাঁদমামা অস্ত যাবার উপক্রম হল। আকাশের পূর্বদিকটা একটু যেন লালচে হয়ে আসছে।

আর ছোট্ট ছেলে আরমান? সেও রাতের শেষে দাদুর সঙ্গে ঘরে ফিরলো। ঘুমকে হাতে ধরা গেল না ঠিকই কিন্তু ঘরে ফিরেই আরমান কয়েকটা হাই তুলে দাদুকে বল্লো, "দাদু আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি—আমার এখন দারুণ ঘুম পাচ্ছে।"

—এই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আরমান বিছানায় শুয়ে পড়লো, আর মুহূর্তের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আরমানের কাছে ঘুম এতোক্ষণে সত্যিই ধরা পড়লো। আরমান ঘুমলো। গভীর ঘুম।

ঘুমন্ত আরমানের কানের কাছে মুখ নিয়ে দাদু নিয়ে বল্লো, "শুনছো দাদুভাই, ঘুম কি তাহলে তোমার বালিশের তলাতেই লুকিয়েছিলো?"

আরমান কিন্তু দাদুর এই কথা শুনতে পেল না। তবে সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো যে, ঘুম যেন তাঁকে বলছে, "অলস মানুষের কাছে আমি ধরা দিই না। যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতে ভালোবাসে আমি তাঁদের কাছেই আগে যাই।"

"তুমিও সারারাত দাদুর কথামতন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছো বলেই, এখন তোমার কাছে ধরা দিলাম। ভবিষ্যতেও যদি এমন যারা পরিশ্রম করতে পারো, তবে ঘুমকে ধরে আনার জন্য এতো ঝামেলা করতে হবে না, তোমাকে। সে আপনিই তোমার কাছে আসবে।"

আরমান স্বপ্ন দেখা শেষ করে, পাশ ফিরে শুয়ে আরো গভীরভাবে ঘুমাতে লাগলো।। [রুশ উপকথা অবলম্বনে]

প্রতিদান

যূথিকা রায়

সেদিন সোমার বড়দা সোমাকে সুন্দর একটা কলম এনে দিলেন। ভারী সুন্দর। কালো কুচকুচে কলমটার গায়ে সোনালী বুটি ঝকমক করছে। সকলের ভালোলাগার সঙ্গে রামুও তাল দিলো।

রামু সোমাদের বাড়ির ক্ষুদে চাকর। খুঁটিনাটি কাজ করে—। বোকা বোকা চেহারা। চোখ দুটো মায়াময়। তাই বলে কিন্তু ওর প্রতি কারুর মায়া নেই। না হলে দেখোনা বাড়িশুদ্ধ লোকে সোমার কলমটা নিয়ে নাচানাচি করল —আর দোষ হল রামুর বেলায়।

ভর দুপুরে সকলে যখন নিঝুম মেরে আছে, তখন রামু তার ক্ষুদে দিদিমণি সোমাদিদির টেবিলে বসে সেই সোনালী বুটিদার কলমটা দিয়ে সবে মাত্র আঁকা-বাঁকা অক্ষরে নিজের নামটা লিখতে শুরু করেছে—আর কোথায় ছিলো সোমা, ছুটে এসে রামুকে আবিষ্কার করে হাতে তালি দিয়ে নাচতে শুরু করলো। রামু তো ধরা পড়ে লজ্জায় লাল। পালাতে যাচ্ছিলো রামু। কিন্তু সোমা ছাড়বার পাত্রী নয়। বললো,—

—পালালে হবে না মশাই। বড়দার ঘরে চলুন। আমার টেবিলে বসে লেখা। সুন্দর কলমটা যদি খারাপ হয়ে যেতো?

রামু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলো সোমা বড়দার কাছে।

—দেখো, দেখো বড়দা—তোমার নদের নিমাইয়ের কাণ্ড। আমার কলম দিয়ে টেবিলে বসে নিজের নাম লেখা হচ্ছিলো।

বড়দা রামুর গালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মেরে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনী দিতে দিতে বললেন,—

কী, রামু বাবু? খুব দেখি শখ। চাকরের আবার এতো ইচ্ছে থাকবে কেন? কোন সাহসে টেবিলের ওপর হাত দিস রে হতভাগা? সোমার জিনিসপত্রে আর হাত দিবি?

রামু ঘাড় নেড়ে জানালো,—'না'।

রামুর দু'চোখে জল। সেদিকে তাকিয়ে উল্লাসে সোমা চেঁচিয়ে উঠলো,—

—এমা। গবুচন্দ্র আবার কাঁদছে দেখো?

তারপর রামু অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো, কেউ এলো না ভোলাতে। ওর যে কেউ নেই।

* * *

বিকেল বেলা পাশের বাড়ির বাগানে ঢালাও অর্ডারে পেয়ারা পাড়ছিলো পাড়ার ছেলেরা। ছাদের ওপর উঠে তাই দেখছিলো সোমা। একবার ইচ্ছা হচ্ছিলো ছুটে গিয়ে ও খুশী মতো পেয়ারা পেড়ে খায়। কিন্তু তার উপায় নেই। তা হলে বড়দা বকবে।

হঠাৎ সোমা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো—ওদের রামুও গাছে উঠেছে। নধর, সতেজ ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা ছিঁড়ছে আর সার্টের পকেটে ঢোকাচ্ছে। আশ্চর্য। বড়দা বকবে, একটুও ভয় নেই ছেলেটার। বাহাদুরী করে গাছে উঠেছে! দাঁড়াও, আবার ওকে আমি মার খাওয়াবো আচ্ছা রকম!

ছাদ থেকে নেমে আসতেই রামুর মুখোমুখি হলো সোমা। রামু হাঁপাচ্ছে। তার মাথার চুলে তখনও শুকনো পেয়ারাপাতা পড়ে রয়েছে। দুহাতে কয়েকটা ডাঁশা পেয়ারা নিয়ে সোমার দিকে ধরে বলে,—নাও, তোমার জন্যে নিয়ে এলাম। তুমি তো যেতে পারবে না?

—কী করে জানলি, আমি পেয়ারা ভালোবাসি?

—আমি জানি তোমার মতো দুষ্টুরা এসব ভালবাসে। আমি চাকর না হলে দুষ্টুমি করে এসব খেতাম। এখন আর আমার দুষ্টুমি সাজেনা। আমি ছোট ছেলে হলেও চাকর তো?

—সে বলেই সোমা দু'হাত পাতলো।

হঠাৎ সোমার দুচোখ জলে ভরে এলো। কিছুক্ষণ আগের অপমান এবং মারের কথা ও মনেও রাখেনি। বড়দার পুষ্ট হাতের চড়ের দাগগুলি রামুর নরম গালে আরো যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য! যার জন্যে ও অপমানিত হয়েছে—মার খেয়েছে, তারই জন্যে পেয়ারা কষ্ট করে পেড়ে এনেছে। রামুর কাছে কত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর আর নীচ।

সাপ পুষত ডাইনী বুড়ী
হরেক রকম জাত,
ভেবেছিল সাপ খেলিয়ে
করবে আসর মাত।
ডাইনী বুড়ী জানত জাদু
ভানুমতীর খেলা,
'লাগ ভেল্কি' বলেই ছুড়ে
মারত ইঁটের ঢেলা।
গাঁয়ের লোকে দৌড়ে যেত,
আছড়ে পড়ে বিষম খেত,
হিসহিসিয়ে হাসত তখন
গোখরো যত চেলা।
ডাইনী বুড়ীর জাদু কাঠির
এমি ছিল গুণ,
ছুঁইয়ে দিলে জ্যান্ত মানুষ
অমনি হত খুন।
কিন্তু বুড়ীর পুষ্যিগুলো
দস্যি এক-একজনা,
ওদের মধ্যে ছিল নাকো
মতের বনিবনা।
ঝগড়া ঝাটি থাকত লেগে,
ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ করতো রেগে,
ডাইনীটাকেই মারলো ছোবল
তুলে ভীষণ ফণা।

কবির ভাগ্য

প্রফুল্ল ঘোড় রায়

না, এমন করে আর চলে? মাথার ওপর চাল পড় পড়। নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতো নয় কেবল, পান্তাই জুটছে না আজকাল। তখন নটবরের স্ত্রী নটবরকে ধরে পড়লো হ্যাঁ গা, তা যাওনা একবারটি রাজার কাছে—রাজা কি আর তোমার গুণ বুঝে আমাদের যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন না?

—তা, নটবরকে গুণীই বলতে হয়—কেন না মুখে মুখে কবিতা বানাতে পারে। পাড়াতে ত তাকে সবাই কবিই বলে। তবে কেউ কেউ যে কপিও বলে না তা অবশ্য নয়—আড়ালে আবডালে তাও বলে। তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আড়ালে আবডালে সকলেই ত সকলের সম্বন্ধে অমন বলেই থাকে।

শেষে নটবর রাজার কাছে যাবে বলে সাব্যস্ত করল। সাব্যস্ত ত করল—কিন্তু কি পরে যাবে—তার সব জামা কাপড়ই তো ছিঁড়ে একশা হয়ে গেছে। শেষটায় নটবরের স্ত্রীই এ সমস্যার সমাধান করে দিলে। কোথা থেকে খুঁজে পেতে যাহোক একটা ধুতি চাদর জোগাড় করে এনে নটবরকে পরিয়ে দিল। তা, সাজ গোজ বড় মন্দ হল না। কিন্তু বিসমিল্লাতেই যে গলদ। রাজার কাছে যাচ্ছে কিন্তু কবিতাই ত রচনা করা হয় নি। ওতে আটকাবে না—যেতে যেতে মুখে মুখে বানিয়ে নিলেই হবে। এই না ভেবে দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করল।

প্রসন্ন প্রভাত কাল সকাল বেলাটা বড় সুন্দর বড় আলো ঝলমল। যেতে যেতে যা-ই দেখে তাতেই তার চিত্ত আনন্দে ভরে ওঠে। তাত হলো—কিন্তু কবিতা-ত হয়ে ওঠে না। নটবরের চিত্তের সুখ দূর হলো। এমন সময় দেখে কি একটা মৃত গরুর কঙ্কাল। কঙ্কালের মাথার মধ্যে চোখের ফোকলে একটা পাখী বাসা বেঁধেছে। বা! ভারি মজাত। আঁখির মধ্যে পাখীর বাসা। আরে! এ যে দেখছি কবিতার একটি ছত্র হয়ে গেল—কি না, আঁখির মধ্যে পাখীর বাসা—হোক না একটি ছত্র। তবু কবিতা-ত বটেই। নটবরের চিত্তে আনন্দ আর ধরে না। হবে, হবে আরো—অনেক হবে।

নটবর চলতে লাগল। রাস্তার দু'ধারে তৃণ গুল্মের এক বিচিত্র সমারোহ। আরে আরে এ যে ভারি মজা দেখছি। দুর্বাদলের ওপর শিশির বিন্দু—ঠিক যেন, ঠিক যেন, হ্যাঁ, নটবরের মনে আর একছত্র কবিতার উদয় হল জলকে দিয়েছে শালে।

তাহলে এতক্ষণে নটবরের দু'লাইন কবিতা হলো—

আঁখির মধ্যে পাখীর বাসা,
জলকে দিয়েছে শালে।

নটবর মনে মনে কবিতার দুটি ছত্র আওড়াতে আওড়াতে এগোতে লাগল। যেতে যেতে নটবর দেখে সামনে এক নদী। তা, নদীর তীর ধরেই নটবর এগোতে লাগল, এমন সময় দেখে কি নদীর ধারে কার যেন একটা তক্তপোষ। নটবর তক্তপোষটা লক্ষ্য ক'রে দেখছে। এমন সময় হবি ত হ নদী থেকে এক মাছ ধপ করে এসে তক্তপোষের ওপর পড়ে লাফাতে লাগল। ভারি মজার ব্যাপার ত'। কিন্তু বেশিক্ষণ মাছটা লাফাতে পারল না। কোথা থেকে এক শিকারী বাজ এসে ছোঁ মেরে মাছটাকে নিয়ে এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। এই না দেখে নটবরের মনে আবার কবিতার উদয় হ'লো। নটবর মনে মনে বানিয়ে ফেল্লো,

চৌপাইয়ার ওপর নেপাইয়া নাচে
দু'পাইয়া নিল ডালে।

—চৌপাইয়া মানে চার পেয়ে তক্তপোষটা চারপেয়ে ছিল কিনা? আর মাছের-তো পা নেই, তাই নিপেয়ে। বাজ পাখীটার দু'পা সুতরাং দু' পেয়ে। তা, মন্দ হলো না। শেষের দু'ছত্রের সঙ্গে আগের দু'ছত্র মিলিয়ে বেশ চারছত্র হলো:

আঁখির মধ্যে পাখীর বাসা
জলকে দিয়েছে শালে,
চৌপাইয়ার ওপর নেপাইয়া নাচে
দু'পাইয়া নিল ডালে।

—তা, চারটি ছত্র হলো, যাহোক, নটবর ভাবলো। তারপর মাছটার কি গতি হলো—দেখবার জন্য বাজ পাখীটা যে গাছের ওপর গিয়ে বসেছিল সেইদিকে তাকাল। দেখে কি বাজ পাখীটা মাছটি আহারে প্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে গাছের খোড়লে আটকানো বৃষ্টির জলও খেয়ে নিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে নটবরের মনে আবার কবিতার উদয় হলে। নটবর মনে মনে রচনা করে ফেল্লো,

ঘস ঘসাতং ঘস ঘসাতং
উৎকলের পানি,
তার পরেত মারদেঙ্গা
তাতো আমিই জানি।

সব সুদ্ধ তাহলে মন্দ দাঁড়াল না। আটটি ছত্র কম কি? গোটা কবিতাটা নটবর মনে মনে আর একবার আওড়ালো,

আঁখির মধ্যে পাখির বাসা
জলকে দিয়েছে শালে;
চৌপাইয়ার ওপর নেপাইয়া নাচে,
দু'পাইয়া নিল ডালে।
ঘস ঘসাতং ঘস ঘসাতং
উৎকলের পানি,
তারপরে ত মারদেঙ্গা
তাতো আমিই জানি।

মনের মত কবিতা রচনা করে নটবরের মনে আনন্দ আর ধরে না। এবার আর তাকে পায় কে? রাজা এ কাব্য শুনে খুসী না হয়ে পারবেন কি? এইরকম ভাবছে আর এগোচ্ছে। ততক্ষণে নটবর রাজবাড়ীর কাছাকাছি ও এসে পড়েছে।

আরে ঐ ত রাজার সেই সোনার গোম্বুজ। ঐ ত' রাজবাড়ীর সিংহদ্বার। দ্বারে সব ইয়া বড় গোঁফওয়ালা দ্বারীরা বসে গোঁফে তা দিচ্ছে।

ঐ অতবড় রাজবাড়ী আর ঐ অতবড় গোঁফওয়ালা সব দ্বারীদের দেখে ত নটবরের আক্কেল গুড়ুম হবার দাখিল। একবার ভাবলে কাজ নেই বাপু আর রাজবাড়ীটাড়িতে গিয়ে। এখন পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। আবার ভাবলে এতদূরে এসেছি এমন করে ফিরে

বিশ টাকা কিলো মাছ?
দর বেশ কন্ যে।
তার চেয়ে চ'লে যাই
ফরবেশগঞ্জে।
দর নিয়ে দোকানীরা
সেখানে বকায় না—
সস্তায় মাছ দেয়,
ওজনে ঠকায় না।
তার পরে পচা মাছে
বোলায় না রঙ,—
ফাউ দেয় হাসিমুখে,
হয় না বিরক্ত।
নদী থেকে মাছ তুলে
সাথে সাথে বিক্রি
করে তারা, থাকে যারা
ফতেপুরসিক্রি।
মাছের বাজারে কেউ
হয় না ব্যাজার—
দাম দিতে হয় নাকো
মুড়ো ও ল্যাজার।
সেখানেই যাওয়া যাক্,
পাব মাছ সস্তায়—
বেশী দরে মাছ কিনে
বলুন কে পস্তায়॥

গেলে সে বড় কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে। বিশেষত এমন খাসা কবিতাটি রাজাকে না শুনিয়ে গেলে ওটি মাঠে মারা যাবে। তা নটবরের ভাল মানুষ, ভাল মানুষ চেহারা দেখেই হোক বা দ্বারীদের মনমেজাজ ভাল ছিল বলেই হোক তারা নটবরকে নিয়ে আর মেলা ঝামেলা করলে না। ভেতরে একেবারে রাজার খাস মহলে পাঠিয়ে দিল। ভেতরে ঢুকেত নটবরের চক্ষুস্থির। নটবর হচ্ছে গাঁয়ের মানুষ নিতান্ত গেঁয়ো—রাজবাড়ীর যতসব ইলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ ত হবেই।

এদিকে হয়েছে কি রাজামশাই তখন বসেছেন দাড়িকামাতে। পরা মাণিক জল নিয়ে রাজামশাইয়ের মুখে ঘষছেন—ক্ষুর লাগাবার আগের প্রস্তুতি হিসেবে।

এমন সময় গুটি গুটি করে নটবর এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। এ আবার কে?

কে তুমি?

আজ্ঞে নটবর।

তা, হ্যাঁ, নটবর এখানে কি মনে করে?

মহারাজকে কবিতা শোনাতে এসেছি।

বল কি, তুমি কবি?

লজ্জায় নটবর আর রা করতে পারল না—অধোবদন হয়ে রইল। তা বেশত' শুনি তোমার কবিতা, কামাতে কামাতে। বেশ আরম্ভ কর। নরসুন্দর ততক্ষণে রাজার মুখখানি বেশ আচ্ছা করে ভিজিয়েছে এবং ক্ষুরও উদ্যত করেছে—এমন সময় নটবর তার কবিতা শুরু করলে,—

আখির মধ্যে পাখীর বাসা,
জলকে দিয়েছে শালে;
চৌপাইয়ার ওপর নেপাইয়া নাচে;
দু'পাইয়া নিল ডালে।
ঘস ঘসাতং খস খসাতং
উৎকলের পানি।
তারপরে ত মারদেঙ্গা
তাতো আমি জানি।

এদিকে হয়েছে কি নরসুন্দর লোকটি ছিল অতি ধূর্ত সে রাজবাড়ীর আরও কারো কারো সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে রাজাকে বধ করে সিংহাসনে রাজা হয়ে বসবার। ঠিক করে ছিল আজই কামাবার সময় রাজাকে হত্যা করবে ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে। নটবর যেই না বলেছে,

ঘস ঘসাতং খস খসাতং
উৎকলের পানি,
তারপরে ত' মারদেঙ্গা
তাতো আমি জানি।

অমনি নাপিত ভাবলে—এইরে সেরেছে, আমার গুপ্ত ষড়যন্ত্র ত ফাঁস হয়ে গেছে। মনের পাপত আর চেপে রাখা যায় না।' তা বার হবেই। তার পরে নাপিত ক্ষুরটুর ফেলে দিয়ে সটান রাজার পায়ে পড়লো। দোহাই মহারাজ। ক্ষমা করুণ, আমার কোন দোষ নেই। রাজা ত' সব শুনে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

তারপর নটবরের সেকি খাতির। নটবরের স্ত্রীরইবা কী সুখ। এই না হলে কি আর কবি? হায়রে সে রাজরাজড়ার দিন, এবং সেই নটবরদের দিন আজ কোথায় গেল?

ছড়া

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

বেড়াল

মিঁউ মিঁউ, ম্যাঁও ম্যাঁও
নাম তোর পুসি;
দুধ-মাছ ভাত পেলে;
খুব তুই খুশী।
মাঝে মাঝে মারি তোকে
তবু ভালোবাসি;
হাজার হলেও তুই
বাঘেদের মাসী।

হাস

প্যাঁক-প্যাঁক, প্যাঁক-প্যাঁক
জলে কেন যাস?
শামুক গুগ্‌লি-গেঁড়ি
তুই বুঝি খাস?
যাবি নাকি মোর সাথে
আমাদের বাড়ি?
খেতে দেবো ডাল ভাত
মাছ তরকারি।

মহাকাশজয়ী রকেট

মানুষ পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে উড়তে চেয়েছিল এক। রাইট ব্রাদার্স মানুষের এই আকাশচারী হওয়ার দুরন্ত কল্পনাকে এ রূপ দিলেন। উড়োজাহাজ—মানুষ সত্যি সত্যিই আকাশে মেলে উড়ল।

কিন্তু মানুষের দুর্বার দুরন্ত হবার কিছুতেই মেটে না। শব্দের দ্রুতগামী হয়েও সে চাইল আরও। চোখের নিমেষে ছুটে যেত থেকে গ্রহান্তরে।

বিজ্ঞানী রকেট তৈরীর সাধনা করলেন। কতদিন আগে যে সাধনার শুরু, কোন্ দেশ যে এ ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী হল, তা নিয়ে বাদের শেষ নেই। তবে যা পুঁথি-পত্তর ঘেঁটে যা জানা তাতে অধিকাংশের মত চীন এ ব্যাপারে প্রথম পথ প্রদর্শক। নাকি ১২৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করে কাইফুংফুতে জালদের সঙ্গে যুদ্ধে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে টের পরিকল্পনা আরও অনেক এগিয়ে যায়। রুশ বিপ্লবী নিকো- কিবালচিক কারাগারে অন্তরীণ য় মনুষ্যযাত্রীবাহী রকেটের নকশা তৈরী করেন। জার য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার ত্র লিপ্ত থাকায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কারাগারে করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের সরকার ওটা হস্তগত করেন। থেকে রকেট নিয়ে চিন্তা জোর শুরু হয়ে যায়।

রুশ বিজ্ঞানী জিওলকভস্কি লিখলেন যুগান্তকারী প্রবন্ধ : 'এক্সপ্লোরেশন অব স্পেস বাই রকেট ডিভাইসেস—অর্থাৎ রকেটের সাহায্যে মহাকাশে অভিযান। তিনি রকেটে তরল জ্বালানীর কথা বলেন। এতে উত্তাপের প্রচণ্ডতা যাবে বেড়ে, রকেট অনেক বেশী দ্রুতগতিতে চলবে। বহুস্তর বিশিষ্ট রকেটের পরিকল্পনাও করে যান। মহাকাশ বিজ্ঞানে জিওলকভস্কি তাই একটি অবিস্মরণীয় নাম।

প্রথম মহাযুদ্ধের রণদামামা থেমে গেলে আবার শুরু হয় রকেট নিয়ে গবেষণা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ।

একটা প্রবন্ধ বেরুল কাগজে। 'রকেট : এ মেথড অব রিচিং এক্সিট্রিম অল্টিচুড্স'—রকেট : অতিদূর উচ্চে যাওয়ার একটি ব্যবস্থা।' প্রবন্ধকার বললেন এই রকেটই মানুষকে একদিন চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে পৌঁছে দেবে।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন প্রবন্ধটা পড়ে। নোতুন ক'রে আঁক জোক কষা, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো শুরু হ'ল। তবে অনেকে বললেন : লোকটাকে নিশ্চয়ই চাঁদে পেয়েছে। মাথায় গোলমাল তাই আবোল তাবোল বকছে।

এই "পাগল" বলে খ্যাত বিজ্ঞান সাধকটি কে, জানো? আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত রকেট বিজ্ঞানী ডঃ হাচিংস গডার্ড। চাঁদে রকেট পাঠাবেনই—এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছে। অধ্যাপনা করতে করতে রকেট তৈরীর ব্যাপারে গডার্ড অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। এই সময় জার্মান বিজ্ঞানী হেরম্যান ওবার্থ লিখলেন : 'রকেটে অন্তর্গ্রহ যাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। ১৯২৯ সালে ডঃ গডার্ডের তৈরী রকেট শূন্যে উঠল।

বাপরে। কী ভীষণ শব্দ সে রকেটের। যেন আশে পাশে শত শত বোমা ফাটছে। লোক ভয় পেয়ে ছুটে এল। আগুন লেগেছে ভেবে দমকল বাহিনী ছুটে এল পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে। লোকে বিরক্ত হ'ল পাগলের এই কীর্তিকলাপে। উপহাসে বিদ্রূপে ফেটে পড়ল।

বাজারে পথে-ঘাটে কোথাও বেরুবার জো নেই। তাঁর গবেষণাগারের চারপাশেও কয়েকটা গোয়েন্দা চোখ অনবরত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্যান্যোপায় হ'য়ে ডঃ গডার্ড কিছু সহকর্মী নিয়ে নিউ মেক্সিকোতে চলে এলেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। মে মাস। আবার আকাশে রকেট উৎক্ষিপ্ত করলেন গডার্ড। রকেটটি লম্বায় ছিল পনের ফুট, ওজনে পঁচাশি পাউণ্ড। মাটি থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেল সেই রকেট। গতি ঘণ্টায় প্রায় সত্তর মাইল।

এতদিনে ডঃ গডার্ডের নিরলস সাধনা সার্থক হ'ল। তবুও তৃপ্ত হতে পারলেন না ডঃ গডার্ড। রকেটকে আরও, আরও ওপরে তুলতে হবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিন্ন ক'রে তাকে ঠেলে তুলতে হবে গ্রহান্তরের ঠিকানায়। সমস্যা দেখা দিল জ্বালানীর। গডার্ড অন্যান্য রকেট বিজ্ঞানীদের মত গ্যাসোলিন, ন্যাট্রিক অ্যাসিড, তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেনের কথা ভাবলেন। বললেন : মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন ছিন্ন করতে হলে একটা রকেটে হবে না, একের পর একটা সারি সারি রকেট জুড়ে তৈরী করতে হবে বহুস্তর বিশিষ্ট রকেট। প্রথমটা জ্বলে নিঃশেষিত হ'য়ে খসে পড়ার আগে দ্বিতীয়টিকে জ্বালিয়ে দেবে। দ্বিতীয়টি অনুরূপভাবে তৃতীয়টিকে, তৃতীয়টি চতুর্থটিকে। এক একটা ল্যাজ খসবে আর রকেটটা ট্রাক ঠিক রাখার জন্যে একটু একটু

মোড় ঘুরবে। এইভাবে চলবে।

ডঃ গভার্ড কিন্তু বেশীদিন গবেষণা চালাতে পারলেন না। তাঁকে সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে হয়। রকেটের কাজ তাই মাঝ পথেই থেমে যায়। ১৯৪৫ সালে তিনি মারা যান।

আজ মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আরো অনেক উন্নতি হয়েছে। মানুষ রকেট চড়ে চাঁদে গিয়ে নেমেছে, চাঁদ থেকে কুড়িয়ে এনেছে নুড়ি পাথর। অ্যাপোলো ১১ র তিন মহাকাশচারী ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে চাঁদের মাটিতে প্রোথিত ক'রে এলেন মানুষের চন্দ্রলোক-জয়ের যুগান্তকারী বাণী।

সত্যিই বর্তমান যুগ মহাকাশ জয়ের যুগ। মহাকালের গর্ভে যেন সেই শুভদিনটি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে, যে দিন অকুতোভয় অভিযাত্রী মানুষ চাঁদের তৃষিত মরুবুকে আপন কলোনী গড়ে তুলবে, চাঁদের মানমন্দির থেকে পৃথিবীতে, গ্রহে গ্রহান্তরে সুখ দুঃখ, আনন্দবেদনার বার্তা বিনিময় করবে। চাঁদের জানালায় দাঁড়িয়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের দিকে তাকিয়ে অনুসন্ধিৎসু মানুষ একদিন বলবে: 'ওগো মহাশূন্যের ভ্রাম্যমাণ আলোক পথিকের দল আমরা তোমাদের জেনেছি, তোমাদের খবর পেয়েছি।'

ছড়া

হিরন্ময় রায়

মজার মানুষ বটে
অপরূপ মামা,
ভুলেও কখনো গায়ে
দেন নাকো জামা।
মুগুর ভাঁজেন ভোরে,
থামে না, শুধুই ঘোরে,
তিনি নাকি হতে চান
পালোয়ান গামা।
গ্যাঁট হয়ে বসে খান
আদা গুড় ছোলা,
দেন না কাউকে তিনি
ভাগ এক তোলা।
আমি থেকে পিছে খাড়া,
কাক পক্ষী করি তাড়া,
জিভে জল এসে করে—
সক্ সক্ নোলা।

ফেলে আসা দিন

পারুল ঘোষ

সদর হাসপাতালের ভার নিয়ে সমীর সরকার যেদিন মেদিনীপুর এল, সেদিন বার বার মনে পড়তে লাগল তার মায়ের কথা। হাসপাতালের বড় ফটকটা পার হতে গিয়ে তার বুক ভেঙে কান্না ঠেলে আসার মত হল। সবার অলক্ষ্যে চোখ দু'টো মুছে সে গিয়ে বসল অফিস ঘরের টেবিলে।

বিদায়ী ডাক্তার প্রসন্ন মুখার্জী তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। বললেন, আপনি কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, এই বয়সেই দেশে বিদেশে নাম করেছেন। আপনার হাতে হাসপাতালও উন্নতি করবে, কর্মচারীরাও সুখী হবেন, এই আশা নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।

সমীর তাঁর দু'টি হাত ধরে বলল, আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি। এখানে এসেও শুনলাম, আপনিই এই হাসপাতালের সংগঠক। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, আপনার সৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে।

এরপর কর্মচারীরা একে একে এসে নূতন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করতে লাগলেন। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, চতুর্থবর্গের কর্মচারী সকলকেই সস্প্রীতি নমস্কার জানালেন নূতন ডাক্তার। বললেন, আপনাদের সকলের সাহায্য পেলে অবশ্যই আমি কিছু সেবা করতে পারব এই জেলাবাসীর। আপনাদের জন্যেও আমার যতটুকু সাধ্য, তা করতে···

হঠাৎ ঐ দলের ভেতর থেকে একটি যুবক, নাম প্রাণতোষ, এগিয়ে এসে বললে—স্যার, আপনি এই মাত্র এসেছেন বলতে খুবই লজ্জা হচ্ছে আমার, কিন্তু না বলেও পারছি না। আমার মাকে যদি আপনি একবার দয়া করে দেখতেন। মা বোধহয় আর বাঁচবে না।

সমীর বলল, না না, কুণ্ঠার কিছু নেই। আমরা ডাক্তার। আমাদের তো সময় অসময় নেই। কাল সকালেই দেখতে যাব আপনার মা আমার কোয়ার্টারে এসে নিয়ে যাবে আপনি। কি হয়েছে তাঁর?

প্রাণতোষ সংকুচিত কণ্ঠে ব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জ্বর, ব্যথা, রাত্রে ভীষণ কাশি হয়, র ওঠে এক এক সময়।

সমীর বলল, ভাবনা করবেন আমি নেব আপনার মায়ের চিকিৎস ভার।

* * *

রাত্রে হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টা বসে সমীরের মনে পড়ল প্র কুড়ি বছর আগেকার কথা। মেদিনীপুরেই বিখ্যাত মজুমদার বাড়ি তার অভাগিনী মা দুবেলা রা কাজ করতেন, আর ঐ বাড় একতলার একখানি ঘরে তাকে নি থাকতেন তিনি। বুড়ো কর্তা পরমে বাবু দয়ালু লোক ছিলেন। নিরু বিধবা ও তার অসহায় সন্তানে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলেন তি আর তাঁরই সহায়তায় সমীর পেয়ে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সুযোগ।

কিন্তু যেবার সে ম্যাট্রিক দি সেবারই হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে পর বাবুর মৃত্যু হল। আর তার ম অল্প দিন পরেই আক্রান্ত হ নিউমোনিয়ায়। পয়সা কড়ি সহায় সম্বল নেই, বাচ্চা ছেলে স বিপন্ন হয়ে পরমেশবাবুর বড় হে শেখরবাবুর কাছে গিয়ে প পড়ল।

শেখরবাবু সব শুনে বললে হাসপাতালে দিগে। আমার এত পয় নেই যে তা দিয়ে তোর মায়ের চিকিৎ করাব।

তাঁর স্ত্রী বিরাজমোহিনী কাছে ছিলেন। তিনি মুখ ঝামটা দি সারারাত্তির খুক খুক করে কা কে জানে যক্ষ্মা কক্ষা হয়েছে কিন আমি বাপু আর তোমাদের এ বা রাখতে পারব না। তাছাড়া এ তো বুকে বসে খেলে, পরীক্ষা-

রহ, এবার নিজের পথ দেখ।

পাগল হয়ে ছুটল সমীর হাসপাতালে ডাক্তার বাবুর কাছে। তিনি ীর গলায় বললেন, সীট পাওয়া সোজা ? একটা সীটের দাম কত নস ?

অনেক কাকুতি মিনতি, অনেক না কাটা করেও কোন ফল হল না। য হেড ক্লার্ক রামতারণ বাবুর দয়ায় টা ফ্রী বেড জোগাড় হল।

সেখানে তিন দিন তিন রাত চতন্য অবস্থায় পড়ে থেকে এবং প্রায় চিকিৎসাতেই প্রাণ হারালেন মীরের মা।

সহরে ওদের আত্মীয় স্বজন, কেউ ছল না। তারপর যে কি হল সমীরের উ জানে না।

সেই সমীর উদয়ন্ত পরিশ্রম করে একদিকে উপার্জন করেছে, অন্যদিকে কার খরচ চালিয়েছে কি করে, সে ার শুধু সে নিজে জানে, আর জানে ার সহপাঠী দেবব্রত চৌধুরী। ওরা ২'জনেই মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ষ্টেট স্কলার শীপ পেয়েছিল। দেশের শিক্ষা শেষ করে ীই পেরেছিল বিদেশে গিয়েও আরো

পান্নালালের পিসি

দুলাল বিশ্বাস

পান্নালালের পিসি ;
হঠাৎ সেদিন বললে হেঁকে—
কোথায় থাকিস ? পাইনে ডেকে,
কৌটো খালি রাত্রি থেকে
ফুরিয়ে গেছে মিশি !
ছুটে গিয়ে পান্না তখন
মিশি এনে দিল যখন,
পিসি শুধায়—বল্ বাছাধন,
বিলিতি না দিশি ?
পান্না বলে—পিসি,
হতে পারে খুব বড়জোর
একটু উনিশ বিশ ই !
বলিস কিরে ! উনিশ বিশ ?
তার চেয়ে তুই আমায় দিস—
একটুখানি সেঁকো বিষ,
এইনা বলে-পিসি—
রাগের চোটে আছড়ে ভাঙে
ঘরের যত শিশি।

কিছু নূতন জ্ঞান আহরণ করে আনতে।

আজ সেই সমীর সেই মেদিনীপুরের জেলা হাসপাতালেই এসেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডাক্তার হয়ে। কান্না আসবে না কেন তার সেই অনাথিনী মায়ের কথা মনে করে ?

* * *

সকাল বেলা প্রাণতোষ এসে সামনে দাঁড়াতেই সমীর বলল, এসেছেন ! আমি তৈরী হয়েই আছি। চলুন।

প্রাণতোষকে নিয়ে সমীর সরকারের গাড়ী এসে থামল যে বাড়ীতে, সে বাড়ী তার অতি পরিচিত মজুমদার বাড়ী।

ফটক পার হয়ে ঠাকুর দালানের ওপর দিয়ে ডানদিকের বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকল সমীর। বলল, পরমেশ বাবুর কে হন আপনি ?

সসংকোচে প্রাণতোষ বলল, নাতি।

তার হাত ধরে সমীর বলল, তার মানে তুমি শেখরদার ছেলে। অসুখ করেছে তোমার মার। তিনি আমার কে জান ? তিনি আমার বড় বৌদি। তাঁর অন্নেই মানুষ হয়েছি যে আমি ছেলেবেলায়। আমি এবাড়ীর বামুনমার ছেলে ভুলু, ভালো নাম সমীর।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে প্রাণতোষ। কি বলবে, কি বলা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারল না সে। খপ করে দুহাত বাড়িয়ে সমীরের পায়ের ধুলো নিল সে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা করুণ কণ্ঠ শোনা গেল। সে কণ্ঠ বিরাজ মোহিনীর। তিনি বললেন, ভুলু, ভেতরে আয় ত ভাই, একবার তোর সোনা মুখখানা দেখি।

আর একবার চোখ ভরে জল এল সমীরের। এই সেই বড় বৌদি, যাঁর তাগিদে, শেখরবাবু একদিন তার মৃত্যু পথযাত্রী মাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আজ সত্যিই সেই বড় বৌদির যক্ষ্মা হয়েছে এবং সে এসেছে তাঁর চিকিৎসা করতে।

বিছানায় এক কোণায় বসে সমীর বলল, কোন ভয় নেই বড়বৌদি। আমি আপনাকে সারিয়ে দেব।

সেই ছেলেটার শরৎ

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

সেই ছেলেটার দু'চোখ জুড়ে
জল টলমল করে,
হঠাৎ যদি ঝলমলে রোদ
তার দু'চোখে পড়ে।
মুক্তো হবে তা কি ?—
শরৎ, তবে সেই ছেলেটার
ব্যথার ছবি আঁকি।

বুকের পাঁজর দিচ্ছে উঁকি
ছেঁড়া জামার ফাঁকে,
শিউলি ফুলের দিন যে এলো
কেউ বলে না তাকে।
এলো খুশীর দিন,—
সেই ছেলেটা কেবল শোধে
বেঁচে থাকার ঋণ।

শরৎ বলো, আর কত কাল
চলবে এমন তরো ;
সেই ছেলেদের সামনে তোমার
খুশীর ছবি ধরো।
আর দিও তার সাথে—
বেঁচে থাকার শপথটুকু
সেই ছেলেদের হাতে।

উপাধি বিতরণ

দিলীপ দে সরকার

বাগদাদ বাসী 'বাগদা চিঙড়ি'
রাজা হোলো এসে সুদূর বঙ্গে,
'তোপসে' মাছেরা—তোপ দেগে তাকে
বরণ কোরলো নাচের চং এ।
'কাতলা'র দল ঘাড় কাত কোরে
সেলাম জানালো মোগল ধরনে।
এক ঝাঁক 'কই' বলে, 'কই ? কই ?
পোন্নাম হোই রাজার চরণে।'
আপন ভোলাসে কবি 'ভোলা' মাছ
পড়লো কবিতা, গোঁপটা পেঁচিয়ে।
'তেলাপিয়া' দিলো দীর্ঘভাষণ,
তেল দিয়ে আর বিকট চেঁচিয়ে।
অভিভূত হোয়ে বললো 'বাগদা,'
'ভুলবো না এই আদর যত্ন
সবাই-কে আমি দিলাম উপাধি
'পঙ্কভূষণ মৎস্যরত্ন'।

তারপর মানুষ আকাশে উড়লো...

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

গ্রীক পুরাণে ইকেরাস নামে একটি দুঃসাহসী ছেলের কাহিনী আছে। সে বন্দী থাকা কালে মোম দিয়ে পাখীর পালখ জুড়ে জুড়ে বিরাট দুই ডানা বানিয়েছিল; তারপর সেই ডানা দুটি দু'হাতে বেঁধে চুপি চুপি চেষ্টা করেছিল পাখীর মতন উড়ে পালাবার। কিছুটা সফলও হয়েছিল ইকেরাস। নকল ডানা ঝাপটিয়ে সে উঠে গিয়েছিল আকাশের দিকে। কিন্তু ছটফটে ইকেরাস শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পিতা ডীড্যালাসের সাবধান বাণী মনে রাখতে পারেনি। পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে ওড়ার আনন্দে সে এমনই বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে তার খেয়ালই ছিল না যে বেশী উঁচুতে উঠলে প্রখর সূর্যকিরণে তার মোম দিয়ে বানানো ডানা একেবারে গলে যাবে। শেষ পর্যন্ত হয়েছিলও তাই। সূর্যের উত্তাপে মোম দিয়ে জোড়া পাখীর-পালকগুলো খসে পড়লো একে একে। হতভাগ্য ইকেরাস মুখ থুবড়ে পড়লো মাটির উপর। ঘটলো তার মৃত্যু।

ইকেরাসের ঐ দুঃখের কাহিনী কিন্তু মানুষকে নিরাশ করে তোলেনি। বরং নতুন ভাবে ও উদ্যমে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। রেনেসাঁসের যুগে ইটালীর বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো-দা ভিঞ্চিও ঐ ইকেরাসের মত ডানা বানিয়ে আকাশে ওড়ার কথা ভেবেছিলেন। শুধু তাই নয়, আকাশে উড়তে পারে এমন কয়েকটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করে তার স্কেচ এবং বিবরণও হেঁয়ালী লিপিতে তিনি তার নোটবুকে লিখে রাখেন। বিলেতের উইণ্ডসোর প্যালেসে সেই নোটবুকটি রাখা আছে। দা-ভিঞ্চির পরেও মানুষ নানাভাবে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই সব চেষ্টার প্রায় সমস্তই শেষ হয়েছে অনিবার্য ট্রাজেডিতে। তবু মানুষ দমে যায়নি। তাই কেউ পিঠে বিরাট ডাক ঘুড়ি বেঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়োর ওপর থেকে। আবার কেউ গ্যাস ভর্তি বেলুনের নীচে ঝুড়ি বেঁধে তাতে চেপে উঠে গেছে মেঘের রাজ্যে। তবু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষের যন্ত্রযানে চেপে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সফল হলোনা।

১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর, ১০টা ৩৫ মিনিটে মানুষের হাতে গড়া বিমানটি একজন চালক সহ প্রথম ডানা মেললো আকাশে। শুরু হল নর পর্যায়ে আকাশ বিজয়। ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল মার্কিন দেশের নর্থ ক্যারোলিনায়। সেখানে সমুদ্রের ধারে, কিল ডেভিল পাহাড়ের কাছে বেশ খানিকটা সমতল জায়গা আছে। লোকে সেই জায়গাটাকে বলতো কিটি হক। সেই কিটি হক ই হয়েছিল দুনিয়ার প্রথম বিমান বন্দর। ঐখানে যারা বিমান উড়িয়েছিল তারা ছিল দুই ভাই। তাদের বাড়ি ছিল ওহিও প্রদেশের ডেটন শহরে। পেশায় দুই ভাই ই ছিল মেকানিক। ফেলে দেওয়া নানা যন্ত্রাংশ, কাঠ, কাগজ, ন্যাকড়া, লোহার পাতি, দড়িদড়া ইত্যাদির সাহায্যে তৈরী হয়েছিল তাদের সাধের বিমান; যার নাম তারা দিয়েছিল—'ফ্লায়ার—১'; ১৬ অশ্ব শক্তির এক মোটরের সঙ্গে সাইকেলের চেনের মাধ্যমে তারা বিমানের প্রপেলারের সংযোগ ঘটিয়েছিল। বিমানের চেহারাটা হয়েছিল বিচিত্র রকমের। যেমন জবরজঙ্গ তেমনই ঠুনকো। তা ছাড়া চালকের আসনটিও ছিল নড়বড়ে। তবু নির্ভীক মানুষের চেষ্টায় ঐ আজব আকাশ যান ঠিকই আকাশে উঠলো।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাদের ঐ দুই দুঃসাহসী ছেলের নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছোট ভাই ওঁভল রাইট-এর জন্ম হয়েছিল ১৮৭১ সালে। সে ছিল একাধারে ঐ বিমানের নির্মাতা এবং চালক। আর বড় ভাই উইলবার ও (১৮৬৭ ১৯১২) বিমান নির্মাণ এবং ওড়ানোর ব্যাপারে ছোট ভাইটিকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। দু ভাই নিজেদের সব সম্বল উজাড় করে, প্রতি বেশীদের সব উপহাস মুখ বুজে সয়ে তৈরী করেছিল একান্ত সাধের 'ফ্লায়ার ওয়ান' যন্ত্রটিকে। অবশেষে এল পরীক্ষার দিন। পাঁচজন সৈকতর কোস্টগার্ডকে সাক্ষী রেখে, দাদা উই বারকে পিছন থেকে ঠেলা দেওয়ার জন্যে বিমানের ল্যাজের কাছে দাঁড় করিয়ে 'দুর্গা দুর্গা' বলে ইঞ্জিনে ে স্টার্ট দিল ওঁভল। গোঁ গোঁ করে করতে বেলা ভূমির ওপর দিয়ে কিছুটা ছুটে গেল সেই অদ্ভুত যন্ত্রযান। তারপর কাপড় আর কাঠে তৈরী ডানার উপর ভর দিয়ে আচমকা উঠে গেল আকাশে। মাটি থেকে প্রায় ১২ ফুট উঁচু দিয়ে ১২ সেকেণ্ড সময় ধরে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে উড়ে চললে মানুষের হাতে গড়া প্রথম যন্ত্রচালিত বিমান।

অবশ্য এর আগেই গ্যাস বেলুনের সঙ্গে যন্ত্র লাগিয়ে একজন ফরাসী নৌ অফিসার ফেলিক্স দ্যু টেম্পল ডেক্স ক্লোয়িক্স (১৮২৩ ৯০) একটা মনোপ্লেন বানিয়ে ছিলেন। একজন ফরাসী নাবিক ১৮৭৪ সালে ফরাসী দেশের ব্রেস্ট শহরে ঢালু জমির ওপরে সেটিকে ওড়ানোরও চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াবার পর ঐ মনোপ্লেন তো ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নেমে এলো মাটি বুকে। ফেলিক্স সাহেবের পরেও ফ্রান্সের ক্লিমেণ্ট এ্যাডার (১৮৪১-১৯২৫) 'ইওলি' নামের এক বিচিত্র যন্ত্রযানে চেপে ১৮৯০ সালের ৯ অক্টোবর আরমেন ভিলিয়াস' নামক স্থানে ঐভাবে মাটি থেকে প্রায় ১৬৪ ফিট লাফ দিয়েছিলেন কিন্তু আকাশে বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারেন নি। তাই রাইট ভাইদেরই যন্ত্রচালিত বিমান নির্মাণের তথা প্রথ ঐ বিমানে চেপে আকাশে ওড়া গৌরব দেওয়া হয়ে থাকে আমেরিকার স্মিথ সোনিয়ান যাদুঘ রাইট ভাইদের হাতে গড়া সেই প্রথ বিমানটি রয়েছে।

ছিল বুড়ো আর বুড়ী। বুড়ো ছেলো ভীষণ কুড়ে। সারাদিন ঘরে বসে থাকতো। কোনো কর্ম করতো না। বুড়ো বুড়ীর তিন মেয়ে। তারাও দেখতে খুব ছিল। কিন্তু হ'লে কি হবে? তিনই বুড়োর মতন কুড়ে ছিল। শুধু খেঁত আর সারাদিন পড়ে শুতো। মেজো মেয়ে সারাদিন নাইত। আর ছোট মেয়ে কেবল গাজ করে ঘুরে বেড়াত। আর বুড়ী। সে আর কি করবে? বেলা উঠে বনে কাঠ কুড়াতে সে-কাঠ বাজারে বেচতো, সেই কাঠ বিক্রির পয়সা দিয়ে করতো চাল-ডাল যা পারত। ঘরে ফিরে বুড়ীকেই রান্না বান্না সবাইকে খেতে দিতে হ'ত। এই দিন যাচ্ছিল ওদের।

একদিন বুড়ীর খুব জ্বর এসে গেল। তিন এখান ওখান খুঁজে যে কটা পয়সা বুড়োর সামনে ধরে দিয়ে বলে—"শোনো, আমার ভীষণ জ্বর এই পয়সা দিলাম, তোমরা খাও তো, বাজার থেকে খুদ কিনে এনে রেঁধে বেড়ে খাও।" শুনে তো বুড়োর মুখ শুকিয়ে একে একে তিন মেয়েকেই বুড়ো সব বললো। তা শুনে বড় মেয়ে বললো—"আমার পেয়েছে ওসব পারবো না।" মেজো বললো—"আমি এখন সাধবো আর কোন কিছু পারবো" ছোট বললো—"মাগো, মা; পায়ে তেল কালি হলুদ লাগবে, আমি পারবো না মোটেই।" ত্যা বুড়ো রাগে গজ গজ করতে করতে থলে থলে বাজার গেলো। তারপর বাজার থেকে এক থলে খুদ কিনে বাড়ী ঢুকলো। কিন্তু বাড়ী পৌঁছে দেখে থলেতে একটাও খুদ নেই। আসলে বুড়ো রাগের চোটে খেয়ালই করে নি যে, থলে ফুটো। কাজেই রাস্তায় সবই পড়ে গেছে। বুড়ীকে এসে বলতেই তো সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, ইস! কত কষ্টের কাঠ কুড়োনোর পয়সা! বুড়ী রাগে বল্লো—"যাও যেমন ফেলেছো আবার রাস্তা থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে আনো গে। আর পয়সা নেই আমার।" এছাড়া উপায়ই বা আর কি? আবার বুড়ো খুদ খুঁটতে গেল। একটা একটা খুদ খোঁটে আর ভাবে, "এবার যে করেই হোক মেয়ে তিনটেকে বিদেয় করবো। আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো না।" এমন সময় মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ উঠলো। বুড়ো অতি কষ্টে কেঁদে ফেল্লো। একটা একটা করে খুদ খোঁটা কি সোজা কথা? সে তখন আকাশের দিকে চেয়ে বল্লো 'সূর্য ঠাকুর যদি তুমি আমার মাথার ওপর একটু ছায়া দাও তবে বড় মেয়েটার সাথে বিয়ে দেবো।" সূর্যিঠাকুর ছায়া দিল। তারপর বুড়ো বল্লো—"এবার পবনদেব একটু হাওয়া দিলে, মেজো মেয়ের সাথে বিয়ে দিই।" পবনদেব ঝির ঝিরে হাওয়া দিল। তখন বুড়ো গা জুড়িয়ে বল্লো—"এবার কেউ খুদগুলো খুঁটে দিলে তার সাথে ছোট মেয়েটার বিয়ে দিই।" গাছের ডালে এক কাক বসেছিল, সে তাড়াতাড়ি খুদগুলো খুঁটে থলেতে ভরে দিল। বুড়ো বাড়ী এলো খুদ নিয়ে। তারপর মেয়ে তিনজনকে বিদায় করলো।

এবার হ'ল কি জানো? বড়ো মেয়ে ভীষণ কুড়ে। সারাদিন ঘুমোতো। তার সুবিধেই হল। সূর্যিঠাকুর সেই সকাল বেলা কাজে বেরোয় আর বড়ো মেয়ে সেজেগুজে লাল টিপ কপালে দিয়ে দোর গোড়া পর্যন্ত বরকে এগিয়ে দিয়ে এসেই লম্বা ঘুম লাগায়। সন্ধ্যেবেলা সূর্যি ঠাকুর বাড়ী ফিরলে কোনো রকমে সব শুদ্ধু সোনার হাঁড়ী করে সূর্যের মাথায় বসিয়ে দেয়। ব্যস এক মিনিটে। রান্না শেষ। মেজ মেয়ের তো আরও সুখ। সারাদিন বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে গান গেয়ে পবন দেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ছোট মেয়ের মনে খুব দুঃখের সীমা নেই। তার বর কিনা কাক। সে সারাদিন কাঁদে। আর সাজগোজ করে না। কাক এখান ওখান থেকে ফলটল এনে দেয় সেই খায়। একদিন সে কাককে বললো, "চলো বোনেদের বাড়ী দিয়ে এসো আমাকে।" কাক পাখায় করে নিয়ে চললো। প্রথমে মেজো বোনের বাড়ী যেতেই সে

রাজপুত্তুর

তপনজ্যোতি সরকার

টগ্ বগ্ বগ্ ছুটছে ঘোড়া
যাচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়ে,
হুস্ হুস্ হুস্ উড়ছে ধুলো
পিছন দিকে লোহার খুরে।

ঝল্ মল্ মল্ রাজপুত্তুর
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে—
ফুল টুক্ টুক্ রাজকন্যার
খোঁজ পেয়ে সে হাজির গিয়ে।

ঝক্ মক্ মক্ সাত মহলায়
রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে,
হাউ মাউ কাউ দৈত্যি-দানো
দ্যায় পাহারা দ্বারের কাছে।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ যুদ্ধে কাটে
ছিলো যতেক দৈত্য দানো,
চিক্ চিক্ চিক্ সোনার কাঠির
স্পর্শে এবার ঘুম ভাঙানো।

ফুল তুল্ তুল্ রাজকন্যা
জাগলো আলোর ঝলকানিতে
প্যাঁ পোঁ পোঁ বাজছে সানাই—
বলছে গলায় মালা দিতে।

বললো—"না বাপু কাককে ঘরে ঢুকতে দেবো না। কোথায় খাবার দাবার নিয়ে পালাবে, তার তা ঠিক নেই।" মনের দুঃখে তখন বড় বোনের বাড়ী এসে নামলো। সূর্যদেব তখন বেরোতে যাচ্ছে কাজে। কাক বর নিয়ে ছোট বোনকে দোর গোড়ায় দেখেই বড় বোন চেঁচিয়ে ওঠে—আহাঃ বেরোতেই কাকের মুখ। না জানি কী দুঃখ আছে কপালে, পালা পালা। তা শুনেই

হবু বলে গবু রে,
মেওয়া ফলে সবুরে।
এতে এক রত্তি
ভুল নেই, সত্যি।
যতো কেন জল দিস্,
সার দিস্ খোল দিস্,
তবু হবে সইতে,—
ফল পাবি চৈতে।
দূরে নয়, চাতালে
রেল যাবে পাতালে,
হুড়্ মুড়্ তাড়া নেই,
জীবনের কাঁড়া নেই,
টাইম ? সেতো খুব কম,
চাপলেই দমদম।
তলা দিয়ে খুঁড়ছে,
পৃথিবীটা ফুঁড়ছে,
দিন রাত ঘট্ ঘট্,
ঠুক্ ঠাক্ খট্ খট্,
রেল যাবে পাতালে—
টের পাবি হাতালে।
হবু বলে গবু রে,
যাবে রেল,— সবুরে।
তত দিনে কাঁচা চুল—
পেকে যাবে বিলকুল,
কুঁজো হবো সাইজে,
তবু বাঁচা চাই যে ॥

ছোট-বোন কাঁদতে থাকে। তা দেখে সূর্যদেবের দয়া হয়। সে বলে-শোনো, তোমরা শিগ্‌গির গিয়ে আমার সূর্য কুণ্ডে ডুব দাও। কাকও মানুষ হবে আর তোমাদের সুন্দর চেহারা হবে। তবে, সাবধান। একটার বেশী ডুব দিও না যেন।" কাক মহা আনন্দে বউকে নিয়ে সূর্যকুণ্ডে ডুব দিল। দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর চেহারা হ'ল। দু'জনে সূর্যদেবকে প্রণাম করে বাড়ীর দিকে চললো। ঠিক সেই সময় সেই-পথ দিয়ে যাচ্ছিল মেজবোন পবনদেবের সঙ্গে। ছোট বোন আর বড় আনন্দে তাদের প্রণাম করলো ও সব একে একে খুলে বললো। মেজ বোনের শুনে তো হিংসায় বুক জ্বলে যেতে লাগলো। সূর্যের বরে ওরা এখন মেজ বোনের চেয়ে ঢের সুন্দর হয়েছে। মেজ বোন মনে মনে এক বুদ্ধি আঁটলো। পবন-দেবকে বললো, তুমি বাড়ী যাও। আমি বোন আর বোনের বরের সাথে একটু গল্প করে আসি। তারপর পবনদেব চলে যেতে মেজদিদি বোন ও তার বরকে বললো—"তোমাদের সূর্যদেব ঠকিয়েছেন। একটা ডুব দিতে বলেছে, কেন জানো ? দুটো দিলেই যে তোমরা সূর্যের মতন তেজ পেতে। তখন আর সূর্যের অহংকার থাকতো না। একথা শুনেই বোকা কাক ছুটে চললো সূর্য-কুণ্ডের দিকে। ছোট বোন চিৎকার করলো আরে থামো থামো। কে কার কথা শোনে ? গিন্নীর হাত ধরে কাক ঝপাং করে কুণ্ডে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া কাক হয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে 'হায়—এ, হা—য় এ্যা' করে কাঁদতে লাগলো। মেজবোন ওদের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সূর্যদেব তো আকাশ থেকে সবই দেখলো, বুঝলো। সে রেগে গিয়ে মেজ বোনকে অভিশাপ দিল,—'তুমিও ওদের মতো কালো কুৎসিৎ, আরও ছোট পাখী হও। তোমার ঘর বাড়ীও হবে না। তুমি এত নিষ্ঠুর যে তোমার বাচ্চাদেরও তুমি মানুষ করতে পারবে না। তোমার বোনই তাদের পালবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে মেজবোন ছোট্ট কোকিল হয়ে গেল।

সেই থেকে কোনো সুন্দর দেখলেই কোকিলের হিংসা জ্বলে যায় আর চেঁচিয়ে—কু—উ। কিন্তু গান গাইতে গলাটা মিষ্টি শোনায়। আর নেই, ঘর বাঁধতে জানে না সূর্যের শাপে। তাই কাকের বাসায় ডিম কাকমাসী সেই ছানা মানুষ করে

ঈর্ষাকাতর

অর্ণবজ্যোতি দেব

উমাকান্ত মাঝি,
লোকটা ভীষণ পাজি।
ভালো কথা বললে তাকে
শুনতে সে নয় রাজি।
কী করে হয় পরের ক্ষতি
এই ছিল তার মতি গতি।
চায়না ভুলে কারুর ভালো
দেখবে সে দুর্গতি।
হঠাৎ সেদিন উমাকান্ত
ক্ষেপে গিয়ে হয় অশান্ত।
চেঁচিয়ে কাঁপায় বাড়ি,
ব্যাপারটা কি। চমকে উ
গেলুম তাড়াতাড়ি।
গিয়ে দেখি উমাকান্তর
হাতে একটা চিঠি,
তার ছোট ভাই রমাকান্ত
পাশ করেছে বি টি—
দারুণ ভালো রেজাল্ট করে
কলকাতা সে থাকে,
উমাকান্ত এ চিঠি পায়
সকালবেলার ডাকে।
চিঠি পড়েই ক্রোধের জ্বা
বাড়তে থাকে তার,
গরম মেজাজ সপ্তমেতে
ঠাণ্ডা না হয় আর।
আমি বলি ক্ষেপলে কেন
এতো খুশীর খবর ;
উমাকান্ত চেঁচিয়ে উঠে
কাঁপিয়ে তুল্লো ঘর।
বললো পরে নিজের ছাড়া
কারুর ভালো হলে—
জানিস নাকি ঈর্ষাতে মোর
অন্তর যায় জ্বলে।
চোখ রাঙিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে
মারতে আমায় আসে
উমাকান্তর ঘর থেকে তাই
পালাই উর্ধশ্বাসে।

ারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ—

বই বাঁধাইয়ের জন্য মার্বেল পেপার
প্রস্তুতকারক এবং
পেপার রোল কাটিং-এর জন্য

অশোকা ইণ্ডাসট্রিস

৯/২ জে খেলাৎ ঘোষ লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

সম্পাদক—জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সত্যযুগ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ১৩ নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা=৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত এবং ডোমিনিয়ন প্রেস ১৩/১এ, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।

রাজ জ্যোতিষী

ফোন ঃ ৫৪-১৩১

(বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত জ্যোতিষী মাসিক পত্রিকা)

১৯৭৭ সনে মন্ত্রিসভার আমূল পরিবর্তন, ভারতের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রপতির শাসন, উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প (জানুয়ারী '৭৭), প্রধানমন্ত্রীর সংশয় (মার্চ '৭৭), ইন্দিরা গান্ধী……কেউ তাকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হবে না, (মামলার সময়, জানুয়ারী '৭৬) ১৯৭৫ সনে মুজিবের প্রাণহানি (জানুয়ারী '৭৫) এই সকল বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

সম্পাদক—**শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী**

জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিঃশাস্ত্রী, পুরোহিতরত্ন, এম, এ, এ (লণ্ডন)

হস্তরেখা ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় নানাপ্রকার তথ্য ও নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী জানবার জন্য

নিয়মিত **"রাজ জ্যোতিষী"** মাসিক পত্রিকা পড়ুন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২৪ টাকা ; যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ সম্পাদক—**শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী** হস্তরেখা ও কুষ্ঠি বিচার করেন দিবা ১২টা থেকে ১-৩০ মিঃ, রাত্রি ৬টা থেকে ৯টা, শনিবার ১২টা থেকে ৭টা, (রবি ও বৃহস্পতিবার বন্ধ)।

জ্যোতিষ বার্ত্তালয়

১/২এ নিলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৪

(শ্যামবাজার ও ফড়িয়াপুকুরের মধ্যে)

আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ **শ্রীশুকদেব গোস্বামী** জ্যোতিষ সম্রাটমহাশয়ের পুস্তকদ্বয়

নীলা প্রসঙ্গ

মূল্য ২০ টাকা (হস্ত ও রাশিচক্র সহ)

(বিশ্ব ইতিহাসে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ সর্ব প্রথম)

নর-নারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার

(অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ) ২য় সংস্করণ, মূল্য ১৫ টাকা।

জ্যোতিষ বার্ত্তালয় ফোন ঃ ৫৪-১৩১৩

১/২এ নিলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

ব্রাঞ্চ ঃ ১৭/২এ/১২ বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা—১০

(বিঃ দ্রঃ—সম্ভ্রান্ত সকল পুস্তকালয়ে উক্ত পুস্তকদ্বয় পাওয়া যায়)